মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমি
স্বর্গাদপি গরীয়

তৃতীয় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১[illegible]৮ | ৫ম সংখ্যা

আফগানিস্থানের প্রা[illegible]ন ইতিহাস

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এ[illegible], পিএইচ্-ডি

আফগানিস্থান অর্থাৎ আফগানদের দেশ মধ্য-এসিয়ার একটি অংশ। এই দেশ ২৯°৩০ ও ৩৮°৩১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬১° ও ৭৫°-এর মধ্যে অবস্থিত। আধুনিক যুগে আফগানরা যখন এই দেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব অধিকার করে তখন হইতে ইহার নাম হইয়াছে আফগানিস্থান। ইহার পূর্ব্বে এই দেশের এক অংশ তথাকথিত মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উহা ভারতবর্ষের একটি অংশ[১] বলিয়া গণ্য হইত। তৎকালে এই অংশ উহার বিভিন্ন প্রদেশের নামেই পরিচিত হইত; যথা: হিরাট প্রদেশ, কান্দাহার প্রদেশ। এই অংশ খোরাশান নামেও অভিহিত হইত। মোগলযুগে ইরাণের পূর্ব্ব হইতে উত্তর-ভারত পর্য্যন্ত মধ্য-এসিয়ার মালভূমি এই নামে পরিচিত ছিল।

কি ভৌগোলিক দিক হইতে, কি নৃতত্ত্বের (ethnological) দিক হইতে আফগানিস্থানকে এক দেশ বলা চলে না। বরং ইহাকে বিভিন্ন মূলজাতি (races) এবং কৌম্-এর (tribes) সমষ্টি বলা যাইতে পারে। ইহারা ইসলাম ধর্ম্ম এবং দুরানী আফগানদের শাখা বারাকজাই-দের (Barakzais) শাসনাধীনে একত্র আবদ্ধ হইয়াছে।

আফগানিস্থানের অধিবাসীদিগকে নিম্নলিখিত চারিটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়:

(১) পস্তভাষা-ভাষী আফগান বা পাঠান;

(২) পার্সিভাষা-ভাষী তাজিক (Tadjiks) এবং পা[illegible]ভাষা-ভাষী অন্যান্য কৌম (tribes)। মঙ্গোলীয় 'হা[illegible]রা' (Hazarah), 'চাহার-এইম্যাক' (Chaher E[illegible]aks) উহাদের অন্তর্ভুক্ত; ও

(৩) আফগান-তুর্কীস্থানবাসী তুর্কীভাষা-ভাষী উজ-বে[illegible];

(৪) কাফির প্রভৃতি একজাতীয় আর্য্যভাষা-ভাষী হি[illegible]কুশ কৌম।*

অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে আফগানিস্থানে পশ্চিমাঞ্চল 'আবেস্তা' রচয়িতাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না পূর্ব্বাঞ্চলের কাবুল নদী ঋগ্বেদে 'কুভা' (Kubha নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে 'কুভা' নদীর উল্লে আছে দুইবার।[২] এই সংস্কৃত শব্দটি বর্ত্তমান ইউরোপী ভাষায় 'কুবাহা' (Kavaha) রূপে উচ্চারিত হই থাকে। বর্ত্তমান কাবুল নদীকে গ্রীকরা 'কোফে (K[illegible]phen) উচ্চারণ করিত। ম্যাকডোনেল এবং কী মনে করেন, বর্ত্তমানের কাবুল নদীই যে ঋগ্বেদের 'কুভ নদী তাহাতে সন্দেহ নাই।[৩] কেহ কেহ মনে করে

১। See the *Records of the Moguls.*

* কাফির প্রভৃতিদের ভাষাকে প্রাচীন "পৈশাচিক প্রাকৃতে অন্তর্গত: বলা হয়।

২। Rigved, V. 53; 9, 7.

৩। See *"Vedic Index of Names and Subjects"* Vo p. 162.

কাবুল উপত্যকাই বেদের সপ্তসিন্ধু প্রদেশ।[৪] 'সিন্ধু' নামটি নির্দ্দিষ্ট দেশের নাম হিসাবে একবার মাত্র ঋগ্বেদে উল্লেখ করা হইয়াছে। তা' ছাড়া বেদে 'পখ্ত' নামক এক কৌম্-এর উল্লেখ আছে। ইহা যে অশ্বীদের নাম তাহা ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে।[৫] দশরাজ্ঞ বা দশ জন নৃপতির যুদ্ধে 'ত্রৎসু ভারত'দের (Tritsu Bhatas) বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে পখ্ত কৌমও ছিল তাহা ঋগ্বেদের উক্তস্থানে উক্ত করা হইয়াছে। সিমার (Zimmer)[৬] ইহাদিগকে 'পখ্তয়েস্' (Paktues) কৌম এবং তাহাদের বাসভূমি 'পকৃত্যুক'র সহিত এবং পূর্ব্ব-আফগানিস্থানের আধুনিক 'পকৃত্'-এর সহিত তুলনা করিয়া ইহাদিগকে উত্তরাঞ্চলের একটি কৌম (tribe) বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। হেরোডোটাসও উত্তর-পশ্চিম ভারতের 'পকৃতুয়েস' এবং 'পকৃতুক'র (Vii 65; iii. 102, and iv. 44) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ভারতজাতি মধ্য-দেশে বাস করিত বলিয়া অনুমিত হয়। ঋগ্বেদের তিনটি স্থলে[৭] 'পকৃথকে (Pakthas) অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আশ্রিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় স্থলে তাঁহাকে 'ত্রস-দস্যু'র (Trasadasyu) সহিত সম্পর্কিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ত্রস-দস্যুর জ্ঞাতি কুরুগণ যখন সুদাসগণকে আক্রমণ করিয়াছিল তখন পকৃথ কুরু-দিগকে সাহায্য করিয়াছিল। তৃতীয় স্থলে তাঁকে 'তুর্ব্বায়নে'র (Turvayana) সহিত এক এবং 'সিয়-বানে'র (Cyavana) শত্রু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, 'পকৃথ' বলিতে সর্ব্বত্রই পকৃথদিগের রাজাকে বুঝাইত।

পরবর্ত্তী কালে পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে হেরোডোটাস এই অঞ্চলের অধিবাসী সম্পর্কে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সট্টগাডি (Sattagydae), গান্ধারীয় (Gandarians), ডাডিকে (Dadicae) এবং আপারিটে (Aparytae) মিলিত হইয়া একশত মুদ্রা (talents) প্রদান করিত। ইহা ছিল সপ্তম বিভাগ। অর্থাৎ এই সকল কৌম-অধ্যুষিত অঞ্চল একত্র সংযুক্ত করা হইয়াছিল এবং উহা 'পাকৃতুইকে'দের দেশ (land of pactyika) নামে পরিচিত ছিল। উহা ছিল দারাউস হিস্টেপস্-এর (Darius Hystapses) সপ্তম প্রদেশের (Satraphy) অন্তর্গতঃ অঞ্চল।[৮] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 'পাকৃতুইকে'দের (Poctyika) দেশ ভারতবর্ষের নিকটে অবস্থিত ছিল।[৯]

'সট্টগাডি'রা (Sattagydae) যে প্রদেশে বাস করিত তাহা বর্ত্তমান দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফগানিস্থান অর্থাৎ কান্দাহার এবং সিন্ধু উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল।[১০] Bellow এই কৌমকে খট্টক নামধারী (Khattaks) আধুনিক পাঠানদের সহিত এক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহার মত গ্রাহ্যযোগ্য নহে। 'গান্ধারীয়দে'র দেশ 'সট্টগাডি'দের দেশের পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল, অর্থাৎ উহা বর্ত্তমান কাবুল এবং কাফিরিস্থানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিন্ধুর উপনদী 'কোফেন' (Cpohan) অর্থাৎ কাবুল নদী এই অঞ্চলের প্রধান নদী এবং 'কাস্পাটিরাস' (Caspatyrus) অর্থাৎ বর্ত্তমান কাবুল প্রধান সহর ছিল।[১১] সংস্কৃত সাহিত্যে গান্ধারীয় এবং তাহাদের দেশ গান্ধারের কথা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদিগকে ভারতীয় কৌম বলিয়া গণ্য করা হইত।

ডাডিকে কৌম কোন্ অঞ্চলে বাস করিত তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। কেহ কেহ এই কৌমকে দার্দ্দিস্থানের দার্দ্দি কৌম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ইহা অলীক কল্পনা মাত্র।

আমাদের মনে হয়, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আফ্রিদি স্থানে যে 'আপ্রিদি' বা 'আফ্রিদি'

৪। *Rigveda,* viii, 24, 27. See also Vivien Saint-Martin.

৫। Rigveda, vii, 18, 7.

৬। Altindisches Leben, 430, 431.

৭। Rigveda, viii, 22, 10, 49, 10; X. 611.

৮। See George Rawlinson 'A Mannual of Ancient History,' Pt. I, pp. 18-19.

৯। *Ibid.*

১০। Herodotus III. 92.

১১। *Ibid* III. 102.

কৌম বাস করে তাহারাই আগেকার আপারিটে (Aparytae) কৌম। গ্রিয়ারসন কর্ত্তৃক উল্লিখিত আর্য্যভাষার অন্তর্গতঃ 'খো' কথ্যভাষার ('Kho'-dialect) অনুরূপ ভাষা এই কৌমের ভাষা ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে তাহারা ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া 'পস্তু' ভাষা গ্রহণ করে। আমি যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয়, তাহারা একপ্রকার ভাঙ্গা 'পস্তু' ভাষায় কথা বলে।

হেরোডোটাস (III. 120) লিখিয়াছেন, "কাস্পাটিয়াস সহর (Caspatyus) এবং পাকৃতুইকে (Pactyica) প্রদেশের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে আরও অনেক ভারতীয় বাস করিত। ইহাদের বাসভূমি ছিল অন্যান্য ভারতীয়দের বাসভূমির উত্তর দিকে। ইহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী অনেকটা 'বক্ত্রুয়দে'র (Bactrians) অনুরূপ ছিল।" প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ 'পাকৃতুইকে' (Pactyica) প্রদেশের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে অনেক বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। মারকোহার্ট (Marquhardt) বলেন, এই প্রদেশ আর্ম্মেনিয়ার নিকটে অবস্থিত ছিল। হেরোডোটাসের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হেরোডোটাস লিখিয়াছেন, "পকৃতুইকে, আর্ম্মেনীয় এবং ইউসাইন (Euxine) সাগর পর্য্যন্ত পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট হইতে চারি শত মুদ্রা (talents) এবং ইহা ত্রয়োদশ বিভাগ (III. 93)। বিতর্কিত পকৃতুইকে (Pactyica) প্রদেশ পারস্য সাম্রাজ্যের সপ্তম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং উভয়কে এক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। হেরোডোটাস 'পকৃতুইকে' প্রদেশের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "সিন্ধু নদী কোন্ স্থানে সাগরে পতিত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দারাউস্ অনেকগুলি জাহাজ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল জাহাজের কাপ্তেন ছিল স্কাইল্যাক্স (Scylax)। জাহাজগুলি কাস্পাটিরাস (Caspalyrus) সহর এবং পকৃতুইকে (Pactyic) প্রদেশ হইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত গিয়াছিল।" (Book Iv. 44)। পকৃতুইকেদের (Pactylc peoples) কথা হেরোডোটাস এই পুস্তকে আরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "পার্থীয়, কোরাসমীয় (Chorasamins), সগদীয় (Sogadian), গান্ধারীয় এবং ডাডিকেগণ বক্ত্রুয়দের মত একই সামরিক সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল।" (Book IV 66)। এখানে হেরোডোটাস তাহাদিগকে পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তবাসী কৌমের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। দারাউস হিসটেপস-এর (Darius Hystapses) 'বেহিস্তন শাসনে' (Behistun tablet) তাহাদিগকে ভারতবর্ষের সীমান্তবাসী কৌমের লোকদের সহিত এক সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে তাহাদিগকে ছাগচর্ম্মের কোট পরিহিত লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহারা যে পরশিক জাতীয় লোক নয় তাহাও বলা হইয়াছে।[১২] হেরোডোটাসও বলিয়াছেন, (Book III. 67) "পাকৃতুয়েসরা ছাগচর্ম্ম নির্ম্মিত লম্বাকোট পরে এবং তাহাদের দেশসুলভ এক প্রকার ধনুক এবং ছোরা ব্যবহার করে।" ভ্রমণকারিগণ বলেন যে, পর্ব্বতবাসী আফগানরা আজও ছাগচর্ম্ম নির্ম্মিত লম্বাকোট পরিধান করিয়া থাকে। পাকতুয়েসরা যে পারশিক নহে তাহা প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, (Book III 85) "সগরটিয়াস (Sogartias) নামে একটি যাযাবর মূল জাতি আছে। ইহারা পারশিক জাতি হইতে উদ্ভূত এবং পারশিক ভাষা ব্যবহার করে। তাহাদের পরিচ্ছদ পারশিক এবং পাকতুয়েদের (Pactya) পরিচ্ছদের মাঝামাঝি।

পারশিক ভাষায় লিখিত প্রথম দারাউস-এর ইতিবৃত্তে[১৩] আমরা নিম্নলিখিত নামগুলির উল্লেখ দেখিতে পাই :

হিন্দু অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী, হারাখওতি (Harakhwatis) বা আরাকোসিয়া (গ্রীক আরাকোসিয়ান) এবং গদারা (Gadara)। হেরোডোটাস গান্ধারীয়দের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গদারা এবং হেরোডোটাস কথিত গন্ধারীয় নিশ্চয় এক এবং অভিন্ন।

অতঃপর আলেকজাণ্ডারের অভিযান আরম্ভ হয়।

১২। Rawlinson—"The Inscription of Darius at Behistun' in "History of Herodotus" Vol. II.

১৩। Lassen—"Indische Altertumtums, Kunde," Bd. 2 and Z. F. lK. d. M., Vol. VI, p. 62 and 92.

আরকোশিয়া (বর্ত্তমান কান্দাহার প্রদেশ) হইতে বক্ত্রিয়া[১৪] অভিমুখে তাঁহার অভিযান পরিচালিত হইবার সময় আলেকজাণ্ডার প্রথমে যে ভারতীয়দের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহাদিগকে কেহ কেহ 'পরপমিসিদিয়ান (Parapaimisadian) নামে অভিহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে-পর্ব্বতমালাকে হিন্দুকুশ নামে অভিহিত করা হয় পূর্ব্বে তাহারই নাম ছিল 'পরপমিসুদ' (Paropemisad)।

ইহার পর ধাটি ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অর্থাৎ 'এস্পাসীয়' (Aspaians) বা 'হিপ্পাসীয়' (Hippasians) গুরীয় (Gurieans) এবং অস্‌সাকানীয়দের (Asskanians)[১৫] বিরুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের অভিযান সুরু হয়। ষ্ট্রাবো (Strabo) বলিয়াছেন, প্রাচ্যদেশে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলবর্ত্তী সেলুকাস তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্ব অংশ (সিন্ধুনদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী) ৩১০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের হাতে সমর্পণ করেন। ভিন্‌সেন্ট স্মিথের মতে গেড্রোসিয়া (Gedrosia) অর্থাৎ আধুনিক দক্ষিণ বেলুচিস্থান সহ সমগ্র আফগানিস্থান এইরূপে চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।[১৬]

আফগানিস্থানের অধিবাসীদের জাতিগত উৎপত্তি লইয়া বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, বেদের 'পখ্‌ত' (Pakhta) এবং হেরোডোটাস কর্ত্তৃক উল্লিখিত পক্‌তুয়েস বর্ত্তমান 'পাখ্‌তুন'দের (Pakhtuns) মধ্যে আজও বাঁচিয়া আছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'পখতুন' উচ্চারণ করা হয়। ভারতবর্ষে উহারা পাঠান নামে পরিচিত। পকতুয়েসদের চারিটি শাখার মধ্যে দুইটির ঐতিহাসিক বিবরণ জানিতে পারা যায়।

সংস্কৃত পুস্তকাদিতে যাহারা ভারতীয় গান্ধারীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে গান্ধারীয়গণ (Gandarians) হইতে তাহারা অভিন্ন। নিয়ামৎউল্লা বিভিন্ন আফগান কৌমের যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহাতেও এই নামটি আছে। তিনি তাঁহার "History of Afghan Tribes" নামক পুস্তকে 'গোণ্ডারী' (gondari) নামক একটি কৌমের উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই কৌম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বেলু (Bellow) এবং অন্যান্যদের মতে 'আপিরিদি' (Apiridi) বা আপারিটেগণই (Aparytae) বর্ত্তমান আফ্রিদি নামক আফগান কৌম।[১৭] তাহারা নিজদিগকে 'আপরিদি' বলে। আমি নিজে এই কৌমের কয়েকজন লোকের নিকট নাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছি। তাহারা তাহাদের কৌমের নাম স্পষ্টভাবেই 'আপরিদি' উচ্চারণ করিয়াছে। আফ্রিদি কথাটা বোধ হয় ইংরেজী ভাষার বিকৃত উচ্চারণ (English corruption)।

গ্রীক ও রোমান লেখকরা যে সকল নামের উল্লেখ করিয়াছেন অনেকে তাহাদের সহিত বর্ত্তমান আফগানদিগকে এক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা এবং অনুরূপ প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই।

এই সকল প্রমাণাদি হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, আফগান রাজ্যের পূর্ব্ব অংশ এবং স্বাধীন আফগানদের (পাঠান) অঞ্চল যাহা পেশওয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং যাহা "ইয়াঘিস্থান" (Yaghistan) অর্থাৎ 'স্বাধীন জনগণের বাসভূমি' (land of the Freemen) বলিয়া কথিত—এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভারতীয়। পক্ষান্তরে আফগান রাজ্যের পশ্চিমাংশের রাজনৈতিক ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, উহা ইরাণী ভাষাভাষী লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল।

ভারতে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ২৪৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বক্ত্রিয়াতে (Bactria) 'হেলেনিক' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪০ হইতে ১২০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত মধ্য-এসিয়া সিথিয় এবং ইউ-চিরা (Yue-chi) এই দেশ আক্রমণ করে। এই সময়েই আরাকোশিয়াতে (Arachosia)[১৮] পার্থিয়ানরা

১৪। Arrian—Anbasis III, 28.

১৫। Arrian—Anbasis III, 23, Indika 1-1-8, Strabo XV, 1.

১৬। V. Smith—'Early History of India.'

১৭। Bellow—"Races of Afghanistan" and Imp. Gazetteer of India.

১৮। পার্থিয়ানরা 'আরাকোশিয়'দিগকে শ্বেত ভারতীয় (The Whit Indians) বলিত।

See Isidor-charae-[illegible]ans Parth P. Q. ed. Hudson; also, Rawlinson "A Manual of Ancient History" Bk. IV, Pt. II per I p.

বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের এক জন রাজার নাম ছিল 'গণ্ডোফারনেস' বা গণ্ডফোর (Gondopharnes—২০—৬০ খৃষ্টাব্দ)।

পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে ইউ-চিরা এই দেশ অধিকার করে এবং সুবিখ্যাত রাজা কণিষ্কের শাসন-সময়ে খৃষ্টীয় অষ্টসপ্ততি সালে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠিত হয়। এই সময় বেলুচিস্থানসহ এই দেশ রোমান লেখকদিগের নিকট 'ইণ্ডো-সিথিয়া' নামে পরিচিত ছিল। খৃষ্ট-জন্মের পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শ্বেত বা Epithalite হূনগণ এই দেশ আক্রমণ ও অধিকার করে।[১৯]

এইরূপে আফগানিস্থান মধ্য-এসিয়ার বিভিন্ন যাযাবর জাতির দ্বারা[২০] আক্রান্ত হয়। তাহারা এই দেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব অধিকার করিয়া এই দেশেই বসবাস করিতে আরম্ভ করে এবং ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতা এবং ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

অতঃপর আফগানিস্থানে ইসলামের বিজয়কেতন উড্ডীয়ন হয়। আরব ঐতিহাসিকগণ এই দেশকে 'হিন্দ ও সিন্দের দেশ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তৎকালে এই দেশ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; যুরথুষ্ট্রের ধর্ম্মাবলম্বীরাও এখানে সেখানে বাস করিত। ডবল্যু. মুইর (W. Muir) তাঁহার "The Caliphate, Rise, Decay and Fall" নামক পুস্তকে (২৯১ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন, "এই সকল অঞ্চলে বহু দিন পর্য্যন্ত পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল। সিগিস্থানে (Sigistan) মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ একটি মন্দির অধিকার করেন। এই মন্দিরের প্রতিমাটি স্বর্ণনির্ম্মিত এবং উহার চক্ষু চুণী দ্বারা নির্ম্মিত ছিল।" আল্‌বেরুণি তাঁহার "Prolegomena to India" নামক পুস্তকে কাবুলের রাজবংশকে 'তুর্কী শাহী' এবং লাল্লীয়ার বংশকে 'হিন্দুশাহী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'তুর্কী শাহী'রা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং 'হিন্দুশাহী'রা ছিলেন কাবুলের ব্রাহ্মণ।[২১]

আরবরা সর্ব্বপ্রথম আফগানিস্থান আক্রমণ করে খলিফা ওস্‌মানের (Kalif Othman) রাজত্বকালে অথবা বোধ হয় মোয়াবিয়ার (Muawiya) আদেশে। তিনিই বসরার শাসনকর্ত্তা আব্‌দাল রহ্‌মানকে সিগিস্থান অধিকার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিগিস্থানই প্রাচীন 'সকস্থান' (Sakastan) এবং বর্ত্তমান সিস্থান (Sistan)। সিস্থান, আরাকোশিয়া এবং কাবুলের উপর দিয়া বসরার শাসনকর্ত্তার অভিযান চলিয়াছিল। কিন্তু আরবগণ দেশে ফিরিয়া গেলেই স্থানীয় শাসকগণ পুনরায় বিদ্রোহ করিয়া বসিত। এই সকল অভিযানের কোনটাতেই মুসলমানগণ স্থায়ীভাবে আফগানিস্থান অধিকার করিয়া বসে নাই। ডবলু, মুইর (W. Muir) ("The Caliphate, Rise, Decay, and Fall", p. 201) বলেন, 'আল্‌-বসরার শাসনকর্ত্তা ইবন্‌ আমীর 'অক্সাস্‌' (Oxus) নদীতীরস্থ 'খোয়ারিজম্‌' (Khwarism) জয় করিয়া কিরমান (Kirman) ও সিগিস্থানের (Sigistan) বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে তরবারির শক্তিতে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য এবং হিরাট (Herat), কাবুল (Kabul) এবং গজ্‌নার (Gazna) রাজাদিগকে অধীনে আনয়ন করিতে তাঁহার সেনাপতিকে রাখিয়া যান। তখন পর্য্যন্ত মুসলিম কর্ত্তৃত্ব সামান্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তেমন স্থায়ী হইতেও পারে নাই। কারণ আমরা দেখিতে পাই, সীমান্তস্থিত এই সকল প্রদেশ ক্রমাগতই মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া কিছুদিনের জন্য স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।"

১৯। Lassen—I. C. Bk. I, p. 434 and Wilken in *Abhandhlengen der Berliner Akad*, 1818-1819.

See also Rawlinson "A Manual of Ancient History," Book IV, Part I, p. 553.

২০। See the latest news regarding these hordes from the writing of Laumann "*Uber die einheimischen sprachen von ost-Turkestan im fruher Mittelalter.*"—Z. d. m. G. 1907, Bk. 9 and 1908, Bk. XXII; F. W. R. Muller "*Tori und Kuisan*" im Sitzungs ber. d. Kgl. Pr. Akad. d. w.; Sten Konow "*Indo-Skythisches Beirtrage*"; SD. AW. 1916, E. Sieg—*Ein ein einheimischer Name fur Toxri*—*ibid.* H. Klaatsch—"*Morphologische studien Zur Rassen Diagnostik der Zurfanschadel*" 1913; Auren Stein—Zur Geschichte der Sahis von Cabool im Festgruss des R. V. Roth Stuttgartt, 1893. E. Meyer "*Geschichte des Altertum.*" Dr. Charpentiers' criticism on Yue-chi as a Centum language in Z. d. M. G. 1915 and P.

২১। See also Aurel Stein—"Zur Gischichte Der Shahi Dynastic" and his writings on the same topic in J.A.S.B.

G. Le Strange তাঁহার "The Lands of the Eastern Caliphate"-এ বলিয়াছেন,[২২] ভারতীয় সীমান্তের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে মুসলিম অভিযানের ইতিহাসে কান্দাহার সহরের (প্রাচীন আরাকোশিয়া) উল্লেখ অনেকবার করা হইয়াছে। 'বলধুরী' (Baladhuri) বলেন, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সিজিস্থান হইতে মুসলমানগণ এই সহরে পৌছিয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, তাহারা এই সহর অতিক্রম করিয়া সুবৃহৎ প্রতিমা 'আল্-বুধ্' ধ্বংস করিয়াছিল। 'আল্-বুধ্' যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী যুগে 'মুকাদ্দসী' (Mukddasi), ইবুরুস্তম (Ibu-Rustam) এবং ইয়াকুবীতে (Yakubi) কেবল প্রসঙ্গক্রমে সাধারণতঃ হিন্দ বা ভারতীয় সীমান্ত হিসাবে কান্দাহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।"

অবশেষে আরবগণ 'সিস্থান'[২৩] জয় করিয়া উহাকে কাবুল রাজ্য আক্রমণের ঘাঁটিতে পরিণত করে।

হিজরী ৭৯ সালে (৬৯৮ খৃঃ অঃ) উবায়েদ আল্লাহ্ বেন আলি বকর-এর অধীনে এবং হিজরী ৮১ সালে (৭০০ খৃঃ অঃ) আল্-হাজ্জাজ-এর (Al-Hadjdjadj) অধীনে কাবুলের হিন্দুরাজা রণবলের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযান প্রেরিত হয় তাহার সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছিল। নোয়েলডেকে (Noeldeke) তাঁহার "Sketches from Eastern History"তে (পৃঃ ১৮২) বলিয়াছেন, "ইয়াকুব এবং তাঁহার পরবর্ত্তিগণ এই সকল অঞ্চলে অনেক বিজয় অভিযান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এইগুলির কোন বিশদ বিবরণ আমরা পাই না। ৮৭১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি কাবুল অথবা তৎসন্নিহিত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত কতকগুলি মূর্ত্তিসহ খলিফা মোটামিদের (Caliph Motamid) দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৮০০ খৃষ্টাব্দে ইয়াকুব বেন লাইস (Jakub ben Lies) যখন শক্তিশালী হইয়া উঠেন তখন আবার নূতন করিয়া অভিযান আরম্ভ হয়। ইনি পশ্চিম আফগানিস্থান আক্রমণ করিয়া অনেক মন্দির এবং মূর্ত্তি ধ্বংস করেন। এই সময়েই লাল্লিয়া (Lalliya) নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কাবুলে 'হিন্দুশাহী' রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই হিন্দুরাজ্যই[২৪] মুসলমানদের ভারত আক্রমণের পক্ষে বাধা-স্বরূপ ছিল। অতঃপর একাদশ শতাব্দীতে তুর্কী বীর গজনীর মাহ্মুদ এই রাজ্য জয় করেন।

হিজরী ৩৫০ সালে (৯৬১ খৃঃ অঃ) আলপ্তগীন জাবুলীস্থান অধিকার করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। আফগানিস্থানে অ-মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে ইহাই প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র। তাঁহার মৃত্যুর পর যিনি রাজা হন তিনি কাবুল এবং পাঞ্জাবের হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। ১০০০ খৃষ্টাব্দে কাবুল হিন্দুদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়।[২৫] সবুক্তগিনের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী মাহ্মুদ হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযান চালাইতে থাকেন।

একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মাহ্মুদ ভারতবর্ষে যে সকল অভিযান করেন সেই সকল অভিযানের সময়ই আমরা সর্ব্বপ্রথম 'আফগান' নামটি শুনিতে পাই। মাহ্মুদের রাজদরবারের ঐতিহাসিক আলবেরুণি তাঁহার "Prolegomina on India"তে[২৬] আফগানদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতের পশ্চিমস্থ পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে সিন্ধু উপত্যকা পর্য্যন্ত আফগানদের বাসভূমি। আফগা গণ মাহ্মুদের সৈন্যদলে যোগদান ও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ রিয়াছিল।"

পরবর্ত্তী কালে ইবন বতুতা তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে এই দেশ ভ্রমণ করিয়া আফগানদিগকে 'কাবুলবাসী পারশিক কৌম' (A Persian tribe living in Cabul) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ইয়ামিন দাওয়ার প্রদেশ (land of Zamindawar) (পশ্চিমাংশ) এখনও বিধর্ম্মীদের দেশ, যদিও অনেক মুসলমান সেখানে বাস করে।

২২। Cha. XXIV, p. 347.

২৩। Encyclopædia des Islam, p. 171.

২৪। Aurel Stein on Shahi Dynasties in J.A.S.B.

২৫। See V. Smith—Early History of India, Third Edition.

২৬। Sachau—Translation of Alberune's Prolegomena on India.

মাহ্মুদের দরবারের আর একজন ঐতিহাসিকের নাম ওৎবি (Otbi)। তিনি তাঁহার 'তারিখ-ই ইয়ামিনি' নামক পুস্তকে আফগানদিগকে পার্ব্বত্যজাতি (mountaineers) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহারা মাহ্মুদের সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আল-ইদ্রিস (Al-Idris) কাবুল এবং কান্দাহার সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তিনি আফগান নামের উল্লেখ করেন নাই। অপর এক ঐতিহাসিকের নিকট হইতে 'ফেরিশ্‌তা' (Ferishta is said to have read from another historian) এইরূপ জানিতে পারেন যে, ১১৯২ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী যখন দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তখন পৃথ্বীরাজের অধীনে এক দল আফগান অশ্বারোহী ছিল। কিন্তু 'ফেরিশ্‌তা' যে স্থান হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নির্ভরযোগ্য নহে।

যাহা হউক, তুর্কীদিগের সেনাদলে যোগদান করিয়া যে পর্য্যন্ত না আফগানগণ ভারতে আসিয়াছিল সে পর্য্যন্ত ইতিহাস তাহাদিগকে উপেক্ষাই করিয়াছে। গজনবীর যুগেরই (Gaznivide period) আমরা তাহাদের প্রথম দেখা পাই। সেই সঙ্গে আরও একটি কৌমের (tribe) সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়; তাহাদের নাম ঐতিহাসিকগণ খালদ্ (খিলিজি) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইসলামিক যুগের প্রারম্ভে আফগানিস্থানের দুইটি শক্তিশালী কৌমের নাম আমরা জানিতে পারি—একটি আফগান এবং আর একটি খালদ্ (ঘিলজাই—Ghilzais) ।[২৭]

ইরান সাহারে (Eran Sahr) উল্লিখিত হইয়াছে যে, খালাক (Xalac) নামক তুর্কী কৌমের এক শাখা আধুনিক আফগানিস্থানে বাস করে বলিয়া ইস্তাখ্রি (Istaxri) এবং তাহার পর ইব্ন হোকল তাঁহাদের বিবরণে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঘোর অঞ্চলের পশ্চাৎ অংশে হিন্দ এবং আফগানিস্থানের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে এই কৌম অতি প্রাচীন কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। তুর্কী চরিত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং ভাষা অবিকৃত অবস্থাতেই তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। (see Istakri 6, Ibn Hauqal 3-10, Idriss I. 444.)

লেখকের মতে 'খালাক' (Xalac), প্রকৃতপক্ষে খোলাক (Xolac)—এপিথেলাইটদের বংশধর।[২৮]

রক্সাস (Ruxxas) এবং জাবিলের (Zabil) (Ibn al Adir VII) সহিত ইয়াকুব-ইন-অল হেইসের (Jaqubb-in al hais) যুদ্ধের সময়ই সর্ব্বপ্রথম আফগানিস্থানের খোলাকদের কথা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। এক শত বৎসর পরে গজনীর আমীর সবুক্তগিন তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করেন। তাহারা ঘোরের আফগানদের সহিত সবুক্তগিনের সৈন্যদলে প্রবেশ করে।[২৯] এই সময় হইতে ইতিহাসে প্রায়ই তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইরান সাহারের লেখকের মতে বর্ত্তমানের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী আফগান কৌম ঘিলজাই (Ghilzai) বা গিলসি (গিলজি) তাহাদেরই বংশধর।[৩০]

এই প্রসঙ্গে 'রেভারটি'র (Raverty) "Notes on Afghanistan"-এর কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে করেন, তুরস্কের 'খিলজি' কৌম এবং আধুনিক 'ঘিলজাই' কৌম অভিন্ন। কিন্তু ঘিলজাইরা পস্তু ভাষায় কথা বলে। জেমস্ ডারমেষ্টেটার (James Darmestetrr) তাহার "Chants populair des Afghans" নামক পুস্তকে[৩১] বলিয়াছেন, "খোলজিস্ (Kholjis) প্রকৃতপক্ষে খোলাজগণ (Kholaj) আফগান নয়, তাহারা তুর্কী জাতি হইতে উদ্ভূত।" তিনি 'খোলজ' (Kholg) বা 'খোলাজ'

২৭। See *Abhandlungin der Koniglichen Gesellschaft der wisscuschaft zu Gottengen—Phil. Hist. Klasse. Neve Folge,* Bd. III No. 2, aus den yohren 1899, 1901. *Eran —Sahrinact der Geographic d. Ps.* Moses Xorenali-von Dr. I. Marquart.

২৮। See Al Xwarizimi,—Mufatih al Elum 10.

২৯। See Otbi in Elliot's "History of India," Bk. II, p. 24.

৩০। P. 253.

৩১। P. CL XVI, CLXXII.

(Kholaj)-দিগকে 'খিলজাইদের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। আফগানদের মধ্যে বৈদেশিক সংমিশ্রণের কথা প্রসঙ্গে তিনি খিলজাইদিগকে তাতার জাতি-সম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আমি মনে করি প্রাচীন তুর্কী খোলাক, মধ্য যুগের তুর্কী খিল্লিজি এবং (Khillijy) এবং পস্তভাষা-ভাষী বক্র নাসিকা (কোন কোন ভ্রমণকারী ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন) আধুনিক খিলজাই কৌমের আফগানরা এক এবং অভিন্ন কি না তাহা আজও নির্দ্ধারিত হয় নাই। আর এই তিনটি কৌম যদি এক এবং অভিন্নই হয় তাহা হইলে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কৌমের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মৌলিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে তাহাদের নামেরও ধ্বনিগত পরিবর্ত্তন।

নিশান্তে

(গান)

অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, এম-এ

শিশির-ঝরা শিউলিতলে
চাঁদের আলোর সুরে সুরে
আলো-ছায়ার মায়া বিছায়
স্বপন-ঘন গোপন পুরে॥
নিশা শেষের বেদনা-ম্লান
ক্লান্ত বাঁশীর করুণ তান
তন্দ্রালস ভৈরবীতে
কেঁদে বেড়ায় দূরে দূরে॥

দীঘল হ'ল শালের ছায়া
দীঘির কালো নিতল জলে,
পূর্ব্বাকাশে ভোরের তারা
বিদায়-পথে নীরবে চলে॥
একলা আমি তোমার লাগি'
বিফল রাতি কাটানু জাগি',
ঝরা ফুলে ভোরের হাওয়া
কী কথা কয় ঘুরে ঘুরে॥

সন্ধ্যারাগ

(উপন্যাস)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাবার শরীরে পরিবর্ত্তন এল। এ যাত্রা সামলে নিলেন তিনি। বিজুর সঙ্গ, সেবা ও আদরে থাকবার একটু আগ্রহ হয়তো এল তাঁর মনে। আর ওষুধ-পথ্যের চেয়ে সেই ইচ্ছেটুকুর জোরেই উপকার হোল বেশী।

এতদিনে দারিদ্র্যের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি পরিচয় হোল বিজুর। তাদের অবস্থা কোনদিনই সচ্ছল ছিল না, তবে তার বয়েস কম ছিল; বাড়ীতে বেশী দিন থাকতোও না, তাই অভাবের আঁচ তেমন ক'রে গায়ে লাগেনি।

দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগের চিকিৎসা চালাবার মত সম্বল একেবারেই নেই, অথচ না চালালেও নয়। রাজগঞ্জে বড় ডাক্তার আছে, তাকে আনিয়ে তার ব্যবস্থামত চলতে পারলে বাবা অত দিন শয্যাশায়ী থাকতেন না। সে উপায় নেই। খানিকটা পাশ-করা যে ডাক্তারটি কাছাকাছি আছে, বারে বারে ভিজিট না পেয়ে সে আজকাল আর আসে না, ব'লে পাঠায় রোগীর ভিড়ে তার মরবার ফুরসৎ নেই। অমিয়মামার এক বন্ধু এসে এক দিন দেখে গিয়েছিলেন, তাঁর ওষুধই চলছে।

সবাই বলে দামী ওষুধ চাই, বিলিতী টনিক চাই, স্বাস্থ্যকর জায়গায় বায়ুপরিবর্ত্তনে নিয়ে যাওয়া চাই। সবই চাই, অথচ সব 'নাই'। অন্ন-বস্ত্র, ব্যবস্থা, সাহায্য কিছুই নাই। ব্যাপার মন্দ নয়।

বিজু ভাবে, সংসারে কোন সমস্যাই তুচ্ছ নয়, তবু চিরদিন মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে টিঁকে থাকবার। সেজন্যে চাই অন্ততঃ কিছু আহার্য্য এবং লজ্জা ত্যাগ না করতে পারা পর্য্যন্ত পরিধেয়। অথচ এমন দিন আসে যখন সেই অতিপ্রয়োজনীয় বস্তু দুটি অতি দুর্লভ হ'য়ে ওঠে তখন চট ক'রে জীবনের আর সব সমস্যা সরল হ'য়ে যায়, অর্থাৎ একটি মাত্র প্রশ্নে এসে ঠেকে, শরীর রাখবো কি দিয়ে আর ঢাকবো কি দিয়ে? আর শরীরই যদি না থাকে তবে তো মানসিক ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হবার বালাই থাকে না। টিঁকে থাকবার সমস্যা একান্ত জটিল হ'য়ে দাঁড়ালে, লোকে রাগী, ত্যাগী, খোসামুদে যা কিছুই হোক না, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। না হ'য়ে সে করবে কি? গরীবরা তো মরবেই। তারা ধনী হ'তে পারে নি, প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছে। আর প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম, যে হারবে, সে মরবে। ভালো হোত, যদি সঙ্গে সঙ্গে মনটাও মরে যেত। কিন্তু মজা এই, শক্তি যার যত ক্ষীণ, ইচ্ছাটা তার ততই প্রবল, ততই বদ্ধমূল তার বেঁচে থাকবার আসক্তি।

এমন সময় একদিন অমিয়মামা একটু আশার খবর নিয়ে এলেন। রাজগঞ্জে যেখানে তিনি মোক্তারী করেন সেখানে মেয়েদের মাইনর ইস্কুলকে হাইস্কুল করার চেষ্টা হচ্ছে। সম্প্রতি দুটো ক্লাস বাড়ানো হয়েছে। অমিয়-মামার চেষ্টা উদ্যোগে বিজু সেখানে হেড্‌মিস্ট্রেসের কাজ পেয়ে যেতে পারে, অবিশ্যি বি-এ পাশ করবে এই প্রতিশ্রুতিতে। অত্যন্ত খুসী হ'য়ে বিজু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাঁচা গেল, ভগবান্ আছেন যা হোক। নইলে সবাই মিলে শীগ্‌গিরই উপোষে মরতে হোত। রাজগঞ্জের মত নগণ্য জায়গায় জীবিকার দরুণ তাকে চাকরী করতে হবে একথা অবিশ্যি একবছর আগে তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু সে কথা ভেবে আর লাভ কি? গরজ বড় বালাই। স্বপ্ন তো সে অনেক কিছুরই দেখেছিল, এখনও অবসর মুহূর্ত্তে অনেক কিছুরই দেখে,

কিন্তু এতদিনে এইটুকু অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান তার হয়েছে, যে, স্বপ্ন স্বপ্নই। তবুও তো আকাশে কুসুম ফোটে ব'লেই জীবনের তরুশাখায় রস সঞ্চারিত হয়। ভয় কি! জীবন এখনও সামনে। বাবা ভাল হবেন, সে বি-এ পাশ করবে তারপরে পালাবে কলকাতায়। রাজগঞ্জের মেয়ে ইস্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সম্মানিত পদ বেঁধে রাখতে পারবে না কি তাকে চিরদিন?

"বাবা, আমি ফি হপ্তায় তোমাকে দেখতে আসবো, কিছু মন খারাপ কোরো না তুমি। এতো আর কলকাতা নয়, ক'মাইল পথ বল দেখি?" নানা ভাবে শিশুর মত তাঁকে বোঝাতে হয়, তবু অসহায় কাতর চোখে ঘরময় তাকে তিনি দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করেন।

এককালে নাকি ভীষণ রাশভারী গম্ভীর স্বভাবের লোক ছিলেন, বন্ধু-বান্ধব ছিল না, আড্ডা-মজলিশে কোনদিন যোগ দিতেন না, লোকে সমীহ ক'রে কথা কইতো, তাঁর পরিচিত জগত তাঁর আপিস ও কতকগুলো বইয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। এমন কি এই ক'বছর আগেও বাবাকে সে তার সঙ্গে ছাড়া কারুর সঙ্গে গল্প করতে দেখেনি। গাঙ্গুলী-জ্যাঠার সঙ্গে দুপুরের রোদ পড়লে দাবা খেলতেন, নীরবে। আরো ছায়া পড়ে এলে কোনদিন সখ ক'রে মাছ ধরতে বসতেন চুপ ক'রে। কেউ নিতান্তই গল্প জমাতে এলে গল্প করতেন তিনিও, তবে জমাট হোত না। উৎসাহের অভাবে সঙ্গী ছুতো ক'রে উঠে যেত। শুধু বিজু তার সঙ্গী। মুখে কথা ফোটবার পর থেকে অনর্গল এক তরফা গল্প সে ক'রে এসেছে। দূরে গিয়ে অজস্র চিঠি লিখে হাজার ছেলেমানুষী খবর দিয়েছে। "বাবা, ইন্দু বলেছে আমার মোটে মাথা নেই, ক্লাসে অঙ্ক ভুল হয়েছে ব'লে। তার সঙ্গে আমি কথা বন্ধ করে দিয়েছি।"—"বাবা, ছারপোকা খুব বেড়েছে বলে তক্তপোষ সব নীচে খেলার মাঠে নামিয়ে রাখা হয়েছে, আমরা এখন মেঝেয় বিছানা পাতি।"

ছোট বেলায় সে গুটি খেলতো। মনে পড়ে, অনেকদিন দুপুর বেলায় সঙ্গীর অভাব হ'লে বাবাকে বলতো, "বাবা, আমি তোমার হ'য়ে এক হাত খেলব, আবার নিজের হ'য়ে খেলব, তুমি কিন্তু ঘুমুতে পাবে না, তাকিয়ে থাকতে হবে। না না, কাগজ পড়তে পাবে না, তাহলেই আড়ি হবে।"

সন্ত্রস্ত হ'য়ে কাগজ সরিয়ে রেখে তাঁকে মেয়ের খেলা দেখতে হোত।

সে যখন প্রথম ভাগ ছেড়ে দ্বিতীয় ভাগ ধরলে, তখন বাবাকে একমনে দ্বিতীয় ভাগ শুনতে হয়েছে। শোন শোন বাবা, "আতপে তাপিত ধরা, তৃষ্ণায় আকুল, সরোবরে মরে মীন, তরুরাজি ফলহীন"—মীন কাকে বলে বাবা? আরো বড় হ'য়ে জাপানী ফানুষ যেদিন সে পড়েছিল, উরশিমার করুণ পরিণাম পড়ে চোখ দিয়ে তার জল পড়েছিল। সেদিন বাবাকেও বারে বারে উরশিমার দুঃখে সহানুভূতি জানাতে হয়েছে। আহা পৌঁছুতে পারলে না সে পরীর দেশে একটুর জন্যে। বানচাল্ হ'য়ে গেল তার নৌকো। তোরঙ্গটা কেন সে খুলে ফেললে বাবা? সাদা ফেনার মুকুট-পরা ঢেউয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে পরীদের রাণী, হাত বাড়িয়ে ডাকছে, এস এস আর একটু এস, কিন্তু হায়, উরশিমার আর শক্তি নেই, জরায় আচ্ছন্ন তার দেহ, মৃত্যু এসে পড়লো, পরীদের দেশে ফিরে যাওয়া আর হোল না।

তার কাছে তিনি চিরকালই অসহায়, ছেলেমানুষ। সব দুঃখ আঘাত থেকে বাঁচানো চাই তাকে। কেমন যেন কোথা থেকে একটা জোর আসে মনে, সাহস হয়। আমার ওপর তাঁর নির্ভর, তাঁকে অন্ততঃ ত্যাগ করতে পারি নে।

জ্যাঠাইমা বিজুকে বিদায় দিতে গিয়ে বিশেষ কিছুই না ব'লে এবারে শুধু একটু কাঁদলেন। কষ্ট হোল বিজুর, বুঝল, অশ্রুটা দুঃখের। বাণীদির বিয়ে হ'য়ে গেছে আজ কতকাল। তার পর থেকে জ্যাঠাইমার সে পেটের মেয়ের মতই বেড়ে উঠেছে। সেই মেয়েকে চাকরী করতে হবে, এবং সংসারের প্রয়োজনে না ক'রে উপায় নেই, এই নিরুপায় দুঃখে এবার তার সহস্র কথার ভাণ্ডার যেন ফুরিয়ে এসেছে। তার সোনার বিজুর এতটা বয়েস অবধি বিয়ে হোল না, এই দুঃখই রাখবার জায়গা নেই। তবু যা হোক, নিজের পড়ার সখ নিয়ে আছে কতকটা সান্ত্বনা।...

কিন্তু রাজগঞ্জে বসে সে চাকরী করবে, আর চাঁপাতলির লোক মোকদ্দমা করতে রাজগঞ্জে গিয়ে দেখে শুনে এসে হাসাহাসি করবে, ভাবলে আর একদণ্ড বাঁচতে ইচ্ছে হয় না তাঁর। অনেক ব'লে কয়ে, অনেক বকুনী দিয়ে তাঁকে একটু ধাতে ফিরিয়ে এনে বিজু অমিয়মামার সঙ্গে রওনা হ'য়ে গেল।

২

এক সোমবারে বাড়ী থেকে ফিরে নিজের ঘরের তালা খুলে ঢুকতে যাবে, এমন সময় ইস্কুলের ঝি একটা চিঠি দিলে তার হাতে। ঘরে ঢুকে, খুলতে গিয়ে সে চম্‌কে উঠল। চিঠিখানা এসেছে তিন দিন আগে। শুধু তাই নয়, কেউ যে খুলেছিল, খামের উপরে সে চিহ্নও স্পষ্ট। এর আগেও দু'একটা চিঠি সম্বন্ধে তার সন্দেহ হয়েছিল, আজ সে নিঃসন্দেহ হোল যে, কেউ তার চিঠিপত্র নাড়াচাড়া করে। কিন্তু কে? তাঁকে নিয়ে পাঁচজন শিক্ষয়িত্রী স্কুলে। সে ও আর একজন স্কুলের কম্পাউণ্ডে দুটি ঘর নিয়ে আলাদা থাকে। তার যিনি সঙ্গী, তিনি সধবা, কিন্তু বহুকাল স্বামীর ঘর করেন না। দুইজন বিধবা টীচার আছেন। তাঁদের আত্মীয়-স্বজন আছে, বাড়ীতে থাকেন। আর একটি তার মতই নূতন এসেছে, বনলতা। সে সেলাই শেখায়। মা ও ভাইদের সঙ্গে স্কুলের খুব কাছে একটা বাড়ী নিয়ে থাকে। এদের একজনকেও বিজুর ভাল লাগে নি। যদিও বনলতা তার সমবয়সী। ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়াশুনো করেছে, পাশ করতে না পেরে ট্রেনিং প'ড়ে এসেছে, সেলাই ভালো জানে। কিন্তু এই মেয়েটির ভাবভঙ্গীতে এমন কিছু আছে যা বিজুর মনে বেসুরো লাগে। সে মন খুলে তার সঙ্গে মিশতে পারে না। পঙ্কজিনী যদিও স্বামীর ঘর করেন না, কিন্তু সিঁদুরের মস্ত টিপ পরেন। চুল-ওঠা চওড়া সিঁথি টক্ টক্ করে। কস্তা পেড়ে তাঁতের শাড়ী পরেন আর স্বামীর নিন্দে করেন। তিনি দেখতে খারাপ ছিলেন ব'লে স্বামী তাঁকে কষ্ট দিতো, শ্বশুর-বাড়ীর সবাই গঞ্জনা দিত। তিনি বড্ড অভিমানী ছিলেন, খোঁটা ও মারধোর সইতে না পেরে পালিয়ে আসেন। তার পর নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। স্বামী আবার বিয়ে ক'রে একরাশ ছেলে-পুলে নিয়ে হিম্‌সিম্ খাচ্ছে। এখন আবার ইনিয়ে-বিনিয়ে তাঁকে চিঠি লেখে সাহায্য চেয়ে। অবিশ্যি তিনি জবাবও দেন না। এতদূর পর্য্যন্ত কাহিনীটি বিজুর সহানুভূতি না জাগিয়ে পারে নি। সে নিজে হ'লেও এই করতো সজোরে সে ঘোষণা করে। কিন্তু জীবনের যে অধ্যায় তিনি চুকিয়ে দিয়ে এসেছেন, বারে বারে তার পুনরাবৃত্তিতে বিস্মৃতপ্রায় বিবাহিত জীবনের দিনকটিকে কাটাচেরা ক'রে লোক-চক্ষুতে অনাবৃত করায় লাভ কি? স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর নিন্দে না ক'রে তিনি জলগ্রহণ করেন না, অথচ এত সিঁদুর আর শাঁখা, লালপেড়ের শাড়ীর কি অর্থ বিজু ভেবে পায় না। কিন্তু শুধু তাই নয়। কুমারী মেয়েদের প্রতি তাঁর বিষম অবজ্ঞা। তাদের কারুরই চরিত্র ভাল নয়। বিশ্বনিন্দুক এই মহিলাটির ওপর বিজু হাড়ে হাড়ে চটা।

বিধবা দু'জনের মধ্যে এক জনের বেশ বয়েস হয়েছে। তার বড় ছেলেই বিজুর বড়। তিনি প্রায় প্রথম থেকে এই ইস্কুলে আছেন। অত্যন্ত ভালমানুষ, নিরীহ, বাতে এদানীং শরীর ফুলে উঠেছে, নড়াচড়া করতে হাঁপ ধরে। তবু পেটের দায়ে কাজ করতে হয়। বিজু লক্ষ্য করেছে, তিনি পড়াতে পারেন না মোটেই, নিজের বিদ্যেও খুবই সামান্য। কিন্তু এতদিন ধ'রে এখানে আছেন, অকেজো হ'লেও তাঁকে সরানো সম্ভব নয়। অন্য জন মাঝ বয়সী খুব আঁট শরীর। বাল-বিধবা। তিনি ভাসুরের সংসারে থাকেন। এমনিতে মন্দ নয়, কিন্তু কেমন একটা খোসামুদে, মনযোগান ভাব সব সময়ে, বিজুর বিরক্ত বোধ হয়।

বনলতা অতি গরীব। বড় ভাই কিছুই করে না। সে নাকি বি-এ পাশ ক'রে দেশের কাজ করবার জন্যে চাকরী পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে। টাকার অভাবে পড়াও আর হয় নি। বনলতার কাছে তার বিদ্যে-বুদ্ধির খুব তারিফ শোনা যায়। ছোট ভাই চুণী ইস্কুলে পড়ে, কিন্তু পড়ার চেয়ে খেলাধুলো, ডানপিটেমিতেই মন বেশী। বাপ নেই, বিধবা মা প্রায়ই রোগে ভোগেন। মেয়ের ওপরেই সংসারের নির্ভর।

প্রথমে বেশ আগ্রহ নিয়ে বিজু এই মেয়েটির সঙ্গে

মিশতে চেয়েছিল, কিন্তু আগ্রহ স্থায়ী হয় নি। ভাই, বোন, মা সবাই কেমন যেন একটু। তাদের ধরণটা বিজুর পরিচিত নয়।

অমিয়মামার স্ত্রী অনেক বছর পরে বাপের বাড়ী গিয়েছেন। কয়েক মাস থেকে আসবেন। বিজু মাঝে মাঝে মামা-বাড়ী গিয়ে খুব খানিকটা হুল্লোড় ক'রে আসে, ভাইদের সঙ্গে মিশে মনটা একটু ছাড়া পায়।

চিঠি শেষ ক'রে অনেকক্ষণ খোলা জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল বিজু। একটা এঁদো পুকুর। সুরেশ পালিতের বুড়ী মা চুপড়ি হাতে শাক ধুতে এসেছে। দুটো হাঁস সাঁতার কাটছে। পুকুরের এক পাড়ে একটু রোদে এক লোম-ওঠা কুকুর গোল হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। পুবের বড় সড়কে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে এক মোটর-বাস্ চলে গেল।

ফুলুবাবু লিখেছেন, বাবার অসুখ সারলে একটুও দেরী না ক'রে বিজু যেন কলকাতা চ'লে যায়। একটি দিনও এখন নষ্ট করবার নয়। যদি তার টাকার দরকার হয়, জানালে তিনি পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তার এখানে বসে বৃথা দিন কাটানো অনুচিত। যে ক'দিন নেহাৎ বাধ্য হ'য়ে থাকতে হবে, সে যেন অপব্যয় না করে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত থাকলে সুযোগের অভাব হয় না কোন স্থানেই। আর একটি ছোট খবর শেষ দিকে আছে, হেমন্তবাবুর ছ'মাস জেল হয়েছে পিকেটিং-এর দরুণ।

সারাদিন বিজুর মনটা বিরক্ত হ'য়ে রইল। পড়ানোতে মন বসে না। গোলমাল করছিল ব'লে মেয়েদের ধমকাল। চিঠিতে কি খবর আছে সে-সব না ভেবে কেবলই ভাবতে লাগলো, কি ক'রে চিঠি-চোরকে ধরা যায়। আর ধরলে কি শাস্তি দেওয়া যায়। সবাইকে সন্দেহ হ'তে লাগলো, পঙ্কজিনী, বড়-মা, বনলতা, সুনীতি-দি, এমন কি লালুর মা ঝিকে পর্য্যন্ত।

স্কুল শেষ হবার আগে বনলতা এসে খুব হেসে আত্মীয়তা দেখিয়ে বলল, "বিজয়াদি, (যদিও বয়সে সে বিজুর বড় বই ছোট নয়, তবু দিদি বলে ডাকে) আসুন না আমাদের ওখানে। মা বারে বারে বলে দিয়েছেন আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে। চলুন গরীবের বাড়ীতে চা খেয়ে আসবেন, মোটে তো এক দিন গিয়েছেন এত দিনে।"

তার গায়ে-পড়া ভাব, ন্যাকা ন্যাকা কথা, একটুও ভাল লাগে না বিজুর। তার যেতে ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বনলতা ছাড়বার পাত্রী নয়, নিয়ে গিয়ে ছাড়ল।

দেড়খানা ঘর আর রান্নার একটা একচালা। চার পাশে বাড়ী, চার দিকে কলরব। এক পাশের বাড়ীতে হারমোনিয়াম বাজছে, অন্য পাশে গ্রামোফোন। কে একটি মেয়ে গান শিখছে, একটা গানই বারে বারে বাজাচ্ছে। না পাড়া-গাঁ, না শহর এ রকম ধরণের একটা জায়গায় নানা লোকের এত কাছাকাছি থাকা কেমন যেন পীড়া দেয়। কলকাতার জনতা যেন নদীর স্রোত। এখানকার মত পরস্পরের হাঁড়ির খবর-নিয়ে কাদা ঘুলিয়ে-তোলা ডোবার জল নয়। রবিবারের জন্যে তাই বিজুর মন ব্যাকুল হয়ে থাকে। চাঁপাতলিতে অন্ততঃ আকাশ আছে, মাঠ আছে, সুপুরি-নারকেলের বন আছে, চোখ ছাড়া পায় সেখানে।

দেড়খানা ঘরের আধখানায় বনলতার দাদা অবিনাশ থাকে। বড় ঘরখানায় বাড়ীর চাল-ডালের টিন, তরকারীর ঝুড়ি, বাক্স-তোরঙ্গ, টেবিল এবং চেয়ার, বই, খাতা, শাড়ী, সার্ট, পাউডারের কৌটা, চুলের কাঁটা, ওষুধের শিশি, সব কিছু জিনিষপত্র অগোছাল ভাবে জমে রয়েছে। তাদের ওপর কারুর যেন কিছুমাত্র যত্ন নেই। অবিশ্যি বনলতাকে সংসারের সব দেখতে শুনতে হয়। আবার মা বারোমাস শয্যাগত, তার হয়তো সময় নেই, কিন্তু বিজুর মন তবু বোঝে না। সে ভাবে, বনলতা একেবারে নিরেট।

বনলতার মা বিজুকে ডাকলেন। সে কাছে গিয়ে দাঁড়াইতেই তিনি দু-হাতে তাকে জড়িয়ে প্রায় বুকে টেনে নিচ্ছিলেন, বিজু তাড়াতাড়ি সামলে একটু সরে পাশে বসলো। তার হাতে হাত বুলাতে বুলাতে কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম ক'রে তিনি বললেন, "টুনীকে রোজ বলি তোমায় ধরে আনতে। মা-মরা মেয়ে, বাপও কাছে নেই, একলাটি থাকে, কেন রোজ আস না মা, বল তো? আমাদের পর ভাবো বুঝি!"

বিজু সঙ্কুচিত হয়ে বলল, "না, তা কেন হবে?"

"তবে কথা দাও, রোজ আসবে। রোগে ভুগে

ভুগে সারা হয়ে গেলাম, মরণ তো নেই। মানুষের মুখ না দেখে বাঁচিনে। আমার আবার সুন্দর মুখ দেখতে ভারী ভালো লাগে। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখি, দেখে দেখে চোখ আর ফেরাতে পারি নে।"

বিজু মুখ নীচু ক'রে হাসি চাপল। যাক্, তার সৌন্দর্য্যের এক জন সমঝদার পাওয়া গিয়েছে এত দিনে। এর পরে ভদ্রমহিলা না জানি আরো কি ব'লে বসেন।

এমন সময় অবিনাশ ঘরে ঢুকেই যেন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে থমকে দাঁড়াল। ফের বেরিয়ে যাবে, এমন সময় চিঁ চিঁ গলায় তার মা বললেন, "পালাচ্ছিস কেন অবি, এ তো বিজয়া, টুনীর কত বড় বন্ধু; ঘরের মেয়ের মত, ওকে আর লজ্জা করে না।"

বিজুর যে কোন লজ্জা থাকতে পারে তা তাঁর ভাবে মনেই হোল না। অবিশ্যি বিজুর এমন কিছু লজ্জা করছিল না। সে চুপ ক'রে রইল। অবিনাশ সহাস্যে নমস্কার করে একেবারে সামনে এসে বসে পড়লো। "হ্যাঁ, খুব শুনি আপনাদের কথা। টুনী তো বিজয়াদি বলতে অজ্ঞান। আমি ওকে কত খেপাই!"

এমন সময় মুখ-হাত ধুয়ে সাবানের বাক্স হাতে বনলতা ঢুকলো ঘরে। "কি দাদা, কি বললে, তুমি খেপাও? কে কাকে খেপায়, খুব জানা আছে। বিজয়াদির নামে কে অজ্ঞান, তা আর নাই বললাম।"

চুল বাঁধবার ফিতে চিরুণী ও পাউডারের কৌটো নিয়ে সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

অবিনাশ মাথা নীচু ক'রে এমন ভাবে লজ্জা পেল যে, হঠাৎ বিজুর বিষম হাসি পেয়ে গেল। এই ঘরের সাজ-সজ্জা, মানুষগুলির চেহারা কথাবার্ত্তা সব এমন হাস্যকর ঠেকলো তার কাছে যে, তার ভয় হোল হাসির ভূত না তাকে এখন চেপে বসে। নিজের রোগ তো অজানা নেই।

বিছানার দুর্গন্ধ, তার ওপর ক্রমাগত হাতের ওপর খরখরে শক্ত হাতের ঘষায় বিজুর অসহ্য হ'য়ে উঠলো, সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আমি এখন যাবো।"

"না, সে কি হয়? চা খেয়ে যেতে হবে।" তিন জনে আর্ত্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

নিরুপায় হ'য়ে বিজুকে আবার বসতে হোল। এবং যত-ক্ষণে বনলতা চা ও লুচি তৈরী করলে ততক্ষণ অবিনাশ ও তার মায়ের অজস্র প্রশ্নের জবাব দিয়ে ও কথায় যোগ দিয়ে মান রক্ষা করতে হোল। পাশের বাড়ীর মেয়ে তখনও গ্রামোফোন বাজিয়ে চলেছে, "দেখি নূতনের স্বপন।" রান্নাঘর থেকে লুচি ভাজার গন্ধ ও ছ্যাঁক্-ছ্যাঁক্ শব্দ আসছে। সেই শব্দের যেন শেষ নেই। লুচি ভাজা কি কোন যুগে ফুরোবে, বিজু এ ঘর থেকে বেরিয়ে ফের আকাশ দেখবে কোন দিন? তার তো মনে হচ্ছে যেন আজন্ম এই ঘরে ব'সে ব'সে শুনছে "যেমন লক্ষ্মী স্বভাবে, তেমনি লক্ষ্মীমন্ত চেহারা, যে ঘরে যাবে…" …"সন্ধ্যের পর একা যাবেন কি ক'রে, আমি না হয় পৌঁছে দেবো….।"

রাত্রি। তার বিছানার পাশে জানালা খোলা। কিন্তু আকাশের একটি ফালি মাত্র চোখে পড়ে। একটা বড় তারা জলজল করছে। রাস্তা দিয়ে রিক্‌শওয়ালা ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে, অনেক দূরে মোটরের হর্ণও মাঝে মাঝে শোনা যায়।

হেমন্ত কি করছে এখন? জেলে তার ঘরটি কল্পনা করতে ইচ্ছে করে। কি ভাবছে সে এখন ঘুমের আগে?

বিমল কোথায় এখন, আর তার সেই বন্ধু কুলমণি? তারা কি হারিয়ে গেল, রাত্রি গ্রাস করলো কি তাদের?

গৌর ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে গলিভারের কাহিনীর শেষটুকু শোনান হয় নি। কি স্বপ্ন দেখছে সে?

নীলমণি কত বড় হোল? এখনও ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে, আবার দুলে দুলে হেসে পা ছুঁড়ে অস্থির হয়?

মঞ্জু, শুনে এসেছিল তার ছেলে হবে। খুব সুন্দর হ'য়ে উঠেছে নিশ্চয়ই। আয়ত সুন্দর চোখ দুটিতে মাতৃ-ত্বের গাম্ভীর্য্য নেমেছে। দৃষ্টিতে আর শুধু স্বপ্ন নয়, সম্ভাবনা।

ক্রমশঃ

উৎসবের মর্মকথা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

স্মরণাতীত কাল থেকেই বাঙালী জাতি পূজা-পার্বণ উপলক্ষে উৎসব ক'রে আস্‌ছে। বাঙালীর পূজা-পার্বণের অভাব নেই; বারো মাসে তেরো পার্বণ তার লেগেই আছে। কিন্তু উৎসব শুধু বাঙালীরাই করে না। সে-ই পুরাকাল থেকে কোনো-না-কোনো আকারে সমগ্র মানব-সংসারেই উৎসবের অনুষ্ঠান হ'য়ে আস্‌ছে।

মানব-সংসারে যে-কেও কোনো বড়ো কাজ করেছেন, এমন-কি জনপদাতঙ্ক কোনো বড়ো জানোয়ার-ও মেরেছেন নিজকে বিপন্ন ক'রে—তাঁর মৃত্যুর পরে মানুষ মনে করেছে, তিনি হাওয়াকে, জোয়ার ভাঁটাকে চালাচ্ছেন। এই রকম ক'রে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে মানুষের মগজে ঈশ্বরের আইডিয়াটা হঠাৎ ঢুকে' পড়ল, এই রকম অনেকের অনুমান। এতে ঘাবড়াবার হেতু অল্প। আপেল ফল পড়ার যে-দৃশ্য, তার থেকেই ত ন্যুটনের মগজের মধ্যে......। যে-কেও বড়ো কাজ করেন, তারই মধ্যে আমরা সবাই আমাদের সে-ই পরিচয়টিকে হয়ত দেখতে পাই যা বড়ো, যা অহং কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত, তাই লঘু-ভার। আর্য্যদের যে-শাখা পশ্চিমে গেছেন, তাঁদের উৎসবের দিনগুলি তাই ঐতিহাসিক দিন।

যে-শাখা পূবে আছেন, তাঁদের পাঁজি অপর রকমে তৈরি। সূর্যকে কি রাহুতে ঢাক্‌ল?—তবে সেইটেই খোল্‌ বাজিয়ে মাতামাতি করার সময়। এখানে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিই ঐতিহাসিক ঘটনার জায়গা জুড়ে আছে।

কিন্তু, আমাদের উৎসব কি শুধুই প্রাকৃতিক ঘটনা বা পূজা-পরবের দিনে? আমাদের জীবনে কি নেহাৎ অতর্কিতে এমন কোন আনন্দঘন মুহূর্ত বা দিন ক্ষণ আসে না, যখন মনে করতে পারি জীবনে মহা-উৎসবক্ষণ সমুপস্থিত, যখন "পরিচিত জগতের উপর হইতে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া যায়, জগৎকে তার নিজের স্বরূপে দেখি?" যখন মনে হয়,

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি?"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সংসারের সমস্ত আনাগোনার উপরে সত্যকে যেদিন প্রত্যক্ষ দেখবে সে-ই দিনই উৎসব।" এটা ত জানা কথা, উৎসবের দিনে আমরা ভেদাভেদ, দ্বেষ-বিদ্বেষ ভুলে যাই—জগৎকে নূতন চোখে দেখি, মন খুসি হয়ে ওঠে, নিজের ভার লাঘব হয়।

উৎসবের দিন হচ্ছে সে-ই দিন যে-দিন আমাদের রোজকার অন্তর্নিবাসিনী সত্তাটি দু'দণ্ডের জন্যে ক্ষণ-প্রভায় সমুজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে,—সে-ই দিন যে-দিন আমাদের আর একটি পরিচয়ের সঙ্গে আমাদের ক্ষণিকের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে—আমাদের যে-অলক্ষ্য পরিচয়টি আকাশের মেঘের ন্যায় স্বৈরগতি, বর্জিত ভার বা অন্তত লঘুভার এবং প্রতি দিবসেব স্থূল হ'তে একেবারে নির্মুক্ত।

এ ভূখণ্ডে মানুষের চিত্ত কৃষ্ণপক্ষ-শুক্লপক্ষ, দক্ষিণায়ণ-উত্তরায়ণের সঙ্গে তাল রেখে রেখে যেন আপনার পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চলেছে কোন্‌ সে "মহামরণ পারের" অভিমুখে দিবসে-রজনীতে, দণ্ডে-দণ্ডে, প্রহরে প্রহরে। যেখানে যা-কিছু আছে, তার সকলের ও প্রত্যেকের সঙ্গে, কোথায়-যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আমাদের রয়েছে যেটা পরম রহস্যে গুণ্ঠিত, যেটা হয়ত আত্মিক, সেটাকেই দেখি প্রকৃতির কোনো ওলটপালটে, বা এমন কোনো ঘটনায় যা আমার চক্ষুকে বা সমস্ত সত্তাকে হঠাৎ অসাড়তা থেকে জাগিয়ে তোলে। যা প্রতি মুহূর্তে জানার কথা ছিল, কিন্তু সচরাচরতার জড়িমায়-জড়িমায় খেয়ালের মধ্যেই আনি নি, তার সঙ্গে সে-দিন দেখা হয় যে-দিন আমার উৎসবের দিন। দেখব বলেই ও-দিনকে আলাদা ক'রে রাখি নি কি? হয় ত আমি রাখি নি বা: গ্রহ-তারা, চন্দ্র-সূর্য, সমুদ্রেরা জোট পাকিয়ে আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছেন। সে-ই দিনের উষা থেকে রাত্রির

গভীরতা অবধি ত আর মুদি নই, জিরগু, গুড়িয়েও সে দিন ভাত ভাব না—সেদিন আমার মক্কেল নেই—সেদিন চোগা-চাপকানে আর শ্যামলা ঝোলানো রইল।

উৎসবের দিন সে-ই দিন যে-দিন নানা লোকের মাঝে থেকেও, অথবা বরং নানা লোকের সঙ্গে যুক্ত হয়েই আমাদের আত্মা সে-ই একক যাত্রায় রওনা হয় যার সম্বন্ধে হুইট্‌ম্যান এই ধরণের কথা বলেছিলেন: It is a journey everybody must take for himself—এমন একটা আকস্মিক চলে-যাওয়া যার 'কেন' নেই এবং যেটা প্রতিনিধি পাঠিয়ে সারা যেত না।

লক্ষ্য করে থাকবেন, বায়োস্কোপের হলে যে দিন লোক কম থাকে সেদিন খুব ভাল প্লে জমে না—যদিচ আঁধারে বসেই দেখা হয় এবং পার্শ্বোপবিষ্ট ও উপবিষ্টাদের মুখমণ্ডল দেখার আকর্ষণ তাই অবিদ্যমান! অনেকে মিলে গলা মিলিয়ে গান, বা গান না এলে জয়ধ্বনি করলেও যে একটা আনন্দ লাভ হয় যা বিশেষ একটা রকমের। তার অভিজ্ঞতাও অনেকের হয়ে থাকবে। ঐ যে অনেকে মিলে একটা পর্দার উপর চোখ নিবিষ্ট ক'রে (theatre আর theoryর মূল ধাতু এক, যেটার মানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা) একই কাহিনী অনুধাবন করা হয়, তাতে যেন আমাদের কোন একটা বন্ধন-মুক্তি ঘটে যেটা ব্যক্তি বিশেষের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। "যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে মুক্ত কর হে বন্ধ"—"ওগো সবার ওগো আমার বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার"—এটাকে কি রামানুজী মতের কোঠায় ফেলা চলে? তা চলুক, কি না চলুক, আর সকলের মাঝখানে নিজেকে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেলে তবেই যে বিশ্ব প্রকৃতির মর্মবাসী সুন্দরকে আপন চিত্তের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বিহরণশীল দেখতে পাওয়া সম্ভব: দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ তাই মনে করেন। উৎসবেরও ঐ হুবহু মর্মকথা।

আমাদের ফীজিওলজি তথা ভারাকর্ষণ থেকে যেহেতু আমাদের ত্রাণ নেই, তাই, বরাবরই আমরা এই রকমের বা অম্লায়বিকতাকে স্নায়ু দিয়ে এসেছি, এমন কি তাদেরকে পুষ্কর সংবর্ত এই সকল নামেও ডেকেছি। আমাদের যে পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব থেকে আমরা চাই রেহাই, সেই ব্যক্তিক পরিচ্ছিন্নতা দিয়েছি তাকে যার চৌহদ্দি নিমেষে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। না, উৎসবের এই হচ্ছে function? উৎসবের দিন কি সেই দিন যে-দিন আমরা

"প্রিয়েরে দেবতা করি, দেবতারে প্রিয়" (ঠাকুর),

বলি,

"স্বর্গ আজি মর্ত্যে নামুক
মর্ত্য উঠুক স্বর্গে" (ডি, এল, রায়)

এবং দেখি—"Spiritualisation of the senses and sensualisation of the spirit" (এলিস)? মর‍্যাল আইডিয়াজ্-এ যেমন আমাদের ত্রাণ Anthropology থেকে, সুন্দরের উৎসবে কি আমাদের তেমনি ত্রাণ আমাদের সমগ্র দৈহিকতা থেকে?—ঐহিকতা থেকে যেমন ত্রাণ ধর্মে?

দিনের শেষে

শ্রীসুধাংশু রায়

তাকিয়ে যারা যায় গো দূরের পানে
তাদের দেব কিসের অজুহাত,—
সাঁঝের পাখী বলবে যখন গানে
সেরে নে কাজ এল যে ঐ রাত?

চর্ম্ম-শিল্প

শ্রীসুধাময় কারকুন, বি-এস্‌সি

রোমীয় ও গ্রীক, এমন কি সুপ্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার যুগেও যে উত্তম চর্ম্ম-শিল্প প্রচলিত ছিল, তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীনতার দিক দিয়া প্রস্তর-শিল্পের পরেই চর্ম্ম-শিল্পের স্থান। প্রাগৈতিহাসিক যুগের উলঙ্গ মানব যে খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল তাহা লজ্জা নিবারণের জন্য নয়—লজ্জাবোধ জাগ্রত হওয়ার বহু আগেই, বিশেষতঃ পৃথিবীর শীত-প্রধান অংশে তাহাকে প্রচণ্ড শীতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায়ের সন্ধান করিতে হইয়াছিল বলিয়া। মানুষ আগে ফলমূল খাইত, না কাঁচা মাংস খাইত তাহা অবশ্য বিতর্কের বিষয়, কিন্তু মাংস খাওয়ার পর নিহত পশুর চামড়াগুলিকে পরিধেয় হিসাবে ও জন্তু-জানোয়ারের সহিত যুদ্ধে আচ্ছাদন (ঢাল) হিসাবে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা মানুষের মনে জাগিয়াছিল। রেড্ ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি অসভ্য জাতিগুলিকে আজ পর্য্যন্তও পোষাক হিসাবে চামড়া পরিধান করিতে দেখা যায়। চামড়াগুলিকে রৌদ্রে শুকাইয়া এবং পরবর্ত্তী যুগে আগুনে বা ধোঁয়ায় সেঁকিয়া ও পশুর চর্ব্বি মাখাইয়া অধিকতর টেঁকসই করিবার উপায় মানুষ ধীরে ধীরে আবিষ্কার করিয়াছিল। চর্ম্ম-শিল্পের উৎপত্তির ইহাই ইতিহাস।

প্রস্তর-মুদ্রার ন্যায় চর্ম্ম-মুদ্রারও এক সময়ে প্রচলন ছিল। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্ম-শিল্প বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের শিল্প-জগতে একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। শুধু মর্য্যাদার দিক দিয়া নয়, প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়াও জুতা পরিচ্ছদের অচ্ছেদ্য অংশ; এবং চামড়ার সুটকেশ, ব্যাগ ও অন্যান্য মনোরম দ্রব্যাদির আভিজাত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

চর্ম্ম-শিল্পের একটা মস্ত বড় সুবিধা এই যে, চামড়াটা পাওয়া যায় উপরি হিসাবে; চামড়ার জন্য নয়, মাংস বা দুধের জন্যই লোকে পশুপালন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ; পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জুতার ব্যবহার বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় জুতার ব্যবহার বাড়িলে উহার প্রভাব চর্ম্ম-শিল্পের প্রসারকে অনিবার্য্য করিয়া তুলিবে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যতগুলি চর্ম্ম-সংস্কারাগার (ট্যানারী) আছে, দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলির সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য; কাজেই প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার পাকা চামড়া এদেশে আমদানি করা হইয়া থাকে, আবার কোটি কোটি টাকার কাঁচা চামড়া বিদেশে চলিয়া যায়। নিম্নে যে-হিসাব দেওয়া হইল তাহা হইতেই এই আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

	আমদানি	রপ্তানি
১৯৩৬-৩৭	৫১,১০,০১৯ টাকা	৬,৭৪,১০,২০৪ টাকা
১৯৩৭-৩৮	৬৬,১৫,৭৪৩ "	৬,৪৫,৩৫,৭৮৯ "
১৯৩৮-৩৯	৫৩,১৯,৮৮৮ "	৭,৭৫,৫৪,৭০৮ "

১৯৩৮—৩৯ সনে এই যে ৫৩ লক্ষ টাকার পাকা চামড়া আমাদের দেশে আমদানি করা হইল এবং ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইল, ইহার লভ্যাংশ প্রায় সমস্তই মোসেল এণ্ড কোং প্রমুখ ইউরোপীয় ও অবাঙ্গালী কোম্পানীগুলির সিন্দুকে উঠিয়াছে। ৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকার ভারতীয় কাঁচা চামড়া বিদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক ট্যানারী থাকিলে এই সকল চামড়া ভারতেই সংস্কৃত হইত এবং সংস্কারের মজুরি হিসাবে ভারতবর্ষ হয়তঃ কমপক্ষেও ৭।৮ কোটি টাকা পাইত।

চর্ম্ম-সংস্কারে যে-সব রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়

তাহার জন্যও বিদেশীর হাতে প্রতি বৎসর বিপুল অর্থ তুলিয়া না দিলে চলে না। অথচ আমাদের দেশের রসায়নাগারসমূহ অনেক দিন আগেই শিশু-অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে। ভেজিটেবিল টেনীন যে-সমস্ত গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয় সেগুলি সমস্তই ভারতের মাটীতে ভারতীয় আবহাওয়ায় উৎপন্ন হইতে পারে। এই গাছের কতকগুলি ভারতের বন হইতে আহরণ করা হইলেও দক্ষিণ-আফ্রিকার বনজ সম্পদ এখনও প্রতিবৎসর আমাদের দেশ হইতে একটা মোটা টাকা টানিয়া লয়। নিম্নে একটা হিসাব তুলিয়া দিলাম।

প্রতিবৎসর আমদানি

সোডিয়াম বাইক্রোমেট	৪	লক্ষ	টাকা
,, সালফাইড	৩	,,	,,
পলিশ, ক্রোমলিকার ও অন্যান্য	১৪	,,	,,
দক্ষিণ-আফ্রিকার গাছের ছাল	২২	,,	,,
সিঙ্গাপুরী ,, ,,	১০	,,	,,
আলকাতরা হইতে প্রস্তুত রং	৩৫০	,,	,,

আশার কথা এই যে, আমাদের দেশের রাসায়নিক কারখানাগুলি এবং বন-বিভাগ এখন আর এই বিষয়ে ততটা উদাসীন নহে।

কিন্তু চর্ম্ম-শিল্প যাহাদের জাতিগত ব্যবসায় বলিয়া ধরা হয় বাঙ্গালার সেই ঋষি-সম্প্রদায়ের কথা ভাবিতে গেলে নিরাশ হইতে হয়। বাঙ্গালীর অতি অল্প কয়েকটি ট্যানারী ছাড়া অন্যগুলির পক্ষে নানা কারণে বিদেশীয়দের ট্যানারীর সহিত প্রতিযোগিতায় সচ্ছলতার সহিত টিকিয়া থাকা অত্যন্ত কঠিন। জুতা ও অন্যান্য চামড়ার জিনিষ তৈরিতে চীনা কারিকরদের দক্ষতা ও ক্ষিপ্রকারিতা অতুলনীয় বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে একটা ধারণা আছে এবং হয়ত তাহা সত্যই। সাধারণের এই বিশ্বাসটুকু অর্জ্জন করিতে হইলে বাঙ্গালী কারিকরদের দীর্ঘদিনের সাধনার প্রয়োজন। আর বাঙ্গালী মুচিই বা কোথায়? সহরগুলির ত কথাই নাই, সুদূর পল্লী অঞ্চলেও জুতা মেরামতের জন্য অবাঙ্গালী মুচিদের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিছুদিন আগে ময়মনসিংহ জেলার কোন একটি ঋষি-পল্লীতে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেখানে প্রায় ১ হাজার ঘর ঋষি বাস করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মাত্র কয়েক ঘর ছাড়া সকলেই চামড়ার ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছে। ষ্টেশনের কুলী, বাজার-কুলী ও দিন-মজুর হিসাবে তাহারা জীবিকার্জ্জন করে। আর যাহারা ব্যবসায়টা বজায় রাখিয়াছে তাহারাও শুধু কাঁচা চামড়া যোগাড় করা এবং লবণ মাখানর পর শুকাইয়া (কিউরিং প্রসেস্) বিক্রী করা ছাড়া আর কিছুই জানে না। তাহাদের করুণ ও দুঃসহ আর্থিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন অন্য কোন হিন্দু বা মুসলমান পল্লী আজও আমি দেখি নাই। জানি না, হয়তঃ বাঙ্গালার অধিকাংশ ঋষি-পল্লীরই এই অবস্থা। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চর্ম্ম-সংস্কার, জুতা, সুটকেস তৈরী ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া না হইলে ঋষিদের এই দুরবস্থার প্রতিকার হওয়া অসম্ভব।

রুটী

(গল্প)

শ্রীগৌরমোহন পাল

চলেছি, চলার আর বিরাম নেই, পেরিকোপ সহর পেরিয়ে ক্ষিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে। উদরের পশুটা হিংস্র নেকড়ের মত মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। এক টুকরো রুটী—সামান্য এক টুকরো, তার জন্যে সারাদিন কি ঘোরাঘুরিই না করে ছিলাম, তবু কিছুই মিললো না। চুরি করবো, তারও ছাই কি উপায় আছে? বরাত। সবাই বরাত।

ক্ষিদের জ্বালায় শেষে রাগটা গিয়ে পড়লো দুনিয়ার ওপর; আমাদের দুরবস্থার জন্য বিশ্বজগতকে করলুম দায়ী। ভাবতে ভাবতে নিজেদের জীবনে এল ধিক্কার; মনে হ'ল পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই—তা' ত' বটেই; তা' না হ'লে পেরিকোপ ছেড়ে আসবারই বা কি প্রয়োজন?

সৌন্দর্য্য! প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য! সবই বুঝলুম বন্ধু, কিন্তু পেটে অতৃপ্ত ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে সৌন্দর্য্য কি উপভোগ করা যায়? অগত্যা স্থির হ'ল, এ সহরে আর থাকা হবে না। কিন্তু যাবই বা কোথায়? তাও ত' অনিশ্চিত। না, না, যেতেই হবে আমাদের। সকলে বললে, কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়া যাক্। কেউ তর্ক করলো না, কোনো আলোচনা হ'ল না। যেমন এসেছিলাম, তেমনিই নিঃস্ব, পেরিকোপ ছেড়ে অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

আমরা বলতে তিন জন। নীপার নদীর ধারে খোরশান্ পান্থশালায় মদ গিলতে গিলতে পরস্পরের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। সকলেরই সমান দশা, একই পথের যাত্রী। বর্ত্তমানটাই আমাদের সর্ব্বস্ব, এ ছাড়া আর যা' কিছু তা ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট।

অতীত জীবনের একটা ইতিহাস সকলেরই আছে বটে, তবে কেউ কারুরটা বিশ্বাস করি না। বলতে হয় বলেই বলি।

আমাদের মধ্যে যিনি বয়সে সব চেয়ে বড়, তিনি এক সময়ে পোল্যাণ্ডে সামরিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চোস্ত জার্ম্মান ভাষায় কথা বলতে পারেন—তারপর তিনি কত কি করলেন, কারখানায় হাতুড়ী পেটা থেকে থিয়েটারে সিন্ টানা, শেষ পর্য্যন্ত জেলের কয়েদী।

কনিষ্ঠটি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। কিন্তু তার মর্কট-মার্কা চেহারা দেখে আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। উপরন্তু মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ত' দূরের কথা, সামান্য কোন একটা পাঠশালারও পথ মাড়িয়েছে কি না সন্দেহ। যাই হোক মেনে নিলুম, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ও মেধাবী ছাত্র।

ছাত্র না হ'য়ে চোর হ'লেই বা কি আসে যায়—সে যে আমাদেরই সগোত্র, সমব্যথার ব্যথী; ক্ষুধার্ত্ত, অনাহার-ক্লিষ্ট; আমাদেরই মত পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা ব্যাহত।

তৃতীয় ব্যক্তি আমিই স্বয়ং। নিজের সম্বন্ধে কিছু বলা ধৃষ্টতারই পরিচায়ক। তবু বলে রাখি, আমি চিরকালই সৃষ্টি ছাড়া—কেমন এক দাম্ভিক প্রকৃতির। আর এই লক্ষ্মীছাড়া অহং-বোধটাই আমার সকল কর্ম্মের মূল প্রেরণা।

আমাদের তিন হতভাগ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইটুকু দিলেই যথেষ্ট।

এখন আমরা পেরিকোপ সহর পেরিয়ে রাশিয়ার বিশাল বিস্তৃত প্রান্তর—ষ্টেপসের সম্মুখীন। আমি ও সৈনিক বন্ধুটি পাশাপাশি চলেছি, ছাত্রটি আমাদের পিছনে। তার কাঁধে একটা ছেঁড়া কোট, পরনে শতছিন্ন তালিমারা ইজের, পায়ে একজোড়া জুতোর সোল দড়ি দিয়ে বাঁধা।

সৈনিকের গায়ে একটা লাল কামিজ, তার ওপর গরম

ওয়েষ্ট কোট, মাথায় তোবড়ান টুপীটা ডান দিকে ঈষৎ হেলান। ছাত্রটির পায়ে তবু দু'পাটি চামড়া আছে—আমাদের দু'জনের তা'ও নাই।

জনহীন ষ্টেপসের পথ ধরে আমরা তিনটি প্রাণী হেঁটে চলেছি—যতদূর দেখা যায় কেবল মাইলের পর মাইল শুকনো ঘাসের জঙ্গল। কোথায়ও প্রাণের সাড়া নেই। মাথার ওপরে নির্মেঘ নীল আকাশ; প্রখর সূর্য্যকিরণে গা যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে। তবুও হাঁটছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, এ এক অদ্ভুত নিরুদ্দেশ যাত্রা—এ চলার বোধ হয় কোনদিন শেষ হবে না।

চলতে চলতে সৈনিক বন্ধুটি হঠাৎ একটা গান ধরে বস্‌লো,—'প্রভু,তোমা' লাগি বহি এ জীবন।'

গানটা কানে বেসুরো ঠেক্‌লেও প্রতিবাদ করতে মন সরল না, যদি একটু অবসাদ কাটে, মন্দ কি? তা ছাড়া শুনতে পাই সে যখন সামরিক বিভাগে চাকরী করতো তার বেশ সাধা গলা ছিল, বহুদিন অনভ্যাসের ফলে খারাপ হয়ে গেছে।

গানটা সবে জমে উঠেছে, এমন সময়ে ছাত্রটি ভাঙা গলায় পরিত্রাহি চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঐযে, ঐযে পাহাড় দেখা যাচ্ছে।'

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সৈনিক উত্তর দিলে, 'দূর, মুখ্যু, ওগুলো পাহাড় না তোমার মুণ্ডু। মেঘ। দূর থেকে দেখলে ওরকম ভুলই হয়।'

তারপর আমার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলো, 'আচ্ছা ভাই, এখন মেঘের রংটা ঠিক জেলীর মত নয় কি?'

জেলী! জেলী! শোনামাত্র শুষ্ক জিহ্বার ডগায় ফুটে উঠলো লোভনীয় স্বাদ, পেটের মধ্যে কে যেন হুল ফোটাতে লাগল, ভুলে-যাওয়া ব্যথাটা আবার যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। নিজেকে কোন মতে সংযত করে ছাত্রটির দিকে ফিরে দেখি, জেলীর নাম শুনে সেও লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'উঃ, আর পারি না।' বিরক্তিভরে সৈনিক বন্ধুটি আবার কিছু পরে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'এতটা পথ এলুম, একটা লোকেরও কি ছাই মুখ দেখতে পাওয়া গেল? তার আবার খাবার! খাবার খাবে? আঙুল চোষ সব।'

ছাত্রটি প্রতিবাদের সুরে জানালো, 'আগেই বলেছিলুম ত'; তা' তোমরা আমার কথা শুনলে কই? আর একটু চেষ্টা ক'রে পেরিকোপ ছাড়লেই ভাল হোত।'

'খুব হয়েছে, থামো, বেশী বিদ্যে ফলাতে হবে না—চেষ্টাটা কোথায় করতে শুনি?'

সৈনিকের উষ্মাভরা মুখের পানে তাকিয়ে ছাত্র বেচারা এতটুকু হয়ে গেল—কোনো জবাব না দিয়ে মুখ বুঁজে হাঁটতে লাগল।

তার পর আজেবাজে কথায় ফাঁকে কখন যে বেলা পড়ে এসেছে কেউ টের পায় নি। চেয়ে দেখি সূর্য্য পশ্চিম আকাশে অনেকটা হেলে পড়েছে। অস্তমিত সূর্য্যের রাঙা আলোয় ষ্টেপস-ভূমির সে এক বিচিত্র রূপ! পবনের মৃদু হিল্লোল, দিগন্ত-বিস্তৃত জনহীন প্রান্তর—সবটা মিলিয়ে প্রকৃতির সে রহস্যজনক মূর্ত্তি মনে এক অদ্ভুত প্রেরণার সাড়া জাগায়। দুঃখের বিষয় সূর্য্যাস্তের এই বর্ণ-সুষমা দেখে কে? আমাদের কথা স্বতন্ত্র—অনাহার-ক্লিষ্ট, অবসন্নচিত্তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কোনো রঙ ধরাতে পারলো না। একে দু'দিন অনাহার, তায় পথশ্রম; শরীর আর চলতে চায় না।

এলিয়ে পড়লে কিন্তু চলবে না, খাবার যে আমাদের চাই। ক্ষিদেয় পেটে আগুন জ্বলছে, চোখে মাঝে মাঝে অন্ধকার দেখছি তবু আমরা চলেছি; কি জানি কিসের আশায়—প্রাণপণ হেঁটেই চলেছি।

পথের মাঝে সৈনিক বন্ধুটি হঠাৎ একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলো—'কাট-কুটো, গাছের ডালপালা যে যা পার কুড়িয়ে নাও; এইখানেই রাত্রি যাপন করা ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া রাত যত বেশী হবে তত ঠাণ্ডা পড়বে।'

সত্যিই ত' রাত্তিরে কোথায় থাকবো একবারও ভাবি নি। যে যা পারলুম সংগ্রহ করতে লাগলুম। মাটীতে হেঁট হয়ে যখন ডালপালা কুড়োচ্ছিলাম, ইচ্ছে করছিল উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি। যদি ঠাণ্ডা মাটীর ছোঁয়া লেগে পেটের জ্বালা কিছু কমে—তাতেও যদি কিছু না হয়

খানিকটা মাটীর তাল চিবোতে পারলে বোধ হয় কিছু কমবে।

দেখতে দেখতে গোধূলীকে গ্রাস ক'রে এল গাঢ় অন্ধকার। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, নিথর,; নিবিড় অন্ধকারে ষ্টেপসের সে এক ভয়াল থমথমে ভাব—বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তবু কি করি!—নিরুপায় হয়ে পথ চলতে লাগলুম।

কিছুদূর না যেতেই ছাত্রটি হঠাৎ থেমে গিয়ে স্বগত বলে উঠল, 'ওখানে একটা লোক শুয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে না?'

তার কথায় আমরা চমকে উঠলুম, লোকটা বলে কি? এই জনশূন্য স্থানে লোক এল কোথা থেকে! সৈনিক একটু ঠেস দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'চোখে সর্ষে ফুল দেখছ নাকি হে পণ্ডিত?'

'চলো না, ঐখানটা একবার দেখেই আসি।' ছাত্রটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্ধকারে হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা স্থানে নিবদ্ধ হলো।

'ওর কাছে হয়ত কিছু খাবারও থাকতে পারে।'

খাবার! কথাটা শোনামাত্র পেটের নাড়ীশুদ্ধ ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠলো। রাস্তা ছেড়ে যে যেদিকে পারি, ছুটলুম। কিন্তু মানুষ কই? অন্ধকারে একটা ঢিবি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। পাঁচ-ছ' হাত দূরে আছি এমন সময় ঢিবির ভেতর থেকে কে যেন আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে বললে, 'এক পা এগিয়েছ কি গুলী করবো।'

সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল পটভূমির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ ক'রে একটা ফাঁকা আওয়াজ হলো।

বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে যে যেখানে ছিলুম দাঁড়িয়ে পড়লুম, যেন খুবই ভয় পেয়েছি। আসলে এতক্ষণ বাদে একটা লোকের সাক্ষাৎ পাওয়াতে আমরা মনে মনে খুসী। খাবার ত' পরের কথা। কি হয়, সকলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছি, লোকটাও দেখি আর নড়েচড়ে না। বন্দুক উঁচিয়ে ঠায় আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

সৈনিক বন্ধুটি আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে আবেদনের সুরে বললে, 'দাদা, যা ভাবছেন তা' নয়। ক্ষুধার্ত্ত আমরা, দু'দিন অনাহারে মৃতপ্রায়। আপনার কাছে খাবার থাকলে দয়া ক'রে কিছু দেবেন কি?'

তাকে নিরুত্তর দেখে বন্ধুবর স্বর আর এক পর্দ্দা চড়িয়ে দিলে, 'শুনতে পাচ্ছেন কি মশায়? খাবার থাকে ত কিছু দিন না? নির্ভয়ে থাকুন, আপনার কাছেও যাব না।'

এবার লোকটি মুখ খুললে, 'আচ্ছা, দেখছি।'

আশ্বস্ত হয়ে আমাদের সকলের মুখে এত কষ্টের ভেতরও হাসি বেরুলো। কিসের বা কার জন্য এই হাসি বলা কঠিন। লোকটাকে দেখবার জন্য নয়, কারণ অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে না।

যাই হোক্ আমাদের সৈনিক বন্ধুটি লোকটিকে আবার আপ্যায়িত করতে সুরু করলো—'দাদা, আমাদের কি ভেবেছিলেন বলুন ত? ডাকাত না চোর? তা আপনারই বা কি দোষ, এ রকম অবস্থায় আপনার অনুমান খুবই স্বাভাবিক। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরাও আপনার মত পথচারী পথিক। রাশিয়া থেকে কিউবান যাচ্ছিলুম, পথে ডাকাতের হাতে সর্ব্বস্ব খুইয়েছি, সেই জন্যই আমাদের এই অবস্থা।'

এতক্ষণে লোকটির বোধ হয় মন ভিজলো। চুপ করতে ইঙ্গিত করে সে তার ঝোলাঝুলির ভেতর থেকে এক তাল মাটীর মতন কি একটা জিনিষ ছুঁড়ে দিলে। ছাত্রটিই সবার আগে সেটাকে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে নিল।

'দাঁড়াও, এই নাও, আরও কিছু দিলুম। এই বলে লোকটি আবার খানিকটা ছুঁড়ে মারল।

টুকরোগুলো একত্র করতে দাঁড়াল, প্রায় সের দুয়েক লাল আটার বাসি রুটী—কাল ঝুলের মতন। বাসি হোক্ আর যাই হোক্; মালে ত ভারী আছে। নিমেষের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেল। তার পরের যে ব্যাপার, সে আরও অদ্ভুত!

ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বাসি রুটী চিবোচ্ছি; এমন সময়ে সৈনিক বন্ধুটি বলে উঠলো, 'এতে ত কিছু হবে না ভাই, লোকটার কাছে আরও কিছু খাবার আছে কি না সন্ধান নেওয়া দরকার।'

তার কথা শেষ হতে না হতে ছাত্র বন্ধু উত্তর দিলে, 'ঠিক বলেছ ভায়া, রুটীর সঙ্গে মাংসের গন্ধ আসছে, ব্যাটার

কাছে নিশ্চয় মাংস আছে। কিন্তু মুস্কিল! বন্দুক রয়েছে যে, তা না হ'লে একবার দেখে নিতুম।'

ছাত্র বন্ধুর কথায় আমাদের চমক ভাঙল। মুখের গ্রাস ছেড়ে তখন ওর কাছ থেকে মাংস বাগাবার ফন্দি আঁটতে লাগলুম। কি করা যায়—সকলে এক সঙ্গে আক্রমণ করব, না এক একজন পেছন দিক দিয়ে এগুবো? বসে বসে ভাবছি, হঠাৎ দেখা গেল সৈনিক বন্ধুটি তীর বেগে দৌড়চ্ছে আর তার পেছন পেছন শিক্ষিত বেকার ছাত্রটি ছুটছে। আমিও অগত্যা তাদের পিছু নিলুম। লোকটা বেগতিক দেখে আমাদের লক্ষ্য ক'রে গুলী ছুঁড়ল।

—'ওঃ খুব বাঁচা গেছে!'—বলেই সৈনিক ঠিক বাঘের মতন লোকটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পৌঁছে গেলুম; ছাত্রটি নিল তার পুঁটলিটা টান মেরে, আমি সেই ফাঁকে লোকটার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিলুম।

লোকটির অবস্থা তখন অত্যন্ত সঙ্গীণ। মাটীর ওপর মুখ গুঁজড়ে সে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো। সৈনিক বোধ হয় তাকে গলা টিপে শেষ ক'রে দিত, যদি না ছাত্রের বিকট উল্লাস,—'পেয়েছি ভাই, খাবার পাওয়া গেছে—' তার সব রাগ জল ক'রে দিত।

তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে দিয়ে সে বললে, 'কই, দেখি, দেখি?'

ছাত্র খুলে দেখাল, মাংস, রুটী, প্যাষ্ট্রি, বহু রকম খাবারে লোকটার ঝোলা ঠাসা।

রাগে চোখ লাল করে সৈনিক বললে, 'মরো, এবার শুকিয়ে মরো।' সঙ্গে সঙ্গে মুখের মধ্যে কয়েকটা প্যাষ্ট্রি সে পুরে দিলে।

আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত বন্দুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। তখনও একটা ঘরে গুলী ভর্ত্তি। ভাগ্যিস্! এটাও ছোঁড়ে নি।

তার পর আমরা সকলে খেতে আরম্ভ করলুম, লোকটা পাশেই মরার মতন পড়েছিল। আছে, থাক্, আমরা সেদিকে নজরই দিলুম না। হঠাৎ এক অদ্ভুত আওয়াজ করে সে বলে উঠলো, 'দাদারা, এত যে কাণ্ড, কেবল কি খাবারের জন্য?'

তার কথায় আমি রীতিমতো চমকে উঠলুম, ছাত্র বেচারার ত বিষম লেগে যায়! কিন্তু সৈনিক একেবারে নির্ব্বিকার। গাল-ভর্ত্তি রুটী চিবোতে চিবোতে গম্ভীর চালে উত্তর দিলে, 'খুব হয়েছে, আর নেকামীর কাজ নেই? আমরা কি তোমার ছাল ছাড়িয়ে নিতে এসেছি?'

ছাত্র তার কাশি সামলাতে সামলাতে বললে, 'দাঁড়াও আগে ডান হাতের ব্যাপার সেরে নিই। তোমার ব্যবস্থা করছি।'

ছাত্রের হুমকীতে লোকটার সে কি কান্না! থামতেই চায় না। সে কান্না দেখলে পাষাণেরও মন গলে যায়। কান্নার সুরে যেন রক্ত মাখানো। কাঁদতে কাঁদতে লোকটা বলে যেতে লাগলো:

—'সত্যি বলছি ভাই, আমি ভুল করেছিলাম। ভয়ের চোটে মাথার ঠিক ছিল না...আমার অবস্থাটা শুনুন। এথেন্স থেকে স্মোলেনস্ক্ গ্রামে যাচ্ছিলুম, পথে ভয়ানক জ্বর...রোজই সন্ধ্যাবেলা এরকম হয়...জ্বরের জন্যই ভাই, এথেন্স ছাড়তে হ'ল...তা, না হ'লে অমন চলতি ব্যবসাটা উঠিয়ে দিয়ে আসি। দাদা, আমাদের জাত-ব্যবসা ছুতোরের কাজ...দেশে বৌ, ছেলেমেয়ে সবই আছে... আজ চারবছর ঘরছাড়া...ভাবলুম, মরি ত' দেশে গিয়ে মরবো।...বলবো কি দাদা, আমার মত হতভাগা কে আছে বলুন? খাও যতো পার পেট ভরে খাও।'

বলতে বলতে লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

'থামো বাবা, এত কথা না বললেও চলতো।' মুখ ভেংচিয়ে ছাত্র বলে উঠলো।

কান্নার বেগ এতে না থেমে আরও বেড়ে চললো— 'বিশ্বাস করছেন না? সত্যি বলছি, যা বললুম তাতে মিথ্যার লেশও নেই।'

সৈনিক বন্ধু অতিষ্ঠ হয়ে বলে ফেললে, 'না, কাঁহাতক আর প্যান্‌প্যানানি সহ্য হয়। চলো একটু তফাতে গিয়ে আগুন জ্বালাই।'

আগুন জ্বালিয়ে সকলে চার পাশে ঘিরে বসলুম। ঘুট-ঘুটে অন্ধকারের ভেতর আমাদের এই স্বল্পালোকিত স্থানটি ঠিক আলেয়ার মতন। দিগন্তগ্রাসী ষ্টেপসের উৎকট ঠাণ্ডায় অগ্ন্যুত্তাপের উষ্ণ আমেজ মন্দ লাগছিল না। ঘুমে

চোখ জড়িয়ে আসছে এমন সময়ে লোকটি আমাদের সঙ্গসুখলাভের জন্য অতি কষ্টে হামা দিয়ে এগোতে লাগলো। এবার অগ্নিশিখার আলোয় লোকটার চেহারার স্পষ্ট পরিচয় পেলুম।

দেখতে বেশ লম্বা। গায়ে রক্ত নেই বললেই হয়। চোখ দুটো গর্ত্তে ঢুকে গেছে—বীভৎস, বিবর্ণ মুখের চেহারা। দেখলেই মায়া হয়। জামা-কাপড় আলখাল্লার মত ঢিলে—এইটুক আসতেই বেচারা থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপছিল।

সে একটু সুস্থ হবার পর সৈনিক বন্ধু জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা তোমার পয়সা থাকতে এত কিপ্‌টে কেন? এ রকম অসুস্থ দেহ নিয়ে হাঁটা-পথে বেরিয়েছ?'

'কি আর বলবো দাদা, ডাক্তারেরা বললেন, সমুদ্রের লোনা জলে জ্বর বাড়বে বই কমবে না। ক্রিমিয়ার জল-হাওয়া ভাল, তাই পায়ে হেঁটে যেতে বললেন। এখন ঠেলা সামলান দায়!. এই বিদেশে মরে পড়ে থাকলেও কেউ জানবে না, হয়ত বন্য পশুর দল মৃতদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে...'

বলতে বলতে নিঃস্ব বালকের মত সে কাঁদতে লাগল। কিন্তু কান্না আমাদের কি করবে! কতই ত কেঁদেছি! কেঁদে কেঁদে চোখের জল শুকিয়ে গেছে কতকাল।

ক্রমশঃ রাত গভীর হয়ে এল। যে যার শুয়ে পড়লাম। সৈনিক বন্ধু আমার পাশে আর ছুতোর ও ছাত্রটি একটু দূরে। শুয়ে আছি, ঘুম কিছুতেই আসতে চায় না। রাজ্যের যত বাজে চিন্তা মাথায় ভিড় করে এল, কত কথা অস্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল; কত দিনের কত ভুলে-যাওয়া স্মৃতির অসংখ্য টুক্‌রো! তার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নাই।

হঠাৎ চোখ মেলে দেখি সৈনিক আমার হাত ধরে টান্‌ছে। ধড়মড় করে উঠে পড়লুম। ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নি, তারই ভেতর সৈনিককে দেখে মনে হ'ল সে খুব গম্ভীর। ব্যাপার কি! কিছু হয় নি ত? এক বার ভাল ক'রে নিজের আশপাশ দেখে নিলুম।

'হয়েছে, এখন চলো দিকি'।—সৈনিক হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগলো।

'কি হয়েছে বল না ভাই?'—সৈনিকের দিকে চেয়ে দেখি ছুতোরের চোখ কপালে উঠে গেছে। 'ও কি! হাঁ করে রয়েছে কেন? কি সর্ব্বনাশ! মরলো নাকি?—'

'তোমারও গলা টিপে ধরলে তুমিও মরে যাবে—এখন চলো, কথা পরে হবে।'

সৈনিক আবার হাত ধরে টানলে।

'কই? ছাত্র গেল কোথায়? এঁ্যা? তবে সেই কি?—'

রাগে গস্‌গস্‌ করতে করতে সৈনিক বলতে লাগল, 'তবে কে? হয় তুমি, নয় আমি। চমৎকার ব্যাপার! আগে যদি জানতুম ত এক ঘুষিতে শেষ করে দিতুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না কচু!...'

'কি হে, এখন তোমার বন্ধুর কাণ্ডখানা বুঝলে! চলো চলো আর দেরী নয়—শ্রীঘর।'

'আচ্ছা ভাই, ভাবতে পার, কি পাষণ্ড! কলি, ঘোর কলি!'

ষ্টেপসের পথ বেয়ে আবার চলেছি। সূর্য্যের আলোয় সারা পৃথিবী ঝলমল করছে। উপরে নীল আকাশ গম্বুজের মত দূরে, বহু দূরে বনভূমির তটরেখায় এসে মিশে গেছে। চতুর্দ্দিকে পূর্ণ শান্তি। কেবল আমাদের দুটি অশান্ত হৃদয় চলেচে, ভগবান্ জানেন কোথা এর শেষ।

কিছু দূর যেতেই, আবার সেই পেটের জ্বালা, সৈনিক বলে উঠলো, 'ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে ভাই। কি করি বল ত?'

'কি করবে বল? জগৎজোড়া আদিম সমস্যা ত এই। আর তারই পরপারে প্রেমের রাজ্য।'*

* ম্যাক্‌সিম গোর্কির 'ইন্ দি ষ্টেপ্‌স' অবলম্বনে।

রাঁচির পথে

(ভ্রমণ)

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২রা নভেম্বর বালক-বালিকা, মহিলা, যুবক, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ প্রভৃতি সকল স্তরের লোক লইয়া দ্বিপ্রহরের বনভোজনের রসদ সহ একখান রিজার্ভ করা মোটর বাস বেলা ৯টার সময় হিনু হইতে রাঁচি সহরের উপর দিয়া উৎসুক জনতার মধ্য দিয়া বিখ্যাত হুড্রু ও জোন্‌হা জলপ্রপাত উদ্দেশ্যে রওনা হইল। রাঁচির চার ধারেই বহু দর্শনীয় স্থান। কিন্তু সাধারণের নিকট হুড্রু জলপ্রপাত এবং কাঁকের পাগলা গারদই বিশেষভাবে পরিচিত। বিখ্যাত দশম ঘাগ্ (ঘাগ্ অর্থে জলপ্রপাত), রাজরোপ্যার ছিন্নমস্তার মন্দির (ভারতের একমাত্র ছিন্নমস্তার মন্দির), জগন্নাথপুরের জগন্নাথদেবের মন্দির, নাগফিনির নাগবংশীয় পুরাতন হিন্দু রাজবংশের কীর্ত্তি, এমন কি রাঁচি সহরের বুকের উপর ছোটনাগপুরের নৃতত্ত্ববিদ্ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের বহু আয়াসে সংগৃহীত ঐতিহাসিক মিউজিয়ম যাহা ওঁরাও, মুণ্ডা, কোল প্রভৃতি ঐ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদিগের সভ্যতা এবং বর্ব্বরতার প্রাচীন নিদর্শনে পরিপূর্ণ তাহার খোঁজই বা কয়জন রাখেন। যাঁহারা রাঁচি গিয়াছেন অথচ শরৎবাবুর বিখ্যাত মিউজিয়ম দেখেন নাই তাঁহাদের রাঁচি ভ্রমণ অঙ্গহীনই হইয়াছে।

বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পাটনায় বিহারের এবং কটকে উড়িষ্যার সরকারী দপ্তরখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং রাঁচির হিনুতেও বিহার লাটের বহু আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই জন্য এই হিনু অঞ্চলটাই রাঁচির মধ্যে "ব্রাহ্মণ পাড়া"র গৌরব ও সম্মান লাভ করিতেছে। আধুনিক স্থপতিদিগের পরিকল্পনা অনুযায়ী সহরের বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। পরিষ্কার পীচ-ঢালা উঁচু-নীচু রাস্তার দুই ধারে কোথাও সুদৃশ্য দীর্ঘ বকাইন বৃক্ষশ্রেণী প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুবাস বিলাইয়া পথিকের আনন্দ বর্দ্ধন করে, আবার কোথাও অদ্ভুত আকারের বাওবাব বৃক্ষশ্রেণী (বোতল' গাছ—যেন বড় বড় বোতলের মুখে মোটা মোটা পাতাসমেত ডাল ভরিয়া রাখা হইয়াছে) তাহার অসংখ্য দোদুল্যমান অদ্ভুত আকারের ফলে পথিকের বিস্ময় উৎপাদন করে। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হঠাৎ ঐ ফলগুলির দিকে চাহিলে মনে করিবেন, যেন অসংখ্য ধেড়ে ইঁদুরের ল্যাজে দড়ি বাঁধিয়া গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

রাঁচি হইতে যে রাস্তা পুরুলিয়া গিয়াছে উহা ধরিয়া দশ মাইল গেলে বাঁ-দিকে একটি রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া আট মাইল গেলেই হুড্রু পৌছান যায়। এই পথে আদিম অধিবাসীদিগের ঘর-সংসার ও গৃহস্থালীর ধারা এবং আমাদের চা-বাগানের উপযুক্ত শিক্ষিত করিবার কার্য্যে রত ছোট ছোট আদর্শ চা-বাগানে কুলী-দিগের কর্ম্মব্যস্ততা দেখিতে দেখিতে বেলা ১১টার সময় হুড্রু আসিয়া পৌছান গেল। ভাবিয়াছিলাম, শুধু আমরাই বুঝি সে-দিনের দর্শকদল। কিন্তু পৌছিয়া দেখিলাম, আমাদের আগেও বহু দর্শক আসিয়াছেন, পরেও দলে দলে আসিতে লাগিলেন। এ অঞ্চলের লোক ছুটির দিনে আমাদের দেশের মত অকারণে খোস-গল্প করিয়া সকালবেলাটা কাটাইয়া অবেলায় আহারের পর নিদ্রা দিয়া দিন কাটায় না। Excursion এবং outing spirit প্রায় সকলের মধ্যেই পুরা মাত্রায় আছে। সকলের মুখেই সজীবতার লক্ষণ সুস্পষ্ট বিদ্যমান। পূর্ব্বে হুড্রুর এক মাইল দক্ষিণে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদীটি যেন সতর্ক প্রহরীর ন্যায় প্রাকৃতিক শান্তিভঙ্গকারী যানবাহনাদি তাহার তোরণদ্বারে রাখিয়া দিত। সেখান হইতে যাত্রীদিগকে ঐ এক মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইত। কিন্তু বিহারের লাটবাহাদুরের হুড্রু আগমনের পর হইতে সে

"বিশ ক্রোশ" ব্যবধান আর নাই—একটি ক্ষুদ্র সেতু দ্বারা যেন "মন্দির প্রবেশ" বিল পাস হইয়া গিয়াছে এবং হুড্রু ও উৎকণ্ঠিত দর্শকদিগকে ত্বরায় আপন বক্ষে টানিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছে। দীর্ঘ অদর্শনজনিত মাতৃস্নেহের নিবিড় আকর্ষণে যাত্রীদলও মোটর থামিতে না থামিতে ছুটিয়া মাতৃক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই আগ্রহাতিশয্যে সেই বিপদসঙ্কুল পিচ্ছিল প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া দ্রুত সেই বিশাল জলরাশির উৎপত্তিস্থল অভিমুখে ছুটিল। অনাদিকাল হইতে অবিরাম গতিতে গম্ভীর ঝঙ্কার তুলিয়া সুউচ্চ মালভূমি হইতে সুবিস্তৃত জলরাশি পতনের ফলে স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্যও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইয়াছে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া সদলবলে নীচে যে স্থানে জলরাশি পতিত হইতেছে সেখানে নামা গেল। নীচে জলধারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। অর্দ্ধেকটায় রৌদ্রকিরণ পড়িয়াছে আর বাকী অর্দ্ধেকটায় একখণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের ছায়া পড়িয়াছে—কিছুক্ষণ সে-দিকে তাকাইয়া থাকিলে মনে হয়, যেন উপর হইতে খুব বড় মুচি করিয়া সোনা ও রূপা গলাইয়া দুইটি বিভিন্ন ধারায় ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। জলরাশির অবিরাম পতনের ফলে নীচে একটি হ্রদের মত হইয়াছে। তাহাতে কেহ স্নান করিতে, কেহ সাঁতার কাটিতে এবং কেহ বা শুধু জল ছিটাইতে লাগিলেন। আমরা মোটর হইতে নামিলে সঙ্গে যে ঠাকুর চাকর গিয়াছিল তাহারা জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া চায়ের জল গরম করিল। তাহাদের আহ্বানে আমরা উপরে উঠিয়া আসিয়া রুটি মাখম সহযোগে চা পান করিলাম। এই বার আমাদের জোন্‌হা যাওয়ার পালা, সেখানে ভোজনের ব্যবস্থা হইবে।

হুড্রুর কিনারে একটি বাঁধান চত্বর আছে। শুনিলাম, কোনও প্রকৃতি-রসিক নিরালায় অফুরন্ত পার্ব্বত্য শোভা উপভোগ করিবার জন্য উহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক সেখান হইতে চাঁদনী রাতে নৈশ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সময় একটি সাপের মাথার মণির সন্ধান পান। ঐ রত্ন আহরণ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিলে কিছুকাল সেই ভুজঙ্গের গতিপথে পাহারায় নিযুক্ত রহিলেন। অবশেষে এক অন্ধকার রাত্রে অসাবধানতা বশতঃ পদস্খলন হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। নিত্য নূতন তথ্য সংগ্রহের দুর্নিবার আগ্রহ ও অনমনীয় দৃঢ়তা পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে যেরূপ প্রবল ভবে বিদ্যমান তাহার বিচিত্র ভয়াবহ বিবরণ হিমালয় পর্ব্বত অভিযান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কার এবং আফ্রিকার দুরধিগম্য শ্বাপদ ও বিষধর সর্পসঙ্কুল অরণ্যানীর রহস্য উদ্ঘাটনের বিবরণ, এমন কি দ্রুতগামী হাউই চড়িয়া পৃথিবী হইতে মঙ্গলগ্রহে পৌছাইয়া তাহার রহস্য ভেদ করিবার পরিকল্পনা আমরা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিই। ঐ ধরণের বিবরণ পাঠ করিবার কালে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, কিন্তু উহা কোন দিনই আমাদিগকে adventurous কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিল না। বড় হইবার তীব্র দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে গতানুগতিক জীবনযাত্রাকে অতিক্রম করা যায় না। বড়দিনের বন্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে দুই জন ডেলী-প্যাসেঞ্জারের কথোপকথন হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রার ধারা কত নীচে গিয়া পৌছাইয়াছে। "সুস্থ শরীর ব্যস্ত করিও না" ঐটিই আমরা জীবনের motto করিয়াছি।

প্রথম যাত্রী—ছুটিতে কোথাও যাচ্ছ নাকি হে ?

২য় যাত্রী—সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইবার জন্য রেলের পাসের দরখাস্ত করিয়াছি।

দ্বিতীয় যাত্রীটি সেতুবন্ধ রামেশ্বর অর্থাৎ রাবণ রাজার রাজ্যের দ্বার অবধি যাইতেছেন শুনিয়া প্রথম যাত্রীটি মুখের ভাব এমন করিলেন যেন তিনি সেখানে পৌছান মাত্রই লঙ্কার রাক্ষসদিগের উদরে স্থান লাভ করিবেন। চিন্তিত মুখে বলিয়া উঠিলেন, "বল কি হে ? এই শীতকালে আফিসের উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর যদি বা ২।৫ দিন ছুটি পাইলে তাহা এমন করিয়া পথে পথে কাটাইবে ? আমি বলি কি জান ? যখন সকালের ফার্ষ্ট ট্রেণ ধরিবার তাড়া নাই, তখন বেলা না উঠা পর্য্যন্ত লেপ চাপা দিয়া শুইয়া থাক, পরে মুখ হাত ধুইয়া রৌদ্রে পিঠ করিয়া ২।১ কাপ চা খাও, গরম গরম বেগুনী খাও আর

অম্বুরী তামাক ভাল করিয়া সাজিয়া আরাম করিয়া খাও। বাজারের বেলা হইলে বেশ গুছাইয়া কপি, কড়াই শুটী, গলদা চিংড়ী বাজার কর। দুপুরে পরিপাটি আহার অন্তে লেপ মুড়ী দিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রা দিয়া বৈকালে খোসগল্প এবং রাত্রে থিয়েটারের রিহার্সাল সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া খেজুর রসের পায়েস, রসবড়া, সরুচাকলী প্রভৃতি নূতন নূতন জিনিসে রসনার তৃপ্তি কর আর নিশ্চিন্তে ঘুমাও। বাস্—"

আমাদের জীবনযাত্রার ধরণ সকলেরই ঐ "আরাম করা।"

বেলা ১২টার সময় হুড্রু হইতে জোন্‌হা যাত্রা করিলাম। পুনরায় রাঁচি-পুরুলিয়ার রাস্তা ধরিয়া পুরুলিয়া অভিমুখে ৮।১০ মাইল যাইয়া রাস্তার ধারে ডান দিকের কাষ্ঠফলকের নির্দ্দেশ মত ২।৩ মাইল যাইয়া জোন্‌হার দ্বারে পৌঁছিলাম। সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য এবং তৈজসপত্র লইয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া রান্নার আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। আমরা জলপ্রপাত অভিমুখে রওনা হইলাম। নীচে নামিতে নামিতে ক্লান্ত হইয়া মধ্যপথে একটি ছায়া-শীতল প্রস্তরখণ্ডের উপর বিশ্রাম করিবার সময় দেখিলাম সেখানেও মহারাজ অশোকের "কীর্ত্তি ছাইয়া" ভগবান্ বুদ্ধের শ্বেত প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজিত এবং তাঁহার পাদদেশে খোদিত নীতিবাক্য সেই অরণ্যবাসীদিগকেও সৎপথে চালিত করিতেছে। আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ভগবান্ তথাগতের পাদমূলে উপস্থিত। সহসা মস্তকের উপর আঙ্গুর ফল সদৃশ এক প্রকার বন্য ফলের সন্ধান মিলিয়া গেল এবং অজানা ফল বিষাক্ত কিনা বিচার-বিবেচনা না করিয়াই নির্ব্বিকারচিত্তে পরম তৃপ্তির সহিত উদরস্থ করা গেল। কিছুক্ষণ এই ছায়াশীতল নিভৃত স্থানে বিশ্রাম করিবার পর নীচে নামিয়া হ্রদে এবং জলপ্রপাতের স্বচ্ছধারায় সকলে আনন্দ করিয়া স্নান করিলাম।

এখানেও হুড্রুর ন্যায় বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, বিহারী প্রভৃতি বহু দর্শকের সমাগম হইয়াছে। আহার্য্য প্রস্তুত হইলে আমরা উপরে উঠিয়া পুরুষ এবং মহিলা সকলে একত্রে আহারে বসিয়া গেলাম। স্ত্রীলোকেরা অচেনা পুরুষদিগের সাম্‌না-সাম্‌নি আহার করিতে লজ্জা বোধ করিতে পারেন বিবেচনা করিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী পঙ্‌ক্তিতে আহারের ব্যবস্থা হইল,—যাকে বলে নলচে আড়াল দেওয়া। ক্রমে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। তাঁহার গতিপথের শেষ রক্তিমচ্ছটা নিস্তব্ধ গম্ভীর বনভূমিতে বিচ্ছুরিত হওয়ায় সেই বিশাল অরণ্যানীর দৃশ্যপট সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করিল। এ দৃশ্য যিনি উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তিনিই ধন্য।

এই বার আমাদের পুনরায় রাঁচি ফিরিবার পালা। সকলে মোটরে উঠিলে বাসখানি নির্জ্জন নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া রাঁচি অভিমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিল। অবেলায় গুরুভোজন এবং পথশ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন যাত্রীদল নীরবে কিছুক্ষণ পথ অতিক্রম করিবার পর যুবক, বালক ও বালিকারা কণ্ঠ মিলাইয়া কোরাস গান আরম্ভ করিল, "কৃষ্ণ নামে তরে যায়, কালী নামে তরে যায়।" পথের দু'ধারের নিস্তব্ধ বনভূমি হইতে প্রতিধ্বনি আসিতে লাগিল, "কৃষ্ণ নামে তরে যায়, কালী নামে তরে যায়।"

কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুপুরে রাজলক্ষ্মী এল শরতের কাছে। কেদার খেয়ে হাট করতে বেরিয়ে গিয়েছেন—আজ গেঁয়োহাটির হাটবার।

রাজলক্ষ্মী দেখতে বেশ মেয়েটি। নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে, কখনো সহরের মুখ দেখেনি, তবে সহরের কথা অনেক জানে। তার দুই মামাতো ভগ্নিপতি এখানে মাঝে মাঝে আসে। কলকাতায় কাজ করে তারা—সহরের অনেক গল্প সে শুনেচে ওদের মুখে।

রাজলক্ষ্মী বললে—হ্যাঁ শরৎ-দি, প্রভাসবাবু বুঝি কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ী এসেছিল? কি বললে?

—বলবে আর কি, বৈকেলে এসেছিল, সন্দের আগে চলে গেল। গল্পগুজব করলে বসে—চা করে দিলাম। বেশ লোক প্রভাস-দা। আমাদের বলেচে এক দিন কলকাতা নিয়ে যাবে—বাবাকে আর আমাকে।

—কবে শরৎ-দিদি?

—তার কিছু ঠিক আছে? তবে প্রভাস-দা বলেচে যেদিন আমি মনে করবো সেদিনই নিয়ে যাবে।

—রেলে?

—না, মটর গাড়ীতে। এখান থেকে সমস্ত পথ মটরে যাবে—কেমন মজা হবে, কি বলিস্? তুই চড়েছিস্ কখনো মটর গাড়ীতে?

রাজলক্ষ্মী উদাস নয়নে অন্য দিকে চেয়েছিল। শরৎ-দিদির কথায় তার মনে কত অদ্ভুত ছবি জেগে উঠেচে। আজ বছর দুই আগে তার পিসেমশায় একটি বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন তার জন্যে—ছেলেটি কলকাতায় চাকরী করতো। চল্লিশ টাকা মাইনে। বেড়ে নাকি হোতে পারে একশো টাকা। তাদের পৈতৃক বাড়ী কোন্নগর, চাকুরী উপলক্ষে কলকাতায় আছে অনেক দিন।

সম্বন্ধটি রাজলক্ষ্মীর মনে ধরেছিল। ছেলেটিও দেখতে নাকি ভালই ছিল। কি দেনা-পাওনার গণ্ডগোলে সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল।

মাস দুই ধরে কথাবার্ত্তা চলবার ফলে রাজলক্ষ্মীর মন অনেক বার নানা রঙীন স্বপ্ন বুনে ছিল সেটা ঘিরে। কখনো যে কলকাতা সে দেখেনি এবং হয়তো দেখবেও না কখনো ভবিষ্যতে, সেই কলকাতা সহরের একটা বাড়ীর দোতলার ঘরে খাট টেবিল চেয়ার সাজানো তাদের ঘরকন্না, দালানের এক কোণে ছোট্ট একটি খাঁচায় টিয়া কি ময়না পাখী, মাটি-দেওয়া টিনের টবে তুলসী গাছ, একটা ঘেরাটোপ-মোড়া সেলাইয়ের কলটা টেবিলের এক পাশে—নিস্তব্ধ দুপুরে বসে সে হয়তো কিছু একটা বুনচে কি সেলাই করচে—উনি গিয়েচেন আপিসে—বাসায় শ্বশুর-শাশুড়ী বা ও ধরণের কোনো ঝামেলা নেই—সে আছে একাই—নিজেকে কত মনে মনে সেই কল্পনীয় ঘরকন্নাটিতে ডুবিয়ে দিয়েচে সে, সে ঘরের খুঁটিনাটি কত কি পরিচিত হয়ে উঠেছিল তার মনের মধ্যে—দেখলেই যেন চিনে নিতে পারতো ঘরটা—কিন্তু কোথায় কি হয়ে গেল, সে ঘরে গিয়ে ওঠা তার আর ঘটে উঠলো না।

শরৎ-দিদির কথায় সে অল্পক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, শেষের দিকের প্রশ্নের মানে সে ভাল করে না বুঝে শূন্যদৃষ্টিতে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি বললে শরৎ-দি? মজা?···ও, মজা হবে না আবার? খুব হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এখান থেকে যেখানে বেরুবে সেখানেই ভাল লাগবে। একঘেয়ে দিন যেন আর কাটতে চায় না। অনছি হয়ে উঠছে দিন দিন। দুপুরে যে তোমার এখেনে একটু নিশ্চিন্দি হয়ে বসবো তার উপায় নেই—এতক্ষণ কাকীমা ঘুম থেকে উঠলেন, যদি দেখেন এখনও এঁটো বাসন মাজা হয় নি, রান্নাঘর ধোয়া হয় নি—তবে সন্দে পর্য্যন্ত বকুনি চলবে।

শরৎ হাসিমুখে বললে—তাহোলে তুই ঝগড়া করে এসেচিস্ বাড়ী থেকে ঠিক বললাম। হাঁ কি না বল?

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল।

শরৎ বললে—তাই বুঝলাম এতক্ষণ পরে। নইলে ঠিক দুপুর বেলা তুমি আসবার মেয়েই আর কি! ভাত খেয়ে এসেচিস না আসিস্ নি, সত্যি কথা বল—আমার মাথার দিব্যি—আমার মরা মুখ দেখিস্—

—না তা নয়। তেমন ঝগড়া নয়। ভাত খেয়েচি বৈকি—

—সত্যি বলচিস?

—মিথ্যে কথা বলবো না শরৎ-দি, তুমি যখন অমন দিব্যি দিলে। না, সে খাওয়ার কথা নিয়ে নয়—ঝগড়া নিয়েও নয়, সত্যিই এত একঘেয়ে হয়ে উঠেচে এখানে—ইচ্ছে হয় যেদিকে দু-চোখ যায় ছুটে যাই—

—সত্যি, যা বললি ভাই, আমারও বড় একঘেয়ে লাগে। সেই সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত একই হাঁড়ি হেঁসেল নিয়ে নাড়াচি আর একই দীঘির ঘাটে সতেরো বার দৌড়ুচ্চি, তার পর কেবল নেই আর নেই—

কিন্তু তরুণী রাজলক্ষ্মীর মন যা চায়, যে জন্যে ব্যাকুল—শরৎ তা ঠিক বুঝতে পারে নি। রাজলক্ষ্মীও ঠিক মত বোঝাতে পারে না, তাই নিয়েই তো আজ বাড়ীতে কাকীমার বকুনি খেতে হোল। সে সর্ব্বদা নাকি থাকে অন্যমনস্ক, কি তাকে বলা হয়, নাকি তার কানে যায় না—ইত্যাদি তার বিরুদ্ধে বাড়ীর লোকের অভিযোগ। শরৎও বুঝতে পারে না ওর দুঃখ। ঘরকন্না করে করে শরতের মন বসে গিয়েচে এই সংসারেই, যেমন তাদের বংশের পুরোনো আমলের পাথরের থাম আর ভাঙা মূর্ত্তিগুলো ক্রমশঃ মাটির ওপর চেপে বসতে বসতে ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্চে।

উঠোনের রোদ এই সময় একটু পড়লো। রাজলক্ষ্মী বললে—চলো শরৎ-দি, একটু গিয়ে দীঘির ঘাটে বসি, বেশ ছায়া আছে গাছের—বেশ লাগে।

শরৎ বললে—আমায় তো যেতেই হবে এঁটো বাসন মাজতে। চল্ ওখানে বসে গল্প করিস্—আমার কি হয়েচে জানিস—মুখ বুঁজে থেকে থেকে আরও মারা গেলুম। আচ্ছা, তুই বল্ রাজলক্ষ্মী, ভাল লাগে সকাল থেকে রাত দশটা অবধি? কার সঙ্গে দুটো কথা কই যে! বাবা তো সব সময়েই বাইরে—

—তুমি তো আবার এমন জাগয়ায় থাকো যে গাঁয়ের কেউ যে আসতে পারে না। এত দূর আর এই বনের মধ্যিখানে। জানো শরৎ-দি, গাঁয়ের বৌ-ঝি এদিকে আসতে ভয় পায়, সাধনের বৌ সেদিন বলছিল গড়বাড়ীতে নাকি ভূত আছে—

—সাধনের বৌয়ের মুণ্ডু—দূর।

—তোমার নাকি সয়ে গিয়েচে। তা ছাড়া সে ভূতে তোমায় কিছু বলবে না। তুমি তো এই বংশের মেয়ে—রাজার মেয়ে। আমাদের মত গরীব গুরবো লোকদেরই বিপদ—হি—হি—

—মরবি কিন্তু মার খেয়ে আমার কাছে—

কালো পায়রা দীঘির সান-বাঁধানো ভাঙা ঘাটের নীচু ধাপে বড় বড় গাছের ছায়া এসে পড়েচে পুকুরের জলে আর ঘাটের রানাতে। ঘাটে ছাতিম আর অন্য অন্য গাছের ছায়া। বাঁ-দিকে দূরে উত্তর-দেউল, যদিও এখান থেকে দেখা যায় না—সামনে সেই ইটের ঢিবিটা। প্রভাস যেখান থেকে ইট নিয়ে গিয়েচে গ্রামের স্কুলের জন্যে, সামনে প্রকাণ্ড দীঘিটার নিথর কালো জল—জলের ওপর এখানে-ওখানে পানকলস আর কলমির দাম, কোণের দিকে রাঙা নাললতার পাতা ভাসচে, যদিও এখন ফুল নেই।

শরৎ এ সময় রোজ বসে একাই বাসন মাজে। আজ রাজলক্ষ্মীকে পেয়ে ভারি খুসি হয়েচে সে।

এই ঘাটে বসে শরৎ কত স্বপ্ন দেখেচে—রোজ এই বাসন মাজবার সময়টি একা বসে বসে। নীল আকাশের তলায় ঠিক দুপুরের অলস শুব্ধতাভরা ছাতিম বন, ভাঙা ইটের রাশ আর কালো পায়রা দীঘির নিথর কালো জল—হয় তো কখনো কাক ডাকে কা-কা—কিংবা যেমন আজকাল ঘুঘু সারাদুপুর ধরে ডাকের বিরাম বিশ্রাম দেয় না। কি ভালই যে লাগে!

জীবনের যে একঘেয়েমির কথা রাজলক্ষ্মী বললে—শরৎ তা কখনো হয় তো সে ভাবে বোঝে নি। এই গ্রামে এই

গড়বাড়ীর ইটের ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে জন্মেচে—এর বাইরের অন্য কোন জীবনের সে কল্পনা করতে পারে না। অন্ততঃ করতে পারতো না এতদিন।

কিন্তু কি জানি, সম্প্রতি তার মনে কোথা থেকে বাইরের হাওয়া এসে লেগেচে—কালো দীঘির নিস্তরঙ্গ শান্ত বক্ষ চঞ্চল হয়ে উঠেচে।

প্রথমে এল তাদের অতিথিশালায় সেই বুড়ো বামুন, তার বাবার কাছে যে জেলার সীমানা দেখবার অপূর্ব্ব গল্প করেছিল। যা ছিল স্থাণুবৎ অচল, অনড় সেই নির্ব্বিকার অতি শান্ত অস্তিত্বের মূলে কোথায় যেন সে কি নাড়া দিয়ে গেল। তার এবং তার বাবার।

বামুনজ্যাঠা কত গল্প করতো তার রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে বসে। বাইরের ঘরকন্না, কত সংসারের কথা, কত ধরণের সুখ-দুঃখের কাহিনী। বড় বড় আম কাঁটালের বাগান, যা তাদের গড়ের বাগানের চেয়েও অনেক, অনেক বড়। পঞ্চাশ বিঘের কলমের আমবাগান। কত বড় বাড়ী, তাদের মেয়েদের বৌদের কথা। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, মাঠের মধ্যে বাবলা গাছের সারি, শেওড়াবন, তিত্তিরাঁদের ফল পেকে ফেটে কালো কালো বীচির রাশি ছড়িয়ে আছে। উইয়ের ঢিবির পাশে বনধুতুরার ঝোপ। শরৎ তন্ময় হয়ে শুনতো।···

অন্য এক জীবন, অন্য এক অস্তিত্বের বার্ত্তা বহন করে আনতো এ সব গল্প। আজ সে মেয়ে হয়ে জন্মেচে—তার হাত-পা বাঁধা, কোথাও যাবার উপায় নেই, কিছু দেখবার উপায় নেই—তার ওপর রয়েচেন বাবা, বৃদ্ধ, সদানন্দ বালকের মত সরল, নির্ব্বিকার।

তারপরে এল প্রভাস-দা।

প্রভাস-দা এল আর এক জীবনের বার্ত্তা নিয়ে। সহরের সহস্র বৈচিত্র্য ও জাঁকজমক আছে সে কাহিনীর মধ্যে। মানুষ যেখানে থাকে অত অদ্ভুত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ডুবে—নিত্য নতুন আনন্দের মধ্যে যেখানে দিন কাটে—দেখতে ইচ্ছে হয় শরতের সে দেশ কেমন। খুব বড় একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা শরতের মনে জেগেচে প্রভাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে।

তারপর এই রাজলক্ষ্মী, ষোল বছরের কিশোরী মেয়ে তো মোটে—এরও নাকি একঘেয়ে লাগচে আজকাল গড়-শিবপুরের জীবন। ওর বয়েসে শরৎ শুধু শিবপূজো করেচে বসে বসে দীঘির ঘাটে বোধনের বেলতলায়, অত সে বুঝতোও না, জানতোও না।

কিন্তু আজকালের মেয়েদের মন আলাদা। শরৎ যে কালের মেয়ে, সে কাল কি আছে?

রাজলক্ষ্মী শরতের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠলো—সত্যি শরৎ-দি—

শরৎ মুখ নীচু করে বাসন মাজছিল, মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সুরে বললে—কি রে?

—আচ্ছা, তোমার চেহারা দেখলে কে বলবে তোমার বয়েস হয়েচে! তোমাকে দেখে আমি মেয়েমানুষ, আমারই চোখের পলক পড়ে না শরৎ-দি—সত্যি, সত্যি বলচি। রাজকন্যে মানায় বটে।

শরৎ সলজ্জ হেসে বললে—দূর—বাঁদরী!

—মিথ্যে বলিনি শরৎ-দি—এতটুকু বাড়িয়ে বলচি নে—

—কেন নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝি কথা বলিস নে?

—আর লজ্জা দিও না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। অনেক তাকিয়ে দেখেচি, কাজেই ওকথা মনে সর্ব্বদাই জেগে থাকে। ওকথা তুলে আর কেন মন খারাপ করিয়ে দেও?

শরৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ইতস্ততঃ করে বললে—একটা কথা বলবো রাজলক্ষ্মী?

—কি শরৎ-দি?

—আমায় অমন কথা আর বলিস নে। কে কোথা থেকে শুনবে আর কি ভাববে। এ গাঁ বড় খারাপ হয়ে উঠেচে ভাই।

—কেন শরৎ-দি একথা বললে?

—তোকে এতদিন বলিনি—কাউকে বলিনি বুঝলি? কিন্তু যখন কথাটা উঠলোই, তখন তোর কাছে বলি।

—কি কথা, বলে ফেলো না ঝাঁ করে। হাঁ করে তোমায় মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকবো—

—এগাঁয়ে কতকগুলো পোড়ার মুখো ড্যাকরা জুটেচে, তাদের মা বোন জ্ঞান নেই—সেগুলোর জ্বালায় আমার

সন্ধের সময় উত্তর-দেউলে পিদিম দিতে যাবার যদি যো থাকে—সেগুলো কবে ষাঁড়তলার ঘাটসই হবে তাই ভাবি—

রাজলক্ষ্মী অবাক হয়ে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে—বলো কি শরৎ-দি! এ কথা তো কোনো দিন শুনি নি তোমার মুখে!...কবে দেখেচ? কি করে তারা?

—কি করে আবার—উত্তর-দেউলে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, ছাতিম বনের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে। রোজ নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই করে। এই কালও তো করেছিল।

—কাল?

—কালই। প্রভাস-দা উঠে চলে গেল, তখন প্রায় বেলা গড়িয়ে গিয়েচে। আমি উত্তর-দেউলে গেলাম সন্ধে দেখাতে, আর অমনি শুনি মন্দিরের পশ্চিম গায়ে দেওয়ালের ওপাশে কার পায়ের শব্দ অন্ধকারে—

—বলো কি শরৎ-দি! আমার শুনে যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠচে! তোমার ভয় করলো না?

—আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে ভাই। আর বছর সারা বর্ষা কাল অমনি করে মরেছে পোড়ার মুখোরা—তাদের যমে ভুলে আছে—আবার সুরু করেছে এই ক'দিন—

—তার পর কি হোলো?

—কি আর হবে, সাহস নেই এক কড়ার। হেই করলে কুকুরের মত পালিয়ে যায়। একবার যদি দেখতে পাই—তবে দেখিয়ে দিই কার সঙ্গে তারা লাগতে এসেচে। বঁটি দিয়ে নাক কেটে ছাড়ি—

—জ্যাঠামশায়কে বলো না কেন?

—বাবাকে? পাগল! উনি কিছু করতে পারবেন না, মাঝে পড়ে গাঁয়ে ঢাক বাজিয়ে বেড়াবেন। মন্দ লোকে পাঁচ কথা বলবে।

—বাবাকে কি ধর্ম্মদাসকে বলবো তবে?

—না ভাই কাউকে বলবি নে। পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা ওঠাবে। গাঁয়ের লোক বড় খারাপ জানো তো সবই। কাকারা করতে যাবেন ভালো ভেবে, হয়ে যাবে উল্টো। তা ছাড়া তাঁরা করবেনই বা কি? চোখে তো কাউকে দেখিনি।

—আচ্ছা সন্দেহ হয় কারো ওপর শরৎ-দি?

শরৎ চুপ করে নীচু মুখে বাসন মাজতে লাগলো।

রাজলক্ষ্মী বললে—বলো না শরৎ-দি, কাউকে সন্দেহ কর?

—কার ভাই নাম করবো—যখন চোখে দেখিনি। তবে সন্দেহ আমার হয় কার ওপর তা বলতে পারি, তুই কিন্তু কারো কাছে কিছু বলতে পারবি নে। কীর্ত্তি মুখুয্যের ভাগ্নে অনাদি ছোঁড়াটার চালচলন অনেক দিন থেকে খারাপ দেখচি। রাস্তাঘাটে যখন দেখা হয়—তখন কেমন হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, শিস্ দেয়—আর ওই বটুক মুখপোড়াটাকেও আমার সন্দেহ হয়।

—বটুক-মামা? তার তো বয়েস হয়েচে অনেক—তবে—

—বয়েস হয়েচে তাই কি? আমিও তো দাদা বলে ডাকি। ও লোক কিন্তু ভাল না।

—সে আমিও একটু একটু না জানি এমন নয় শরৎ-দিদি—একদিন হয়েচে কি, শোনো তবে বলি। আমি আসচি হারান চক্কত্তিদের বাড়ী থেকে—ঠিক দুপুর বেলা, ঘোষেদের কাঁটাল বাগানে এসে বটুক-মামার সঙ্গে দেখা—

শরৎ বাধা দিয়ে বললে—থাকগে—ওসব কথা আর শুনে কি করবো? ওসব শুনলে রাগে আমার সর্ব্ব শরীর রি রি করে জ্বলে। তবে ওরা এখনও আমায় চিনতে পারে নি। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই আমার। শাস্তি যেদিন দেবো. সেদিন নিজের হাতে দেবো। মুখপোড়াদের শিক্ষে সেদিন ভাল করেই হবে। তবে একটা কথা বলি—যাদের নাম করলাম, তাদের সন্দেহ করি এই পর্য্যন্ত। ওরা কি না, আমি ঠিক জানিনে—চোখে তো দেখতে পাই নি কাউকে। অন্যায় দোষ দিলে ধর্ম্মে সইবে না।

রাজলক্ষ্মী প্রশংসমান দৃষ্টিতে শরতের সুগঠিত সুন্দর দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—সে যদি কেউ পারে, তবে তুমিই পারবে শরৎ-দি, তা আমি জানি। তোমায় দেখলে আমাদের মনে সাহস আসে।

শরৎ দুষ্টুমির হাসি হেসে রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে

সুন্দর ভঙ্গিতে চেয়ে বললে—ইস্! বলিস কি রে! সত্যি? সত্যি নাকি?

রাজলক্ষ্মীও উৎসাহের সুরে হাসিমুখে বললে—বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্চে তোমায় শরৎ-দিদি? কি চমৎকার ভাবে চাইলে? আমারই মন কেমন করে ওঠে তবুও আমি মেয়ে মানুষ।

শরৎ কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললে—আবার! বারণ করে দিলাম না? ও সব কথা বলবি নে। মেয়ের এদিকে নেই ওদিকে আছে? চল্ বাসনগুলো কিছু নে দিকি হাতে করে—বেলা আর নেই। এখনও ছিষ্টির কাজ বাকি—

বাড়ী ফিরে রাজলক্ষ্মী বললে—চলে যাই শরৎ-দিদি—সন্দে হোলে যেতে ভয় করবে।

শরৎ তাকে যেতে দিলে না। বললে—ও কি রে! তোকে কিছু খেতে দিলাম না যে? তা হবে না। এইবার চা করি, আর কিছু খাবার করি।

—না শরৎ-দি, পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও আজ। আর একদিন এসে খাবো এখন।

শরৎ কিছুতেই শুনলে না—কখনো সে রাজলক্ষ্মীকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দেয় না, নিজে সে গরীব, গরীব ঘরের মেয়ে রাজলক্ষ্মীর দুঃখ ভাল করেই বোঝে। বাড়ীতে হয়তো বিকেলে খাবার কিছুই জোটে না—আসে এখানে, গল্প করে—ওকে খাওয়াতে পারলে শরতের মনে তৃপ্তি হয় বড়। শরৎ চা করে ওকে দিলে, নিজের জন্যে একটা কাঁসার গ্লাসে, ঢেলে নিলে। হালুয়া করে ওকে কিছু দিয়ে বাকিটা বাবার জন্যে রেখে দিলে।

রাজলক্ষ্মী বললে—ওকি শরৎ-দি, তুমি নিলে না?

—আমি একেবারে সন্দের পরই তো খাবো। এখন খেলে আর খিদে পায় না, তুই খা—

রাজলক্ষ্মী চা ও খাবার পেয়ে বেশ একটু খুসিই হোল। বললে—কি সুন্দর হালুয়া তুমি কর শরৎ-দি—

—যাঃ—আমার সবই তো তোর ভালো।

—তা ভাল লাগলে ভালো বলবো না? বা—রে—তোমার সবই আমার যদি ভালো লাগে, তবে কি করি বলো না?

—আমারও ভাল লাগে তুই এলে, বুঝলি? এই নিবান্ধা পুরীর মধ্যে একা মুখটি বুঁজে সদাসর্ব্বদা থাকি, কেউ এলে গেলে বড় ভাল লাগে। বাবা তো সব সময় বাড়ী থাকেন না—তোর সঙ্গে বেশ একটু গল্পগুজব করে বড় আমোদ পাই।

—আমারও শরৎ-দি। গাঁয়ের আর কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশে তেমন আমোদ পাই নে, তাই তো তোমার কাছে আসি।

রাজলক্ষ্মীর বিবাহের বয়স পার হয়েচে—কিন্তু বাপ-মায়ের পয়সার জোর না থাকায় এখনও কিছু ঠিকঠাক হয় নি। শরতের মনে এটা সর্ব্বদাই ওঠে, যেন তার নিজেরই কন্যাদায় উপস্থিত।

কেদারকে দিয়ে শরৎ দু-এক-জায়গায় কথাবার্ত্তা তুলেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পয়সা-কড়ির জন্যে সে সব সম্বন্ধ ভেঙে যায়। আজ দিন দশ-বারো হোল, কেদার আর একটা সম্বন্ধ এনেছিলেন—শরতেরও শুনে মনে হয়েচে সেখানে হোলে ভালই হয়। পূর্ব্বে এ নিয়ে একবার দুই সখীর মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়েচে।

আজও শরৎ বললে—ভালো কথা, রাজলক্ষ্মী—আসল ব্যাপারের কি করবি বল—

রাজলক্ষ্মী না বুঝতে পারার ভান করে বললে—কি ব্যাপার আসল?

—তোকে যে-কথা সেদিন বললাম। সাঁতরা পাড়ার সেই সম্বন্ধটা—

রাজলক্ষ্মী মনে মনে খুসি হয়ে উঠলো। মুখে বললে—যাঃ, আর ও সবে দরকার নেই। বেশ আছি। কেন তাড়িয়ে দেবে শরৎদি?

—না ও সব চালাকি রাখ দিকি। এখন আমায় বল, বাবাকে কি বলবো।

যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব উঠেচে তার সম্বন্ধে সব কথা রাজলক্ষ্মী ইতিপূর্ব্বে দুবার শুনেচে শরতেরই মুখে—তবুও তার ইচ্ছে হোল আর একবার সে কথা শোনে। শুনতে লাগে ভালই। তবুও কিছু নূতনত্ব।

সে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—ভারি তো সম্বন্ধ? ছেলে কি করে বলেছিলে?

শরৎ বললে—নৈহাটিতে পাটের কলে চাকরী করে শুনেচি। মাকে নিয়ে নৈহাটিতেই বাসা করে থাকে।

রাজলক্ষ্মী ঠোঁট উল্টে বললে—পাটের কলে আবার চাকরী! তুমিও যেমন!

রাজলক্ষ্মী কথাটা বললে বটে, কিন্তু তার মনে হোল এ সম্বন্ধ খারাপ নয়। ছেলেটির বিষয়ে আরও কিছু জানবার তার খুব কৌতুহল হোল, কেমন দেখতে, কত টাকা মাইনে পায়, বাড়ীতে আর কেউ আছে কিনা।

শরৎ কিন্তু সে দিক দিয়েও গেল না। বললে—তা তো বুঝলাম তোর খুব উঁচু নজর। কিন্তু জজ মেজেষ্টার পাত্র এখন পাওয়া যাচ্চে কোথায় বল্। অবস্থা বুঝে তো ব্যবস্থা? কি মত তোর?

রাজলক্ষ্মী চুপ করে থেকে বললে—ভেবে বলবো শরৎ-দিদি—আচ্ছা, কি পাশ বলেছিলে যেন সেদিন?

খানিকক্ষণ এসম্বন্ধেই কথা চলে যদি, বেশ লাগে।

শরৎ বললে—ম্যাট্রিক পাশ।

—মোটে?

—অমন কথা বলিস নে। দু-তিনটে পাশ পাত্র কি পাওয়া সহজ? এতগুলো টাকা চাইবে।

—আচ্ছা, পাটের কল কি রকম শরৎ-দি?

শরৎ হেসে বললে—আমি তো আর দেখি নি কখনো। তোরও পরের মুখে ঝাল খাওয়ার দরকার কি, একেবারে নিজের চোখেই তো দেখবি।

—যাঃ শরৎ-দি যেন কি!

শরৎ হাসতে হাসতে বললে—আচ্ছা শোন, তুই যে বলচিস ম্যাট্রিক পাশ কিছুই না—দুই-তিনটে পাশ ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিলে তুই কথা বলতে পারবি তার সঙ্গে?

—কেন পারবো না? দেখে নিও—

গল্পে দুজন উন্মত্ত, কখন ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে, বাইরে বেশ অন্ধকার নেমেচে, ওরা খেয়ালই করে নি। ছাতিম বনে শেয়াল ডেকে উঠতে ওদের চমক ভাঙলো।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো—ও শরৎ-দি, একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল যে! আমি কি করে যাবো?

—বোস না। বাবা এলে তোকে বাড়ী দিয়ে আসবেন এখন।

—না শরৎ-দি আমি যাই, তুমি গড়ের খাল পার করে দিয়ে এসো আমায়—বাকী পথ ঠিক যাবো। আমার যত ভয় এই গড়ের মধ্যে।

—আর আমি একলাটি এখন কতক্ষণ পর্য্যন্ত বসে থাকবো তার ঠিক আছে? বাবা যে কখন ফিরবেন! তুই থাকলে বড্ড ভাল হোত থাক্ না, লক্ষ্মীটি—আর একটু চা খাবি?

কিন্তু রাজলক্ষ্মী আর থাকতে চাইল না। বেশি রাত পর্য্যন্ত বাইরে থাকলে মা ভারি বকবে। একলাটি অন্ধকারে যেতে ভয়ও করে। কেদার-জ্যাঠার আসবার ভরসায় থাকতে গেলে দুপুর রাত হয়ে যাবে, বাপরে!

কেরোসিনের টেমি ধরে শরৎ গড়ের খাল পর্য্যন্ত রাজলক্ষ্মীকে এগিয়ে দিলে। রাজলক্ষ্মী খাল পার হয়ে ওপারের রাস্তায় উঠে বললে—তুমি দাও শরৎ-দি, গোয়ালাদের বাড়ীর আলো দেখা যাচ্চে—আর ভয় নেই।

যেতে যেতে সে ভাবছিল, নৈহাটি কেমন জায়গা না জানি।

সংসারে বেশি ঝামেলা না থাকাই ভালো।

ম্যাট্রিক পাশ ছেলে মন্দ নয়।

ছেলের রংটা কালো না ফর্সা? ক্রমশঃ

ট্যুশান

শ্রীপৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

গুরু-শিষ্য ! মিথ্যা কথা,
সোক্রাটিস-প্লেটো নয়—
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ত নয়ই,
বৃহন্নলা-উত্তরাও নয় ;
(ঐতিহাসিক না হ'লেও ক্ষতি নেই।)

ট্যুশান আছে—
কোথায় শিক্ষক, উদ্দালকের ধৈর্য নিয়ে !
ছাত্র কোথায়, নচিকেতার শ্রদ্ধা নিয়ে !

বেকার-নাশন সমিতি খুলেছে আজ কোচিং স্কুল
বিক্রী হচ্ছে সময় জলের দরে,
(দুগ্ধ-ঘৃত-নবনীর দরেও হ'তে পারতো।)

রাসায়নিক শুদ্ধি-যন্ত্রের চেয়েও ঘোরালো
শেয়ার-মার্কেট ঢুকেছে বাগ্দেবীর অর্চ্চনা-মন্দিরে
ঘুলিয়ে দিয়েছে ধনিকের মগজ।

ছাত্রের পিতা, অভিভাবক—
শুধু ছাত্রের নয়, শিক্ষকেরও।
ধনিকের দাবী দুর্বিষহ হয়ে নামে শিক্ষায়তনে।
পক্ক-কেশ আর বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা
সদম্ভে ঔদ্ধত্য জানায় অধিকার-গর্বে।

ছাত্র কেবল ছাত্র নয়,
সবজান্তা (অবশ্য পাঠ্য পুঁথি বাদ দিয়ে)
গুণে আজ ঘুণ ধরেছে।—
শেখার চেয়ে শেখাবার আগ্রহ বেশী,
জ্ঞানার্জনের চেয়ে কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা বেশী,
(টাকা দিয়ে মাষ্টার রেখেছে কিনা !)
অতন্দ্রিত,—
পাছে সময় নষ্ট করে মাষ্টার—
(জলের দরে বিক্রী হচ্ছে সময়।)

'ফ্যামিলী-আপ্ব্রিংইং'-এর দম্ভ
টিটকারী দেয় নিরীহ মানবতায়—
শিষ্টতাকে করে পরিহাস আদিমতা বলে।

শিক্ষক, নিরীহ বেচারী,—
মনে মনে হাসে দুঃখের হাসি।
আঙ্গুলে দিন গোনে
বুর্জোয়া-শোষণ আর কতদিন ?
ফরাসী আর রাশিয়া বিপ্লবের কাহিনী
মুখস্থ প্রায়।
দীর্ঘশ্বাস আসে,
ভাবে—
আর কতো দিন।
ছাত্রের দায়িত্ব-ভার গুরুতর,
আত্মার চেয়েও জটিলতর,
গুরু-গম্ভীর, বক-ধার্মিকের মতো।
ফ্রয়েড কী কুক্ষণেই লিখেছিলেন মনস্তত্ত্ব।

ঘুম হয় না রাত্তিরে (পেটের জ্বালায়)
স্বপ্ন দেখে—আর কতোদিন !
পড়ানোতে তন্ময়,
দুঘণ্টা পরেই মন আটুপাটু করে,
এন্গেজ্মেণ্ট থাকে প্রায়ই
(অবিশ্যি সে দু-ঘণ্টা বাদ দিয়ে।)
ঘড়ী দেখে ঘণ্টা রিজার্ভ করা
গণিকার মতো সময় বিক্রী
যদিও জলের দরে।

মন চায় না,
জঠরাগ্নি ডবল মার্চ করায়—
বসে বসে দিবাস্বপ্নের মতো ভাবে,
'আর কতো দিন ?'

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

সম্প্রতি ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ১৯৩৫ সাল হইতে ভারত ও ব্রহ্মদেশ রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতে উভয় দেশের বাণিজ্য একটি বিশেষ চুক্তি (Indo-Burma Trade Convention) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। কিন্তু এই চুক্তি ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাসে শেষ হওয়ায় আর একটি বাণিজ্য-চুক্তি করিবার প্রয়োজন হয়। প্রায় চার মাস আলোচনার পর নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। পূর্ব্বেকার চুক্তির নীতি ছিল এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাধ-বাণিজ্য (free-trade) চলিবে এবং অন্যত্র বিশেষ সুবিধার (preference) ব্যবস্থা থাকিবে। নূতন চুক্তিও এই ভিত্তিতেই সম্পাদিত হইয়াছে, তবে অবাধ-বাণিজ্যের তালিকা অনেকটা সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে,—পূর্ব্বে যেগুলি অবাধ-বাণিজ্যের তালিকায় ছিল বর্ত্তমান চুক্তিতে তাহার অনেকগুলিই 'বিশেষ সুবিধার' পর্য্যায়ে পড়িবে, অর্থাৎ, নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যগুলি আমদানি বা রপ্তানি শুল্কের আওতায় আসিবে, কিন্তু অন্যান্য দেশজাত দ্রব্যের উপর নির্দ্দিষ্ট শুল্ক অপেক্ষা কম শুল্ক দিতে হইবে।

নূতন বাণিজ্য-চুক্তির লাভ-লোকসানের খতিয়ান করিতে হইলে ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের প্রকৃতি এবং মূল্যের তারতম্য নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

নিম্নের তালিকায় ব্রহ্মদেশের মোট আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ১৯৩৬ হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত বার্ষিক গড় হিসাব দেওয়া হইল এবং উহার কত অংশ ভারতের সহিত যুক্ত তাহাও দেখান হইল।

ব্রহ্মদেশের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব

১৯৩৬-৪০ সালের বার্ষিক গড় হিসাব

মোট রপ্তানি	৫০,৯২ লক্ষ টাকা		
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	২৮,০৫	,,	,,
মোট আমদানি	২২,৮৮	,,	,,
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	১১,২১	,,	,,
মোট আমদানি হইতে রপ্তানির আধিক্য	২৮,০৪	,,	,,
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	১৬,৪৮	,,	,,

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মদেশের (১) মোট রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ ভারতে আসিয়াছে, (২) মোট আমদানি বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ভারত হইতে গিয়াছে এবং (৩) মোট বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্তের (favourable balance of trade) শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ ভারতের অংশ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারত ও ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে ব্রহ্মদেশই বেশী লাভবান হয়। ব্রহ্মদেশের আমদানি বাণিজ্যে ভারত, ইংলণ্ড, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রই প্রধান প্রধান অংশীদার, তন্মধ্যে ভারতের অংশই সমগ্র আমদানি বাণিজ্যের অর্দ্ধেক। ভারতের অংশ ব্রহ্মদেশের আমদানী বাণিজ্যের অর্দ্ধেক হইলেও ভারতের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের তুলনায় ইহা মাত্র শতকরা ৭ ভাগ। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বাজার ব্রহ্মদেশের পক্ষে যতটা প্রয়োজীয়, ব্রহ্মদেশের বাজার ভারতের পক্ষে ততটা প্রয়োজনীয় নহে।

ব্রহ্মদেশ হইতে যে কয়টি প্রধান দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয় তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল এবং ইহার কতটা ভারতে আমদানি হয় তাহাও দেখান হইল।

ব্রহ্মদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য—

১৯৩৬-৪০ সালের বার্ষিক গড় হিসাব

চাউল ও ধান্য	প্রায়	২১,০০	লক্ষ	টাকা
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	,,	১১,০০	,,	,,
কেরোসিন	,,	৭,০০	,,	,,
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	,,	৭,০০	,,	,,

পেট্রোল	„	২,৪০	„	„
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	„	২,৪০	„	„
কাষ্ঠ	„	৩,৭০	„	„
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	„	২,৩০	„	„
খনিজ তৈল	„	১,৬০	„	„
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	„	১,৬০	„	„

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, (১) কেরোসিন, পেট্রোল এবং খনিজ তৈল সবই ভারতে আমদানি হয়, (২) চাউল ও ধান্যের প্রায় অর্দ্ধেক ভারতে আমদানি হয় এবং (৩) কাষ্ঠের শত করা ৬০ ভাগ ভারতে আসিয়া থাকে। পরিশিষ্টে ব্রহ্ম-ভারত-বাণিজ্য-চুক্তির যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, চাউল, ধান্য, কেরোসিন, কাষ্ঠ এবং খনিজ তৈল বিনা শুল্কে বা বিশেষ নিম্ন শুল্কে ভারতে আমদানি হইতে পারিবে। তাহা হইলে বাকী রহিল শুধু পেট্রোল। ভারতের বাজারে ব্রহ্মদেশের পেট্রোলের ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কেরোসিন, খনিজ তৈল এবং পেট্রোলের ব্যবসা ইংরেজদের হাতে। কাজেই ব্রহ্ম-ভারত-বাণিজ্য-চুক্তির ফলে তথাকার ইংরেজ ব্যবসায়ীরাই লাভবান হইবে। একমাত্র চাউল, ধান্য ও কাষ্ঠের ব্যবসায়ের কতক অংশ বর্ম্মীদের হাতে। চাউল ও ধান্য সম্বন্ধে বলিবার কথা এই যে, উহা প্রধান খাদ্যতালিকাভুক্ত, কাজেই উহার উপর শুল্ক বসান অন্যায়। ব্রহ্মদেশের প্রায় সব কয়টি প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যে সুবিধা পাইলেও ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের উহাতে সুবিধা কতটা হইল তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রকারান্তরে ব্রহ্মদেশের বেনামীতে ভারতের বাজারে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল।

নিম্নের তালিকায় ব্রহ্মদেশের প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্যের হিসাব এবং তৎসহ ভারতের অংশ দেওয়া হইল।

ব্রহ্মদেশের প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্য
১৯৩৬-৪০ সালের গড় বার্ষিক হিসাব

মোট কার্পাস সূতা	৮০	লক্ষ	টাকা
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	৬২	„	„
মোট কার্পাস-জাত বস্ত্র	৩৬৫	„	„
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	২০০	„	„
মোট পাটের থলি	১৩০	„	„
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	১২৯	„	„
মোট লোহা ও ষ্টীল	১২৫	„	„
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	৬৫	„	„
মোট কয়লা	৫০	„	„
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	৪৯	„	„
মোট তামাক ও তজ্জাত দ্রব্য	৮৭	„	„
তন্মধ্যে ভারতের অংশ	৮৫	„	„

পরিশিষ্টে যে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য-চুক্তিভুক্ত দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হইল তাহাতে অবাধ বাণিজ্যের তালিকায় উপরে উল্লিখিত দ্রব্যের একটিও নাই। বিশেষ সুবিধার তালিকায় কার্পাস, সূতা, বস্ত্র, তামাক ও তজ্জাত দ্রব্য আছে। অবাধ-বাণিজ্যের তালিকায় ভারত-জাত যে সকল দ্রব্য আছে তাহার মোট মূল্য দুই কোটি টাকার উপরে নহে। কার্পাস বস্ত্র সম্পর্কে যে বিশেষ সুবিধা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই একমাত্র ভারতের দিক হইতে লাভের কথা। ভারতে উৎপন্ন চিনি সম্পর্কে এই বাণিজ্য-চুক্তিতে যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা খুবই অস্পষ্ট। বর্ত্তমানে ভারতে রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত চিনি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং ভারত-জাত চিনি সম্পর্কে এই বাণিজ্য-চুক্তিতে ভারতের পক্ষে বিশেষ সুবি[illegible]জনক সুনির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত থাকা উচিত ছিল।

সম্প্রতি ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, নূতন চুক্তির ফলে ব্রহ্মদেশের শুল্ক বাবদ আয় ১ কোটি টাকা বৃদ্ধি হইবে। হিসাব করিলে মোটামুটি দেখা যায় যে, এই চুক্তির ফলে ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক বাবদ ভারতের আয় কিঞ্চিদধিক ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের লাভের অঙ্কের দিক দিয়াও ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের ভাগেই বেশী পড়িল।

পরিশিষ্ট

নিম্নে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির মূল ধারা ও তদন্তর্গত দ্রব্যের তালিকার মর্ম্ম দেওয়া হইল। প্রথমতঃ, এই চুক্তিদ্বারা অবাধ-বাণিজ্যের অবসান হইয়া পারস্পরিক

বিশেষ সুবিধার নীতি গৃহীত হইল। সাধারণ ভাবে ইংলণ্ড বা সাম্রাজ্য-জাত দ্রব্য হইতে অন্ততঃ শতকরা ১০৲ টাকা কম শুল্কে এবং অন্যান্য দেশ-জাত দ্রব্য হইতে অন্ততঃ শতকরা ১৫৲ টাকা কম শুল্কে উভয় দেশে মাল আমদানি-রপ্তানি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উভয় দেশে কতকগুলি দ্রব্য বিনা শুল্কে আমদানি করা যাইবে এবং কতকগুলি দ্রব্যের উপর শুল্কের উর্দ্ধ হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশ কর্ত্তৃক সুবিধা দান

(১) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিনা শুল্কে ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে আমদানি করা যাইবে—টিনে ভরা মাছ, ফল ও তরিতরকারী, ফলের রস, পেন্সিল, কাগজ, নারিকেলের ছোবড়া, নারিকেলের ছোবড়া-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কাচ, কাচের চিমনী ও আলোর ঢাকনী, কাচের চুড়ি, কাচের পুঁতি, কতিপয় ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও অন্য যন্ত্রপাতি। (২) নিম্নলিখিত ভারতীয় দ্রব্যসমূহের উপর শতকরা পাঁচ টাকার বেশী শুল্ক ধার্য্য করা হইবে না:—আলু ও পেঁয়াজ, নারিকেল, কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য, ভেষজ ঔষধ, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, প্রসাধনের দ্রব্যাদি, রং, পশমী সুতা, কম্বল ও পশমের হোসিয়ারী দ্রব্য, (৩) নিম্নলিখিত ভারতীয় পণ্যগুলির উপর শতকরা দশ টাকার বেশী শুল্ক ধার্য্য করা হইবে না:—কফি, কতকগুলি মসলা, চুরুট, গায়ে মাখার সাবান, পশমের কার্পেট ও জুতা। (৪) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উপর ব্রহ্মদেশ বিশেষ হারে আমদানি শুল্ক বসাইতে পারিবে:—সুপারি, (শুল্কের হার অনূর্দ্ধ শতকরা কুড়ি টাকা), স্পিরিটযুক্ত ভেষজ ঔষধ (অনূর্দ্ধ চলতি শুল্কের দ্বিগুণ), তামাক (অনূর্দ্ধ প্রতি পাউণ্ড এক আনা), কাপড় (অনূর্দ্ধ শতকরা ১৫ টাকা), কার্পাস সূতায় প্রস্তুত বস্ত্রাদি (অনূর্দ্ধ শতকরা ১৫ টাকা), ইলেকট্রিক বালব (অনূর্দ্ধ শতকরা ১৫ টাকা)।

ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক সুবিধা দান

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিনা শুল্কে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে আমদানি করা চলিবে—রং ও চামড়া পাকা করিবার মালমসলা, কাঠ ও কাঠের তৈজসপত্রাদি, চায়ের বাক্স, তুলা, লোহা ও ইস্পাত, এনামেল-করা লোহার তার, তামা, তামার টুকরা, এলুমিনিয়ামের বাক্স ও পাত, সীসা ও দস্তা, টিন ও অন্যান্য ধাতু। (২) নিম্নলিখিত ব্রহ্মদেশীয় দ্রব্যের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে শুল্ক বসান হইবে: আলু ও পেঁয়াজ শতকরা ৫ টাকা, কফি শতকরা ১০ টাকা, এলাচি, দারচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ, জায়ফল ও গোলমরিচের উপর শতকরা ১০ টাকা, সুপারি শতকরা ২০ টাকা, চুরুটের উপর শতকরা ১০ টাকা, তামাকের উপর প্রতি পাউণ্ডে এক আনা।

বিশেষ বিশেষ পণ্য সম্পর্কে বিধান

ব্রহ্মদেশে ভারত হইতে যে কার্পাস-বস্ত্র আমদানি হইবে তাহার উপর শতকরা দশ টাকার বেশী শুল্ক বসান হইবে না। ব্রহ্মদেশ হইতে যে কেরোসিন আমদানি হয় তাহার উপর ধার্য্য শুল্কের হার কমাইয়া ৯ পাই করা হইয়াছে। তবে ভারত-সরকার কেরোসিনের উপরে সারচার্জ্জ ধার্য্য করিবার অধিকার রাখিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে ব্রহ্মসরকার কাঠের উপর রপ্তানি শুল্ক ধার্য্য করিবেন না। স্বদেশজাত চিনির দ্বারা চাহিদা মিটাইয়া যেটুকু অভাব পড়িবে তাহা পূরণ করিবার জন্য ব্রহ্মসরকার ভারত হইতে চিনি আমদানি সম্পর্কে বিশেষ শুল্ক সুবিধা দিবেন। অন্যান্য দেশ হইতে যতদিন পর্য্যন্ত ভারতে বিনা শুল্কে চাউল আমদানি হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানিকৃত চাউলের উপর শুল্ক বসান হইবে না।

হাসির কমল

শ্রীনিশিকান্ত

আনন্দ মোর হাসির কমল
মোর বেদনার সরোবরে
মোর জীবনের বৃন্তে যে তার
দল ফুটে রয় থরে থরে ॥

রুদ্ধ কুঁড়ির আঁধার বেলা
এবার মুক্ত বিকাশ-মেলা
তোমার আলোয় তোমার পানে
আপনাকে তার তুলে ধরে।
তোমার অরুণ আঁখির কিরণ
তারে সদাই পরশ করে ॥

অশ্রুধারায় ভাসিয়ে গতি
পার হয়েছি অশ্রুনদী
বিরহ মোর পরশমণি
নিজ মিলন রূপান্তরে।
মরণ আমার মাঝির মত
আনে অমর কূলের 'পরে ॥

উপজীবিকা স্বরূপে বাংলা সাহিত্য

শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম-এ

সাহিত্যিক মহলে একটা অভিযোগ আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে, দেশের সময় ও অবস্থা আজো ঠিক বাংলা সাহিত্যকে মুখ্য উপজীবিকারূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে অনুকূল নয়। অনেকের ধারণা, এজন্যই বাংলা সাহিত্য এখনো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্য-পদবাচ্য হইতে পারে নাই। কারণ, সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার প্রধানতঃ নির্ভর করে পেশাদারী সাহিত্যিকদের অনন্যমুখী সাধনার উপর। প্রকাশক এবং সম্পাদকগণকে এ সম্পর্কে কেহ কেহ দায়ী করিয়া থাকেন। লেখার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কার্পণ্য না কি তাঁদের অসীম। লেখকসম্প্রদায়—বিশেষ করিয়া দুঃস্থ লেখকসম্প্রদায়, যাহাতে লেখার ন্যায্য মূল্য এঁদের নিকট হইতে কড়ায়গণ্ডায় আদায় করিয়া নিতে

পারেন, সে সম্বন্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইবার সপক্ষে কোন কোন সভা-সমিতিতে প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে, লক্ষ্য করিয়াছি।

এ কথা অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, নিছক সাহিত্যসেবা দ্বারা দিন গুজরানের বিধিব্যবস্থা দেশে আজো বড় একটা কেহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শোনা যায়, লেখকবিশেষকে কোন কোন দেশের সাময়িক পত্রের কর্তৃপক্ষ শব্দ-পিছু এক গিনি হারে পারিশ্রমিক দিতেও ইতস্তত: করেন না। এদেশে ওসব ব্যাপার স্বপ্নেরও অতীত। পক্ষান্তরে জীবনযাত্রা দিনের পর দিন এমনি জটিল, বিক্ষিপ্তিময় ও সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে যে, একমাত্র পেশাদারী-সাহিত্যসেবী ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য-সাধনা অপর কাহারো পক্ষে এক প্রকার দুঃসাধ্য। এ যুগ আমাদের বড় বেশী করিয়া specialist বা বিশেষজ্ঞের যুগ—অব্যবসায়ী অথবা অনভিজ্ঞের (layman) কথায় কান বিশেষ একটা কেহ সহজে আর দিতে চায় না। এ হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে এমেচারের (amateur) দিন প্রায় ঘুচিতে চলিয়াছে—যদিও বাংলা সাহিত্য এক কালে গড়িয়া উঠিয়াছিল এই এমেচারদের হাতেই! দৃষ্টান্ত-স্বরূপে মাইকেল, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের উল্লেখ করা যায়। মাইকেল ও হেমচন্দ্রের শেষ বয়সের শোচনীয় কাহিনী হইতেই ধরা পড়ে—শুধু সাহিত্য চর্চ্চায় দিনের অন্ন সেদিনো কারো জুটিত না। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ বাগ্দেবীর একনিষ্ঠ সাধকের প্রতি কমলার কৃপাও সুপ্রচুর। সুতরাং সাহিত্যকে উপজীবিকা রূপে বরণের কথা এঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সমস্যা শুধু তাঁদেরি বেলায়—যাঁদের মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভা অল্পবিস্তর বর্ত্তমান, অথচ দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাঁদের পরমুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বহু সাহিত্যিক ও লেখক এই উদরান্নের তাড়নাতেই অল্প বেতনে আর কিছু হোক না হোক অন্তত: শিক্ষকতা কিম্বা বার্ত্তাজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দিনের অধিকাংশটুকুই কাটে তাঁদের এ সব কাজের মধ্যে। অবসরকালে তাঁরা সাহিত্য-চর্চ্চা করেন বটে, কিন্তু যে মানসিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে সেটুকু করিতে হয়, তাহা সাহিত্য-প্রেরণার অথবা সাহিত্য-প্রতিভা স্ফুরণের সম্যক অনুকূলে কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে।

পরোক্ষভাবে ব্যাপারটা সাহিত্যের উন্নতিরই পরিপন্থী। প্রাচীন কালের বিদ্বৎসমাজ রাজারাজড়ার বা বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিশ্চিন্তে জ্ঞান-চর্চ্চার সুযোগ পাইতেন, জানা যায়। লেখার কাটতির উপর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন অংশ তখন তাঁদের নির্ভর করিত না। বিদ্যাদান বা জ্ঞানদান সম্পর্কে অর্থের লেন-দেন ব্যাপারটা এই জন্যই সেদিন নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইতে বাধা ছিল না বটে, কিন্তু বর্ত্তমান এই বেকার-সঙ্কুল অর্থসমস্যার দিনে অর্থের চাহিদা এক দিকে যেমন ব্যাপক, তার সংস্থানও অন্য পক্ষে তেমনি দুর্ঘট। সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও রসস্রষ্টার তাই প্রয়োজন নিজ নিজ সাহিত্য প্রচেষ্টার বা রসসৃষ্টির ন্যায্য পারিশ্রমিকের। পক্ষান্তরে পূর্ব্বের তুলনায় এমেচারদের মধ্যেও সাহিত্যচর্চ্চার মন্দা পড়িয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যায়—দ্বিজেন্দ্রলালের পর সত্যিকার প্রতিভাশালী লেখকের উদ্ভব এই শ্রেণীর মধ্যে আজ পর্য্যন্তও দেশে আর হয় নাই। অবশ্য বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধোত্তর আবহাওয়ার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া এঁদেরি কেহ কেহ কথাশিল্পী হিসাবে নব্য-মনোবিজ্ঞানমূলক ও নব্য-নীতি ঘটিত রচনায় কিছুটা কৃতিত্ব প্রদর্শন যে ক্ষেত্র-বিশেষে না করিয়াছেন এমন নয়। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রত্যয় সাহিত্য-সাধনাকে সার্থক ও সজীব করিয়া তোলে—তাদেরি পরম অভাবের জন্যই যেন সে-সব লেখা অত্যল্প কালের মধ্যেই অবজ্ঞাত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সাহিত্য-প্রতিভা যে এদের নাই অথবা ছিল না এমন নয়, তথাপি তাঁদের প্রতিভা ব্যর্থ হইয়াছিল শুধু এই জন্যই যে, "ওপারে"র সমস্ত "ঢেউ"ই যে এপারে কেন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে না সেটুকু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত ধৈর্য্য, প্রবৃত্তি ও সহানুভূতির পরিচয় সেদিন তাঁরা দিতে পারেন নাই। সাহিত্যের উন্নতি এ সব সাময়িক "হুজুগে" লেখার মুখাপেক্ষী কোন কালে নয়—পরন্তু তার গতি প্রবাহটিকে এরা পঙ্গু ও আবর্ত্তসঙ্কুলই করিয়া তোলে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের দিক দিয়া এ সব আলোচনা

অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অনিবার্য্য নানা কারণে এক দিকে তথাকথিত এমেচার লেখকসম্প্রদায়ের সাহিত্য-প্রচেষ্টা যেমন বর্ত্তমানে নগণ্য না হোক, অন্ততঃ উন্নতিশীল একটা সাহিত্যের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতেছে না—অন্য দিকে পেশাদারী সাহিত্যিকগণের সাহিত্যসাধনাও তেমনটা ব্যাপক, অবিক্ষিপ্ত ও একাগ্র নয়। কারণ, সাহিত্য সেবায় অর্থকৃচ্ছ্রতা আজো এদেশে ঘুচবার সম্ভাবনা নাই। সাহিত্যের স্থিতি, ব্যাপ্তি ও প্রগতির দিক দিয়া সমস্যাটা অকিঞ্চিৎকর নয়।

এজন্য প্রকাশক ও সম্পাদকগণকেই শুধু দায়ী করা অবশ্য অন্যায় হইবে। কারণ ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত লাভের কিছুটা অংশই শুধু তাঁরা লেখকদিগকে পারিশ্রমিক রূপে প্রদান করিতে পারেন,—তার বেশী নয়। লেখার মূল্য নিরূপিত হয় পাঠকের সংখ্যা এবং চাহিদার দ্বারা। এদিকে দেশের প্রধান অভাব কিন্তু পাঠকের—বিশেষতঃ পয়সা খরচ করিয়া লেখা পড়িবার মত পাঠকের। বর্ত্তমান আদমসুমারির প্রাথমিক হিসাবানুসারে বাংলার মোট জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬০৩৬৮০০০; ইহার মধ্যে মাত্র ৯১২২০০০ জন শিক্ষিত। এই "শিক্ষিত" কথাটার অর্থ এই নয় যে—এদের প্রত্যেকেই একখানা বই পড়িবার ও বুঝিবার মত বিদ্যা রাখে। সামান্য একখানা চিঠি পড়িতে বা লিখিতে শুধু যাঁরা সক্ষম বর্ত্তমান আদমসুমারিতে তাঁদেরই শিক্ষিত পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিলে সাহিত্যের রসবোধ ও মর্ম্মগ্রহণের ক্ষমতা ইহার এক-চতুর্থাংশ লোকেরও আছে কিনা সন্দেহ, অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা পঁচিশ লক্ষেও হয়ত দাঁড়াইবে না। এঁদের সিকি ভাগও হয়ত আবার সাহিত্য-রসিক অথবা সাহিত্যচর্চ্চাশীল নয়। সঙ্গে সঙ্গে একথা অবশ্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে,—এক দিকে বাংলার জনসংখ্যা একমাত্র বাঙ্গালীতেই যেমন নিবদ্ধ নয়, অন্য দিকে প্রবাসী বাঙ্গালীও বঙ্গের বাহিরে যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছেন, যাঁদের অনেকেই বাংলা সাহিত্যের রীতিমত পাঠক। বর্ত্তমান আদমসুমারির হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর মোট সংখ্যা যে কত তাহা এখনও জানিবার উপায় নাই, কিন্তু ১৯৩১ খৃঃ উহা ছিল ৫৩৪৬৮৪৬ জন। ঐ বৎসর ভারতের শিক্ষিতের হার ছিল হাজারকরা প্রায় ৯৫ মাত্র। এই সমস্ত সংখ্যার তুলনামূলক আলোচনায় এমন ধারণা জন্মে না যে, বাঙ্গালী পাঠকের সংখ্যা এত বেশী একটা কিছু যার ভরসায় লেখকসম্প্রদায় সাহিত্য-সেবাকেই মুখ্য উপজীবিকা রূপে বরণ করিয়া নিতে সাহসী হইতে পারেন, অথবা প্রকাশক এবং সম্পাদকগণও তাঁদের অতিরিক্ত হারে পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন। আদমসুমারীর সংজ্ঞানুযায়ী শিক্ষিতের হার দেশে অবশ্য এবার শতকরা একশত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৎসত্ত্বেও মোট সাহিত্যামোদীর আনুমানিক সংখ্যা এমন কোন আশার সঞ্চার করে না যে, আগামী অন্ততঃ দুই কি তিন দশকের মধ্যেও বাঙ্গালী পাঠক সংখ্যা এতটা বাড়িয়া যাইবে যে, একমাত্র সাহিত্য-সাধনাকেই পেশা রূপে গ্রহণ করিয়া বাংলার লেখক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন।

একখানি ইংরাজী বই প্রকাশিত হইলে উহার সমস্ত জগতেই ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে;—কারণ ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞের অভাব সভ্য-সমাজে কুত্রাপি নাই। ইহার তুলনায় বাংলা সাহিত্যের পরিধি যে কতখানি সঙ্কীর্ণ তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অবশ্য পাঠকসংখ্যার তারতম্যের উপর দেশবিশেষের সাহিত্যের মূল্য, মর্য্যাদা, উন্নতি, ও অধোগতি সর্ব্বাংশে নির্ভর করে না। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি এবং প্রসার সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় যদি পেশাদারী সাহিত্যিকদের উপরই মুখ্যতঃ নির্ভর করে, তবে প্রকাশিত পুস্তকের কাটতির সংখ্যার দিকটাও অবশ্য বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ সাহিত্যিকদের সৃজন-প্রেরণা ও উদরান্নের সংস্থান ইহার অনপেক্ষ নয়। এ হিসাবে বাঙ্গালী পাঠকসম্প্রদায়ের সংখ্যাকে পর্য্যাপ্ত মনে করার কোন হেতু নাই। লেখকপিছু বিক্রীত পুস্তকের সংখ্যার বাৎসরিক একটা হিসাব এদেশে কখনও রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা আমার জানা নাই; তবে অনেক সাহিত্যিকের সহিত আলাপ-আলোচনায় যতটা বুঝিয়াছি তাতে এমন মনে হয় না যে, খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের লেখাও পুস্তক প্রকাশের প্রথম বৎসরেও গড়ে শ' দুই-তিনেকের বেশী কাটে। ইহাও

শুধু গল্প উপন্যাস প্রভৃতি লঘু সাহিত্যেরই বেলায়। কবিতার বই ত একপ্রকার অচল,—বিশেষতঃ কাব্যের সাম্প্রতিক রুচি বিবর্ত্তনের পর হইতে কবিতা সম্পর্কে সাধারণ পাঠক অনেকটা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সম্বৎসরে প্রকাশিত দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা অতি সামান্য এবং তাদের কাটতির পরিমাণও ততোধিক নগণ্য। জনসংখ্যার দিক দিয়া বাংলা প্রদেশের স্থান হয়ত অনেকানেক ইউরোপীয় দেশেরও উচ্চে,—কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, সে সব অঞ্চলের শিক্ষিতের হার বাংলার চেয়ে বহুগুণ বেশী, এবং তদনুপাতে বইয়ের চাহিদা এবং বিক্রয়ও অধিকতর। পক্ষান্তরে সে-সব দেশে একখানা উচ্চাঙ্গের পুস্তক প্রকাশিত হইলে অত্যল্প কালের মধ্যেই বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ হইয়া যায়। ফলে গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়েই অল্পবিস্তর লাভবান্ হন। এ ক্ষেত্রে বাংলার লেখকের সহিত ইউরোপীয় কোন দেশের লেখকের তুলনা বড় একটা চলে না।

সুতরাং বিনা দ্বিধায় একথা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, পাঠকের সংখ্যার দিক দিয়াই হোক কিংবা সাহিত্যের প্রসারের দিক দিয়া হোক, দেশের অবস্থা বর্ত্তমানে এমন নয় যাহাতে একমাত্র সাহিত্য-সেবাদ্বারা লেখক-সম্প্রদায় জীবিকা-নির্ব্বাহের বিধি-ব্যবস্থা করিতে সক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকাও কাজের কথা নয়,—অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি কামনা যাঁরা করেন তাঁদের। একটু লক্ষ্য করিলেই ধরা পড়িবে যে, সুকুমার সাহিত্যের, অর্থাৎ কাব্য, নাটক এবং কথা-সাহিত্যের দিক দিয়া বাংলা সাহিত্য আজ যতখানি সুসমৃদ্ধ, অন্য কোন বিভাগে এতটা আদৌ নয়। একমাত্র ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান থাকিলেই পৃথিবীর যাবতীয় দেশেরই সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের সহিত এক প্রকার সুপরিচিত হওয়া যায়। সে তুলনায় আমাদের নিজ দেশের সাহিত্য আজও কতখানিই না পশ্চাৎপদ! ফলকথা, আমাদের দেশে অনুবাদ-সাহিত্য এখনো তেমনটা বাড়িয়া উঠে নাই, এবং এই কারণেই দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সহিত আজও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ শিক্ষিত নারী-সম্প্রদায়ের বিরাট একটা অংশেরই প্রকৃত পরিচয়ের অভাব রহিয়া গিয়াছে। এই গল্প-উপন্যাস-প্লাবিত দেশে বিদেশী কথা সাহিত্যের অনুবাদেরও যে-অন্ততঃ সমাদরের ত্রুটি হইবে না, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। কিন্তু সে চেষ্টাই বা কতটুকু করা হইয়াছে? পক্ষান্তরে বাংলা সাহিত্যে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়সমূহ অবজ্ঞাতই হইয়া আসিতেছে। সম্বৎসরে ক্বচিৎ দুই-একখানি গ্রন্থ এ সম্বন্ধে প্রকাশিত হয় মাত্র,—তাও আবার অনেক ক্ষেত্রেই প্রামাণিক নয়। এ দেশে বাঙ্গালীর দর্শন-চর্চ্চা আজও উপনিষদ, গীতা, শঙ্কর, রামানুজের বেদান্ত-ভাষ্যের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে,—যা শুধু চর্ব্বিত চর্ব্বণেরই নামান্তর। মৌলিক রচনার সন্ধান আজও তেমনটি মিলে নাই। বহু কৃতী বাঙ্গালী মনীষী ভারতীয় দর্শনের বিপুলায়তন ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, অথবা ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁদের সবাই লিখিয়াছেন ইংরেজীতে। বাংলা সাহিত্যের তাতে লাভ হয় নাই। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের আমরা পাইয়াছি শুধু কবি অথবা কথাশিল্পীরূপে,—যা ছিল একান্ত অনাবশ্যক। অথচ এমনও নয় যে, এই গবেষক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বহুল সংস্কৃতিপরায়ণ বাংলায় উচ্চতর বিষয়ের পাঠকের অভাব একান্তরূপেই রহিয়া গিয়াছে। বাংলা ভাষায় ঐ শ্রেণীর উপযুক্ত গ্রন্থের অপ্রাচুর্য্যের জন্যই তাঁদেরে ইংরেজী সাহিত্যের দ্বারে ভিখারীর মত প্রতিনিয়ত হাত পাতিতে হয়। গৌণ-ভাবে ভাষার দিক দিয়াও বাংলা সাহিত্যের ইহাতে সমূহ ক্ষতি,—কারণ সুকুমার সাহিত্য ব্যতীত সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ উপবিভাগগুলি অবহেলিত হইতেছে বলিয়াই বাংলা ভাষায় পারিভাষিক শব্দের দৈন্য রহিয়া গিয়াছে, বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাও অদ্যাপি একটা উন্নত সাহিত্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কথাটা যে কতখানি সত্য তা বিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, বা দর্শন সম্পর্কীয় প্রবন্ধ লেখক মাত্রেই অবগত আছেন। গুরু সাহিত্যের পাঠকের অভাব দেশে বাস্তবিক যদি না-ই থাকে, তবে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই শ্রেণীর গ্রন্থের কাটতি কেন যে হইবে না, তার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই নাই।

আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র অর্থাগম ও ব্যবসায়ের প্রসারের চেষ্টার দিক দিয়াও এই দিকটা আজও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, যার প্রতি লেখক ও প্রকাশক উভয়েরই দৃষ্টি অচিরেই আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ সম্পর্কে প্রকাশকগণের বিশেষ একটা দায়িত্ব আছে। পাঠকসাধারণের চাহিদা ও রুচির রসদ জোগান দিতে গিয়া তাঁদের শুধু লঘু'সাহিত্যেরই কারবার করিতে হয়,—জানি। কিন্তু পাঠকের এই রুচির ও চাহিদার বিবর্ত্তনের ভারও কতকটা তাঁদের উপরেই ন্যস্ত। অন্ততঃ ব্যবসা বিস্তারের খাতিরেও তাঁদের নিত্য নূতন বিষয়ের পাঠক সৃষ্টির ও পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস পাওয়া আবশ্যক। পরোক্ষভাবে এইরূপে প্রকাশকসম্প্রদায় সাহিত্য-সৃষ্টির ও সাহিত্যের প্রসারেরই সহায়ক। সাহিত্য আজও আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিলাভ করে নাই, কারণ একমাত্র সুকুমার সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই সাহিত্যের উন্নতির সীমারেখা নিবদ্ধ নয়। দেশের লেখক তথা প্রকাশকসম্প্রদায় যদি মনে করিয়া থাকেন যে, কেবল রস-সৃষ্টির দ্বারাই অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত বা দিন গুজরানের সুরাহা হইবে, তবে তা নিতান্ত ভুল; কারণ বেশীর ভাগ মানুষই নীরস। তাদের কেহ চায় শুষ্ক জ্ঞান, কেহ বা ফলিত বুদ্ধি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, পাঠকের বেশীর ভাগই লঘু সাহিত্যের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে নারাজ, যদিও আকর্ষণ তাঁদের এর প্রতিই ষোল আনা। এ সব বই তাঁরা সাধারণতঃ পড়েন গ্রন্থাগারে অথবা বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে ধার করিয়া। কিন্তু সংগ্রহ করিবার বেলায় শুধু স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী উচ্চতর বিষয়ক পুস্তকের দিকেই তাঁদের ঝোঁক। তাই মনে হয়, বর্ত্তমান এই হতাশা ব্যঞ্জক অবস্থার মধ্যেও সাহিত্যিক তথা প্রকাশকের আয়ের অনেক কিছু পথই অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। তথাপি কৃতি ও প্রতিভাবান লেখকগণ কেন যে ইহারই দ্বারা লাভবান হইবেন না,—এবং প্রকাশকগণও যে কেন তাঁদের আবশ্যক ক্ষেত্রে ইহার যোগ্য পারিশ্রমিক দিতে কসুর করিবেন তা ধরা শক্ত।

পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির উপরই যদি বইয়ের কাটতি নির্ভর করে এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখকের অর্থোপার্জ্জনের পথ সুপরিসর হয় তবে এই পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির অন্য একটা উপায়ও আছে যা আন্দোলন সাপেক্ষ। সম্প্রতি বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্রীয় ভাষা করিবার সপক্ষে একটা আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। উর্দ্দু ও হিন্দী সম্পর্কেও এইরূপ আন্দোলন চলিতেছে। এ সব আন্দোলন যে কতখানি সফল হইবে,—অথবা সর্ব্বভাষার সংমিশ্রণে রচিত হিন্দুস্থানীর মত কোন ভাষাই কালে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গৃহীত হইবে কি না,—সে সব অবশ্য ভবিষ্যতের কথা। ভাষা বিশেষ উন্নত অথবা ভাবপ্রকাশের অধিকতর উপযোগী হইলেই যে প্রতিযোগিতায় সর্ব্ববাদীসম্মত জাতীয় ভাষা রূপে পরিগণিত হইবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ, ইহার মধ্যে প্রাদেশিক আত্মাভিমান বা কলহ-বিদ্বেষের একটা স্থান রহিয়া গিয়াছে, যার জের কাটাইয়া উঠা শক্ত। কিন্তু ভাষার ও সাহিত্যের প্রসারকল্পে ভারতের অপরাপর উন্নতিশীল সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের একটা যোগসূত্র স্থাপন বাঞ্ছনীয় এবং ব্যাপারটাও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। বাংলা সাহিত্যের হিতকামী সুধীসমাজের সর্ব্বপ্রথম ইহার প্রতিই লক্ষ্য রাখা সমীচীন। বাংলা সাহিত্যের ন্যায় উর্দ্দু ও হিন্দী সাহিত্যও শক্তিমান্ ও প্রগতিশীল। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন ভাষায় উন্নতিশীল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এদের সবারই নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যার পারস্পরিক আদান-প্রদানে সমগ্র ভারতেরই সংস্কৃতিমূলক একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। এজন্য প্রয়োজন সম্মিলিত সাহিত্য-সম্মেলনের ও সভাসমিতির অনুষ্ঠানের। প্রগতি লেখক সংঘের মধ্যে এমনি একটা প্রচেষ্টা কিছুকাল পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পরোক্ষভাবে ইহাতে লাভ এই যে, এই সংযোগসূত্রের ও ভাব বিনিময়ের ফলে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থের অনুবাদের দিকে প্রত্যেক দেশের লেখকসমাজেরই একটা আগ্রহ জন্মিতে পারে, যা সে সব সাহিত্যকে যে শুধু সমৃদ্ধই করিয়া তুলিবে এমন নয়, সাহিত্যোপজীবীদের আর্থিক সমস্যারও কতকটা সমাধান তাতে সম্ভবপর হইবে। সম্প্রতি বাংলা ভাষার প্রসারের সপক্ষে যে আন্দোলন সূচিত হইয়াছে, তার উদ্যোক্তাগণের এদিকে অবহিত হইবার বিশেষই প্রয়োজন রহিয়াছে।

এ সম্পর্কে আরও একটি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান। আজ যদি দেশের শক্তিমান ও উন্নতিশীল সাহিত্যের ভাষার অন্ততঃ দু'টিরও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রবর্ত্তিত হয়, জাতির সংস্কৃতিমূলক ঐক্যের দিক দিয়া তবে উহা যেমনি কার্য্যকরী হইবে, সাহিত্যের ও ভাষার প্রসারের দিক্ দিয়াও তেমনি উহা হইবে সার্থক ও ফলপ্রসূ। প্রাদেশিক ঐক্যই যদি দেশের কাম্য হয়, তবে উহা সম্ভবপর একমাত্র সংস্কৃতিমূলক ঐক্যের সংযোগেই। এই সংস্কৃতিমূলক ঐক্য নির্ভর করে, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কীয় জ্ঞান ও ধারণার উপর কারণ, তদ্ব্যতিরেকে একের অন্যকে বুঝিবার উপায় বড় একটা নাই! এই হিসাবে ভারতীয় উন্নতিশীল ভাষা ও সাহিত্যের বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সবিশেষই আছে। এই উপায়ে যদি কোন দিন পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেশে বাস্তবিকই সংঘটিত হয়, তাহা হইলে অর্থের দিক দিয়াও বাংলা তথা অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যিক সমাজ কালে যে অল্পবিস্তর লাভবান হইতে পারিবেন, এমন আশা করা অসঙ্গত হইবে না।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বাংলা সাহিত্যকে একমাত্র উপজীবিকারূপে অবলম্বন করিবার পথে বাধা আজও বিস্তরই রহিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহারই মধ্যে সমস্যাটির আংশিক সমাধান সাধ্যেরও যে অতীত তাও নয়। বাংলা সাহিত্যের অর্থগত কোন মূল্যই নাই, এ হা-হুতাশ অরণ্য-রোদনেই শুধু পর্য্যবসিত হইবে যতদিন তার বাজার-দর বৃদ্ধির প্রত্যেকটি পন্থা সম্পর্কেই পরীক্ষামূলক একটা ঐকান্তিক উদ্যম দেশে সূচিত না হয়। এ বিষয়ে লেখক, প্রকাশক, সাহিত্যামোদী ও বিদ্বৎসমাজ সকলেরই একটা কর্ত্তব্য রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তারই কিছুটা ইঙ্গিত আমরা প্রদান করিলাম মাত্র।

বর্ষারাতে

ডাঃ শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, এম-বি

আজি এ শ্রাবণ নিশি-কাটিবে কি এমনি বৃথায়?
নিদ্রাহারা প্রহরের অবিরাম নিঃশব্দ সঞ্চারে,
শ্রান্তিহারা ধারাধ্বনি-শব্দিত এ বিজন সন্ধ্যায়
তোমারি ও স্বপ্নচ্ছবি দৃষ্টিপথে ভাসে বারে বারে।

পাংশু হ'ল মেঘবক্ষে জ্বলে যেই দিগন্ত-শায়িনী
মৃদু আভা! ঘনাইল অন্তহীন সুনিবিড় কালো।
উন্মত্ত বাতাসে কাঁদে উপেক্ষিতা কোন্ বিরহিণী!
বিচ্ছুরিছে দূর শূন্যে বুঝি তার কঙ্কণের আলো।

একান্ত নিঃসঙ্গ এই সুবিস্তীর্ণ মনের প্রান্তর
পড়ে আছে জনহীন, শব্দহীন, গতিহীন একা!
এরি মাঝে যদি ওর পরিপূর্ণ, সঙ্গীত-মুখর,
অভাবিত আবির্ভাবখানি দেয় সচকিত দেখা—

এখানেও উন্মুখর বর্ষাধারা নামিবে তাহ'লে
ধ্বনিবে জীবন-বেদী অবিরত অশ্রান্ত কল্লোলে!

ভীরু

(গল্প)

শ্রীসুহাসিনী দেবী

নাস্তিক হলেও সে ভীরু। কারণে অকারণে সে চমকে ওঠে, অন্ধকার পথে চল্‌তে বুক কাঁপে, ছায়াময়ী বিভীষিকা যেন ঘিরে আছে তার চার দিক। তবে সবাই জানে, লোকটি মানুষ ভাল। সুখ্যাতি এবং সুদূরপ্রসারী কাজ যাদের আছে এমনি একটা ফার্ম্মের একটা উচ্চ পদেই সে প্রতিষ্ঠিত। সারা মাস দশটা-নয়টা নিয়মিত কাজ করে আর পরের মাসে সাত থেকে সাতাশ তারিখের মধ্যে যেদিন বেতন পায় সেদিনও তেমনি ভাবলেশহীন মুখে আঠার টাকা পনের আনা পকেটে নিয়ে ঘরে ফিরে। সুবিখ্যাত ফার্ম্ম, সুদূরপ্রসারী কাজ কারবার—তারই একটা যথাসম্ভব উচ্চপদ। লোকে মনে করে বেতন হয়ত খুবই বেশী। কারণ লোককে তো আর তা জানতে দেওয়া হয় না। পঁচিশ টাকা তার মাসিক প্রাপ্য। তার মধ্যে থেকে এক আনা দিতে হয় রেভিনিউ ষ্টাম্পের জন্যে, এক টাকা দিতে হয় ম্যানেজিং ডাইরেক্‌টারের প্রতিষ্ঠিত 'দেশ কল্যাণ' ফণ্ডে, আর পাঁচ টাকার শেয়ার প্রতি মাসে কিন্‌তেই হয়,—নইলে চাকুরী থাকে না।

এক কালে সে ছিল উদীয়মান্ সাহিত্যিকদের মধ্যে নাম করা সহিত্যিক—গল্পে ও প্রবন্ধে তার সমান হাত ছিল। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে সে-সব ভুলে গেছে। যেটুকু ক্ষমতা এখনও আছে, তা সে চেপে রাখে, নইলে যে-আগুন ছুটবে লেখনীর মুখে তাতে সে নিজেই পুড়ে মরবে।

আফিসের আর একটি সহকর্ম্মীর সাথে মিলে বস্তীতে একটা গোটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। তাতে দুটো খণ্ড—বুর্জোয়া ভাষায় যাকে বলে ফ্ল্যাট বা স্যুট। অর্থাৎ মাঝখানে একটা মাটিলেপা চাটাই-এর ব্যবধান। একটাতে থাকে তার বন্ধু স্ত্রী আর শিশু-কন্যা নিয়ে। অন্যটাতে সে একাই থাকে। একার পক্ষে ভাড়া বেশী, তবু সে থাকে, বিলাসিতার জন্যে নয়, বিস্মৃত দিনের স্মৃতির মায়ায়। এই ঘরেই তার বৃদ্ধা মাতা অনাহারে শুকিয়ে শুকিয়ে মরেছে, এই ঘরেই তার স্ত্রী বস্ত্রাভাবের লজ্জা ঢাকৃতে গিয়ে আত্মহত্যার কলঙ্ককে বরণ করেছে, এই ঘরেই তার শিশুপুত্র অনাহারে, অচিকিৎসায়, অনাদরে মৃত্যুপথের যাত্রী হয়েছে।

পাশের ঘরের বন্ধুটির মাসিক আয় চৌদ্দ টাকা। দুর্দ্দশা যে চরমে উঠেছে, তা সে আন্দাজ করতে পারে। অনেক কিছু সে দেখে, অনেক কথা শুনে, কাজেই নিছক আন্দাজের উপর নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু উপায় কি? দানের সামর্থ্য তারই বা কতটুকু।

* * *

বর্ষাকাল। কি একটা উপলক্ষে আফিস সেদিন ছুটি। সকালবেলায় বেরিয়ে যাবার সময় প্রতিবেশী বন্ধুকে জানিয়ে গেল, রাত্রে আর সে ফিরবে না, নগরসীমান্তে অন্য এক বন্ধুর বাড়ীতে রোগী-শুশ্রূষায় যাচ্ছে। গিয়ে দেখল, শুশ্রূষার প্রয়োজন মিটে গেছে। কাজেই রাত্রে আর থাকতে হ'ল না, ফিরে আসে। দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে আসা—সময় লাগে। কাজও ছিল না কিছু। রাস্তায় জিপসী নৃত্য থেকে আরম্ভ ক'রে পার্কে রক্ত-পতাকার সমারোহ সব কিছু দেখে ধীরে ধীরে যখন সে ঘরে ফিরল তখন রাত্রি বারটা। সারা বস্তী নিঝুম। বাতি জালিয়ে রাত্রি জেগে থাকবার মত পয়সা বা সময় কারও নেই।

নীরবে সে ঘরে ঢুকল। অন্ধকার, নোংরা, কুৎসিত ঘর। রাত্রে যেন কারা ছায়ামূর্ত্তি ধরে নিঃশব্দে তাতে চলাফিরা করে। সে কিন্তু ভয় পায় না, জানে ওরা তার আপন জন—অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসার অভাবে যারা বন্ধন কাটিয়েছিল, এরা তারাই। নিঃশব্দ পদসঞ্চার সে যেন শুনতে পায়, বুঝে, চিন্‌তেও পারে। বৃদ্ধা জননীর

অনাহারক্লিষ্ট দেহের ভার বহনে অক্ষম পায়ের শব্দ, বিবস্ত্র-প্রায় পত্নীর সলজ্জ শঙ্কিত কঙ্কালসার পায়ের মৃদু আওয়াজ, আর ক্ষুধা-কাতর রুগ্ন শিশুর হামাগুড়ির একটানা শব্দ, সব সে চিনতে পারে।

নীরবে ঘরে ঢুকে সে ছেঁড়া কম্বলটার উপর শুয়ে পড়ল। মাছি, পিঁপড়া, ছারপোকা, আরশুলা, ইঁদুর নিরর্থক খাদ্য সন্ধানে বিব্রত। তার দেহ প্রায় রক্তলেশহীন, ভাণ্ডারও শূন্য। ঘুম আর তার আসে না। দু'চোখ মেলে অদৃশ্য সঞ্চারী মূর্ত্তিদের গতি লক্ষ্য করতে চেষ্টা করে। গীর্জ্জার ঘড়ীতে বাজে তিনটা। চেষ্টা করে তবু ঘুম আসে না।

হঠাৎ পাশের ঘরে মৃদু শব্দ শোনা যায়, আলোর একটা রেখা মাঝখানের বেড়ার ফাঁক দিয়ে এদিকেও আসে। ওঘরে স্বামী-স্ত্রী জেগেছে, ওদের কথা শোনা যায়, কিন্তু অর্থ বোঝা যায় না—যেন, ভীত, সন্ত্রস্ত। খানিক পরে কান্নার শব্দও কানে আসে। সব শুনে ভাবে, ওদের মেয়েটা হয়ত মারা গেছে—কয়েক দিন থেকে রক্ত বমি করছিল। উঠে দেখতে তার ইচ্ছা হয় না। বস্তীতে এগুলি নিতান্তই স্বাভাবিক, দৈনন্দিন ব্যাপার। তবু যেন কি এক অতীন্দ্রিয় শক্তির নির্দ্দেশে সে ওঠে। বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে চেষ্টা করে, সবটা দেখা যায় না। বন্ধুপত্নীকে দেখা যায়, ছেঁড়া একটা ন্যাকড়া পরা। তার লজ্জা করে না। ঐ অসহায়া, ক্ষীণ, রক্তহীন মেয়েটিকে দেখে লোভ হয় না। লোভ না হ'লে লজ্জা কী? আলোটা নিয়ে ওরা ফিরে দাঁড়ায়। এবার স্পষ্ট দেখা যায়। মেয়েটির কোটরগত চক্ষে অশ্রুর বান ডেকেছে যেন। পুরুষটি যেন পাথরের তৈরি—ধীর, স্থির, কিন্তু মূর্ত্তি তার বীভৎস।

দু'জনে নিঃশব্দে ঘুমন্ত মেয়েটিকে চুম্বন করল। কিন্তু একজনের চুম্বন দীর্ঘস্থায়ী—যেন তার শেষ নেই। পুরুষটি তাকে টেনে দূরে নিয়ে রাখল, বললো—শান্ত হও, প্রার্থনা কর মৃত্যুর পর যেন ওর আত্মার সদ্‌গতি হয়, দুঃখের তার সমাপ্তি হোক।

তার স্বর চাপা। যাকে বলা হয়েছে, সে যেন কিছুই শুনে নি—উন্মাদিনীর মত তার দৃষ্টি উদাসীন। পুরুষটি বলল—চোখ বুজে থাক।

এদিকে যে একজন দ্রষ্টা আছে, তা কেউ জানে না। দ্রষ্টাও ভাবছে ব্যাপার কি? পরমুহূর্ত্তেই পুরুষটি শিশু-কন্যার গলা টিপে ধরল, বিড়্-বিড়্ করে বলল—ভগবান্, ক্ষমা আমি চাই না, কিন্তু এই শিশুর আত্মাকে গ্রহণ কর তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে।

"খুন, খুন"—মেয়েটি চেঁচিয়ে লাফিয়ে এসে শিশু-কন্যাকে ছিনিয়ে নিল, এদিককার দ্রষ্টাও বেড়া ভেঙ্গে লাফিয়ে গিয়ে পড়ল ভিতরে। আর একজন আবির্ভূত হ'ল যেন ভূতের মত মাটির তলা থেকে, প্রতিবেশীরাও আসল।

তার পর থানা, পুলিশ, গুপ্তচর, অনেক। প্রধান সাক্ষী হ'ল সেই অখ্যাত আগন্তুকটি যে এসেছিল চুরি করতে, সিঁদও কেটেছিল। সেই পুলিশকে সবচেয়ে বেশী সংবাদ দিল। অবশ্য সব কথা সে শোনে নি, দেখতেও পায় নি কিছু। তবু তার সাক্ষ্যই হ'ল প্রধান। আসামী নিজে নির্ব্বাক, তার স্ত্রী সেই মুহূর্ত্ত থেকে সম্পূর্ণ উন্মাদ আর প্রতিবেশী বন্ধুটিও অজ্ঞতার ভান করল, যেন কিছুই জানে না।

বিচারের প্রহসন চলতে লাগল। সংবাদপত্রে সন্তান-হত্যার বীভৎস কাহিনী অতিরঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত হ'ল। কিন্তু সত্যি যে প্রধান সাক্ষী সে তখনও নির্ব্বাক। সে শুধু ভাবে, কেন লোকটা সন্তান হত্যা করল। পুলিশে, আর গুপ্তচরে তাকে চেপে ধরে, তবু সে কিছু বলে না—যেন সে বিশেষ কিছুই জানে না। তবু সে ভাবে, কেন এমন হ'ল।

অবশেষে এক দিন হাজতে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করল, চুপি চুপি জিজ্ঞাসাও করল সেই প্রশ্ন, কেন সে এমন করল।

বন্ধু একটু নীরব থেকে বলল—কেন, তা তুমি কি বুঝবে ভীরু, তোমাকে বুঝান কঠিন। না খেয়ে খেয়ে বুড়ো মা তোমার শুকিয়ে মরেছে। রোগ ও ক্ষুধাকে যে উপেক্ষা করে চলতো সেই সাধ্বী স্ত্রী তোমার আত্মহত্যা করেছে বস্ত্রাভাবে লজ্জাসম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হয়েছিল বলে। ফুলের মত শিশুটি তোমার নেংটী ইঁদুরের মত না খেয়ে মরেছে। তোমাকে বুঝান ভার।

বলতে বলতে লোকটা কাঁপতে লাগল রাগে নয়, যেন দুর্ব্বলতায় বা উত্তেজনায়। বলতে লাগল—তুমি ভীরু, ওদের হত্যা করতে সাহস কর নি। আমি তাকে একান্ত ভাবে ভালবাসতুম, তাই তাকে দুঃখের পৃথিবী থেকে মুক্তি দিয়েছি। সে সুখী হোক।

বলতে বলতে লোকটি আকাশের দিকে চেয়ে হাত যোড় ক'রে বিড়্-বিড়্ করে কি বলতে লাগল। পাগল একেবারে বদ্ধ পাগল। প্রধান সাক্ষী এবার নতশিরে বাইরে ফিরে এল।

পর দিন সে বিচার-গৃহে উপস্থিত হয়ে দর্শকদের মাঝে বসে রইল। পাগল আসামীকে আনা হল। লোকে মনে করল, ভাণ করছে। প্রধান সাক্ষীর কাপড় ধরে কে এক জন টানল। চেয়ে দেখে, সেণ্ট্ জন অরফেনেজের প্রধান কেরাণী আর পিয়ন। তাদের ডাকে সে বাইরে গেল। লটারীতে সে পেয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা, সেই খবর। টাকা পাবার কাগজটা সে ওদের হাত থেকে নিয়ে এল। পাশের একজনের হাত থেকে একটা কলম চেয়ে নিয়ে ভাবি রসিদটার পিছনে কি লিখল। তারপর সোজা বিচারকের সামনে হাজির হ'য়ে বলল—হুজুর, একটা সাক্ষী হতে হবে।

বিচারক ভাবলেন—আর এক একটা পাগল নাকি? কাগজটা বিচারকের সামনে সে বিছিয়ে দিল, বলল—আমি কিছু টাকা পেয়েছি— তা হাতে আসার আগেই দান করে দিচ্ছি। কোন দলীল করবার সময় হবে না, তাই 'এসাইন' করে দিচ্ছি।

বিচারক বলেন—কাজের সময় বাধা দেওয়া অন্যায়। যাক্, তবু একটা সংকাজ যখন, দাও দেখি।

কাগজটার উপর লেখা রয়েছে—"আমার প্রাপ্য এই পঞ্চাশ হাজার টাকা হইতে চল্লিশ হাজার টাকার আয় দ্বারা দরিদ্র পরিবারের বৃদ্ধ, শিশু ও মেয়েদের অন্ন-বস্ত্র ও পথ্যের যথাসম্ভব ব্যবস্থার ভার সেণ্ট্ জন অরফেনেজের কর্ত্তৃপক্ষের উপর প্রদত্ত হইল এবং অবশিষ্ট দশ হাজার টাকা…নং…রোডের শ্রীঅসিতরঞ্জন রায় ও তাঁহার পত্নীকে দান করা হইল। উক্ত প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে তাহারে উন্মাদ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা করার যাবতীয় ক্ষমতা সুবিখ্যাত বিচারক শ্রীযুক্ত…এর হস্তে সসম্মানে অর্পিত হইল।"

বিচারক নির্ব্বাক বিস্ময়ে সহি করিয়া বলিলেন—তোমায় প্রশংসা করি, কিন্তু আসামী অসিতরঞ্জন রায় কি মৃত্যুদণ্ড এড়িয়ে যেতে পারবে?

—হাঁা, হুজুর। কাগজটি আপনার হাতেই রইল। এবার আসামীর মুক্তির ব্যবস্থাও আমি করছি।

বিচারক ও দর্শকগণ তো অবাক।

তারপর ধীরে ধীরে সে যা ব'লে গেল, এমন ভাবে সে ঘটনার বর্ণনা করল যাতে নিঃসন্দেহে সকলের মনে হ'ল, সে-ই আসামীর শিশু মেয়েটিকে হত্যা করেছে। তবু বিচার চললো। শত্রুতা ও স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে সে শিশু হত্যা করেছে প্রমাণ হয়ে গেল। বিচারকের রায়ে তার হ'ল মৃত্যুদণ্ড।

পুলিশ যখন তাকে বেঁধে নিয়ে চলল কয়েদখানার দিকে, দর্শকবৃন্দ গালাগালি করতে লাগল, "বর্ব্বর, শিশুহন্তা, ভীরু।"

তার হাতকড়াতে আর একজন বাঁধা ছিল, সে স্বভাবদুর্ব্বৃত্ত, ডজনখানেক খুন করে ধরা পড়েছে। সে-ও তার মুখে থুতু দিয়ে বিদ্রূপ করে বলল—ভীরু, কাপুরুষ, একটা খুন করেই এমন! এত বিবেকের ভয়! ডজনখানেক খুন করেছি, কিন্তু একটাও স্বীকার করিনি। দায় পড়েছে যাদের তারাই প্রমাণ করেছে।

বলে ওর মুখের উপর আরও খানিকটা থুতু ছড়িয়ে দিয়ে বিদ্রূপ করল— ভীরু, এক নম্বর ভীরু!

আলো-ছায়া

শ্রীমুরারিমোহন রায়

ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রণ সভ্য জগতের মানুষের জীবনে যে কতখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহা আজ আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক হয় না। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ যত কিছু বিস্ময়কর আবিষ্কার করিয়াছে আলোকচিত্রণ তাহাদের অন্যতম। বর্ত্তমান সময়ে ইহার এত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে যে, উহাকে এ যুগের সপ্তাশ্চার্য্যের মধ্যে অনায়াসেই গণ্য করা যাইতে পারে।

গৃহ-প্রাচীরে প্রদীপের ছায়া লইয়া প্রথম যে খেলা সুরু হইয়াছিল, আজ সেই নগণ্য ব্যাপার কি বিরাট্ আকারে পরিণত হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। আজ সমস্ত জগতে প্রতি দেশের রাজনীতিক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত সাধারণ জীবনযাত্রার ব্যাপারের মধ্যে পর্য্যন্ত এই আলোকচিত্রণ এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তাহাকে বাদ দিয়া এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আজ যে সিনেমা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমোদ-প্রমোদে পরিণত হইয়াছে তাহাও এই আলোকচিত্রণের সুউন্নত ও সুসম্পন্ন পরিণতিরই ফলস্বরূপ।

আলোকের ছবি আঁকাকেই বলা যায় আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফি। বস্তুতঃ কোন পদার্থেরই ছবি আঁকা যায় না। পদার্থের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় আলো ও ছায়ার দ্বারা। শুধু আলো বা শুধু ছায়ার দ্বারা কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মূল সূত্রের উপরেই চিত্র-কার্য্যের প্রায় সম্পূর্ণটাই নির্ভর করে।

ঘরের সাদা দেওয়ালের উপর একটি কালো ছাতা ঝুলান আছে। কালো কাপড়ের পরদাগুলি সমস্তই আমরা দেখিতে পাই। তাহার কারণ ঐ কালো কাপড়ের উপর আলো পতিত হইয়া উহার প্রত্যেক ভাঁজকে আরও গভীর কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে এবং এক পরদার সহিত আর এক পরদার পার্থক্য সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। তাহা না হইলে শুধু একাকার কালোই দেখা যাইত, ছাতার বিভিন্ন পরদা দেখা যাইত না। এখন ঐ ছাতার উপর আলো ও ছায়া যে-ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে অর্থাৎ কোথায়ও কম, কোথায়ও বেশী, কোথায়ও বা মাঝারি ইত্যাদি—উহা যদি সমতলক্ষেত্রের উপর রং-এর সাহায্যে ঠিক ভাবে সন্নিবেশিত করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত ছাতা না থাকিলেও মনে হইবে একটা ছাতা ঝুলিতেছে। এই প্রকারে জগতের সমস্ত বস্তুর, এমন কি পৃথিবীটার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় আলো ও ছায়ার দ্বারা। এই আলো ও ছায়াকে বিভিন্ন প্রকারে সন্নিবেশিত করিলে বিভিন্ন প্রকার পদার্থের ছবি তৈয়ার হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে চিত্রকার্য্য হইতেছে পদার্থের বিভিন্ন অংশে আলো ও ছায়ার প্রতিফলিত অবস্থার ছবি আঁকা। কেহ তাহা করেন সাদা কাগজের উপর কালো পেন্‌সিল দ্বারা, কেহ করেন ক্যানভাসের উপর বা দেয়ালের উপর অথবা যে-কোন সমতলক্ষেত্রের উপর বহুবিধ রং-এর দ্বারা, আর কেহ করেন সরাসরি সূর্য্য অথবা বাতির আলোক দ্বারা। এই শেষোক্ত প্রথাটিই সব চেয়ে সুবিধাজনক। উহাই নিখুঁৎ স্বাভাবিক ছবি তৈয়ারী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, যাহা পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য প্রথাগুলিকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া বিজয় গর্ব্বে উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং পশ্চাতস্থিত বর্ণচিত্রেরও বিপুল সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিয়া দিয়াছে। অথচ ইহাই আবিষ্কৃত হইয়াছে সর্ব্বশেষে।

কে সর্ব্বপ্রথম এই কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে এক কথায় তাহার সদুত্তর দেওয়া যায় না। কারণ, বহু বৈজ্ঞানিকের বহুকালের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া ইহা সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে। তবে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সর্ব্ব-

প্রথম ইহার বিষয় চিন্তা এবং ইহার দ্বার উন্মোচন করিয়াছিলেন চিত্র-জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণই। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে এরূপ ধারণার অসত্যতাই প্রমাণিত হইবে। পদার্থ ও রসায়নবিদ্‌গণই ইহার প্রথম সোপান গঠন করিয়াছেন, তাহার পর সেই সূত্র ধরিয়া শিল্পীদের সহযোগিতায় ও বৈজ্ঞানিকগণের যন্ত্র-নির্মাণ কৌশলে ইহা বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পৃথিবীর সকল নূতন আবিষ্কৃত বস্তুর ন্যায় ইহাও একজনের দ্বারা সংসাধিত হয় নাই। সকল নূতন আবিষ্কারেই একজন হয়ত পথ দেখান, কিন্তু পরবর্ত্তিগণ তাহা অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের চিন্তা ও সৃজনী শক্তির সাহায্যে তাহাকে উন্নত হইতে উন্নততর করিয়া তোলেন।

প্রকৃত আলোকচিত্রণ কৌশল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ইউরোপের নিয়প্স ও ডগার সাহেব (Mr. Nyops & Mr. Dauger) ইহার বিশেষ বিশেষ ও প্রধান অংশগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাহারও বহুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইটালীর বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ পোর্টো (porto) এ বিষয়ে প্রথম গবেষণা করেন এবং তাঁহাকেই এই বিরাট আবিষ্কারের দ্বারোদ্‌ঘাটনকারী বলা যায়। কি করিয়া অত্যন্ত নগণ্য ব্যাপার হইতে তিনি মহান চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন তাহার একটি কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী আছে।

কোন কাজে পোর্টো (porto) দুপুর বেলায় কোন এক স্থানে যাইতেছিলেন। প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য তিনি একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করিলেন। বৃক্ষের বহু দূর ব্যাপ্ত স্নিগ্ধ ছায়ায় শীঘ্রই তাঁহার ক্লান্তি দূর হইল। তখন সামান্য একটা ঘটনার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন যে, বৃক্ষের বহুবিস্তৃত ছায়ার মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দু (light spots) পতিত হইয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া আলোকবিন্দুগুলি দুলিতেছে, কোনটা বা নিভিয়া গিয়া পুনরায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। বৃক্ষপত্রের ফাঁকে ফাঁকে নিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মির (pencil of rays) দ্বারাই ঐ সকল আলোকবিন্দু সংগঠিত হইয়াছিল এবং বাতাসের দোলায় যখন পাতাগুলি নড়িতেছিল, আলোকবিন্দুগুলিও তখন দুলিতেছিল বা নিভিতেছিল। এই দৃশ্যে পোর্টোর গবেষণার স্বাভাবিক ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিয়া তিনি নানারূপ পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। একটি গৃহের সকল দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দরজায় অঙ্গুলিপ্রমাণ একটি ছিদ্র করিলেন এবং উক্ত ছিদ্রের সম্মুখে বাহিরের দিকে একটি প্রদীপ রাখিলেন। গৃহের মধ্যে ছিদ্রের সম্মুখে খানিকটা দূরে একখানা সাদা কাপড় ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। দেখা গেল, উক্ত সাদা কাপড়ের উপর দীপশিখাটির প্রতিচ্ছবি ঠিক উল্টা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর তিনি সেই দীপের সম্মুখে বিভিন্ন বস্তু ধরিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, কাপড়ের উপর সকল বস্তুরই প্রতিচ্ছবি উল্টা হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ সকল প্রতিচ্ছবি তত সুস্পষ্ট হয় না দেখিয়া বহু পরীক্ষার পর তিনি ঐ ছিদ্রপথে একখানা আতসি কাচ (convex glass) আঁটিয়া দিলেন। তখন দেখা গেল, সমস্ত বস্তুর ছায়াই সুস্পষ্ট ভাবে কাপড়ের উপর পতিত হইয়াছে। এই পরীক্ষা হইতেই ক্যামেরার (camera) উদ্ভব হইল। উপরোক্ত রূপে প্রতিচ্ছবি পাইতে হইলে অন্ধকার গৃহ (dark chamber) দরকার। ঐ 'কামরা' কথা থেকেই 'ক্যামেরা' নামের উৎপত্তি। পোর্টো তাঁহার এই কৌশল তৎকালীন সকল চিত্রশিল্পীদের দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও এই কৌশল অবলম্বন করিয়াই অভীপ্সিত জিনিষের ছবি সহজেই অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইলেন।

ঠিক এই সময়ে ফ্রান্সের একজন রসায়নবিদ্ (chemist) যবক্ষারায়িত রৌপ্য (nitrate of silver) নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার পোর্টোর আবিষ্কারের সহিত সংযুক্ত হইয়া আলোকচিত্রকে প্রকৃত জীবন দান করিয়াছে। তিন ভাগ রৌপ্য, এক ভাগ যবক্ষার দ্রাবক ও পাঁচ ভাগ জল দিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা দেখিতে অনেকটা শুভ্র দানাদার পদার্থের ন্যায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার উপর আলো পড়িলে ক্রমে ইহা কালো হইয়া যায়। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে সুইজারলণ্ডের অধ্যাপক চার্লস্ (prof. Charls)

ক্যামেরার সহিত এই পদার্থের সন্নিবেশ সাধন করিয়া পরীক্ষা করেন। তিনি একখানা কাগজে উক্ত আরক (acid) মাখাইয়া অন্ধকার কামরার অথবা ক্যামেরার ছিদ্রের সম্মুখে আবদ্ধ করিয়া একজন মানুষের শুধু মাথাটুকু ছিদ্রের বাহিরে স্থাপন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, মাথাটির ছায়া যতটুকু জায়গায় পড়িয়াছিল তাহা ছাড়া চারিদিকের সমস্তটাই কালো হইয়া গিয়াছে এবং মাথার প্রতিকৃতি সাদা অবস্থায় কাগজের উপর পড়িয়াছে। কিন্তু এই ছবি বাহিরে আলোয় আনা যাইত না, কারণ বাহিরের আলোকে তাহা কালো হইয়া নষ্ট হইয়া যাইত। ইংলণ্ডের পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ ওয়েজউড (Wedgwood), স্যার হামফ্রী ডেভি (Sir Humphry Davy) প্রভৃতি তৎকালীন বৈজ্ঞানিকগণও উপরোক্ত রৌপ্য আরকের পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই ছবি স্থায়ী করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা চলিতে থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্যারিসের (Paris) মহামতি ডগার (Dauger) ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক ও চিত্রশিল্পী। তিনিও পূর্ব্বোক্ত আলোক-চিত্রকে স্থায়ী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। একদিন কোন এক চশমার দোকানে উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় এক জন লোক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি আলোকচিত্রকে স্থায়ী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানা আলোকচিত্র ও এক শিশি কালো এক প্রকার আরক বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া পরীক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। ডগার দেখিলেন, সত্যই চিত্র স্থায়ী হইয়াছে। কিন্তু এই কৃষ্ণবর্ণ আরকটি কি তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সে লোকটিকে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর পাওয়া গেল না। তাহার পর ডগারের সহিত এম. নিয়প্স-এর (M. Nyops) পরিচয় হয়। ইনিও একই বিষয়ের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তখন হইতে উভয়ের একত্রিত চেষ্টায় একদিন তাঁহারা ঈপ্সিত কার্য্যে সফল হইলেন এবং প্রায় বিশ বৎসরের চেষ্টায় নিয়প্স বিটুমেন (bitumen) নামক খনিজ পদার্থের আস্তরণের উপর চিত্র তুলিবার প্রথা প্রচার করেন। ইহার নামকরণ করা হয় হেলিওগ্রাফি (Heliography)। নিয়প্সের মৃত্যুর পর ডগার আর এক নূতন প্রথা প্রচার করেন, ইহার নাম ডগারোটাইপ (Daugerreotype)। কাচের প্লেটের উপর রৌপ্য আরক মাখাইয়া ক্যামেরার মধ্যে ছবি তুলিয়া তাহা পারদের রাসায়নিক মিশ্রণের সাহায্যে প্রস্তুত ও স্থায়ী করা হইত। ডগার তাহার চিত্র স্থায়ী করিয়াছিলেন লবণের জল ও পটাস্ ব্রোমাইডের সাহায্যে। তাহার পর সার জন হারসেলি (Sir John Herseli) পরীক্ষিত হাইপোসাল্‌ফেট অব সোডা ব্যবহার করিয়া অপেক্ষাকৃত সুফল লাভ করেন।

এই সময়ে ফক্স টেবলট (Fox Teblot) কাগজের উপর চিত্র ছাপিবার প্রথা উদ্ভাবন করেন। এই চিত্র গ্যালিক এসিড ও নাইট্রেট অব সিলভারের দ্বারা পরিস্ফুটিত হইত। পরে মেজর রাসেল (Major Russel) প্রভৃতি আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক শুষ্ক প্লেটে (dry plate) ছবি তুলিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ডাঃ আর, এল ম্যাডক্স (Dr. R. L. Madoox) জেলিটিনের সাহায্যে প্লেট প্রস্তুত করেন। ইহা ইতিপূর্ব্বের সকল প্রকার প্লেটের চেয়ে উৎকৃষ্ট হয় এবং বর্ত্তমান সময়েও ইহার ব্যবহার অনেক পরিমাণেই চলিতেছে। তাহার পর বহুদিনের উন্নতির ফলে আরও অনেক প্রকার প্লেট এবং ফিলিম তৈয়ারী হইয়াছে যাহার সাহায্যে এখন ফটো তোলা খুবই সহজ হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে বহু শিল্প ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া ক্রমেই ইহার উন্নতিকে দ্রুত ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

এই প্রকারে আলোকচিত্রণ বহুকাল ধরিয়া বহু লোকের চিন্তা ও চেষ্টার সংযোগে ক্রমে উন্নতির পথে চলিয়া সর্ব্বদিক হইতেই উৎকর্ষতা (perfection) লাভ করিয়াছে। কিন্তু তখনকার দিনে একখানি ফটো তুলিতে বহু সময় লাগিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে হেলিওগ্রাফি প্রথায় যে সকল ছবি তোলা হইত তাহাতে একখানা ছবি তুলিতে প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা সময় লাগিত। ডগারোটাইপে

আধঘণ্টা এবং ফলোটাইপে ৩।৪ মিনিট লাগিত। পরে ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ফলোভিয়ন প্লেটে ১০ সেকেণ্ডে, কলোভিয়ন ড্রাই প্লেটে ১ সেকেণ্ডে এবং বর্ত্তমান ড্রাই প্লেটেও এক সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগে না। সিনেমা প্রভৃতিতে এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেও ছবি তোলা সম্ভব হইয়াছে। তবে আলোকের তারতম্য অনুসারে সময় কম বেশী লাগিয়া থাকে।

এবার ক্যামেরার মধ্যে প্লেট অথবা ফিলিমের গায়ে কি করিয়া বস্তুর সমস্ত খুঁটিনাটি—নাক, মুখ, চোখ, এমন কি শরীরের কোন ক্ষতচিহ্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া যায় তাহার কথাই বলিব। পোর্টো যে প্রথায় অন্ধকার গৃহের মধ্যে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি ফেলিতেন, উহা ছিল সম্পূর্ণ কালো ছায়া মাত্র—ছায়া-কায়া (Silhoutte figure)। উহাতে বস্তুর পিছন দিককার আলোই ব্যবহৃত হইত; যে আলো মণিমুকুরের (lense) ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া ভিতরস্থ পরদা বা প্লেটের উপর পড়িত। ইহাতে নাক-মুখ-চোখ প্রভৃতি, ছবির গভীরতা (depth) বা অন্য কিছুই বোঝা যাইত না। অবশেষে কি করিয়া তাহা সম্ভব হইল তাহা আর একটি বিষয় বলিলে অনেকটা পরিষ্কার হইবে।

ক্যামেরাকে কৃত্রিম চোখ (artificial eye) বলা যাইতে পারে। ঠিক যেমন কৃত্রিম কান হইল রেডিও। এখন এই কৃত্রিম চোখের দৃষ্টিপ্রণালী হুবহু আমাদের স্বাভাবিক চোখের দৃষ্টিরই মত। আমরা বস্তু সকল দেখিতে পাই আলোর সাহায্যে, কিন্তু শুধু তাহাই নহে। যে সকল বস্তুর ভিতর দিয়া আলোক সম্পূর্ণরূপে প্রবাহিত হইতে পারে সে সকল বস্তু আমরা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই সেই সকল বস্তু যাহাতে আলো প্রতিহত হয়। সেই প্রতিহত আলোক যখন আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে তখনই সেই বস্তুটির অবয়ব দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে কোন জিনিষকে ঠিক তাহার প্রকৃত স্বরূপে (as it is) আমরা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই উহা হইতে প্রতিহত আলোকরশ্মির ছবিমাত্র। দৃষ্টি-বিজ্ঞানের এই তথ্যটুকু ক্যামেরায় আরোপ করিলেই ছবি উঠার কারণ বোঝা যাইবে।

প্রাণীবর্গের চোখের মধ্যে যে ফিলিম নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা কি উপাদানে প্রস্তুত তাহা আজও মানুষের জ্ঞানের বাহিরে। তাহাতে একবার কোন বস্তুর ছবি পতিত হইলেই তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় না, বা তাহার উপর ছবি উঠিতে অধিক সময়ের আবশ্যক হয় না। তাহাতে কোন রাসায়নিক পদার্থ মাখানো আছে কি না অথবা প্রত্যেকবার দেখার সঙ্গে সঙ্গে ফিলিম সরিয়া সরিয়া যাইতেছে কি না তাহাও বলা যায় না। অথচ প্রতি সেকেণ্ডে কত শত ছবি ঐ একই স্থানে উঠিতেছে, মুছিতেছে, আবার উঠিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বেগবান কোন যানে চড়িয়া যাইবার সময় বাহিরের দৃশ্যের উপর দিয়া যখন আমাদের চোখ দুটি বুলাইয়া চলিয়া যাইতে থাকি তখন সেই দৃশ্যের সমস্ত ছবি আমাদের চোখের ফিলিমে উদয় হইয়া আবার পরমুহূর্ত্তে মুছিয়া গিয়া পরবর্ত্তী দৃশ্যের ছবি উত্তোলনের জন্য খালি হইয়া যায়। এই চক্ষু-ক্যামেরার এত শক্তি যে সে আমাদের কল্পনাকেও চিত্ররূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম নয়। মানুষ এই শক্তিকেও কলে আবদ্ধ করিয়া আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং ফরাসী পণ্ডিত বরদোঁ (Bordoan) মানুষের চিন্তাস্রোতেরও ছবি তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাই একদিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে ভগবদ্দত্ত চক্ষু-ক্যামেরার শক্তি অপেক্ষা মনুষ্য-সৃষ্ট ক্যামেরার শক্তি অনেক বেশী হইয়াছে। তাহার কারণ [illegible]-চক্ষুর তারার যে শক্তি, ক্যামেরার মণিমুকুরের শক্তি তাহা অপেক্ষা বেশী করিয়াই তৈয়ারী করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া মানুষের দৃষ্টিশক্তি তাহার মনের অবস্থার সহিত নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকায় মনোযোগিতার তারতম্য অনুসারে দৃষ্টিশক্তিও কমে বাড়ে। কিন্তু ক্যামেরা কল-চালিত। যতটুকু যে ভাবে কার্য্যের উপযোগী করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে আপনা হইতেই তাহা হইবে, কোন তারতম্য হইবে না। তাই মানুষের চোখের সামনেও 'চোখে ধূলা দিয়া' কোন কিছু গোপন করিতে পারা অসম্ভব না হইলেও ক্যামেরার সুতীব্র সদা সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে।

ক্যামেরার মধ্যে যে প্লেট অথবা ফিলিম থাকে তাহা

মানবচক্ষুর ফিলিমের মত চির নূতন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ব্যবহারোপযোগী না হইলেও তাহার উপর এরূপ রাসায়নিক পদার্থের স্তর থাকে যাহার উপর আলোকের সামান্য স্পর্শ লাগিলেই তাহা কালো হইয়া যাইবে। তাই ক্যামেরার মণিমুকুরের সম্মুখস্থ ফোকাসের (focus) সীমার মধ্যে যে কোন বস্তু থাকুক, তাহার প্রতি বিন্দু হইতে প্রতিহত বিভিন্ন প্রাখর্য্যের আলো উচ্চ-নিম্ন তারতম্যানুসারে ক্যামেরার মধ্যস্থ ফিলিমের গায়ে পতিত হইয়া সেখানে সেইরূপ তারতম্য-বিশিষ্ট কমবেশী বা গাঢ় হাল্‌কা দাগ আঁকিয়া দেয়। উহাই হইল 'নেগেটিভ' (negative) ছবি। উহা হইতে আবার যখন পজেটিভ ছবি লওয়া হয় তখন ঠিক নেগেটিভের বিপরীত ছবি উঠিবে, অর্থাৎ নেগেটিভের যেখানে যতটুকু কালো আছে পজেটিভের সেখানে ঠিক ততটুকু আলোকিত হইয়া ছবি উঠিবে।

বুদ্ধিমান মানুষ সর্ব্বদাই বুদ্ধি খাটাইয়া প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাই সে ক্যামেরাকেও ক্রমাগত মানবচক্ষুর ন্যায় ক্ষিপ্র দৃষ্টিবিশিষ্ট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত তাহাতে এত দূর সাফল্য লাভ করিয়াছে যে, মানুষের চক্ষুর শক্তিকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। যে ক্যামেরার প্রথমে ৬ ঘণ্টায় একখানা ছবি উঠিত সেই ক্যামেরায় এখন সেকেণ্ডে এক হাজারেরও অধিক ছবি তোলা যায়—যদিও ঠিক সেই ক্যামেরাই নয়, তবে মূলনীতি একই। মানুষের চোখ কোন কালেই এক সেকেণ্ডে এত ছবি দেখিয়া ফেলিতে পারে না।

ক্যামেরার মধ্যে প্লেটে বা ফিলিমে উপরোক্ত রূপে ছায়াছবি লইলেই ফটো তোলার কার্য্য শেষ হইল না। তাহার পর সেই প্লেট বা ফিলিমকে অনেক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা ধৌত করিয়া, তাহার পর ছাপা, টোন করা (toning), বার্নিশ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার পর ঠিক ছবিখানি পাওয়া যাইবে। সে সকল প্রক্রিয়ার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তাই সে সকল উল্লেখ করিলাম না। বিশেষতঃ এখনকার দিনে শিক্ষিত সমাজে ফটোগ্রাফি বিষয়ে অল্পাধিক জানেন না, এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম; তাই সে সকলের উল্লেখ না করিলেও চলিবে। তবে কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তৈয়ারী ফটোকে ইচ্ছামত রং-এ রঞ্জিত করা যায়, সেই প্রক্রিয়ার ২।১টির কথা এখানে উল্লেখ করা হইল।

ফটোকে পাটকিলে অথবা লাল রং-এ রঞ্জিত করিতে হইলে প্রথমে তিন প্রকার আরক (acid) প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। যথা:—

১নং	নাইট্রেট্ ইউরেনিয়াম	৩ ড্রাম
	জল	১ আউন্স
২নং	ফেরিসায়েনাইড্ পটাসিয়াম্	২ ড্রাম
	জল	৩১ আউন্স
৩নং	সাইট্রিক এসিড্	৪ ড্রাম
	জল	১৫ আউন্স

উক্ত তিন প্রকার আরকের ১নং তিন আউন্স, ২নং নয় আউন্স এবং ৩নং এক ড্রাম মিশাইয়া লইয়া, উহাতে ছবি খানিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে উহা পাটকিলে রং ধারণ করিবে এবং আরও বেশীক্ষণ রাখিলে লাল বর্ণে রঞ্জিত হইবে। রঞ্জিত হইলে উহাকে আবার অর্দ্ধ ড্রাম সাইট্রিক এসিড্ ও তিন আউন্স জলের মিক্‌চারের (mixture) মধ্যে ১০।১২ মিনিট ভিজাইয়া তাহার পর পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইতে হইবে।

নীল বর্ণ করিতে হইলে পটাসিয়াম ফেরিসায়েনাইড ৩০ গ্রেণ এবং জল ২ আউন্স এর মিক্‌চারের মধ্যে ১।২ মিনিট ভিজাইয়া তাহার পর তাহাকে পুনরায় ধুইয়া পুনরায় আয়রন সালফেট ৩০ গ্রেণ ও জল ২ আউন্সের মিক্‌চারে ভিজাইতে হইবে। এই প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ছবিকে আরও কয়েক প্রকার রং-এ রঞ্জিত করা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে আজ বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যকাল পর্য্যন্ত ৩০০ বৎসর ধরিয়া এই আলোক-চিত্রণের পশ্চাতে কত মহাপুরুষের জীবনব্যাপী সাধনা, কত মনীষীর চিন্তা ও পরিকল্পনা রহিয়াছে, কত বৈজ্ঞানিকের নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সংযুক্ত হইয়াছে তাহার ইতিহাস কে রাখে? কিন্তু একথা সত্য যে, তাঁহারা আলোক-চিত্রণের আবিষ্কার ও উন্নতির দ্বারা মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহা আবিষ্কৃত না হইলে মানবজাতির ইতিহাসই হয়ত অন্য রূপ ধারণ করিত।

ধন-সম্পদের গোড়ার কথা

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

১৮

পুঁজিপতিদের দৃষ্টিতে পণ্য উৎপাদনের উপায়ের অর্থাৎ কলযন্ত্রাদির মূল্য এবং পুঁজির গুণাবলীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পুঁজি প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অ-প্রদত্ত-মূল্য শ্রম শোষণ করে এবং শ্রম শোষণ করিয়া নিজকে সম্প্রসারিত করে। কাজেই পুঁজির আত্ম-সম্প্রসারণ যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেইখানেই পুঁজি তাহার পুঁজিত্ব হারাইয়া ফেলে—পুঁজিপতিদের হয় লোকসান। এই লোকসানই পুঁজিপতিদিগকে relay system-এর প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং আজ পর্য্যন্তও যোগাইতেছে।'

কল-যন্ত্র চালিত শিল্প-ব্যবস্থায় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা কেহ-ই অস্বীকার করেন না। করিলেও তাহা সত্যের অপলাপই হইবে। কিন্তু কল-যন্ত্রের ব্যবহারে এই যে বর্দ্ধিত হারে পণ্য উৎপাদিত হইতেছে—শ্রমের এই যে উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং 'রেশনেলিজেশনে'র ফলে আরও বর্দ্ধিত হইতেছে ইহাতে শ্রমিকের কোন লাভ হয় নাই। শ্রমিকের লাভ অবশ্যই কিছু হইত যদি উৎপন্ন পণ্যের বাড়্তি ভাগ বর্দ্ধিত মজুরি-রূপে শ্রমিকের হাতে যাইত। কিন্তু তাহা তো হইতেছে না, উৎপন্ন পণ্যের বাড়্তি ভাগ বর্দ্ধিত লাভ রূপে যাইতেছে শিল্পপতিদের পকেটে। কেন এবং কিরূপে যাইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে শ্রমিকের মজুরির কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। শ্রমিক কি হারে তাহার মজুরি পায়? এই প্রশ্নটাকে আরও এক ভাবে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি। শ্রমিকের মজুরী নির্দ্ধারিত হয় কিরূপে?

বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমিকের মজুরিটা আমাদের কাছে শ্রমের দাম (price) রূপেই প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ শ্রমিক পাইয়া থাকে। শ্রমের মূল্যের কথাও লোকের মুখে আমরা শুনিতে পাই। এইরূপ বলা হয় যে, টাকা-পয়সায় শ্রমের মূল্যের যে অভিব্যক্তি তাহাই শ্রমের স্বাভাবিক দাম (necessary or natural price)। আমরা দেখিয়াছি, পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় উহার মধ্যে যে-পরিমাণ সামাজিক শ্রম সঞ্চিত হইয়াছে তাহারই দ্বারা। তাহা হইলে শ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণ করিব কি ভাবে? মনে করুন, এক একটি কাজের দিনের পরিমাণ ১২ ঘণ্টা। তাহা হইলে ১২ ঘণ্টা শ্রমের দ্বারা এক দিনের মজুরি অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার মজুরি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ১২ ঘণ্টা শ্রমের মূল্য বার ঘণ্টা শ্রম, এ কথার কোন অর্থ হয় কি? আসলে উহা একই কথাকে ঘুরাইয়া বলা ছাড়া আর কিছুই নয়। রিকার্ডোর মতে মজুরি উৎপন্ন করিতে যে-পরিমাণ শ্রম লাগে তাহারই উপরে নির্ভর করে শ্রমের মূল্য। অর্থাৎ মজুরির পরিমাণ টাকা-পয়সা উৎপন্ন করিতে যে-পরিমাণ শ্রম দরকার তাহা দ্বারাই শ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাহা হইলে বলিতে হয়, এক-খানা কাপড়ের মূল্য উহা তৈয়ার করিতে যে-পরিমাণ শ্রম লাগিয়াছে তাহা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না, কাপড়ের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় উহার বিনিময়ে যে টাকা-পয়সা পাওয়া যায় ঐ টাকা-পয়সা তৈয়ার করিতে যে পরিমাণ শ্রম লাগিয়াছে তাহারই দ্বারা। ইহা একটা হাস্যকর কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রমকে যদি কোন পণ্যের ন্যায় বাজারে বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে বিক্রয়ের পূর্ব্বে শ্রমের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে শ্রমকে বিক্রয় করা যাইবে কিরূপে? কিন্তু শ্রমকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন সত্তা কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে। শ্রমিকের শ্রমশক্তি যখন পণ্য গড়িয়া তুলে তখনই ঐ তৈয়ারী পণ্যের মধ্যে শ্রমকে স্বতন্ত্র অবস্থায় আমরা পাইতে পারি। ইহা ব্যতীত

শ্রমকে স্বতন্ত্র ভাবে পাইবার উপায় নাই। শ্রমিক যদি তাহার শ্রমকে স্বতন্ত্র সত্তা দিতে পারিত, তাহা হইলে সে তৈয়ারী পণ্যই বাজারে বিক্রয় করিত, শ্রম বিক্রয় করিত না। সুতরাং শ্রমকে যদি পণ্য বলিতে হয়, তাহা হইলে এ কথাও সেই সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা অন্য যে-কোন প্রকারের পণ্য হইতে স্বতন্ত্র। কেন-না প্রত্যেক পণ্যকেই আগে তৈয়ার করিতে হয়, তার পর উহা বাজারে নীত হইয়া বিক্রয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রম তো বাজারে নীত হইবার পূর্ব্বে তৈয়ারী হয় না। বরং বলিতে হয় তৈয়ারী হওয়ার পূর্ব্বেই উহা বিক্রয়ের জন্য বাজারে নীত হয়। কথাটা শুধু হাস্যকর নয়, স্ব-বিরোধীও বটে।

'শ্রমের মূল্য' কথাটার মধ্যে যে স্ব-বিরোধ আছে তাহা উপেক্ষা করিয়া অন্য দিক দিয়া ইহার সম্পর্কে আলোচনা আমরা করিতে পারি। শ্রমের বিনিময় হয় টাকা-পয়সার সঙ্গে। এই টাকা-পয়সাও শ্রমের ঘনীভূত রূপ অথবা মূর্ত্তিমান্ শ্রম (objectified labour) ছাড়া আর কিছুই নয়। মূর্ত্তিমান্ শ্রমরূপী টাকা-পয়সার সহিত সজীব শ্রমের বিনিময় হইলে মূল্যের অর্থনৈতিক বিধানের কোন অস্তিত্বই আর থাকে না। কারণ মূল্যের অর্থনৈতিক বিধান ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তির উপরেই স্বাধীন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অথবা একথাও আমরা বলিতে পারি, মূর্ত্তিমান শ্রমরূপী টাকা-পয়সার সহিত সজীব শ্রমের বিনিময় হইলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অস্তিত্বই আর থাকে না ; কেন-না, মজুরি প্রদানের পরিবর্ত্তে যে শ্রম পাওয়া যায় তাহারই উপরে অর্থাৎ wage labour-এর উপরেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এই ব্যাপারটাকে আমাদের বুঝিতে হইবে। মনে করুন, কাজের দিনের পরিমাণ ১২ বার ঘণ্টা। এই কাজের দিন অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার আর্থিক মূল্য ১৲ এক টাকা। এখন, তুল্যমূল্য বস্তুর যদি বিনিময় হয়, তাহা হইলে শ্রমিক ১২ ঘণ্টা শ্রমের জন্যই ১৲ এক টাকা পাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ ১২ ঘণ্টা শ্রমের দাম এবং ঐ ১২ ঘণ্টা শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের দাম পরস্পর সমান। তাই যদি হয়, তাহা হইলে শ্রমিক তো তাহার শ্রমের ক্রেতার জন্য কোন বাড়্তি মূল্যই সৃষ্টি করিল না—এক টাকা তো পুঁজিতে রূপান্তরিত হইল না। কাজেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া যায়। অথচ শ্রমিক যে তাহার শ্রম বিক্রয় করে, শ্রমের পরিবর্ত্তে যে মজুরি দেওয়া হয় তাহারই ভিত্তির উপরেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। যদি বলা যায় যে, না, শ্রমিক বার ঘণ্টা শ্রমের পরিবর্ত্তে ১৲ এক টাকা পায় না, পায় এক টাকার কম ; তাহা হইলে উহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ১২ ঘণ্টা শ্রমের বিনিময় হইতেছে উহা অপেক্ষা কম শ্রম-সময় অর্থাৎ ১০ ঘণ্টা, ৮ ঘণ্টা বা ৬ ঘণ্টা শ্রমের সহিত। তাহা হইলেও বিপদ আমাদের কাটে না, কারণ দুইটি অ-সম পরিমাণ বস্তুর সমীকরণ করিতে যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে—মূল্য আর কিছুতেই নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং এই যে আত্ম-বিধ্বংসী স্ব-বিরোধ তাহাকে কখনই অর্থনৈতিক বিধানের রূপ দেওয়া যাইতে পারে না।

বলা যাইতে পারে, অল্প পরিমাণ শ্রমের সহিত বেশী পরিমাণ শ্রমের যেখানে বিনিময় হয় সেখানে উভয় শ্রমের আকার এক নয়—পরস্পর বিভিন্ন আকারের শ্রমের মধ্যে বিনিময় হইতেছে বলিয়াই অ-সম পরিমাণ শ্রমের মধ্যে বিনিময় সম্ভব হইয়াছে। 'সিস্‌মণ্ডি' (Sesmondi)-ও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এ কথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে, সম্পাদিত শ্রমের (work done) সহিত যেখানে যে-শ্রম সম্পাদন করা হইবে (work to be done) তাহার বিনিময় হইবে সেখানে শ্রমিকের নিকটে যাহা আছে তাহা অপেক্ষা পুঁজিপতির নিকট যাহা আছে তাহার মূল্য বেশী হইবে।" (De la richesse commerciale, Geneva, 1803, Vol. 1, p. 37)। কিন্তু ইহাতে ব্যাপারটা আরও বেশী হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায় না কি ? কারণ, পণ্যের মধ্যে যে-পরিমাণ শ্রম ঘনীভূত হইয়াছে তাহা দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না, পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় উহা তৈয়ার করিতে যে-পরিমাণ সজীব শ্রম প্রয়োজন তাহারই দ্বারা।

ক্রমশঃ

পুস্তক-পরিচয়

সুরহারা—শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম-এ। প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্র-মোহন বাগ্‌চি, 'ইলাবাস,' হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য বার আনা। পত্রাঙ্ক ৮৭।

সাঁঝের ছায়া—শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম-এ। প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ, ১৪।১ টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। পত্রাঙ্ক ৬৪।

দুইখানি কবিতা-গ্রন্থ। দুইখানি পুস্তকেরই কতকগুলি কবিতা ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং লেখকের কবিখ্যাতি আছে। বই দুইখানি পড়িয়া বুঝিলাম, তিনি সত্য সত্যই কবি। কবি-জীবনের যাহা মূলভিত্তি—সেই রসানুভূতি তাঁহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে। এই রসানুভূতিকে বাঙ্ময় করিয়া তুলিবার উপযোগী ছন্দ এবং ভাষার উপরে তাঁহার অধিকার যথেষ্ট। কবিতা-গ্রন্থ দুইখানিতে অনুভূতি, ছন্দ এবং ভাষা এই তিনেরই সমন্বয় ঘটিয়াছে। তাঁহার অনুভূতির মধ্যে মিষ্টিসিজমের আমেজ পাওয়া গেলেও এই মিষ্টিসিজম কোথাও কুহেলিকার সৃষ্টি করে নাই। ভাষা সুস্পষ্ট, প্রকাশক এবং কষ্ট-কৃচ্ছ্রতাহীন, ছন্দ ও ভাব ভাষার সহিত তাল রাখিয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে বহিয়া চলিয়াছে।

জগতকে কবি যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এই দৃষ্টি শুধু তাঁহার একান্ত ভাবে নিজস্ব নয়, নিখিল মানবের দৃষ্টির তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। কবির নিজের ভাষাতেই বলি :

> নিখিল মানব-বক্ষে জাগে চিরন্তনী—
> যে তৃষার সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু-দ্যুতি,
> যে আনন্দ-বেদনার অনাহত ধ্বনি
> বুভুক্ষু যে হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি ;—
> তাদেরই গোপন লীলা এ হিয়ার পরে,

'বুভুক্ষু হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি'র 'নিবিড় রসে' উচ্ছলিত কবির প্রাণে কার যেন অধীর আহ্বান জাগিয়া উঠে। এই বাণীকেই করি রূপ দিয়াছেন :

> মোর ছন্দে গানে শুধু তারি বাণী জাগে!

মানব-চিত্তে ব্যর্থতার যে চিরন্তন বেদনা—অসিদ্ধ সাধনা, অকৃতার্থ স্বপ্নের যে ব্যথা 'বর্ষশেষে' কবিতাটিতে কবি তাহাকেই রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন।

> 'নবোৎসাহে বার বার বাজিয়াছে তার যাত্রা-ভেরী,
> নব প্রেরণায় নিত্য ছুটিয়াছে নব কেন্দ্র ঘেরি,'
> আজিও মিলেনি তবু কোন কিছু চরম সন্ধান ;
> ব্যর্থতার গ্লানি মাঝে চলা শুধু হল অবসান!

কবির জীবনধারার মধ্যেই বিশ্ব-মানবের জীবনধারা আসিয়া মিলিত হয়, কবি-জীবনের চরম সার্থকতা এইখানেই। অজিতবাবু 'চরম সার্থকতা' কবিতায় বলিতেছেন,

> আজ মনে লয় জীবন ভ'রে
> যাদের পেনু প্রাণের পরে,—
> আসা-যাওয়ার মাঝে তারাই
> আমায় গেছে পূর্ণ করে।

অজিতবাবুর কবিতা সবগুলিই উপভোগ্য হইয়াছে, কাব্যামোদী পাঠক-পাঠিকা কবিতা-গ্রন্থ দুইখানি পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন। আর একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। অজিতবাবুর কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই কবিতার সুর যে রবীন্দ্রনাথের তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। যেমন :

> আমারে কি পড়ে কারো মনে,
> সন্ধ্যার স্তিমিতালোকে, দিনান্তের অবসর ক্ষণে,
> সঙ্গীহারা নিমেষের বিক্ষিপ্তির, রিক্ততার মাঝে,—
> বক্ষে যবে তীব্র ব্যথা বাজে ?

কোথাও বা ছন্দ এবং শব্দ নির্ব্বাচন সত্যেন্দ্রনাথের কথা মনে করাইয়া দেয়,

> তালে তালে পড়ে দাঁড়,—
> লীলায়িত ছন্দ!
> অন্তরে জাগে তার
> দোদুল সে স্পন্দ!

বই দুইখানির গঠনপারিপাট্যও রবীন্দ্র-গ্রন্থদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। 'সুরহারা' রবীন্দ্রনাথের আগেকার বই-এর চেহারা মনে করাইয়া দেয়। 'সাঁঝের ছায়া'তে ফুটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের অধুনাতন গ্রন্থের রূপ!

চীন—রথীন্দ্র সেন। প্রকাশক চিত্ত গুহ, কালচার ক্লাব, ৪৮৮।১ সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা। পৃষ্ঠা ৩২।

আধুনিক জগৎ গ্রন্থমালার প্রথম বই। ডক্টর শ্রীযুত কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট মহোদয় আধুনিক জগৎ গ্রন্থমালা সম্পর্কে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

১৮৪০ সালের বক্সার বিদ্রোহের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চীনের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক উন্নতি, শিক্ষা ও সংবাদপত্র, ছাত্র আন্দোলন, চীনে বৈদেশিক স্বার্থ এবং চীন-জাপান যুদ্ধ সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ এই পুস্তিকায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে সকল কথা বলা হইলেও কোন তথ্যই বাদ পড়ে নাই। ভাষা সুখপাঠ্য।

বর্ত্তমান যুগে এক দেশের সহিত আর এক দেশের সম্পর্ক ক্রমেই নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন দেশের পরিচয় লাভ করা আজ আমাদের পক্ষেও একান্ত প্রয়োজন। আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থমালার বইগুলি এ বিষয় আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। এই গ্রন্থমালার প্রকাশকদিগের উদ্যম প্রশংসনীয়। প্রত্যেক পুস্তিকার প্রথমে [illegible] হিসাবে প্রত্যেক দেশের প্রাচীন ইতিহাস এবং ভৌগোলিক [illegible] অল্প কথায় প্রদান করিলে এই গ্রন্থমালার পুস্তিকাগুলির পূর্ণাঙ্গ হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই জাতীয় বই বাংলা ভাষায় নূতন বলিয়াই উহার প্রয়োজনীয়তা আছে। ডক্টর নাগের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিতেছি, "আন্তর্জ্জাতিক মনোভাব গঠনে এই পুস্তিকাগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিবে...এবং সেই জন্য ইহাদের বহুল প্রচার কামনা করি।"

জাপান—চিত্ত গুহ। প্রকাশক চিত্ত গুহ, কালচার ক্লাব, ৪৮৮।১ সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা। পৃষ্ঠা ৩২।

আধুনিক জগৎ গ্রন্থমালার দ্বিতীয় পুস্তিকা। রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই জাপান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তির সম্মান লাভ করিয়াছে। কিন্তু জাপানে নবযুগের সূচনা দেখা দেয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জাপানের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়া জাপানকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তি এবং সমৃদ্ধ দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। ঐ সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জাপানের রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে এই পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে। স্থানের স্বল্পতা তথ্যকে কোথাও অঙ্গহীন করে নাই। ভাষা সহজ ও সরল।

সঞ্চয়ন

গো-পালন ও দুগ্ধ-ব্যবসায়

[১৩৪৮।৯ই বৈশাখ তারিখের 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম]

প্রত্যেক সভ্য দেশেই দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ খাদ্য হিসাবে একটা প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমেরিকায় শতকরা ২০ প্রকার খাদ্যই আজকাল দুগ্ধ-জাত। গো-দুগ্ধের এত প্রয়োজন দেখিয়া ডেনমার্ক, অষ্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশগুলি উন্নততর উপায়ে গো-পালন ও ডেয়রী ফার্ম্ম খুলিয়া দুগ্ধের ব্যবসায় করিতেছে। কিন্তু এ ব্যবসায় আমাদের দেশে এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কিন্তু ঐতিহাসিক, শারীরিক, অর্থনৈতিক যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়াই আমরা বিচার করি না কেন, ভবিষ্যতে এই ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে না। ঐতিহাসিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, সেই প্রাচীন যুগ হইতে মানুষ কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, কিন্তু দুগ্ধের প্রতি তাহার সেই আদিম লিপ্সা আজিও সমভাবেই বর্ত্তমান। এতদৃষ্টে আমাদের বলা মোটেই অসঙ্গত হইবে না যে, ভবিষ্যতেও ইহার চাহিদা সমভাবেই বর্ত্তমান থাকিবে। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবেও ইহার স্থান অতুলনীয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারি, মানুষকে এত সস্তায় এরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রদান করিতে গাভীর সমকক্ষ আর কিছু নাই। এই সমস্ত কারণে আমরা একরূপ নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি, দুগ্ধের চাহিদা অদূর ভবিষ্যতে কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না এবং এই ব্যবসায়েরও ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে। সুতরাং দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে গরুর চাষ বৃদ্ধি করিয়া এই ব্যবসায়ের দিকে নজর দেন, তবে তাঁহাদের নিজেদের এবং দেশের সকলের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

আমাদের সমাজব্যবস্থার অধঃপতনের মূল কারণ অর্থনৈতিক সমস্যা। অধিকাংশ গৃহস্থেরই আজকাল দুই বেলা আহার জুটান কষ্টসাধ্য। এমতাবস্থায় কোন ব্যবসায়ের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা কার্য্যতঃ তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। দেশে যাঁহারা ধনী তাঁহারা অধিকাংশই ব্যাঙ্ক হইতে মোটা সুদ পাইয়াই সন্তুষ্ট। কোন প্রকার ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে অনেকেই প্রস্তুত নহেন। শতকরা ৮০ জন লোককে এখনও সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু আজকাল কৃষিজাত পণ্যের মূল্য ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে। প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলী অনেক স্থলে চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ফসলের মূল্য বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। এই অবস্থায় কৃষির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল না হইয়া তাঁহারা যদি দেশের গো-সম্পদের উপর একবার দৃষ্টি দেন—তাঁহাদের দুর্দ্দশা অনেকটা লাঘব হইয়া যাইবে। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্‌রিকাল্‌চারাল রিসার্চ্চের সহঃ সভাপতি এন, সি, মেটা বলেন,—এই সমস্ত পশুর সংখ্যা ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ভারত-সরকারের হিসাব হইতে ইহাদের যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গাভী—১২,১৩০,০৩৮
বলদ—১০,৬১৭, ৬৮০
ষাঁড়—১,৮৪৮,৩৯৮
বাছুর—৯,২৩৩,২০২
স্ত্রী মহিষ—৪,৬৮৯,৬৭২
পুং ,, —১,০১৯,৯৪২
ভেড়া ১৬,২৫৯,০৩৯
ছাগল—১২,৩৮০,৯১৪

কিন্তু এই সংখ্যাপ্রাচুর্য্য ছাড়া আমাদের আর গৌরব করিবার কিছু নাই। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহারা দুধ দেয় অতি অল্প। আমেরিকায় প্রত্যেকটি গাভী যেখানে গড়ে পাঁচ সের করিয়া দুধ দেয়, সেখানে আমরা গড়ে এক সের দুধ পাই কিনা সন্দেহ এবং যে দুধ আমরা

পাই, তাহাতে ভাল দুধের অনেক গুণই থাকে না। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও দেশের এ অবস্থা ছিল না। গোয়ালভরা তাজা হৃষ্টপুষ্ট গরুগুলি বেশ ভাল দুধ দিত। কিন্তু উপযুক্ত খাদ্য ও যত্নের অভাবে ইহারা আজ অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

অব্যবস্থার ভিতরেও আমাদের দেশে এই দুগ্ধ-ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকার বিকিকিনি চলিতেছে। এক কলিকাতা সহরেই বৎসরে এক কোটি টাকার উর্দ্ধে দুধ বিক্রয় হইয়া থাকে। যদি এরূপ অব্যবস্থার ভিতরেই এত টাকার কারবার চলিতে পারে—তবে ইহাকে সুব্যবস্থার ভিতর আনয়ন করিতে পারিলে অন্ততঃ পাঁচ-ছয় গুণ বেশী টাকার কারবার চলিতে পারে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

গরুর চাষ বৃদ্ধি এবং স্থানে স্থানে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত 'ডেয়রী ফার্ম্ম' খুলিতে পারিলে অনেকটা সুব্যবস্থা হয়। যে সমস্ত তথাকথিত 'ডেয়রী' আমরা দেখিতে পাই তাহারা কার্য্যতঃ শুধু দুধই বিক্রয় করিয়া থাকে। অনেকের মতেই এই সমস্ত ফার্ম্মের দুধ ভাল তো নহেই স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিকর। শিক্ষিত জনসাধারণ এই ব্যবসার দিকে নজর না দেওয়াতে অধিকাংশ স্থলেই ইহা নিরক্ষর লোকদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। তাহারা তাহাদের নোংরা স্বভাবের জন্য প্রায় একরূপ বিখ্যাত। তাহাদের অতিরিক্ত ময়লা পরিচ্ছদ হইতে কত প্রকার বিষাক্ত জীবাণু যে দুধের সহিত মিশিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার পরেও অতিরিক্ত লোভের মোহে তাহারা জল ও অনেক প্রকার বাজে ভেজাল মিশাইয়া থাকে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতেই ভারতে খাঁটি দুধ পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। অথচ এই দুধের উপরই জনস্বাস্থ্য, বিশেষতঃ শিশুদের স্বাস্থ্য একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে।

আমাদের দেশের নিরক্ষর দুগ্ধ ব্যবসায়িগণ আধুনিক বিজ্ঞান এবং ব্যবসা নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। দুধের অপচয় নিবারণ করিয়া কি করিয়া মাখন, ঘৃত, পনীর, জমানো দুধ, গুঁড়া দুধ প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হয় তাহা তাহারা জানে না, ফলে দুধের প্রকৃত ব্যবহার কখনও হয় না—এবং লক্ষ লক্ষ টাকার দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ প্রতি বৎসর আমাদের বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। অথচ এই দিকে একটু শিক্ষালাভ করিলে আমরা নিজেদের কারখানাজাত এই সমস্ত দ্রব্য অল্পায়াসেই বিদেশে রপ্তানি করিতে সক্ষম হইতাম। আজকাল ডেনমার্ক দুগ্ধ ব্যবসায়ের ভিতর দিয়া অনেক সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। অনেকে এই দেশকে সমস্ত য়ুরোপের 'ডেয়রী ফার্ম্ম' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এই ডেনমার্কের সহিত আমাদের ভারতবর্ষের তুলনা করিলে দেখিতে পাই, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ডেনিশগণ আমাদের আধুনিক ভারতীয়দেরই মত কৃষিজীবী ছিল। ঋণে ছিল তাহাদের আকণ্ঠ ডোবা। ক্রমাগত ফসলের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় আধুনিক ভারতবাসীদের মত তাহাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছিল। তখনও তাহারা তাহাদের গো-সম্পদের দিকে নজর দেয় নাই। ক্রমে দেশে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এবং সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিল। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণকে উন্নতপ্রকারে গো-পালন করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং স্থানে স্থানে ডেয়রী ফার্ম্ম খুলিয়া তাহাদের দুধের প্রকৃত ব্যবহার করা। ডেনিশ সরকার এই সমস্ত সমিতিগুলিকে অনেক টাকা ধার দিতে লাগিলেন। সমিতির কপর্দ্দকহীন সভ্য পর্য্যন্ত টাকা ধার পাইত। এই টাকার সাহায্যে তাহারা সকলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে গো-পালন ও দুগ্ধ-ব্যবসায়ে মন দিল। ভোজবাজির মত তাহাদের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

সমবায় সমিতি আমাদের দেশেও অনেক আছে। কিন্তু দেশবাসী এখনও ইহাদের বিশ্বাস করিতে শিখে নাই। এখন পর্য্যন্ত দুগ্ধ-ব্যবসায়ে ইহাদের দান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু যখনই ভাবি ডেনমার্কের উন্নতির পথে সমবায় সমিতির দান কত বড়—তখনই মনে হয় যদি এই সমস্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঠিক পথে পরিচালনা করা যায়, তবে ভারতবর্ষেরও অর্থনৈতিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সমবায় সমিতিই ডেনমার্ককে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল এবং ঐকান্তিক চেষ্টা থাকিলে ইহারাই ভারতবর্ষকে দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা

করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের ধারণা। দুগ্ধ ব্যবসায়ের ভিতর দিয়া ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলি এত উন্নত। আমাদের দেশেও যদি গো-সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং দেশের জনসাধারণ যদি এই ব্যবসায়ের দিকে মন দেয়, তবে ভারতবর্ষের অবস্থা অদূর ভবিষ্যতে ফিরিয়া যাইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

(বিমল মজুমদার, এম-এ)

আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ

[১৩৪৭। ফাল্গুন সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদী হইতে উদ্ধৃত]

স্মরণাতীত কাল হ'তে আফগানিস্তান সমগ্র এসিয়ার একটি সঙ্গমক্ষেত্ররূপে বিরাজ করে এসেছে। এক সময় Indo-Aryan ও Iranianদের ইহাই ছিল পটভূমি। পরবর্ত্তী-যুগে পারস্য, গ্রীক, ভারতীয় Scythian ও পারথিয়ানগণ, হুনজাতি, তুরস্ক, আফগান ও মোগলজাতির দ্বারা এ অঞ্চল অধ্যুষিত হয়।

আইন-ই-আকবরী রচয়িতা আবুল ফজল আফগানিস্তানে যে-সব সমসাময়িক জাতি বাস করত তা'র একটু সুষ্ঠু বিবরণ দিয়েছেন। সে সময় এগারটি জাতি ও এগারটি ভাষা এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এখনও আফগানিস্তানে বারটি স্বতন্ত্র ভাষা বর্ত্তমান। আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে এক সময় বিশ্ববিজয়ী বীরগণ গমন করেছেন। Darius, আলেকজেণ্ডার, সেলিউকাস, কুষাণ সম্রাট Kabiphses I প্রভৃতি আফগানিস্তানের ইতিহাসকে এই ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এখানকার প্রাচীন শহরগুলি সভ্যতার উচ্চ পতাকা বহন করে' সমগ্র এসিয়ায় খ্যাতি লাভ করে। তক্ষশীলা, নগরহাট, কপিলা, বামিয়ান ও বল্‌খ্‌ প্রভৃতি নগর সমগ্র প্রাচ্যের ঘনিষ্ঠ ইতিহাসের সহিত জড়িত।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের পর হিন্দুকুশ সংলগ্ন রাজপথ এসিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। Cyrus-এর বিজয় (৫৩৮-৫৩০ খৃঃ-পূঃ) এবং Dariusএর সফলতা ব্যাক্‌ট্রিয়া, গান্ধার ও ভারতের সীমান্তকে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। Xerxes যখন গ্রীকদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন তখন ভারতীয় সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যান এবং তারা ব্যাক্‌ট্রিয় ও মগধীয় সেনার সহ একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়।

বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণের গ্রন্থকার পাণিনি গান্ধারের কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই আফগানিস্তান ভারতীয় সভ্যতার সহিত জড়িত। এক সময় হিন্দুকুশের দক্ষিণের রাজা ছিলেন শুভগ সেন। ২০৬ হতে ১৯০ খৃঃ-পূঃ সালে ডেমিট্রিয়স কাবুল উপত্যকা জয় করেন। ৫০ শতকে Kabiphses কাবুল ও কান্দাহার জয় করেন। খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভেই Oxus উপত্যকায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। ইউ-চি'দের (Yueh-chi) তখন রাজ্যই ছিল আফগানিস্তান। কনিষ্ক ইউ-চি'দের সম্রাট ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

জেলালাবাদের সমতলভূমি প্রাচীন নগরহার নগরের স্থান। এক শতাব্দী পর্য্যন্ত এই অঞ্চল খোদিত করিয়া বহু স্তুপ ও বিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবুও মনে হয় আবার নূতনভাবে কাজ আরম্ভ করার বিশেষ প্রয়োজন এ অঞ্চলে আছে। জেলালাবাদ হতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী হাড্ডায় বহু স্মৃতিফলক ও বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি গান্ধারকলার নিদর্শন। কাবুলের কোহিস্তানে প্রাচীন বৌদ্ধনগরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। তা'তে প্রকাণ্ড তিনটি Amphitheatre আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের নাম হচ্ছে সেট ডোপান, কামারি ও সেবকী। Kapesa উপত্যকায় একটি বিহারের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

হিন্দুকুশের বরফাচ্ছাদিত শিখরের নিম্নভাগে বহু গুহা, মন্দির, প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে এ সমস্ত গুহার সংখ্যা বার হাজার বলে' নির্ণয় করেছেন। দু'টি দণ্ডায়মান এবং তিনটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি এখানকার সম্পদ-স্থানীয়।

বল্‌খ্‌ অঞ্চলে প্রচুর ভগ্নাবশেষ, স্তুপ ও অন্যান্য প্রত্ন-দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে। মিনার চক্রীতে আঁচির ন্যায় স্তম্ভ পাওয়া গেছে। ৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের প্রধান নেতা প্রভাকরমিত্র নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে চীন-যাত্রার কালে অভিনন্দিত করেন। Chavanny ও Levi বলেন যখন Wen-King কাশ্মীর ও গান্ধার পরিদর্শন করেন সে সময় এই অঞ্চলের তুরস্করাজ দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এক

সময় বল্‌থ্‌ শহরে একশ'টি বিহার ছিল এবং ৩০০০ বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী বাস করত। এখানেই নববিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুকুশের উত্তরে ইহা বৌদ্ধশিক্ষার প্রধানতম কেন্দ্র ছিল। Gaz প্রদেশে দশটি বিহার ও তিনশত সর্ব্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ ছিল এবং বামিয়ানে (Bamian) বহুসহস্র লোকোত্তরবাদী বৌদ্ধগণ বাস করত। কপিলাতে ১০০ বৌদ্ধবিহার ছিল। Hupianএর তুরস্করাজ বৌদ্ধ ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্‌ গান্ধারে শৈবধর্ম্মের অস্তিত্বের বিষয় উল্লেখ করেছেন।

আফগানিস্তানের প্রাচীন গান্ধার-কলা বৌদ্ধধর্ম্মের নানা দিক উপস্থিত করেছে। বুদ্ধের জীবনের বহু অধ্যায় ভাস্কর্য্যে রূপায়িত হয়েছে। Swat উপত্যকা, Takt-i-khai ও তক্ষশীলায় এসব নমুনা পাওয়া গিয়েছে। এ-সমস্ত রচনাকাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। এই সব মূর্ত্তি বিষয়ে ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ একটা বিপুল বিরোধ সৃষ্টি করে' ইউরোপের মর্য্যাদা বাড়াতে চেষ্টা করেছেন।

আফগানিস্তানের বামিয়ান অঞ্চলের পার্ব্বত্যশোভা অতুলনীয়। সারি সারি শৈলশ্রেণীর দণ্ডায়মান প্রাচীর সমগ্র ভূখণ্ডকে এক অতিপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করেছে। এক সময় এই অঞ্চলে একটি বিরাট জনপদ ছিল। এখনও গৃহাদির ভিত্তি ও প্রাচীর প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে সমুচ্চ পাহাড়শ্রেণী খোদিত করে' একটি বুদ্ধমূর্ত্তি তৈরি করা হয়েছিল যা' পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মূর্ত্তি বলে গণ্য হতে পারে। পাহাড় কেটে একটা বিরাট উচ্চ গুহা করা হয়েছিল—তারই ভিতর বুদ্ধের সেই খোদিত মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহা প্রাচীন আফগানিস্তানের এক গৌরবের বস্তু। মধ্য-এসিয়া ও ভারতীয় চিত্রকলার ইহা যোগসূত্রস্থানীয়। এখানকার চিত্রে অজন্তার লীলায়িত মাধুর্য্য আছে। এতে গান্ধার-শিল্পের প্রেরণা অতি যৎসামান্য। মধ্য-এসিয়ার খোটানী চিত্রের ছায়াপাত এ'তে আছে—অথচ সে চিত্রকলার গ্রাম্যভঙ্গীগুলি এ'তে নেই। এখানকার চিত্রের সংযত রূপভঙ্গী ভারতীয় রচনার মত স্বচ্ছ ও সুনিপুণ কুহক সৃষ্টি করে।

আধুনিক আফগানিস্তান এই সমস্ত প্রত্নসম্পদের অধিকারী হয়ে সমগ্র প্রাচ্যের দর্শনীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছে। বামিয়ান এখন একটি পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত হয়। এখানে বহু ফকির দিনরাত্রি বাস করে। বামিয়ানে নরনারীর ভিতর একটি সংযত সৌন্দর্য্য ও বিনীত মাধুর্য্য প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিকে জাগ্রত করে। পর্য্যটকেরা ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এজন্য বামিনিয়ানকে একটি শিল্পকেন্দ্র মনে করেন।

(শ্রীযামিনীকান্ত সেন)
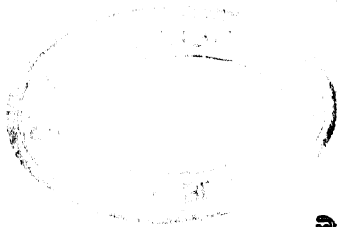
কলহ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

লোভ বলে, "ক্রোধ তুমি নহ কভু ভালো,
হিংসার অনল সারা বিশ্বে তুমি জ্বালো"।
"তুমিও যে সেই দোষে দোষী সমতুল,"
হাসিয়া কহিল ক্রোধ, "নাহি তাহে ভুল।"

রবীন্দ্রনাথের একাশীতিতম জন্মতিথি

পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম বৎসর পূর্ণ হইয়াছে—তিনি একাশীতিতম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। বিচিত্র তাঁহার কবিজীবন, বিরাট তাঁহার প্রতিভা, বাংলা সাহিত্য এবং বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে বিপুল এবং বহুমুখী তাঁহার দান। তাঁহার দানের ভাণ্ডার আজিও অফুরন্ত, দানের সামর্থ্য তাঁহার আজিও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই—অজস্র ধারায় তাঁহার লোকত্তর প্রতিভার দান আজিও বাঙ্গালী জাতিকে—বিশ্বমানবকে অভিষিক্ত করিতেছে।

কবিগুরুর একাশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সমগ্র বিশ্ব তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য। আমরা সকলের সহিত মিলিত হইয়া অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রীতি কবিগুরুকে নিবেদন করিতেছি।

দীর্ঘ অশীতি বৎসর ধরিয়া তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, ইহা আমাদের স্বল্পায়ু বাঙ্গালী জাতির এবং বিশ্বমানবের পরম সৌভাগ্য। আরও অনেক দিন ধরিয়া তাঁহাকে আমরা আমাদের মধ্যে পাইতে চাই। তিনি শতায়ু হইয়া তাঁহার কল্যাণ হস্তের দানে মাতৃভূমিকে এবং বিশ্বমানবকে সমৃদ্ধ করুন, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

—

ভারতীয় সমস্যা ও ভারত-সচিব

ভারতের কি দাবী, তাহা অনেক বার বলা হইয়াছে, ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কি নীতি তাহাও অপ্রকাশ নাই—ভারত-সচিব এবং ভারতের বড়লাটের নিকট বহুবার আমরা তাহা শুনিয়াছি। তথাপি ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা শেষ হইতেছে না, শেষ হওয়াও সম্ভব নয়। পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভারতসম্পর্কে যখন কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে তখনই ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ভারত-সচিবকে কিছু বলিতেই হয়। বৃটিশ ভারতের এগারটি প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করায় গবর্ণরগণ স্বহস্তে ঐ সকল প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। প্রাদেশিক শাসনকার্য্য এইরূপে পরিচালিত হওয়ার মেয়াদ মাত্র এক বৎসর। এই মেয়াদ পূর্ণ হইয়া আসায় গবর্ণরগণ কর্ত্তৃক স্বহস্তে প্রাদেশিক শাসনকার্য্য পরিচালনের কার্য্য আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করিবার জন্য ২২শে এপ্রিল পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করিতে যাইয়া ভারত-সচিব মিঃ আমেরী ভারতীয় সমস্যার সমাধানসম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

ভারত-সচিবের এই বিবৃতিতে নূতন কথা কিছুই নাই। ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি যেখানে অপরিবর্ত্তিত সেখানে ভারত-সচিব যে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, আমাদের হতাশ হইবারও নাই কিছু। তবে বোম্বাইয়ের দল-নিরপেক্ষ সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভারত-সচিবের বিবৃতি গভীর নৈরাশ্যের সঞ্চার করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারত-সচিব এক বিবৃতিতে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা আদর্শের ভক্ত অথচ বাস্তব দর্শন করিবার মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহাদের উপর নির্ভর করিবার আভাস প্রদান করিয়াছিলেন। এই আভাসটুকু সম্বল করিয়াই বোম্বাই সম্মেলনীর উদ্যোক্তাগণ হয়ত ভারত-সচিবের বিবৃতিতে অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু আশা যে বৃথা এত দিনে তাঁহারা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।

ভারত-সচিবের মামুলী বিবৃতি বিশ্লেষণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই বিবৃতি দ্বারা বৃটেনের সহিত ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্কের একটুও পরিবর্ত্তন না হওয়ায় পার্লামেণ্টের কতিপয় সদস্য সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভারত-সচিবের বিবৃতির সমালোচনা করিয়া ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য নূতন পথের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শ্রমিক সদস্য মিঃ সোরেন্স পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু অথবা কোন কংগ্রেসী নেতাকে বৃটিশ মন্ত্রিসভায় গ্রহণ অথবা একজন ভারতীয়কে সহকারী ভারতসচিবের পদে নিয়োগ করিয়া বৃটেন ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। জাতীয় উদারনৈতিক দলের স্যার জর্জ্জ স্থষ্টার এই যুদ্ধের সময় কংগ্রেস সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি সন্দেহ করেন, কংগ্রেসের আসল লক্ষ্য রাষ্ট্রের উপর দলগত আধিপত্য স্থাপন। তিনিও একজন ভারতীয়কে সহকারী ভারত-সচিবের পদে নিয়োগ করিবার পক্ষপাতী এবং স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর মত লোককে লর্ড সভায় আসন দিতে ইচ্ছুক। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে যে আলোচনা হইয়াছে উহার প্রতি ভারত-সচিব আরও অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই বলিয়া মিঃ ভার্ণন বার্টলেট অনুযোগ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ করা যায় বলিয়া তিনি মনে করেন।

ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা যে সকল ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের আন্তরিকতাই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাদের আন্তরিকতায় আমরা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করি না। কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাব শুনিয়া মনে হয়, ভারতের দাবীর প্রকৃত স্বরূপ তাঁহারা সম্যক রূপে অবগত নহেন, অথবা ভারতের দাবীর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে একজন ভারতীয় (বাঙ্গালী) লর্ড সভায় আসন পাইয়াছিলেন, বর্ত্তমানেও একজন লর্ড সভায় আছেন, ভবিষ্যতে আরও কেহ কেহ পাইতেও পারেন। সহকারী ভারতসচিবের পদে একজন ভারতীয় নিযুক্ত হওয়া বিচিত্র নহে। প্রয়োজন হইলে বৃটিশ মন্ত্রিসভাতেও একজন ভারতীয়ের স্থান হওয়া বিস্ময়কর নাও হইতে পারে। কিন্তু উহার সহিত ভারতের দাবীর কোন সম্পর্ক নাই, ভারত-বাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহাতে পূরণ হইবে না।

—

স্বাধীন ভারতের নয়ারূপ

ভারত-সচিব মিঃ আমেরীর বিবৃতি পড়িয়া ষ্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আর্থার মুরও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি তিনি বিলাতে আছেন এবং 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার একপত্রে বৃটিশ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, বৃটিশ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত না-ই হইবে তবে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে তাঁহারা পারিতেছেন না কেন? তাঁহার বক্তব্য 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রেই শেষ হয় নাই। ভারতীয় সমস্যার সমাধান কিরূপে করিতে পারা যায় সে সম্বন্ধে মিঃ আর্থার মুরের নিজেরও একটা পরিকল্পনা আছে। 'ইয়র্কসায়ার পোষ্টে'র প্রতিনিধির নিকট তিনি তাঁহার পরিকল্পনাটি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনার আসল কথা, ভারতবর্ষকে একেবারে স্বাধীন করিয়া দিতে হইবে। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। কিন্তু এই স্বাধীন ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন বড়লাট। তিনি তাঁহার ইচ্ছামত মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার থাকিবে না।

যাক্, এতদিনে ভারতীয় সমস্যার একটা সুরাহা হইল। স্বাধীন ভারতের নয়ারূপ দেখিয়া ভারতবাসী নিশ্চয়ই রোমাঞ্চ হইবে। গণতন্ত্রের এই নূতন অ[illegible] অনুযায়ী ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র রচিত হইলে আর আমাদের ভাবনা কি?

—

মুসলিম লীগের অধিবেশন

সম্প্রতি মাদ্রাজে মুসলিম লীগের ২৮তম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে দুই হাজার প্রতিনিধি এবং পাঁচ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। গত কয়েক বৎসরের তুলনায় এবারের অধিবেশনে প্রতিনিধি ও দর্শকের সংখ্যা নাকি খুব কম হইয়াছে। লীগ কাউন্সিলের ৪৬৫ জন সদস্যের মধ্যে নাকি মাত্র একশত জন সদস্যের বেশী উপস্থিত হন নাই। আরও

আশ্চর্য্যের কথা, বাংলা এবং পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই।

মুসলিম লীগের এই অধিবেশন নৈরাশ্যজনক হওয়া আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নয়। মাটীতে সঞ্চিত রস আহরণ করিয়াই বৃক্ষের পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। মাটীর সহিত সংযোগ ছিন্ন হইলে কৃত্রিম উপায়ে আহার্য্য যোগাইয়া গাছকে বাঁচাইয়া রাখা গেলেও তাহার সম্যক পরিপুষ্টি হয় না। মুসলিম লীগের অবস্থা এইরূপই হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। মুসলিম লীগ কায়েমী স্বার্থভোগীদের প্রতিষ্ঠান, ভারতের মুসলিম জনসাধারণের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের কোন সংযোগ নাই, তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশার প্রতি লীগ সম্পূর্ণ উদাসীন। জমিয়ৎ-উল-উলেমায় হিন্দ্ এবং বাংলার কৃষক-প্রজাদল মুসলিম লীগকে স্বীকার করে না। বিহারের পুলিশ রিপোর্টে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, লীগনেতারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিহারের মোমিন মুসলমানদিগকে লীগের নেতৃত্বাধীনে আনয়ন করিতে পারেন নাই। অথচ ভারতের মোমিন মুসলমানগণ সংখ্যায় সমগ্র ভারতীয় মুসলিম জনসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও কিঞ্চিৎ অধিক। শুধু বড় বড় কথা বলিয়া এবং ইসলাম বিপন্নের ধুয়া তুলিয়া ভারতের মুসলিম জনসাধারণকে ভুলাইতে পারা বা চিরদিন ভুলাইয়া রাখা সম্ভব নয়।

—

মিঃ জিন্নার অভিভাষণ

মুসলিম লীগের চিরস্থায়ী সভাপতি মিঃ জিন্না মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, শিখ লীগ প্রভৃতির উপর এক হাত লইয়াছেন। তাঁহার মতে কংগ্রেসও হিন্দু প্রতিষ্ঠান। বৃটিশের বর্ত্তমান জীবন-মরণের বিপদে কংগ্রেস বৃটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাধা দিতেছে, কিন্তু তথাপি ইংরাজ রাষ্ট্রনেতারা হিতৈষী এবং বন্ধু মুসলিম লীগকে উপেক্ষা করিয়া কংগ্রেসের তুষ্টি সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে জিন্না সাহেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং "ইংরাজের সহগামী মুসলমানদিগকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করাই বৃটিশ রাষ্ট্রনেতাদের কর্ত্তব্য" বলিয়া ইংরাজদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারত-সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কি নীতি তাহা ভারত-সচিবের সাম্প্রতিক বিবৃতিতেই প্রকাশ। সুতরাং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া জিন্না সাহেবকে 'পাকিস্থান' প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন সে ভরসা মোটেই দেখা যাইতেছে না। তবে প্রয়োজন হইলে কল্পিত পাকিস্থান ভারতীয় আলষ্টার রূপে প্রকট হইতে পারে বটে; কিন্তু ইহাতে মিঃ জিন্না দমিবার পাত্র বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, আসলে তিনি কি চান তাহা মোটেই স্পষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট নয়। তাঁহার উদ্দেশ্য শুধু সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে সজীব রাখা এবং ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করা।

—

পাকিস্থানে স্ব-বিরোধ

স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সমবায়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রের আকারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই মুসলিম লীগের লক্ষ্য এবং আদর্শ বলিয়া লীগের গঠনতন্ত্রে একটি ধারা বর্ত্তমান ছিল। লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে এই ধারাটি সংশোধন করিয়া স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে পাকিস্থানই মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু এই পাকিস্থানের স্বরূপ যে-কি, লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে মিঃ জিন্নার সুদীর্ঘ অভিভাষণে তাহার কোন সুস্পষ্ট আভাস প্রদান করেন নাই। জিন্না সাহেব তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি, ভারতীয় ঐক্য একটা কাল্পনিক বস্তু মাত্র।" কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "পাকিস্থানের আদর্শ ভারতীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ভারতবিচ্ছেদ ইহার মূল কথা নহে।" একই সম্মেলনে পাকিস্থান সম্পর্কে লীগের দুই নেতা পরস্পরবিরোধী দুই কথা বলিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, কাল্পনিক পাকিস্থান সম্পর্কে তাঁহাদের নিজেদেরই কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই এবং উহার পরিকল্পনার মধ্যেও একটা স্ব-বিরোধ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

—

মিঃ জিন্নার দ্রাবিড়ীস্থানের দাবী

এখন আর শুধু পাকিস্থানেও কুলাইতেছে না। মিঃ

জিন্না ভারতবর্ষকে পাকিস্থান, হিন্দুস্থান এবং দ্রাবিড়ীস্থান এই তিন ভাগে বিভক্ত করিবার একটি মহৎ সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যবস্থায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজী না হইলে, যুগোশ্লাভিয়ায় নাৎসীরা যাহা করিয়াছে ভারতেও তাহাই ঘটিবে বলিয়া তিনি শাসাইয়াছেন। তাঁহার এই হুমকীতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভয় পাইবেন বলিয়া আমরা মনে করি না, এবং জিন্না সাহেবও তাহা জানেন। মিঃ জিন্না কি অন্তর্বিপ্লবের ভয় দেখাইয়া কংগ্রেসকে তাঁহার প্রস্তাবে রাজী করাইতে চান? ইহাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা ব্যর্থই হইবে। ভারতের মুসলিম জনসাধারণ—মুসলমান কৃষক এবং শ্রমিক যে লীগের কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার ছাড়িয়া দিবে না তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে—পাকিস্থানের বিরুদ্ধে একটা প্রবল মুসলিম জনমত গঠিত হইতেছে।

—

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় স্যার তেজবাহাদুর

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু কংগ্রেসীও নহেন, হিন্দুমহাসভার সদস্যও নহেন। তিনি ধীরপন্থী মডারেট নেতা। বর্ত্তমান রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা আপোষ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর পত্রের উত্তরে মিঃ জিন্না তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মিঃ গান্ধী বা অন্য কোন হিন্দুনেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।" মিঃ জিন্না কংগ্রেসকে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অনেক দিন হইতে করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। কংগ্রেসকে হিন্দুপ্রতিষ্ঠান প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করাইয়া লওয়া সহজ হয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে মিঃ জিন্নার সর্ত্ত মানিয়া লইয়া তাঁহার সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি এইরূপ সর্ত্তে মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হনও নাই। কাজেই স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না। মিঃ জিন্না স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সম্মতি ব্যতীতই উভয়ের মধ্যে লিখিত পত্রাবলী প্রকাশ করেন এবং একটা বিবৃতিও দেন। এই বিবৃতিতে তিনি স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপাইয়াছেন। তিনি সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্যার সপ্রু আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করেন নাই এবং মধ্যপথে পত্রালাপ স্থগিত রাখিয়া অসৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অথচ স্যার তেজবাহাদুরের নিকট লিখিত পত্রের 'হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে' কথাটি তাঁহার বিবৃতিতে নাই।

স্যার তেজবাহাদুরও একটি বিবৃতিতে এই অসৌজন্যের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এইখানেই ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটে এবং মিঃ জিন্নার সহিত এ বিষয়ে আমার অগ্রসর হওয়া নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহাকে পত্র না লেখার জন্য শিষ্টাচারের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বিশেষ করিয়া মাদ্রাজে মিঃ জিন্নার বক্তৃতা এবং দুই দিন পূর্ব্বে প্রচারিত তাঁহার বিবৃতির পর আমি তাঁহার নিকট হইতে শিষ্টাচার সম্বন্ধে কোন শিক্ষা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।"

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর মন্তব্যসহ মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার পত্রালাপ প্রকাশিত হওয়ার পর মিঃ জিন্না তাঁহাকে কংগ্রেসের বেনামদার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পূর্ব্ব বিবৃতিতে মিঃ জিন্না স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুকে 'রাজনৈতিক অনাথ বালক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। অতঃপর বোম্বাই সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল হইতে মিঃ জিন্নার উক্ত উক্তির একটি বিস্তৃত প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর রাজনৈতিক মতামত যাহাই হউক, 'শান্তিদূত' (peace-maker) বলিয়া তাঁহার নাম আছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় তাঁহার দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা তো

আছেই এবং উহার মীমাংসা হওয়াও প্রয়োজন। কিন্তু এই মীমাংসার চেষ্টায় মিঃ জিন্না এবং তাঁহার লীগের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে না। মহাত্মা গান্ধী কথাটা ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। আশা করি স্যার তেজ-বাহাদুর সপ্রুও এবার শিখিলেন।

—

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মহাত্মা গান্ধী

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটা প্রতিষেধক নির্দ্দেশ করিয়া মহাত্মা গান্ধী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিকারের জন্য একটি অহিংস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিতে হইবে। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আক্রমণ-কারীদিগকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদের হাতে প্রাণ দিয়া আক্রমণকারীদের আক্রমণ-প্রবৃত্তি সংযত করিবে। ইহাই মহাত্মাজীর পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার একটি বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আরও একটি বিবৃতি দান করিয়াছেন। ব্যক্তিগত আত্মরক্ষা ব্যতীত দেশরক্ষা ও জাতিগত আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেও অহিংসার প্রয়োগ কতখানি এবং কি ভাবে প্রয়োজন তাহা এই বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

এই বিবৃতির একস্থানে তিনি বলিয়াছেন, "জন-সাধারণকে শিখাইতে হইবে যে, বিপদের সম্মুখে কখনও পলায়ন করিবে না। যদি তাহারা অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে পারে ভালই; যদি না পারে, তবে যে-কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করিবে। প্রয়োজন হইল অন্তরের সাহস।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "বেপরোয়া ভাবে কেমন করিয়া আত্মবলি দিতে হয় বৃটিশের নিকট হইতে যেন আমরা তাহার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করি।"

আত্মরক্ষার জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন করিবার অধিকার মানুষের আছে, এ কথা স্বীকার করিলেও অহিংসাকেই একমাত্র অবলম্বনীয় উপায় বলিয়া মহাত্মা মনে করেন। কারণ, তিনি মনে করেন, অহিংসা ব্যতীত সমস্যা মিটিতে পারে না এবং কোন কালেই শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীতে অখণ্ড শান্তি কখনও প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা তাহা বলা কঠিন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ-ক্ষেত্র কতটুকু বিস্তৃত মহাত্মাজী তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিলেই ভাল হইত।

—

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ

কালবৈশাখীর ঝড় প্রতিবৎসরই রুদ্র মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হয়। এবার বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চল দিয়া যে-প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহাতে বরিশাল, ত্রিপুরা প্রভৃতি কয়েকটি জেলার বহু ক্ষতি হইয়াছে। দরিদ্র জনসাধারণই এইরূপ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী। তাহাদের পর্ণ কুটীর ঝড়ের সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে একেবারেই অসমর্থ। বহু বৃক্ষাদিও ঝড়ের ঝাপ্টায় ভাঙ্গিয়া পড়ে।

এবারের প্রচণ্ড ঝড়ে 'মেকলা' নামক একখানি ষ্টীমার পটুয়াখালীর নিকট ডুবিয়া গিয়াছে। ঐ ষ্টীমারে ৭০ জন যাত্রী ছিল। তন্মধ্যে ৪০ জন পাড়ে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। অবশিষ্ট যাত্রীদের মধ্যে অনেকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। অনেকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ঝড়ের দুর্য্যোগ কাটিতে না কাটিতেই কয়েক দিনের অনবরত বারিবর্ষণের ফলে বাংলা ও আসামের কয়েকটি জেলায় বন্যা দেখা দিয়াছে।

ঝড়ে ও ষ্টীমার ডুবিতে নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন, আহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—

যুদ্ধোত্তর আর্থিক পরিকল্পনা

বর্ত্তমান যুদ্ধ কবে শেষ হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্ত্তী শিল্পবাণিজ্যের সমস্যা এখনই বিশিষ্ট চিন্তানায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সমরোপকরণ নির্ম্মাণের জন্য বহু সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। প্রাইভেট শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলিতেও প্রচুর পরিমাণে সামরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। শান্তি স্থাপিত হইলে সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলি আর থাকিবে না। প্রাইভেট শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কানপুরে সংযুক্ত প্রদেশের বণিক-সঙ্ঘের

রৌপ্য জুবিলী উৎসবে সভাপতি স্যার জোয়ালা প্রসাদ শ্রীবাস্তব যুদ্ধোত্তর শিল্প-ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারও যুদ্ধোত্তর শিল্পসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, যুদ্ধের সময়ে ভারতে যেমন বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, যুদ্ধের পরেও তেমনি নানা দিক দিয়া দিয়া নূতন শিল্পের সুযোগ আসিবে। স্যার শ্রীবাস্তবের মত তিনিও আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। শ্রীযুত সরকার মনে করেন, যুদ্ধের পরে বিধ্বস্ত দেশসমূহে বাড়ীঘর, কলকারখানা প্রভৃতি নূতন করিয়া গড়িবার প্রয়োজন হইবে, অনেক দেশ পূর্ব্বের সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে মনোযোগী হইবে। ফলে ভারতের কাঁচা মালের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। এই বর্দ্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্যই পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন বলিয়া শ্রীযুত সরকার মনে করেন।

যুদ্ধের পরে পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ হইবে এবং ভারতের শিল্পপ্রচেষ্টার উপরেই বা উহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা হয়ত যায় না। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের প্রসার এবং উন্নতির জন্য সুপরিকল্পিত কর্ম্মনীতি গ্রহণ করা যে একান্তই প্রয়োজন তাহাতে মতভেদের স্থান নাই।

—

ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের নয়া সুযোগ

ভারতবর্ষ এতদিন পর্য্যন্ত শুধু কাঁচা মালই বিদেশে রপ্তানি করিত, তাহার শিল্পজাত পণ্যের বিদেশে কোন চাহিদা ছিল না। বর্ত্তমান যুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিদেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ব্বগোলার্দ্ধের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় কার্পাস-পণ্যের চাহিদা দেখা দিয়াছে। তবে যুদ্ধের পরেও এই চাহিদা থাকিবে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের প্রসার সাধন করা কর্ত্তব্য। অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় কার্পাস-পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হইয়াছে। তবে অষ্ট্রেলিয়ার জন্য খুব বেশী বহরের কাপড় দরকার; কিন্তু ভারতের কাপড়ের কলে অত বেশী বহরের কাপড় বয়নের ব্যবস্থা নাই। কাজেই বেশী বহরের কাপড় বয়নের উপযোগী তাঁত স্থাপন করা প্রয়োজন। অষ্ট্রেলিয়া নাকি যুদ্ধের পরেও দশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতীয় কাপড় ক্রয়ের চুক্তি করিতে স্বীকৃত আছে। তা যদি হয়, তাহা হইলে ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের একটা নূতন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হয়।

—

সর্ব্বভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিবার অন্যতম অন্তরায়। স্বর্গীয় স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পুত্র বোম্বাই-এর শিক্ষা-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার মিঃ বি, এন শীল সমগ্র ভারতের জন্য একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈয়ার করিবার প্রস্তাব করিয়া এক নোট দেন। তাঁহার এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা বোর্ড সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যথাসম্ভব একই প্রকার হওয়া উচিত। ইংরেজী পরিভাষাই গ্রহণ করা উচিত কি না তাহাও তাঁহারা আলোচনা করেন। সমগ্র বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার জন্য একটি কমিটী নিয়োগ করা হয়। এই কমিটীতে প্রথমে আট জন সদস্য ছিলেন, পরে আরও তিন জন গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই কমিটীতে বাংলা, অন্ধ্র, তামিল, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কোন প্রতিনিধি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত কমিটীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন প্রতিনিধির প্রয়োজনীয়তা মোটেই উপেক্ষার বিষয় ছিল না। কিন্তু উক্ত কমিটী শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতামত গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটী প্রথমে ভারতীয়

ভাষাগুলিকে হিন্দুস্থানী এবং দ্রাবিড়ী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কমিটীর অন্যতম সদস্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার শ্রীযুত অমরনাথ ঝা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় ভাষাগুলিকে সংস্কৃত-মূলক, আরবী ও ফার্সী হইতে উৎপন্ন এবং দ্রাবিড়ী এই তিন ভাগে বিভক্ত করা উচিত। অতঃপর কমিটী ভারতীয় ভাষাসমূহকে সংস্কৃতমূলক এবং আরবী ও ফার্সী হইতে উৎপন্ন এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিটীর এই সিদ্ধান্তে দ্রাবিড়ী ভাষাগুলির উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে।

সর্ব্বভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করা এমন একটি গুরুতর বিষয় যে, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবেত প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা ব্যতীত এই কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অভিমত বিবেচনা না করিয়া যদি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচিত হয়, তাহা হইলে উহা সর্ব্বভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ ও শৈলজানন্দের অভিনন্দন

গত ১১ই মে রবিবার ২নং কালুঘোষ লেনে বারবেলা সাহিত্য সভার উদ্যোগে বাংলার খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধিত ও মানপত্র প্রদান করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ঋত্বিকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের গৌরব বর্দ্ধন করেন।

বারবেলা সাহিত্য সভার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। সাহিত্যিককে যাঁহারা অভিনন্দিত করেন তাঁহারা শুধু নিজেদের রসগ্রাহিতারই পরিচয় দেন না, তাঁহাদের এই রসগ্রাহিতা সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহাতা করে।

বৃটিশ মন্ত্রিসভায় পরিবর্ত্তন

বিলাতের রক্ষণশীলদলের মুখপত্র 'টাইমস্' বৃটিশ মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন এবং সাম্রাজ্য সমর মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে বৃটিশ মন্ত্রিসভার কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে—মিঃ চার্চ্চিলের মন্ত্রিমণ্ডলে আরও তিন জন নূতন সদস্য গৃহীত হইয়াছেন। লর্ড বীভারব্রুক রাষ্ট্র বিভাগের, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল জে টি সি মূর ব্রাবাজন বিমান প্রস্তুত বিভাগের এবং মিঃ এফ লেদার্স জাহাজ ও যানবাহন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে কয়েকটি পরাজয়ের পর বৃটিশ জাতির মনে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহারই ফলে মিঃ চার্চ্চিল প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। বৃটিশ জনসাধারণ হয়ত মিঃ চার্চ্চিলের সমর পরিষদের প্রচেষ্টায় আশ্বস্ত হইতে পারে নাই। তাই সম্প্রতি বৃটিশ মন্ত্রিসভার এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। তবে 'সাম্রাজ্য সমর মন্ত্রিসভা' গঠনের কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। তবে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বৃটিশ মন্ত্রিসভায় অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশের প্রধান মন্ত্রীদিগকে গ্রহণ করার পক্ষে কোন বাধাই হয়ত উপস্থিত হইবে না।

ইউরোপীয় যুদ্ধের পরিস্থিতি

ইউরোপীয় যুদ্ধের বল্‌কান অধ্যায় একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। যুগোশ্লাভিয়া জার্ম্মানীর করতলগত, এখন চলিতেছে উহা ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা। গ্রীস হইতেও বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল উত্তর-আফ্রিকায় সরাইয়া আনা হইয়াছে, গ্রীক গবর্ণমেণ্ট এখন ক্রীট দ্বীপে। সুতরাং প্রায় সমগ্র গ্রীসই এখন জার্ম্মানীর তাঁবে আসিয়াছে। জার্ম্মানী এখন চেষ্টা করিতেছে ইজিয়ান সাগরের গ্রীক দ্বীপগুলি অধিকার করিতে। দার্দ্দানেলিসের কাছাকাছি দুইটি দ্বীপ তাহারা দখলও করিয়াছে। নিকট প্রাচ্যে এখন জার্ম্মানীর কূটনৈতিক চাল চলিতেছে তুর্কীর ভিতর দিয়া তাহার সৈন্যবাহিনী পরিচালনের জন্য।

বল্‌কানের যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই ইরাকে এক গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে—সেখানে বৃটিশ বাহিনীর সহিত ইরাক বাহিনীর সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। বৃটিশ সৈন্যরা

হ্যাব্বানিয়ার সম্মুখস্থ মালভূমি অধিকার করিয়াছে এবং বসরার ব্যাঙ্ক, টেলিগ্রাফ অফিস, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বাড়ীঘর ইত্যাদি দখল করিয়া বসিয়াছে। আফ্রিকাতেও যুদ্ধ সমান ভাবেই চলিয়াছে—লিবিয়ার জার্মান ও ইটালীয় সৈন্যরা মিশরের দিকে অগ্রসর হইয়া তব্রুকের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। এদিকে বেনগাজীর পোতাশ্রয়ের উপরে বৃটিশ নৌবাহিনী গোলাবর্ষণ করিতেছে। আবেসিনিয়ার দক্ষিণ-আফ্রিকান ও বৃটিশ বিমানবহর গিমা, সিয়াসি আমলান, উবাদেরা ও আলাগীর উপর বিমান আক্রমণ চালাইতেছে, আবেসিনিয়ায় আম্বা আলাগী অভিমুখে অগ্রগতির পথে ভারতীয় সৈন্যদল আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিয়াছে এবং প্রতিপক্ষের ১৫০ সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। সুতরাং এখানে যুদ্ধের অবস্থা অনেকটা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়।

জার্ম্মানী আজ ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের প্রায় অধিকাংশ দেশকেই পদানত করিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে জার্ম্মানীর এই বিজয়ে লোকের মনে তাক লাগিয়া যাইতে পারে। কিন্তু আসলে এই বিজয়ের উপর তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। বর্ত্তমানে প্রকৃত যুদ্ধ চলিতেছে বৃটেনের সহিত জার্ম্মানীর। এই মূল যুদ্ধে জার্ম্মানী একপদও অগ্রসর হইতে পারে নাই আজিও। বৃটেনের উপর জার্ম্মানীর বিমান আক্রমণ প্রবলভাবে চলিতেছে বটে এবং ক্ষতির পরিমাণও বড় কম হইতেছে না। 'ইকোনোমিষ্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত এক হিসাবে দেখা যায়; গত এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বিমান আক্রমণ ও বোমা বর্ষণের ফলে বৃটেনের ২৯ হাজার ৮ শত ৫৬ জন নিহত হয় এবং ৪০ হাজার ৭ শত ৮৯ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে ১৩ হাজার ৭ শত ১২ জন পুরুষ, ১২ হাজার ১ শত ১২ জন নারী, এবং ষোল বৎসরের কম বয়স্ক শিশু ৩ হাজার ৬ শত ৪৪ জন। এই ক্ষতি যে দুর্ব্বিষহ তাহাতে সন্দেহ নাই। বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বৃটিশ নরনারী অবিচলিত চিত্তে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। বৃটিশের সামরিক শক্তি আজিও অব্যাহত এবং অটুট। ইউরোপ-বিজয়ী হিটলার এ পর্য্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন অংশেরও ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু সমগ্র ইউরোপ বিজয় করিতে যাইয়া তাহার শক্তি যতই ক্ষয় হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার পরাজয় ততই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। তাই জার্ম্মানী এখন বৃটেনকে তাহার সাম্রাজ্যের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টায় আছে। বল্কানের যুদ্ধ এই চেষ্টারই ফল। সুয়েজে তাহার আধিপত্য স্থাপনের জন্য এই দিক দিয়া সে অগ্রসর হইয়াছে। জিব্রাল্টারও তাহার আর একটি লক্ষ্য। এজন্য স্পেনকে দলে ভিড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে এবং ফ্রান্সের ভিসি গবর্ণমেণ্টের সহিত জার্ম্মানীর এক নূতন চুক্তি হইয়াছে। জিব্রাল্টার ও সুয়েজে আধিপত্য করিতে পারিলে জার্ম্মানীর অনেকটা সুবিধা হইবে বটে, কিন্তু তাহার শক্তি আরও ক্ষয় হইবে। এদিকে বৃটিশ সামরিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কাজেই, হিটলার আজ যতই বিশ্ববাসীকে তাক লাগাইয়া দিন না কেন শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জয়ের আশা কোথায়?

—

চীনে জাপানের নূতন উদ্যম

চীনে জাপানের সামরিক তৎপরতা অনেকটা ঝিমাইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি তাহার কর্ম্মতৎপরতায় নূতন উদ্যম দেখা দিয়াছে, জাপান চীনের কয়েকটি বন্দর অধিকার করিয়াছে এবং কুনমিং, এনসি, লিয়াংশান সহরের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। চীন যাহাতে বাহির হইতে কোন সাহায্য না পায় তাহারই জন্য এই ব্যবস্থা। বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন আর এদিকের প্রতি তেমন মনোযোগ দিবার ফুরসৎ নাই। এই অবসরে জাপান এসিয়ায় তাহার নববিধানকে চালু করিয়া লইতে চায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জাপ পররাষ্ট্র সচিব মাৎসুওকো হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার পরেই এই নূতন কর্ম্মতৎপরতা দেখা দিয়াছে।

—

রুশ প্রধান মন্ত্রীর পদে মঃ ষ্ট্যালিন

সম্প্রতি রাশিয়ার মন্ত্রী সভাতেও পরিবর্ত্তন হইয়াছে—মঃ ষ্ট্যালিন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইতিপূর্ব্বে মঃ ষ্ট্যালিন যদিও শুধু কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী মাত্র ছিলেন, তথাপি তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুযায়ীই রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হইত।

—
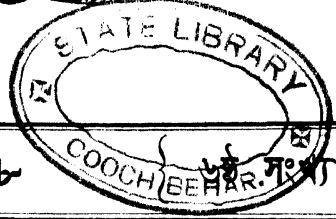
তৃতীয় বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৪৮ ষষ্ঠ সংখ্যা

আফগানদের পরিচয়

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, পিএইচ-ডি

ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি, আফগানিস্থান ভারতবর্ষ, পারস্য এবং মধ্য-এশিয়া এই তিন দেশ হইতে আগত বিভিন্ন মূলজাতি (races) এবং সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। বিভিন্ন মূলজাতি, কৌম (tribes), ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি একের পর আর তাহাদের নিজ নিজ ভূমিকা এখানে অভিনয় করিয়াছে। তাহারি ফলে বিভিন্ন মূলজাতিগত এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যযুক্ত অধিবাসীর দেখা এই দেশে আমরা পাইয়া থাকি। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, বিভিন্ন জাতির এই সংমিশ্রণ হইতে কি শেষ পর্য্যন্ত একীভূত নূতন কোন মূলজাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, অথবা এই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এখনও তাহাদের প্রাচীন জাতিগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিম্বা এই দেশের বর্ত্তমান অধিবাসীদের মধ্যে কি কি জাতিগত উপাদান দেখিতে পাওয়া যায় ? এই দেশ বর্ত্তমানে যে নামে পরিচিত (অর্থাৎ আফগানিস্থান) তাহা আফগানদের সংখ্যাধিক্যের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। সংখ্যায় তাহারাই বেশী, রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তিও তাহাদেরই। রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষার দিক হইতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা শুধু আফগান জাতিকেই জানে। কাবুলের কোন তাজিককে আফগান বলিয়া পরিচয় দিতে আমি নিজে শুনিয়াছি। সুতরাং আফগানরা কে, এই প্রশ্ন অবশ্যই উত্থিত হইতে পারে।

আফগানদের ভাষা পস্তু। পস্তু-ভাষা-ভাষীর মোট সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ। তন্মধ্যে ২০ লক্ষ আফগানিস্থানে এবং ১৫ লক্ষ বৃটিশভারতে এবং ইয়াঘিস্থানে (independent tribal land) বাস করে[১]। ট্রুম্প (Trumpp) এবং বেলুর[২] (Bellew) মতে পস্তু ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গাইগার[৩] (Geiger) এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে পস্তু ভাষা পূর্ব্ব-ইরানী ভাষাবর্গের অন্তর্গত। আফগানদের যে শুধু নিজস্ব ভাষাই আছে তাহা নহে, তাহাদের কৌমের নিজস্ব আইনও আছে। এই আইনের নাম 'পস্তুন্-ওয়ালী' (Pushtun wali)। এই আইন দ্বারাই তাহাদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

সুতরাং আফগানদিগকে তাদের প্রতিবেশীদের হইতে ভিন্ন কৌম বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে আফগানরা ইজরায়েলী অর্থাৎ ইহুদী এবং হিব্রু নৃপতি 'সলে'র[৪] বংশধর। আফগান কিম্বদন্তীতে রাজা 'সল'

১। *Encyclopædia des Islam.* P. 164.

২। Trumpp, *Verwandschafts Verhaltnisse der Pashto* i. d. z. d. D. Mg. Ges XXX; 10-155 XXXIII.

H. Bellew—*A Grammar of the Pukkte or Pukshtu Language*, London, M. D. CCCLXVII.

৩। W. Geiger, *Die Sprache der Afghanen—Grundriss d. Iran Phil*, Part I.

৪। Neamatulla,—*History of the Afghans.*

'মালিক তলুত' নামে অভিহিত। কেল্ডীয় সম্রাট নেবুকাড্‌নেজর (Nebuchadnezer) যে-সকল ইহুদীকে প্যালেষ্টাইন হইতে বন্দী করিয়া আনিয়া 'মেডিয়া'তে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং পরে যাহারা পূর্ব্ব-আফগানিস্থানের ঘোর প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল আফগানরা তাহাদেরই বংশধর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ফরিদ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ তাঁহার 'রিসালা আনসাব্‌ আফগানিয়া' নামক পুস্তকে ইজরায়েলীদিগকে ঘোর[৫] প্রদেশের কোহিস্থানে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, নির্ব্বাসিত হওয়ার পর ইজরায়েলীগণ দেশের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং 'আফগান', কাহারও মতে 'আওগান' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে। সেই সময় হইতে তাহাদের নাম আফগান হইয়াছে। কৈস বা কিশ নামক একজন মূল পুরুষ হইতে আফগানগণ তাহাদের বংশাবলী গণনা করিয়া থাকে। বতন, ঘুরঘস্ত এবং সরবন্দ বা সরবনস নামক তাহার তিন পুত্র ছিল। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, হজরত মহম্মদের প্রথম শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা মক্কা গিয়াছিলেন কৈস ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। হজরত মহম্মদ তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আব্দুর রসিদ নাম রাখেন। হজরত তাহাকে 'পাহ্‌টান' (Pahtan) বলিয়া ডাকিতেন। সিরিয় ভাষায় 'পাহ্‌টান' শব্দের অর্থ নৌকার হাল[৬] (rudder)। বোধ হয় ঐতিহাসিক নাম পাঠানকে পাহ্‌টানে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহাকে একটা ইসলামিক রূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আফগানরা ইহুদী বংশ হইতে উদ্ভূত কি না তাহা লইয়া বৃটিশ ভ্রমণকারী এবং লেখকদের মধ্যে বেশ তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আফগানদের দৈহিক গঠন তাহাদের মধ্যে প্রচলিত উক্ত কিম্বদন্তীর অনুকূল বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তাহাদের নাক ইহুদীদের[৭] নাকের মত এবং তাহাদের মুখমণ্ডলের গড়নে ইহুদীসুলভ অর্থাৎ সেমেটিক ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। 'বেলু' বহুদিন আফগানিস্থানে বাস করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আফগানরা ইহুদীবংশজাত এবং তাহারা ভারতীয়দের মধ্যে বসতি স্থাপন করিয়া ভারতীয় রীতিনীতি গ্রহণ করে। তিনি আরও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আফাগানদের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ 'বতন' ব্রাহ্মণ ছিলেন। বতন নামটি ব্রাহ্মণ নাম ভট্টের অনুরূপ। সরবান বা সরযুন এবং কৃষ্ণবান (কোন কোন লেখকের মতে 'খাবুশবন্দ') বা কৃষ্ণায়ুন যথাক্রমে প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশ এবং কৃষ্ণবংশ সম্ভূত রাজপুত ছিলেন।

নিয়ামৎউল্লা জনৈক আফগান আমীর খান্ জাহান লোদীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও সাহায্যে তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'আফগানদের ইতিহাস'[৮] প্রণয়ন করেন। আফগানরা রাজা সলের বংশজাত বলিয়া তিনি এই পুস্তকে সাব্যস্ত করেন, কিন্তু কতিপয় আফগান কুলের (clans) পূর্ব্বপুরুষ সেখ বতনের বংশধরদের নামের যে তালিকা তিনি এই পুস্তকে প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকটি হিন্দু নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা: ঘোরের বংশধরগণ, শেওরাণীর পুত্রগণ এবং হরিপাল। বেলু মনে করেন, শেওরাণী হিন্দু নাম শিবরাম ছাড়া আর কিছু নয়। এই পরিবারের হামিনের সাত পুত্র ছিল, তাহারা সকলেই প্রতিমাপূজক ছিল।[৯] 'তুবে'র চারি পুত্র ছিল। তাহাদের এক জনের নাম ছিল গাণ্ডারী[১০]। ডর্ন[১১] (Dorn) মনে করেন, 'তুরে'র রং কাল ছিল বলিয়া তাহার এই নাম হইয়াছিল। উল্লিখিত গাণ্ডারী, হেরোডোটাসের 'গাণ্ডারিতিস' এবং সংস্কৃত গান্ধারী কি

৫। Farid-uddin Ahmed,—*Risalah Ansab Afghaneeh,* p. 64.

৬। Neamatulla—*Ditto.*

৭। Bellew—*Races of Afghanistan.*

৮। Neamatull—p. 41.

৯। Dorn—Translation of Neamatullah's *History of the Afghans,* pp. 3-133.

১০। সংস্কৃত ভাষায় গান্ধারী শব্দের অর্থ গান্ধার দেশের অধিবাসী।

১১। Dorn—*Ibid,* p. 43.

এক এবং অভিন্ন? দামরের[১২] সাত পুত্র ছিল। তাহাদের এক জনের নাম ছিল রামদেও। এই নামটি যে হিন্দু নাম তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সরবানের[১৩] ছিল তিন পুত্র। তাহাদের নাম: শনি, সরপাল এবং বলি। এই তিনটি নামও নিঃসন্দেহরূপে ভারতীয়। নাগরের ছয় পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে দুই জনের নাম ছিল মরু এবং চন্দ। এই দুইটি নামও ভারতীয়। দানীর পুত্রদের মধ্যে এক জনের নাম ছিল দারপাল। এইটিও ভারতীয় নাম।

ইহা ব্যতীত গোওফর নামে একটি আফগান কৌম আছে। এই কৌমের কতক লোক সিন্ধু উপত্যকায় বাস করে এবং কতক বাস করে বেলুচিস্থানে। আরাকোশিয়ার (বর্ত্তমান কান্দাহার) পার্থীয় রাজা গোণ্ডোফারের সহিত কি এই কৌমের কোনরূপ সম্পর্ক আছে? এই রাজা কি পার্থীয় কৌমের কোন বীরপুরুষ ছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে এই নামটি আফগান নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে?

ঘিলজাইদিগকেও একটি আফগান কৌম বলা হইয়া থাকে। আফগান কিম্বদন্তী অনুসারে ঘিলজাইরা ঘোরের সুলতানের কৌমের অন্তর্গত এবং ঘোরের সুলতান ছিলেন ইরানী। গল্প প্রচলিত আছে যে, পারশ্য সম্রাট ফরিদুন পারসিক রাজবংশের জোহাক নামক জনৈক রাজপুত্রকে দেমাভান্দ (Demawand) পর্ব্বতের পাদমূলে ফাঁসী দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করেন। এই দণ্ডিত ব্যক্তি পারশ্যের রাজধানী 'ইস্তাখার' (Istakhar) হইতে পলায়ন করিয়া ফরিদুনের আক্রোশ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং কোহিস্থানে (ঘোর প্রদেশে) আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। শাহ হোসেন নামে জোহাকের জনৈক বংশধরের সহিত আফগান কৌমের আদি পুরুষ কৈসের পৌত্রী এবং সেখ বতন বা বত্তির কন্যা বিবি মাতো বা মাতুর গুপ্ত প্রণয় জন্মে। মাতৃত্বের লক্ষণ যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল তখন সেখ হোসেনকে সম্ভ্রান্ত বংশজাত জানিতে পারিয়া তাহার সহিত সেখ বতন স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। অতঃপর মাতু একটি সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করে। গুপ্ত-প্রণয়ের ফলে এই পুত্রের জন্ম হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম রাখা হয় ঘিলজাই। পস্তু ভাষায় 'ঘিল' শব্দের অর্থ চোর এবং 'জাই' শব্দের অর্থ জাত পুত্র[১৪]। সুতরাং 'ঘিলজাই' শব্দের অর্থ চোরের পুত্র।

মেজর রেবার্টি এবং মার্কোহার্ট[১৫] প্রমুখ বহু ইউরোপীয় লেখক এবং আরও অনেকে মনে করেন যে, ঘিলজাইরা মূলতঃ একটি তুর্কী কৌম এবং 'ইরান শাহর' এবং অন্যত্র যাহাদিগকে খিলাদ বা খিলিজি নামে অভিহিত করা হইয়াছে ঘিলজাইরা তাহারাই।

আরও অনেক কৌম আছে যাহাদিগকে আফগান বলিয়া ধরা হইলেও আসলে তাহারা আফগান নয়। নিয়ামৎউল্লা লিখিয়াছেন, "সৈয়দ মহম্মদ গিসুডিরাজ আফগানদের মধ্যে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং এই চারিটি বংশ সৈয়দজাদা অর্থাৎ সৈয়দের বংশধর। কিন্তু তাহাদিগকে আফগান বলিয়া ধরা হইয়া থাকে[১৬]। তিনি আরও বলেন, "ফারমুলী এবং খোটানীরা আফগান নয়। তাহারা ফারমুলী নামক স্থানের অধিবাসী। ফারমুলীরা একথা স্বীকার করে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ খাটা বা খোটান হইতে আসিয়াছে[১৭]।

যাহারা আফগান নয়[১৮] অথচ নিজদিগকে আফগান বলিয়া অভিহিত করে তাহারা 'সরবাতি' (Servatis)। ইহাদের সম্বন্ধে "খুলাশাত উলানসলি" (*Khulassat Ulansali*) হইতে আমি নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি: "সরবাতিরা আসলে আফগান না হইলেও আফগানদের ভাষা এবং আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া এবং তাহাদের সহিত সংমিশ্রণের ফলে আফগান বলিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং তাহাদিগকে আফগান বলিয়াই ধরা হয়।"

১২-১৩। নিয়ামৎউল্লা।

১৪। নিয়ামৎ উল্লা, পৃঃ ৪৪।

১৫। Marquart—*Eran Shahar.*

১৬। নিয়ামৎউল্লা, পৃঃ ৫৬।

১৭। নিয়ামৎউল্লা—পৃঃ ৫১।

১৮। আফগানরা বলে যে, কতকগুলি কৌম আছে যাহারা আফগান না হইলেও আফগান কৌমগুলির সহিত সংসৃষ্ট। তাহাদিগকে 'মিণ্ডন' (Minduns) বলা হয়। বিদেশীদের কাছে তাহারা আফগান বলিয়াই চলিয়া যায়।

সরবাতিরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত …। মূলতঃ তাহারা তাজিক, কিন্তু তাহাদের কতক তাজিক নয়[১৯]। ইহা দ্বারা গ্রন্থকার কি এই কথা বলিতে চান যে, মূলতঃ এই কৌম তাজিকদের লইয়া গঠিত হইলেও পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য কৌমের লোকও এই কৌমের সহিত আসিয়া মিশিয়াছে?

ইহা ব্যতীত, লগ্‌মান (সংস্কৃত লম্পক?) এবং স্বোয়াতের (Swat) (সংস্কৃত সুবস্তু) অধিবাসীদিগকে পাঠান বলিয়া ধরা হয়, যদিও আফগান বংশাবলীতে তাহাদের উল্লেখ দেখা যায় না। লগ্‌মানীদের নিজস্ব ভাষা আছে এবং এখনও সেই ভাষাতেই তাহারা কথা বলে[২০]। কিন্তু ইউসুফজাই আফগান কর্ত্তৃক বিজিত হওয়ার পর স্বোয়াতীরা তাহাদের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া পস্ত ভাষা গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে পাঠান বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। ইউসুফ-জাই কৌমের প্রধান মোল্লা এবং ঐতিহাসিক তাহার 'তাতকিরা'তে অর্থাৎ স্মরণ-লিপিতে (Memoirs) লিখিয়াছেন যে, ইউসুফ-জাই আফগান কর্ত্তৃক স্বোয়াত উপত্যকা আক্রান্ত হওয়ার পর "উহার অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং তাহাদের জাতীয় বিশুদ্ধতা (identity) হারাইয়া ফেলে। তাহাদিগকে 'স্বোয়াতী'[২১] নামে অভিহিত করা হয়[২২]।"

আফগানদের অর্থাৎ পস্ত ভাষা-ভাষীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে উল্লিখিত কিম্বদন্তী এবং পুরাকাহিনী আমরা পাইয়া থাকি। কিন্তু আফগানরা যে ইহুদী জাতি হইতে উদ্ভূত একথা ঐতিহাসিক সমালোচনার কষ্টিপাথরে কষিলে টিকে না। আফগানরা বলে, তাহারা খালেদ বেন ওয়ালীদের সহিত একই কৌমের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের এই কথাই উল্লিখিত মতবাদকে খণ্ডন করিতেছে। বলধুরী[২৩] প্রভৃতি আরব-বিজয়ের ইতিহাস লেখকগণ একথা কোথাও উল্লেখ করেন নাই যে, খালেদ বেন ওয়ালীদ পারশ্য অথবা আফগানিস্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন।

খালেদ বেন ওয়ালীদ আফগানিস্থান আক্রমণ করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কৈশ এবং তাহার কৌমের সমস্ত লোককে মদীনায় লইয়া যান, এই যে গল্প আফগানদের মধ্যে প্রচলিত আছে ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাজা তলুত (সল) এবং তাহার বংশাবলীর গল্পটি স্বতঃই আফগানদের ইহুদী বংশোদ্ভব হওয়ার কথা খণ্ডন করে। আমি নিজে বিভিন্ন কৌমের কয়েকজন আফগানের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। একজন ব্যতীত তাহাদের সকলেই আফগানরা ইহুদীবংশজাত একথা অস্বীকার করিয়াছেন[২৪]। তাহারা আরও বলিয়াছেন যে, এইরূপ কথা তাহারা পূর্ব্বে কখনো শোনেনই নাই। তাহাদের মধ্যে একজন আফ্রিদি মালিক (ভূম্যধিকারী) ছিলেন। আফগানদিগকে ইহুদী বংশজাত বলিয়া মনে করা হয়, একথা শুনিয়া তিনি খুব বিস্মিত হন। অধিকন্তু তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি তাঁহার পিতার নিকট শুনিয়াছেন যে, আফগানরা হিন্দুবংশজাত এবং পাঞ্জাবের অধিবাসীদের সহিত তাহারা এক মূলজাতির অন্তর্ভুক্ত। একজন শিক্ষিত তরুণ আফগানও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, আফগানরা যে হিন্দুবংশজাত তাহা সীমান্তবাসী কৌমের লোকেরাও স্বীকার করে। পূর্ব্ব-আফগানিস্থানের অধিবাসীদিগকে যাঁহারা দেখিয়াছেন

১৯। Dorn's translation of Neamatulla, p. 131.

২০। Imp. Gaz. Bk. V, p. 48.

২১। Quoted by Bellew, p. 69.

২২। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চিতোর যখন বিদেশী কর্ত্তৃক (সম্ভবতঃ আরব) আক্রান্ত হয় তখন যে-সব কৌম চি[illegible]র রক্ষার্থ সৈন্য পাঠাইয়াছিল তাহাদের নামের তালিকায় হুন এবং স্বোয়াতীদের নাম পাওয়া যায়। উল্লিখিত আছে যে, সুবস্তু (স্বোয়াত উপত্যকা) হইতে চিতোর রক্ষার্থ সাত শত অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়াছিল। কাবুল এবং সুবস্তু উপত্যকাকে বৌদ্ধ যুগে উদ্যান বলা হইত। কারণ, উহা উদ্যানের মত সুন্দর। এই সব স্থান বৌদ্ধ মহাযানীদের বড় কেন্দ্র ছিল। (Vaidya History of Mediaeval Hindu India দ্রষ্টব্য)। গ্রিয়ারসন বলেন, লগ্‌মান ও স্বোয়তীদের নিজস্ব ভাষা ছিল সংস্কৃত-মূলক।

২৩। Al-Baladuri, "Kitab Futuh" or the origin of the Islamic State.

২৪। A. Schwyn Blunt তাঁহার "India under Ripon" নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কাইরো সহরে তিনি প্যান-ইসলাম মতবাদের প্রবর্ত্তক বিখ্যাত জামাল উদ্দিন আফগানীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আফগানরা ইহুদী বংশজাত কিনা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন যে, আফগানী এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং বলেন যে আফগানরা উত্তর-ভারতের ন্যায় ইণ্ডো-আর্য্য বংশসম্ভূত।

তাঁহারা ভারতীয়দের সহিত তাঁহাদের সাদৃশ্য বা মিল দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারেন না। নিয়ামৎউল্লার পুস্তকে যেরূপ লিখিত আছে তাহাতে দেখা যায়, সবক্তগিন গজনভীর বংশ কর্ত্তৃক আফগানিস্থান বিজিত হওয়ার পর কৌমগুলির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে হইলে ই, ই, অলিভারের "Across the Border" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

আমার জনৈক পাঠান বন্ধু বলেন, আফগানরা ইহুদী বংশজাত বলিয়া যে কিম্বদন্তী প্রচলিত তাহার মূলে ঐতিহাসিক সত্য কিছু না কিছু আছে। কারণ, মুসলমানদের মধ্যে ইহুদী বংশজাত হওয়ার দাবী করা অপেক্ষা আরব বংশজাত হওয়ার দাবী করার আগ্রহই বেশী। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, কোন মুসলমানই নিজেকে ইহুদীবংশজাত বলিয়া দাবী করে না। কিন্তু তাঁহার যুক্তির মধ্যে ইহুদী-বিরোধী মনোভাবের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। হাতরাসের কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ বহুবার আফগানিস্থানে গিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তিনি যতই আফগানদের দেশে আফগানদিগকে দেখেন ততই তাঁহার ধারণা দৃঢ়তর হয় যে, আফগানরা হিন্দুবংশজাত। ইহুদী সম্পর্কিত কিম্বদন্তী কেন প্রচলিত হইল তাহার কারণ সম্বন্ধে তিনি একটি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলটি অধিকার করার পর ভারতীয় হিন্দুদের সহিত আফগানরা যে এক জাতি এই ধারণা আফগানদের মধ্য হইতে দূর করিবার জন্য বিজয়ী মুসলমানগণ প্রবলভাবে প্রচার-কার্য্য চালাইতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যেই আফগানরা ইহুদী বংশজাত এই গল্পের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কুমার মহেন্দ্র প্রতাপের মতে ইহুদী সম্পর্কিত কিম্বদন্তী প্রচলিত হওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ।

পূর্ব্বপুরুষ হিব্রু এই বিশ্বাস মুসলমানের কাছে ঘৃণাজনক হইতে পারে না এবং কোন মুসলমান যদি ইহুদীবংশজাত হয় তাহা হইলে একথা সে অস্বীকারও করে না। 'সুব্বিয়া আন্দোলন' সম্পর্কে লিখিত পুস্তকাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (GeldZieher "Islamische Studien" এবং খুদাবক্সের Islamic & Indian Studies নামক পুস্তকের Subbiyan Movement নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। খাইবারের (আরব) ইহুদীরা মুসলমান হইয়াছে, কিন্তু তাহারা যে ইহুদী একথা তাহারা অস্বীকার করে নাই[২৫]। আফগানগণ ফ্যারোয়াদের রাজত্বের সময়কার জনৈক মিশরবাসী পুরুষ এবং ভারতীয় স্ত্রীলোকের বংশধর এইরূপ কথা শুনিয়াছেন বলিয়া ফেরিশ্‌তা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুসার অধিনায়কত্বে ইজরায়েলীরা যখন মিশর হইতে চলিয়া আসিতেছিল সেই সময় ফ্যারোয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছিলেন। লোহিতসাগর পার হইবার সময় ফ্যারোয়ার সমস্ত অনুচরই লোহিত সাগরের জলে ডুবিয়া মারা যায়, কেবলমাত্র উল্লিখিত মিশরবাসীই রক্ষা পাইয়াছিল। অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পাইয়া উক্ত মিশরবাসী মুসার দলে যোগদান করে এবং ইহুদী ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া সুলেইমান পর্ব্বতে বাস করিতে আরম্ভ করে। এইখানে সে একজন ভারতীয় স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করে। তাহাদের সন্ততিরাই আফগান। আফগানিস্থানের অধিবাসীরা যে ভারতীয়দের বংশধর এ কথা অস্বীকার করিবার জন্যই উল্লিখিত আজগুবি গল্পগুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে। মুসলমানদের গ্রহণ যোগ্য করিবার জন্যই হিব্রু কাহিনীর সহিত আরবীয় কাহিনীকে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যাহারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের অনেকের বেলাতেই এইরূপ করা হইয়াছে। অনেক ভারতীয় মুসলমানের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে নূতন কাহিনী সহজেই বেশ শিকড় গড়িয়া বসে। বেলু ঠিকই বলিয়াছেন যে, অধিবাসীদের মধ্য হইতে অ-মুসলমান ঐতিহ্যের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার জন্য গজনভী এবং তাঁহার পরবর্ত্তী শাসকদের সময়ে সমগ্র দেশকে বনভূমিতে পরিণত করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষও এইরূপ অত্যাচার হইতে রেহাই পায় নাই। বর্ত্তমান যুগের সুধীমণ্ডলী যে-গান্ধার শিল্পের উচ্চ প্রশংসা করেন, এইরূপেই তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় সভ্যতায় প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। আফগানিস্থানের

২৫। তুর্কীতে দানমে নামক মুসলমান সম্প্রদায় ইহুদী কৌমের লোক এবং মুসলমান হইয়াও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে বলিয়া অভিহিত হয়। তাহারা নিজেদের পূর্ব্ব পরিচয় অস্বীকার করে না।

আধুনিক অধিবাসীরা তাহাদের অ-মুসলমান পূর্ব্বপুরুষদের সম্পাদিত শিল্পকলার নিদর্শন দেখিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হয় এবং অজ্ঞতা বশতঃ এইগুলিকে অলৌকিক বলিয়া মনে করে। তাহারা যে ভারতীয়দের বংশধর একথা শিক্ষিত আফগানেরা আজকাল স্বীকার করেন। আমি নিজেও একথা অনেকের নিকট শুনিয়াছি।

আফগানরা ইহুদী বংশজাত এই কাহিনী ঐতিহাসিক বিবরণ দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ হইতেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই দেশের অধিবাসীরা অর্থাৎ আফগানরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, এবং জারটুস্‌ট্রি (Zoroaster) প্রচারিত ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, যদিও ইহুদীরা এদেশে অজ্ঞাত ছিল না। Le Strenge বলিয়াছেন, "খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেও মুসলমান, ইহুদী এবং পৌত্তলিকগণ কাবুলের পৃথক্ পৃথক্ অঞ্চলে বাস করিত। (The Land of the Eastern Caliphate, p. 349)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ইবন হোকলের মতে "ঘোর ছিল বিধর্ম্মীদের দেশ, যদিও মুসলমানগণ সেখানে বাস করিত।" (p. 416)। একাদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে গজনবীর পরিচালনাধীনে ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয়।

মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে ইহুদীরা তোখরিস্থানে[২৬] (Toxristan—আধুনিক চীনা তুর্কীস্থান) বাস করিত।[২৭] ইহুদীরা এখনও মধ্য-এসিয়াতে বাস করে এবং বণিক হিসাবে তাহারা আফগানিস্থানের অধিবাসীদের নিকট অপরিচিত নয়। মধ্য-এসিয়ার জনৈক ইহুদী বণিক আমার নিকট একথার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ফেরিশ্‌তা বলেন যে, পরিশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আফগানরা সকলেই ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতীয় সীমান্তপ্রদেশে ভারতীয় ধর্ম্মের অস্তিত্ব উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কিছু কিছু বর্ত্তমান ছিল। Biddulpp (বিদ্‌দল্‌ফ) তাঁহার "Hindu-Kush Tribes" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আশী বৎসর পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে একজন লোকের মৃত্যু হয় যাহার সুন্নৎ করা হয় নাই। সে মৃত্যুকালে তাহার মুসলমান পুত্রকে তাহার মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া যায়। ইহুদীরা আফগানিস্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল একথা আফগানিস্থানের ইতিহাসে আমরা কোথাও পাই না। সুতরাং আফগানদের মধ্যে প্রচলিত উক্ত কিম্বদন্তী যে মুসলিম-উত্তর-যুগে রচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শুধু একজন লোক ব্যতীত আর কেহই ইহুদী সম্পর্কিত কিম্বদন্তী স্বীকার করেন নাই। যিনি এই কিম্বদন্তীকে স্বীকার করিয়াছেন তিনি বলেন যে, পুস্তকাদি হইতে তিনি ইহা জানিতে পারিয়াছেন। 'বেলু' মনে করেন যে, খুব সম্ভবতঃ এই সকল পার্ব্বত্য লোকেরা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর কোন মোল্লা তাহাদিগকে মুসলিম ঐতিহ্য অনুযায়ী বংশ পরিচয় প্রদান করিবার জন্য এই কিম্বদন্তীর সৃষ্টি এবং প্রচার করিয়াছেন। আফগানরা যাহাতে 'আল্‌কিতাবী' অর্থাৎ কোর-আন-উক্ত জাতির মধ্যে পরিগণিত হয় এই উদ্দেশ্যে ইহুদী সংক্রান্ত কাহিনী প্রচারিত করা হইয়াছে।

আফগানদের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন সম্পর্কে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সংস্কৃত ভাষাভাষী, পারসিক, বক্ত্রীয়, গ্রীক, শক, ইউ-চি, এপিথেলাইট হুন, পার্থীয় এবং আধুনিক যুগে তুর্কী, আরব এবং মোঙ্গলরা মধ্য-এশিয়ার এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে (আফগানিস্থানে) তাহাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে। তাহাদের প্রাচীন এবং আরবীয় বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে গবেষণা করিলে দেখা যায় যে, আফগানরা ইহুদীরাজ সলের বংশধর বলিয়া কাহিনী প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আধুনিক আফগান জাতির গঠনে ভারতীয়, তাজিক, পার্থীয় এবং তুর্কীদের দান রহিয়াছে যথেষ্ট।

উল্লিখিত বিভিন্ন মূলজাতি কর্ত্তৃক আফগানিস্থান আক্রান্ত হওয়ার কথা আফগানদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীতে পাওয়া যায় না। আফগানদের কাছে তাহাদের অতীত ইতিহাস অন্ধকারাবৃত। তাহাদের লিখিত বৃত্তান্ত অনুসারে আফগানরা বিদেশী, প্যালেষ্টাইন হইতে তাহারা এই দেশে (আফগানিস্থানে) আসিয়া দেখিতে পায় 'কাফের'গণ এখানে বসবাস করিতেছে। তাহারা 'কাফের'দিগকে পার্ব্বত্যপ্রদেশে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত বাসভূমিতে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

আফগানদের সম্বন্ধে অধিকতর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করিতে হইলে ঐতিহাসিক গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুযায়ী বিশ্লেষণমূলক গবেষণা করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

২৬। কনিষ্কের প্রাচীন মাতৃভূমিকে সংস্কৃত ভাষায় 'তুষার' বা 'তুখার' জাতির দেশ বলা হইত। এ সম্বন্ধে জয়চন্দ্র নারং প্রণীত 'ভারতবর্ষকা ইতিহাসকী রূপরেখা' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

২৭। See the remains brought to the Berlin Museum of Ethnology by the German Turfan Expedition.

সর্বজয়া

(কীর্ত্তন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কে তুমি কমলিনী !
সুখ-নূপুরে ব্যথা-বিধুরে তোমারে যেন চিনি !

সুপ্তিমাঝে তারায় দিলে দেখা...
জাগর-নভে বিছালে ভানুলেখা···
নিঝরভাষা বহে পিপাসা তোমারি সুহাসিনী !
সে-ঝঙ্কারে তাই তোমারে চিনি !

আলোর মণি যে-খণে মূরছায়···
ফুলের দীপ যে-খণে নিভে যায়···
সে-খণে তব মিলন-রব উছলে বিনোদিনী !
অশ্রুধারে আরো তোমারে চিনি !

সুষমা-সখী : তিমিরে তুমি জ্বালো
কিরণ-মালী : গরলে সুধা ঢালো
সমীপসুরে রণি' সুদূরে অলখ মায়াবিনী !
অচিন তৃষা বরণে দিশা চিনি !

স্বপনলোকে জোনাকি যত জ্বলে,
বিরহে যত সুরভি সঞ্চলে—
অঙ্গরাগে তোমারি জাগে উছসি'— নন্দিনী !
রূপের রাসে তব বিলাসে চিনি !

কুঁড়িটি যবে লুটায় অবিকাশে,
উষরে আঁখি অকালে মুদে আসে —
তোমারি ছবি-ছন্দ লভি' মরণে লয় জিনি' !
আসা-যাওয়ায় মধুরিমায় নিরুপমায় চিনি !

সন্ধ্যারাগ

(উপন্যাস)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অমিয়মামা ব্যস্ত ভাবে ঘরে ঢুকে পড়লেন, "বিজু, তোর নাকি অসুখ করেছে ? তোদের বনলতার ভাই, কি যেন নামটা, গিয়ে আমায় খবর দিলে। ব্যাপার কি বল্‌তো ?"

আপাদমস্তক একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বিজু শুয়েছিল। চোখের নীচে কালি, ফ্যাকাসে মুখ, বিবর্ণ ওষ্ঠাধর, অগোছাল চুল, সব মিলিয়ে তাকে মনে হচ্ছে যেন কত-কালের রোগী। একটু চিন্তিত ভাবে সস্নেহে তার কপালে হাত রাখলেন অমিয়মামা, "কি রে পাগলী, হয়েছে কি ? জ্বর ? কই, গা তো গরম নয়।"

"না, জ্বর হয় নি, এমনি শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।"

"খাটুনী বেশী পড়েছে বোধ হয়। এতদিন বাপের অসুখের ঝক্কি তো কম যায় নি। তার পরেই আবার ইস্কুলে পড়ানো, নিজের পড়া। ক'টা দিন বিশ্রাম চাই। চল্‌ না, আমার ওখানে গিয়ে থাকবি।"

বিজু জোর ক'রে একটু হাসলো, "কিচ্ছু ভাববেন না অমিয়মামা, আমি আজই উঠবো, এখন তো বেশ ভাল লাগছে। অসুখ বুঝি কারো হয় না ?"

"কিন্তু তোর তো অসুখ হয় না, আমি তো কই দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। যাক্‌, সাবধানে থাকিস্‌, বেশী কাজ-কর্ম্ম করিস্‌নে।"

তিনি চলে গেলেও বিজু তখুনি উঠল না। সামনের দেয়ালে একটা টিকটিকি ঘোরাফেরা করছে, তার গতি-বিধি মন দিয়ে দেখলে সে অনেকক্ষণ। পাশের বাড়ীতে হড়হড় শব্দে বোধ হয় ডাল ভাঙা হচ্ছে। এদিকে ইস্কুল বসেছে। মেয়েদের হাসি, কথা, শিক্ষয়িত্রীদের গম্ভীর গলার শাসন সব অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আজও তার ছুটি। আজও, কালও, পরশুও। তারও পরে, তারও পরে, চিরকাল তার ছুটি। এই যে শুয়েছে, আর সে উঠবে না। কার সাধ্যি তাকে ওঠায় ? কেন, সে কি যন্ত্র, তার ভাল-লাগা মন্দ-লাগা নেই ? সে কিছু চায় না। কেউ তাকে ভালবেসো না, কেউ কাছে এসো না, কেউ কিছু চেয়ো না, কেউ মাথা ঘামিও না তাকে নিয়ে। মানুষের তো কথাই নেই। কে কার বাপ, মা, ভাই, বন্ধু ? তার পৃথিবীতে ঈশ্বরও নেই। ঈশ্বর শুধু কথার কথা। হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, কেউ ফিরে তাকায় না, কি মানুষ, কি ঈশ্বর। পরাধীন দেশের নিরন্ন, নিরুপায়, পদদলিত, নির্যাতিত লক্ষ কোটি লোকের জন্যে ঈশ্বর নেই।

ভরা ফাল্গুন। দিনগুলি এত উজ্জ্বল, আকাশ এত নীল, গাছে গাছে নতুন সবুজের এমন আভা যে, চোখ চেয়ে চোখ ঠিক্‌রে যায়, তবু ফেরানো যায় না। কোকিলের অশ্রান্ত ডাকাডাকি। আমের মুকুলের গন্ধে, বাতাবীনেবু-ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী। সামনের পুকুরের এক ঘাটে সুরেশ পালিতের বুড়ী মা স্নান করছে। অন্য ঘাটে ডাক্তারের বাসার ফাজিল চাকর ছোঁড়া বাসন ধুতে এসে গান জুড়েছে,—

ও তার বয়েস ষোল, গড়ন ভালো
কালো চোখের তারা।

এই ফাল্গুন-মধ্যাহ্নের রূপের সঙ্গে গানের কথাগুলির কোথায় যেন সঙ্গতি আছে। বিজুও গুন্‌গুন করে, 'তার বয়েস ষোলো'...।

এই রকম শুয়ে শুয়ে সে শেষ ক'রে আনবে তার জীবন।

কারুর জন্যে ভাববার নেই। দেশকে ভালবাসি, দেশের কাজ করব ভেবে ভেবে যে মেয়েটির মাথা খারাপ হয়েছিল রোগ সেরেছে তার। আশ্চর্য্য বোধ হয়, কি ক'রে এতদিন বৃথা দিন কাটিয়েছে? দেশের কাজ করলেই বা কি, না করলেই বা কি, কি এসে যায় তাতে। বোকা যারা—নিতান্ত মূর্খ, তারাই এসব বাজে কাজ বাজে কথা নিয়ে ব্যস্ত হয়। নিজেদের ঘরে অন্ন-বস্ত্র নেই, খামোকা পরের ভাবনা ভেবে মাথা গরম করা। বুদ্ধি যদি কারো থাকে তবে তাদেরই যারা আজীবন সাহেবদের পায়ে তেল দিয়ে হাত জোড় ক'রে, নির্জ্জলা খোসামোদ ক'রে মোটা মাইনে ও নিশ্চিন্ত পেন্‌সান ভোগ ক'রে নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করছে। টিঁকে থাকা চাই যেমন ক'রেই হোক্। সেইটাই আসল কথা। পরাধীনতা আবার কি? ইংরেজ রাজত্বি চ'লে গেলেই আমাদের জন্যে স্বর্গ নেমে আসবে কিনা! কে বলতে পারে কষ্ট তখন আরো বাড়বে না, সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠবে না।

বিজু একটা গল্প লিখবে। একবার একটি বোকা মেয়ে এক পাগল ছেলেকে ভালবেসেছিল। ছেলেটি দেশ দেশ ক'রে মাথা খারাপ ক'রে ঘরের বার হোল। মেয়েটি ধরে রাখতে পারলো না, অথবা রাখলো না তাকে। কারণ, সে এত বোকা, ভেবেছিল দেশ ব'লে সত্যিই কিছু আছে। আর তার জন্যে সুখ-শান্তি ত্যাগ ক'রে ছুটে বেড়ানো বুঝি ভারী একটা কাজ। তার পরে পাগল ছেলেটি উধাও হয়ে গেল কে জানে কোথায়, আর সেই মূর্খ মেয়েটি বিছানায় শুয়ে কেঁদে কেঁদে মরে গেল।

না, মরে গেল না। তা'হলে আর ট্র্যাজেডি কি। অতএব শেষটা হবে এই রকম: মেয়েটি বেঁচে রইল আরো বহু—বহুদিন। ইস্কুলে পড়ালো, সস্তায় সংসার চালানোর ভাবনা ভাবলো, সুখী লোকদের সুখে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌লো। সুবিধে পেলে বিয়ে থা' ক'রে সংসারী হোল হয় তো। আর ছেলেটি একদিন ধরা পড়লো, ফাঁসী হোল তার। অথবা সদয় বিচারকের করুণায় আজীবন জেলে বসে হাতুড়ী পিটিয়ে পাথর ভাঙল, কি দড়ির সতরঞ্চি তৈরী করলো।

২

পর দিন বিজু সহসা সুস্থ হ'য়ে উঠলো। চুল বেঁধে, হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করলো। ইস্কুলে গিয়ে কয়েকদিনের বাকী কাজের মধ্যে তন্ময় হয়ে রইল অনেকক্ষণ। বিকেল বেলায় ফিরে এসে চা খেয়েই গেল বনলতাদের বাড়ী বিনা নিমন্ত্রণেই। সেখানে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে পরম আগ্রহে গল্প-গুজব ক'রে ঘণ্টা দুই পরে যখন ফিরল, একটু রাত হয়েছে। তবু সে খাওয়ার পরে তিনটি ঘণ্টা পড়াশুনা করলো। বিছানায় শু'ল বই হাতে নিয়ে, পড়তে পড়তে শেষটায় ঘুমিয়ে পড়লো।

স্বপ্ন দেখল—বিশাল সমুদ্রে নৌকো ক'রে সে চলেছে একা। যতদূর চাওয়া যায় জল আর জল। হঠাৎ ঝড় উঠলো, নৌকা ডুবে গেল। প্রাণপণে ভেসে ওঠবার জন্যে চেষ্টা করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙল।

আবার। সরু শুড়ি পথ বনের মধ্যে। খুব অন্ধকার। তাকে কে যেন তাড়া করেছে। ছুটতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটে গেল। জেগে উঠল সে। আর তার ঘুম এলো না। দেশলাই জেলে ঘড়ি দেখলো, এখনো দু'ঘণ্টা রাত আছে।

ব্যর্থ হ'য়ে গেল বিমলের প্রাণপণ চেষ্টায় গ'ড়ে তোলা সশস্ত্র বিপ্লব-অভিযান। অনেকেই ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে কুলমণি একজন। বিমল ধরা পড়ে নি। যারা পালিয়েছে তাদের জোর অনুসন্ধান চলছে। বিমলকে ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার। দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা ছিল বিমলের। তাকে ধরতে না পারা পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষের শান্তি নেই। যত দিন না ধরা পড়ে পিঁপড়ের গর্ত্তেও খোঁজ করা হোক্।

এই বড় আশ্চর্য্য, ক'লকাতার কেউ এখনও ধরা পড়ে নি। ফুলুবাবুদের দল এখনও নিরাপদ, তবে হেমন্তর দিদির বাড়ী খানাতল্লাস হ'য়ে গিয়েছে। তিন দিন আগে এ সব খবর খবরের কাগজের মারফৎ বিজুর গোচরে এসেছে।

কৃষ্ণপক্ষের শেষ, একটু আগে চাঁদ উঠেছে। এক-টুকরো জ্যোৎস্না ঢুকেছে ঘরে। এই শেষ হয়ে আসা রাত্রির গভীর মুহূর্ত্তগুলিতে কোন কারাকক্ষে কুলমণি মৃত্যুর

প্রতীক্ষা করছে! কোন পর্ব্বত গুহায়, কি নিবিড় অন্ধকার অরণ্যে, কি কোন সহৃদয় বন্ধুর আশ্রয়ে, কোন্ ছদ্মবেশের আড়ালে বিমলের আজ রাত্রি প্রভাত!

না, দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই, বিস্ময়ের কিছু নেই। বিমল, কুলমণি প্রথম নয়, শেষও নয়। বহু প্রাণ গিয়েছে, বহু আয়োজন নষ্ট হয়েছে, আরো হয় তো হবে। তাই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া নয়। তারা দীক্ষিত ক'রে গিয়েছে আমাদের। এবার আমরা এগিয়ে যাবো। আর সংশয় নেই, দ্বিধা নেই। পথ খুঁজে পেয়েছি। বিমলের ভুল হয় নি। "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"। আমাদের দেশ আমাদেরই চিরকাল। আমার মায়ের গায়ে অন্যে হাত দিলে সহ্য করতাম কখনো? জন্মভূমি মাতৃভূমি। তাঁর মান রাখতে প্রাণ দেবো। এর মধ্যে দ্বিধা কোথায়? চল, এগিয়ে যাই। কুইক মার্চ্চ।

কিন্তু মন যতই কুইক মার্চ্চ করুক তাকে শরীরের সঙ্গে তাল দিয়েই চল্‌তে হয়। মন তার এদেশেই ছিল না। কিন্তু ক'লকাতায় চ'লে যাবার উপায় নেই। তার আয়ের ওপর বাবার সেবা-যত্ন নির্ভর করে, তার কাছে থাকার জন্যে অপেক্ষা করে তাঁর মনের আনন্দ, এখান থেকে এখন নড়া অসম্ভব।

অগত্যা এখানে থাকতেই হবে, কিন্তু আর একটা মুহূর্ত্ত ব'সে কাটানো নয়, সেই মীমাংসা হ'য়ে গিয়েছে বিমলের ব্যর্থতায়। এতদিন তার ইচ্ছে ছিল, উৎসাহ ছিল, পথ খুঁজে পায় নি। এখন মনে হচ্ছে, যে কাজ সামনে আসবে সেই প্রকৃত কাজ। কোন কাজটা সব চেয়ে ভালো এই মীমাংসা কোনদিন হ'তে পারে না। অগত্যা, সব রাস্তাই রোমে নিয়ে যাবে, এই সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয়।

বিজু যা পারে এখানেই করবে। তার ইস্কুলে সে মেয়েদের মন গড়ে তুলবে। এই বনলতা, সুনীতি, এদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে দেশের প্রতি মমতা। যে আগুন তার মধ্যে জ্বলছে, সে উত্তাপ সঞ্চারিত করবে এদের শিরায় শিরায়, নিজেদের অভাব সম্বন্ধে সচকিত ক'রে তুলবে এদের মন। ফুলুবাবুও লিখেছেন, ইচ্ছে থাকলে সুযোগের অভাব ঘটে না।

প্রথম এসে এদের মধ্যে বিজু একটু আড়ষ্ট হ'য়ে থাকতো। সহকর্ম্মীদের সঙ্গে মিশতে পারতো না। মেয়েদের সঙ্গে পড়ানোর সময়টুকু ছাড়া বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, আর প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন ছিল। কাজের সময়টুকু ছাড়া সব সময়ে সে নিজের চারিদিকে গণ্ডী টেনে আলাদা হ'য়ে থাকতো। এখন সে জোর ক'রে সেই উদাসীনতা পরিহার করলো। নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করলো পারিপার্শ্বিকে। অবসর সময়টুকু পড়াশুনো নিয়ে কাটতো।

দেখতে দেখতে তার ভাব জমে উঠলো সকলের সঙ্গে। তার সুখ-দুঃখের ভাগ সে কাউকে দিতে পারলো না বটে, কিন্তু অন্যদের অভাব অভিযোগের কাহিনী শুনতে শুনতে তার প্রাণান্ত হবার যো হোল। সে এতদিন কাটিয়েছে চাঁপাতলি আর ক'লকাতায়। একদল লোকের সঙ্গে মিশেছে যারা মনে প্রাণে ভাব ভঙ্গীতে, কথায়, রীতিতে সম্পূর্ণ গ্রাম্য, অমার্জ্জিত। তাদের মধ্যে ভেজাল নেই। তাদের মূর্খতা, অজ্ঞতা, হিংসা বিদ্বেষ ঘোঁট পাকানো সবই প্রকাশ্য। এক কথায় তারা সরল। আর ক'লকাতায় যে সব লোকের মধ্যে সে থাকতো (অবিশ্যি মেয়ের সংখ্যাই বেশী), তারা প্রায়ই লেখাপড়া-জানা, তারই মত। রুচি নিয়ে মনে মনে সকলেরই গর্ব্ব। মনের ভাব রেখে ঢেকে বলা, অন্ততঃ বাইরের ভদ্রতায় ভেতরের বিকৃতি[illegible] আড়াল কোরবার চেষ্টা সকলেরই, এবং প্রায় সকলেই নিজেকে নিয়ে অহংকৃত। কিন্তু এই রাজগঞ্জে এসে তার মানুষ সম্বন্ধে কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হোল। ইস্কুলের মেয়েদের সঙ্গে মিশে সে বুঝল যে, ক'লকাতার মেয়েদের মত নানাদিকে এরা নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পারছে না, অথচ অল্প বয়সের আগ্রহ ও প্রাচুর্য্য মনে জেগেছে এদেরও। কেবলই ব্যাহত হচ্ছে এদের শিক্ষা। যে মেয়েটির পড়ায় মন নেই, অথচ গান গাইতে পারে, কি ছবি আঁকার সখ আছে, কি খেলাধূলো ভালবাসে, ব্যবস্থার অভাবে সে সব দিকের পরিণতি এখানে সম্ভব নয়। যে বড় লোকের মেয়ে শুধু সাজগোজ করতে বা ফ্যাসান শিখতেই ভালোবাসে, ক'লকাতায় সুবিধে আছে তার। সে একা

পড়ে যাবে না, কিন্তু এখানে সে শুধু নিজের অতৃপ্তি ও অপরের চাঞ্চল্য বাড়িয়ে তোলে। যে মেয়েটির পড়া-শুনোয় সত্যি মন আছে, প্রতিযোগিতা ও শেখাবার ভালো লোকের অভাবে ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে তার আগ্রহ। আলো-হাওয়া বঞ্চিত তরুর মত এদের বাড় হচ্ছে না দেহ-মনের।

যতটুকু তার সাধ্য চেষ্টা সে করতে লাগলো এখানে মেয়েদের মধ্যে মনের আড়ষ্টতা ঘুচিয়ে দেবার। কিন্তু একাজে বাধা পেতে লাগলো সে সব দিক থেকেই। কয়েক রকমের খেলাধূলো প্রচলন করতে গিয়ে সে অবাক হ'য়ে দেখলো যে, কয়েকটি মেয়ে খেলার দিনে ইস্কুলে আসে না। একটি মেয়ে অভিভাবকের এক চিঠি আনলে। "আমার মেয়েকে ইস্কুলে পড়তে দিয়েছি, খেলা শিখতে পাঠাই নি, সে জন্যে ইস্কুলের আবশ্যক হয় না। ওকে জোর ক'রে খেলাবার দরকার নেই কিছু।"

অন্য দিকে শিক্ষয়িত্রীরা তাদের বাঁধা অভ্যস্ত কাজের বাইরে কিছু কিছু কাজ বাড়ায় নিতান্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। সকলেই যথাসাধ্য ফাঁকি দিতে লাগলো। বনলতা মুখে সব কথাতেই বিজুর সঙ্গে সায় দিয়ে তলে তলে কাজে অবহেলা করতে লাগলো সব চেয়ে বেশী, তবে এমন কৌশলে যে সহসা ধ'রে ফেলবে, বিজুর এমন ক্ষমতা ছিল না। এদিকে ইস্কুলের কর্তৃপক্ষের কয়েক জন তাকে ডেকে মিষ্টি কথায় অথচ দৃঢ় ভাবেই বুঝিয়ে দিলেন যে, মাইনর ইস্কুলকে হাইস্কুলে গ'ড়ে তোলবার জন্যেই তাকে আনা হয়েছে। সে মেয়েদের পড়ার প্রতি যেন বিশেষ মনোযোগ দেয়, দরকার হ'লে ইস্কুলের সময়ের বাইরেও ক্লাস নিয়ে তাদের ভাল ক'রে তৈরী করা চাই।

এমন সময় একদিন অবিনাশ এসে উপস্থিত। সে কয়েক দিন কোথায় গিয়েছিল। এসে বলল, 'মদের দোকানে পিকেটিং ক'রে খুব মার খেয়ে এলাম পুলিশের হাতে। সার্ট যদি খুলে ফেলি দেখবেন পিঠে বেতের দাগের অন্ত নেই। মা খুব কান্নাকাটি করছে। আমি বলি, আরে এই তো কলির সবে সন্ধ্যে—মার খাওয়ার এখুনি হয়েছে কি।"

তার পর বলল, "দেখুন, টুনীর কাছে আমি সব শুনেছি। ইস্কুলের জন্যে যা করছেন আপনি, ইতিহাসে সোনার অক্ষরে আপনার নাম লেখা হ'য়ে থাকবে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে যে কি মহান্ হয়ে ওঠে তার প্রমাণ…।"

বাধা দিয়ে বিজু বলল, "আপনি আজ আসুন, আমি আমার মামাবাড়ী যাচ্ছি। না, না, আপনাকে সঙ্গে যেতে হবে না। আমি হরদম একা যাই, কতটুকু বা পথ!"

কিন্তু অবিনাশ নাছোড়বান্দা, সঙ্গ নিয়ে ছাড়লো। সে বার বার ক'রে বল্‌তে লাগলো, সঙ্গে যেতে তার কোন কষ্ট হবে না। এখন হাতে কোন কাজ নেই। এখানে শিক্ষিত লোকের বড় অভাব, দুটো কথা কারুর সঙ্গে ক'য়ে সুখ নেই। বিজুর সঙ্গ তাই তার এত ভালো লাগে।

বিজু মনে মনে বললে "ক্লাউন"। মুখে কিছু না বলে সে গট্ গট্ ক'রে হাঁটতে সুরু করলে। অবিনাশ তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "খুব জোর হাঁটতে পারেন দেখছি। এই তো চাই। 'না জাগিলে যত ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগেনা'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কথা।"

বনলতার বাড়ীতে প্রায় রোজ যেতে হয়। নইলে তার মা শুকনো চোখ আঁচলে ঘসে বলেন, "তুমি না এলে যে মা আমার সন্ধ্যে কাটে না। মা-হারা মেয়ে, আর জন্মে তুমি আমার পেটে জন্মে ছিলে, নইলে এত টান হয়? মা বলে ডেকো আমাকে তুমি।"

বনলতা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে বলল, "তা তোমার মেয়ে ক'রে নাও না কেন, বিজুদির বাবাও একটি ছেলে পাবেন।"

এ সব রসিকতায় গা জ্বলে যায় বিজুর, কঠিন মুখে সে চুপ ক'রে থাকে, মনে মনে জপতে থাকে:

"অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।"

মাঝখানে বহু দিন সে সুতো কাটে নি। এবার বাড়ী এসে অবধি আবার সুরু করেছিল। বিকেলে এদের বাড়ীতে আসতে সে সঙ্গে তকলি নিয়ে এসে আপন মনে সুতো তৈরী করতো। বনলতা তার সুতো কাটা নিয়ে

অনেক ঠাট্টা করতো, "আপনি এখানে না থেকে বিজু-দি সবরমতী গিয়ে থাকুন, সেখানে আপনার খুব আদর হবে।"

তার মা খেঁকিয়ে উঠতেন, "আদরটা কোনখানে কম লো টুনী, নিজের মত সবাইকে ভাবিসনে। ও মেয়ের পায়ের ধূলো নিলে তরে যাবি।"

মুখ কালো হ'য়ে যেত বনলতার, এমন ভাবে সে মার দিকে তাকাতো যে বিজুর বুঝতে বাকী থাকতো না, এর শোধ সে নেবে। অদ্ভুত মা কিন্তু। অকর্ম্মণ্য, অলস বড় ছেলের প্রতি তাঁর দরদের অন্ত নেই। আর যে মেয়ের রোজগারে তাঁর ভাত-কাপড় তাকে কথায় কথায় তিনি অপমান করেন।

এ বাড়ীর ছোট ছেলে চুণী কোনদিনই বিজুর সঙ্গে মেশবার জন্যে একটুও আগ্রহ দেখায় নি। বছর ষোল বয়েস, বেশ ভাল স্বাস্থ্য, অবিনাশ বা বনলতার মত নয়। সে দিনের অর্দ্ধেক খেলার মাঠে কাটায়, সন্ধ্যেবেলা প্রায়ই সিনেমা দেখতে যায়। টিকিটের পয়সা কি ক'রে যোগাড় করে সেই জানে। স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। বনলতা অনেক চেষ্টায় অনেককে ধ'রে একটা দোকানে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল, খোরাকী বাবদ পাঁচ টাকা মাইনে। সে কাজও এদানীং সে ছেড়ে দিয়েছে। একান্ত অকর্ম্মণ্য। তিন ভাইবোনেই শরীর-চর্চ্চায় উৎসাহী, তবে অবিনাশ ও বনলতা চর্চ্চা করে রূপের, চুণী চর্চ্চা করে স্বাস্থ্যের।

কয়েকদিন হয় বনলতা তার এক ছাত্রীর বাড়ী খুব যাওয়া-আসা সুরু করেছে। কয়েকদিন সন্ধ্যেবেলায় তার বাড়ীতে গিয়ে বিজু তাকে পায় নি। বনলতা কৈফিয়ৎ দিয়েছে, মেয়েটি পড়ায় ভারী কাঁচা, একটু সাহায্য চায়, কাছাকাছি বাড়ী, কি ক'রে সে অস্বীকার করে। বিজু এ নিয়ে আর ভাবে নি। কিন্তু ইস্কুলে পঙ্কজিনী ও সুনীতি বনলতার আড়ালে দু'দিন ধ'রে যে সব আলোচনা করছেন বিজুর কানে তা কিছু কিছু এসেছে। বনলতা নাকি ছাত্রীর উপকারের অছিলায় নিজের উপকারের চেষ্টায় আছে। মেয়েটির দাদা মেডিকেল ইস্কুল থেকে পাশ ক'রে নতুন ডাক্তার হ'য়ে এসেছে। দু-একদিন বনলতার মায়ের চিকিৎসা সে করেছিল, সেই উপলক্ষে পরিচয়। এখন বনলতার রোজই সে বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া চাই। অবিশ্যি ছাত্রীকে পড়াবার মহৎ উদ্দেশ্যেই সে যায়, কিন্তু সে বেচারীর পড়া কদ্দূর হয় সেটা সহজেই অনুমেয়।

বনলতার নামে নানা কানাঘুষো বিজু এসে অবধিই শুনছে। এমন কি একদিন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের একজন তাকে এ নিয়ে একটা ইঙ্গিত করেছিলেন। বিজু ভাবে, সব কথাই যদি সত্যি হয় তবুও বনলতাকে কতটুকু দোষ দেওয়া যেতে পারে? আর পাঁচটি মেয়ের মতই সেও একজন। তার বয়েস হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে খানিকটা। সারাদিন খেটে রোজগার ক'রে মা ভাইদের প্রতিপালন করছে সে। কিন্তু এ ছাড়া কি তার আর কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকতে নেই? সহর শুদ্ধ লোক তাকে সংযত হবার বাছা বাছা উপদেশ দিতে ব্যস্ত, কিন্তু কোন্ অধিকারে শুনি? যে যৌবন তাকে কর্ম্মে প্রেরণা যোগায়, জীবন-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে, সেই যৌবনই তার মর্ম্মে আকুলতা ও আবেগ জাগিয়েছে, সে ভালবাসতে চায়, সংসার করতে চায়, সে চায় তাকে নিয়ে কেউ ব্যস্ত হোক্। এই তো অপরাধ! মা ও ভাই স্বার্থপর, তারা নিজেদের নিয়েই আছে, আর সহরের হিতৈষীরা তো সম্বন্ধ ক'রে বনলতার একটা বিয়ে দেবেন না! বনলতার পক্ষ নিয়ে সকলের সঙ্গেই মনে মনে বিজু ঝগড়া করে।

কিন্তু বনলতা নির্ব্বিকার। রঙীন শাড়ী প'রে, পাউডারে মুখ সাদা ক'রে সে স্কুলে আসে। পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে পঙ্কজিনী ও সুনীতির সঙ্গে সরস পরচর্চ্চা করে। বড়মা'র বাড়ীর পাঁচটা খবর নেয়। ডাকের চিঠি এলে বিজুকে অনাবশ্যক প্রশ্ন করে, লালুর মা'কে মিছিমিছি খাটাতে চায়। কোন ভদ্রলোক মেয়ে ভর্ত্তি বা অন্য কোন দরকারে বিজুর সঙ্গে দেখা করতে এলে বিজু টের পায় ওদিক থেকে অন্যরা বিশেষতঃ বনলতা কান পেতে রয়েছে। সে বাড়ী গেলে চিঠিপত্র নিয়ে এক আধটু গোলমাল এখনও হয়, বিজুর মনে সন্দেহ না হ'য়ে পারে না। পঙ্কজিনী ও বনলতা বিজুর চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী, তাকে নিয়ে তাদের ব্যাকুলতার অন্ত নেই। চিঠি এলে নিতান্ত ভালমানুষের মত প্রশ্ন করে বনলতা, "কার চিঠি বিজয়াদি, সবাই ভালো আছে

তো? টানা টানা হরফ, ছেলেদের হাতের লেখা মনে হচ্ছে।"

একটা কড়া জবাব ঠোঁটে এসে পড়ে বিজুর, অত্যন্ত রাগ হয়। তবু সামলে নিতে হয়, কার সঙ্গে ঝগড়া করবে? ক'রে লাভ কি? এরা তো তার জগতের লোক নয় যে তার মন বুঝবে? সেও তো এদের ধরণ বোঝে না।

ইতিমধ্যে একদিন খবরের কাগজে দুটো খবর চোখে পড়লো। ইভা বোস বরের সঙ্গে বিলেত গিয়েছিল। সেখানে এরোপ্লেন চালাতে শিখে সে পাইলট হয়েছে, সেই পোষাকে তার ছবি ছাপা হয়েছে। নিজে প্লেন চালিয়ে সে ভারতবর্ষে আসবে, এই খবর।

দ্বিতীয় খবর হচ্ছে, কলকাতায় এক পার্কে কম্যুনিষ্টদের বিরাট এক সভা হয়েছিল। বে-আইনি বক্তৃতার দরুণ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রকাশ সরকারের নাম আছে।

ইভা? স্ফূর্ত্তিতে উজ্জ্বল, আনন্দে ভরপূর, কালোর ওপরে কি সুন্দর মুখখানা। বড়লোকের মেয়ে, বাড়ীতে মেম গভর্ণেস্ ছিল, ইংরিজি বল্‌তো ইংরেজ মেয়ের মত। সব খেলায় সে অগ্রণী ছিল আর গায়ের জোরে ছিল প্রায় পুরুষের মত। সে ঘরে এসে ঢুক্‌লে বিজু-মঞ্জুদের সব সমস্যা এক মুহূর্ত্তে সরল হ'য়ে যেত। ইভার সামনে কেউ গম্ভীর হ'য়ে কোন গভীর আলোচনা করবে সাধ্যি কি? পিঠ চাপড়িয়ে, হেসে, ইংরিজি গান গেয়ে, অজস্র বাজে গল্পে আবহাওয়াটা সে লঘুতায় পূর্ণ ক'রে দিত। প্রাণপণে সাজতো। বিজু-মঞ্জু হাজার বক্তৃতা দিয়ে তাকে বিলিতী জিনিষ কেনা বন্ধ করতে পারে নি। তাদের শাসনে মুখটা একটু করুণ ক'রে বল্‌তো, "কি কোরব ভাই, আমি যে লোভী মানুষ, সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখলে কিছুতে না কিনে পারি নে। তোদের মত রং-চটা মোটা মোটা জামা-কাপড় পরা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার রুচিতে বাধে।" অথচ বিজুদের দিশী জিনিষের দোকানে সেই ছিল প্রধান খদ্দের। মঞ্জু হেসে বলতো, "নে, পরিস নে, তবু দুটো টাকা দে, মন্দের ভালো।"

আই-এ পাশ ক'রেই এক টাকা ও টাকওয়ালা ব্যারিষ্টারকে বিয়ে ক'রে সে বিলেত যায়, তার পরে খবরের কাগজে এই খবর।

সতী-দি কি করছেন? বিজু জানে তিনি কি করছেন। চশমা-পরা গম্ভীর মুখে সরকার এণ্ড ফ্রেণ্ডস্-এ বসে বই বিক্রি করছেন সতী-দি, নির্ভুল।

যদি সে কলকাতায় চলে যেতে পারতো। আর তো তার মনে দ্বিধা নেই। যে কাজ সামনে আসে তাই সে করবে। তার চেয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণী লোক সব দলেই আছেন। কাজেই যে-কোন দলেই সে যোগ দিক্, কিছু ক্ষতি নেই।

পাখীর মত উড়ে, জয়ের আনন্দে দিগন্ত মুখরিত ক'রে তুলবে, বিজুরও ইচ্ছে করে, করে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, অরণ্যে, মরুভূমিতে দুঃসাহসী অভিযান। রসিটা ফরবেসের মত সেও বই ছাপাবে—"The Worst Journey in the World"। তার চার দিকে কত যে ইঙ্গিত, উৎসাহের অক্সিজেনে বাতাস ভরপূর। বিজু অনুভব করে, কৈশোরের উদ্দাম কল্পনা আজো তাকে ত্যাগ করে নি। সে যদি ইভার সঙ্গী হ'তে পারতো। যেখানে যে যা কিছু কঠিন কাজ করেছে, বিজুর সায় আছে, অংশ আছে তাতে, বেঁচে থাকাটা বৃথা নয়।

কিন্তু কুলমণির বেঁচে থাকার মেয়াদ কয়দিন?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভারতীয় চিত্রকলা

অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, এম-এ

আজকাল আমাদের দেশে শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলাকে জগতের সমক্ষে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার একটা প্রবল প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। ভাল কথা। স্বদেশীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি বহির্জগতে সম্মান পেলে সকলেরই ভাল লাগে। কয়েকজন বিদেশীয় শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তিও এঁদের সেই প্রচেষ্টাকে সাহায্য করেছেন, তাতে এঁরা অধিকতর উৎসাহিত হয়েছেন সন্দেহ নেই।

সত্যিই অজন্তার প্রাচীন প্রাচীর-চিত্রগুলি প্রশংসার যোগ্য। সুদূর অতীতে আমাদের দেশে যে এরূপ শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল একথা ভাবতে সকলেরই হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠবে গর্ব্বে, আনন্দে, উত্তেজনায়, একথা সুনিশ্চিত। কিন্তু সব জিনিষের মধ্যেই একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত। তাই অজন্তাগুহার চিত্রপদ্ধতির প্রশংসা করতে করতে যখন তথাকথিত চিত্ররসজ্ঞেরা কালীঘাটের পটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন তখন সত্যিই তাঁদের রসজ্ঞতায় সন্দেহ জন্মে। স্বাদেশিকতা জিনিষটা ভাল, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়, অন্তত: Artএর ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে যে নয়, এ কথা অবিসংবাদিত। কালীঘাটের পট বা জগন্নাথক্ষেত্রের পটের প্রশংসা যাঁরা করেন তারা একটা উগ্র স্বাদেশিকতার বশবর্ত্তী হয়েই করেন, সূক্ষ্ম রসবোধের বশবর্ত্তী হয়ে নয়, এই কথাটাই আমি জোর দিয়ে বলতে চাই। কারণ, সত্যিকারের শিল্পরসবোধ বলতে যা বোঝায় তা কালীঘাটের পটুয়াদের নেই, ছিলও না কোন দিন।

এই জাতীয় অন্যায্য প্রশংসার আরও একটা ক্ষতির দিক আছে। শুধু যে এতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত শিল্পচেতনা গড়ে উঠে রসবোধের ক্ষমতা কমিয়ে দেয় তাই নয়, এতে অপদার্থ শিল্পজ্ঞানহীন শিল্পীরা প্রশ্রয় পায় অন্যায় ভাবে, এবং সত্যিকারের শিল্পীরা হয় অনাদৃত, অবহেলিত। সমষ্টিগতভাবে তাতে দেশের শিল্পসাধনার ক্রমোন্নতি ব্যাহত হয়। তাই এ পন্থা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

এবার অজন্তার প্রাচীর চিত্রের কথায় আসা যাক। পূর্ব্বেই বলেছি এ আমাদের গৌরবের বস্তু। অজন্তার প্রাচীনতম চিত্রগুলি খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় শতকে অঙ্কিত। সর্ব্বশেষ চিত্রগুলি সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমাপ্ত হয়। সুতরাং এক অজন্তায় আমরা প্রায় হাজার বৎসরের চিত্রাঙ্কনের ইতিহাস দেখতে পাই।

এই হাজার বৎসরের মধ্যে অবশ্য শিল্পসৃষ্টির ধারণা ও শিল্পবোধ বহু দিক দিয়ে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল, এবং শিল্পীরা নিজেও সকলে সমান শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। তাই তাঁদের সম্বন্ধে এক কথায় কিছু বলা অসম্ভব। তবে সাধারণভাবে এ কথা বলা যায়, যে সেই সুদূর অতীতে তাঁরা যে শিল্পসৃষ্টির অপূর্ব্ব নিদর্শন রেখে গেছেন, তা সত্যই গৌরবের বস্তু। বাস্তবতার দিক দিয়ে পম্পীর প্রাচীর-চিত্রের সমকক্ষ না হলেও, ভাবব্যঞ্জনা এবং রেখামাধুর্য্যের দিক দিয়ে তা কোনো অংশেই কম নয়। কিন্তু একথার মানে এ নয় যে, এযুগেও আমাদের তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হবে। ঠিক এই ভুলটিই আমাদের দেশের এক দল চিত্রশিল্পী করে চলেছেন বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরে। তাঁরা বলতে চান, যখন অজন্তা-পদ্ধতি সত্যিই একটা বড় জিনিষ, এবং স্বদেশীও বটে, তখন কেন আমরা বৃথা ইয়োরোপের বাস্তবতাকে অনুকরণ করতে যাব? অজন্তা-শিল্পকেই অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করে নিয়ে যুগোপযোগী করে নিয়ে কেন আমরা চিত্রাঙ্কন করব না? তাঁদের দেখাদেখি আরও অনেক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল, রাজপুত পদ্ধতি, মুঘল পদ্ধতি, বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট, কালীঘাটের আর্ট, উড়িষ্যার আর্ট, অন্ধ্রজাতীয় কলাশালা, আরও কত কি। অক্ষম, সক্ষম বহু শিল্পী বেঙের ছাতার মত নানা দিকে গজিয়া উঠল হাজারে হাজারে,—ফলে সত্যিকারের শিল্প পড়ে গেল ধামা চাপা। বেজে উঠল প্রোপাগ্যাণ্ডার রণদামামা, ছাপা হতে লাগল ছবি মাসিক পত্রে ম্যানুফ্যাকচারিং স্কেলে, সমালোচনা হতে লাগল উচ্ছ্বসিত স্বরে বিলিতি নজীর তুলে কোটেসন-কণ্টকিত

হয়ে—দেশের লোক ভাবলে সত্যিই তো এমন জিনিষও আমাদের দেশে ছিল! আর আমরা কিনা সস্তার মোহে ভুলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এটা প্রোপাগ্যাণ্ডার যুগ। প্রোপাগ্যাণ্ডায় সবই হয় স্বীকার করি, কিন্তু টিঁকে কি? প্রোপাগ্যাণ্ডার জোরে আজ অবশ্য ভারতীয় কলাকে একটা মস্ত বড় উচ্চাসন জোগাড় করে দেওয়া অসম্ভব হবে না, কিন্তু মহাকালের কষ্টিপাথরের অমোঘ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে কি? স্বকীয় মর্য্যাদা না থাকলে কোনো বস্তুই চিরদিন উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। তার পতন অনিবার্য্য, এবং যখন সে পড়ে—বোধ হয় উঁচু থেকে পড়ে বলেই—তখন সে একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এ কথা শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

অজন্তা শিল্প সত্যিই একটা বড় জিনিষ, কিন্তু সে দেড় হাজার বছর আগেকার পারিপার্শ্বিকে। তার পরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক নূতন তথ্য, তাই এই বিংশ শতাব্দীতে চলবে না তারই অনুবৃত্তি, যা এক দিন গৌরবের বস্তু ছিল দেড় হাজার বছর আগে। এই দেড় হাজার বছরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে, উক্‌সেলোর দূরাভাষতত্ত্ব (perspectivity) আবিষ্কৃত হয়েছে, পাওয়া গেছে দালাক্রয়ের ছায়াবর্ণতত্ত্ব (colours of shade),—আলোছায়া (light and shade) ও বর্ণৌজ্জ্বল্য (brightness of colours—pointillism) সম্বন্ধেও অনেক নূতন তথ্য জানা গেছে। এনাটমী, দৃষ্টিকোণতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি আমরা প্রচুর। এখন আমরা দেড় হাজার বছরের পুরানো ষ্টাইল ও টেকনিক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না,—থাকলে, সেটা হবে আত্মঘাতী পন্থা।

তারপরে জ্ঞানের রাজ্যে, শিল্পের রাজ্যে প্রাদেশিকতার স্থান নেই। কোন্ তত্ত্ব কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে, এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল শিল্পীর সৃষ্টি সুন্দরতর হল কিনা নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে। তা যদি হয়ে থাকে তা হলেই সার্থক হল শিল্পীর শ্রম—সে তত্ত্ব স্বদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে, কি বিদেশে, সে বিচার অবান্তর। উগ্র জাতীয়তা শিল্পের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। ধরা যাক কাব্যের কথা, উদাহরণ হিসাবে। আমরা সবাই জানি, রবীন্দ্রনাথের জন্ম কখন আমাদের দেশে সম্ভব হত না, যদি না তার পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় কাব্য-সমুদ্রের ঢেউ আমাদের দেশের তীরে এসে লাগত। আমরা আরও জানি, ঈশ্বর গুপ্তই বাংলার শেষ খাঁটি জাতীয় কবি। কিন্তু তাই বলে কি কেউ আমরা বলতে পারি, আমরা চাই না রবীন্দ্রনাথকে—যেহেতু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান—আমরা গড়ে তুলব বাংলার ভাবী কাব্য-সাহিত্য ঈশ্বর গুপ্তকে ভিত্তি করে? আমাদের দেশে এককালে রসায়ন, জ্যোতিষ, ভেষজতত্ত্বের উন্নতি হয়েছিল প্রচুর, কিন্তু তাই বলে কি এমন বাতুল কেউ আছে যে বলবে, আমরা চাই না লাবোয়াজিয়ে-লাপ্লাস-নিউটন-আয়েনষ্টাইন-পাস্তর-লিষ্টারের নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব, আমরা গড়ে তুলব আমাদের নববিজ্ঞান চরক-সুশ্রুত-বরাহমিহির-ভাস্করাচার্য্য-লীলাবতীর পর থেকে, তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে? নবযুগের নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের চলতেই হবে, নইলে আমরা শিল্পজগতের জীবন-সংগ্রামে তুচ্ছ হয়ে, লুপ্ত হয়ে যাব।

এখানে একটা কথা বিশদ করে বুঝিয়ে বলা দরকার। সাধারণ পাঠকের মনে হতে পারে, আমি প্রাচীন ভারতের চিত্রকলার নিন্দা করছি। মোটেই না। আমি শুধু বলছি, কেবল মাত্র প্রাচীন কালের অনুবৃত্তি করে চললে সিদ্ধি মিলবে না; আধুনিক কালের জ্ঞানসমৃদ্ধিকে শ্রদ্ধা করতে হবে, হবে তার সাহায্য নিতে, তার সঙ্গে সমান গতিতে তালে তাল রেখে চলতে হবে। নিন্দনীয় যদি কিছু থাকে প্রাচীনত্বে, তবে সে শুধু যে ভারতেই আছে তা নয়, আছে চীনদেশে, আছে জাপানে, আছে যবদ্বীপে, আছে দক্ষিণ-আমেরিকায়; এবং অন্যান্য আরও অনেক স্থানেই আছে। তারা সবাই নিজের নিজের কালে গৌরবান্বিত ছিল সন্দেহ নেই,—এখনো তারা পুরাতাত্ত্বিকের আদরের বস্তু, কিন্তু প্রতিদিনের মানব-মনের রসের খোরাক যোগাবার পক্ষে তারা পর্য্যাপ্ত নয়। তাদের পিছনে ফেলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে নূতন

নূতন পথে, নব নব আবিষ্কারের আলোকবর্ত্তিকায় উজ্জ্বল পরিচিত রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে, নইলে কেবল তাদেরই অনুবর্ত্তন করে ফিরলে মিলবে না সেই সিদ্ধি, যা মহা-ভবিষ্যতের নির্ম্মোঘ বিচারালয়ে পাবে সম্মানের আসন।

ইয়োরোপেও একদিন বাইজ্যাণ্টাইন রীতির প্রভাব ছিল প্রচুর। কিন্তু যে-দিন তারা বুঝতে পারলে যে, এ তাদের সিদ্ধির পথ নয়, সেই দিনই তারা তা ছেড়ে দিয়ে ধরলে সত্যের পথ। তাই তাদের আজ এত গৌরব, এত সমৃদ্ধি। নইলে যদি তারা আজও মিথ্যা স্বাজাত্য-বোধের দোহাই দিয়ে বাইজ্যাণ্টাইন রীতিকেই আঁকড়ে ধরে থাকত, তা হলে কোথায় থাকত তাদের রেনেসাঁস্ যুগের রথী-মহারথীরা যাঁদের নাম করতে সমগ্র বিশ্ব শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। সিমাবু নিজে এক জন খুব বড়দরের শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু বিশ্ব তাঁকে শ্রদ্ধা করে তিনি ইয়োরোপের অঙ্কনরীতিকে এই অধঃপতনের পথ থেকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন বলে। সিমাবু যদি না জন্মাতেন তা'হলে রেনেসাঁস যুগের মাইকেল এঞ্জেলো, রাফেল, দা ভিঞ্চি প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের অভ্যুদয় সম্ভব হত না কোনো দিন ইয়োরোপে। আমাদের দেশেও এখন সিমাবুর মত দূরদর্শী শিল্পী নেতার প্রয়োজন হয়েছে—শিল্পধারাকে নিশ্চিত অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

সত্যিকারের শিল্পী তার পাঠ নেয় প্রকৃতি থেকে। কোন চিত্র যদি স্বাভাবিক না হয়, তা হলে তা ভালো বলে গণ্য হবার যোগ্য হতে পারে না। এর জন্যে প্রয়োজন শিল্পীর পরিমিতিজ্ঞান (sense of proportion) ও দূরাভাষজ্ঞান (sense of perspectivity)। সকলের তা থাকে না,—সব শিল্পী সমান শক্তিশালী নয়। তাই বহু স্বল্পশক্তিশালী শিল্পী প্রকৃতিকে আদর্শ না করে করে গুরুর অঙ্কন-পদ্ধতিকে, তাঁর উপদেশকে। এইরূপে কয়েক পুরুষ বাদে গড়ে উঠে স্কুল। এই স্কুল জিনিষটাই শিল্পোন্নতির পক্ষে মারাত্মক। এই স্কুল গড়ে উঠার ফলেই শিল্পী হারায় তার স্বচ্ছ দৃষ্টি, চিত্র হয়ে উঠে অস্বাভাবিক। তখন তারা আঙুল আঁকতে আঁকে cucurbita tendril, কটি আঁকতে ডমরু, গ্রীবা আঁকতে শঙ্খ, স্তন আঁকতে তিনটা concentric circle, চোখ আঁকতে concavo-convex lens-এর radial section, তখন তারা রঙ্ নির্ব্বাচন করতে ভাবে colour contrast, তাতে গাছের পাতা নীল হলেও ক্ষতি নেই, আকাশ সবুজ হলেও চলবে, বেগুনী রঙের ঘোড়া দেখবার দুর্ভাগ্যও হয়েছে আমাদের।

এ দুর্ভোগ শুধু ভারতবর্ষে নয়, সব দেশেই হয়েছে, যেখানেই স্কুল গড়ে উঠেছে সেখানেই। চীন, জাপান, যবদ্বীপ সব দেশেই হয়েছে—ইয়োরোপেও বাদ যায় নি। আধুনিক কালে Futurism, Cubism প্রভৃতি নাম নিয়ে সেই একই জিনিষ দেখা দিচ্ছে সেখানে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন পরিবেশে।

এই শ্রেণীর শিল্পীদের একটা বড় যুক্তি হ'ল এই যে, চিত্রকর যদি প্রকৃতিকেই অনুকরণ করবে, তা হ'লে ফটোগ্রাফিই তো হ'ল সবচেয়ে বড় আর্ট—কষ্ট করে ছবি আঁকবার আর দরকারটা কি? এই জাতীয় sophistryর জবাব দিতে হ'লে অনেক কথাই বলতে হয়,—সব কথা বলবার মতো সময় এবং স্থান এক্ষেত্রে নেই। তাই সংক্ষেপেই বলব।

প্রত্যেক শিল্পকলাই নিজ নিজ নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। সঙ্গীত বাঁধা তার সুরে তালে, কাব্যে তার ছন্দে, কথা-সাহিত্য তার স্বাভাবিকত্বে। কথা-সাহিত্য যদি তার স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে কল্পনার বেগে উদ্দাম হয়ে ছোটে, তা হলে তা হয়ে দাঁড়াবে আরব্য উপন্যাস—আধুনিক উপন্যাস-পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারবে না। তেমনি কাব্যে যদি ছন্দঃপতন হয়, সঙ্গীতে যদি তাল মান না থাকে, তা হলে তা কখনই উচ্চশ্রেণীর কাব্য বা সঙ্গীত বলে গণ্য হতে পারে না। তেমনি চিত্রকলাও তার নিজের নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা—সে শৃঙ্খল হ'ল তার স্বাভাবিকত্ব। স্বাভাবিকত্ব-হীন চিত্রকলা অলঙ্করণ (decoration) পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারে—কিন্তু সত্যিকারের চিত্র বলে গণ্য হতে পারে না। চিত্রকরকে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতেই হবে তার চিত্রে—তার বাইরে তার স্বাধীনতার ক্ষেত্র। ফটোগ্রাফির সঙ্গে চিত্রের তুলনা হতে পারে না এই জন্যে যে, ফটোগ্রাফারের কোনোই স্বাধীনতা নেই চিত্র সংরচনার মধ্যে। প্রকৃতিতে

আমরা কোনো বস্তু সম্পূর্ণ (perfect) হিসাবে পাই না। চিত্রকরের কর্ত্তব্য হ'ল নানা স্থান থেকে অসম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য আহরণ ক'রে একত্র সংগ্রহ করা। সৌন্দর্য্যের এই সম্পূর্ণতা (perfection) বিধানের প্রচেষ্টাই হ'ল শিল্প। তার পর শিল্পীর দ্বিতীয় কাজ হ'ল composition বা সংস্থান-রচনা। তৃতীয়, ভাব-প্রকাশ বা expression। এসব ক্ষেত্রেই শিল্পীর স্বাধীনতা অবাধ। তা ছাড়া সামঞ্জস্য, সুষমা, বর্ণসমাবেশ, নাটকীয়তা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক ক্ষেত্র তো আছেই।

এস্থলে ভারতীয় শিল্পীরা প্রায়ই বলে থাকেন, দেহ-গঠনে সঠিক পরিমিতি (correct proportion) বজায় রাখতে গেলে ভাবপ্রকাশ (expression) ব্যাহত হয়। অর্থাৎ চিত্রে প্রকৃতির অনুকরণ করলে ভাবাবেগ (emotion) বা চরিত্র (character) ঠিক ঠিক ফোটানো যায় না। কিন্তু চরিত্র বা ভাবাবেগের ধারণা মানুষ পেলে কোথা থেকে? প্রকৃতি থেকেই তো? সে জিনিষ প্রকৃতিতে যদি সম্যক্ ফুটে থাকে, তা হলে প্রকৃতির অনুকারী চিত্রে ফুটবে না কেন? তাঁরা প্রায়ই উদাহরণ স্বরূপ বলে থাকেন, ভারতীয় কলানুযায়ী ক্ষোদিত ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তিতে যে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ফুটে উঠেছে প্রকৃতি-অনুকরণ-কারী গ্রীক্-শিল্পদ্বারা প্রভাবান্বিত গান্ধার-শিল্পের বুদ্ধ মূর্ত্তিতে তা ফোটেনি কেন? তাঁরা বলতে চান গান্ধার-শিল্প কম ভাবপ্রকাশক হতে বাধ্য কারণ তা দেহগঠনে প্রাকৃতিক পরিমিতিতত্ত্ব (natural proportion) মেনে চলে। এর উত্তর হচ্ছে, গান্ধার-শিল্পীরা বুদ্ধমূর্ত্তিতে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ফোটাতে চান নি মোটেই,—তাই তা ফোটে নি,—তাঁরা ফোটাতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেবের সৌন্দর্য্য এবং ললিত-সৌকুমার্য্য (beauty and loveliness)—যা তাঁদের মনে বিশেষ করে আবেদন জাগিয়েছিল। গান্ধার-বুদ্ধমূর্ত্তিকে বিচার করতে হবে সেই দিক দিয়ে। যা তাঁরা ফোটাতে চান নি, তা নিয়ে তাঁদের বিচার চলে না। আমগাছে কেন আপেল ফলল না, এ নিয়ে আমগাছের কাছে অনুযোগ করা বৃথা। আমগাছে আমই ফলবে—তার বিচার করতে গেলে দেখতে হবে আমগুলি সুখাদ্য কিনা, মিষ্ট কিনা। যাঁর আপেল নইলে ভালই লাগবে না, তাঁর আপেল গাছের কাছেই যাওয়া উচিত, আম গাছের কাছে নয়। তবে অবশ্য কার আম ভাল লাগবে, কার আপেল, এ নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজ নিজ রুচির উপর। তেমনি বুদ্ধমূর্ত্তিতে গাম্ভীর্য্য ভাল কি সৌকুমার্য্য ভাল, এ নিয়ে তর্ক চলে না,—সে নির্ভর করে দর্শকের নিজস্ব রুচির উপর।

তুলনা করা চলে কেবলমাত্র সমজাতীয় জিনিষের মধ্যে। যেমন, লেংড়া আম ভাল কি বোম্বাই ভাল, এ হয় তো কতকটা বলা যায়, এবং দেশী টোকো আম যে এদের তুলনায় ভাল নয়, তা নিঃসংশয়েই বলা চলে। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় লেংড়া আম ভাল কি বাটা কোম্পানির জুতা ভাল তা হলে সত্যিই ভারি মুস্কিল বাধে। তাই গান্ধার শিল্পের বুদ্ধমূর্ত্তির ভাবব্যঞ্জনার সঙ্গে তুলনাই যদি করতে হয় তা হলে ভারতীয় শিল্পের এমন কোনো উদাহরণ নিতে হবে যাতে সৌন্দর্য্য এবং ললিত-সৌকুমার্য্য ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই তুলনাই হবে সত্যিকারের বিচার।

তা ছাড়া, ভারতীয় চিত্র-শিল্পীরা ভাবপ্রকাশের উন্নতি বিধানের জন্যেই যদি পরিমিতি-জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়ে থাকেন তো তাতেই বা তাঁদের কতটুকু ফল লাভ হয়েছে? তাঁরা কি আজও এমন একখানা ভাবপ্রকাশক চিত্র আঁকতে পেরেছেন যার তুলনা চলতে পারে রাফেলের Madonna de San Sistoর সঙ্গে, বা লিয়োনার্দো দা ভিন্সির The Last Supper কিংবা Mona Lisaর সঙ্গে, বা মুরিলোর The Immaculate Conceptionএর সঙ্গে, বা মিলের The Order of Releaseএর সঙ্গে, বা রেনলডসের The Infant Samuelএর সঙ্গে, বা টিসিয়েনের The Magdalen-এর সঙ্গে, বা পয়েণ্টারের Faithful unto Death-এর সঙ্গে?

তবে এ বৃথা চেষ্টা কেন? তা ছাড়া যদি সত্যিই পরিমিতিজ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিলেই ভাবপ্রকাশ সুলভ হয়ে পড়ত, তা হলেও শুধু পরিমিতিজ্ঞানের নিজস্ব মূল্যের জন্যেই তাকে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত হত না। কল্পনার উদ্দাম প্রসার স্বাভাবিক উপন্যাসে চলে না—স্বাভাবিকত্ব

বর্জ্জন করলে চলে, যেমন চলেছিল আরব্য উপন্যাসে, পারস্য উপন্যাসে, দিদিমার রূপকথায়। তাতে এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে তাদের চিত্তাকর্ষকতা বেড়ে যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে কি তাদের আর্টিষ্টিক্ মূল্য কমে যায় নি? শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের সঙ্গে কি কেউ ঠাকুরমার ঝুলির স্থান দেবে?

এত কথা বললাম শুধু এই জন্যে যে, এতে দেশের একটা বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। ভারতীয় শিল্পীদের এই মিথ্যা প্রোপাগ্যাণ্ডায় ভুলে দেশের লোক বিপথে যাচ্ছে, তাদের রুচি বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, তারা স্বচ্ছ দৃষ্টি হারাচ্ছে। তা ছাড়া যাঁরা সত্যিকারের শিল্পী তাঁরাও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কম না। এখনো আমাদের দেশে হেমেন্দ্রনাথের মত, দেবীপ্রসাদের মত শিল্পী ব[illegible], এ আমাদের গৌরবের কথা। কিন্তু তাঁদের প্র[illegible]দেশের লোকেরও একটা কর্ত্তব্য আছে—সেইটুকু শুধু [illegible] করিয়ে দেওয়াই এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দ্বন্দ্ব

শ্রীপ্রীতিকুমার বসু

(গান)

আমার মন যে আমায় মানে না।
আমার প্রাণের মনের এই দ্বন্দ্ব
কেউ তো জানে না।
আমার মন যে আমায় মানে না॥

(আমার) মনের সাথে যখন আমি খেলি,
বিচার করে যখন পথ চলি,
প্রাণের দাবী যায় সে কেবল দলি,
আমার প্রাণের খবর মন তো রাখে না।
আমার মন যে আমায় মানে না॥

(আমার) প্রাণ বল্লে, তোমায় ভালোবাসি,
তবু তোমার মালা হলো বাসি,
মন বল্লে, সে যে গলার ফাঁসি,
আমার প্রেমের পরশ তাই সে পেলে না।
আমার মন যে আমায় মানে না॥

আমি জানি তুমি চেনো মোরে.
সেই চেনা রাখবে আমায় ধ[illegible]
তোমার পাশে তোমার প্রেমের ডোরে,
আমার প্রাণের কথা থাক্ না অজানা।
আমার মন যে আমায় মানে না॥

শিশু—ভোলানাথ

(গল্প)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

ভোর না হ'তেই সেদিন সকলের কানে গিয়ে পৌঁছল একখানি কীর্ত্তনের সুর। তন্দ্রার ঘোরে কেউ কেউ ভাবল—বুঝি স্বপ্নের রেশটা এখনও মেটেনি। যারা স্বপ্ন দেখেছিল ভাল, তারা আবার একটু শুয়ে থাকে ভোরের স্বপ্ন সফল হ'তে পারে এই আশায়, গানের সুরটা তাদের মনকে ঝঙ্কৃত ক'রে তুলেছে। যারা খারাপ স্বপ্ন দেখছিল তারা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, গানের অনুসরণ ক'রে কান পেতে থাকে—যাকে সামনে পায় তাকে জিজ্ঞেস করে—কলের গান হচ্ছে কোথায়?

উত্তর আসে—সতীপ্রসন্নর বড় জামাই এয়েচে...

মুহূর্ত্তে গ্রামের সমস্ত আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটল সতীপ্রসন্নর বাড়ী: তার বড় জামাই এসেছে—সঙ্গে এনেছে কলের গান।

সতীপ্রসন্নর বড় জামাই বাইরের ঘরে বহু রেকর্ড ছড়িয়ে নিয়ে কলের গান দিয়েছেন।

ও পাড়ার চক্কোত্তি মশাই বাতের ব্যথা ভুলে উঠে এসে বললেন—আরে রজনী বাবাজী, কখন এলে?

রজনী তাঁকে প্রণাম ক'রে বললেন—এই কাল শেষ রাত্রে এসেছি জ্যাঠামশাই।

সতীপ্রসন্নর বড় জামাই রজনীর বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। সামনের দিকে সুবৃহৎ টাক পড়েছে—অর্থ-প্রাচুর্য্যের প্রমাণ দেয় হয়ত। বহুদিন পর এসেছেন শ্বশুরবাড়ীতে। সরকারী চাকরি করেন—বেশ মেজাজী চাকরি।

সতীপ্রসন্নর অবস্থা তত ভাল নয়—তত ভাল নয় কেন, বেশ একটু মন্দই। অথচ তাঁর এ রকম জামাইভাগ্য দেখে অনেকেই বিয়ের সময় ঈর্ষা করেছিল—কেউ বা সন্দেহ করেছিল, জামাইয়ের কোন অসুখ-বিসুখ আছে। কিন্তু তাদের সন্দেহ অমূলক—রজনী কেবলমাত্র চীৎকার ক'রে কথা বলেন আর একটুতেই রেগে ওঠেন—এবং মানুষ রাগলে যেটুকু আবোল-তাবোল কথা বলে তিনিও সেইটুকুই করেন—তবে তাঁর রাগ হ'লে তিনি অনেকটা শিশুর মতই হয়ে যান এবং শিশুরা ভোলানাথের চেলা বলেই তিনি বয়স ভুলে যান—এই দোষটুকু ছাড়া তাঁর আর কোন দোষ নাই। আর তিনি যে চাকরি করেন তাতে এমন চীৎকার ক'রে কথা বলার দরকারই নাকি হয়। রজনীর অনেক তেজস্বিতার গল্প প্রচলিত আছে—একবার নাকি কোন্ এক খুনের তদন্তে গিয়ে দশজন ডাকাতকে তিনি এক হাতে নিঃশেষ ক'রে এসেছিলেন। সেই রজনী এবার শ্বশুরবাড়ী এসেছেন দশ বৎসর পর।

বাড়ীর ভেতর থেকে এক কাপ চা এল আর সঙ্গে এল পাঁপরভাজা। রজনী একবার কি ভাবলেন। সামনে বসে আছে তীনু, ও পাড়ার দীনু ভট্টাচার্য্যের ছেলে। রজনীর বিয়ের সময় সে ছিল একাই এক-শ। তাকে উপলক্ষ ক'রেই রজনী আর এককাপ চায়ের জন্য ভেতরে তাগিদ দিলেন। অন্দর থেকে পালটা জবাব এল—চা আর করা হয়নি—যদি দরকার থাকে ক'রে দেওয়া যাচ্ছে।

তীনু ঢোক গিলে বলল—না থাক্।

রজনী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—তা কি হয়, আচ্ছা দাঁড়াও।

আর একটা কাপ নিয়ে এসে অর্দ্ধেকটা চা সেই কাপে ঢেলে তীনুকে দিলেন। তীনু আপত্তি করলো না।

এই আসরে তীনুই একমাত্র ব্যক্তি যে রজনীর এমন কাছে ঘেঁসতে পেরেছে। তীনু এই ফাঁকে একবার বলে বসে—দাদাবাবু, আপনি যে সেবার আমাকে একটা চাকরি দিবেন বলেছিলেন?

তীনুর বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেছে—এখনও চাকরির আশা রাখে—রজনী তীনুকে তবু নিরাশ করেন না।

—আচ্ছা এইবার চেষ্টা ক'রে দেখব।

রজনীর কণ্ঠস্বরে গভীর আন্তরিকতা। তিনি একটু লজ্জাই পেলেন—এত বছর এই ব্যাপারটা ভুলেই গেছলেন। তীনু একটু হাসে—হাসিটা তার বিস্তার লাভ ক'রে কান পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছায়। তার চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে—কিন্তু অবাক কাণ্ড—রজনীর কাপের চা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে—বড়লোকের চা পান এমনিই বটে।

বাগচীদের বাড়ীর রমার ছেলেটিও লেখাপড়া ছেড়ে কলের গান শুনতে এসেছে। লেখাপড়ায় ছেলের অমনোযোগ দেখে রমা তেড়ে এল।

—লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, সকালবেলা পড়াশুনা নেই? গান শুনতে এসেছিস যে বড়—চল আগে বাড়ী।

বিশ্বনাথকে অনেকদিন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যারা লেখাপড়া করে, তাদের সকালসন্ধ্যা নষ্ট করতে নেই, কোন রকম আমোদ-প্রমোদ করতে নেই। বিশ্বনাথের বয়স বছর-সাতেক হবে, কিন্তু উপদেশ সে অনেক বড়-বড়ই শুনেছে।

বিশ্বনাথ ওরফে বিশু কাঁদ কাঁদ সুরে বলল—ওই ত রতিদা'ও রয়েছে।

—তা থাকুক, তুই যাবি কি না বল—না হ'লে এই—

ঝঙ্কার দিয়ে কি এক শপথ করতে যাচ্ছিল রমা, রজনী তাকে নিরস্ত করলেন।

—থাক্ থাক্, রমা থাক্—বিশু ছেলেমানুষ।

রমা সম্পর্কে রজনীর শ্যালিকা।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে রজনী কথার জের টেনে বলতে লাগলেন—ছেলেপিলে—শিশু—এরা দেবতা, এদের লক্ষ্মীছাড়া বলতে নেই—ওদের লক্ষ্মীছাড়া গাল দিলে দেবতা অসন্তুষ্ট হন।

বিশুকে ডেকে একটুকরা পাঁপর ভাজা তার হাতে তুলে দিয়ে রজনী আবার বললেন—শিশু ত নয় ওরা ভোলানাথের দল।

রমা কি একটা বলতে যাচ্ছিল—তাকে থামিয়ে রজনী বললেন—যদি শুনতে চাও তো শোন—

গ্রামোফোনের উপর ঘুরছিল যে রেকর্ডখানা—সেখানা নামিয়ে রাখলেন, সাউণ্ডবক্স থেকে পিন্‌টা রাখলেন খুলে। যাঁরা একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁরা একটু কাছে ঘেঁসে বসলেন শোনবার আগ্রহে। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে রজনী একবার কেসে বলতে আরম্ভ করলেন ধীরে ধীরে যেন পুরাকালের ঋষি সমাহিত চিত্তে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিচ্ছেন। রজনী যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ ক'রে ঘটনাটা বিবৃত করতে থাকেন—কারণ তিনি সত্যিই ঋষি নন, তাঁর অনেক কাজ আছে—অর্থাৎ ভাল ভাল রেকর্ডগুলো এখনও সকলকে শোনান হয় নি। রজনী বলতে আরম্ভ করলেন:

আমার দাদার একটি ছেলে ছিল—নাম শশাঙ্কমোহন। নামটা আমিই রেখেছিলাম। তার অন্নপ্রাশনও আমার হাতেই হয়—সে-সব কথা তোমরা হয়ত জান, তোমরা এ-ও জান যে দাদা বৌদির মত ভালমানুষ আর হয় না—কিন্তু ছেলেটা ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত হয়ে ওঠে—কেউ তাকে ভালবাসে না—এক আমি ছাড়া। ছেলেটার বয়স হয়েছিল চার কি পাঁচ।

শশাঙ্ক সেদিন রমজান আলীর ক্ষেত থেকে একটা শশা চুরি করে খেয়েছিল ব'লে—বৌদি তাকে আচ্ছা মত মারলেন আর বললেন—তুই মর না, মলেও আমি বাঁচি।

রজনী আর এক টুকরা পাপর গালে পুরে বললেন—এক দিন যায়, দুদিন যায় তিনদিনের দিন ছেলেটার হ'ল জ্বর—

রজনী আবার একটু থেমে বলতে লাগলেন—এক সপ্তা যায়, দুই সপ্তা যায়, তিন সপ্তাও গেল—ছেলেটার জ্বর আর ছাড়ে না-ডাক্তাররা রোগ টের পায় না। অনেক ঝাড়ফুঁকও করা হ'ল। কিছুই হয় না।

রজনী এবার আশেপাশে একবার তাকিয়ে নিলেন। প্রত্যেকেই গল্পের শেষটুকু শুনবার জন্যে তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। রজনী একবার সাউণ্ডবক্সটা নাড়লেন, একবার রেকর্ডখানা পড়লেন, কিন্তু শেষেরটুকু

আর বললেন না, স্মৃতির বেদনা যেন তাঁর কণ্ঠকে নীরব করে দিয়েছিল। রজনীর নীরবতা সেই মুমূর্ষু ছেলেটির আকৃতি যেন হুবহু শ্রোতাদের সামনে ফুটিয়ে তুলল—এ নীরবতা যেন বলার চেয়েও অনেক বেশী মর্ম্মস্পর্শী। শ্রোতৃবৃন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ফুটফুটে একটি ছেলে—আর্ত্ত চীৎকার করছে। অবশেষে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ না ক'রে সমাহিত কণ্ঠে রজনী বললেন—তিন সপ্তাহের মাথায় ছেলেটা মারা গেল।

আবার নীরবতা। সেই নিষ্ঠুর নীরবতা যেন সব শেষ ক'রে দিয়েও আরও একটা আঘাত করবার জন্যে উদ্যত হয়ে রয়েছে।

রজনীর কণ্ঠস্বরে সকলের চমক ভাঙ্গল। রমাকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন—তোমার দিদিই প্রথম বললেন, 'ওগো, আমার ত মনে হয় বড়দির অলক্ষুণে কথাটাই শেষ পর্য্যন্ত ফলে গেল।' তোমার দিদিকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তার মনের সন্দেহটা উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু আমার মনের খট্‌কাটা আর গেল না—আজও মনে করতে আমার বুকটা যেন টনটন করে উঠে ব্যথায়। তার পর থেকে আমি আর কোন ছেলেমেয়েকে কটুকথা বলতে পারিনে। সেবার যখন তোমার দিদির গলার দশ ভরি সোনার হারটা হারিয়ে ফেলল আমাদের পুলিস সাহেবের ছোট ছেলেটা খেলা করতে করতে—পুলিস সাহেবের স্ত্রী তাকে কত বকলেন। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁকে বললাম—আপনাদের আশীর্ব্বাদে ওরকম হার আমার বহু জুটবে, কিন্তু শিশুদের হাসি একবার মিলিয়ে গেলে আর তো সে-হাসি ফুটবে না। সত্যি কথা, তোমরাই বুঝে দেখ—মানুষের জীবনের চেয়ে তো আর সোনার দাম বেশী নয়! তোমরা বিশ্বাস না কর রমা, তোমার দিদিকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ।

রজনীর গল্প শুনে অজ্ঞাত আশঙ্কায় রমা একটু শিউরেই উঠছিল, সে বলল—কিন্তু আমি তো বিশুকে এমন কথা বলিনি লা'ড়ী মশাই?

লাহিড়ী এবার হেসে বললেন—ঐ তো দোষ, তোমরা কেবল তর্ক করতেই জান।

সুদর্শন কলেজে পড়ে, এবার বি-এ দিয়েছে—সে-ই এ ব্যাপারটাতে একটু সন্দেহ প্রকাশ করল, কারণ পুলিসের বদান্যতায় তার বিশেষ আস্থা নেই, আর রজনীর কথায় সে শিশু আর বালকের তারতম্য করতে গিয়ে রীতিমত সমস্যায় পড়ে গেল। কিন্তু যারা ভাল লোক, যাদের ভিতর সুদর্শনের মত ঔদ্ধত্য নেই, তারা ভাবল, রজনী অপুত্রক—তাই ছেলেমেয়েদের প্রতি এমনি মায়া। অপুত্রকের যে কি দুঃখ তা রজনীর কথাতে পরিষ্কার হয়ে গেল। তীনু সুদর্শনকে বুঝিয়ে দিল—কেন, অত বড় রবিঠাকুর যে 'দেবতার গ্রাসে' দেখিয়ে দিলেন ছেলেদের গাল দিলে কি হয়! সে কথা অবিশ্বাস করতে পারবে?

গ্রামোফোনের উপর তখন একটি বিষণ্ণতার ছায়া পড়ে গেছে—কোন গান আর ভাল লাগে না। রজনী লাহিড়ী এই বেদনা-বিধুর শ্রোতৃবর্গের মন বুঝেন, তাই একখানা ভজন গান চড়িয়ে দিলেন। আবার ফিরে এল সকলের মনে আনন্দ: ঐ ভজনের ভক্তি-উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে এল প্রফুল্লতা। গ্রামোফন চলছে। এদিকে বিশুর চেয়েও দুটি ছোট ছেলে ঝগড়া বাধিয়ে বসেছে—গ্রামোফোন কি ক'রে বাজে এই কথা নিয়ে। রোগা ছেলেটির মুখে কথা বেশী—সে স্থূলতর ছেলেটিকে একটা গাল দিয়ে বসল। স্থূলতর ছেলেটি তা সহ্য করতে না পেরে রোগা ছেলেটিকে দিল এক চড় বসিয়ে। ব্যস্—রোগা ছেলেটা তীব্র অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এতগুলো ছেলের সামনে এমন অপমান—সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হরুকে এক ধাক্কা মারল। হরু টাল সামলাতে না পেরে পড়বি তো পড় একেবারে রেকর্ডগুলির উপর। খান-দুই-তিন রেকর্ড ভেঙে চুরমার।

রজনী এই ব্যাপারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। সাড়ে তিন টাকা ক'রে এক একখানা রেকর্ডের দাম—তিনখানা রেকর্ডই ভাল গানের। এতবড় ক্ষতি স্বীকার করা যে কত কঠিন তা এখানকার প্রত্যেকটি লোকই বুঝতে পেরেছে, যদিও সদ্যশোনা দশ ভরি সোনার হার হারানোর গল্পটা সকলের মনেই জলজল করছিল।

হরু বেচারী তো ভয়ে একেবারে হতভম্ব—অন্তরে তার শত বৃশ্চিক-দংশন। কিন্তু ভাঙা রেকর্ড তিনখানা যেন শতলক্ষ বৃশ্চিক হয়ে রজনীর অন্তরে দংশন করছিল। সে

দংশন জ্বালা এমনি তীব্র যে রজনী অস্থির হয়ে এক চড় কসলেন হরুর গালে। হরু এবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্রামের ছেলে সে, তায় ছোট লোকের ছেলে—মুহূর্ত্তে তার নিজের স্বরূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ল। লাহিড়ী মশাইকে একজন সাধারণ লোক মনে ক'রে অশ্লীল ভাষায় হরু তাঁর সঙ্গে এক সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে ছুটে বেরিয়ে গেল। লাহিড়ী মশাই চাকরি-জীবনে এমন গাল শোনেন নি কোনদিন। রাগে তাঁর সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল।

সামনেই নকুড় মিস্ত্রীর বাড়ী—হরু নকুড় মিস্ত্রীরই ভাইপো—মা-বাপ নেই—তা নাই-বা থাকল—হরু শিশু—তা হোক্। রজনী লাহিড়ী পুলিসী মেজাজ নিয়ে চললেন মিস্ত্রীর কাছে। রজনীর পিছনে আছে গ্রামের সকলের সমর্থন।

নকুড় খড়মের কাঠ কাটছে, ঠিক ছাঁচ মত হচ্ছে না—তাই মুখে একটু বিরক্তি। কাঠটাতে একটু গলদ বেরিয়ে পড়ল—সমস্ত কাঠটুকুই বাদ দিতে হয় নাকি। নকুড় ভাবছে আর হাতুড়ী বাটালী নাড়াচাড়া করছে—কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না—কোন্‌টার প্রয়োজন এই দুঃসময়ে।

এই সময় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রজনী লাহিড়ী সেখানে উপস্থিত হলেন। গায়ে তাঁর নেটের গেঞ্জী, পায়ে সুদৃশ্য স্যাণ্ডেল—এখনও যেন যুবকজীবন রজনীর যায় নি। নকুড় রজনীর চেয়ে কিছুটা বড় হ'তে পারে—কিন্তু তার দেহ শক্ত হয়ে গেছে—লোমশ বক্ষ লোহার মত শক্ত মনে হয়। নকুড়ের স্বাস্থ্য আছে—চেহারা নেই, পায়ের হাতের একটা নখও সুন্দর নয়, সবগুলিই বিকৃত। নকুড় বোধহয় লেখা-পড়া করেনি—অত শক্ত হাতে আর অত পুরু ঠোঁটে লেখাপড়া করা যায় না। কপালের উপর নকুড়ের একটি গভীর ক্ষতের দাগ। কয়েক বছর পূর্ব্বে কোকোন মিস্ত্রীর সঙ্গে মারামারী করার ঐ চিহ্ন। নকুড়ের চোখ দুটো তেমন পরিষ্কার নয়—একটু ঘোলাটে—কোন রকম নেশা করে হয়ত। গায়ের রঙের সঙ্গে চোখের ভুরু এমন ভাবে মিশে আছে যে, সহসা খুঁজে বের করা যায় না।

নকুড় রজনীকে দলবল শুদ্ধ তার বাড়ীতে আসতে দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘোর কেটে উঠলে একখানা চেয়ার এনে দিল রজনী লাহিড়ীকে বসতে। লাহিড়ী মশাই যদিও জানেন, বসলেও পুলিসের লোকের রাগ থামে না—তবুও তিনি এখন বসলেন না—কারণ তিনি বোঝেন যে, তিনি একজন সহৃদয় ব্যক্তি। চেয়ারে বসলেই নকুড়ের আতিথ্য গ্রহণ করা হয়, আর তা হলে তাঁর উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না।

লাহিড়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নকুড়কে বললেন,—তোমার ভাইপোকে যদি শাসন করতে না পার তবে গ্রামের লোকের হাতে ছেড়ে দাও, তারা ছেলে শায়েস্তা করে দেবে!

নকুড় তো অবাক—ব্যাপার কি? পাশের একজন লোকের কাছে ব্যাপারটা সমস্ত শুনে নকুড় খুবই দুঃখিত এবং ভীত হয়ে পড়ল। সর্ব্বনাশ! তিন-তিন খানা থালি ভেঙেছে হরু। নকুড়ের ভাষায় রেকর্ড থালি নামে অভিহিত।

সে হাত জোড় ক'রে লাহিড়ী মশায়কে বলল—জামাই-বাবু, আপনি রাগ করবেন না, হরু এলে আমি ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব!

জামাইবাবু কথাটাতে রজনী ভারী চটে গেলেন—তেড়ে উঠে বললেন—খবরদার, জামাইবাবু বলে ডাকিস নি বলে দিচ্ছি—ছোটলোকের অত আস্পর্দ্ধা ভাল নয়!

নকুড় একেবারে অপ্রস্তুত—তবু মুখে একটু হাসি টেনে বলল—এজ্ঞে বাবু, ছোটলোক হতে পারি, কিন্তু সতী-খুড়োর মেয়েরা যে আমার দিদিমণি হয়। এই ত তরু দিদিমণি সেদিন পর্য্যন্তও আমার কাছ থেকে পুতুলের পাল্কী তৈরী ক'রে নিয়ে গেছে—ক'দিনকার কথা আর। তরু দিদিমণি তো আমাদের চোখের সামনেই হলেন, ওনারা সব ন্যাংটা বয়েস থেকে এই নকুড়দার কারখানাতেই ঘুরঘুর করত…

তরুবালা সতীপ্রসন্নর বড় মেয়ে, রজনীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। তরুবালার নাম আর বিশেষ বয়সের বিশেষ ঘটনা নকুড়ের কাছে শুনে রজনী হাঁক দিয়ে বললেন—চোপ হারামজাত, মেয়েদের অপমান করিস তোর এত বড় বুকের পাটা!

নকুড় কিছু ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না তার অপরাধ কি—অনির্দ্দেশ্য অপরাধের ভয়ে রজনীর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—এজ্ঞে আমরা সত্যিই ছোট লোক-লেখাপড়া

শিখিনি। কিন্তু বাবু, আমরা হারামজাত নই—আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে গরীবের মা-বাপকে অসম্মান করবেন নি বাবু! লেখাপড়ার খাতির হারাবেন না—এখনও যে আমাদের লেখাপড়া শিখবার লোভ আছে…

নকুড়ের কথায় যে বিদ্রূপটা ছিল তা কাঁটার মতই রজনীর বুকে বিঁধল। রজনী লাহিড়ী একটু ক্রূর হাসি হেসে বললেন—জেলে গিয়ে তোর উন্নতি হয়েছে দেখছি। অনেক বড় বড় কথা বলতে শিখেছিস যে—

নকুড়ও পাল্টাই জবাব দিয়ে বলল—আজ্ঞে হেঁ, দোষ-গুলো ঝেড়েঝুড়ে আসতেইত সরকার জেলে পাঠান, তা না হ'লে সরকার শুধু শুধু অতগুলো টাকা খরচপত্তর করেন! জেলে গিয়ে দারোগার ভয় ভেঙে গেছে বাবু, তাদের দেখে আর ভয় হয় না।

রজনী কেবল বলিলেন—বটে, দারোগা দেখে ভয় হয় না!

রজনী তাঁর ভৃত্য রঘুয়াকে কি ইঙ্গিত করলেন। রঘুয়া নিমেষে নকুড়ের কানটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে রজনীর পায়ের কাছে তার মাথাটা নামিয়ে দিল। রজনী সমস্ত গায়ের শক্তি দিয়ে স্যাণ্ডেল সমেত নকুড়ের মাথায় এক পদাঘাত ক'রে বললেন—মনে থাকে যেন ভদ্রলোকের মুখে মুখে কথা বললে এমনি ক'রে জুতো খেতে হয়।

অতবড় জোয়ান নকুড়ও রজনীর সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে দূরে মাথা গুঁজে পড়ে গেল, কাঠের টুকরোর খোঁচাতে তার কয়েকটা স্থান কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। নকুড় রক্ত মুছতে মুছতে রক্তটা চোখের কাছে এনে কি যেন পরীক্ষা করল—বোধ হয় দেখল রক্ত ঠাণ্ডা না গরম, রক্ত তেজী না দুর্ব্বল। মুহূর্ত্তে তার হাতের হাতুড়ীটা শূন্যে উঠে পড়ল—তার চোখে জেগে উঠল খুনীর দৃষ্টি, গ্রামের লোক ভীত হয়ে দেখল, কোকনকে খুন করবার সময় নকুড়ের চোখের যে চেহারা ছিল সেই চেহারাটিই এখন দেখা যায় তার চোখে। সেই জেল খাটবার পূর্ব্বেকার নকুড় বুঝি আবার এসেছে গ্রামে। কিন্তু নকুড় হাতের হাতুড়ীটা আবার নামিয়ে রেখে বলল—লাহিড়ীমশাই, আপনি সরে যান এখান থেকে—শীগ্‌গির সরে যান। আপনি জানেন না ছোটলোকদের—তারা আগপাছ না ভেবে খুন ক'রেও বসতে পারে। আপনার জুতোয় আমার অপমান হয় নি, আমার লেগেছে কোথায় জানেন? আমার গায়ের জোরকে আপনি হারিয়ে দিয়েছেন? —আপনি শীগ্‌গির এখান থেকে চলে যান লা'ড়ী মশাই, হরুর শাস্তি আমি পরে দেব—যান আপনি এখনই।

তীনু রজনীকে বলল—এ সব সেই সুহৃদ মাষ্টারের কাজ। গ্রামে নাইট ইস্কুল খুলেছে, সেখানে সন্ধ্যা হ'লেই যত রাজ্যের ছোটলোক জমায়েত হয়—কি সব ষড়যন্ত্র হয় তারাই জানে। তা না হ'লে আগে দেখতাম নকুড় তার ঠোঁটই খুলতে পারত না।

সুদর্শন বললে—নকুড়ের মুখে আগে কথা ছিল না তীনুদা, কিন্তু তার হাতে তখন অস্ত্র চলত!

রজনী সুদর্শনের কথার কোন উত্তর দিলেন না; তার দিকে একবার বক্র কটাক্ষে তাকিয়ে নিলেন।

রজনী দেখলেন, নকুড়ের চোখ এখনও তার মুখের ওপর রয়েছে। নকুড়কে দেখে এখন রঘুয়ায়ও ভয় হ'তে লাগল।

ঐ ছোটলোকটার অন্তরের তীব্র ক্ষুব্ধতা উপস্থিত সকলের চিত্তকেই একটা নাড়া দিয়ে গেল। রজনী এই বিক্ষুব্ধতার নিকট আর দাঁড়াতে পারলেন না, তীনুকে বললেন—চল, এখান থেকে যাই তীনু!—আর তুমি ঐ নাইট স্কুলের ব্যাপারটা আমাকে সব চিঠিতে লিখে জানিও তো।

রজনী ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীকে বললেন—তখনই বলেছিলাম দরকার নেই ছোটলোকদের দেশে যেয়ে—তা শুনলেন না—এখন নাও ব্যাপারখানা বোঝ। এ গাঁয়ের ভদ্রলোকগুলো পর্য্যন্ত চাষা বনে গেছে—আমি জানি।

কিন্তু নকুড় মিস্ত্রী হরুকে যে প্রহার করছে—সে শব্দ এখান থেকেও শোনা যায়। হরু আকাশ-ফাটা আর্ত্তনাদ করছে। নকুড় হরুকে আজ মেরেই ফেলবে নাকি!

রমা সেখানে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল—সে বলল, আহা রে, কি মারটাই মারছে রে?

রজনী গজরাতে গজরাতে বললেন—মারুক, ছেলেদের একটু আধটু শাসন করা ভাল—আর তোমাদের ছেলে-পিলেদের ওই সব ছোটলোকদের ছেলের সঙ্গে মিশতে দিয়ো না।

বিশু তখন সেখানে নেই।

বিশুর মা দাঁড়িয়ে আর সেই চীৎকার সহ্য করতে পারে না—বুঝি নকুড়কে নিরস্তই করতেই ছুটল বিশুর মা।

তীনু বলছিল—কথাটা কি জানো?—টাকা ওঁর কাছে কিছুই নয়—কিন্তু হরু অমন গাল দিল কেন?

আরও কি বলতে চাইছিল সে—কিন্তু হরুর আর্ত্তনাদে সে কথা ঢাকা পড়ে গেল।

হরু বিশুর চিয়ে কিছু ছোটই হবে।

গতি-ছন্দ

পরাশর

উন্মত্ত প্রভুত্ব-প্রয়াসীর অত্যাচার! এই পৃথিবী—যেখানে আমিত্ববোধ, দুর্বিনীত শক্তি, সৎবৃত্তির প্রতি নিষ্ঠুর উপেক্ষা—মানুষের হীন অভীপ্সা, অতীত ঐতিহ্যের দিকে লক্ষ্যহীন। মানুষ চলেছে সভ্যতার মুখোস পরে তারই অন্ধ স্তাবক সেজে,—দলে দলে। প্রাচুর্য্যের মধ্যে অভাব উৎপাদনের এই ত পথ;—অসংখ্য প্রাচুর্য্যের পাশেই রিক্তের অসহায় কলরোল, যারা সম্পূর্ণ আশঙ্কা-শূন্য দুর্ব্বল, যারা লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখতে শিখেনি তাদেরই বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা পেল তারাই যারা আজীবনই ফাঁকি আর প্রবঞ্চনার উপর দিয়ে চলে এসেছে। তাদেরই জয়গান, তাদেরই বন্দনা দিকে দিকে, সারা পৃথিবী জুড়ে।

এ আত্ম-প্রচারের ইতিহাস খুঁজলে আমরা পাব যারা আমাদেরই বাহন করে উঠে গেল মিথ্যা গৌরবের অভ্রভেদী শৃঙ্গে,—তারা কতখানি অবজ্ঞার চোখে আমাদের সে দুর্ব্বলতাকে তাদের প্রভুত্বের কথা বার বার মনে করিয়ে দেয়,—পাছে আমরা ভুলে যাই। অন্তরের অনুভূতি, আত্মার আকাঙ্ক্ষা তারা মানতে চায় না,—অপমান করে, তীব্র আঘাত করে, বেপরোয়া নিষ্ঠুর! এর থেকে পরিত্রাণ নেই, পথের সন্ধান অস্পষ্ট, গাঢ় অস্পষ্ট—ধূসর।

মিথ্যা এ অধিকারের যাঁরা তীব্র সমালোচনা করেছেন, তাঁরা কেউ বলেছেন—"বিষকুম্ভ পয়োমুখম্"—লোক দেখানো যত রকমের অনুষ্ঠান সম্ভব, সমস্তই সে প্রতিষ্ঠাকে চাকচিক্যে ঘিরে রেখেছে,—মধ্যে তার সর্পিল হিংস্রতায় পরিপূর্ণ। Plathoric growth-এর মত ঐ প্রতিষ্ঠার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। উক্ত সমালোচনা অস্বীকার করবার শক্তি কারও নেই—এমন আত্মবিশ্বাস তার নেই যার জোরে সে প্রতিবাদ করতে পারে,—"না, না, আমার পথ সত্য, আমার প্রতিষ্ঠাই সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা।" এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? এক মাত্র দায়ী আমরা, আমরাই আমাদের অনৈক্যে, দুর্ব্বলতায় তার সুযোগ করে দিয়েছি। আমরাই নিজেদের নিশ্চেষ্টতায় অক্টোপাশের নির্ম্মম বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছি। আমাদের সহজ বিকাশ, সৎপ্রবৃত্তির প্রেরণাকে হত্যা করেছি আমরাই। আত্মদোষস্খলনের কোনও অজুহাত পাব কোথা'? অপক্ষপাত দৃষ্টিতে নিজেদের অতীত খতিয়ে দেখলে লাভ-লোকসানের ফিরিস্তি সম্যক বুঝতে পারব। আর বুঝতে পারব আমাদের দুঃখকষ্ট, ক্ষুৎপিপাসা, দৈন্য আর অপরিপুষ্টির মূল কোথা'। আমাদের নিপীড়নের উৎপত্তি কোন্ বিভীষিকার ভয়াল গহ্বরে।

কিন্তু কেন? আমাদের ভুল কোথা', কোন্‌খানে আমাদের গতিভঙ্গ ঘটেছে যার প্রতিফল এ মর্ম্মান্তিক ছন্দহীনতা? বেদান্তবিদ্‌রা বলবেন, এ সমস্তের মূলে রয়েছে—"অবিদ্যা", "অজ্ঞানতা"। "অবিদ্যার" অর্থ ব্যাপক। যে বিশেষ জ্ঞানশূন্যতা বর্ত্তমান অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, তা' বুঝাতে হ'লে আমাদের বলতে হয়, "বস্তুতান্ত্রিকতা" (materialism)—মানুষ জীবনের যে সংজ্ঞা করেছে, যে জীবন সে আমরণ বইবে। স্বাতন্ত্র্যবাদ এসে বর্ত্তমান সভ্যতায় সেঁধিয়েছে। স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বে সীমাবদ্ধ, "আমিত্ব" যা দ্বারা তার অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি সমস্ত বুঝায়। আত্মরক্ষা মানে সেই "আমিত্ব"কে জীইয়ে রাখা, তার গায়ে কোনও আঁচড় না লাগে। "আমিত্ব"র সংঘর্ষ, বিরোধিতা, প্রতিযোগিতা, ডিঙ্গিয়ে যাওয়া, অপরকে নিশ্চিহ্ন করা বাধা-বিপত্তির অন্যায় সৃষ্টি—এ ছয় ঋতু (?) আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য। আত্মরক্ষার বর্ত্তমান অর্থ (কদর্থ কিমর্থক) হচ্ছে "প্রত্যেকেই নিজের জন্যে",—সমস্ত দরদ মানুষের নিজেরই প্রতি। "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এ আদর্শ আজ একঘরে, বাতিল। এক কথায় কি সাম্রাজ্যবাদ, কি

জাতীয়তাবাদ, কি স্বাতন্ত্র্যবাদ—সকলকেই "আমিত্ব"বাদ ঘিরে রেখেছে।

অনুরূপ চলার পথে "সাহচর্য্য, সমবেদনা, এমন কি সহনশীলতার" বিন্দুমাত্র নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে না—এখানেই জীবনের নিষ্ঠুর পরিহাস, আত্মার বন্দীত্ব। "পুরুষসিংহৈব লক্ষ্মীমুপৈতি"-র আদর্শ ক্ষয়ে গিয়ে বর্ত্তমানে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"-র আধিপত্য সর্ব্বত্র। আর সে আধিপত্য বিস্তারের গোড়ায় রয়েছে নিঃস্বের মর্ম্মপীড়া, দুর্ব্বলের বিলোপ, আর্ত্তের পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস। আমরা অস্বীকার করি না—"Old order changeth, yielding place to new"—এর কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু স্বার্থপরতার আওতায় এই তত্ত্বের নিরর্থকতাই আমাদের মনে জাগে। স্বার্থপরতাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, তথা প্রবৃত্তির মাল-মসলা। তাই ধ্বংসের অট্টহাসি, ভস্ম-স্তূপে মিলিত জয়োল্লাস,—আকাশ-বাতাস সক্রিয়তা ভুলে আশঙ্কাকুল, স্তব্ধ—নিথর।

খাও-দাও, আমোদ কর—ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নালসতার প্রতিধ্বনি···ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বলে কোন আকর্ষণ তাদের নেই। কর্ম্মের বিকৃত ধারা তাদের স্বল্প আয়ুঃকালের বন্ধন, আত্মস্ফুরণে অনোন্যোপায় হয়ে,—তার সুষ্ঠু পরিকল্পনায় বিশ্বাস হারিয়ে আজ একেই করেছে সম্বল। ভুলের দুর্নিবার প্রতিক্রিয়ায় স্থিতির ভিত যাচ্ছে সরে, এ যে হ'তেই হবে। "চিরদিন ভুল দিয়ে একটা ফাঁক ভরিয়ে রাখা যায় না।" সভ্যতা, সংস্কৃতিকে নিজেদের দোষ-ত্রুটি দিয়ে ক'দিন বাঁচিয়ে রাখা যায়? দিন দিন জীর্ণতর হয়ে তার বিনাশশীলতা প্রকাশ পাবেই। কারণ, বস্তু-তান্ত্রিকতার আওতার পরে যা কিছু ধরা-ছোঁয়া যায়, দেখা যায়, উপভোগ করা যায় তাকেই "বাস্তব" বলে চিনেছি। এ কথা নির্ভুল সত্য যে, ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বিচারশক্তিশূন্য তাদের সত্যিকারের অর্থ আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয়। তবুও আমাদের অস্তিত্ব, উদ্দেশ্য, পরিণতি (চলার শেষ সীমা) জানতে, শিখতে এবং অনুভব করতে হবে—তাঁদেরই উপদেশ থেকে যাঁরা "সত্য জীবনে"র অর্থ যুগে যুগে প্রচার করেছেন, দুঃখ-ক্লেশ পীড়িত এ পৃথিবীতে অমৃতের, ভূমার সন্ধান দিয়েছেন—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" মানুষ শুধু প্রবৃত্তি বিশেষের অনুগত নয়, তার মাঝে অবর্ণনীয় সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। তাকে জাগাতে হবে, তার বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। নয়ত দুঃসহ ব্যথা আর পীড়ন জীবনকে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করতে থাকবে।

কিন্তু পথ কোথা? এ বন্দীত্বের পরিত্রাণ কোন্ দিকে? এর জবাব মাত্র একটি এবং যুগাবতারগণ সে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। আত্মাই হ'ল সত্যিকারের মানুষ—বিভিন্ন বিরোধী শক্তির সংহতি—সুপ্ত সম্ভাবনার বিচিত্র উন্মেষ; ভূমার প্রাচুর্য্য আত্মার মধ্যে নিত্য ক্রিয়াশীল, শুধু এরই অপেক্ষা করে সমস্ত আশাপথ চেয়ে আছে। কিন্তু তা সহজলভ্য নয়, দুর্গম পরীক্ষাসাপেক্ষ, আভ্যন্তরিক গুণাবলীর প্রকৃত গতিক্ষেপের উপর ন্যস্ত। তার ব্যক্তিত্ব দৈনিক কার্য্যক্রমের কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ, মানুষের পরিচয়-লিপির এক অধ্যায়। আর তার সহায়ক হচ্ছে—তার দেহ, মন, প্রবৃত্তিনিচয়—যার ভিতর দিয়ে নিজেকে সে বাইরে তুলে ধরে। চরিত্র অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য আত্মার ক্রমিক বিবর্ত্তন, আত্ম-বুদ্ধির পথ এবং পশুত্বের (animality) উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার। নীতি-জ্ঞান, ভালোমন্দ বিচারবোধ,—জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ার থেকে এদের উৎপত্তি। অভিজ্ঞতা নিঙ্ড়ে আত্মা নিয়েছে তার রস, পেয়েছে পুষ্টি। প্রয়োজনের অসংখ্য দাবী,—তাদের পরিপূর্ণতার জন্য—কঠিন চলা তখনই শেষ হ'বে যখন মানুষ নিজেকে অমৃতের ন্যায্য অংশীদার বলে চিনতে পারবে, যখন তার অন্তরের শোভা-সম্পদ পাবে পূর্ণ মুক্তি, যখন সে হৃদয়ঙ্গম করবে—"সোহম্" তত্ত্ব।

এমন একটি নিয়ম আছে যা আমাদের সত্যানু-সন্ধিৎসার প্রতি সজাগ করে তুলে, আমাদিগকে বলে দেয়—"কঠিন পরীক্ষার সময় কেউ সরে থাকতে পারে না, নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবার কোন উপায় নেই।" আর সে নিয়মের মূল বস্তু হচ্ছে "প্রেম, সহজ অনুভূতি," তার পরিণতি "নিবৃত্তি, তথা অন্তরের শান্তি।" এ নিয়মের একটি ধারানুযায়ী কি ভাল কি মন্দ আমরা জানতে পারি—আকর্ষণ-বিকর্ষণ সমতুল্য। প্রত্যেক কর্ম্মে এবং

তার প্রতিক্রিয়ায় ঐক্য আছে, তার ফলভোগ করতেই হবে, নিষ্কৃতি পাবার জো নেই। আমরা যে রকম বীজ বুনব, অনুরূপ ফল আমাদের পেতেই হবে, ভিন্ন কিছু আশা করা অলীক কল্পনা, বাতুলতা। এ নিয়মানুবর্ত্তিতার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু বার বার এ জায়গাতেই করে বসি ভুল, ঐ আইন করি অমান্য। কাজেই দোষ কার যদি আমাদেরই চলার মাঝে দেখতে পাই—History was not repeating itself, history never repeats itself; but man has a curious disposition towards historical repetition," (H. G. Wells)। তাই বলছিলুম—অহমিকতার মিথ্যা অভিনয় আর কত করব, গতি-ছন্দের বেসুরো, সঙ্গতিহীন গমক, মীর টেনে জীবনটাকে দুর্ব্বিসহ করে তোলা আর কেন?*

* Indian Opinion থেকে L. W. Ritchএর The End is Inevitable অবলম্বনে।

ক্ষমা-সুন্দর

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উদার সাঁঝে আকাশ যেথা নুইয়ে মাথা প্রণাম করে,
শুনতে যে পাই আমায় সেথা ডাকছ তুমি নামটি ধরে।
সন্ধ্যা বেলা, সাঙ্গ খেলা, যখন ঘরে যাই
সমুখে-পাছে, দূরে ও কাছে তোমার চেহারাই
নীরবে অনুসরণ ক'রে ভরম ভরে দেখি
রক্ত ঝরে তোমার চোখে আহত তুমি এ কি!
কাহার দুষ্কৃতির ফলে আহত তুমি হলে?
শুধানু তোমা আমি—
ক'লে না কথা নীরবে মুখ ভিজালে আঁখিজলে
কাঁদিলে তুমি স্বামী!
তুমি তো প্রভু রাজাধিরাজ, দাসানুদাস আমি
দাসের কাছে বিচার মাগি মিনতি কেন স্বামী?
প্রলয় যার চোখের কোণে পলকে চমকে
ভিখারী প্রায়, সে কেন হায়, আমার সমুখে?
এই কথাটি ভাব্‌ছি বসি অবাক্ মানি মনে
হাতের পানে এ হেন ক্ষণে দেখিনু অকারণে
রক্ত-মাখা হস্ত মোর সদ্য তখন ভিজে
আহত তোমায়, করেছি যে হায়, জানিনা কখন্ নিজে
কাঁদিয়া ফেলি দুঃখে ক্ষোভে—
কখন বুঝি কিসের লোভে
করেছি তোমা খুন।
বজ্র কেন নাওনি প্রিয় করে
হাননি কেন আততায়ীর পরে
সে কি গো কভু মিনতি করে
যাহার ভরা তূণ?
কহিনু যেই এতেক বাণী
অমনি কাছে নিলে টানি
দেখিনু চাহি অবাক্ মানি
তোমার বরবেশ
তোমার বুকে মুখটি রাখি পাতি
মজিনু কি যে অপার সুখে মাতি
দেখিনু মুখে বিমল তব ভাতি
ক্ষতের নাহি লেশ।

কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীত কমে গিয়েচে—বসন্তের হাওয়া দিতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সজ্‌নে গাছে থোকা থোকা ফুল দেখা দিয়েচে।

কেদার নিজের গ্রামেই একটি কৃষ্ণযাত্রার দল খুলেচেন। সম্প্রতি এ অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রার একটা হিড়িক এসে পড়েচে—গত পূজোর সময় থেকে এর প্রথম সূত্রপাত ঘটে, বর্ত্তমানে মহামারীর মত গ্রামে গ্রামে হুজুক ছড়িয়ে পড়েচে। কেদার হট্‌বার পাত্র নন, তাঁর গ্রামকে ছোট হয়ে থাকতে দেবেন কেন—জেলেপাড়া, কামারপাড়া এবং কুমোর পাড়ার লোকজন জুটিয়ে তিনিও এক দল খুলে মহা উৎসাহে মহলা আরম্ভ করচেন। স্নানাহারের সময় নেই তাঁর, ভারি ব্যস্ত। সম্প্রতি তাঁর দলের গাওনা হবে চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণা পূজার দিন গ্রামে বারোয়ারি তলায়। বেশি দেরি নেই, দেড় মাস মাত্র।

সীতানাথ জেলের বাড়ীর বাইরে বড় ছ-চালা ঘর। যাত্রার দলের মহলা এখানেই রোজ বসে। অন্য সকলের আসতে একটু রাত হয়, কারণ সবাই কাজের লোক—কাজকর্ম্ম সেরে আসতে একটু দেরিই হ'য়ে পড়ে। কেদারের কিন্তু সন্ধ্যা হোতে দেরি সয় না, তিনি সকলের আগে এসে বসে থাকেন।

সীতানাথ বাড়ী নেই—শীতকালের মাঝামাঝি নৌকো করে এখান থেকে পাঁচ দিনের পথ চূর্ণী নদীতে মাছ ধরতে গিয়েচে—এখনও দেশে ফেরে নি।

সীতানাথের বড় ছেলে মাণিক বাড়ীতে থাকে ও গ্রামের নদীতেই মাছ ধরে স্থানীয় হাটে বিক্রি করে সংসার চালায়। আজ পুরো মহলা হবে বলে সে সকাল সকাল নদী থেকে ফিরে এসে বাইরের ঘরে বড় বড় খানকতক মাদুর ও চট পেতে আসর করে রেখেচে।

কেদারকে বললে—বাবাঠাকুর, তামাক কি আর এক বার ইচ্ছে করবেন?

—তা সাজ না হয় একবার। হ্যাঁরে মাণ্‌কে, এরা এখনো সব এল না কেন?

—আসচে বাবাঠাকুর, সবাই কাজ সেরে আসচে তো একটু দেরি হবে।

—তুই তামাক সেজে এক বার দেখে আয় দিকি বিশু কুমোরের বাড়ী। ওর ছেলেটাকে না হয় ডেকে আন। সে রাধিকা সাজবে, তার গানগুলো ততক্ষণ বেহালায় রপ্ত করে দিই—

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জন দুই অভিনেতা ঘরে ঢুকলো—এক জন ছিবাস মুদী আর এক জন হৃষীকেশ কর্ম্মকার।

কেদার খুসিতে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—আরে ছিবাস যে! এই যে রিষিকেশ—এসো এসো—তোমরা না এলে তো মহলাই আরম্ভ হয় না। বেশ ভাল করেচ—বসো।

মাণিক ততক্ষণ তামাক সেজে কেদারের হাতে দিয়ে বললে—তামাক ইচ্ছে করুন।

কেদারের মনে অকস্মাৎ তুমুল আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। বাইরের ঝিরঝিরে মিঠে ফাল্গুনের হাওয়ায় আমের বউলের সুঘ্রাণ, একটা আঁকোড় ফুলের গাছে সাদা ফুল ধরেচে—সামনে এখন অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত গান-বাজনার গম্‌গমে আসর, কত লোকজন, ছেলে-ছোক্‌রা আসবে, মানুষের জীবনে এত আনন্দও আছে!

তামাক খেতে খেতে কেদার খুসির আতিশয্যে বলে উঠলেন—ওহে রিষিকেশ, এদিকে এসো—ততক্ষণ তোমার আয়ান ঘোষের পার্টটা একবার মুখস্ত বলে যাও শুনি—

কেদারের হুকুম অমান্য করবার সাধ্য নেই কারো এ আসরে। হৃষীকেশ কর্ম্মকার দু-একবার ঢোক গিলে দু-একবার ঘরের আড়ার দিকে তাকিয়ে বিপন্ন মুখে

বলতে সুরু করলে—অদ্য পৌর্ণমাসী রজনী, যমুনা পুলিনের কি অদ্ভুত শোভা! কিন্তু অহো! আমার হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের মত এরূপ মর্ম্মঘাতী জ্বালা অনুভব করিতেছি কেন?—কোকিলের কুহুধ্বনি আমার কর্ণকুহরে—

—আঃ দাঁড়াও দাঁড়াও—অমন নামতা মুখস্থ বলে গেলে হবে না। থেমে দমক দিয়ে দিয়ে বলো—কাঠের পুতুলের মত অমন আড়ষ্ট হয়ে থাকার মানে কি? হাত পা নড়ে না?

এই সময় কয়েকজন লোক এসে মহলা ঘরে ঢুকলো। কেদারের ঝোঁক গান-বাজনার দিকে, শুধু বক্তৃতার তালিম তাঁর মনে পুরো আনন্দ দিতে পারে নি এতক্ষণ, নবাগতদের মধ্যে বিশ্বেশ্বর পালের ছেলে নন্দকে দেখে তিনি হঠাৎ অতিমাত্রায় খুসি হয়ে উঠলেন।

—আরে ও নন্দ, এত দেরি করে এলে বাবা তবেই তুই রাধিকা সেজেচিস? বারোখানা গান তোমার পার্টে, আজই সব তালিম দেওয়া চাই নইলে আর কবে কি হবে শুনি? বোস, বেয়ালা বেঁধে নি—গানগুলো আগে হয়ে যাক।

দু-এক জন ক্ষীণ আপত্তি তুলবার চেষ্টা করলে। ছিবাস মুদীর নন্দ ঘোষের পার্ট, সে বললে--এ্যাকঠোর সঙ্গে সঙ্গে গান চললে একানে গানগুলো ভালো রপ্ত হয়ে যেতো বাবাঠাকুর—নইলে এ্যাকঠো আড়ষ্ট মেরে যাবে যে!

কেদার মুখ খিঁচিয়ে বললেন—থামো না ছিবাস। বোঝো তো সব বাপু—কিসে কি হয় সে আমি খুব ভাল জানি। একানে গান আগে না তালিম দিয়ে নিলে শেষকালে এ্যাকঠোর সময় গান গাইতে গেলে ভয়েই গলা শুকিয়ে যাবে। তুমি তোমার নিজের পার্ট দেখো গিয়ে বাইরে বসে—

ছিবাস ধমক খেয়ে অপ্রতিভ হয়ে গেল। এর পরে আর কেউ কোনো প্রকার প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না, কেদারের মুখের ওপর প্রতিবাদ কখনো বড় একটা করেও না কেউ।

সুতরাং গান-বাজনা চললো পুরোদমে।

ক্রমে সব লোক এসে জড় হয়ে গেল—মহলা ঘরে বসবার জায়গা দিতে পারা যায় না—বাইরের দাওয়ায় গিয়ে অনেকে বসলো। বাইরে যাবার আরও একটা কারণ এই, এঁদের মধ্যে বেশির ভাগ ছেলেছোকরা ও বাইশ-তেইশ থেকে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক, এরা কেদারের সামনে বিড়ি বা তামাক খায় না—অথচ বেশিক্ষণ ধূমপান না করে তারা থাকতেও পারে না, বাইরের দাওয়া আশ্রয় করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই।

গানে বাজনায় বক্তৃতায় গল্পে এবং সঙ্গে সঙ্গে তামাক ও বিড়ির ধোঁয়ায় মহলাঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেচে, এমন সময় দূরে কিসের চীৎকার শোনা গেল।

কে একজন বললে—ও ছিবাস জ্যাঠা—চৌকিদার হাঁকচে যে বামুন পাড়ায়, অনেক রাত হয়েচে তবে!

দু-এক জন উৎকর্ণ হয়ে শুনে বললে—তাই তো রাতটা বেশি হয়ে গিয়েচে। বাবাঠাকুর, আজ বন্ধ করে দিলে হোত না। আপুনি আবার এতডা পথ যাবেন—

বিশু কুমোরের ছেলে এ পর্য্যন্ত গোটা আষ্টেক গানের তালিম দিয়ে এবং কেদারের কাছে বিস্তর ধমক খেয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—সে করুণ দৃষ্টিতে কেদারের দিকে চাইলে।

কেদার বললেন—ঘুম আসচে, না? তোর কিছু হবে না বাবা। কুমোরের ছেলে, চাক ঘোরাবি, ভাঁড় আর তিজল হাঁড়ি গড়বি, তোর এ বিড়ম্বনা কেন বল দিকি বাপু? সেই সন্দে থেকে তোকে খোঁপড়া করচি, এখনও একটা গানও নিখুঁত করে গলায় আনতে পারলি নে—তোর গলায় নেই সুর তার কোত্থেকে কি হবে? বেসুরো গলা নিয়ে গান গাওয়া চলে?

আসলে তা একথা ঠিক নয়। বিশু ছেলেটি বেশ সুকণ্ঠ গায়ক, সবাই জানে, কেদারও তা ভালই জানেন—কিন্তু তিনি বড় কড়া মাষ্টার এবং তাঁর কথা বলবার ধরণই এই। ছেলেটির এ রকম তিরস্কার গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে, সুতরাং সে কেদারের কথায় দুঃখিত না হয়ে বললে—দাদাঠাকুর, বাড়ীতে মার অসুখ—সকাল সকাল যেতি বাবা বলে দিয়েল—

—তা যা যা। আজ তবে থাক এই পর্য্যন্ত। কাল

সবাই সকালে সকালে আসা হয় যেন। চল হে ছিবাস, চল হে রিষিকেশ—

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে কেদার উঠে পড়লেন, হুস্ না করিয়ে দিলে তিনি আরও কতক্ষণ এখানে থাকতেন কে জানে।

কিন্তু মহলা ঘরের বাইরে পা দিয়ে তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন—একি হ্যাঁ ছিবাস, জ্যোৎস্না উঠে গিয়েচে যে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তাই তো দেখচি—

—তাই তো হে, আজ নবমী না? কৃষ্ণপক্ষের নবমী—ওঃ অনেক রাত হয়ে গিয়েচে তা হলে।

পথে কিছুদূর পর্য্যন্ত এক সঙ্গে এসে বিভিন্ন পাড়ার দিকে একে একে সবাই বেরিয়ে গেল কেদারকে ফেলে। দু-তিনজন কেদারকে বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চাইলে—কিন্তু কেদার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে একাই বাড়ীর দিকে চললেন। গড়ের খাল পার হবার সময় নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নালোকিত বন-ঝোপের দিকে চেয়ে চেয়ে কেদারের বেশ লাগল। কেদারের পিতামহ রাজা বিষ্ণু-রামের স্বহস্ত রোপিত বোম্বাই আমের গাছে প্রচুর বউল এসেছে এবার—তার ঘন সুগন্ধে মাঝ রাত্রির জ্যোৎস্না-ভরা বাতাস যেন নেশায় ভরপুর, ভারি আনন্দে জীবনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে মোটের উপর তাঁর। সকাল থেকে এত রাত পর্য্যন্ত সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায় তা তিনি বুঝতেই পারেন না।

কি চমৎকার দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নায় এই গড়বাড়ীর জঙ্গল, ভাঙা ইট-পাথরের ঢিবিগুলো! সবাই বলে নাকি অপদেবতা আছে, তিনি বিশ্বাস করেন না! সব বাজে কথা!

কই এত রাত পর্য্যন্ত তো তিনি বাইরে থাকেন, একাই আসেন বাড়ী, কখনো কিছু তো দেখেন নি! বাল্যকাল থেকে এই বনে ঘেরা ভাঙা বাড়ীতে মানুষ হয়েছেন, এর প্রত্যেক ইটখানা, প্রত্যেক গাছটি, বনের লতাটি তাঁর প্রিয় ও পরিচিত! তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে এরা জড়ান, তিনি যে চোখে এদের দেখেন, অন্য লোকে সে চোখ পাবে কোথায়?

কষ্ট হয় শরতের জন্যে!

ওকে তিনি কোনো সুখে সুখী করতে পারলেন না! ছেলে মানুষ, ওর জীবনের কোন সাধ পূরলো না! সারা-দিনের কাজকর্ম্ম ও আমোদ-প্রমোদের ফাঁকে ফাঁকে শরতের মুখখানা যেন তাঁর মনে পড়ে—হঠাৎ তখন বড় অন্যমনস্ক হয়ে যান কেদার! যেখানেই থাকুন, মনে হয় এখনি ছুটে একবার তার কাছে চলে যান!

আহা, এত রাত পর্য্যন্ত মেয়েটা একা এই জঙ্গলে ঘেরা বাড়ীর মধ্যে থাকে, কাজটা ভাল হচ্ছে না—ঠিক নয় কেদারের এতক্ষণ বাইরে থাকা!

দোরে ঘা দিয়ে কেদার ডাকলেন—ও শরৎ, মা ওঠো, দোর খোলো—

দু-তিনবার ডাকের পর শরতের ঘুমজড়িত কণ্ঠের ক্ষীণ সাড়া পাওয়া গেল।

—উঠে দোর খুলে দে—ও শরৎ—

শরৎ বিরক্তিভরা মুখে দোর খুলতে খুলতে বললে—আমি মরবো মাথা কুটে কুটে তোমার সামনে বাবা। পারি নে আর—সন্দে হয়েছে কি এ যুগে! রাত কাবার হয়ে গেল—এখন তুমি বাড়ী এলে। পুবে ফর্সা হবার আর বাকি আছে।

—না না, আরে এই তো বামুন পাড়ায় চৌকিদার হেঁকে গেল—রাত এখনও অনেক আছে। আর বকিস নে, এখন ভাত দে দিকি। খিদে পেয়েছে মা—

কেদার খেতে বসলে শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—কোথায় আবার থাকবো? আমাদের দলের মহলা হচ্ছে, সেখানে আমি না থাকলেই সব মাটি। যেদিকে আমি না যাবো সেদিকেই কোনো কাজ হবে না।

শরৎ একটু নরম সুরে বললে—কোথায় যাত্রা হবে? আমি কিন্তু যাবো তোমার সঙ্গে।

—তা ভালই তো। বাড়ীর মেয়েদের জন্যে চিক দিয়ে দেবে, যাবি তো ভালই।

শরৎ একটু চুপ করে থেকে বললে—বাবা, আজ প্রভাস-দা এসেছিল।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন—কোথায়? কখন?

—তুমি বেরিয়ে চলে গেলে তার একটু পরেই। এখানে এসে বসলো। তার সঙ্গে আর একজন ওর বন্ধু। দু-জনকে চা করে দিলাম—খাবার কিছু নেই, কি করি—একটুখানি ময়দা পড়েছিল, তাই দিয়ে খানকতক পরোটা ভেজে দিলাম।

—বেশ বেশ। কতক্ষণ ছিল?

—তা অনেকক্ষণ—প্রায় ঘণ্টাতিনেক। সন্ধ্যা হবার পরও খানিকক্ষণ ছিল।

—কি বলে গেল?

—বেড়াতে এসেছিল। প্রভাস-দা'র বন্ধু কলকাতার কোন বড়লোকের ছেলে, বেশ চেহারা। নাম অরুণ মুখুয্যে। আমাদের গড়বাড়ীর গল্প শুনে সে এসেছিল প্রভাস-দা'র সঙ্গে দেখতে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলে।

—বড়লোকের কাণ্ড, তুইও যেমন! ঘরে পয়সা থাকলেই মাথায় নানা রকম খেয়াল গজায়। তার পর দেখে কি বললে?

—খুব খুসি। আমাদের এখানে এসে কত রকম কথা বলতে লাগলো, অরুণবাবু আবার আসবে, ফটোগ্রাফ নিয়ে যাবে। কি লিখবে নাকি আমাদের গড়বাড়ী নিয়ে। আমায় তো একেবারে মাথায় তুললে।

—ওই তো বললাম বড় লোকের যখন যেটি খেয়াল চাপবে। কলকাতায় মানুষের নেই অভাব—আমাদের মত দুঃখ-ধান্দা করে যদি খেতে হোত—

শরতের হাসি পেল বাবার দুঃখ-ধান্দা করে খাবার কথায়। জীবনে তিনি তা কখনো করেন নি। কাকে বলে তা এখনও জানেন না। কিসে কি হয় তা শরৎ ভাল করেই জানে।

যেমন আজকার দিনের কথা। শরৎ হুবহু সত্য কথা বলে নি। ঘরে কিছুই ছিল না। ওরা গেল ভাঙা ইট-কাট দেখতে, গড়বাড়ী ঘুরতে—সেই ফাঁকে শরৎকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে হোল রাজলক্ষ্মীদের বাড়ী ময়দা ও ঘি ধার করতে। সেখানে পাওয়া গেল তাই মান রক্ষে। সব দিন আবার সেখানেও পাওয়া যায় না।

রাজলক্ষ্মী ওদের কথা শুনে দেখতে এসেছিল। সেই চা ও খাবার পরিবেশন করেছিল প্রভাস ও তার বন্ধুকে।

আর একটা কথা শরৎ বলেনি বাবাকে। প্রভাস ওকে একটা মখমলের বাক্স দিয়ে গিয়েচে। কেমন চমৎকার বাক্সটা। তার মধ্যে গন্ধতেল, এসেন্স, পাউডার আরও সব কি কি? না নিলে প্রভাস-দা কি মনে করবে, সে বাক্সটা হাত পেতে নিয়েছিল—কলকাতার ছেলে, ওরা হয় তো বোঝে না যে বিধবা মানুষের ওসব ব্যবহার করতে নেই। তার যে কোনো বিষয়ে কোনো সাধ আহ্লাদ নেই, সব বিষয়ে সে নিস্পৃহ, উদাসী—কেমন এক ধরণের এ বয়সেই মেয়ের এ সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি তার বাবার ভাল লাগে না। শরৎ তা জানে। বাবাকে বলে কি হবে বাক্সটার কথা, যখন সেটা সে রাখবে না।

কেদার আহারান্তে তামাক খেতে বসলেন বাইরের দাওয়ায়।

শরৎ বলল—বাইরে কেন বাবা, ঘরে বসে খাওনা তামাক, আজকাল রাত্তিরে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে; দিনে গরম, রাতে ঠাণ্ডা—যত অসুখের কুটি।

গভীর রাত্রি।

বিছানায় শুয়ে একটা কথা তার মনে হোল বার বার। এর আগেও অনেক বার মনে হয়েছে। প্রভাস দার বন্ধু অরুণবাবুর চেহারা বেশ সুন্দর, অবস্থাও ভাল রাজ-লক্ষ্মীর সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া যেত?

রাজলক্ষ্মী এল তিনদিন পরে।

সে গড়ের বনে সজনে ফুল কুড়ুতে এসেছিল, কোঁচড় ভর্ত্তি করে ফুল কুড়িয়ে বাড়ী ফিরবার পথে শরতের রান্নাঘরে উঁকি মেরে বললে—ও শরৎ-দি, সজনে ফুল রাখবে নাকি? কত ফুল কুড়িয়েছি ছাখো—তোমাদের ওই পুকুরের কোণের গাছে।

শরৎ রান্না চড়িয়ে ছিল, ব্যস্তভাবে খুসির সুরে বললে—ও রাজলক্ষ্মী আয়, আয় দেখি কেমন ফুল? আয় তোকে আমি খুঁজচি ক'দিন। কথা আছে তোর সঙ্গে।

একটা ছোট চুবড়ি এনে বললে—দে এতে চাট্টি ফুল।

বেশ কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলগুলো, ভাজবো এখন। বাবা বড্ড খেতে ভালবাসেন।

—শরৎ-দি, আমাদের ওদিকে তুমিও তো যাও নি ক'দিন—

—না ভাই, বাবার পায়ে বাত মত হয়ে কদিন কষ্ট পেলেন। তাঁর তাপ-সেঁক—আবার এ দিকে সংসারের ছিষ্টি কাজ, এর পরে সময় পাই কখন যে যাবো বল। চা খাবি?

—না শরৎ-দি, বেলা হয়ে গেল—আর বেশিক্ষণ থাকলে এ বেলা ফুলগুলো ভাজা হবে কখন? এ বেলা যাই—ও বেলা বরং আসবো।

—দাঁড়া, তোর জন্যে একটা জিনিস রেখে দিয়েচি, নিয়ে যা—

শরৎ মখমলের বাক্সটা এনে ওর হাতে দিয়ে বললে—দ্যাখ্‌ তো কেমন? খুলে দ্যাখ্‌—

অপ্রত্যাশিত আনন্দে ও বিস্ময়ে রাজলক্ষ্মীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। বাক্সটা খুলতে খুলতে বললে—কোথায় পেলে শরৎ-দি?

—প্রভাস-দা দিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

রাজলক্ষ্মী শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে—তা তুমি রাখলে না?

শরৎ মৃদু হেসে বললে—ওর মধ্যে দ্যাখ না কত কি—সাবান, পাউডার, মুখে মাখবার ক্রিম্—আমি কি করবো ও সব। তুই নিয়ে গিয়ে মাখলে আমার আনন্দ হবে।

রাজলক্ষ্মী কিছু ভেবে বললে—যদি মা জিগ্যেস করে কোথায় পেলি?

—বলিস আমি দিয়েচি।

—এ নিয়ে কেউ কিছু বলবে না তো? জানো তো নিমু ঠাকরুণকে, গাঁয়ের গেজেট। প্রভাসবাবুর কথা বলবো না—কি বলো?

—সত্যি কথা বলচি, এতে আর ভয় কি? নিমু ঠান্‌দি এতে বলবে কি? বলিস প্রভাসবাবু দিয়েছিল শরৎ-দিকে।

—ভারি খারাপ মানুষ সব শরৎ-দি। তুমি যত সহজ আর ভালো ভাবো সবাইকে অত ভালো কেউ নয়। আমার আর জানতে বাকি নেই। সেবার যে এখানে প্রভাসবাবু এসেছিল, এ কথা গাঁয়ে রটনা হয়ে গিয়েচে। কাল যে এসেছিল আবার—তা নিয়েও কাল কথা হয়েচে।

শরৎ বিস্ময়ের সুরে বললে—বলিস কি রে? কি কথা হয়েচে?

—অন্য কথা কিছু নয় শরৎ দিদি। শুধু এই কথা যে প্রভাস-দা তোমাদের বাড়ী আসা যাওয়া করচে আজ-কাল। তুমি না হয়ে অন্য মেয়ে যদি হোত, তা হোলে অনেক অন্য রকম কথাও ওঠাতো নিমু ঠাকরুণ, আমার জ্যাঠাই মা, হীরেন কাকার মা, জগন্নাথ দাদু—এরা। কিন্তু তুমি বলেই কেউ কিছু বলতে সাহস করে না।

শরৎ যাত্রার দলের সুর নকল করে টেনে টেনে হাত নেড়ে বললে—দেশের রাজকন্যার নামে অপকলঙ্ক রটাবে, কার ঘাড়ে কটা মাথা? সব তা হোলে গর্দ্দান নেবো না দুরাচারদের?

রাজলক্ষ্মী হি হি করে হেসে লুটিয়ে পরে আর কি! মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে হাসতে বললে—উঃ এত মজাও তুমি করতে জানো শরৎ-দি! হাসিয়ে মারলে—মাগোঃ—

শরৎ হাসিমুখে বললে—তবে একটু বসে যা লক্ষ্মী দিদি আমার। দুটো মুড়ি খেয়ে যা—

রাজলক্ষ্মী দুর্ব্বল সুরের প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—না, শরৎ দি—ফুল ভাজা হবে কখন তা হোলে এবেলা? আমায় আটকো না—

—বোস্। আমিও খাচ্চি দুটো মুড়ি—নারকোল কোরা দিয়ে। তুইও খাবি। যেতে দিলে তো? সজনে ফুলের দুর্ভিক্ষ লাগেনি গড় শিবপুরে—

খানিক পরে শরৎ মুড়ি খেতে খেতে বললে—শোন রে, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। অরুণ বাবু এসেছিল প্রভাস-দার সঙ্গে, দেখেচিস তো? ওর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পাড়বো প্রভাস-দার কাছে? অরুণবাবুরা বেশ অবস্থাপন্ন। বেশ ভাল হবে।

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ দৃষ্টিতে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি যে তুমি বলো শরৎ-দি! এক-এক সময় এমন ছেলেমানুষ হয়ে যাও!

—ছেলে মানুষ হওয়া কি দেখলি ?

—ওরা আমায় নেবে কেন ? আমার কি রূপগুণ আছে লো। তুমি যে চোখে আমায় দেখো—সকলে কি সে চোখে দেখবে ?

—সে ভাবনায় তোর দরকার নেই। তুই শুধু আমায় ল প্রভাস-দার কাছে কথা আমি পাড়বো কি না। রুণবাবুকে পছন্দ হয় ?

—দূর—কি যে বলো ? শরৎ-দি একটা পাগল—

—সোজা কথাটা কি বল না ?

—ধরো যদি বলি হয়—তুমি কি করবে ?

—তাই বল ! আমি প্রভাস-দার কাছে তা হোলে থাটা পেড়ে ফেলি।

রাজলক্ষী চুপ করে রইল। শরৎ বললে—বাড়ীতে। অন্য কারো কাছে বলিস নে কোনো কথা এখন।

রাজলক্ষী হাত নেড়ে বললে—হ্যাঁ, আমি বলে বেড়াতে াই, ওগো আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে সবাই শোনো গো ! কটা কথা, জ্যাঠামশাইকে যেন বোলো না শরৎ-দি ?

—বাবাকে ? ও বাপ রে ! এখুনি সারা গাঁ পরগনা টে যাবে তা হোলে। পাগল তুই, তা কখনো লি ?

রাজলক্ষী বিদায় নিয়ে বাড়ী যাবার পথে গড়ের াল পার হয়ে দেখলে কেদার একটা চুপড়িতে আধ চুপড়ি বগুন নিয়ে হন্ হন্ করে আসচেন।

ওকে দেখে বললেন—ও বুড়ি, ওঃ কত সজনে ফুল য !—কোত্থেকে ? তা বেশ। শরতের সঙ্গে দেখা করে এলি তো ?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশায়। শরৎ-দির সঙ্গে দেখা না করে আসবার যো আছে ? আর না খাইয়ে কখনো ছাড়বে না।

—হ্যাঃ, ভারি তো খাওয়া ? কি খেতে দিলে ?

—মুড়ি মাখলে, ও খেলে, আমি খেলাম।

—তা যা মা—বেলা হয়ে গেল আবার—

রাজলক্ষী দূর থেকে কেদারকে আসতে দেখে মখমলের বাক্সটা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল—সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। কথা শেষ করে কেদারের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলো সে।

কিন্তু কিছু দূর যেতেই সে শুনলে কেদার তাকে পেছন থেকে ডাকচেন—ও বুড়ি, শুনে যা। একটু দাঁড়িয়ে যা—

—কি জ্যাঠামশায় ?

—এই বেগুনক'টা আনলাম গেঁয়োহাটির তারক কাপালীর বাড়ী থেকে। তুই নিয়ে যা দুটো। সজনে ফুলের সঙ্গে বেশ হবে এখন—

রাজলক্ষী বিব্রত হয়ে পড়লো। এক হাতে সে বাক্সটা ধরে আছে, অন্য হাতে ফুলে ভর্ত্তি আঁচল। বেগুন নেয় কোন হাতে ? কিন্তু কেদার সদাই অন্যমনস্ক, কোনোদিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখবার তাঁর সময় নেই। কোনো রকমে গোটা চারেক বেগুন রাজলক্ষীর সামনে নামিয়ে রেখে তিনি চলে যেতে পারলে যেন বাঁচেন এমন ভাব দেখালেন।

রাজলক্ষী ভাবলে—জ্যাঠামশায় বড় ভাল। এ গাঁয়ে ওদের মত মানুষ নেই। শরৎ-দি কি ভালই বাসে আমায়। এ গাঁ থেকে যদি বিয়ে হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাই, শরৎ-দিকে না দেখে কি করে থাকবো তাই ভাবি ! পাছে বাড়ীতে জ্যাঠাইমা টের পায়, এজন্যে রাজলক্ষী বাক্সটা সন্তর্পনে লুকিয়ে বাড়ী ঢুকলে মাকে ডেকে বললে—এই দেখো মা—

রাজলক্ষীর মা বাক্সটা হাতে নিয়ে বললেন—বাঃ দেখি, দেখি—কোথায় পেলি রে ? শরৎ দিলে ? চমৎকার জিনিসটা। আমরা বাপু সেকেলে লোক, কখনো চক্ষেও দেখিনি এসব। শরৎ কোথায় পেলে রে ?

রাজলক্ষী বললে—ওকে প্রভাস-দা কাল দিয়েছিল। তা ও তো এসব মাখবে না—জানো তো ওকে। তাই আমায় বললে, তুই নিয়ে যা। এ কথা কাউকে বোলো না কিন্তু মা।

ক্রমশঃ

আসামের বনে-জঙ্গলে

(শিকার-কাহিনী)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

অনেক দিন পরে বন্ধু বিভূতিভূষণের আমন্ত্রণলিপি পাইয়া মনটা খুসীতে ভরিয়া উঠিল। বিভূতিভূষণ শুধু বন্ধু নয়—বাল্যবন্ধু, থাকেন আসামের এক সুদূর জঙ্গলে। জায়গাটির নাম তিনঘোড়ি—বন্ধুবর সেখানেরই চা-বাগানের ম্যানেজার। তিনঘোড়ি চা-বাগান একেবারে হিমালয়ের কোলে এবং তেরাই-এর বক্ষে অবস্থিত বলিলেও ভুল বলা হয় না। হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল এই তিনঘোড়িতে যাওয়ারই আহ্বান বহন করিয়া এই পত্রের আগমন। আনন্দে আমার শিকারী মন নাচিয়া উঠিল—আমার যেন আর বিলম্ব সহিতেছিল না। আমার এই ভ্রমণ তথা শিকার-অভিযানে বাবার অনুমতিও পাওয়া গেল সহজেই। অবিলম্বে জিনিষপত্র গুছাইয়া ডায়মণ্ডহারবার ষ্টেশনে কলিকাতাগামী ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম, বন্ধুকেও একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম তিনঘোড়ি ষ্টিমার ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্য।

কলিকাতায় কিছু জিনিষপত্র কিনিবার প্রয়োজন ছিল। সেগুলি কেনাকাটা শেষ করিয়া পরের দিনই আসাম মেলে তিনঘোড়ি যাত্রা করিলাম। পর দিন ভোরে ট্রেন আমিনগাঁ ষ্টেশনে পৌঁছিল। এখান হইতে ষ্টিমারে তিনঘোড়ি যাইতে হইবে।

মাঘ মাস। ভীষণ শীত। ব্রহ্মপুত্র নদীতেও স্রোতের তেমন জোর নাই। ষ্টিমার একটানা স্রোত ঠেলিয়া অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিল। দুই তীরের মনোরম পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখিয়াই সারাদিন কাটাইয়া দিলাম। রাত্রিতে শীতের অস্ফুট জ্যোৎস্নায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের যেন পট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, কিন্তু প্রকৃতির এই নূতন রূপ উপভোগ করা আর হইল না। রাত্রিতে শীতের তীব্রতা এত বাড়িয়া গেল যে, আপাদমস্তক রাগ্ মুড়ি দিয়াও শীত যাইতেছিল না। মাঝে মাঝে উঠিয়া বয়লারের কাছে দাঁড়াইয়া গা গরম করিয়া লইতে হইতেছিল।

তিনঘোড়ি ষ্টেশনে যখন ষ্টিমার পৌঁছিল তখন রাত্রি সাড়ে তিনটা। একে ছোট ষ্টেশন, তায় শীতকালের গভীর রাত্রি। কুলি মিলিবার জায়গাও এ নয়, সময় তো নয়ই। তল্পিতল্পা লইয়া বিব্রত হইয়াই পড়িতে হইল। অগত্যা ষ্টিমারের সারেং এবং ক্লার্কের শরণাপন্ন হইলাম। তাহাদেরই সৌজন্যে একটা সুরাহা হইয়া গেল—কয়েক জন খালাসীর সাহায্যে ষ্টিমার হইতে আমার মোটঘাট লইয়া জেঠিতে আসিয়া উঠিলাম।

জেঠিতে উঠিয়া দেখি, বন্ধু বিভূতিভূষণ সশরীরে হাজির আছেন। টেলিগ্রাম পাইয়া লোকজন এবং আলো সহ আমারই জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনেক দিন পরে দেখা—আলাপ-আপ্যায়নে কিছু সময় কাটিয়া গেল। তার পর সেই শেষ রাত্রেই পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়া আমাদের যাত্রা সুরু হইল।

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওহে বিভূতি, এবার যাবার ব্যবস্থা কিসে?—শুনেছি পথ তো অনেকটাই।

বন্ধু হাসিলেন, বলিলেন—যাওয়ার ব্যবস্থা? যাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালই—একেবারে জুড়িগাড়ী।

আমি অবাক হইলাম, বলিলাম—জুড়িগাড়ী! এই পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্যে?

—নিশ্চয় জুড়িগাড়ী, তবে অবশ্য কাড়ার জুড়ি।

—কাড়ার জুড়ী? সে আবার কি?

বন্ধু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—তাও জান না বুঝি? চল দেখবে'খন।

জেঠির বাহিরে আসিয়া দেখিলাম তিনখানা মহিষের গাড়ী সারি দিয়া দাঁড়াইয়া। ও হরি! এরই নাম কাড়ার জুড়ি? গাড়ীর উপরে নৌকার ছই-এর মত আবরণ, দুই দিক পর্দ্দায় ঢাকা। ভিতরে পার্ব্বত্য 'মস'-দ্বারা খুব পুরু করিয়া গদি পাতা। তার উপর কম্বল বিছাইয়া বিছানা প্রস্তুত করাই ছিল। প্রথম গাড়িটাতে জিনিষপত্র তোলা

হইল। দ্বিতীয়টাতে আমরা দুই বন্ধু আশ্রয় লইলাম। তৃতীয়টিতে খাবার, জল ইত্যাদি লইয়া বন্ধুর সঙ্গীয় লোকজন চড়িয়া বসিল। একে ভীষণ শীত, তায় গভীর রাত্রি—চারি দিক কুয়াসায় ঢাকা। শীতে বুকের ভিতর গুরগুর করিতেছিল। গাড়ীতে উঠিয়া শীতের তীব্রতা হইতে খানিকটা নিষ্কৃতি পাইলাম।

গাড়ী তিনখানি চলিতে আরম্ভ করিল—পিছনে পিছনে সামরিক কায়দায় মার্চ্চ করিয়া চলিতে লাগিল বার জন সশস্ত্র বরকন্দাজ। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এসব করেছ কি হে? এ যে সামরিক শোভাযাত্রা—একেবারে রাজসিক ব্যাপার!

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন—শোভাযাত্রার প্রয়োজন আছে হে আছে, দেখতেই পাবে'খন। তুমি এত বড় একজন নামজাদা শিকারী এসেছ এদেশে, জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে এ সংবাদ কি আর পৌঁছে গেছে না এতক্ষণ। তারা তোমার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে আসবে না বুঝি ভেবেছ? কাজেই জাঁকজমক একটু চাই বই কি?

বুঝিলাম, আমাদের গন্তব্যপথ নিরাপদ তো নয়ই, বরং খুবই বিপদসঙ্কুল।

পার্ব্বত্য পথ—কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। মহিষের গাড়ী হইলেও বেশ জোরেই চলিতেছিল। দুই ধারে কোথাও জঙ্গলাকীর্ণ সমতল ক্ষেত্র, কোথাও বা লতা-গুল্মাচ্ছাদিত পাহাড় কুয়াশায় ঢাকা, মনে হইতেছিল যেন শীতের মধ্যে পাহাড়গুলি সাদা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রায় মাইলখানেক পথ চলিবার পর কাড়ার জুড়ি গড় গড় করিয়া নীচে নামিতে নামিতে ঝপাং করিয়া জলে পড়িল। আমি তো একটু চমকিয়াই উঠিলাম—এবার বুঝি একেবারে পপাত চ—। বন্ধু মৃদু হাসিয়া অভয় দিলেন—ও কিছু নয়, গাড়ী এবার নদী পার হচ্ছে।

ভরসা করিয়া পর্দ্দা তুলিয়া বাহিরে চাহিলাম। নদীটি বেশ বড়, কিন্তু জলের পরিসর পঁচিশ-ত্রিশ হাতের বেশী হইবে না—দুই পাশে চড়া ধূ ধূ করিতেছে। নদীর জলও গভীর নয় বেশী—ফুটখানেক হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু এদিক না থাকিলেও ওদিক আছে—স্রোত আছে খুব। বন্ধু নদীর পরিচয় দিলেন—নাম তিনঘড়িয়া নদী, এখন পার হওয়া খুব সহজ, কিন্তু বর্ষায় তাহার মূর্ত্তি ভীষণ—তখন পার হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। বর্ষাকালে এ অঞ্চলের সকল নদীই ভীষণ হইয়া উঠে।

পাড়ে উঠিয়া গাড়ী এবার ক্রমোচ্চ পথে চলিতে লাগিল। ভোর হইতে তখন বেশী বাকী নাই। এবার এই ভোর রাত্রেও জঙ্গলের ভিতর হইতে বন্যজন্তুর ডাক শোনা যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে হরিণের পাল পথের এধার হইতে ওধারে দৌড়িয়া পালাইতেছে। দুই-একটা হায়নাকেও দৌড়িয়া যাইতে দেখিলাম। দুই-এক বার ভল্লুকও আসিয়া দেখা দিয়া গেল। কিন্তু কেহই আমাদের কাছে ঘেঁসিল না। হয়ত বা মহিষযুগলের শিং-নাড়া দেখিয়া ভড়কাইয়া গিয়াছিল। মহিষদু'টি দেখিলাম খুব সাহসী—হায়না ভালুককে আমলই দিল না। এই সকল বন্য জন্তুর সহিত হামেসা দেখা হয় বলিয়া উহারা যেন তাহাদের কতকটা গা-সহা হইয়া গিয়াছে—ভয় পায় না একটুও।

এতক্ষণে ভোর হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব-গগন রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু বেলা যখন প্রায় নয়টা তখনও প্রাতঃ-সূর্য্যের মতই সূর্য্যদেব জবাকুসুমসঙ্কাশং, রৌদ্রেরও তেজ নাই। আমাদের চলারও শেষ হইতেছে না। আরও কয়েকটা ছোট ছোট নদী ইতিমধ্যে আমরা পার হইয়াছি। হঠাৎ গাড়ী থমকিয়া ঝাঁকানি দিয়া থামিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি হে?

গাড়োয়ান সবিনয়ে জানাইল—কুত্তা চল্‌তা হুজুর।

'কুত্তা চল্‌তা?' সে আবার কি? কুকুর দেখিয়া মহিষগুলি ভয় পাইয়া গেল, এ ত ভারি আশ্চর্য্য। গাড়ীর ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া দেখিলাম, কুকুরের মত কটা রঙের শতাধিক জন্তুর একটা দল আমাদের গাড়ী হইতে কিছু দূরে রাস্তা পার হইতেছে—কয়েকটা ঘাড় বাঁকাইয়া আড় চোখে আমাদের দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওহে, কুকুর দেখে এত ভয়?

বন্ধু বলিলেন—দেখ্‌লে তো এক দলে কতগুলো কুকুর! কুকুর হ'লে কি হয়, এক বার যদি ক্ষেপে ওঠে,

তা'হলে কারুরই নিস্তার নেই—বাঘেরও নয়। সকলেই ওদের সমীহ করে চলে—বাঘ-ভালুক পর্য্যন্ত পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

বুঝিলাম, সঙ্ঘশক্তির সম্মান জানোয়ারদের মধ্যেও আছে।

কুকুরের দল চলিয়া গেলে গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। বেলা প্রায় দশটার সময় বন্ধু একটা বড় গাছের কাছে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থান দেখিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন। গাছের ধারেই একটা সুন্দর ঝরণা। আমরা ঝরণার হিমশীতল জলে স্নানাদি সারিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। মহিষগুলিও আহার ও ঝরণার জলে জল-কেলি করিয়া তৃপ্ত হইল। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল।

রৌদ্রের এখন খুব তেজ। দিন হইলে কি হইবে, এখনও মাঝে মাঝে ভল্লুক, শুলবাঘ, হায়না প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এবং নানা জাতীয় হরিণের দেখা পাওয়া যাইতেছিল। এবার কয়েক মাইল ভীষণ চড়াই অতিক্রম করিয়া আমাদের কাড়ার জুড়ি একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকায় আসিয়া পৌছিল। এখানে একটি সুদৃশ্য ঝরণা প্রায় কুড়ি হাত উপর হইতে পড়িয়া ভীমবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। ফুল যে ফুটিয়া রহিয়াছে কত রঙের তার সীমা নাই। দূরে তুষারাবৃত পর্ব্বত-শিখর সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতেছে—সে দিকে চোখ তুলিয়া তাকান যায় না। ক্রমে চারি দিকে যেন সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিল। ঘড়িতে সবে চারিটা বাজিয়াছে। একটু বিস্মিত হইয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কি ভাই, চারটার সময়ই সন্ধ্যা! জয়দ্রথ বধ হবে নাকি আজ?

বন্ধু বলিলেন—না হে ভায়া, এ দেশটাই এ রকম। দশটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত দিনের আলো দেখা যায়। কুয়াসা হয় কিনা, রোদের আর তেজ থাকে না। ঐ দেখ না সূর্য্য লাল হয়ে আসছে।

আমি বিস্মিত হইয়া সেই অকাল-রক্তিম সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

আরও একটু আগাইয়া একটা ঝরণার ধারে গাড়ী থামিল। আমরা এখানে বৈকালিক জলযোগ সারিয়া লইলাম। আবার সেই রাত্রি। রাগ মুড়ি দিয়া কাপড়ের পুটুলীর মত জড়সড় হইয়া গাড়ীতে বসিয়া আছি আর বাঘের গর্জ্জন, হরিণের মৃদু রব, ভল্লুক ও অন্যান্য বন্যজন্তুর চীৎকারের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। চারিদিকেই নিবিড় বন।

সুন্দরবনের জঙ্গলে আর হিমালয়ের পাদমূলের জঙ্গলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এখানকার বৃক্ষাদিও অতি বৃহৎ, এমন কি দাঁতনগাছ অর্থাৎ আশ্‌শেওড়া গাছগুলি পর্য্যন্ত এক একটা মহীরুহ বিশেষ—বেড় প্রায় দশ-বারো ফুট। ইতিপূর্ব্বে হিমালয়ের তেরাই অঞ্চলে কখনও আসি নাই। সবই নূতন লাগিতেছিল আমার কাছে। সুন্দরবনের জঙ্গলে এরূপ মনোমুগ্ধকর শোভা নাই।

এবার আমরা গন্তব্য পথের শেষে আসিয়া পৌছিলাম। সম্মুখেই বিস্তৃত চায়ের বাগান। কাঁটা-তারের বেড়ায় আর কাঁটা-লতায় যেন দেয়াল তৈয়ারী হইয়াছে। গাড়ী একটি সুদৃশ্য বাংলোর সম্মুখে আসিয়া থামিল। এইটি বন্ধুবরের বাসগৃহ। আমরা দুই জন একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলাম। বন্ধু তাঁহার স্ত্রীকে আমার আগমন সংবাদ দিবার জন্য ভিতরে চলিয়া গেলেন। একটু পরেই বন্ধুর সহিত বন্ধু-পত্নী আসিয়া 'মালাই চা' দিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তার পর কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

এখানে চারিদিকেই গভীর জঙ্গল আর পাহাড়ের পর পাহাড়। মানুষ ত্রিসীমানায় নাই বলিলেই চলে—কোথাও কোথাও পাহাড়ীদের বিরলবসতি। এই যে আট শত একরের চা-বাগান এইখানেই যা কয়েকশত কুলী ও তাহাদের পরিচালকদের বাস। পাহাড়ীরা মহিষ পালন করে। কাজেই মহিষের দুধ এবং ঐ দুগ্ধজাত ঘৃত, ছানা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। এই গভীর জঙ্গলেও বন্ধুপত্নীর স্বহস্তে তৈয়ারী মহিষের দুধের এবং ছানার নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগ সারিয়া বারান্দার এক কোণে আপাদমস্তক কম্বলাবৃত হইয়া একটি ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। উভয়দিকের পর্দ্দা ঈষৎ উন্মুক্ত। বন্ধুবরের গল্প শুনিতেছি আর মধ্যে

মধ্যে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছি। কাছেই ওয়ার্ডারদের কোয়ার্টার্স। ওয়ার্ডাররা তাহাদের ঘরের সম্মুখে বড় বড় ধুনি জ্বালাইয়াছে আর তাহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া গিয়াছে স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা সকলেই। তেরাইয়ের প্রচণ্ড শীত হইতে নিস্তার পাইবার এই ধুনিই তাহাদের একমাত্র সম্বল। কুয়াসার মধ্য দিয়া মেটে মেটে জ্যোৎস্না এবং ওয়ার্ডাদের ধুনির আলোয় চারিদিক ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখাইতেছিল।

হঠাৎ মনে হইল, কুকুরের মত কি একটা জন্তু নিঃশব্দে ওয়ার্ডারদের পিছন দিয়া তাহাদের একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই গৃহাভ্যন্তর হইতে স্ত্রীলোকের চীৎকারধ্বনি এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডারদের কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। কেহ লাঠি, কেহ ভোজালী, কেহ টাঙ্গী, কেহ বর্শা যে যাহা পারিল লইয়া ছুটিয়া চলিল। কয়েকজন বরকন্দাজ বন্দুক লইয়া দৌড়াইয়া গেল। ব্যাপারটা ঠিক কি আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি ভায়া?

বন্ধু যেন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর দিলেন—ব্যাপার এমন গুরুতর কিছুই নয়। এই সব নিয়েই তো আছি এখানে। এ আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি?

নির্লীপ্ত ভাবে বন্ধুবর জবাব দিলেন—এই কুলীদের ঘরে বাঘ-ভালুক, হায়না, নেকড়ের অত্যাচার।

এই সময় কোলাহলটা যেন আরও বাড়িয়া গেল, বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল একটা, সঙ্গে সঙ্গে আহত জন্তুর অব্যক্ত চীৎকার। ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই?

—বোধ হয় কুলিদের ঘরে ভালুক ঢুকেছে, তাই চেঁচামেচি আর হল্লা হচ্ছে। ভালুকটাকে মেরেছে বোধ হয়। খবর এই এলো বলে।

আমি শিকারী হইলেও এই ব্যাপারে বিস্মিত কম হইলাম না। বলিলাম—অবস্থা যা দেখলাম তাতে এই কুলীরা থাকে কি করে এই তো আশ্চর্য্য।

বন্ধু বলিলেন—কুলীদের বস্তী তো দেখনি! কাল সকালে দেখাব। আড়াই হাজার কুলী থাকে এক সঙ্গে, তবু রাতদিন ভালুকের অত্যাচার। ভালুকের অত্যাচারটাই এখানে সব চেয়ে বেশী।

কোলাহল করিতে করিতে ওয়ার্ডাররা মৃত ভল্লুক লইয়া উপস্থিত হইল। আমরা উপর হইতেই একবার দেখিলাম। বন্ধুবর যথোচিত নির্দ্দেশ দিলে তাহারা চলিয়া গেল। আহারাদির পর শয্যার আশ্রয় লওয়া মাত্রই পথশ্রান্তিতে দুই চোখ বুজিয়া আসিল। কিন্তু বাঘের গভীর গর্জ্জন, হাতীর বৃংহন এবং অন্যান্য বন্যজন্তুর চীৎকারে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হইতে লাগিল। নিদ্রা-জাগরণের মধ্যে হঠাৎ তীব্র ঘণ্টাধ্বনিতে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ঘণ্টা বাজিয়াই চলিল। বন্ধুবরও এত প্রত্যূষে উঠিয়া পড়িয়াছেন। তাহার চলাফেরার শব্দ ও কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইতেছিলাম। ভাবিলাম, এবার নিশ্চয়ই আরও গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে। এত শীতের মধ্যেও লেপের মধুর আকর্ষণ ছাড়িয়া না উঠিয়া পারিলাম না। সম্মুখেই বন্ধুকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ভোরবেলায় আবার কী হ'লো হে?

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন—এটা আমাদের জাগাবার ঘণ্টা। এবার আমাদের হাত-মুখ ধোয়া, খাওয়া-দাওয়া সেরে আপিসে হাজির দিতেহবে। তুমি আরও কিছু ক্ষণ স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পার। কুলীদের হাজিরা নিয়ে তাদের কাজে লাগিয়ে দিই, তার পর দু'জনে এক সঙ্গে বেড়াতে বেরুব।

আমার কিন্তু আর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতে ছিল না। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া লইয়া বন্ধুর সহগামী হইবার জন্য তৈয়ার হইলাম। আবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এটা কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইবার ঘণ্টা। জলযোগ ও চা-পান ইতিমধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছিল। এবার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এবং ওভারকোটে আকর্ণ মুড়ি দিয়া দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে চলিল বার জন বরকন্দাজ এবং জন কয়েক দফাদার।

হাজিরা লওয়া শেষ হইলে বন্ধু বলিলেন—এখনকার মত কাজ আমার শেষ। চল একবার ডাক্তারের বাড়ী ঘুরে আসি। ডাক্তারটি বাঙালী, সস্ত্রীক থাকেন।

আড়াই হাজার কুলীর বাস, কাজেই কুলীবস্তীকে একটা বিরাট গ্রাম বলিলেও চলে। কুলীবস্তীর মাঝখানে একটা বাগানের মধ্যে ডাক্তারবাবুর ডিস্‌পেন্‌সারী ও বাংলো। ডাক্তারবাবু অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গেলেন। এখানেও আবার চা-পানের আয়োজন হইল। জলখাবার লইয়া ডাক্তার-গৃহিনী নিজেই আসিলেন। আমরা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। কিন্তু তিনি টেবিলে জলখাবার রাখিয়া যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি চলিয়া গেলেন, কোন প্রকার সৌজন্য প্রকাশ করিলেন না—আকারেও নয়, ইঙ্গিতেও নয়।

জলযোগের পর ডাক্তারবাবুর নিকট বিদায় লইয়া আমরা কুলী-লাইনের পাশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওহে শিকারের ব্যবস্থা করেছ তো?

বন্ধুবর মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—হাঁ, শিকারের ব্যবস্থা করাই আছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরকন্দাজরা 'ভল্লু' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল এবং দুই দলে ভাগ হইয়া দুই দিকে দৌড়াইয়া গেল। বন্ধুবর অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন—ঐ দেখ শিকার ঘরে ঢুকছে। সঙ্গে সঙ্গে পিঠ হইতে বন্দুকটি হাতে লইয়া বন্ধু দৌড়াইতে লাগিলেন। বন্ধু যে দিকে নির্দেশ করিয়াছিলেন সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা ভালুক দুই পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া একটা ঘরের দরজা আঁচড়াইতেছে। আমিও তাড়াতাড়ি পিঠ হইতে রাইফেলটা খুলিয়া লইলাম এবং ঐখানে দাঁড়াইয়াই ভালুকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম। ভালুকটা একটা বিকট শব্দ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া ছটফট করিতে লাগিল। এই সময় বন্ধুও ভালুকটাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। দ্বিতীয় গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ভালুকের দেহ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। কাছে যাইয়া দেখিলাম, মরিয়া গিয়াছে। চারিজন লোকে ধরাধরি করিয়া ভালুকটাকে লইয়া চলিয়া গেল। আমরাও গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম।

বন্ধু বলিলেন—দেখলে তো, তোমার শিকারের ব্যবস্থা করা আছে কি না?

হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলাম—ব্যবস্থাটা ভালই বটে, তবে উল্টে আমিই আবার না শিকার হয়ে যাই। ব্যবস্থাটা যে রকম পথে ঘাটে ছড়ানো, তাতে কিছুই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।

কথা বলিতে বলিতে আমরা একটা বাংলোর কাছে আসিয়া পড়িলাম। বন্ধু বলিলেন—এইটে আমাদের বড় সাহেবের বাংলো। চল তোমায় introduce করে দিই। বড় সাহেব কিন্তু বড় ভীতু, ঘর থেকে বেরুতেই চান না। দেখছো না বারান্দার সমস্তটাই কেমন মোটা মোটা গরাদ দিয়ে ঘেরা—দরজায় আবার দু'জন সশস্ত্র প্রহরী।

বড় সাহেব আপাদমস্তক রাগ মুড়িয়া একটা ইজি-চেয়ারে শুইয়া বিলাতী পত্রিকা পড়িতে ছিলেন। বন্ধুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—Good morning. তার পর খবর সব ভাল তো?

বন্ধুবর প্রত্যাভিবাদন করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ স্যার, খবর সবই ভাল। তার পর আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন—ইনি আমার বন্ধু মিঃ ভট্টাচার্য্য, কাল রাত্রে এখানে এসেছেন।

—ও, আসুন, আসুন, very glad to meet you, বলিতে বলিতে সাহেব চেয়ার হইতে উঠিয়া আমার সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

এখানেও আর এক দফা চায়ের আয়োজন হইল। চা পান করিতে করিতে সদ্য ভালুক শিকারের কথা উঠিল। শুনিয়া সাহেব বলিলেন—তা'হলে চলুন আজ বিকেলে একবার শিকারে বেরুনো যাক। চারটের সময় আমি নিজেই আপনাদের বাংলোয় যাব।

সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমরা বিদায় লইলাম এবং পথে কুলীরমণীদের চা-পাতা সংগ্রহের পদ্ধতি দেখিতে দেখিতে বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম।

বেলা একটার সময় আবার ঘণ্টা পড়িল। এবার কুলীদের খাইবার ছুটি। আবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল বেলা তিনটার সময়—কুলীরা সকলেই আবার যে যার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চারিটার সময় বন্ধুবর আফিস হইতে ফিরিলেন। একটু পরেই অনেক লোকজন লইয়া বড়

সাহেবও আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—মিঃ ভট্টাচারিয়া, চলুন ঐ নদীর ধারে—ওখানে অনেক শিকার পাওয়া যাবে।

কালবিলম্ব না করিয়া গুরখা শরীররক্ষী এবং কয়েক জন পার্ব্বত্য শিকারী সঙ্গে লইয়া শিকারের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। চা-বাগানের পূর্ব্ব সীমানায় একটি পার্ব্বত্য নদী আছে, অপর পারে একটি ছোট পাহাড়। পাহাড়টি ছোট হইলে কি হইবে ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আমরা বহু কষ্টে উপরে উঠিয়া একটা ফাঁকা জায়গা দেখিলাম। চারিদিকেই বড় বড় গাছ—ভীষণ জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে দুই একটা গুহা বা গর্ত্তও আছে। ঘুরিতে ঘুরিতে একটা খুব বড় গর্ত্তের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম—ভিতরে কি ভয়ানক অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না। আমি একটা বড় পাথরের টুকরা পা দিয়া ঠেলিয়া গর্ত্তের ভিতরে ফেলিয়া দিলাম। প্রস্তর-পতনের কোন শব্দ পাওয়া গেল না, তৎপরিবর্ত্তে একটা গম্ভীর গর্জ্জন-ধ্বনি ভাসিয়া আসিল। গর্জ্জন শুনিয়া সকলেই গর্ত্তের কাছে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল, দুইজন পার্ব্বত্য-শিকারী গর্ত্তের মুখে বর্শা নীচু করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল।

এবার গর্ত্তের ভিতর চাহিয়া দেখিলাম, যেন দুইটি নক্ষত্র জলজল করিতেছে। সাহেব ও বন্ধুকে ডাকিয়া দেখাইলাম। সাহেব বলিলেন—এখনই ওটাকে গুলি করে মেরে ফেলা যাক।

আমি বলিলাম—তা হয় না সাহেব—পাথর ফেলে ওকে উত্যক্ত করলে ও নিশ্চয় ওপরে উঠে আসবে। তখন গুলি করাই ভাল।

পার্ব্বত্য শিকারীরা কয়েকটুকরা বড় বড় পাথর গর্ত্তের ভিতর ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্ত্তের ভিতর হইতে ভীষণ গর্জ্জন শোনা যাইতে লাগিল—বেশ স্পষ্ট বাঘের গর্জ্জন। কিন্তু বাঘ উপরে উঠিল না। আবার কতকগুলি পাথরের টুকরা গর্ত্তের ভিতর ফেলিয়া দেওয়া হইল। এবার ভীষণ গর্জ্জন করিয়া বাঘটা লাফাইয়া বাঁকের উপর উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তিন জনের বন্দুক হইতেই বাঘকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুটিল। গুলি খাইয়া বাঘ এক লাফে একেবারে গর্ত্তের উপরে উঠিয়া আসিল। কিন্তু বাঘটা গর্ত্তের একেবারে ধারে পড়িয়াছিল, পাথর গড়াইয়া যাওয়ায় আবার নীচে পড়িয়া গেল।

আবার কয়েকটি পাথরের টুকরা গড়াইয়া গর্ত্তের ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া হইল। বাঘ পুনরায় লাফাইয়া বাঁকের উপর উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজন পুনরায় এক সঙ্গে গুলি করিলাম। এবারেও গুলি খাইয়া বাঘ লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু উপরে আর উঠিতে পারিল না—ধাপের উপর পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে একেবারে গর্ত্তের নীচে গিয়া হাজির হইল। বাঘের আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ছয় ছয়টা গুলি খাইয়াছে, কাজেই বাঘের পক্ষে পঞ্চত্ব লাভ করা আশ্চর্য্য নয়।

দুই জন পার্ব্বত্য শিকারী বর্শা লইয়া গর্ত্তের ভিতরে নামিয়া গেল। আমিও টর্চ্চ লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিলাম। গর্ত্তের ভিতরে ধাপের পর ধাপ নামিয়া গিয়াছে—উঠা নামার বেশ সুবিধা। বাঁক পর্যান্ত নামিয়া দেখিলাম, বাঘটা মরিয়া কাত হইয়া পড়িয়া আছে।

দড়িদড়া বাঁধিয়া উপর হইতে বাঘকে টানিয়া তুলিতে বেশ বেগ পাইতে হইল। মৃত বাঘকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া আমরা নদীর ধারে আসিলাম। অপর পাড়ে পাহাড়ের উপর সুবৃহৎ শৃঙ্গী একটা হরিণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাছের পাতা খাইতেছিল। এত বড় হরিণ বড় একটা দেখা যায় না। মারিবা[illegible] ভারি লোভ হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু [illegible]র আগাইবার উপায় নাই—পর্ব্বতগাত্র ভয়ানক পিচ্ছিল। একটু অসবধান হইলেই একেবারে নদীগর্ভে পড়িয়া যাইব। সাহেব বলিলেন—আর এগোবেন না, বিপদ ঘটতে পারে। এতদূর থেকে মারাও যাবে না—কি আর করা যাবে, চলুন ফেরা যাক।

আমি বলিলাম—এগুতে আর না হয় নাই পারলাম, কিন্তু এখান থেকেই একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

একটা পাথরে পায়ের ঠেস দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম এবং হরিণকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম। গুলি হরিণের বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। গুলি খাইয়াই হরিণটা লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া গিয়া গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নদীগর্ভে

গিয়া পড়িল। এক গুলিতেই শেষ। কয়েকজন লোক নীচে নামিয়া মৃত হরিণকে তুলিয়া আনিল, আমরাও বাগানের দিকে চলিতে লাগিলাম।

বাগানের সীমার কাছেই প্রায় আসিয়া পড়িয়াছি। এমন সময় একটা নেকড়ে বাঘকে পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিতে দেখিয়া আমরা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইলাম। নেকড়েটা চলিতে চলিতে হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া তীব্র দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। বুঝিলাম, এবার পলাইবে অথবা যা হয় একটা কিছু করিবে। আর কালবিলম্ব না করিয়া গুলি করিলাম। গুলিবিদ্ধ নেকড়েটা লাফাইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া গেল এবং গড়াইতে গড়াইতে একটা পাথরে আটকাইয়া রহিল। কয়েকজন যাইয়া উহাকে লইয়া আসিল।

সম্মুখে আর একটা পাহাড়। এইটা পার হইলেই চা-বাগান। আমরা পাহাড়ের উপরে উঠিয়া একটু দম লইতেছি—পরিশ্রম তো নেহাৎ কম হয় নাই—এমন সময় সাহেব বলিলেন—দেখুন, দেখুন, গাছগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন।

কিন্তু এদিক ওদিক চাহিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক জন বরকন্দাজ বলিল—হুজুর, হাতীতে গাছ ভাঙ্‌ছে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—হাতীতে? কোথায়।

—ঐ যে।

বলিয়া বরকন্দাজ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। তাহার অঙ্গুলী নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, অদূরে একটা পার্ব্বত্য নদী—জল নাই বলিলেই হয়। তাহারই অপর পাড়ে খানিকটা দূরে কতকগুলি গাছ যেন নুইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, একটা নয়, দুয়টা নয়—একেবারে এক পাল হাতী গাছ ভাঙ্গিতেছে আর পাতা খাইতেছে।

সাহেব বলিলেন—আর দেরী নয়, চলুন শীগ্‌গির এখান থেকে নিঃশব্দে সরে পড়ি। যদি বুঝতে পারে আমরা ওদের শত্রু তা'হলে আর রক্ষে নেই—একেবারে সদলবলে আক্রমণ করবে।

আমরা পড়ি তো মরি করিয়া বাগানে আসিয়া পৌছিলাম।

পরের দিন। বন্ধুবরের ডিউটি শেষ হইলে তাঁহার সঙ্গে কুলী-লাইন দেখিতে বাহির হইলাম। পথে দুই-একটা জানোয়ারের সঙ্গে দেখা হইল বটে, কিন্তু আমাদিগকে দেখিয়াই দূর হইতে পলায়ন করিল। আপ্যায়ন করিতে আর নিকটে আসিল না দেখিয়া আমি কিছু ক্ষুব্ধ হইলাম। বন্দুকে টোটা ভরাই রহিল—অতিথি সৎকারে লাগিল না। পরে আমার এই আফ্‌শোষ কতকটা দূর হইয়াছিল বটে। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া বাংলোর দিকে ফিরিতেছি, পথে এক গুলবাঘের সঙ্গে মোলাকাৎ হইয়া গেল। গুলবাঘটি এক কুলীর ঘরে ঢুকিয়াছিল। একটা ময়লা বালিশ মুখে লইয়া গুলবাঘটা জানালা দিয়া যে খানটায় লাফাইয়া পড়িল সে স্থানটি বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যেই। তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলিয়া গুলি করিলাম। এক গুলিতেই শেষ। বাঘটা লইয়া আমরা বাংলোয় ফিরিলাম।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—ওহে জ্ঞান, আজ তিনটের সময় বালিপাড়া পোষ্টাফিসে যাব হুণ্ডি আনতে, যাবে নাকি আমার সঙ্গে?

আমি খুব উৎসাহিত হইয়া বলিলাম—নিশ্চয়, যাবো বৈকি?

—তাহলে প্রস্তুত থেকো, আমি কাজ সেরে নি।

তিনটার সময় এক অদ্ভুত রকমের টমটম আসিয়া হাজির। চাকা দুইটি বড় বড়, বসিবার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—দুই জনের পক্ষে খুবই অপ্রতুল। সহিসের বসিবার স্থান পিছনে একটু নীচুতে। দুইটি বড় বড় ওয়েলার ঘোড়া জোতা হইয়াছে—খুব তেজী ঘোড়া! গাড়ীর তুলনায় ঘোড়া খুবই বড়! সহিস রামদির কোমরে এক ভোজালী, তাছাড়া কোন অস্ত্র তাহার নাই! আমরা দুই বন্ধু সশস্ত্র হইয়া গাড়ীতে উঠিলাম!

পোষ্টমাষ্টার বাবু বাঙালী। আমাদের পাইয়া ভারী খুসী। কিছুতেই আর ছাড়িতে চান না। চা, জলখাবারের বিরাট আয়োজন করিয়া ফেলিলেন এরই মধ্যে—অবশ্য

এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু সম্ভব। গল্প-গুজবে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। এখন আমাদের ফিরতেই হইবে।

আকাশ বেশ পরিষ্কার! কুয়াসা মোটেই নাই! কন্‌কনে শীতের মধ্যে মেটেমেটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে! রাস্তা বেশ প্রশস্ত বটে কিন্তু দুই ধারে ঘন কৃষ্ণবর্ণ জঙ্গল! যাবার সময় কোন বন্যজন্তুর সহিত আমাদের মোলাকাৎ হয় নাই! ফিরিবার পথে কিছু দূর যাইতেই একটা ভালুকের সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা! ভালুকটি আমাদের কিছুই বলিল না—নেহাৎ ভীরুর মত চুপ করিয়া সরিয়া পড়িল! তার পর আরও অনেক বন্য জন্তু আমাদের পথে পড়িল বটে, কিন্তু ঘোড়ার খুরের এবং গাড়ী চলার শব্দে ভয় পাইয়াই যেন তাহারা সরিয়া পড়িতেছিল! নানা রকমের হরিণের পাল এবং একটি হায়নার দেখাও আমাদের মিলিয়াছিল! প্রায় অর্দ্ধেক রাস্তা আসিয়াছি এমন সময় একটা নেকড়ে যেন আস্ফালন করিতে করিতে গাড়ীর পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। বন্ধু সহিসকে বলিলেন—রামদি, ঐ দেখ।

রামদি নেক্‌ড়েটার দিকে এক বার চাহিয়া বলিল—কুছ ডর নেহি হুজুর, জোরসে হাঁকাইয়ে।

গাড়ী আরও বেগে ছুটিয়া চলিল। নেক্‌ড়ে বাঘটাও খানিকক্ষণ লাফালাফি করিয়া জঙ্গলের ভিতর চলিয়া গেল। ইহার পর অবশিষ্ট পথে আর কোন বন্যজন্তুর সহিত আমাদের দেখা হয় নাই।

রাত্রে আহারাদির পর বিছানায় শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। গভীর রাত্রে বিকট শাঁখের আওয়াজের মত শব্দ এবং কুলীদের কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জানালা খুলিয়া দেখিলাম, চার-পাঁচ স্থানে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, বরকন্দাজরা বড় বড় মশাল জ্বালাইয়া ঘুরাইতেছে আর প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে এবং সমস্ত কোলাহলকে ডুবাইয়া মধ্যে মধ্যে শোনা যাইতেছে—বিকট শাঁখের আওয়াজের মত শব্দ।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বন্ধুও জাগিয়াছেন টের পাইলাম। তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। বন্ধু বলিলেন—বাগানে হাতী ঢুকেছে, তাই আগুন জ্বেলে চেঁচামেচি করছে। নইলে গাছপালা সব নষ্ট করে ফেলবে।

কিছুক্ষণ পরে কোলাহল থামিয়া গেল, সেই বিকট শাঁখের মত শব্দও আর শোনা গেল না। অনুমানে বুঝিলাম হাতী চলিয়া গিয়াছে।

পরের দিন বন্ধুর সহিত বাহির হইলাম—গত রাত্রে হাতী কি পরিমাণ ক্ষতি করিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য। গুরুতর ক্ষতি কিছু হয় নাই—দু'টা লাইনের চা-গাছ কতক নষ্ট করিয়াছে। বাগানের বাহিরে আসিয়া বনমধ্যে হাতীর যাতায়াতের পথ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। জন্তু-জানোয়ারেরা সাধারণতঃ একই স্থান দিয়া যাতায়াত করে এবং ক্রমাগত যাতায়াতের ফলে বেশ একটা পথ পড়িয়া যায়, সুন্দরবনেও জানোয়ারের চলার পথ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে হাতীর যাতায়াতের পথ যেমন পরিষ্কার ও কাঁটা-কাঁকর শূন্য তেমনটি কোথাও দেখি নাই। অবশ্য অন্যান্য জন্তু সকল স্থানেই যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু হাতী তাহা পারে না। তাহাদের গতিবিধি একই পথ ধরিয়া চলে। তাই দীর্ঘকাল চলার ফলে পথটি বেশ পরিষ্কার ও কাঁকর-কাঁটা শূন্য হইয়া যায়।

বেলা দশটার সময় বাসায় ফিরিয়া চা পান করিতেছি। বন্ধু-গৃহিণী ঝি সঙ্গে লইয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। একটু পরে ঝি দৌড়াইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল— বা-ঘ।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর মাইজী কোথায়?

—তিনি নদীতে স্নান করছেন।

—নদীতে? আমরা ভীত ও শঙ্কিত হইয়া তড়িৎ-গতিতে বন্দুক লইয়া ছুটিলাম নদীর দিকে। কয়েকজন বরকন্দাজও আমাদের সঙ্গে চলিল। নদীর পাড়ে যাইয়া দেখিলাম তিনজন বন্দুকধারী বরকন্দাজ দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা নদীর অপর পাড়ে খুব উঁচু একটা পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—ঐ বাঘ।

সত্যই দুইটা প্রকাণ্ড বাঘ—যাকে বলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার—পাহাড়ের উপর খেলা করিতেছে। এত উচ্চে যে সেখান হইতে লাফ দিয়া পড়িলে বাঘের হাড়ও গুঁড়া

হইয়া যাইবে, তা'ছাড়া বাঘদুটির এদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না, তাহারা আপন মনে খেলা করিতেছিল। কিন্তু এদিকে আর এক বিপদ—নদীর জলে বন্ধু-পত্নীর চিহ্নমাত্রও নাই। আমরা সকলেই ভীত এবং ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। বন্ধু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর মাইজী কোথায়?

—পানিমে হুজুর।

—পানিমে কাঁহা দেখলাও।

ধমক খাইয়া ঝি জল হইতে বন্ধু-পত্নীকে তুলিয়া আনিল। পাহাড়ের উপর বাঘ দেখিয়া তিনি এমনই ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন যে, শুধু নাকটি জলের উপর ভাসাইয়া নিঃসাড়ে জলে পড়িয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই নাই। তীরে উঠিয়াই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। অনেক শুশ্রূষার পর তাঁহার জ্ঞান হইল।

বিকালে বন্ধু এবং আমি টমটমে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বেশ খানিকটা দূর—একেবারে ডাকা-জুড়ি ফরেষ্টের ডাকাজুড়ি নদীর পোল পার হইয়াও খানিকটা আগাইয়া গেলাম। এবার ফিরিবার পালা। টমটম ডাকাজুড়ী নদীর পোলের উপর উঠিতেছে এমন সময় দেখিলাম ওপারে পোলের নীচে প্রকাণ্ড একটা বাঘ চক্‌চক্ করিয়া জল খাইতেছে। ঠিক সেই সময়েই ওপারে একজন লোক সাইকেল চড়িয়া পোলের দিকে আসিতেছিল। লোকটি যেন ক্রমেই পথের একধারে আসিয়া পড়িতেছিল। ব্যাপার কি! লোকটা পাগল নাকি? না, বাঘ দেখিবার জন্য নদীর কিনারায় আসিতেছে আমরা ভাল করিয়া ভাবিবারও অবসর পাইলাম না—লোকটি পোলের কাছে আসিয়া হঠাৎ সাইকেল সহ নদীর মধ্যে গড়াইয়া পড়িল। পড়বি তো পড় একেবারে বাঘের পাশেই। আমরা তো লোকটির পরিণাম ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম—কি যে করিব কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আর এদিকে লোকটার অবস্থা যে কি তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা তো এক রকম ঠিক করিয়াই লইলাম যে, এইবার বাঘ নিমেষ মধ্যে লোকটার উপর লাফাইয়া পড়িবে। সাইকেলসহ লোকটাকে গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া বাঘটাও বোধ হয় হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল—এ আবার কি জানোয়ার রে বাবা! ঘাড় বাঁকাইয়া একবার লোকটার দিকে তাকাইয়া দেখিল, তার পরই অদ্ভুতভাবে শরীর সঙ্কুচিত করিয়া উর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিল—তার পর উর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট।

বাঘ তো 'যঃ পলায়তি স জীবতি' ভাবিয়া জঙ্গলে যাইয়া ঢুকিল, আমরা বাঘের কাণ্ড দেখিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া লইলাম। তার পর কয়েকজন পথ চল্‌তি পাহাড়ী লোক ডাকিয়া লোকটির সংজ্ঞাহীন দেহ নদী হইতে উদ্ধার করা গেল। তাহার শরীরের অনেক স্থান কাটিয়া ছড়িয়া গিয়াছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর লোকটিকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বাগানের দিকে অগ্রসর হইলাম।

ইতিমধ্যে বেশ রাত্রি হইয়া গিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। দুই বন্ধুতে এই সাহসী বাঘটার কথা আলোচনা করিতে করিতে চলিয়াছি। খানিক দূর আসিবার পর দুইটা নেকড়ে গর্জ্জন করিতে করিতে রাস্তার উপর আসিয়া পড়িল। উহাদের চীৎকারে ঘোড়া দুইটা ভয় পাইয়া লাফাইতে সুরু করিয়া দিল—কিছুতেই বাগ্-মানাইতে পারা যায় না। করাই বা যায় কি? অবশেষে একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলাম। বন্দুকের শব্দে ঘোড়া দুইটা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু নেকড়ে দুইটা পাশের জঙ্গলে পলাইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীমতী

[নাটিকা]

রচনা :—শ্রীসতীকুমার নাগ

গান :—শ্রীতারাপদ লাহিড়ী

প্রথম দৃশ্য

[বৌদ্ধ মন্দির। সময়—সন্ধ্যা। আরতির ঘণ্টাধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। আরতির পর নর্তকীদের নৃত্য আরম্ভ হইল। মাঝে মাঝে বৌদ্ধ পুরহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পরে নর্তকীদের সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া উঠিল।]

গান

(জাগে) অন্তরে সন্ধ্যার মূরতিখানি
মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খধ্বনি
ধরার বুকে আজি নামিল সন্ধ্যা ঐ
আরতির বন্দনা উঠেছে রণি'।
মোরা পূজারিণী সবে
দেব-দেউলে।
সাজায়ে এনেছি ডালা
নৃত্যের ছন্দে,
ধূপদীপ গন্ধে ॥
পাষাণ দেবতা জানি
লইবে প্রণাম
উঠিবে মুখর হ'য়ে
পূজার বাণী ॥

[সঙ্গীত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ অজাতশত্রু, রাজগুরু এবং মন্ত্রীর প্রবেশ]

অজাতশত্রু। (রাজগুরুরপ্রতি) গুরুদেব, আজ হ'তে এই মন্দিরের দ্বার চিররুদ্ধ।

গুরুদেব। মহারাজ, আপনার পিতার প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতি যে নির্মম আদেশ।

অজাতশত্রু। আমি এখন মগধের রাজা। পিতার ধর্ম, আমার ধর্ম নয়।

গুরুদেব। পিতৃদেবের প্রতি যে অবিচার মহারাজ!

অজাতশত্রু। অবিচার! [হোঃ-হোঃ-হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন] সন্তান হয়ে বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে কারাগৃহে বন্দী করেছি। এ রাজ্য হ'তে বৌদ্ধ ধর্মকে লুপ্ত করাই যে আমার ধর্মনীতি, গুরুদেব। পরে মন্ত্রীর দিকে তাকাইয়া] মন্ত্রী!

মন্ত্রী। আজ্ঞে!

অজাতশত্রু। রাজ্যে ঘোষণা করুন, বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা ছাড়া যে বুদ্ধকে পূজা করবে—তার শাস্তি মৃত্যু।

[গুরুদেব শিহরিয়া উঠিলেন]

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে!

অজাতশত্রু। মন্ত্রী, পিতার গ্রন্থশালায় যত বৌদ্ধগ্রন্থ আছে সমস্তই অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে!

অজাতশত্রু। [গুরুদেবের প্রতি চাহিয়া] আমার আদেশ যেন প্রতিপালিত হয়, গুরুদেব।

[প্রস্থানোদ্যত। এই সময় দেখিলেন একটি নারী সংকুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। হাতে তাহার ফুল-ডালি ও পূজা-উপচার। অজাতশত্রু তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন] কি চাই তোমার?

নারী। বুদ্ধদেবের চরণতলে অর্ঘ্য দিতে এনেছি এই উপচার।

অজাতশত্রু। বুদ্ধের চরণতলে! [কঠোর কণ্ঠে]

নারী, ফিরে যাও আপনার গৃহে। এই রাজ্য হ'তে বুদ্ধ নির্বাসিত।

নারী। আমার যে মানত ছিল।

অজাতশত্রু। মানত! [হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন] ফিরে যাও প্রাণ নিয়ে। তোমাদের রাজাই সর্বদেবতা নারী।

[পূজা-উপচার সহসা হস্তচ্যুত হইল। এবং মাটিতে পড়িয়া ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল। নারী-কণ্ঠে কাতর অথচ মৃদু আর্তনাদ। রাজা অজাতশত্রু মন্ত্রীসহ প্রস্থান করিলেন।

নারী। [সকরুণ কণ্ঠে] গুরুদেব!

গুরুদেব। মা, তুমি তোমার ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছ বুদ্ধদেবের কাছে, কিন্তু এই মন্দিরে ত তা হবে না।

নারী। আমি যে সন্তানের কল্যাণ কামনায় এই পূজা···

গুরুদেব। ফিরে যাও নারী! আমি নিঃসহায়—নিরুপায়। [নারী মলিন বদনে ধীর পদে চলিয়া গেল। গুরুদেব পরে নর্তকীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন] তোমরাও ফিরে যাও। মনে রেখ, এই তোমাদের শেষ আরতি-উৎসব এই বৌদ্ধ মন্দিরে। [নর্তকীরা একে একে চলিয়া গেল। তাহাদের বিদায়ের মঞ্জীর-নিক্কণ করুণ ও বিষাদ শোনা গেল। পরে গুরুদেব বুদ্ধদেবের মূর্তির দিকে চাহিয়া বলিতে থাকিলেন]—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

সংঘং শরণং গচ্ছামি। [প্রণাম করিয়া উঠিলেন] এই তোমার শেষ আহুতি। অপরাধ নিও না প্রভু।

[পিছন দিক হইতে রাজদ্বারীর আগমন]

রাজদ্বারী। গুরুদেব, মহারাজের আদেশে মন্দিরদ্বার বন্ধ করতে এসেছি।

গুরুদেব। এসেছ···বেশ···তাই কর রাজদ্বারী···প্রভু-আজ্ঞা পালন কর।

[রাজদ্বারী মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা। অজাতশত্রু সিংহাসনে আসীন।
দেবদত্তের আগমন।

অজাতশত্রু। দেবদত্ত কি সংবাদ নিয়ে এলে আবার?

দেবদত্ত। মহারাজ, আজ শারদ পূর্ণিমা। প্রত্যেক রাজ্যে সাড়া পড়ে গেছে উৎসবের।

অজাতশত্রু। কিসের দেবদত্ত?

দেবদত্ত। বুদ্ধদেবের উৎসব, বিরাট আয়োজন হচ্ছে দেশে দেশে, নগরীতে নগরীতে। তোমার এই রাজ্যে তার কি আয়োজন করলে?

অজাতশত্রু। হাঃ হাঃ হাঃ—আমার রাজ্যে—নিষ্প্রদীপ। দেবদত্ত, তুমি আমায় পরীক্ষা করতে এসেছো—নয়?

দেবদত্ত। সে অভিপ্রায় ত আমার নয় মহারাজ!

অজাতশত্রু। দেবদত্ত, পিতার ধর্মকে উচ্ছেদ সাধন করাই যে আমার নবধর্ম প্রবর্তন।

[এই সময় নেপথ্যে রাজঢুলির ঘোষণা শোনা গেল : মহারাজ অজাতশত্রুর আদেশ এই রাজ্যে কোন নরনারী বুদ্ধের পূজা করিলে—তাহার মৃত্যুদণ্ড।]

অজাতশত্রু। শোন বন্ধু, ঐ আমার রাজ-আজ্ঞা। রাজ্যে প্রচারিত করেছি বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা ছাড়া সব মিথ্যা।

দেবদত্ত। আমি ত তোমায় এই কথাই বলতে এসেছি। যেখানে যেখানে বুদ্ধের মূর্তি আছে তাকে লুপ্ত করে সেখানে প্রতিষ্ঠা কর রাজমূর্তি। আর সেই সঙ্গে রাজ-উৎসবের ব্যবস্থা কর। এই প্রস্তাব বহন করে এনেছি মহারাজ।

অজাতশত্রু। উত্তম প্রস্তাব। তাই হবে রাজ্যে দেবদত্ত।

দেবদত্ত। আমি যাই মহারাজ

[দেবদত্ত চলিয়া গেল। এই সময় মন্ত্রীর আগমন]

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনার দ্বারে ব্রাহ্মণ দর্শন প্রার্থী।

অজাতশত্রু। সসম্মানে রাজসভায় তাঁকে নিয়ে আসুন।

[মন্ত্রীর তথাকরণ। পুনরায় দর্শনপ্রার্থীকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রী রাজ-সভায় আসিলেন]

অজাতশত্রু। আপনার কি চাই ?

ব্রাহ্মণ। মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

অজাতশত্রু। আমিই মগধের মহারাজা।

ব্রাহ্মণ। আপনার কল্যাণ হউক, আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। সুদূর হিমালয় হ'তে এসেছি আপনার রাজ্যের খ্যাতি শুনে।

অজাতশত্রু। আপনার পরিচয় ত বললেন না ?

ব্রাহ্মণ। আমি একজন সামান্ত ভিক্ষুক—ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী।

অজাতশত্রু। [মন্ত্রীর দিকে তাকাইয়া] মন্ত্রী, এই ব্রাহ্মণকে রাজকোষ হ'তে শত স্বর্ণমুদ্রা দান করুন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান]

ব্রাহ্মণ। আমি ত স্বর্ণমুদ্রার জন্তে আসিনি মহারাজ।

অজাতশত্রু। তবে ?

ব্রাহ্মণ। আজ শারদ পূর্ণিমা—বুদ্ধদেবের উৎসব—এই উৎসব উপলক্ষে আপনার রাজ্যে আগমন।

অজাতশত্রু। আপনি বৌদ্ধশিষ্য! বুদ্ধ আমার শত্রু। রাজ-আদেশ শুনেছেন কি ? এই রাজ্যে বুদ্ধের উৎসব নিষিদ্ধ।

ব্রাহ্মণ। কিন্তু রাজা বিম্বিসার যে একজন বৌদ্ধশিষ্য।

অজাতশত্রু। তিনি আমার পিতা। তাঁকে বন্দী করে আমিই সিংহাসনে আরোহণ করেছি। আপনি এই মুহূর্তে এই রাজ্য হ'তে বিদায় গ্রহণ করুন। রাজ-আজ্ঞা অমান্ত করলে আপনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

[এই সময় মন্ত্রী রাজকোষ হইতে স্বর্ণমুদ্রা নিয়া আসিলেন]

অজাতশত্রু। মন্ত্রী, এই ব্রাহ্মণকে রাজ্যের বাহির সীমানায় নির্বাসন করে আসুন।

মন্ত্রী। আসুন—ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ। আপনিই অজাতশত্রু।

অজাতশত্রু। হ্যাঁ—আমিই সেই অজাতশত্রু—পিতার ধর্মকে কলুষিত করার জন্য সিংহাসনে বসেছি। যাও ব্রাহ্মণ প্রাণ নিয়ে ফিরে।

[ব্রাহ্মণকে লইয়া মন্ত্রীর প্রস্থান]

অজাতশত্রু। আজ এই রাজ্যে নিষ্প্রদীপ...উৎসব নাই, সমারোহ নাই।

[রাজা আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ অন্তঃপুর। রাজ্ঞী অমিতার কক্ষ। চারিদিক জ্যোৎস্নার রজত ধারায় প্লাবিত করিয়া পূর্বাকাশে শারদপূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। রাজ্ঞী অমিতা একমনে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নীল আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। ফুল ও পূজা-উপচার লইয়া শ্রীমতীর প্রবেশ।

শ্রীমতী। [রাজ্ঞী অমিতাকে সম্বোধন করিয়া] মা!

অমিতা। [পিছন ফিরিয়া] কে, শ্রীমতী! তোর হাতে এ সব কি ?

শ্রীমতী। [প্রণাম করিয়া] মা, আজ শারদ পূর্ণিমা-উৎসব। তোমার কাছে অনুমতি নিতে এসেছি। আমি জানি তুমিই একমাত্র আমাকে এই উৎসবের অনুমতি দিতে পার।

অমিতা। উৎসব! কিসের উৎসব শ্রীমতী ?

শ্রীমতী। ভগবান বুদ্ধদেবের।

অমিতা। [শিহরিয়া উঠিলেন] শ্রীমতী, আমি ত তোকে এ অনুমতি দিতে পারি না। আমার স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে তোকে কি করে অনুমতি দেই বল্ ত। শীগ্‌গির এ সব নিয়ে পালিয়ে যা। কে কোথায় দেখে ফেলবে—শেষকালে পড়বি বিপদে। ফিরে যা মা, ফিরে যা।

শ্রীমতী। আমি যে আজ বুদ্ধদেবের উৎসব করব বলে মনে করেছি মা।

অমিতা। কেন বৃথা মরণকে ডেকে নিয়ে আসছিস শ্রীমতী ? আমার অনুরোধ রাখ—মা।

[শ্রীমতী বিষণ্ণ বদনে অমিতার কাছ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

রাজকুমারী শুক্লার কক্ষ।—শুক্লা গান গাহিতেছে।

গান

শরতের রূপালী আলোয়
নিদ্‌হারা চাঁদ জাগে
আকাশের গায়।
সাথীহারা মন গাহে
বিরহের গান
দখিন বাতাস শুধু
কাঁদিয়া বেড়ায়।
বাতায়নে দীপ জ্বালি
আর কতদিন
কাটাব এমন রাতি
নিদ্রা বিহীন।
স্বপন-কুহেলী মাখা
আশার কুসুম
গন্ধে উতলা হয়ে
সুবাস ছড়ায়

[শুক্লার গান শেষ হইলে শ্রীমতী ফুল ও পূজা-উপচার সহ কক্ষে প্রবেশ করিল।]

শুক্লা। শ্রীমতী, এ ফুল প্রদীপ নিয়ে এ সময় কোথায় চলেছিস?

শ্রীমতী। তোমার কাছে একটিবার এলুম রাজ-কুমারী। মা ত আদেশ দিলেন না?

শুক্লা। কিসের আদেশ? কোথায় যাবি?

শ্রীমতী। আজ শারদ পূর্ণিমা-উৎসব! সে-কথা কি জানো না?

শুক্লা। শারদ পূর্ণিমা-উৎসব! কই তা ত জানি না। কিসের? কার?

শ্রীমতী। বুদ্ধদেবের জন্ম যে পূর্ণিমাতেই হয়েছিল।—তারি বন্দনা করতে চলেছি মন্দিরে। একটিবার অনুমতি দেও রাজকুমারী!

শুক্লা। এ-কি কথা বলছিস তুই! আমাদের যে বুদ্ধের উৎসব করা নিষেধ। দাদার আদেশ কি ভুলে গেলি? তোর প্রাণে কি একটুও ভয় নেই। দাঁড়িয়ে থাকলি যে! লুকিয়ে ফেল এ সব!

শ্রীমতী। তবে আমি যাই। সময়ও হয়ে এলো।

[শ্রীমতী সেখান হইতে ধীরপদে প্রস্থান করিল]

পঞ্চম দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যে বর্ণিত বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। পূজা-উপচার হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ। শ্রীমতী মন্দির-সোপানতলে প্রদীপ রচনা করিল এবং ফুল দ্বারা সজ্জিত করিল। প্রজ্জ্বলিত দীপমালা দেখিয়া কোষমুক্ত অসিহস্তে প্রহরী আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজপ্রহরী। কে এই নিভৃত স্থানে দীপমালা জ্বালিয়েছে?

শ্রীমতী। আমি জ্বালিয়েছি—আমি শ্রীমতী।

প্রহরী। কার আদেশে এখানে এসেছো?

শ্রীমতী। আমার প্রভুর আদেশ।

প্রহরী। প্রভু! রাজা আদেশ দিয়েছেন?

শ্রীমতী। আমার প্রভু ঐ মন্দিরে বন্দী—বুদ্ধদেব। আজ তাঁরি শারদ-পূর্ণিমা-উৎসব তাই পূজো দিতে এসেছি আমি।

প্রহরী। মূর্খ নারী, রাজ-আজ্ঞা অমান্য। মৃত্যু তোর পুরস্কার!

[প্রহরী তরবারি দ্বারা শ্রীমতীকে আঘাত করিল। শ্রীমতী কেবল 'প্রভু আমার' বলিয়া সকরুণ আর্ত্তনাদ করিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। এমন সময়ে মহারাজ প্রবেশ করিলেন।]

অজাতশত্রু। এ কি! হত্যা! প্রহরী!

প্রহরী। হাঁ—মহারাজ! আপনার আদেশ পালন করেছি। রাজদাসী শ্রীমতী রাজ-আজ্ঞা অমান্য করেছে।

অজাতশত্রু। আমার আদেশে হত্যা! উঃ—রক্ত—রক্ত ঐ নারী...হ্যাঁ আমিই আদেশ দিয়েছি, কিন্তু ঐ রক্তাক্ত মৃতদেহ যে আমার চোখে বিভীষিকার দৃশ্য সৃষ্টি করেছে—বুদ্ধ...বুদ্ধ... প্রহরী, উন্মুক্ত করে দাও ঐ মন্দিরদ্বার—উৎসবের আয়োজন। ক্ষমা কর অমিতাভ!

[করজোড়ে প্রণাম করিলেন।]

যবনিকা

ধন-সম্পদের গোড়ার কথা

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী বি-এল

১৯

গত মাসে আমরা বলিয়াছি, কোন পণ্যের মধ্যে সঞ্চিত শ্রমদ্বারা উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না, উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় উহা তৈয়ার করিতে যে পরিমাণ সজীব শ্রম প্রয়োজন তাহারই দ্বারা। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝিতে আমরা চেষ্টা করিব। মনে করুন, একটি পণ্য তৈয়ার করিতে ৬ ঘণ্টা শ্রম আবশ্যক অর্থাৎ উহা ৬ ঘণ্টা শ্রমের প্রতিনিধি। এখন, যদি এমন কোন নূতন আবিষ্কার হয় যাহার ফলে ঐ পণ্যটি ৩ ঘণ্টায় তৈয়ার করিতে পারা যায় তাহা হইলে যে-পণ্যটি পূর্ব্বেই তৈয়ার করা হইয়াছে তাহার মূল্য অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে। কারণ, পণ্যটি এখন পূর্ব্বের ন্যায় ৬ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৩ ঘণ্টা প্রয়োজনীয় সামাজিক শ্রমের দ্বারা তৈয়ারী হইতেছে। সুতরাং পণ্য-মূল্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় উক্ত পণ্য তৈয়ার করিতে যে-পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন তাহারই দ্বারা, বস্তুরূপে রূপায়িত (objectified form of labour) শ্রমের দ্বারা নহে।

আসলে ব্যাপারটা অন্য রকমের। বাজারে শ্রম বিক্রয় হয় না, বিক্রয় হয় শ্রম-শক্তি। পুঁজিপতি অর্থাৎ টাকা-পয়সার মালিক বাজারে শ্রমের সম্মুখীন হন না, সম্মুখীন হন শ্রমিকের এবং শ্রমিক যাহা বিক্রয় করে তাহা তাহার শ্রম নয়, তাহার শ্রম-শক্তি। শ্রমিক যখন পুঁজিপতির জন্য শ্রম আরম্ভ করে তাহার পূর্ব্বেই সে তাহার শ্রমের মালিকত্ব খোয়াইয়া বসে। সুতরাং শ্রম বিক্রয় করিবার অধিকার আর তাহার থাকে না। শ্রমই মূল্যের সার বস্তু এবং মূল্যের পরিমাপকও বটে। কিন্তু উহার নিজের কোন মূল্য নাই।

মামুলী অর্থনীতি শাস্ত্রে যাহাকে শ্রমের মূল্য বলা হয় আসলে উহা শ্রমশক্তির মূল্য এবং উহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে শ্রমিকের দেহে। কল-যন্ত্র যে-কাজ করে তাহা হইতে কল-যন্ত্র যেমন স্বতন্ত্র জিনিষ তেমনি শ্রম-শক্তির ক্রিয়া হইতে শ্রম-শক্তিও স্বতন্ত্র। মানুষের মধ্যে যে সকল দৈহিক এবং মানসিক সামর্থ্য বর্ত্তমান আছে যেগুলিকে সে কোন ব্যবহারিক পণ্য তৈয়ার করিবার জন্য খাটায় সেইগুলির সমষ্টিকে আমরা বলিতে পারি শ্রম-শক্তি বা শ্রম করিবার সামর্থ্য। শ্রমশক্তির মূল্য হইতে কিরূপে শ্রমিকের মজুরি নির্দ্ধারিত হয় তাহাই এখন আমরা আলোচনা করিব।

মজুরি সম্বন্ধে মামুলী অর্থনীতি-শাস্ত্রে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল মতবাদ লইয়া আলোচনা করিবার এখানে স্থানাভাব। মজুরি সম্বন্ধে অর্থনীতি-শাস্ত্রের কোন মতবাদই মজুরির হার নির্দ্ধারণ করে না, কেবল মজুরির প্রচলিত হারকে একটা যুক্তিসঙ্গত রূপ দিতে চেষ্টা করে মাত্র। অর্থনীতি-শাস্ত্রের সৃষ্টি যখনও হয় নাই তখনও মজুরি-প্রথা যে একেবারেই ছিল না তাহা নহে। তখনও মানুষ মজুর নিযুক্ত করিত এবং তাহাকে মজুরিও দিত। মজুরির হার সেই সময় যে ভাবে নির্দ্ধারিত হইত বর্ত্তমান যুগেও তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই।

শ্রমিককে খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে হয়। মৃত্যুর পর তাহার শূন্য আসন অধিকার করিবার জন্য নূতন মজুরও সৃষ্টি করা প্রয়োজন। মজুরের যোগানকে প্রবাহিত রাখিবার জন্য শ্রমিককে বিবাহ করিতে হয় এবং বিবাহের ফলস্বরূপ সন্তান-সন্ততির আগমন অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে প্রতিপালন করিতে হয়, খাওয়াইয়া পরাইয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। এক কথায় শ্রমিক এবং তাহার পরিবারবর্গের খোরপোষ চলিয়া যাওয়া প্রয়োজন। খোরপোষেরও আবার একটা সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ আছে যাহার কম হইলে মানুষ

বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, বাঁচিয়া থাকিলেও তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহার কর্ম্মক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে-মজুরি না পাইলে শ্রমিকের সংসার-খরচ নির্ব্বাহ হয় না তাহার কম মজুরিতে সে কাজ করিতে সে রাজী হইবে না। পুঁজিপতিও ইহার অধিক মজুরি শ্রমিককে দিতে রাজী হইবেন না। কারণ, ঐ মজুরি না পাইলে শ্রমিকের যখন উপবাস ছাড়া আর গত্যন্তর নাই, তখন উহাতেই তাহাকে রাজী হইতে হইবে, একথাটা পুঁজিপতিরা বেশ ভাল করিয়াই জানেন। সুতরাং গড়পড়তা প্রত্যেক শ্রমিকের সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিষের যে মূল্য শ্রম-শক্তির মূল্যও তাহাই। অতীতে ও বর্ত্তমানে এই মাপকাঠি দিয়াই শ্রমিকের মজুরি নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং হইতেছে, শ্রমের মূল্য দিয়া মজুরি নির্দ্ধারিত হয় না, শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি দ্বারাও হয় না।

গড়পড়তা প্রত্যেক শ্রমিকের সাংসারিক প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মূলেও ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশের মজুরের জীবন-যাত্রার প্রণালী এক নয়। কিন্তু প্রত্যেক দেশের মজুরের জীবন-যাত্রার মান তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সভ্যতার ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-যাপনের রীতি-পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন হয়। যে-দেশ যে-পরিমাণে সভ্য হইয়াছে সে-দেশের মজুরদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের মানদণ্ডও সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখন তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানদণ্ড পাশ্চাত্য দেশের শ্রমিক-দের জীবনযাত্রার মান অপেক্ষা অনেক খাটো। দেশ ও কাল ভেদে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ভারতীয় শ্রমিকদের যে টাকায় সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়, ইউরোপীয় শ্রমিকদের তাহাতে চলে না। তাই তাহাদের মজুরি চাই বেশী। কিন্তু বেশী হইলেও উহা কেবল তাহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যে-ব্যয় হয় তাহারই সমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রম-শক্তির মূল্য জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে-পরিমাণ দ্রব্যের প্রয়োজন তাহারই মূল্যের সমান।

শ্রমিকের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যে-সকল জিনিষের প্রয়োজন তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশে ও সমাজে শ্রমিকের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কি কি জিনিষ দরকার এবং কি পরিমাণে দরকার তাহা আমাদের অজ্ঞাত নয়। এই পরিমাণকে আমরা স্থায়ী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি, কিন্তু পরিবর্ত্তন হয় উহার মূল্যের। কল-যন্ত্রের ব্যবহারে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই বলিয়া এ কথা বলা চলে না যে, গড়পড়তা প্রত্যেক শ্রমিক-পরিবারের জন্য পূর্ব্বে যে যে জিনিষ যে-পরিমাণে লাগিত-এখন তাহা অপেক্ষা কম লাগে। শ্রমিক পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিষ-গুলির পরিমাণ ঠিকই আছে, পরিবর্ত্তন হইয়াছে কেবল উহাদের মূল্যের। অতএব একথা অবশ্যই আমরা বলিতে পারি যে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে-সকল দ্রব্য প্রয়োজন তাহাদের মূল্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রম-শক্তির মূল্যেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমরা জানি, পণ্য তৈয়ার করিতে যে পরিমাণ সামাজিক শ্রম দরকার তাহার দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় এবং ইহাও আমরা জানি, (মাতৃভূমি, ফাল্গুন, ১৩৪৬, পৃঃ ১০৪), শ্রমের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় শ্রমের কাল পরিমাণ দ্বারা। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, শ্রমিক পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে যে শ্রম-সময় দরকার তাহার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রম-শক্তির মূল্যেরও পরিবর্ত্তন হয়।

ক্রমশঃ

সঞ্চয়ন

ভারতীয় কোম্পানী-আইনের ইতিহাস ও ক্রমবিবর্ত্তন

[১৯৪১।৩০শে মার্চ্চ তারিখের জয়েন্ট ষ্টক্ কোম্পানিজ্ জার্ণালে প্রকাশিত "History and Development of Indian Companies Act" শীর্ষক প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ]

কোম্পানি-আইন যে ইংলণ্ডই ভারতবর্ষকে দান করিয়াছে তাহা বিনা আপত্তিতেই স্বীকার করিতে হইবে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে কোম্পানি আইন পাশ হয় তাহারই অনুকরণে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যৌথ কারবারগুলিকে রেজেষ্টরী করিবার জন্য ভারতবর্ষে এক আইন (১৮৫০ সালের ৪৩নং আইন) বিধিবদ্ধ হয়। অংশীদারদের সম্মতি ব্যতীতই অংশ ইত্যাদি বিক্রয় করা যাইতে পারে এইরূপ কোম্পানি গঠন করা এই আইন দ্বারাই সম্ভবপর করা হইয়াছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং জনসেবার (charitable) উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানিগুলিও রেজেষ্ট্রী করার সুবিধা এই আইনে দেওয়া হয়। এই আইনকে ভারতীয় কোম্পানি আইনের ভিত্তি বলা যাইতে পারে,—পরবর্ত্তী কোম্পানি আইনগুলি ইহারই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আইনে আমরা নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে বিধান দেখিতে পাই: ১। সভা, ২। পরীক্ষিত হিসাব এবং ব্যালান্সসিট, ৩। অংশীদার, ডিরেক্টার এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদের তালিকা, ৪। স্বয়ং কোম্পানি কর্ত্তৃক নিজ কোম্পানির অংশ ক্রয় করা, ৫। ডিরেক্টার এবং কর্ম্মচারীদিগকে ঋণ দান, ৬। অপ্রদত্ত মূলধন, ৭। অংশ হস্তান্তর করিতে অংশীদারদের অধিকার, ৮। আইনতঃ স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে কোম্পানির বিরুদ্ধে এবং কোম্পানি কর্ত্তৃক মোকদ্দমা আনয়ন করা, ১০। পূর্ব্বে যাঁহারা সদস্য ছিলেন তাঁহাদের দায়িত্ব, ১১। কোম্পানি তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি। এই আইন অনুসারে কোম্পানি রেজেষ্ট্রী করা ছিল খুব সহজ। কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ এই তিন সুপ্রিম কোর্টের যে কোর্টের এলাকায় কোম্পানি কারবার চালাইতে ইচ্ছুক সেই সুপ্রীম কোর্টে রেজেষ্ট্রীর জন্য দরখাস্ত করিতে হইত। কোর্টকে কোম্পানি রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য আদেশ দিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল। দরখাস্তে শেয়ার-হোল্ডার অথবা পার্টনারদের নাম, কোম্পানির নাম কোন স্থানে কারবার চালান হইবে এবং কি কারবার করা হইবে তাহা, মোট মূলধনের পরিমাণ এবং উহাকে কতটি শেয়ারে বিভক্ত তাহা উল্লেখ করিতে হইত। দরখাস্তের সঙ্গে অংশীদার-পত্র (Deed of Partnership) এবং অংশীদার ও ডিরেক্টারদের নামের তালিকা দাখিল করিতে হইত। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই আইন অনুযায়ী ১৪টি কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছিল। এই কোম্পানিগুলির মধ্যে 'নিউ ওরিয়েণ্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি' ১৮৫১ সালের ১৬ই জুন তারিখে রেজেষ্ট্রী করা হয়।

১৮৪৪ সালের ইংলণ্ডের আইনের মত ১৮৫ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনে অংশীদারদের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন বিধান ছিল না। কাজেই কোম্পানির দেনার জন্য অংশীদার-সম্পর্কিত সাধারণ আইন অনুযায়ীই অংশীদারগণ দায়ী ছিলেন। তবে কোম্পানির নিকট হইতে দেনা আদায় করা অসম্ভব না হইলে কোন অংশীদারের নিকট হইতে দেনা আদায় করা যাইত না।

১৮৫৫ সালে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোম্পানি আইন পাশ হওয়ার পর ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে যৌথ কারবার সম্পর্কিত অনুরূপ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৫৭ সালে এবং ১৮৫৮ সালে ইংলণ্ডে যথাক্রমে যৌথ ব্যাঙ্কিং আইন এবং সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট যৌথ ব্যাঙ্কিং আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর ভারতবর্ষে ১৮৬০ সালে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কিং আইন বিধিবদ্ধ হয়।

যৌথ কারবার এবং সীমাবদ্ধ দায়িত্ব কিংবা সীমাহীন দায়িত্ববিশিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গঠন এবং পরিচালনের জন্যই ১৮৫৭ সালের আইন (১৮৫৭ সালের ১৯নং আইন) প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু ১নং ধারার 'প্রভিসো' (proviso) হইতে আমরা জানিতে পারি যে, উক্ত আইন অনুসারে সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন ব্যাঙ্কিং অথবা ইনস্যুরেন্স কোম্পানি গঠন করা যাইত না। 'জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ্ এ্যাক্ট' (১৮৬০ সালের ৭নং আইন) দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা হয়। ১৮৫৭ সালের আইনের বিধান অনুযায়ী কলিকাতায় সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট যে কোম্পানি সর্ব্বপ্রথম গঠিত হয় তাহার নাম 'দি ক্যালকাটা অক্সন কোং লিঃ।' জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ্ এ্যাক্ট অনুযায়ী কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম 'দি পিপুলস্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ' নামক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যবসায়ী কোম্পানি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালন এবং তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কিত সমস্ত আইন সংশোধন এবং একত্রীভূত করিয়া ইংলণ্ডে ১৮৬৬ সালে ১০ নং আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই আইনই কার্য্যকরী থাকে, যদিও আরও বিভিন্ন কোম্পানি আইন পাশ হইয়াছিল। ইহারই ফলে ভারতীয় কোম্পানি আইনেরও পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ১৮৮২ সালে ব্যবসায়ী কোম্পানি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালন এবং তুলিয়া দেওয়া ইত্যাদির জন্য ভারতীয় কোম্পানি আইন (১৮৮২ সালের ৬নং আইন) প্রণীত হয়। এই ভাবে কোম্পানি সম্পর্কিত ভারতীয় আইনকে ইংলণ্ডের কোম্পানী আইনের অনুকরণে হাল-নাগাৎ করা হয়।

অতঃপর নিম্নলিখিত আইনগুলি বিধিবদ্ধ হয়: কোম্পানি তুলিয়া দেওয়া হইলে সর্ব্বপ্রথম ঋণ শোধের ব্যবস্থা করিবার জন্য ১৮৮৭ সালের ৬নং আইন; ১৮৮২ সালের ৬নং আইন সংশোধন করিবার জন্য ১৮০১ সালের ১২ নং আইন; কোম্পানিকে তাহার উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার দিবার জন্য ১৮৯৫ সালের ১২ নং আইন; মূলধন হইতে সুদ প্রদান করিবার এবং পরিশোধিত ডিবেঞ্চার পুনরায় 'ইস্যু' করিবার অধিকার দিয়া ১৯১০ সালের ৪ নং আইন। ইংলণ্ডে সময় সময় যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল সেইগুলিকে ভিত্তি করিয়াই এই সকল আইন রচিত হয়।

ইহার পর ১৯১৩ সালের 'ইণ্ডিয়ান্ কোম্পানিজ এ্যাক্ট' বা ভারতীয় কোম্পানি আইন (১৯১৩ সালের ৭ নং আইন) বিধিবদ্ধ হয়। বিভিন্ন সংশোধন আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়া বর্ত্তমানে এই আইনই প্রচলিত আছে। ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইনকে ইংলণ্ডের ১৯০৮ সালের আইনের অবিকল অনুকরণ বলা যাইতে পারে, যদিও উভয় আইনের মধ্যে পার্থক্যও আছে কতকগুলি। ১৯১৪, ১৯১৫, ১৯২০, ১৯২৬, ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ভারতীয় কোম্পানি আইন সংশোধন করা হইয়াছে।

কিন্তু ১৯১৩ সালের আইনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতভাবে সংশোধন করা হয় ১৯৩৬ সালের ভারতীয় কোম্পানি-আইন সংশোধন আইন (১৯৩৬ সালের ৪২ নং আইন) দ্বারা। এই সংশোধন আইন ইংলণ্ডের ১৯২৯ সালের ইংলিস কোম্পানিজ এ্যাক্টকে ভিত্তি করিয়া রচিত হয়। ইংলণ্ডের ১৯২৯ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে ভারতীয় কোম্পানী আইনকে আমূল সংশোধন করিবার জন্য যে দাবী ভারতবর্ষে উত্থিত হইয়াছিল তাহারই ফলে ভারতীয় কোম্পানী আইনের এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আইন সম্পর্কে তদন্ত করিয়া প্রচলিত আইনের কি কি সংশোধন করা আবশ্যক তৎসম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৩৪ সালে একজন বিশেষ অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংশোধন আইন রচিত হয় তাঁহারই সুপারিশকে ভিত্তি করিয়া।

এই আইনে নূতন যে সকল পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা দরকার। এখানে শুধু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। ইংলণ্ডের ১৯২৯ সালের আইনের অনুসরণেই শুধু এই সংশোধন আইন দ্বারা আইনের বিধান সমূহ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, কয়েকটি নূতন বিধানও সংযুক্ত করা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল ম্যানেজিং এজেণ্টস্ এবং ব্যাঙ্কিং

কোম্পানি সম্পর্কে বিধানগুলি। এই বিষয়গুলি এ দেশের একটা অনন্যসাধারণ সমস্যা এবং স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী এগুলি বিবেচনা করা হইয়াছে। ভুঁইফোর এবং প্রবঞ্চনা-মূলক কোম্পানি গঠনে বাধা সৃষ্টি, অংশীদারদিগকে অধিকতর পরিমাণে সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা, শেয়ার হোল্ডারদিগকে আরও অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান, ডিরেক্টারদের এবং ম্যানেজিং এজেন্টদের ক্ষমতা সঙ্কোচন এবং কোম্পানি তুলিয়া দিবার বিধান ইংলণ্ডের আইনের অনুসরণে প্রণয়ন করিয়া ১৯৩৬ সালের সংশোধন আইনে আরও কয়েকটি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। কতকগুলি পরিবর্ত্তন সত্যই বিপ্লবাত্মক হইয়াছে; কাজেই এই আইনের ফলাফল সকলেই আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিতেছেন।

(মিঃ আর, এন, চক্রবর্ত্তী, এম-এস্‌সি, বি-এল, এড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট)

বাংলার তাঁতশিল্প

[১৩৪৭। ২৪শে চৈত্র তারিখের 'আর্থিক জগতে' প্রকাশিত প্রবন্ধের সারাংশ]

বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগের মিঃ ডি, এন ঘোষ তাঁহার "বাংলার তাঁতশিল্প" (Hand-loom cotton weaving Indrustry in Bengal) শীর্ষক পুস্তকে বাংলা দেশে তাঁতশিল্পের অতীত ইতিহাস, উহার বর্ত্তমান অবস্থা, এই শিল্পের বিভিন্ন গলদ এবং এই সমস্ত গলদ দূরীকরণের উপায় সম্বন্ধে অতি বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষের মতে বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে মোট ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২১১টি তাঁতে বস্ত্র বয়ন হইতেছে এবং উহার মধ্যে ফ্লাই শাট্‌ল তাঁতের সংখ্যা ৯৩ হাজার ৯০৯টি। এই সব তাঁতে কাজ করিয়া মোটমাট ৮১ হাজার ২৬০টি পরিবার জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে এবং মোটমাট ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬১১ জন লোক উহাতে নিয়োজিত রহিয়াছে। এই সমস্ত তাঁতে বৎসরে ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪ হাজার ৭৪৪ পাউণ্ড ওজনের সূতা খরচ হয় এবং উহাতে ৫ কোটি ১১ লক্ষ ২১ হাজার ৮৭২ টাকা মূল্যের ১৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৯ হাজার গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাংলার সমস্ত কাপড়ের কলে প্রতি বৎসরে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ১৮ কোটি ৯০ লক্ষ গজ। সেই হিসাবে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে কাপড়ের কল ও তাঁত মিলিয়া মোটমাট যত গজ কাপড় উৎপন্ন হইতেছে তাহার শতকরা ৪৩ ভাগেরও বেশী কাপড় তাঁতিগণ নিজের গৃহে বসিয়া সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে বয়ন করিয়া দিতেছে।

শ্রীযুক্ত ঘোষ তাঁহার পুস্তকে যে সমস্ত তথ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলার এই শিল্পটি দিন দিন অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত ঘোষের মতে কত ১৯২১ সালে বাংলা দেশে মোট তাঁতের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৬১১—সেই স্থলে বর্ত্তমানে উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২১১। ১৯৩১ সালে বাংলার তাঁতসমূহের উপর জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য নির্ভরশীল লোকের যে সংখ্যা ছিল বর্ত্তমানে তাহার তুলনায় উহা ৪ হাজারের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, বর্ত্তমানে তাঁতিদের মধ্যে তাঁতের অভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩১ সালে বাংলার প্রত্যেক তাঁতে গড়পড়তায় ১·৪ জন লোক কাজ করিত—এক্ষণে প্রতি তাঁতে গড়পড়তায় ১·৭ জন লোক কাজ করিতেছে। তিনি তাঁহার পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় বাংলার তাঁতসমূহে ব্যবহৃত দেশী ও বিদেশী সূতার যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৫-৩৬ সালে বাংলার তাঁতসমূহে ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৩৬-৩৭ সালে ৪ কোটি ৯১ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ৪ কোটী ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালে মাত্র ২ কোটী ৭৭ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমানে বাংলায় তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ঘোষের মতে তাঁতে ব্যবহারযোগ্য সূতা সংগ্রহে অসুবিধা, আধুনিক ধরণের তাঁতের অভাব, আধুনিক রুচিসম্মত ডিজাইন সম্বন্ধে তাঁতিদের অজ্ঞতা, বস্ত্র ধোলাই ও রঞ্জনের অব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারই বাংলার তাঁত-শিল্পের অবনতির জন্য দায়ী। সর্ব্বোপরি

তাঁতিদের মূলধনের অভাবও উহার কারণ বটে। তাঁতে ব্যবহারযোগ্য সূতা সংগ্রহের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য শ্রীযুত ঘোষ বাংলার নানা স্থানে কেবল সূতা প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি স্পিনিং মিল স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। বাংলা দেশের ঢাকা অঞ্চলে তাঁতিগণ প্রত্যেক বৎসরে ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড, পাবনা অঞ্চলে ২০ লক্ষ পাউণ্ড, হুগলী অঞ্চলে ১৪ লক্ষ পাউণ্ড, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ১৭ লক্ষ পাউণ্ড এবং ফরিদপুর অঞ্চলে ১৩ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া সূতা কিনিয়া থাকে। এই সব অঞ্চলের মধ্যে অনেক অঞ্চলে গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদির জন্যও বহুল পরিমাণে সূতা বিক্রয় হয়। এই সব অঞ্চলে একাধিক স্পিনিং মিল স্থাপিত হইতে পারে এবং তজ্জন্য ৫।৬ লক্ষ টাকা মূলধন যথেষ্ট।

তাঁতিদের আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য শ্রীযুক্ত ঘোষ বাংলা সরকারকে একটি কুটীর-শিল্প বোর্ড গঠন করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। উক্ত বোর্ড একটি লিমিটেড কোম্পানীর মারফতে বাংলার সর্ব্বত্র উন্নততর ধরণের তাঁতবস্ত্র প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন এবং দেশের যে সব অঞ্চলে অধিক সংখ্যক তাঁতি রহিয়াছে সেখানে স্পিনিং মিল স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিবেন। অধিকন্তু তাঁতিগণকে উন্নততর ধরণের যন্ত্রপাতি সরবরাহ, উন্নততর বস্ত্র প্রস্তুত সম্বন্ধে শিক্ষাদান এবং প্রচারকার্য্যও এই বোর্ডের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ঘোষ বিশেষভাবে তাঁতিদের জন্য গঠিত সমবায় সমিতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এই সম্পর্কে তাঁহার প্রস্তাব এই যে, তাঁতিদের জন্য পরিকল্পিত সমিতিগুলি বাংলা সরকারের সমবায় সমিতির অধীন না হইয়া শিল্পবিভাগের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় খাল

[১৩৪৮।১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত]

নদী দেশের প্রাণ স্বরূপ। উহা লোকের পানীয় জল সরবরাহ করে, দেশকে শস্যশ্যামলা করে এবং বাণিজ্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। দেশের সমৃদ্ধির পক্ষে অভাব সেই দেশ কখনও সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না। সেইজন্য বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগে প্রতীচ্যের দেশসমূহ উহাদের আভ্যন্তরীণ জলপথের উন্নতি সাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। বৃটেন, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, কানাডা প্রভৃতি দেশে বহু নদীর সংস্কার করা হইয়াছে এবং খাল খনন করিয়া এক নদীর সহিত অপর নদীর, এক সমুদ্রের সহিত অপর সমুদ্রের কিংবা কোন নদীর, সহিত সমুদ্রের সংযোগ সাধন করিয়া নৌকা ও জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়া গত ২০ বৎসরে সমস্ত দেশকে পিছনে ফেলিয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার উত্তরে উত্তর মহাসাগর। উহা বৎসরে অধিকাংশ সময় বরফে আবৃত থাকে বলিয়া বাণিজ্যের পক্ষে অসুবিধাজনক। রাশিয়ার দক্ষিণ দিকে নির্গমনের একমাত্র পথ কৃষ্ণসাগর এবং পশ্চিম দিকে নির্গমনের পথ ফিনল্যাণ্ড উপসাগর। রাশিয়া বহু বিস্তীর্ণ দেশ বলিয়া উহার পণ্য দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে কিংবা বিদেশে পাঠাইতে হইলে জাহাজসমূহকে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ই এই অসুবিধা দূরীকরণের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারেও শ্বেত সাগর ও বাল্টিক সাগরের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য এক খাল খনন, নিপার নদীর আগাগোড়া নৌচালনোপযোগী করিবার জন্য নিপার বাঁধ নির্ম্মাণ এবং ভলগা নদীর সহিত মস্কোর সংযোগ সাধনের জন্য ৮০ মাইল দীর্ঘ এক খাল খনন আরম্ভ হয়। ইহাদের প্রত্যেকটি পূর্ত্তকার্য্যের দিক হইতে এক একটি বিরাট দুঃসাহসিক ব্যাপার।

১৯৩৮ সালের মে মাসে মস্কো-ভলগা খালে জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয়। ইহার ফলে এখন মস্কো হইতে এক দিকে ভলগা নদী দিয়া ক্যাস্পিয়ান সাগরে এবং অপর দিকে মারিনাস্ক নদীপথে ও অল্পদিন পূর্ব্বে খনিত বাল্টিক-শ্বেতসাগর খাল, নেভা নদী ও লাডোগা খাল দিয়া বাল্টিক সাগরে ও শ্বেতসাগরে যাইতে পারে।

হইতে জাহাজ গভীর জলপথে কৃষ্ণসাগরে যাইতে পারিবে।

মস্কো-ভলগা খাল পূর্ত্তকার্য্যের দিক হইতে অতি বিরাট ব্যাপার। উহাতে ২০ কোটি ঘন মিটার (৩৯.৩৭ ইঞ্চিতে এক মিটার হয়) মাটি কাটা হইয়াছে এবং ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার ঘন মিটার কংক্রিটের কাজ করা হইয়াছে। ঐ খালের ২৫ মাইল উচ্চ মালভূমির উপর অবস্থিত বলিয়া জাহাজ চলাচলের জন্য ঐ অংশে ১১টি 'লক' আছে। খালের দ্বারা মস্কোতে পানীয় জলের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিপার নদীর জলপ্রপাতের বিলোপ সাধন করিয়া উহাতে নৌ চলাচলের সুবিধা করা হইয়াছে। প্রপাতের নীচে এক বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার ফলে বাঁধের উজানে নদীপৃষ্ঠ ১৩০ ফুট উচ্চ হইয়াছে। নৌকা চলাচলের জন্য তথায় 'লক' নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ বাঁধের পাশে এক নূতন সহর গড়িয়া উঠিয়াছে; উহার লোক সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার। এতদ্ব্যতীত নিপার-বাস খাল দ্বারা কৃষ্ণসাগরের সহিত বাল্টিক সাগরের সংযোগ সাধিত হইয়াছে।

রাশিয়ার আর একটি বড় পরিকল্পনা হইল ভলগা-ডন খাল। উহা খননের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই ভলগা নদীর সহিত শ্বেতসাগর, বাল্টিক সাগর ও ক্যাস্পিয়ান সাগরের সংযোগ সাধিত হইয়াছে। এই নূতন খালদ্বারা ভলগার সহিত কৃষ্ণসাগর ও আজব সাগরের সংযোগ সাধিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত লেনিনগ্রাডকে নদী তীরস্থ একটি বড় বন্দরে পরিণত করিবার জন্য এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

রুশিয় মধ্য-এশিয়ার ফারগানা অঞ্চলে আর একটি বড় খাল খনন আরম্ভ হইয়াছে; ঐ অঞ্চলে তুলার চাষ হয়। ঐ খাল ২৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ হইবে। উহা দ্বারা ঐ অঞ্চলে তুলার চাষের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।

উক্ত খালসমূহ দ্বারা এখন রাশিয়ার অভ্যন্তর হইতে যে কোন পণ্য উত্তরে শ্বেতসাগরে, পশ্চিমে বাল্টিক সাগরে এবং দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর, আজব সাগর ও ক্যাস্পিয়ান সাগরে জাহাজযোগে নীত হইতে পারে। ইহার ফলে রাশিয়ার জলপথে বাণিজ্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কোন কোন খালে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া জলশক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত খালের কল্যাণে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হওয়ায় বহু নূতন সহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

নদী ও সাগর

শ্রীসুকুমার সুর

নদী ছিল যবে দূরে
আপনার মনে নাচিত খেলিত
আপন সীমায় ঘুরে,
ভাবিত না কোন দিন
মিলিবে আসিয়া বিরাটের বুকে—
সাগরেতে হবে লীন,
সেদিন আসিল যবে—
ঘুচে গেল তার সব অহঙ্কার
বিরাটের গৌরবে।

পুস্তক-পরিচয়

শিরীষ ফুল—শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশ শ্রীরমেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী, জয়শ্রী গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ, ১৬৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচসিকা। পৃষ্ঠা ১৫৬।

ছোট গল্পের বই। শেষের গল্পটির নাম অনুসারে বইখানার নামকরণ করা হইয়াছে। স কয়টি গল্পই ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং সম্পাদকের কষ্টিপাথরে সবগুলি গল্পই একবার করিয়া কষিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠক সাধারণের কষ্টিপাথরেও পরখ করা হইয়া যাইবে। সম্পাদকরা স্বীকার করুন আর না-ই করুন, আসল কথা হইল এই যে গল্প উপন্যাস প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ বিচারক পাঠকসাধারণ। প্রকাশকরাই এ কথা ভাল করিয়া জানেন। আমাদের বিশ্বাস, শিববাবুর গল্পগুলি গল্পপিয়াসী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ভালই লাগিবে।

শিববাবুর গল্প বলিবার (লিখিবার ইত্যর্থঃ) ধরণটি বেশ সরস, ভাষাও বেশ স্বচ্ছন্দ গতি—পড়িয়া যাইতে কোথাও বাধে না। ছোট গল্পের সল্প পরিসরের মধ্যে আখ্যান ভাগের স্থান খুব সঙ্কীর্ণ—জীবনের কোন একটা দিকের ক্ষুদ্রতম একটি অংশেই মাত্র লেখক আলোক সম্পাত করিতে পারেন। এই দিক দিয়া শিববাবু অসংযম কোথাও দেখান নাই আবার সংযমের বাড়াবাড়িও নাই কোথাও। তবে অনেক গল্পেই কোন না কোন দিয়া 'আদর্শবাদ' ফুটিয়া উঠিয়াছে। আদর্শবাদ ভাল কি মন্দ তাহা বিচার্য্য নয়, বিচার্য্য বিষয় উহাদ্বারা প্রকৃত রসসৃষ্টি হইল কি না। রস-সৃষ্টিকে আমরা যুগের মাপকাঠি দিয়াই বিচার করিব, দেখিব গল্পের পরিণতি আমাদের মনকে উদ্বেল করিয়া তুলিল, না শুধু sadist মনোবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিল। তথাপি মোটের উপর শিববাবুর সবগুলি গল্পই সুখপাঠ্য। সাতভাই চম্পা, নিরুদ্দেশ, সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব এবং স্নেহ আমাদের কাছে খুব ভাল লাগিয়াছে। সহানুভূতি ও সমবেদনার দৃষ্টি দিয়াই তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন। কিন্তু মানব-সমাজ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। তিনি যদি দৃষ্টিকেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিতে পারেন তাহা হইলেই বিভিন্ন স্তরের জীবনের স্বাভাবিক ধারাকে জীবন্ত ও রসঘন মূর্ত্তি দিতে পারিবেন। কথা-সাহিত্যে আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করিতেছি।

ছাপা-বাঁধাই ভাল। কাগজ দুর্ম্মূল্য হওয় সত্ত্বেও দাম বেশী নয়।

বাঙ্গালীর পণ্য—প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৪৮ সম্পাদক—শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। কার্য্যালয়—১নং মুক্তারাম বাবুর সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা, প্রতি সংখ্যা দুই আনা।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও ধনবিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। বাংলা ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা খুবই অল্প। অথচ এই কলিকাতা হইতেই অর্থনীতি বিষয়ক ইংরেজী পত্রিকা অনেকগুলি প্রকাশিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইগুলির পরিচালক এবং সম্পাদক বাঙ্গালী। ইহার কারণ হয়ত এই যে, ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত অর্থনৈতিক পত্রিকার প্রচার-ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা অপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তৃত। প্রচার-ক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে লাভের পরিমাণও বেশী হয়। বাংলা দেশ হইতে অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকাগুলির অধিকাংশ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার ইহাই হয়ত একমাত্র না হইলেও অন্যতম কারণ। ইংরেজী অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীদের জন্য এবং বাংলা ভাষার উন্নতি কল্পেও বাংলা ভাষাতেই অধিকাংশ অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই জন্য 'বাঙ্গালীর পণ্য'কে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ, রায় সাহেব মিঃ বি. এম দাস, শ্রীযুত সন্তোষকুমার শেঠ প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের প্রবন্ধ আলোচ্য সংখ্যাখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কয়েক মাসের মধ্যেই পত্রিকাখানির আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা অর্থনীতি বিষয়ক বাংলা পত্রিকার পক্ষে খুবই আশার কথা। আমরা 'বাঙ্গালীর পণ্যে'র দীর্ঘজীবন ও উন্নতি কামনা করিতেছি।

বন্দনা—দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮। সম্পাদক শ্রীসুকুমার মল্লিক। কার্য্যালয়—৩৫, সুন্দরবাগ, লখনউ, সংযুক্ত প্রদেশ। বার্ষিক মূল্য সডাক আড়াই টাকা, প্রতি সংখ্যা তিন আনা। বর্ম্মা ও সিংহলের জন্য পাঁচ শিলিং।

লখনউ হইতে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙ্গালী পরিচালিত বাংলা মাসিক পত্রিকা। বন্দনার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পড়িয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। আলোচ্য সংখ্যাখানি প্রবন্ধ গৌরবে সমৃদ্ধ। 'জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের 'বংশগত' ভিত্তি' এবং ক্রমপ্রকাশিত 'ফরাসী বিপ্লবে সোস্যালিজম' তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। 'ডলি পুতুল' গল্পটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অন্যান্য গল্পগুলি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত এই পত্রিকাখানির ক্রমোন্নতি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

১৯৪০-৪১ সালে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের উপর ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনাই এতদিন চলিতেছিল। সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের ১৯৪১ সনের মার্চ্চ মাসের হিসাব প্রকাশিত হওয়ায় এই জল্পনা-কল্পনার অবসান হইয়াছে—আমরা ১৯৪০-৪১ সালের অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক অর্থনৈতিক বৎসরের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সহিত আলোচ্য বৎসরের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা আলোচনা করিলে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যে যে পরিবর্ত্তন আমরা দেখিতে পাই তাহা যে একেবারে অপ্রত্যাশিত এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। নিম্নে ১৯৩৯-৪০ এবং ১৯৪০-৪১ সালের ভারতীয় আমদানি রপ্তানির তুলনামূলক একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল:

	১৯৩৯-৪০ কোটি টাকা	১৯৪০-৪১ কোটি টাকা	বৃদ্ধি+ হ্রাস−
মোট আমদানি	১৬৫'২৮	১৫৬'৭৯	− ৮'৪৯
মোট রপ্তানি	২১৩'৫৭	১৯৮'৭১	−১৪'৮৬
বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্ত	+৪৮'২৯	+৪১'৯২	−৬'৩৭

উল্লিখিত তালিকায় প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, ভারতের আমদানি এবং রপ্তানি উভয় বাণিজ্যই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আমদানি-বাণিজ্যের তুলনায় রপ্তানি-বাণিজ্যই বেশী হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে আমদানি-বাণিজ্য ৮'৪৯ কোটি টাকা কমিয়াছে, কিন্তু রপ্তানি-বাণিজ্য কমিয়াছে ১৪'৮৬ কোটি টাকা। ফলে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে যেখানে বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্ত ছিল ৪৮'২৯ কোটি টাকা, সেখানে আলোচ্য বৎসরে উহা দাঁড়াইয়াছে ৪১'৯২ কোটি টাকায় অর্থাৎ বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্ত ৬'৩৭ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা সন্তোষজনক তো নহেই, বরং উদ্বেগজনক তাহা সহজেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ভারতীয় আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্যের বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব [illegible] আমরা শুধু দুই একটি গুরুত্বপূর্ণ আমদানি ও [illegible] দ্রব্যের উল্লেখ করিব। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কার্পাস-সূতা এবং কার্পাসজাত বস্ত্রের আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ১৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকার কার্পাসবস্ত্র ভারতে আমদানি হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আমদানি-বাণিজ্যের এই দিকটা ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের পক্ষে কল্যাণজনক—ভারতের কাপড়ের কলগুলি আরও অধিক পরিমাণে কাপড় তৈয়ার করিতে সমর্থ হইবে। ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি যে এই সুযোগ গ্রহণ করিতেছে তাহার প্রমাণ, আলোচ্য বৎসরে ভারতে বিদেশী তুলার আমদানি পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ভারতের কাপড়ের কলগুলি যে আরও অধিক পরিমাণে বস্ত্র তৈয়ার করিতে মনোযোগী হইয়াছে বিদেশী তুলার আমদানি বৃদ্ধি তাহারই পরিচায়ক। কিন্তু এই সঙ্গে বিদেশী চাউলের এবং কলকব্জার আমদানি হ্রাসের কথাও উল্লেখযোগ্য। ভারতবাসীকে ব্রহ্মদেশের চাউলের উপর ক[illegible]ক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। তা ছাড়া অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির জন্য ধানের ফলন কম হওয়ায় এই নির্ভরতা আরও বাড়িয়াছে। কাজেই বিদেশী চাউলের আমদানি হ্রাস আমাদের পক্ষে চিন্তার কথা বটে। চাউলের বাজার তো বেশ চড়া। প্রাক্-সমর বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৯ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকার কলকব্জা বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি হইয়াছিল; কিন্তু আলোচ্য বৎসরে উহা ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশেও যে কলকব্জা তৈয়ারের শিল্প প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, কলকব্জার আমদানি হ্রাসে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। আলোচ্য বৎসরে আমদানি-বাণিজ্যের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তৈয়ারী মাল অপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যাদির আমদানিই বেশী কমিয়াছে। ভারতের শিল্প বিস্তারের সম্ভাবনা যে কত বেশী ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ইউরোপের প্রায় সবগুলি দেশই হিটলারের করতলগত হওয়ায় ঐ সকল দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য হ্রাসের ইহাই যে কারণ তাহা আমরা সকলেই জানি। ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কাঁচা পাট, তুলা, পাকা ও কাঁচা চামড়া, খইল, বীজ এবং পশমই প্রধান। ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের বাজার বন্ধ হওয়ায় উল্লিখিত রপ্তানি দ্রব্যের বাবদ ভারতের ক্ষতির পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা বলিয়া মিক-গ্রিগোরী রিপোর্টে (Meek Gregory Report) অনুমান করা হইয়াছে। এই অনুমানের মধ্যে অতিশয়োক্তি কিছুই নাই। ১৯৩৯-৪০ সনে ৭৯·৮৩ কোটি টাকার উল্লিখিত দ্রব্যাদি ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৩·৯৭ কোটি টাকা। সুতরাং ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইল ২৫·৮৬ কোটি টাকা।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলিতে আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্য ২·৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইলেও বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্রে উহার পরিমাণ ৭·১৫ কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরে প্রায় একরূপই আছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে আমদানির পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে। জাপানে ভারতীয় রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু জাপান হইতে ভারতে আমদানি-বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৪০-৪১ সালের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমাদের চিন্তিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলিতে বিশেষ করিয়া অন্যান্য দেশে আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি তাহা সম্ভব না হয়, কিম্বা বৃদ্ধি আশানুরূপ না হয়, তাহা হইলে রপ্তানি-বাণিজ্যের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি-বাণিজ্যের পরিমাণ কমাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলেই ভারতের কাঁচা মাল এবং [illegible] পণ্য উৎপাদন-কার্য্যে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় পথ আর নাই।

—

ঘূর্ণিবাত্যার ধ্বংসলীলা

সম্প্রতি বরিশাল, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জিলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বরিশাল জিলায় প্রবল বন্যাসহ এই প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা ২৫শে মে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ২৬শে মে ৮টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। ঘূর্ণিবাত্যার বেগ ভোলা মহকুমার উপরেই প্রচণ্ডতম হইয়াছিল। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে জোয়ারের জলে সমস্ত সহর প্লাবিত হইয়া যায়। ভোলা সহরে মাত্র ১২টি পাকা বাড়ী দণ্ডায়মান আছে, আর সমস্তই ভূমিসাৎ কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পল্লীর সমস্ত কুটীর ভূমিসাৎ হইয়াছে। নোয়াখালি জিলায় ২৫শে মে রাত্রি ১০টা হইতে অবিশ্রান্ত বারিপাতের সহিত প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হয় এবং পরদিন বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। নোয়াখালি সহরের শতকরা ৫০ খানি বাড়ী ধ্বংস হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ নিরন্ন, গৃহহীন এবং বিপন্ন। কুমিল্লায় ২৫শে মে রাত্রি ১২টা হইতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং ২৩শে মে অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। সহরের বহু বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। বহু গ্রামে গৃহাদি ও বৃক্ষাদি পতিত হইয়াছে এবং বহু লোক ও গবাদি পশু আহত হইয়াছে। উল্লিখিত ঝড় ব্যতীত রংপুর জিলার নিল-ফামারীতে এবং মানভূম জেলায় প্রচণ্ড ঝড় হইয়াছে।

ঘূর্ণিবাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই, তাহারা গৃহহীন, অন্নবস্ত্রহীন। এই সকল নিরাশ্রয় নরনারীদিগকে অন্নবস্ত্র যোগাইতে হইবে, নূতন করিয়া তাহাদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে। শুধু ইহাতেই দুর্গতদের প্রতি দেশবাসীর কর্ত্তব্য শেষ হইবে না; বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে উপযুক্ত প্রতিষেধক এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে ব্যাপকভাবে মহামারী দেখা দিতে পারে।

বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় নূতন ফসল উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত দেশবাসীর সাহায্যের উপরেই বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের বিপন্ন নরনারীদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। সরকার হইতে কৃষিঋণ এবং সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু উহাই যথেষ্ট নহে। দুর্গতদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ইতিমধ্যেই বহু প্রতিষ্ঠান রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান যদি পৃথক সাহায্যদানের ব্যবস্থা না করিয়া একযোগে কাজ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সেবাকার্য্য অধিকতর সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। বিপন্নকে সাহায্য করিতে শত অভাব সত্বেও দেশবাসী কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই। প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলাকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি মানুষের নাই। তাই আমরা আশা করিতেছি, দেশবাসী মুক্ত হস্তে দান করিয়া দুর্গতদিগকে সাহায্য করিবেন।

—

ভারতীয় সমস্যায় ডিভনশায়ারের ডিউক

লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী ডেভনশায়ারের ডিউক ঘোষণা করেন যে, "ভারতে ভারতের জন্য ভারতীয়দের দ্বারা ভারতের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়,—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালনা অভিপ্রায় নহে। ভারতের ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা বন্ধ করা হইবে না।"

ডিউক অব্ ডিভনশায়ারের এই উক্তি যে ভারত-সম্পর্কে বৃটিশ নীতির পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে না, তাহা ভারতবাসী বোঝে এবং ইহাও জানে যে, ভারতসম্পর্কে বৃটেনের নীতি যদি পরিবর্ত্তিত হয়ই তবে উহা ঘোষণা করিবার স্থান লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা-প্রাঙ্গণ নহে। তথাপি লোকে যদি ভুল বোঝে এই আশঙ্কায় রয়টারের কূটনৈতিক সংবাদদাতা ডিউক অব ডিভনশায়ারের উল্লিখিত উক্তির একটি সংশোধনী প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ডিউক মহোদয়ের উক্ত ঘোষণা দ্বারা ভারতসম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতির কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তন সূচিত হয় নাই বা ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে বড়লাট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহারও কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। উক্ত কূটনৈতিক সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন যে, যদি নূতন কোন নীতি ঘোষণা করা হইত, তবে পার্লামেণ্টেই ইহা ঘোষণা করা হইত—একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরোয়া বৈঠকে এরূপ ঘোষণা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

যাহা হউক, ডিউক মহোদয়ের ঘোষণা সম্পর্কে কাহারও ভ্রান্ত ধারণা থাকিয়া থাকিলে এই সংশোধনী দ্বারা তাহার নিরসন হইল। ভারতসম্পর্কে বৃটেনের নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই ইহা তো জানা কথা। কাজেই এই এক বিষয় লইয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনা করার কোন সার্থকতা আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

—

হক সাহেব ও মুসলিম লীগ

বাংলার প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর ফজলুল হক সাহেবকে মুসলিম লীগে পাইয়াছে—তাঁহাকে আর কৃষকপ্রজাদলের নেতা হক সাহেব বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। লীগে পাইলেও হক সাহেব যে মাঝে মাঝে তাঁহার স্ব-স্বরূপে ফিরিয়া আসেন, তাহার পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়—লীগওয়ালারা সব সময় তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার এই অবস্থা বেশীদিন থাকে না—আবার তিনি লীগের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়েন। তবে একথাও সত্য যে, কোন সময়েই লীগের সহিত নিজকে তিনি সম্পূর্ণরূপে খাপখাওয়াইয়া লইতে পারেন নাই। পাকিস্থান পরিকল্পনা তাঁহার অন্তরের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। ভূপালের মুসলিম ছাত্র সমাজের প্রতিষ্ঠাতার নিকট হক সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন "তোমাদের পাকিস্থানী…র স্কীম আমি বুঝি না।" বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যাপারেও তিনি লীগের নীতি সমর্থন করেন না এবং লীগের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি কাজ করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি যাহা ঘটিয়া গেল তাহাতেও আমরা হক সাহেবের নিজস্ব রূপটি যেমন ক্ষণিকের জন্য দেখিতে পাইলাম অমনি পরমুহূর্ত্তেই লীগ-প্রভাবে তাঁহার সেই মূর্ত্তি আবৃত হইয়া পড়িল।

সম্প্রতি হক সাহেব সিমলায় গমন করিয়া বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বর্ত্তমান রাজনৈতিক জটিল সমস্যার সমাধান কল্পে কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের উপযোগিতার কথা বিবৃত করেন এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বলিতে তিনি কি বুঝেন, বড়লাটের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলেন তাহা কংগ্রেসের দাবীরই অনুরূপ। অর্থাৎ আইন সভার নিকট দায়ী এবং ভারতীয় সদস্য দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভাই তিনি পছন্দ করেন। সিমলা যাইবার পথে মিরাটে তাঁহার সিমলা গমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বিবৃতি তাহাতেই কলিকাতার মুসলিম লীগ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। কিন্তু এই সময় লীগ হক সাহেবকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাই তিনি দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিয়াছেন ইহার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিবার অধিকার কলিকাতা মুসলিম লীগের নাই। তাঁহার এই দৃঢ় উক্তির মধ্যে খাঁটি ফজলুল হককে আমরা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। লীগ আসিয়া আবার তাঁহার ঘাড়ে চাপিল তিনি 'তোবা' করিয়া লীগের আদর্শের প্রতি অটুট আস্থা প্রকাশ করিলেন।

হক সাহেবের প্রতিভা আছে, কিন্তু কোন আদর্শের প্রতিই তাহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা নাই তাই নির্ভীক চিত্তে তিনি কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই দুর্ব্বলতার সুযোগেই লীগ তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিতে সক্ষম হইয়াছে।

—

পরলোকে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত এস, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার গত ১৯শে মে প্রাতে সাত ঘটিকার সময় তাঁহার মাদ্রাজস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে কোদাইকানাল থাকিবার সময় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাহাকে মাদ্রাজে আনা হইয়াছিল। তিনি পত্নী, এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন; এই ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করায় তিনি মাদ্রাজের এডাভোকেট জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৬ হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১২ হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন। ১৯২১ সালে রাজনৈতিক কারণে মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ, মাদ্রাজের এড্‌ভোকেট জেনারেলের পদ ত্যাগ করেন। সি, আই, ই উপাধিও তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত আয়েঙ্গার ১৯২৬-২৭ সালে কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রদেশে এখন দুটি দল থাকিতে পারে—এক গবর্ণমেণ্টের দল আর এক স্বরাজ লাভেচ্ছুদল। এখন সকল দলের কর্ত্তব্য পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া স্বরাজ সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া। এখন কোন্ দলের মত কি তাহা লইয়া বিচার বিতর্কের সময় নাই।"

কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতা এবং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের পর আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইদানীং তিনি কংগ্রেসের নীতি ও নেতৃত্ব অনুমোদন না করিলেও দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নীতি ও মতবাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল। শ্রীযুত আয়েঙ্গারের মৃত্যুতে ভারতের একজন প্রাচীন রাজনীতিকের জীবন অবসান হইল। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর যোদ্ধার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—

ভূতপূর্ব্ব কাইজার পরলোকে

হল্যাণ্ডের দুর্গপ্রাসাদে দীর্ঘকাল নির্ব্বাসিত জীবন-যাপন করিবার পর জার্ম্মাণীর শেষ এবং ভূতপূর্ব্ব কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম ৪ঠা জুন বেলা ১১টা ৩০ মিনিটের সময়

পরলোক গমন করেন। ৩০শে মে তারিখে নিউয়র্ক হইতে তাঁহার সর্দ্দি ও অন্ত্রপীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। সপ্তাহের শেষভাগে তাঁহার অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তিনি আরোগ্য লাভ করিবেন বলিয়া আশা করা হয়। কিন্তু ৩রা জুন রাত্রিতে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসিতে থাকায় তিনি অবশেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। তাঁহার সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসে নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। ডুর্ণ প্রাসাদে তিনি অনুমান ২৩ বৎসর কাল বাস করেন।

১৮৫৯ সালের ২৭শে জানুয়ারী জার্ম্মনীর শেষ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম বার্লিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার কন্যা। ১৮৮১ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮৮ সালে তাঁহার পিতার আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় ২৯ বৎসর বয়সে তিনি জার্ম্মানীর রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিসমার্কের পন্থা অনুসরণ করিলেও বিসমার্কের সহিত কলহ হওয়ায় ১৮৯০ সালে বিসমার্ক পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রাধান্য ২৫ বৎসর কাল অক্ষুণ্ণ থাকে; সমুদ্রে বৃটেনের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার জন্য কাইজার জার্ম্মানীতে বিরাট নৌ-বহর গড়িয়া তুলেন। জার্ম্মানীর সম্প্রসারণ ছিল তাহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মানীকে তিনি বিপুল সমর সজ্জায় সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আফ্রিকায় জার্ম্মান এবং বৃটিশ স্বার্থ লইয়া এবং আরও নানা সূত্রে বৃটেনের সহিত জার্ম্মানীর বিরোধ উপস্থিত হয়। কাইজার বৃটেন এবং রাশিয়ার সহিত মিত্রতা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার জন্য তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্ক ডিউক ফার্ডিনাণ্ডের হত্যার পর অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পরেও কাইজার ব্যাপারটা আপোষে মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় অষ্ট্রিয়ার পক্ষ হইয়া তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মহাযুদ্ধের শেষের দিকে সঙ্কট যখন ঘনাইয়া আসিল, জার্ম্মানীর নূতন চ্যান্সেলার প্রিন্স ম্যাক যখন ১৯১৮ সালের ৯ই জুন কাইজারের সিংহাসন-চ্যুতির কথা ঘোষণা করেন তখনও তিনি সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিরাশ হইয়া ১০ই নবেম্বর হল্যাণ্ডে পলায়ন করিতে হইল। এইখানেই ডুর্ণ প্রাসাদে তাঁহার অবশিষ্ট অজ্ঞাত জীবন কাটিয়াছে। ১৯২০ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর বিয়োগ হওয়ার পর ১৯২২ সালে তিনি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার নির্ব্বাসিত জীবনে কোন বড়লোকী আদবকায়দা বা আড়ম্বর ছিল না। ডুর্ণ প্রাসাদের সম্মুখস্থ চত্বরে তাঁহার একটি গোলাপবাগ ছিল। তিনি স্বহস্তে এই বাগানটি রচনা করেন। দিনের অপরাহ্ণগুলি জীবনস্মৃতি, ভ্রমণ কাহিনী, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি রচনায় অতিবাহিত হইত। তিনি ছয়খানি পুস্তক রচনা করেন। শেষের দিকে তিনি লেখা ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রভূত শক্তি দ্বারা এক দিন যিনি সমস্ত পৃথিবীতে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন নির্ব্বাসিত অবস্থায় অজ্ঞাত বাসে তাঁহার জীবনান্ত হইল। অদৃষ্টের এই পরিহাস মর্ম্মান্তিক হইলেও নূতন নহে—অনেক রাজা এবং রাজপুরুষের ভাগ্যে যে এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ইতিহাসে তাহার বিবরণ দুর্লভ নহে। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা মোহিত বলদৃপ্ত ব্যক্তিরা ইতিহাসের নিকট হইতে কোন শিক্ষাই লাভ করিতে চান না, ইহাই মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য। মৃত্যুর পরপারে তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক, আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

মিস্ র‍্যাথবোনের খোলা চিঠি

পার্লামেন্টের সদস্য কুমারী র‍্যাথবোন সম্প্রতি তাঁহার কয়েক জন ভারতীয় বন্ধুর নিকট যে খোলা চিঠি লিখিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস নেতৃবর্গকে, বিশেষ করিয়া পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরুকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত। যদিও মিস্ র‍্যাথবোন সুনিশ্চিতভাবেই জানেন যে ভারতের সাহায্য ছাড়াই বৃটেন জয়লাভ করিবে এবং কংগ্রেস ছাড়াও ভারতের অন্য দল হইতে সাহায্য পাওয়া

হইতেছে, তথাপি তিনি কংগ্রেসের সহযোগিতা কামনা করেন। কিন্তু তাঁহার চিঠিতে এরূপ মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, চিঠির ভাষা এবং ভঙ্গী এরূপ যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উহাকে "ঔদ্ধত্য ও অবিবেচনাপূর্ণ চ্যালেঞ্জ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মিস্ র‍্যাথবোনের খোলা চিঠিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহাকে শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই, উহা ভারতহিতৈষী বলিয়া পরিচিত সাধারণ ইংরেজের মনোভাব। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই অভিমত পোষণ করেন এবং এই জন্যই রুগ্ন শয্যা হইতেও এই খোলা চিঠির প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই। মিস্ র‍্যাথবোনের কথা এই যে, নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়াও কংগ্রেস নেতৃবর্গ অসহযোগ দ্বারা সমর প্রচেষ্টায় বাধাদান করায় তাঁহারা কি আক্রমণকারীদেরই অহিংস মিত্ররূপে কাজ করিতেছেন না? দ্বিতীয়তঃ এপর্য্যন্ত ভারতে যে শাসন সংস্কার প্রদত্ত হইয়াছে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি এবং ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকার, ইহার কি কোন মূল্য নাই? তৃতীয়তঃ কংগ্রেসের এই নীতির ফলে জার্ম্মানী, ইটালী এবং জাপান যদি জয়লাভ করে তাহা হইলে কি ভারতের স্বাধীনতালাভের আশা আছে, না তাহারা অমৃতসরের চেয়েও ভীষণ অত্যাচার করিবে? চতুর্থতঃ সমগ্র পৃথিবীর জন্য যে যুদ্ধের দায়িত্ব বৃটেন গ্রহণ করিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া ভারত অস্থায়ীভাবে আত্মসমর্পণ করিলেই কি ভাল দেখায় না?

মিস্ র‍্যাথবোনের খোলা চিঠির উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলিয়াছেন, "ইংরেজী চিন্তারূপ কূপের জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবার পরও আমাদের আপন দরিদ্র দেশের স্বার্থের জন্য কিছু চিন্তা অবশিষ্ট আছে—আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় তিনি ব্যথিত হইয়াছেন।" পাশ্চাত্য বিশেষ করিয়া ইংরেজ শিক্ষকগণের নিকট ভারতের যে ঋণের কথা মিস্ র‍্যাথবোন উল্লেখ করিয়াছেন তাহার উত্তরে কবি বলিয়াছেন, "আমরা অপর কোন ইউরোপীয় ভাষার সাহায্যে প্রতীচ্য জ্ঞানের সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। তাঁহারা যদি আমাদিগকে শিক্ষা না দিতেন, তাহা হইলে আমরা এখনও অন্ধকার যুগে থাকিতাম, আমাদের তথাকথিত ইংরাজ বন্ধুদের পক্ষে এই ধারণা সম্পূর্ণ ধৃষ্টতাপূর্ণ আত্মপ্রসাদ।"

অতঃপর কবি দুই শতাব্দী ব্যাপী বৃটিশ শাসনের ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "দুই শতাব্দী ব্যাপী বৃটিশ শাসনের পরও ১৯৩১ সালে ভারতের মোট লোক-সংখ্যার শতকরা এক ভাগ মাত্র ইংরেজী জানে। পক্ষান্তরে মাত্র পনর বৎসর সোভিয়েট শাসনের পর ১৯৩২ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় বালকবালিকাদের শতকরা ৯৮ ভাগ শিক্ষিত। ভারতবর্ষের অন্নকষ্ট ও জলকষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "ইংরেজগণ যাঁহারা দুই শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ আমাদের জাতির ধনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন এবং সম্পদ শোষণ করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছেন? আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখি, অনশনক্ষীণ ব্যক্তিগণ অন্নের জন্য চীৎকার করিতেছে। আমি গ্রামে গ্রামে নারীদিগকে কয়েক ফোঁটা জলের জন্য মাটি খুঁড়িতে দেখিয়াছি…।"

অতঃপর আমাদের অসহায় অবস্থা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন, "যখন বহু ভারতীয়ের জীবন বিনষ্ট হয়, আমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও নারীগণ লাঞ্ছিত হয়, তখন ঐ সমুদয় দমনের জন্য বৃটিশ-অস্ত্র নিষ্ক্রিয় থাকে; কেবল আমাদিগকে আমাদের ঘর সুশৃঙ্খল রাখিবার অযোগ্যতার জন্য তিরস্কার করিতে সাগর পার হইতে বৃটিশের রব উঠে।" আমাদের অসহায় অবস্থার কারণের উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান যুদ্ধেও এরূপ ঘটিয়াছে যে, ইংরাজ, ফরাসী ও গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসীদিগকেও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া আসিতে হইয়াছে, কারণ তাহারা উৎকৃষ্টতর অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল। কিন্তু যখন আমাদের দরিদ্র, নিরস্ত্র ও নিরাশ্রয় কৃষকগণ আপনাদিগকে সশস্ত্র গুণ্ডার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া রোরুদ্যমান শিশু লইয়া বিব্রত অবস্থায় বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে তখন

বৃটিশ সরকারী কর্ম্মচারিগণ হয়ত আমাদের কাপুরুষতায় অবজ্ঞার হাসি হাসেন। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক শত্রুর আক্রমণ হইতে তাহার গৃহ রক্ষার জন্য সশস্ত্র; কিন্তু ভারতে সরকারী আদেশ দ্বারা লাঠি চালনা শিক্ষাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। জনসাধারণকে চিরকাল ভয়বিহ্বল ও তাহাদের সশস্ত্র প্রভুদের অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল রাখিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও বীর্য্যহীন করা হইয়াছে। নাৎসীগণ শুধু ইংরেজের পৃথিবীব্যাপী প্রভুত্বের বিরোধিতা করায় ইংরাজগণ তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। মিস্ র‍্যাথবোন আশা করেন, আমাদের শৃঙ্খল আরও শক্ত করায় আমরা দাসত্বের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার স্বদেশবাসীর হস্ত চুম্বন করিব।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মিস্ র‍্যাথবোনের খোলা চিঠির যে উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন ইহার উপর মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

নিষেধ আজ্ঞা প্রত্যাহার

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইলে গত ২২শে মার্চ্চ বাংলা গবর্ণমেণ্ট বাংলার সমস্ত মুদ্রাকর, প্রকাশক এবং সম্পাদকের উপর প্রদেশের কোন স্থানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাদি সম্পর্কে কোন সংবাদ, মন্তব্য, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন এবং আলোচনাদি প্রকাশের পূর্ব্বে কলিকাতার স্পেশাল প্রেস এডভাইজারের নিকট এবং অন্যত্র জেলা প্রেস এড্ভাইজারের নিকট পাঠাইবার যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। বাংলা গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের এডিশনেল সেক্রেটারী মহোদয় ৩১শে মে তারিখে সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশে সংবাদপত্রগুলিকে নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুসারে চলিবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, প্রেস এড্ভাইজারী কমিটির এই সুপারিশ অনুসারেই কর্ত্তৃপক্ষ দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কিত সংবাদ ও মন্তব্যাদি প্রকাশের নিষেধ আজ্ঞাগুলি প্রত্যাহার করেন।

প্রেস এডভাইজারী কমিটীর এই সুপারিশ গ্রহণ করিতে মন্ত্রিমণ্ডলীর এত বিলম্ব হইল কেন তাহা বোঝা কঠিন। ঢাকার দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত কমিটীর কার্য্য আরম্ভ না হইলে উল্লিখিত নিষেধ আজ্ঞা প্রত্যাহারে আরও বিলম্ব হইত কি না, কে জানে? তদন্ত কমিটীর কার্য্যারম্ভের তারিখ হইতে এই নিষেধ আজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। তদন্ত কমিটীর কার্য্যের পক্ষেও এই নিষেধ আজ্ঞা বড় একটা কম অসুবিধার বিষয় ছিল না।

ঢাকা দাঙ্গার তদন্ত কমিটী

ঢাকা দাঙ্গার তদন্ত কমিটী কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কমিটীর সভাপতি বিচারপতি ম্যাক্নেয়ার আপাততঃ তদন্তের বিবরণ প্রকাশে কোন বিধিনিষেধ জারী করিবেন না বলিয়া আশ্বাস দেওয়ায় আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে নিষেধ আজ্ঞা থাকায় লোকের মনে অনেক আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছিল। তদন্ত কমিটীর কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইলে এই আশঙ্কা দূরীভূত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

দাঙ্গা-হাঙ্গামাগুলিকে অনেকেই একটা আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং পুনরায় যাহাতে দাঙ্গা না হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতে হইলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রকৃত উৎস কোথায় তাহাও জানা দরকার। সাধারণতঃ যাহারা দাঙ্গা করে তাহারা নিরক্ষর, অজ্ঞ এবং দরিদ্র। দাঙ্গার পরিণামে তাহারাই দুঃখ ভোগ করে বেশী। কিন্তু তাহারাই দাঙ্গার মূল একথা অনেকের পক্ষেই বিশ্বাস করা কঠিন। দাঙ্গা তদন্ত কমিটী যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বাংলার জনগণের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ

বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ফল বাংলার পাট-চাষীদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু বাংলার দুইটি প্রতিবেশী প্রদেশ—আসাম এবং বিহারেও যদি পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না হয় তাহা

হইলে বাংলার গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই যে শুধু ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, বাংলার পাট-চাষীদেরও যে চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। আসামে এবং বিহারে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাংলা গবর্ণমেণ্ট যে আসাম এবং বিহার গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন মীমাংসায় আসিতে পারেন নাই ইহাতেই তাঁহাদের অদূরদর্শী নীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়াছে।

পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতার জন্য সম্প্রতি শিলং-এ যে বৈঠক হইয়া গেল তাহার ফলাফল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই নাই। আমরা শুধু এইটুকু জানিতে পারিয়াছি যে, আসামের পাটের জমিগুলি পরিমাপ করিয়া তালিকাভুক্ত করিবার ব্যয় বাবদ বাংলা গবর্ণমেণ্ট আসাম গবর্ণমেণ্টকে বিনা সুদে ঋণ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আসাম গবর্ণমেণ্ট পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করিবেন কি না তাহা জানা যায় না। বরং আসামে এখনও যে প্রচুর জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে সেগুলিতে পাট চাষ হওয়ার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করা আসাম মন্ত্রিমণ্ডলীর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কাজেই বাংলায় পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আমরা শুধু বাংলার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই দেখিতে পাইতেছি।

—

বেকারত্বের ট্যাক্স

ইনকাম ট্যাক্স বাড়িলে ধনীমহলে প্রতিবাদের হৈ চৈ পড়িয়া যায়, কিন্তু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকারদিগকেও যে বেকারত্বের জন্য ট্যাক্স দিতে হয় সে খবর কয়জন রাখেন? কোন কোন রেলওয়েতে বিজ্ঞাপিত চাকুরীর জন্য প্রার্থী হইতে হইলে যে ১৲ এক টাকা দিয়া দরখাস্তের ফরম কিনিতে হয়, আমরা তাহারই কথা বলিতেছি। বাংলা দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যে কত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু যে কোন অফিসে সামান্য কেরানীর পদের জন্যও যে রাশি রাশি দরখাস্ত পড়ে তাহা হইতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অতি সামান্যই অনুমান করা যাইতে পারে। এদিকে প্রতি বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট, আণ্ডার গ্রাজুয়েট প্রভৃতি বাহির হইয়া শিক্ষিত বেকারের দল ভারী করিয়া তুলিতেছেন। এদিকে চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া কেহ মনে করেন না। বরং অনেক ক্ষেত্রে বেকার যুবকের এই সংখ্যা বৃদ্ধিকে নামমাত্র বেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার একটা সুযোগ বলিয়াই গ্রহণ করা হয়।

কোন কোন রেলওয়েতে বিশেষতঃ অনেক সরকারী রেলওয়েতেই পদপ্রার্থীকে এক টাকা মূল্য দিয়া দরখাস্তের ফরম ক্রয় করিতে হয়। অথচ দরখাস্তের এই ফরমের মূল্য এক পয়সা কি দুই পয়সার বেশী হইতে পারে না। ইহাকে বেকারত্বের উপর ট্যাক্স ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? যদি বলা যায় যে, দরখাস্তের সংখ্যা যাহাতে অসম্ভব রকম বেশী না হয় এবং অযোগ্য ব্যক্তি দরখাস্ত করিতে না পারে, তাহারই জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা হইলেও বলিতে হয়, এই যুক্তি মোটেই যুক্তিসহ নহে। প্রথমতঃ দরখাস্তের ফরমের মূল্য ১৲ টাকা দিয়া পদপ্রার্থীর যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করা হাস্যকর ব্যাপার নয় কি? দ্বিতীয়তঃ এমনও তো হইতে পারে যে, একটি টাকাও সংগ্রহ করিতে পারে নাই বলিয়া অনেক যোগ্য ব্যক্তিও দরখাস্ত করিতে আশক্ত হয়। ইহাতে যোগ্যতার প্রতি উপেক্ষা করা এবং অযোগ্যকে কাজে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা থাকে না কি? তৃতীয়তঃ অন্ন-সমস্যা যেখানে প্রবল সেখানে সপরিবারে উপবাসে কাটাইয়া দরখাস্তের জন্য একটি টাকা সংগ্রহ করাও আশ্চর্য্য নয়। অথচ দরখাস্তের পরিণাম অনিশ্চিত।

রেলওয়ে হইতে এই প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি।

—

সংবাদপত্রের কাগজের আমদানি নিয়ন্ত্রণ

আমাদের দেশের কাগজের কলগুলিতে সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ার হয় না। এজন্য বিদেশী আমদানির উপরে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। যুদ্ধের জন্য সংবাদপত্রের কাগজের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অনেক সংবাদপত্রকেই আয়তন কমাইতে হইয়াছে। তাহাতেও কাগজের সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর গবর্ণমেণ্ট আবার সংবাদপত্রের কাগজের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে কাগজের দাম আরও বাড়িবার সম্ভাবনা এবং কাগজ পাওয়ার পক্ষেও অসুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

দুই বৎসর হইল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে ইতিমধ্যে এ দেশেই সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। তাহা হইলে আজ আর আমাদিগকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইত না।

—

কলিকাতা প্রজাস্বত্ব আইন

জমিদারের অত্যাচার হইতে বাংলার কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে। তাহার ফলও যে একেবারে কিছু হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু কলিকাতার ভাড়াটিয়াদের সুবিধার জন্য কোন

আন্দোলন বা চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় কলিকাতা ভাড়াটিয়া স্বত্ব বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

কলিকাতায় যত দিন রেণ্ট অ্যাক্ট বহাল ছিল তত দিন ভাড়াটিয়াদের অনেকটা সুবিধা ছিল। রেণ্ট এ্যাক্ট উঠিয়া যাওয়ায় ভাড়াটিয়াদের যে কি অসুবিধা হইয়াছে তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অপরকে বুঝান কঠিন। আমরা আশা করি, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ এই বিলটি পাস করিয়া কলিকাতার প্রজাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

—

বেগম ফরহাৎ বানুর বিল

অনাথ আশ্রম, বিধবা আশ্রম, নারীরক্ষা আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের জন্য বেগম ফরহাৎ বানু এম-এল-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি বিল আনয়ন করিয়াছেন। এই মহিলাটি মিঃ সাহাবুদ্দিনের গৃহিণী। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু এই বিলের ধারাগুলি যেভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাতে নিয়ন্ত্রণের নামে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হওয়ারই আশঙ্কা। দ্বিতীয়তঃ এই জাতীয় আইন প্রণয়নের জন্য বিল গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উপস্থাপিত হওয়া উচিত এবং উহা বিশেষ সাবধানতার সহিত রচিত ও জনসাধারণের মতামত সংগ্রহের জন্য প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। এই সকল কারণে বেগম ফরহাৎ বানুর আনিত বিলটি আইনে পরিণত হওয়া উচিত নহে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি এই দিকে আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

—

নিজাম বাহাদুরের ফরমান

নিজাম রাজ্য হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার জন্য হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর একে একে কয়েকটি ফরমান জারী করিয়াছেন। একটি বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানাইয়াছেন যে, রাজনীতিতে ও শাসন-নীতিতে ধর্ম্মের স্থান নাই। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ধর্ম্ম যাহাই হউক, হায়দরাবাদের শাসক হিসাবে তাঁহার কোন ধর্ম্ম নাই। সকল প্রজাই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান। আর একটি ফরমান দ্বারা হায়দরাবাদে ধর্ম্মসভায় রাজনৈতিক আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। নিজাম বাহাদুরের ঘোষণা সত্যই কালোপযোগী হইয়াছে।' ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে নিজাম বাহাদুরের নীতি অনুসৃত হইলে সাম্প্রদায়িকতা বিষদুষ্ট ভীরতের সত্যই অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। —

মূক, বধির ও অন্ধদের শিক্ষা

১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ভারতবর্ষে অন্ধের সংখ্যা ছয় লক্ষেরও অধিক। একমাত্র বাংলা দেশেই সাঁইত্রিশ হাজার অন্ধ আছে। মূক, বধির এবং অন্ধদিগের দুঃখ যে কি তাহা অপরের পক্ষে বুঝা কঠিন। বিজ্ঞান আজও মূকত্ব, বধিরতা এবং অন্ধতা নিবারণ করিবার কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই। কিন্তু বিজ্ঞান যেটুকু করিয়াছে তাহাও বড় কম নয়। মূক, বধির এবং অন্ধদিগকে শিক্ষাদানের প্রণালী বিজ্ঞানের অমূল্য দান। কিন্তু উহাকে কার্য্যকরী করিবার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। ইহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া ইহাদের দুঃখভার লাঘব করা সমাজের ও রাষ্ট্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। সম্প্রতি অন্ধ অধ্যাপক মিঃ এস, সি, রায়ের উদ্যোগে 'অন্ধের আলোনিকেতন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। অন্ধ, মূক, বধিরদিগকে শিক্ষাদান এবং কর্ম্মক্ষম করিয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসী এই অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটি পরিপুষ্ট ও রক্ষা করিবার জন্য মুক্তহস্ত হইবেন।

—

শ্রমিকদের দাবী

মে মাসে মালয়ের প্রায় চল্লিশটি রবার বাগানের শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করে। এই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য মালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সৈন্য এবং সাঁজোয়া গাড়ী পর্য্যন্ত নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে মালয় কর্ত্তৃপক্ষ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, ধর্ম্মঘট করিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। কয়েক জন আন্দোলন-কারীর প্রচারের ফলেই ধর্ম্মঘট হইয়াছে। [illegible] সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উপরেও দোষারো[illegible] করা হইয়াছে এবং মিঃ নাথনকে মালয় হইতে ভারতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

মালয়ের এই সকল রবার বাগানে যে সকল শ্রমিক কাজ করে তাহারা সকলেই দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষাভাষী নরনারী। ইহাদের মত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ কোথাও বড় দেখা যায় না। কাজেই, কোন অভাব অভিযোগ না থাকিলেও শুধু আন্দোলনকারীদের প্ররোচনায় তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। শ্রমিকদের দাবী-দাওয়ার কথা উঠিলেই আন্দোলনকারীদের উপর দোষ চাপাইয়া দেওয়া একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদের দাবী যে অসঙ্গত নয় সম্প্রতি প্রকাশিত 'বোম্বাই বস্ত্র-শিল্পের শ্রমিক তদন্ত কমিটী'র 'ইণ্টারিম রিপোর্ট' তাহার একটি দৃষ্টান্ত। মালয়ের ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা

হইলেও অনুরূপ ফলই প্রকাশ পাইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। তবে একথাও ঠিক যে, তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট এবং সুপারিশ প্রকাশিত হইলেও উহা প্রায়ই কার্য্যকরী করা হয় না। বোম্বাইয়ে তাহাই হইতে চলিয়াছে। অবিলম্বে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং আরও কয়েকটি বিষয়ে সুপারিশ করিয়া উক্ত কমিটী রিপোর্ট দিলেও বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট উক্ত সুপারিশগুলি কার্য্যে পরিণত না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

—

খাকসার দল বে-আইনী

ভারত-গবর্ণমেণ্ট খাকসার দলকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অতঃপর বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্টও অনুরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। খাকসার দলের গতিবিধি যে সন্দেহজনক এবং এই দল সম্পর্কে যে গবর্ণমেণ্টের বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তাহা বহু পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কাজই বড় ধীরে চলে। বিলম্বে হইলেও অবশেষে গবর্ণমেণ্ট খাকসার দলকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া ভাল করিয়াছেন।

—

যুদ্ধ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব খুব যে অস্পষ্ট ছিল তাহা নয়, তথাপি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় আমেরিকা সম্বন্ধেও আশঙ্কা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "ইহা নিঃসন্দেহ রূপে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হইতেছে যে, হিটলারী প্রচেষ্টা প্রবলভাবে প্রতিহত করিতে না পারিলে পশ্চিম গোলার্দ্ধও নাৎসীদের ধ্বংসাস্ত্রের পাল্লার মধ্যে আসিয়া পড়িবে।" আমেরিকা সম্পর্কে এই আশঙ্কা প্রকাশের সঙ্গে বৃটেনকে সাহায্য করা এবং সমুদ্র হইতে হিটলারের প্রভাব দূরীকরণ সম্পর্কেও তিনি স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটেনকে সামরিক উপকরণ সরবরাহ করা তিনি অবশ্য কর্ত্তব্য (imperative) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "যাহাতে দ্রব্যসম্ভার বৃটেনে নিশ্চিত ভাবে পৌছিতে পারে, সেজন্য আমাদের রক্ষীদল সাহায্য করিতেছে এবং প্রয়োজনীয় অন্য সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।"

কি ভাবে উল্লিখিত ব্যবস্থা করা হইবে তাহাও তিনি বলিয়াছেন: "বৃটিশ সরকারের সম্মতিক্রমেই আমি এই নগ্ন সত্য কথা প্রকাশ করিতেছি যে, বৃটিশ জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানাগুলি এক সময়ের মধ্যে যত জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারে তাহার তিনগুণ বাণিজ্য জাহাজ সেই সময়ের মধ্যে নাৎসীরা নিমজ্জিত করিতেছে। বৃটিশ ও আমেরিকান কারখানায় যত জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে নাৎসীরা তাহার দ্বিগুণ জাহাজের সলিল সমাধি ঘটাইতেছে। জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য আমাদের যে বিরাট কর্ম্মসূচী আছে প্রথমতঃ তাহাকে আরও দ্রুততর এবং শক্তিশালী করিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রবক্ষে জাহাজ ডুবির পরিমাণ কমাইতে সাহায্য করিয়া আমরা এই বিপদের প্রতিকার করিতে পারি।"

শুধু ইহাই নয়, তিনি তাঁহার স্মরণীয় ঘোষণায় বলিয়াছেন: "এই দেশের সম্মুখে পূর্ণ জরুরী অবস্থা দেখা দিয়াছে, যাহার জন্য ইহার সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী বিমানবাহিনী ও অসামরিক দেশরক্ষার ব্যবস্থা পশ্চিম গোলার্দ্ধের যে কোন অংশের বিরুদ্ধে চালিত যে কোন কার্য্য বা আক্রমণের বিপদ প্রতিহত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"

তাঁহার ঘোষণাকে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বাভাষ বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ইংলণ্ডে সমরোপকরণ পৌছাইয়া দিতে হইলে নাৎসী যুদ্ধ জাহাজের সম্মুখীন না হইয়া তাহা সম্ভব হইবে না। সুতরাং তাঁহার ঘোষণাকে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলেই যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট অতঃপর কি করিবেন তাহা হয়ত অচিরেই জানা যাইবে।

—

ক্রীট যুদ্ধের পরে

ক্রীট দ্বীপ হইতে বৃটিশ বাহিনী অপসারিত হওয়ায় এই দ্বীপটি জার্ম্মানীর হস্তগত হইয়াছে। এই দ্বীপটি ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। সুতরাং ক্রীটে জার্ম্মান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে যুদ্ধের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকের ধারণা, হিটলার ক্রীট দ্বীপে বৃটেন আক্রমণের মহলা দিলেন, অর্থাৎ যে রণ-নীতিতে ক্রীট দ্বীপ অধিকৃত হইল অতঃপর উহাই বৃটেন আক্রমণে অনুসৃত হইবে। কিন্তু এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। গ্রেট বৃটেনে শত্রুর আক্রমণ ব্যাহত করিবার জন্য যেরূপ পূর্ণাঙ্গ আয়োজন করা হইয়াছে ক্রীট দ্বীপে যে অনুরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই তাহা প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই এই ক্রীট দ্বীপে জার্ম্মানী যে জয়লাভ করিল তাহাতে হিটলারের রণনীতি এবং সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। কিন্তু ক্রীট অধিকার করায় পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে যুদ্ধের

ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। জার্ম্মানী হয়ত এখন সুয়েজ খাল, আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর-সীমান্ত আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিবে। তবে একথাও ঠিক যে ইরাকে রসীদ আলী যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছিল বৃটেন তাহা প্রশমিত করিয়া পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে জার্ম্মান প্রভাবকে প্রতিহত করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। এদিকে ভিসি গবর্ণমেন্টের সহিত জার্ম্মানীর যে চুক্তি হইয়াছে হয়ত তাহারই ফলেই জার্ম্মানী সিরিয়াতে সৈন্য এবং রণসম্ভার আনয়ন করিতেছে। এই বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই স্বাধীন ফরাসী বাহিনীর সহায়তায় বৃটিশ বাহিনী সিরিয়া সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। সিরিয়ার ব্যাপারে জার্ম্মানী হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া শুনা যাইতেছে। যদি ভিসি গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া সিরিয়ার ব্যাপারে জার্ম্মানী হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে ইহা এক অভিনব ব্যাপার হইবে। যুদ্ধের প্রারম্ভে বৃটেন ছিল ফ্রান্সের মিত্র, জার্ম্মানী ছিল শত্রু। ফ্রান্স যদি আজ বৃটিশকে ছাড়িয়া জার্ম্মানীর শরণাপন্ন হয় তাহা হইলে ফ্রান্সের মত একটা শ্রেষ্ঠ জাতির পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্গতি এবং কলঙ্কের বিষয় কি হইতে পারে?

—

আটলাণ্টিকে জল-যুদ্ধ

আটলাণ্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশে ডেনমার্কের নিকটে বৃটিশের সহিত জার্ম্মানীর এক জলযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে বৃটিশ ক্রুজার 'হুড' জার্ম্মানীর টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু অপর পক্ষে জার্ম্মানীর ৩৫ হাজার টনের অতিকায় রণতরী 'বিসমার্ক' জলমগ্ন হয়। বৃটেনের 'প্রিন্স অব ওয়েলস' নামক যুদ্ধ জাহাজ জখম এবং ডেষ্ট্রয়ার 'ম্যাসোনা' জলমগ্ন হইলেও বৃটিশ নৌবাহিনী এই জলযুদ্ধে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত করিয়াছে।

—

চিয়াং কাই-সেক ও কম্যুনিষ্ট পার্টি

চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি খুব শক্তিশালী দল, কিন্তু মার্শাল চিয়াং কাই-সেকের দলের সহিত তাহাদের মৌলিক পার্থক্য বর্ত্তমান। এই জন্যই চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াই মার্শাল চিয়াং কাই-সেক চীন হইতে কম্যুনিষ্টদিগকে উচ্ছেদ করিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কম্যুনিষ্ট দলকে উৎখাত করিবার জন্য দশ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রভূত শক্তি ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টিকে উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহার শক্তি ক্ষয় হইয়াছে প্রচুর—যে শক্তি চীনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করিলে চীনের এই অবস্থা আজ হইত না। অবশেষে যখন বেণী পুড়িয়া হাতে লাগিল তখন তাঁহার চৈতন্য হইল, জাপানের আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার কার্য্যে সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি চীনা কম্যুনিষ্টদের নিকট আবেদন করিলেন। এই আবেদনে তাহারা সাড়াও দিয়াছিল। চীন-জাপান যুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টি যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যাপার অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল। কম্যুনিষ্ট দলের চতুর্থ রুট আর্ম্মি কিয়াংসু, চেকিয়াং এবং আনহুই প্রদেশে প্রবেশের অনুমতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে তাহাদের সাম্যবাদী নীতির প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় চীনের কায়েমী স্বার্থ-বাদীরা ভীত হইয়া উঠিলেন। তাহারই ফলে মার্শাল চিয়াং কাই-সেক চতুর্থ রুট আর্ম্মিকে নিরস্ত্র করি[illegible] আদেশ দেন এবং আর্ম্মি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পরে অবশ্য চিয়াং কাই-সেকের ভুল ভাঙিয়াছে এবং কম্যুনিষ্ট দলের সহিত তাঁহার বিরোধ মিটিয়া গিয়াছে। কম্যুনিষ্টরা যেখানে যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহার সহিত চিয়াং কাই-সেকের চুংকিং গবর্ণমেন্টের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিগত মৌলিক বিরোধ রহিয়াছে, যদিও কম্যুনিষ্ট দল চুংকিং গবর্ণমেন্টের প্রভুত্ব মানিয়া লইয়াছে। কাজেই চীন-জাপান যুদ্ধ মিটিয়া গেলে কম্যুনিষ্টদের সহিত আবার যে চিয়াং কাই-সেকের সংঘর্ষ হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? যদি হয়, তবে উহা চীনের পক্ষে অধিকতর দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে।

—

মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

তৃতীয় বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৪৮ | ৭ম সংখ্যা

চিন্তাধারার ক্রম-বিকাশ

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

চিন্তা-জগতের একটা ইতিহাস আছে। কিন্তু প্রথমেই আমাদের স্পষ্ট ভাবে জানা দরকার চিন্তা-জগতের ইতিহাস বলিতে আমরা কি বুঝি। বুঝি, মানুষের চিন্তা-বৃত্তির একটা অতীত ছিল, একটা বর্ত্তমান আছে এবং একটা ভবিষ্যৎ থাকিবে। এক কথায়, চিন্তা-বৃত্তি static নয়, অচল নয়, স্থাণু নয়, চিন্তা-বৃত্তি dynamic—সচল, চির-পরিবর্ত্তনশীল—চিন্তাবৃত্তিরও একটা ক্রমবিকাশ আছে এবং ক্রমবিকাশের পথে উহার গতি আজও থামিয়া যায় নাই—যাইবেও না কোনদিন যদি না মানব-জাতি পৃথিবী হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং বৈশিষ্ট্যের যাঁহারা ধারক এবং বাহক এ কথাটা তাঁহারা স্বীকার করিবেন কিনা সন্দেহ। তাঁহারা হয়ত বলিবেন, আমাদের জন্য যাহা কিছু চিন্তা করিবার দরকার তাহা সমস্তই আর্য্যঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন, নূতন করিয়া চিন্তা করিবার আমাদের আর কিছু নাই। এই কথাটাকেই সহজ ভাষায় বলিতে গেলে দাঁড়ায় এই যে, ভারতীয় চিন্তাবৃত্তির ইতিবৃত্ত—অতীত ইতিহাস অবশ্যই একটা আছে, কিন্তু উহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু নাই। এইরূপ মনোবৃত্তির মধ্যে যে একটা স্ব-বিরোধ আছে—একটা self-contradiction আছে তাহা সহজে আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু [illegible] অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি, একথাও বলা চলে না। পাশ্চাত্য যৌথ কারবারকে—joint-stock companyকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিলেও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি বিরাগ আমাদের অপরিসীম, এমন কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতিও এই বিরাগ বড় কম নয়। কিন্তু মুস্কিলে পড়িতে হয় পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নব্য সম্প্রদায়কে লইয়া। এই সঙ্কটের মধ্যে আমাদের নূতন আর একটি পথ ধরিতে হয়—আমরা প্রমাণ করিতে লাগিয়া যাই—এই যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, সমস্তই আছে আমাদের বেদে—আর্য্যঋষি প্রণীত অষ্টাদশবিদ্যার মধ্যেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের সব কথাই বলা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ আর আমাদের কাছে নূতন কথা কি? এইখানেই আমাদের স্ব-বিরোধটা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, ইউরোপেও একদিন এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, যখন রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদের প্রতি সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ মানুষের ছিল না। ভগবান বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য এই দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কি তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা জানিবার কোন উপায় নাই—সেকথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, মানুষের জীবন-যাপনের প্রণালী কিরূপ হইবে তাহাই

তিনি শুধু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জাতীয় নির্দ্দেশ আমরা যেমন পাইয়াছি আর্য্যঋষিদের নিকট, সে-যুগে ইউরোপের লোকেরাও তাহা পাইয়াছিল ধর্ম্মযাজকদের নিকট হইতে। রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান মানুষের কল্যাণের জন্যই ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন, এগুলির মধ্যে তাঁহারই মহৎ ইচ্ছা প্রতিফলিত হইতেছে। এগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার অধিকার সে-যুগের ইউরোপে কাহারও ছিল না। রাষ্ট্র, সমাজ কিম্বা পরিবার সম্পর্কে কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে মানুষের যাইতে হইত ধর্ম্মযাজকদের নিকট। কারণ, তাঁহাদের ভিতর দিয়াই ভগবানের প্রত্যাদেশ মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়, ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, রোগ হইলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া এবং বাড়ী তৈয়ার করিতে হইলে ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাওয়ার সহিত ধর্ম্মযাজকদের কাছে যাওয়ার পার্থক্য আছে অনেকখানি। ডাক্তার চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, বাড়ী তৈয়ার করা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়াররা। কিন্তু তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান যে-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা মানুষের কাছে দুর্ব্বোধ্য নয়, মানুষ চেষ্টা করিলে অন্ততঃ তাহার মূল সূত্রগুলি বুঝিতে পারে। ধর্ম্মযাজকগণ ভগবানের প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বটে, কিন্তু তাহাদের এই বিশেষ জ্ঞান এমন একটা বস্তু যে, মানুষের বুদ্ধি সেখানে পৌঁছায় না। এক কথায় উহা ভগবান্ তথা ধর্ম্মযাজকদের স্বেচ্ছাপ্রসূত নির্দ্দেশ মাত্র। রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজরীতি, পারিবারিক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা, সমালোচনা করা, প্রয়োজনবোধে সংস্কার করিবার কোন অধিকার মানুষের আছে বলিয়া সে যুগের ইউরোপে স্বীকৃত হয় নাই। এগুলি যে ভাবে তাহারা পাইয়াছিল সেই ভাবে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় তাহাদের ছিল না। ইউরোপের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অতীন্দ্রিয় শক্তির হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিদ্রোহের সূচনা দেখাদেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। এই বিদ্রোহের উদ্বোধন-মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন ফরাসী দার্শনিক রুশো।

রুশোর পূর্ব্বে ইউরোপের চিন্তাধারায় যে অচল অবস্থার পরিচয় আমরা পাই তাহা অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইউরোপীয় চিন্তাধারার এই ক্লীবত্বের পূর্ব্বে গ্রীক দর্শনের সত্য-জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা অকুতোভয় স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ইউরোপের চিন্তাধারায় এই গ্রীক দর্শনের প্রভূত প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, যদিও উভয়ের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই—উভয়ের মধ্যে বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে রোমান সাম্রাজ্য এবং মধ্যযুগের সুদীর্ঘ ইতিহাস। বস্তুতঃ চিন্তাধারার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় কতগুলি সিদ্ধান্ত এবং মতবাদ মানুষের চিন্তাজগতে আবির্ভূত হওয়ার পর পুনরায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই চিন্তাজগতে আবার ঐ সকল সিদ্ধান্ত এবং মতবাদের আবির্ভাব দেখা যায়। মাঝখানের সময়টুকুতে মানুষ যে-নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করে তাহারই আলোক সম্পাতে উল্লিখিত পুরাতন সিদ্ধান্ত এবং মতবাদগুলিকে নূতন করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে আরম্ভ করে। এখানে একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, টিকী রাখিবার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে এই জাতীয় বিচারের কোন সম্পর্ক নাই, কিম্বা হিন্দুর দশ অবতারকে ডারুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টাও এই জাতীয় বিচার নহে।

ভারতীয় আর্য্যঋষিদের স্বাধীন চিন্তার অভাব ছিল না। স্বাধীন চিন্তা তাঁহাদের ছিল বলিয়াই তাঁহারা ঋষিপদবাচ্য হইয়াছেন। কিন্তু ভারতে আজকাল আর ঋষি জন্মগ্রহণ করেন না। তাহার কারণ, আমরা আর্য্যঋষিদের স্বাধীন চিন্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইতে পারি নাই। ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী ও পঞ্জী লিখিয়া আর্য্যঋষিদের উত্তরাধিকারী হওয়ার চেষ্টা যে কত বৃথা তাহা আমাদের অধঃপতিত অবস্থা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। আমরা যাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য বলিয়া উপেক্ষা করি তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে আর্য্যঋষিদের স্বাধীন চিন্তার উত্তরাধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। বীজগণিত, দশমিক ভগ্নাংশ, জ্যোতিষ প্রভৃতির প্রথম আবিষ্কারক আর্য্যঋষিরাই, কিন্তু তাঁহাদের বংশধর আমাদের চিন্তাবৃত্তির ক্লীবত্বের জন্যই এ সকল বিষয়ে নূতন কিছুর আবিষ্কার

এ দেশে আর সম্ভব হয় নাই। আর্য্যঋষিদের আবিষ্কার পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে পাশ্চাত্য মনীষীদের হাতেই এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু তাই নয়, তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন নব যুগের।

মানুষের চিন্তাবৃত্তি আলোচনা করিলে দেখা যায়, আমাদের মনে কতগুলি idea বা প্রত্যয় আছে যাহার প্রতিরূপ পদার্থ বহির্জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কতগুলি প্রত্যয় আছে যাহার প্রতিরূপ কোন কিছুর অস্তিত্বই বস্তু জগতে নাই। যেমন: ন্যায়, অন্যায়, সত্য, ভাল, মন্দ, সংখ্যা (এক, দুই ইত্যাদি) কার্য্য-কারণ, অসীমত্ব ইত্যাদি। এগুলিকে আমরা বলি abstract idea বা অমূর্ত্ত প্রত্যয়। যে সকল প্রত্যয়ের প্রতিরূপ বস্তু-জগতে বর্ত্তমান আছে তাহাদের উৎপত্তি কি ভাবে হইল অর্থাৎ আমাদের মনে বহির্জগতের বস্তুর ধারণা কিরূপে জন্মিল তাহা বুঝিতে আমাদের তেমন কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু বহির্জগতে যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার ধারণা অর্থাৎ অমূর্ত্ত প্রত্যয় কিরূপে আমাদের মনে সৃষ্টি হইল সে সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক মীমাংসা আজও হয় নাই।

ষ্টোয়িক দর্শনের (Stoic Philosophy) স্রষ্টা জেনো বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। কিন্তু বহির্জগতের সংস্পর্শে আমাদের মনে যে সংবেদন (sensation) জন্মে তাহা কতগুলি মানস প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রত্যয়ে (conception) পরিণত হয়। প্লেটো কিন্তু জেনোর মতবাদকে স্বীকার করেন নাই। প্লেটো বলেন, ভাল, মন্দ, সত্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির ধারণা মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ, এইগুলি লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে, এগুলি চির অ-পরিবর্ত্তনীয় এবং সার্ব্বজনীন।

সক্রেটিস্ মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের (natural right) কথা বলিয়াছেন। এই অধিকার কি কি তাহা কোথাও লিখিত নাই, অথবা এ কথাও বলা চলে না যে, কোন এক সময়ে সমস্ত মানুষ কোন সম্মিলনে মিলিত হইয়া এই সকল অধিকার সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে। স্বাভাবিক অধিকারের প্রতি এরিষ্টটলের আদৌ কোন বিশ্বাস ছিল [illegible] স্বাভাবিক অধিকার শুধু অলিম্পাসের দেবতাদের বেলাতেই বাধ্যকর। বস্তুতঃ অলিম্পাসের দেবতাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে গ্রীক পুরাণাদিতে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তৎকালীন গ্রীক সমাজের রীতিনীতির দিক হইতে সেগুলিকে চরম দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। প্রসিদ্ধ গ্রীক কবি হোমর তাঁহার অমর কাব্যে অলিম্পাসের দেবতাদের এই সকল রীতিনীতির উল্লেখ করায় পাইথাগোরাস হোমরের আত্মাকে নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অধিকার জিনিষটাকে এরিষ্টটল কখনও সার্ব্বজনীন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে দুইজন সমান ব্যক্তির মধ্যেই অধিকারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে। তৎকালীন গ্রীকদের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে এরিষ্টটল এই কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎকালীন গ্রীসের সমাজ-ব্যবস্থা পিতৃকুলাত্মক পরিবারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পিতাই ছিলেন পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা—পরিবারের ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ক্রীতদাস প্রভৃতিকে তিনি প্রহার করিতে, বিক্রয় করিতে এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। এইরূপ কার্য্যদ্বারা তিনি মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, এ কথা কেহই স্বীকার করিত না। অধিকার এবং ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে এরিষ্টটল পিতৃকুলাত্মক পরিবারের রীতি-নীতিই মানিয়া লইয়াছিলেন। অধিকারকে, ন্যায়-অন্যায়কে সার্ব্বজনীন এবং চির-অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া তিনি স্বীকার করেন নাই, উহাকে তিনি সমপদস্থ ব্যক্তিগণের ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া কেবল উহার আপেক্ষিক মূল্যই স্বীকার করিয়াছিলেন।

প্লেটো এরিষ্টটল অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান ছিলেন এ কথা বলা চলে না। অথচ তিনি ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ প্রভৃতিকে মানুষের প্রকৃতি-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেন কেন তাহা বোঝা কঠিন। আর্কেলাস্ (Archelaus) ছিলেন সক্রেটিসের শিক্ষাগুরু—তিনি 'নেচারেলিষ্ট' (Naturalist) বলিয়াও খ্যাতিঅর্জ্জন করিয়াছিলেন। আর্কেলাস্ স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া কিছু স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে দেওয়ানী আইনই হইল ন্যায়-

অন্যায়ের মূলভিত্তি। প্লেটোর মত এরিষ্টিপাসও (Aristppus) সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক অধিকার এবং সামাজিক অধিকারের প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বলিতেন, জ্ঞানী ব্যক্তিদের উচিত সব সময়ই দেওয়ানী আইনের (civil laws) উর্দ্ধে অবস্থান করা। নিরাপত্তার সহিত দেওয়ানী আইন ভঙ্গ করিবার সুযোগ পাইলে তিনি তাহাও করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গ্রীক সভ্যতার পতনের পর দীর্ঘ কালের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ এই সকল ধারণা মানুষের মধ্যে কিরূপে সৃষ্ট হইল তাহা লইয়া আর কোন তর্কবিতর্ক ইউরোপীয় পণ্ডিতসমাজে উপস্থিত হয় নাই। বস্তুত: যতদিন পর্য্যন্ত ফিউডাল সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নূতন ধনী শ্রেণীর উদ্ভব না হইয়াছে ততদিন পর্য্যন্ত অমূর্ত্ত প্রত্যয়গুলির (abstract ideas) উদ্ভব কিরূপে হইল তাহার আলোচনাও আরম্ভ হয় নাই। মানুষের চিন্তাধারার উপর সামাজিক ঘটনার প্রভাব যে কতখানি মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপীয় চিন্তাধারার মধ্যে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আজ অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, দার্শনিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সাহিত্য ও আর্ট সম্পর্কে যত কিছু মতবাদ আমরা পাইয়াছি তাহা সমস্তই এই যুগে উদ্ভূত হইয়াছে। পরিপাক কার্য্য সমাধা করা যেমন পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্র অন্ত্রের কার্য্য তেমনি চিন্তা করা মস্তিষ্কের কাজ, এ কথা আজ সর্ব্ববাদীসম্মত। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক আবেষ্টনীর পরিবর্ত্তনে যে অবস্থার উদ্ভব হয় মানুষের মস্তিষ্ক তাহাকেই উপকরণ করিয়া চিন্তা করে।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী ইউরোপের ইতিহাসে একটা বিপুল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের যুগ। আমেরিকা আবিষ্কার এবং ইউরোপ হইতে জলপথে ভারতবর্ষে আসিবার পথের সন্ধান ইউরোপের শিল্প-বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্যে যে পরিবর্ত্তন আনায়ন করিয়াছিল তাহারই ফলে উদ্ভব হইল নূতন এক শ্রেণীর। ইহারাই হইলেন নূতন ধনী সম্প্রদায়। ইহাদিগকেই বলা হয়

তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তৃতিতে তাঁহারা হইলেন প্রচুর অর্থের অধিকারী, অথচ তৎকালীন ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থা এবং শিল্প-ব্যবস্থা ছিল ইহাদের আত্মসম্প্রসারণের পক্ষে প্রবল বাধা। রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁহাদের নূতন অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইল তাহাদের প্রথম এবং প্রধান কাম্য। এই সময়ই সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের মনে অমূর্ত্ত প্রত্যয়ের সৃষ্টি সম্বন্ধে নূতন মতবাদের উদ্ভব হইল, যদিও একদিক হইতে দেখিতে গেলে উহা কতকটা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। ডিডেরট (Diderot) এবং এন্‌সাক্লোপিডিষ্টরা বলিলেন, কোন প্রত্যয়ই (ideas) মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, মানুষ কোন প্রকৃতিসিদ্ধ প্রত্যয় লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার মনটি অর্থাৎ মস্তিষ্কটি থাকে একেবারে tabula rasa—অলিখিত একখানা সাদা শ্লেটের মত। সংবেদনবাদীদের (sensationalist school) প্রসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধই হইল—Nothing exists in the understanding which has not originally been in the senses. বুদ্ধিতে এমন কিছু নাই যাহা আদিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল না। ডেকার্ডে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ডিডেরটের অনেক পূর্ব্বে। তাঁহাকে বলা হয় মানবের চিন্তাবৃত্তির অন্যতম মুক্তিদাতা। কিন্তু আসলে ইহার মধ্যে অতিশয় উক্তি আছে অনেকখানি। ডেকার্ডে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। মানুষের যত কিছু বিশ্বাস-অবিশ্বাস সকলের প্রতিই তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। সন্দেহ করিলেই সন্দেহকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। cognito, ergo sum. আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি। বিশ্ব বৈচিত্র্যকে জানিবার বুঝিবার জন্য ডেকার্ডে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া সক্রেটিসের মত "Know Thyself" এর পন্থা—অন্তর্দৃষ্টির পন্থা গ্রহণ করিলেন—নিজের মধ্যেই পৃথক করিয়া লইলেন নিজকে। ছোট বেলা হইতে যে-সকল বিশ্বাস তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন অথবা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের দ্বারা যে সকল সংস্কার বা কুসংস্কার তাঁহার জন্মিয়াছিল, সেগুলি হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তিনি সৎপদার্থ (substance) এবং কারণের

(cause) অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার মতে এগুলি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানলব্ধ নহে, এগুলির জ্ঞান মানুষের সহজাত। কাণ্টের (Kant) ভাষায় এগুলি সার্ব্বজনীন এবং অপরিহার্য্য প্রত্যয়—universal and necessary ideas, অভিজ্ঞতা দ্বারা এগুলি অর্জ্জন করা যায় না, এগুলির অস্তিত্ব আমাদের মনের মধ্যে অকাট্য ভাবেই রহিয়াছে।

জন লক (John Locke) ডেকার্ডের অন্তর্দৃষ্টিকে স্বীকার করেন নাই, যদিও ডেকার্ডের সন্দেহের পন্থাকে তিনিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জ্ঞানের পথ দুইটি: সংবেদন এবং চিন্তা। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান হইতেই আমাদের idea গুলির উদ্ভব হইয়াছে, এ কথা লক স্বীকার করিলেও নাস্তিক্যবাদকে তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। কারণ তিনি মনে করিতেন, আইন-স্রষ্টা ঈশ্বর যদি না থাকেন, তাহা হইলে ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দের ভিত্তিই আর থাকে না। নাস্তিকরা যে ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না তাহা নয়। লকের আপত্তির কারণও তাহা নয়। তাঁহার আসল আপত্তির কারণ হইল, ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের মূলে কাহারও sanction অর্থাৎ অনুমোদন আর থাকে না, ফলে অন্যায়-কারীকে শাস্তি দিবারও আর থাকে না কেহই। কাজেই মানুষ যথেচ্ছ অন্যায় কার্য্য করিয়া যাইতে পারে। নাস্তিকরাও অবশ্য লকের এই যুক্তির উপযুক্ত উত্তর দিতে পারেন। প্রথমত: লক নিজে ছিলেন determinist. তাঁহার determinism মতবাদ মানিলে মানুষের ন্যায়-অন্যায় কোন কার্য্যের দায়িত্বই আর ঈশ্বরের পক্ষে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। 'ত্বয়া হৃষীকেশ' না হউক determinist-দের মতে মানুষ তাহার কৃতকার্য্যের passive agent মাত্র। একজন passive agentকে তাহার কৃতকার্য্যের জন্য পুরস্কৃত করা এবং আর একজনকে শাস্তি দেওয়ার কোন অর্থ হয় না—শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, শাস্তির ভয় নাই বলিয়াই নাস্তিকরা যদি অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে ভগবানের পক্ষে অন্যায় কার্য্য করা আরও সহজ। কারণ, তিনি নিশ্চিতরূপে জানেন, তাঁহার উপরওয়ালা কেহ নাই—

জর্জ্জ বার্কলে চরাচর সমগ্র বিশ্বকেই মানসিক প্রত্যয়ে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। জগতে আছে শুধু মন আর মনের ক্রিয়া। জগতটা কতগুলি মানস চিত্রের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানের বিষয়-গুলি কোথা হইতে আসিল? বার্কলে বলিলেন, সমস্ত বস্তুই ভগবানের জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত। মনে করুন, চায়ের জন্য কেটলিভরা জল ষ্টোভের উপর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কতক্ষণ পরে জল টগবগ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিল। জল কেন ফুটিতে আরম্ভ করিল? বিজ্ঞান অবশ্য বলিবে, আগুনের যে দহন শক্তি তাহাই জলের ফুটন্ত গরম অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু বার্কেলের কাছে কেটলি, জল, ষ্টোভ—এগুলি কতকগুলি মানস চিত্র ছাড়া আর কিছু নয়। চায়ের জল গরম করিতে যাইয়া এগুলি সাময়িক ভাবে আমার মনের মানস চিত্র হইয়াছে বটে, কিন্তু আসলে এগুলি ভগবানের মনে অনন্ত কাল ধরিয়াই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং ষ্টোভের জ্বলনকে আর জল গরম হওয়ার কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভগবানের জ্ঞানে ষ্টোভের যে জ্বলন তাহাই আসল বস্তু এবং জল গরম হওয়ার সমগ্র ব্যাপারটাই ভগবানের জ্ঞান-চেতন অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কাহারও জ্ঞান-চেতন অনুভূতি এক ফোঁটা জলকেও গরম করিতে পারিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। তাই যদি হয়, তাহা হইলে ভগবানের মন তাহা যত শক্তিসম্পন্নই হউক—ঠাণ্ডা জলকে গরম করিতে পারিবে তাহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? তা ছাড়া ভগবান্ যে সত্যই আছেন তাহাই বা তিনি কি করিয়া জানিলেন। ডেভিড হিউম দেখাইলেন, আমরা প্রকৃতপক্ষে কতগুলি প্রত্যক্ষ অনুভূতির সমষ্টি মাত্র। মানুষের জ্ঞান-চেতনা দুই ভাগে বিভক্ত: এক ভাগের নাম impression বা অনুভূতি, আর এক ভাগের নাম idea. বা প্রত্যয়। idea বা প্রত্যয় ক্ষণস্থায়ী অনুভূতির স্থায়ী প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আর কিছু নয়। হিউমের এই যুক্তির সম্মুখে চিরন্তন অধ্যাত্ম সত্তা ভগবানের অস্তিত্বই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বর্কলে এবং হিউমের সময় হইতেই দার্শনিক চিন্তাধারা বিষয়ীনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ (subjective idealism) এবং

ইন্দ্রিয়জ্ঞান মূলক অজ্ঞেয়বাদ (empirical scepticism) এই দুইটি বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। ইমানুয়েল কাণ্ট এই দুইটি স্রোতধারাকে একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। Pure reason বা শুদ্ধ বুদ্ধি এমন একটা শক্তি যাহাদ্বারা অভিজ্ঞতা ব্যতীতই idea বা প্রত্যয় সৃষ্ট হইতে পারে। এই সকল idea বা প্রত্যয় কতটুকু প্রামাণিক তাহা নির্ণয় করাই হইল The Critique of Pure Reason এর উদ্দেশ্য। কিন্তু এসম্বন্ধে কিছু সন্ধান করিতে হইলেই আমরা অভিজ্ঞতা কিরূপে লাভ করি এই প্রশ্ন প্রথমেই আসিয়া পড়ে। কার্য্যকারণ সম্বন্ধে হিউমের যে অজ্ঞেয়বাদ মূলক বিশ্লেষণ তাহার সমালোচনা করার উদ্দেশ্য লইয়াই Criticএর আরম্ভ, একথা আমাদের ভুলিলে চলিবেনা। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য কার্য্যকারণ সম্বন্ধের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু Critique of Pure Reason-এর আলোচনা এত বিরাট এবং এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার ফলে আসল বস্তুই চাপা পড়িয়া গিয়াছে—এ যেন মশা মারিতে কামান দাগা, অথচ মশাও মরিল না—উড়িয়া চলিয়া গেল। শুদ্ধ বুদ্ধি সম্বন্ধে কাণ্টের আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যাহা কিছু আমাদের সমস্ত রকম অভিজ্ঞতার বাহিরে শুধু বুদ্ধি তাহার নাগাল পায় না, যাহা আমাদের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত তাহাকে জানিবার উপায় নাই। এই সঙ্কটের মধ্যে আমাদের সাহায্যের জন্য কাণ্ট practical reasonকে—কার্য্যকরী বুদ্ধিকে লইয়া আসিয়াছেন। কারণ তাঁহার মতে এই কার্য্যকরী বুদ্ধিই আমাদের সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারে। সমস্ত বুদ্ধিই একরূপতা (uniormity), শৃঙ্খলা এবং বিধির দাবী করিয়া থাকে। তাত্ত্বিক দিক হইতে যাহা সত্য আমাদের আচরণের দিক হইতে তাহাই করণীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নূতন ধনীশ্রেণীকে অর্থাৎ বুর্জ্জোয়া শ্রেণীকে রাষ্ট্রে, সমাজে এবং আর্থিক ব্যবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। এই নূতন গড়া ধনীই সে-যুগে বিপ্লব লইয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্গে আনিলেন মানুষের অধিকারের বাণী যাহা ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় রাষ্ট্র, নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সমস্তই তাঁহাদের দান। বলিতে গেলে বুর্জ্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার উহা সর্ব্বোন্নত স্তর। কিন্তু এই নূতন সমাজ-ব্যবস্থার একটি অভাবাত্মক দিকও আছে। ধনতন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে অগণিত দরিদ্র মানব তাহাদের কাছে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা একেবারেই অর্থহীন। এই সময়ই আর একটি নূতন সামাজিক শক্তির উদ্ভব হইল—সর্ব্বহারা শ্রমিকরাই এই শক্তি। শ্রমিক-শক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনাও আরম্ভ হইল। কলকারখানার সৃষ্টির সঙ্গে জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য দেখিয়া কার্লাইল মধ্যযুগের সমাজ-ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। সিস্‌মণ্ডী মানবতার নামে সৃষ্টি করিলেন কুহেলিকা। আর একদল নূতন পথে অগ্রসর হইয়া সৃষ্টি করিলেন নূতন একটি মতবাদের। ইহারই নাম ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ। আওয়েন, ফোরিয়ার, সেণ্ট সাইমন এই নূতন মতবাদের স্রষ্টা, ধারক এবং বাহক। বঞ্চিতের প্রতি করুণায় ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদীদের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। জনগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রত্যেকই ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদী এক একটি পৃথক পরিকল্পনা গঠন করিলেন। উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষাও আরম্ভ হইয়াছিল। পরীক্ষামূলক কার্য্যকেই তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার উপায় মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিলেন, ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার পরিকল্পনা এতই সুন্দর, এতই চিত্তাকর্ষক যে তাহাকে ক্ষুদ্র আকারেও যদি কার্য্যে পরিণত করা যায় তাহা হইলেও স্বেচ্ছায় সমগ্র পৃথিবী এই আদর্শ গ্রহণ করিবে। কিন্তু পরীক্ষার কষ্টি পাথরে তাঁহাদের কোন পরিকল্পনাই টিকে নাই। তাঁহারা শ্রেণী-সংগ্রামের নিন্দা করিয়াছেন, ধনীদের সাহায্য নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার ক্রমাভিব্যক্তির ধারাটি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাদের মতবাদ আর টিকিল না। ক্লাসিকেল ধনবিজ্ঞান এই সময়েই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এ্যাডামস্মিথ নূতন সমাজ-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করিয়া যে

অর্থনৈতিক বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিলেন তাহা রিকার্ডোর মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল। ইহার পরে বুর্জোয়া ধনবিজ্ঞান আর বিজ্ঞান রহিল না, উহা পরিণত হইল বাজার-দরের হিসাব-নিকাশ এবং লাভ-লোকসানের খতিয়ানে। দার্শনিক চিন্তাধারাও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চরম পরিণতি লাভ করে হেগেলের মতবাদের মধ্যে।

দার্শনিক চিন্তাধারায় হেগেল অনয়ন করিলেন এক অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব। বিষয়নিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ (subjective idealism) এবং ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অজ্ঞেয়বাদ কোনটাই তাঁহার যুক্তির সম্মুখে টিকিল না। হেগেল বলিলেন, বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্য অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় নহে, মানুষের বুদ্ধি তাহার রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ। সমগ্র বিশ্ব ঐশী ধী-শক্তিরই অভিব্যক্তি। মানুষের মন এই ঐশী ধীশক্তিরই অংশ বা প্রতিবিম্ব। দুনিয়ার সবকিছুর পরিমাপক হইল মানুষ। কারণ, মানুষ ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই ঐশী ধীশক্তি এবং মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি উভয়ের গতি একমুখী। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে ঐশীচিন্তা অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহাকে অভিব্যক্ত করার নামই ইতিহাস। চিন্তাধারা এবং ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা অভিন্ন। যে-পদ্ধতি দ্বারা হেগেল এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার নাম dialectic method বা বিরোধ-সমন্বয়-মূলক পদ্ধতি। ভাবাত্মক বা thesis, অভাবাত্মক বা antithesis এবং সমন্বয়াত্মক বা Synthesis এই তিনটি অংশ লইয়া dialectic method গড়িয়া উঠিয়াছে।

হেগেল বলিলেন, আমরা যখন কোন সত্যের আবিষ্কার করি তখন উহার বিপরীত সত্যের সন্ধানও আমরা পাই। এই দুইটি সত্য পরস্পর বিরোধী, পরস্পর বিবদমান। জ্ঞানের পথে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে আমরা দেখিতে পাই, এই পরস্পর বিরোধী সত্য দুটি একই বৃহত্তর সত্যের দুইটি দিক মাত্র। এই নবাবিষ্কৃত বৃহত্তর সত্যই আমাদিগকে জ্ঞানে পথে পরিচালিত করে যতক্ষণ না এই সত্যটি একটি বিরোধী সত্যের সম্মুখীন হয়। তখন জ্ঞানের পথে আরও কতকদূর অগ্রসর হইলে এই দুইটি বিরোধী সত্যের সমন্বয়ে আবার একটি নূতন সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। ইহারই নাম dialectic method বা বিরোধ-সমন্বয়-মূলক পদ্ধতি।

হেগেল অতীন্দ্রিয় জগতকে বুদ্ধির সীমার মধ্যে টানিয়া আনিলেন এবং বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করিলেন বিশ্বসৃষ্টির আদিতে। হেগেলের শিষ্য ফয়ারব্যাক (Feuerback) আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বুদ্ধির এই বিশ্বাতীত অবস্থার প্রতিও সন্দেহ করিলেন। ভগবান এবং স্বর্গ মানব-মনের অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ—রক্তমাংসে গড়া মানুষই একমাত্র সত্য। মানুষ ছাড়া আর কোন দেবতা মানুষের নাই। মানুষের জীবন শুধু ইহকালের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। তাহার এই ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা, সমাজের সর্ব্বাংশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তৃতি সাধন করাই রাষ্ট্র, সমাজ এবং ধর্ম্মজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ফয়ারব্যাক ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আসনে মানব-বিজ্ঞানকে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সহিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সাদৃশ্যও ফয়ারব্যাক প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান যেমন মানব-সমাজের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত, মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের সহিত তাঁহার যেমন কোন সম্বন্ধ নাই, তেমনি রাষ্ট্রও রহিয়াছে মানব-জীবনের বহু উর্দ্ধে। যে বৃহত্তর মানব-সমাজ রাষ্ট্র-শক্তির উৎস তাহার প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টি নাই। ধর্ম্ম-জগতের ঈশ্বর এবং মানব এই দ্বৈতবাদ মানব-জীবনে রাষ্ট্র এবং সমাজরূপ দ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে। চিন্তাজগতে ধর্ম্মতত্ত্বের আসন যখন মানব-বিজ্ঞান আসিয়া দখল করিল, সমাজ-জীবনে তখন রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিয়া বসিল গণতন্ত্র। সমাজ-জীবনে রাষ্ট্র ও জনগণ এই যে দ্বৈতভাব তাহা বিলুপ্ত করিয়া জনগণের কল্যাণের জন্য জনগণের হাতেই রাষ্ট্রকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মানব-জীবনের অতীত কোন কিছু লাভ করিবার উপায়স্বরূপ মানুষকে ব্যবহার করা চলিবে না। মানুষের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দান করাই সমাজ-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ অতিমানব বলিয়া যেমন কিছু নাই তেমনি অব-মানব বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না।

ফয়ারব্যাক হেগেলের অধ্যাত্মবাদকে মানবতাবাদে

পরিণত করিয়াছেন। মানবতাবাদ কার্ল মার্কসের হাতে *বাস্তবতাবাদে* (materialism) পরিণত হইয়াছে। মার্কসের বাস্তবতাবাদ বুর্জোয়া দর্শনের যান্ত্রিক জড়বাদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মার্কসের মতে বুদ্ধির স্থান বিশ্ব-সৃষ্টির আদিতে নয়, বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্বশেষে। জীবনের আগে ছিল শুধু জড় জগৎ। এই জড় জগৎ ক্রমবিবর্ত্তনের একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরে পৌছিলে প্রাণীজগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রাণীজগতও ক্রমবিবর্ত্তনের অধীন। আজ পর্য্যন্ত প্রাণীজগতের শেষ পরিণাম মানুষ এবং মানব-সমাজ। জড়জগৎ হইতেই বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে। আদি মানবই ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে সুসভ্য মানবে পরিণত হইয়াছে—natural selection এর সাহায্যে এমন একটি দেহ লাভ করিয়াছে যাহার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার মননশীলতা।

ভাষা এবং বর্ণমালা স্বর্গ হইতে ready made অবস্থায় মানুষ পায় নাই। এমন কি দেব-ভাষা সংস্কৃতও মানুষেরই সৃষ্টি। মনের ভাব প্রকাশে ভাষার গুরুত্ব এত বেশী যে, ভারতীয় ঋষিরা শব্দকে বলিয়াছেন ব্রহ্ম। বাইবেলেও বলা হইয়াছে, "The word is God." তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ব্যক্তিও শব্দ ব্যবহার না করিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। মানুষ নিজের চেষ্টায়, প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা গড়িয়া তুলিয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে বর্ণমালার। মানুষের ভাষা প্রথমে অল্প কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মাত্র ছিল। গোল, কঠিন, তরল প্রভৃতি abstract ভাব প্রকাশক শব্দগুলির জন্য মানুষকে বহুদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। মানুষ প্রথমে গোল বুঝাইতে চাঁদের মত, কঠিন বুঝাইতে পাথরের মত, তরল বুঝাইতে জলের মত প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিত। সর্ব্ব প্রথম মানুষ যখন abstract idea প্রকাশক শব্দগুলি সৃষ্টি করিল তখন সেগুলি ছিল সমস্তই বিশেষণ অর্থাৎ কোন বস্তুর গুণ। পরে উহা abstract idea বাচক বিশেষ্য পদে পরিণত হয়। বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে চিত্র-লিপি হইতে। ধ্বনিকে ভাঙ্গিয়া স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণে বিভক্ত করিতে মানুষের যুগ যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভূমির পরিমাপক, বস্তুর পরিমাপক শব্দগুলিও বহুদিনের চেষ্টায় মানুষ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশে গ্রামে এখনও এমন লোক অনেক আছে যাহারা 'পুরা' 'বিঘা' প্রভৃতি ভূমির পরিমাপক abstract idea প্রকাশক শব্দগুলি বুঝে না, ভূমির পরিমাণ বুঝাইতে তাহারা আদিম মানবের ভাষাই ব্যবহার করে বলে, 'এত সের ধান বুনিবার জমি।' বিনিময়ের প্রচেষ্টা হইতেই মানুষ বস্তুর পরিমাণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছে। সংখ্যা-গণনা, যোগ-বিয়োগ অঙ্কও মানুষ সহজে শিখে নাই। উচ্চাঙ্গের গণিত differential calculus কথাটির calculus শব্দ লাটিন calculi শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। calculi শব্দের অর্থ পাথরের কুচি। লাটিন calculum ponere কথার অর্থ পাথরের কুচিকে একস্থানে রাখা এবং Sub-ducere calculum কথার অর্থ পাথরের কুচি সরাইয়া লওয়া। বস্তুতঃ মানুষ প্রথমে বস্তুর সাহায্যেই যোগ বিয়োগ করিতে শিখিয়াছিল। এখনও অসভ্য মানব এবং সুসভ্য মানবের শিশুরা চক্ষের সম্মুখে বস্তুকে না দেখিলে সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না। শূন্য (০) অঙ্ক-শাস্ত্রের একটি বিপ্লবসাধক আবিষ্কার। কিন্তু নির্ব্বাণ-বাদের প্রতিষ্ঠাতা ভারতীয় ঋষি ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে শূন্যের (০) আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। শূন্য এমন একটা প্রতীক যাহার নিজের কোন মূল্য নাই, অথচ অন্য সংখ্যার সহিত যুক্ত হইয়া তাহাকে মূল্যবান করিয়া তোলে। প্রকৃতপক্ষে শূন্যই এক মাত্র অবিভাজ্য সংখ্যা। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সৌন্দর্য্য প্রভৃতিকে প্লেটো ভগবদ্দত্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও সংখ্যাকে ভগবদ্দত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই।

ন্যায়বিচার বলিতে আমরা যাহা বুঝি আদিম মানব তাহা বুঝিত না। তাহাদের ছিল প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি—চোখের পরিবর্ত্তে চোখ, জীবনের পরিবর্ত্তে জীবন। একজনের অপরাধের জন্য গোষ্ঠীর সকলেই ছিল দায়ী। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হওয়ায় প্রতিহিংসার রক্তপিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে, একজনের অপরাধের জন্য গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্য ব্যক্তিকে দায়ী করা হয় না। সভ্যজগতের ফৌজদারী আইনে অর্থদণ্ড দিয়া অপরাধীর অব্যাহতি পাওয়ার বিধান আছে। বস্তুতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষের চিন্তাজগতে যে বিপ্লব আনিয়াছে তাহাতে সন্দেহ

নাই। প্রোডন (Proudhon) বলিয়াছেন 'property is robberry,' অর্থাৎ সম্পত্তি হইল ডাকাতির নামান্তর। কিন্তু আসলে ব্যাপরটা উহার বিপরীত। ডাকাতি করিয়া সম্পত্তি হয় নাই, বরং সম্পত্তি সৃষ্ট হওয়ার ফলেই ডাকাতি করা সম্ভব হইয়াছে। আইন না থাকিলে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়। অথচ হোমরের যুগে গ্রীকদের মধ্যে আইন বাচক কোন শব্দই ছিল না। ইলিয়াডে nomos শব্দটি পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে উহা আইন বাচকরূপে ব্যবহৃত হইলেও তৎকালে উহা আইনবাচক ছিল না। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে মানবের পূর্ব্বপুরুষ যখন বৃক্ষ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিল, তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিবার কায়দাটাও ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করিয়া লইল। মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া ধরিবার এই সামর্থ্যই মানুষের ক্রমোন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ। প্রথম অবস্থায় প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ যাহা পাইতে তাহাই ধরিত এবং আত্মসাৎ করিত। এই যে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিবার প্রবৃত্তি—prehensile instinct, উহা ছিল তাহার আত্মরক্ষার (খাদ্য সংগ্রহ এবং বন্য পশুর কবল হইতে আত্মরক্ষা উভয়ই) প্রধান উপায়। কিন্তু ক্রমোন্নতিতে যখন সম্পত্তির সৃষ্টি হইল তখন এই প্রবৃত্তি কতক পরিমাণে দমন করিতে হইল, যাহা পাই তাহাই আর লওয়া চলিল না। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি অপেক্ষা এই প্রবৃত্তিকে দমন করিতে মানুষকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। কিন্তু একেবারে যে পারে নাই ফৌজদারী আইনে তাহার পরিচয় আমরা পাই। মানুষের চিন্তাবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশের আরও অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন।

বিবর্ত্তনের গতিধারা থামিয়া যায় নাই। মানব-সমাজ বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে পণ্য-উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া। এই পরিবর্ত্তনের প্রতি স্তরে পরস্পর বিরোধী দুইটি শক্তির দেখা পাওয়া যায়। উভয়ের সংঘর্ষের ফলে নূতন সমাজ গড়িয়া উঠে। ফিউডাল যুগে ফিউডাল লর্ড এবং নূতন গড়া ধনী সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে বর্ত্তমান ধন-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। এই সমাজ-ব্যবস্থাতেও রহিয়াছে পরস্পর বিরোধী দুইটি শ্রেণী—বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায় এবং সর্ব্বহারা শ্রমিক।

মার্কসের মতে বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা সামাজিক বিবর্ত্তনের একটা অবশ্যম্ভাবী স্তর। চাষী ও মজুর যে তাহার ন্যায্যপ্রাপ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে তাহার মূলে ব্যক্তিবিশেষের কোন আক্রোশ নাই, ব্যক্তিবিশেষের কোন শত্রুতা নাই। এই বঞ্চনার মূলে রহিয়াছে সমাজ-ব্যবস্থা। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা যেমন সনাতন নয়, তেমনি উহার পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। ইহারই নাম কার্ল মার্কসের ইতিহাসের বাস্তবতাবাদমূলক ব্যাখ্যা। এই বাস্তবতা-বাদই সমাজতন্ত্রের দ্বার স্বরূপ।

ধনতান্ত্রিক যুগে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের যে-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই ফলে কৃষক ও শ্রমিক তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এই বঞ্চনার মূলে রহিয়াছে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের বর্ত্তমান পদ্ধতি। এই পদ্ধতির বিশ্লেষণের ফলে পণ্যের মূল্য এবং মূল্যের বাড়্তি ভাগ সম্বন্ধে মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মতবাদই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি।

ধনী, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, কৃষক, শ্রমিক সমস্তই সমাজ বিবর্ত্তনের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজ বিবর্ত্তনের ফলে এই সকল শ্রেণীর অস্তিত্বও একদিন থাকিবে না, গড়িয়া উঠিবে অখণ্ড মানব-সমাজ। আজ পর্য্যন্ত মানুষের চিন্তাধারা ক্রম-বিকাশের পথে এই পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু মানব-সমাজ চির-পরিবর্ত্তনশীল, সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে চিন্তাধারারও পরিবর্ত্তন হইবে। কত অসংখ্য পথে অখণ্ড মানব-সমাজের উন্নতির ধারা প্রবাহিত হইবে তাহা আজ কাহারও পক্ষে বলা অসম্ভব।

সন্ধ্যারাগ

(উপন্যাস)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বাবার শরীর প্রায় সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে দেখে বিজু শনিবারে বাড়ী যাওয়া কমিয়ে দিল। চিঠিপত্রের গোলমাল হ'ত ব'লে চিঠি লেখাও সে একরকম ছেড়েছিল, কেবল গৌর ও পিসিমার চিঠি মাঝে মাঝে আসতো। সে তাদের সমিতির একজন সভ্য ছিল ব'লে, ফুলুবাবু পিসিমার মারফতে দু'একটা খবর জানাতেন। মাঝে মাঝে উপদেশ বা নির্দ্দেশ দিয়ে পাঠাতেন। সে তাঁকে জানিয়ে দিল যে, যথাশক্তি কাজ করতে সে চেষ্টা করছে।

কিছু সে করবেই, এ প্রতিজ্ঞা যখন মনে দৃঢ় হোল, তখন সে মনে একটা খুব জোর অনুভব করলে। স্কুলের উপরের ক্লাসগুলি থেকে দশ-বারোটি মেয়ে সে বেছে নিল। রবিবারে ও অন্যান্য ছুটির দিনে তারা আসবে এই ঠিক হোল। কিন্তু এতদিনে বিজু বুঝেছিল যে, এদের পক্ষে অভিভাবকদের হাত এড়িয়ে আসা সহজে সম্ভব নয়। তাই সে একটু কৌশল করলে। সে অভিভাবকদের চিঠি লিখে পাঠাল যে, এদের সে আলাদা করে একটু পড়াতে চায়, যাতে পরীক্ষার ফল বেশ ভাল হয়। অভিভাবকরা খুসী হলেন, মেয়েরাও সহজেই আসতে অনুমতি পেল। বিজু মনে মনে অনেকটা হেসে ভাবল, "পরীক্ষার ফলের জন্যে যা ভাবনা আমার, তা আমিই জানি।"

মেয়েদের সঙ্গে সে গল্প কোরত নানারকমের। ইতিহাস পড়াবার ছলে ভারতবর্ষের আধুনিক রাজনীতি সহজেই এসে পড়তো। রোজ রাত্রে সে ভেবে রাখতো কতখানি সরস ও সহজ করে এদের বুঝিয়ে দেওয়া যায়। মহাত্মাজীর আত্মচরিত থেকে পড়ে শোনাত, বড় বড় নেতাদের গল্প শোনাত নানা রকমের। মেয়েরা বাড়ী যাবার আগে অঙ্কের বই খুলে কয়েকটা অঙ্ক দাগ দিয়ে দিত কিম্বা ইংরিজী গল্পের অনুবাদ করে আনতে বলতো। এইটুকু ছলনার আশ্রয় না নিলে তার প্রাথমিক চেষ্টা যে বিফল হবে সে তা বুঝেছিল।

রাত্রে ঘুমের আগে ক্লান্ত হয়ে সে ভাবতো, এর কি সার্থকতা? এদের কেউ কিছু বুঝবে, কেউ কিছু করবে তা তো মোটেই মনে হয় না। এ জগদ্দল পাষাণের বোঝা আমি সরাবো কোন্ উপায়ে? মনে হোত, তার শক্তি বৃথা অপচয়িত হচ্ছে। আবার মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিত, ভবিষ্যতের মানুষ গড়ে তুলতে সে তার সাধ্যমত চেষ্টা তো করছে। এ কি একদিনের কাজ!

শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে সে সুতো কাটা ও তাঁত চালানোর আগ্রহ সৃষ্টি করতে চেষ্টা ক'রে মোটেই সাড়া পেলো না। সুনীতি বলে দিল, "বাড়ীতে থাকি আমরা, ঘরের কত কি কাজের ভার আছে। তার ওপরে আছে মাষ্টারি। আবার কাপড় বুনতে বসি। ব্যস্, বাড়ী সব্বাইকার কাপড় কেনা বন্ধ হোক্। পয়সা যদি পেতাম না হয় করতাম, কি বসে থাকতাম তো ব্যাগার খাটা যেত। আপনার ভাই বয়েস কম, শরীরে তেজ আছে, উপরি কাজও নেই। আপনার কথাই আলাদা।"

অবসরসময়ে সে প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করতো মেয়েদের জন্যে। কিন্তু ভাষা আড়ষ্ট। ভাবগুলো ফুটে উঠতো না। কখনো বা উচ্ছ্বাসের চোটে খেই হারিয়ে যেত। মঞ্জুকে মনে পড়ে, কি সহজে কি গুছিয়ে লিখতে সে পারতো। রচনায় হাত ছিল একেবারে পাকা। তা সে তো আর এ সব কাজের কথা লিখবে না—লিখবে কবিতা। আরে, কবিতা কি কম লেখা হচ্ছে নাকি দেশে, কিন্তু লেখার মধ্য দিয়ে রাজনীতি চর্চ্চা করছে ক'টা লোক? অথচ

তারও তো দরকার আছে। অত বড় ফরাসী বিপ্লবের মূলে রুসো, ভলটেয়ারের লেখনী কি ছিল না? ক্রমওয়েলের পেছনে ছিলেন না মিলটন্?

বনলতাকে বিকেলে বাড়ীতে পাওয়া কঠিন। তবু বিজুর নিয়মিত উপস্থিতিতে বাধা পড়তো না। কি মনোভাব থেকে রোজ সে সেখানে অপরাহ্ণ যাপন করতে যেতো তার নিজের কাছে তা স্পষ্ট ছিল না। এ নিয়ে সে কোন দিন বিশ্লেষণ করে নি। সেই অগোছাল অপরিচ্ছন্ন ঘরে ব'সে বনলতার মায়ের সঙ্গে গল্প করতে কি এমন আকর্ষণ ছিল? অবিনাশের নির্লজ্জ আস্ফালন ও চাটুবাক্যে কি এমন মোহ ছিল তার? অতি খারাপ লাগতো বলেই যেন তাকে যেতে হোত। নিকৃষ্টের একটা আকর্ষণ আছে হয় তো। মনে হোত, না গেলে যেন অবশ্যকর্ত্তব্যে বাধা পড়লো। বাইরে যখন সুপুরিগাছের মাথায় রং-এর ছড়াছড়ি, মুকুলধরা আমড়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের নীল, আর ঘরে-ফিরে-যাওয়া বাদুড়ের পাখায় আসন্ন রাত্রির আভাস, তখন প্রায়ান্ধকার সেই ঘরে বসে একুশ বছরের অমূল্য সন্ধ্যাগুলি এমন সাহচর্য্যে, অমন পরিবেশে কাটানো যতই নিদারুণ মনে হোত, সেখানে বসে থাকার সঙ্কল্প ততই যেন অপরিহার্য্য হয়ে উঠতো। এই তার দেশ, তার দেশের একটি লাঞ্ছিত দীনহীন পরিবার। এই রুগ্না মা তার দেশের কত ঘরে ঘরে। অবিনাশের মত গ্লানিকর সঙ্গ তার দেশের পথে ঘাটে ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র। কাকে সে ঘৃণা করে এড়িয়ে চল্‌তে চায়? সবাই তো বিমল নয়, হেমন্ত নয়, মঞ্জরী নয়? বড় মাসীমার সংসারের কথা মনে পড়তো। অবিনাশ, তার মা, বড় মাসীমা, মেসোমশায় এরাই যে ভারতের লক্ষকোটি, বিমলরা তা মুষ্টিমেয়। এদের কি তুচ্ছ করা যায়? এদের তো জাগাতে হবেই। বিমল বলতো, জনসাধারণ কোন দিন সত্যি ক'রে জাগে না! বিজু তা মানে না!

বনলতার মার ম্যালেরিয়া ও পেটের অসুখে একেবারে হাড় চামড়া সার হয়ে হয়েছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, তিনি আর বাঁচবেন না। তাঁর অবর্ত্তমানে ছেলেগুলো একেবারে ভেসে যাবে। বিজু অবাক হ'য়ে যেত। শুয়ে শুয়ে নিজের ও অপরের কষ্টের অবধি রাখছেন না। তবু তাঁর চিন্তা, তিনি না থাকলে উপায় কি হবে! নিজের ওপরে মানুষের কি অসীম শ্রদ্ধা!

"কেন মাসীমা, আপনি ভাবছেন? আপনার মেয়ে অত করছে। ও থাকতে আপনার ভাবনা কি?" বিজু বলে।

"হ্যাঁ, টুনীর করা! নিজের মেয়ের কথা নিজের মুখে বলতে নেই: মা, ওর তো আমি আপদ জঞ্জাল। আজ যদি ওর বিয়ের সুবিধে হ'য়ে যায়, কাল আমাকে ও টান মেরে গাছতলায় ফেলবে। নেহাৎ বিয়ে ঘটাতে পারছে না...।"

অবাক হয় বিজু। "সে কি মাসীমা, মেয়ের বিয়ে হ'লে আপনি খুসী হবেন না?"

অমনি চোখে তাঁর আঁচল ওঠে, সুর বদলে তিনি বলেন, "মা তো হওনি বাছা, কি বুঝবে? আমি কি চাইনে, মেয়ে আমার রাজরাণী হোক, ঘরসংসার করুক! কিন্তু বুড়ো বয়সে এ ভাজাপোড়া দেহটাই কাল হয়েছে কি না! কোথা দাঁড়াই বলতো? আর ছেলেরাই বা কি করে? আজ ব'লে টুনী চাকরী করছে মা, অতটা বয়েস অবধি ওদের খাওয়ানো, পরানো, লেখাপড়া শেখানো করলে কে? কোন কালে কপাল পুড়িয়েছি, সারাটা জীবন লোকের দোর সেধে আর ভাল লাগে, তুমিই বল না মা?"

মনটা নরম হ'য়ে আসে বিজুর। সত্যি, মানুষের দুর্দ্দশার ইতিহাস এক দিনের তো নয়? এই মহিলাকে কত উঞ্ছবৃত্তিই না করতে হয়েছে! কেবল বর্ত্তমান দেখেই বিচার চলে না, পেছনে মস্ত অতীত আছে তো!

"কেন, আপনার বড় ছেলে কাজ-কর্ম্ম জুটিয়ে আপনার ভার নেবেন?"

"কে, অবিনাশ?" স্নেহসিক্ত মুখে তিনি বলেন, "লেখাপড়া শিখলে, সবই হোল, কিন্তু শরীরে জোর নেই এই তো মুস্কিল। আর আজকালকার দিনে সহায় মুরুব্বি না থাকলে চাকরি কি মেলে? ওর যদি বিয়েটা দিতে পারতাম ওর একটা আশ্রয় হোত। বল্‌তে নেই, অবির আমার মায়া দয়া আছে। তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে ওরই

শুধু টান আছে মায়ের ওপর। টুনী, চুণীকে তো দেখেছ! অবি যাকে বিয়ে করবে, সে আর যাই হোক, মায়া মমতা চিরটা দিন পাবে।”

বিজু ভাবে তা সত্যি বটে। মায়া মমতার অবিনাশের কিছু আধিক্যই দেখা যায়। বিজুর সঙ্গে দেখা হ'লে যে রকম গদগদ ভাবে কথা কইতে সুরু করে, যে রকম লোভীর মত হাঁ করে তাকায়, বিয়ে হ'লে এ লোক বউ-পাগলা না হ'য়ে যায় কখনো? যাক্‌গে, তার কি মাথাব্যথা।

আর এক দিন সে যেতেই তার হাত চেপে ধ'রে বনলতার মা কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বললেন, “টুনী তো আমার কথা শোনে না মা, একটু তাকে শাসন ক'রে দাও তুমি। শেষটায় কি একটা কেলেঙ্কারী ঘটাবে! তুমি যদি আমার পেটের মেয়ে হ'তে, আমি ওই হতচ্ছাড়িকে ঝাঁটা মেরে তাড়াতাম। কিন্তু ভাত কাপড় দেয়, এ খোঁটা তো যাবার নয়! ইদিকে অবিনাশও ক্ষেপে রয়েছে। বলে, বোন হোক্, যাই হোক্, ভাল ভাবে চলতে হবে।”

কি ধরণের বাড়াবাড়ি, বিজু ঠিক বুঝতে পারল না। কিছু জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে হোল না তার।

পরদিন ইস্কুলে হৈ-চৈ কাণ্ড। বনলতা তখনো আসে নি। পঙ্কজিনী যা মুখে আসে তাই ব'লে হাসাহাসি করছেন। নতুন ডাক্তারের স্বভাবও যেমন, বনলতারও তেমনি। রোজ রাত্তিরে নটা-দশটার আগে বনলতা বাড়ী ফেরে না। পৌঁছয়ে দিতে আসে ডাক্তার। বাড়ীতে মার সঙ্গে বনলতার চাপা গলার কলহ প্রতিবেশীরা রোজ রাত্তিরেই উপভোগ করতে পায়। বিয়েটা হ'য়ে যেত, কেউ কিছু বলতো না। কিন্তু ডাক্তার কি অতই কাঁচা লোক। বিয়ে সে করবে কি না!

সেইদিনই হঠাৎ কাছারি যাবার পোষাকে অমিয়মামা এসে হাজির।

“বিজু আয় তো, একটা দরকারী কথা আছে।”

দু'জনে বিজুর ঘরে গিয়ে বসার পর তিনি নীচু গলায় বললেন, “তোকে বলতে আমার বাধছে, কিন্তু না বললেও নয়।”

“কি ব্যাপার!” উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো বিজু।

আবার একটু ইতস্ততঃ ক'রে তিনি বললেন, “কাল থেকে তিন বার লোক পাঠিয়ে তোদের বনলতার মা আমাকে ডাকিয়েছেন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি। শেষটায় ভাবলাম, কোন বিপদে পড়েছেন। সকালে আমি দেখা করতে গেলাম। বললেন কি, “আমার অবিনাশের সঙ্গে আপনার ভাগ্নীর বিয়ে ঠিক ক'রে দিন।”

বিস্ময়ের সঙ্গে একটু কৌতুকের হাসি বিজুর মুখে ফুটে উঠতেই অমিয়মামা রাগ ক'রে বললেন, “হাসছিস্ তো, কিন্তু শুনলাম তোর নাকি খুব মত আছে। আমি তো বোকা ব'নে গিয়েছি।”

এবার আর কৌতুকপ্রদ মনে হোল না ব্যাপারটা। বিজু বললে, “কি মিথ্যে কথা!”

“তারা তো সবাই বললে, মা, ছেলে, মেয়ে—তোর খুব ইচ্ছে, আমরা ঠিক ক'রে দিলেই হয়? যাক্ বাঁচলাম। তুই রোজ ওখানে যাস্ কেন বল দেখি। ওসব নেহাৎ বাজেমার্কা লোক। ওসব বিদেশী ধড়িবাজ লোকের পাল্লায় প'ড়ে কোনদিন কি বিপদে পড়ে যাবি তার ঠিক নেই। তোর মামীমা শীগ্‌গির আসবেন, তোকে তখন আমার কাছে নিয়ে রাখবো।”

খুসী হ'য়ে উঠলো বিজু, সব দুশ্চিন্তা দূরে গেল। “বাঁচি তা'হলে অমিয়মামা, এখানে একটুও ভাল লাগে না আমার।”

তিনিও হেসে বার দুয়েক আঙ্গুল মটকিয়ে বিদায় নিলেন।

বনলতার মা তলে তলে এই মতলব আঁটছেন! বেশ মজা তো। প্রজাপতি তার প্রতি এত সদয় হ'য়ে উঠছেন, সে তো বুঝতে পারেনি। অবিনাশের গুণকীর্ত্তন অত ক'রে তাকে শোনাবার বিশেষ উদ্দেশ্যটা একটু বুঝতে পারলে রোজ কি আর সেখানে হাজিরা দিতে যায়? তবে ভদ্রমহিলারও বিশেষ দোষ নেই। বনলতা বাড়ী থাকে না, তবু বিজু রোজ যায় কেন? নিশ্চয়ই অকারণে নয়। সে যখন তকলীতে সুতো কাটতে জানলার বাইরে কালো হ'য়ে আসা আকাশের দিকে চেয়ে, অন্যমনে বনলতার মার পাঁচালী শুনতে শুনতে, প্রদীপ্ত একটি মুখের চিন্তায় তন্ময় হ'য়ে থাকতো, মনে মনে শত দুঃখ সয়ে তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো ধ্রুবতারার দিকে চেয়ে ভাবতো, সেখানেও এই ধ্রুবতারা ওঠে,

"Escape me !
Never !
Beloved !" এড়াবে আমারে,
কভু নহে—নহে প্রিয়! আমার চোখ যে ধ্রুবতারার মত তোমাকে অনুসরণ করবে, যেখানে থাক, যেমন ক'রেই থাক। আমার এ প্রীতি তোমার নিয়তি, দুর্ব্বার সে যে, প্রিয়!

তখন যে বনলতার মা তাকেই বউ করবার ভাবনা ভাবছেন, সে কেমন ক'রে বুঝবে?

বিমল কত কষ্ট সইছে, সেও অন্ততঃ তার সঙ্গে মানসিক কষ্টটা ভাগ ক'রে নিক, অপ্রিয় লোকের অশ্রদ্ধেয় সঙ্গ সহ্য ক'রে। এই কৃচ্ছ্রসাধনের মূল্য সে ভাল ক'রেই পেল বটে।

কিন্তু সেদিন আরো বিস্ময় তার জন্যে জমা ছিল। ইস্কুল ছুটির পর বনলতাকে ঘরে ডেকে সে খুবই লঘু ভাবে তাকে একটু সাবধান হ'তে বললে, "লোকে পাঁচ কথা বলছে, একটু বুঝে চললেই তো হয়, কেউ কিছু বলতে না পারে।"

বনলতার বোধ হয় এ নিয়ে অনেকের সঙ্গেই অনেক কথা হ'য়ে গেছে, উষ্ণ হ'য়ে বললে, "কি বাড়াবাড়ি করছি শুনি?"

বিজু বললে, "অত জানিনে ভাই। বোধ হয় রাত ক'রে ফের, আর রোজ ওখানে যাও তাই।"

"রাত ক'রে ফিরি, আর রোজ ওখানে যাই, এই তো? তা বিজয়াদি, আপনি একথা বলছেন আমাকে কোন্ হিসেবে!"

তার কথার ধরণে আশ্চর্য্য হয়ে বিজু বললে, "কেন!"

"কেন! আপনি রোজ যান না আমাদের বাড়ী? আমি থাকি না, তবু আপনার অত যাওয়া, দাদার সঙ্গে অত মেশামিশি, এ-সব কি জন্যে শুনি! আমরা তো এদেশের নই, তাই লোকে যা খুসী অপবাদ দিয়ে তাড়াতে চায়, তা ব'লে আপনার বলবার মুখ আছে আমাকে?"

ক্রোধে, অপমানে বিজুর মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু এই নীচ কলহ আর বাড়তে না দিয়ে সে শুধু বললে—তুমি এখন যাও।

"তা যাচ্ছি, কিন্তু জেনে রাখুন, পাঁচ কথা লোকে আপনাকেও বলছে। আমাদের পাড়ায় আপনার কীর্ত্তির বহু সাক্ষী আছে। নিজের চরকায় তেল দিয়ে পরোপকার করতে যাবেন।"

২

পত্রযোগে অবিনাশ নিজের মনোভাব স্পষ্ট করেই জানিয়েছে। কোন ফল না হওয়ায় একদিন মৌখিক আর্জ্জি পেশ করতে এসে হাজির হোল। "আমার চিঠির কি কোন উত্তর নেই," করুণ কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলো।

বিজু বললে, "আপনি যান অবিনাশবাবু। যা হবার তা হয়েছে। আপনার মনে একটা ভুল ধারণা জন্মিয়ে দেবার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু বিয়ে করা আমার সম্ভব নয়। ওসব আলোচনাও করতে চাই নে।"

"কিন্তু মন নিয়ে খেলা করার একটা দায়িত্ব আছে তো?" উত্তেজিত হয়ে উঠল অবিনাশ, "আমি হয়তো আপনার ঠিক যোগ্য নই, কিন্তু আমারও তো মন ব'লে একটা জিনিষ আছে।"

"ওসব আলোচনায় ফল নেই, আপনি যান। আর দেখা করতে আসবেন না। এলেও আমি দেখা কোরব না।"

সে এখন বেশ বুঝতে পেরেছিল যে ভাই, বোন, মা সব এক ছাঁচে ঢালা। সবটাই ওদের ছলনা। তা নইলে মনের সুখ-দুঃখ নিয়ে কেউ এমন নির্লজ্জ ভাবে ঝগড়া করতে আসে?

কিন্তু আর যে ভাল লাগে না। একদিন, দু-দিন ক'রে কতদিন কেটে গেল এখানে, গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন ফুরোয় না। সন্ধ্যের পর একটু যা হাওয়া দেয়। আর ক'টা দিন পরে ইস্কুলের ছুটি হ'লে তবু বাঁচা যায়। কিন্তু ছুটির পরে আবার তাকে এখানে ফিরে আসতে হবে ভাবলে মন খারাপ হ'য়ে যায়।

তাদের ইস্কুলের পাশেই সরকারী ডাক্তারের বাড়ী, সে বাড়ীর চাকর একটা ভাটিয়ালী সুর নতুন শিখেছে। দিন নেই, রাত নেই সেইটে সাধে। গানটা কিছুই নয়, তবু সুরের সঙ্গে বিজুর মন নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হয়।

তার যদি কোনদিন টাকা হয়, খুব বড় একটা নদীর ধারে সে বাড়ী করবে। গুণটানা বড় বড় নৌকো, পাল-তোলা নৌকো বেয়ে বেয়ে মাঝিরা ভাটিয়ালী গান গেয়ে যাবে। খুব হাওয়া হবে রাত্তিরে। যতদূর চাওয়া যায় আকাশ আর জল। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে জান্‌লা দিয়ে আকাশের তারা চোখে পড়বে, আর নদীর কালি-ঢালা জল। চারি দিকে অতলস্পর্শী অন্ধকারে অনেক দূর থেকে তারার আলো চোখে এসে লাগবে।

একদিন অনেক···অনেক···বছর পরে সবাই যখন ভুলে যাবে, আশা ছেড়ে দেবে তার ফিরে আসার; পুলিশও ক্লান্ত হয়ে আর অনুসরণ করবে না, তখন বিজুর বাড়ীর কাছে এক কৃষ্ণপক্ষের ঝড়ের রাত্রে এক নৌকো এসে লাগবে। একজন লোক, বয়েস হয়েছে, তবু চোখের জ্যোতি ম্লান হয় নি তার, দরজায় এসে সঙ্কেত করবে, সে দোর খুলে দেবে। একটু ক্লান্ত, একটু বিষণ্ণ মধুর চোখের দৃষ্টিতে চির পরিচয়ের হাসি ফুটে উঠবে। সে বলবে, "আমার আজ সব কাজ শেষ হয়েছে, একটু ঘুমুবো এবার।"

একদিন সকালে বিজু বসে পড়াশুনো করবার চেষ্টা করছে, এমন সময় পুলিশের দারোগা তার কাছে এসে উপস্থিত। প্রায় এক ঘণ্টা বসে তাকে নানা জেরা করলেন। তার কাছে বার বার চিঠি আসে, কলকাতায় সে কোথায় থাকতো, ফুলুবাবুর সঙ্গে তার কি আত্মীয়তা, অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করলেন। এ সব প্রশ্নের কি ভাবে উত্তর দিতে হয় সে জান্‌তো, ঠিক ঠিক বলে গেল। কিন্তু তার বড় আশ্চর্য্য বোধ হোল যে, বিমলের সঙ্গে ফুলুবাবু রাজীব, অনিল, প্রণব এদের যোগাযোগ এখনও কি পুলিশের সন্ধানে আসে নি? অথচ তার কলকাতার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে খোঁজ নিলে বিমলের সঙ্গে তার পরিচয় এতদিন তো গোপন থাকার কথা নয়। সে এত দিন যাবৎ কলকাতায় না থেকে এখানে আছে বলেই বোধ হয় তার সম্বন্ধে কোন কথা এত দিন উঠে নি। এখন খোঁজ-খবর সুরু হ'লে সবই হয় তো বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু খোঁজ পাচ্ছে কি করে?

বিকেল বেলা অমিয় মামার বাড়ী যাবার সময় পথে বনলতার ছোট ভাই চুণীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। একটা ময়লা হাফপ্যাণ্টের উপর বোতাম-ছেঁড়া সার্ট পরে সে রাস্তা দিয়ে চলেছে। সে দিনের পর থেকে প্রয়োজন ছাড়া বনলতার সঙ্গে কথা হয় নি। সেই কথা ভেবে একটু অন্যমনা হয়েছিল। এমন সময় চুণী কাছে এসে পড়লো, বললে, "বিজয়া-দি, একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে", বলে গম্ভীর ভাবে খুব কাজের লোকের মত কাছে এসে চাপা গলায় বললে, "দিদি আর দাদা আপনার পেছনে খুব লেগেছে।"

"তাই নাকি, কি করে জান্‌লে?" জিজ্ঞেস করলো বিজু।

ফিস্ ফিস্ করে চুণী বললে, "দাদাকে তো আর জানেন না! দিদির কাছ থেকে কি চিঠি নিয়ে পুলিশকে দিয়েছে, বলেছে আপনাকে জেলে পুরে ছাড়বে। আমি লুকিয়ে শুনেছি। মা বলেছে দাদার সঙ্গে আপনার বিয়ে ঘটাবেই ঘটাবে। আপনি কিন্তু যেন দাদাকে বিয়ে করবেন না বিজয়া-দি, ও লেখাপড়া জানে না, কিছু না।"

বিজু চিন্তিত হয়েছিল, তবু হেসে ফেলল। "কেন, ও তবু বি, এ পাশ করেছে। তুমি তো মোটেই পড় না।"

"কে, দাদা, বি-এ না হাতী? ম্যাট্রিক ফেল ক'রে আর পড়েছে নাকি? এই নিয়ে তো দিদির সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা ঝগড়া হয়। আচ্ছা আমি এখন যাই, কাউকে বলবেন না এ সব কথা।" বলে সে গট্ গট্ ক'রে ছুটে চলে গেল।

যাক্, সমস্ত পরিবারটায় অন্ততঃ একজনের মনে সে নিঃস্বার্থ একটু করুণা জাগাতে পেরেছিল তবে। তার মনে আত্মবিশ্বাস এল একটু। তাই বল, অবিনাশ তার পেছনে লেগেছে। পুলিশের টিক্‌টিকি। বিদ্যে না থাকলে কি হয়, বুদ্ধি আছে। আর বনলতাই তবে চিঠিচোর? কোন্ চিঠিখানা খোয়া গিয়েছে কি জানি! হয় তো আরো কতই গিয়েছে। কী সাংঘাতিক মেয়ে!

অমিয়মামাকে ব্যাপারটার কিছু কিছু আভাস সে দিল। তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। "তখুনি বলে-ছিলাম, ওরকম নীচ লোকদের ভালো করতে যাস্ নি। এখন হোল তো! নাও, কালই ছুটি নিয়ে বাড়ী চ'লে

যাও। এখানের কাজ আর নয়। এখনই ইস্তফা দিলে আবার লোকের সন্দেহ হ'তে পারে। বাড়ীতে খুব অসুখ এই মর্ম্মে দরখাস্ত তাকে তখুনি লিখিয়ে দিলেন।

(৩)

খুব বর্ষা নেমেছে ক'দিন ধরে।

সেদিনের ডাকে মঞ্জুরীর চিঠি এসেছিল। তার একটি ছেলে হয়েছে। খবর শুনে বাবা খুব খুসী হ'লেন। জ্যাঠাইমা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার অদৃষ্টে তো আর এ সব লেখা নেই। ঘরে ঘরে কত লোকের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, নাতি-নাতনী হচ্ছে। আমার মেয়ে আর জন্মে বোধ হয় বর ব'রে আসেনি। নে, হাসিস নে বাবু। ঠাট্টার কথা নয়। ভালো লাগে না।"

বৃষ্টি, বৃষ্টি। মাঠ ভরে গিয়েছে, পুকুর ভরেছে। উঠোনে জল থৈ থৈ। শোবার ঘর থেকে রান্না ঘরে বিনা কাজে যাওয়া-আসা করছে বিজু। কাপড় ভিজেছে, মাথার চুলে বৃষ্টির ফোঁটা প'ড়ে মুক্তোর মত ঝলমল্ করছে। পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। গাছপালা কাঁপিয়ে বাঁশঝাড় দুলিয়ে সন্ সন্ করছে পুবের হাওয়া। তৃষিত রুক্ষ মাটী খুব ভিজছে অবিরল বৃষ্টিতে। ভিজে মাটীর গন্ধ বাতাসে।

বৃষ্টি পড়ছে এখানে।

আসানসোলে আজ এমনি সময় বৃষ্টি পড়ছে কি? মঞ্জুর কোলে নতুন পাতার মত নতুন মানুষ। সে নিশ্চয় বৃষ্টির সুরে তার প্রিয় গান ধ'রে দিয়েছে, "তৃষ্ণার জল, এস, এসহে।" না প্রতিজ্ঞা বুঝি আর থাকে না। কতদিন হ'য়ে গেল মঞ্জুকে সে দেখেনি। সেই আই-এ পরীক্ষা দিয়ে ছাড়াছাড়ি। তার সঙ্গেই শত্রুতা, তার ছেলের সঙ্গে নয়। ছোট ছেলের সঙ্গে কি পারবার যো আছে? সব পণ তারা ভেঙ্গে দিতে জানে। মঞ্জুর ছেলের নাম সে লিখে পাঠাবে কাল, মাণিক।

বৃষ্টি পড়ছে কলকাতায়। খবরের কাগজে তাই তো লেখে। রেডিয়োতে গান হচ্ছে,

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়!"

কি বলা যায়, কোন্ কথা?

যে কথা লেখা আছে বালিশের তলে লুকিয়ে রেখে-দেওয়া চিঠিখানিতে।

কি লেখা আছে?

"বন্দে মাতরম্ শুনে শুনে কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা হয়েছে। কণ্ঠের দশাও শোচনীয়, কত পুষ্পমালা সে ধারণ করবে! তার পর অশেষ জয়গৌরবমণ্ডিত হ'য়ে ঘরে ফিরে টেবিলের ওপর যখন বিজয়া দেবীর অভিনন্দন-পত্র দেখতে পেলাম, তখন বুঝলাম যে, "হীরো" হ'তে আর বাকী রইল না। আপনার অভিনন্দন কিন্তু আন্তরিক নয়। সত্যি ক'রে বলুন দেখি, মনের নিভৃতে ঈর্ষ্যাবহ্নি কি ধিকি ধিকি জ্বলছে না। আপনার চোখের ওপর দিয়ে জেল খেটে এলাম, আর আপনি অত চেষ্টা করেও আজ পর্য্যন্ত একটি দিনের জন্যে জেলে যাবার সুযোগ পেলেন না, এতে মাৎসর্য্যের সঞ্চার হতেই পারে। তাই উপদেশ দিয়ে রাখি, অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার মাৎসর্য্যের মহৌষধ।

"আমার চিঠি পড়ে অবাক হ'য়ে ভাবছেন যে ক'মাস জেল খেটে মাতৃভাষা ও বক্তৃতা দু'টো কি ক'রে অতখানি আয়ত্ত করলাম। কিন্তু এখনই হয়েছে কি? বক্তৃতায় যে কতখানি পটুত্ব লাভ করেছি তার প্রমাণ স্বকর্ণে শীঘ্রই পাবেন। এত দিন সরকারী আতিথ্য লাভ ক'রে সাহস বেড়ে গিয়েছে। নিমন্ত্রণের ধার ধারি নে। আসছে সপ্তাহে আসছি সশরীরে, অবহিত হোন।

"চাঁপাতলিতে চাঁপা ফুল ফোটে তো? অবিশ্যি সৌরভে শুধু কুলোবে না, বিশেষতঃ ছ-মাস অমন সরকারী ভোজের পর। রান্না খারাপ হ'লে বুঝবো লেখাপড়া-জানা মেয়েদের লোকে সাধে অপবাদ দেয় না।"

* * *

বৃষ্টি ঝরছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। ভাবতে ইচ্ছে হয়, এখানে ওখানে সর্ব্বত্রই বৃষ্টি। বড় নদী, তার ধারে ছোট বাড়ী (টাকা যখন হবে)। আকাশে মেঘের ফাঁকে তারা। অন্ধকার আকাশে, জলে। অনেক রাত্রি। "খুলে দাও দোর, আমিই এসেছি, কাজ শেষ হয়েছে আমার।" * * *

সারাদিন পর বৃষ্টি ধরেছে। সন্ধ্যে হোল। আকাশে অস্তসূর্য্যের আলোয় মেঘে মেঘে আবিরের রং।

দিগন্তের সন্ধ্যারাগ মিলিয়ে যাবে। তারপরে? নিবিড় কালো রাত্রি? কিন্তু চাঁদও তো ওঠে!

সুমুখ জ্যোৎস্না রাত।

সমাপ্ত

ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের একবৎসর

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় এবং টাকা-পয়সার ইতিহাসে গত বৎসর যাহা ঘটিয়াছে তাহা সত্যই অভূতপূর্ব্ব। কিঞ্চিদধিক একবৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের পশ্চিমাংশ নাৎসী আক্রমণের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষেও অনুভূত হইতেছে—আমাদের ব্যাঙ্কিং এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে আঘাত করিয়াছে বেশ গুরুতর ভাবেই। ভারতীয় কোম্পানীর কাগজের দর দ্রুত নামিতে আরম্ভ করিল এবং উহার মূল্য শতকরা ১৫৲ টাকা কমিয়া গেল। ফলে বহু লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্ক এবং পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের আমানতী টাকা উঠাইতে আরম্ভ করিল এবং নোট ভাঙ্গাইয়া সংগ্রহ করিতে লাগিল রূপার টাকা। এই আতঙ্ক যে কিরূপ গুরুতর এবং ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা অতি সহজেই আমরা বুঝিতে পারি যখন দেখি, নোটের ভাঙ্গানী বাবত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে ৪৩ তেতাল্লিশ কোটি টাকা বাহির করিয়া দিতে হইয়াছিল। কোম্পানীর কাগজের দাম অত্যন্ত হ্রাস পাইতে থাকায় কলিকাতা এবং বোম্বায়ের কোম্পানীর কাগজের বাজার সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। অতঃপর কোম্পানীর কাগজের সর্ব্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দেওয়া হয়। নির্দ্ধারিত দামের কমে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইল। রূপার টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার আগ্রহ দমন করিবার জন্য রূপার টাকা সঞ্চয় করা ভারতরক্ষা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট অর্ডিনান্স জারী করিলেন। টাকার চাহিদা মিটাইবার জন্য এক টাকার নোট প্রকাশ করা হইল এবং কয়েক মাস পরে গবর্ণমেণ্ট নূতন টাকা বাজারে প্রকাশ করিলেন। এই নূতন টাকায় রূপার ভাগ কম।

ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি এই গুরুতর ধাক্কা যে ভাবে সামলাইয়া লইয়াছে তাহাতে আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা যে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহা অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কের প্রতি যে লোকের আস্থা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতী টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা বুঝিবার জন্য নিম্নে একটি তুলনামূলক তালিকা প্রদত্ত হইল। এই তালিকায় ১৯৪১ সনের ১৮ই এপ্রিল এবং উক্ত তারিখের একবৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৪০ সনের ১৯শে এপ্রিল তারিখ এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইবার তিন দিন পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৩৯ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতী টাকার তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকা হইতে সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে।

কোটি টাকায়

	১৮ই এপ্রিল ১৯৪১	১৯শে এপ্রিল ১৯৪০	১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯
আমানত	২৯০	২৬০	২৪৮
নগদ ও ব্যাঙ্কে জমা	৩৬	২৭	৩৩
ঋণ প্রদান	১৩৭	১৬০	১১০

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যায়, একবৎসর পূর্ব্বে আমানতী টাকার পরিমাণ যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা আমানতী টাকার পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রাক্-যুদ্ধকালীন আমানত অপেক্ষা বাড়িয়াছে ৪২ কোটি টাকা। নগদ তহবিল এবং ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে নগদ তহবিলের পরিমাণ ৬০ কোটি টাকার উপরে ছিল এবং সাময়িক ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় নগদ তহবিলের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই নগদ তহবিলের পরিমাণ ৬০ কোটি টাকার উর্দ্ধে উঠিবে।

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি সম্পর্কে আইনের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ককে তাহার 'ডিমাণ্ড লায়েবিলিটিজে'র (demand liabilites) শতকরা পাঁচ টাকা এবং 'টাইম লায়েবিলিটিজে'র (time liabilities) শতকরা দুই টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে দৈনিক আমানত রাখিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে প্রত্যেক সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কের উহাই সর্ব্বনিম্ন দৈনিক আমানতের পরিমাণ। আমানতের পরিমাণ উহা অপেক্ষা কম হইলে যে-পরিমাণ টাকা কম হইবে তাহার উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অত্যধিক হারে সুদ (interest at penal rates) আদায় করিতে অধিকারী। কিন্তু ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে আমানতী টাকার সম্পূর্ণই তুলিয়া লইতে পারে, ইহাতে বাধা দিবার কোন বিধান ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে নাই। তবে উল্লিখিত ধারা অনুযায়ী যে-টাকা কম পড়িবে তাহার উপর ব্যাঙ্ককে অত্যধিক হারে সুদ দিতে হইবে। সম্প্রতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া একটি নূতন বিধান করা হইয়াছে। এই বিধান দ্বারা 'পিনালটি'র পরিমাণ নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা এবং বাকীদার (defaulting) ব্যাঙ্ক যে-পর্য্যন্ত আমানতের নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জমা না দিবে তত দিন উক্ত ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নূতন আমানত গ্রহণ নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির কল্যাণ যাঁহারা কামনা করেন উল্লিখিত সংশোধনী বিধানের অন্তর্নিহিত নীতি তাঁহাদের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হইবে না বলিয়া আশা করি। আইনের এই নূতন বিধানের আরও একটি ভাল দিক আছে। যে সকল ব্যাঙ্ক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কৌশলে মূলধন বৃদ্ধি করিয়া সিডিউলভুক্ত হওয়ার বাতিক তাহাদের দূর হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের অর্থ-নৈতিক জীবনের স্রোতধারা এবং অন্তঃ-স্রোতধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪১ সনের ২৫শে এপ্রিল, ১৯৪১ সনের ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৪০ সনের ২৬শে এপ্রিল এবং ১৯৩৯ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন করিয়া নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া গেল। এই তালিকা হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্-যুদ্ধ-কালীন এবং একবৎসর আগেকার আর্থিক অবস্থার সহিত বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা যাইবে। ১৯৪১ সনের ১৪ই মার্চ্চ তারিখের আর্থিক বিবরণ প্রদত্ত হওয়ার কারণ এই যে, ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করার পর কতকগুলি হিসাবে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা

(কোটি টাকায়)

	২৫শে এপ্রিল, ১৯৪১	১৪ই মার্চ্চ, ১৯৪১	২৬শে এপ্রিল, ১৯৪০	১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯
ইস্যুবিভাগ				
নোট	২৮৮	২৬৭	২৫৩	২১৭
সোনা	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪
ষ্টার্লিং সিকিউরিটিজ	১০৯	১৪১	১১৭	৬০
রূপার টাকা	৩৬	৩২	৫৩	৭৬
রূপী সিকিউরিটিজ	৯১	৫০	৩৮	৩৭
ব্যাঙ্কিং বিভাগ				
নগদ	১৪	১০	১৩	৩৫
ভারতের বাহিরে রক্ষিত তহবিল	২৯	৭৭	২৪	১০
গভর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত ঋণ	১১	*	*	*
গবর্ণমেণ্টের ডিপজিট	১৪	৩৫	১২	১৫
ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক আমানত	২৮	৩৯	২২	২৭

উল্লিখিত তালিকায় নোটের পরিমাণ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ফিডিউসিয়ারী নোটের (fiduciary) পরিমাণ খুব বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক বৎসরে ২৮ কোটি টাকার নোট বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ৩ দিন পূর্ব্বে নোটের যে পরিমাণ ছিল তাহা অপেক্ষা ৬৪ কোটি টাকার নোট বেশী ইস্যু করা হইয়াছে। শুধু পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে নোটের পরিমাণ ১৪ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে।

আর একটি বিষয় যাহা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহা ভারতের বাহিরে উদ্বৃত্ত তহবিলের অত্যধিক বৃদ্ধি। যুদ্ধের জন্য সামরিক দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্তের ফলেই ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত মহাসমরের সময়েও ঠিক এইরূপ অবস্থাই হইয়াছিল। কিন্তু তখন ঐ উদ্বৃত্ত তহবিলের সবটাই রূপার স্পেকুলেশনে ব্যয় করা হইয়াছিল। এবার এই উদ্বৃত্ত তহবিলকে ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ১৯৪০ সনের ডিসেম্বর মাসেই গবর্ণমেণ্টকে আমি অনুরূপ পরামর্শ প্রদান করি। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আর্থিক বিভাগের সহযোগিতায় ১২০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে। ইহাতে সুদের দিক হইতে দুই কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। কারণ ষ্টার্লিং ঋণের সুদ শত করা ৩৲ হইতে ৫৲ পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সুদের যে হারে গবর্ণমণ্ট ঋণপত্র ইস্যু করিতে পারিবেন তাহা শত করা ৩৲ এর বেশী হইবে না বলিয়া আশা করা যায়। ১২০ কোটি টাকার মধ্যে ৩০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং ঋণ শোধ করা হইয়াছে উহাকে ভারত গবর্ণমেণ্টের কোম্পানীর কাগজে পরিবর্ত্তিত করিয়া। প্রায় ৯০ কোটি টাকা নগদ পরিশোধ করা হইয়াছে। এই বিরাট ঋণ শোধের কাজ গত মার্চ্চ মাসের সমগ্র শেষ সপ্তাহ ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ৪০ কোটি টাকার রূপী সিকিউরিটি প্রদান করিয়া, সরকারী আমানতী টাকা হইতে ২৩ কোটি টাকা উঠাইয়া লইয়া এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ১৭ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত নগদ টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার ফলে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা উল্লিখিত তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।*

* এ সম্বন্ধে ১৩৪৮ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'মাতৃভূমি'তে প্রকাশিত 'ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত ব্যবস্থার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লায়েবিলিটিজের সহিত মজুত তহবিলের আইনগত অনুপাতের পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই জন্য ফেব্রুয়ারী মাসে একটি অর্ডিনান্স জারী করা হয়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে-পরিমাণ ভারত গবর্ণমেণ্টের রূপী সিকিউরিটি রাখিতে পারে উল্লিখিত অর্ডিনান্স দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। উক্ত অর্ডিনান্স দ্বারা এই বিধান করা হইয়াছে যে, রূপী সিকিউরিটি, রৌপ্য মুদ্রা, এবং আভ্যন্তরীণ 'বিল অব একসচেঞ্জ' দ্বারা মোট সম্পদের ত্রি-পঞ্চমাংশের অনধিক রাখা চলিবে।

সমগ্র বৎসর ধরিয়া প্রচুর পরিমাণেই অর্থের যোগান দেওয়া হইয়াছে। খুব দৃঢ়তার সহিত বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। অল্প সময়ের মেয়াদী ঋণ যদি আর্থিক অবস্থার পরিমাপক হয়, তাহা হইলে অবস্থার কোন অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৪০ সনের জানুয়ারী মাসে ট্রেজারী বিল দ্বারা গবর্ণমেণ্ট গড়ে শতকরা ১৷৵০ আনা সুদে তিন মাসের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সুদের হার ক্রমেই নামিতে থাকে এবং ১৯৪০ সনের অক্টোবর মাসে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় দশ আনা। ইহার পর ১৯৪০ সনের নবেম্বর মাসে সুদের হার ১৲৫০ পাইতে উঠে এবং উহা পুনরায় ১৯৪১ সনের ফেব্রুয়ারীতে দশ আনায় নামে। এখন সুদের হার প্রায় তের আনা।

গত যুদ্ধের সময় সুদের হার খুব বাড়িয়া গিয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্টকে শতকরা ৬৲ টাকা হারে সুদেও অধিক দিনের মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সুদের হার বৃদ্ধির কোন লক্ষণ দেখা যায় না এবং শতকরা ৩৲ টাকা সুদে গবর্ণমেণ্ট প্রচুর ঋণ পাইতেছেন। ভারতবর্ষের দিক হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধ শতকরা তিনটাকা হারের।

মাষ্টার-মশায়

(গল্প)

শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈলজার এমন জোর তলবের কারণ বুঝতে পারলাম না।

না বুঝলেও যেতে হ'ল ওদের ওখানে। গিয়ে দেখি শৈলজা বাড়ী নেই। কেউ কিছু না বললেও বোঝা গেল, বাড়ীতে একটা কিছু উৎসবের আয়োজন চ'লেছে। সামনের দরজা ফুল-পাতা দিয়ে সাজানো, চাকরগুলোর হাকডাক, ধূপধুনোর গন্ধ—সব জড়িয়ে একটা উৎসবের আবহাওয়া।

এমন সময় হন্ হন্ ক'রে শৈলজা বাড়ী ঢুকলো। পিছনে একটা ঝাঁকা-মুটের মাথায় কয়েকটা ফুলের টব, আর একটা তুলসী গাছ বলেই মনে হ'ল। শৈলজার খেয়ালের অন্ত নেই—এ আবার কোন্ খেয়াল কে জানে।

আমার দিকে চোখ পড়তেই শৈলজা লাফিয়ে উঠল, "আরে, সরোজ এসে পড়েছ, আমার চিঠি পেয়েছিলে? একেবারে উপরে উঠে এস ভাই।"

উপরে গেলাম। উপরের ঘরটিতে আগে তো কতবারই এসেছি, কিন্তু আজ আর এ ঘরটিকে চিনবার উপায় নেই। সারা ঘর জুড়ে ফরাস পাতা হ'য়েছে, এক কোণে কথক ঠাকুরের বস্‌বার মত খানিকটা উঁচু যায়গা, তার উপর ধূপধুনো, প্রদীপ জ্বলছে, পুষ্পপাত্রে ফুল-চন্দন। নানা বয়েসের লোকের মধ্যে বৃদ্ধের সংখ্যাই বেশী মনে হ'ল। আসল উদ্দেশ্য না বুঝলেও খানিকটা আন্দাজ ক'রে নিলাম।

আড়ালে ডেকে শৈলজাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি শৈলজা?"

শৈলজারও ফুরসৎ নেই, বললে, "শোন নি, মানে আমাদের মাষ্টার মশায় মানে—বিশুর মাষ্টার—মানে বেশ পণ্ডিত লোক—গীতা পাঠ করবেন।—আসুন মাষ্টার মশায়, মানে—এক রকম সব যোগাড়।"

শৈলজার মানে বুঝতে আর বাকী রইল না—ওর জীবনটাই একটা খেয়ালের ইতিহাস। যা হোক মাষ্টার মশায়কে দেখা গেল। দোহারা গড়ন, লম্বা নয় বরং একটু বেঁটে,—বয়স কত হবে বলা কঠিন, তিরিশ, পঁয়ত্রিশ—চল্লিশও পেরিয়ে যেতে পারে। খদ্দরের একটা পাঞ্জাবী গায়ে—নিতান্ত ভাল মানুষ ব'লে মনে হ'ল।

আলাপ করবার ইচ্ছে হচ্ছিল, হ'য়ে উঠল না। আরম্ভের সময় উতরে গেছে, সুতরাং মাষ্টার মশায় আসনে গিয়ে বসলেন। পাঠ আরম্ভ হ'ল। বেশ ভাবময় গলা। বলবার ভঙ্গীটি ভারি চমৎকার। ব্যাখ্যা শুনলাম দু'একটা শ্লোকের—বেশ পণ্ডিত লোক বলেই মনে হ'ল।

শৈলজার ছেলে দু'বার চা খাবার জন্যে ডেকে গেছে, উঠি উঠি ক'রেও উঠতে পারছি না। গীতার বক্তব্য যতই কঠিন হোক, একঘেয়ে চাকরী-জীবনে এও একটা বৈচিত্র্য।

ভিতরে যেতেই শৈলজার স্ত্রী বললেন—"কেমন, কর্ত্তার নতুন খেয়ালের পরিচয় পেলেন তো? কেমন লাগলো?"

সত্যি কথাই বললাম, "গীতার ভক্ত না হ'লেও বেশ ভালই লাগলো, শৈলজার এবারকার খেয়ালটা বেশ ভালই হ'য়েছে বলতে হবে।"

চা ঢালতে ঢালতে শৈজার স্ত্রী বললেন, "এবারকার খেয়ালের ইতিহাস শুনেছেন?"

শৈলজার সব খেয়ালের পিছনেই একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকে। এবারকার ইতিহাসটুকুও শুনলাম। ভদ্রলোক নিজেই শৈলজার নিকটে আসেন একটা টিউসানের জন্য। প্রথমটা ছেলের মাষ্টার হিসেবে রাখলেও শেষে এর গুণের পরিচয় পেয়ে শৈলজা নিজেই ওঁর ছাত্র হ'য়ে উঠেছে—গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন,

নানা ধর্ম্মের কথা আলোচনা হয়। ভদ্রলোক আই-এ পাশ, সংস্কৃত পাশও দু-একটা আছে; অবস্থা শুনলাম না-খেতে পাওয়া পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। মাষ্টার মশায় এখন পঁচিশ টাকা পাচ্ছেন, শৈলজার কাছে তাও শুনলাম। কুড়ি-পঁচিশ টাকা শৈলজার পক্ষে একটা বড় কিছু না, কিন্তু থাকলেই বা ক-জন দেয়?

একটু পরেই আবার হলঘরে গেলাম। এর মধ্যে আরও অনেক লোক এসেছে। মাষ্টার মশায়ের চোখ দুটো ছল ছল করছে, তার উপর প্রদীপের আলো পড়ে সুন্দর দেখাচ্ছে মুখখানা।

কি একটা শ্লোকের ব্যখ্যা হ'চ্ছে তখন—বলবার ভঙ্গীটি চমৎকার—"শ্রীভগবান বলছেন, সমুদ্র দেখেছ অর্জ্জুন? সাগর? কত জল এসে পড়েছে তার বুকে, অথচ পৃথিবীটা ডুবে যাচ্ছে না—কেমন অচলভাবে সীমা রেখে যাচ্ছে! আর নদীগুলো কত দেশদেশান্তর থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে—যতক্ষণ সাগরের বুকে এসে পড়েনি, ততক্ষণ কি ব্যাকুলতা, তার পর যখন সাগরের বুকে মিশে গেল, তখন আবার শান্ত, স্তব্ধ..."

সেদিন সাংখ্যতেই শেষ হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর আলাপ হ'ল। জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগলো?"

"খুব ভালই লেগেছে; সবটাই শোনবার ইচ্ছে রয়েছে—নানা কাজের চিন্তায় থাকতে হয়, হয়ত হ'য়ে উঠবে না।"

"কাজ ভাল, কিন্তু কাজের চিন্তা খারাপ; দেখুন, জগতের কোনও কাজই আমাদের চিন্তার অপেক্ষা রাখে না—'মা ফলেষু' কথাটার ওপর বিশ্বাস রাখবেন।"

কথা বলার ধরণটাও কেমন যেন অদ্ভুত।

এর পর ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও দু-একটা কথা বললেন। বেশ জানা-শোনা লোক।

দিন সাতেক পরেই বোধ হয় শৈলজার বাড়ীতে গীতার দ্বিতীয় আসর বসবার কথা ছিল। যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও হয়ে উঠল না। বাড়ী থেকে মায়ের চিঠি এল—বহু কাল বাড়ী যাই নি।

দু-দিনের ছুটী পেয়ে একাই বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ী গিয়ে উঠলাম রেল-ষ্টেশন থেকে দু'মাইল হেঁটে। কত কাল পর বাড়ী ফিরলাম, মার কথা আর ফুরোয় না।

সে গাঁ আর নেই। কত পরিবর্ত্তনই না হয়েছে এই ক'বছরে। কি ভীষণ স্তব্ধ, জনবিরল—! অর্দ্ধেক লোক গ্রাম ছেড়ে গেছে, যারা আছে তারাও মরছে নানা রকমে: অনাহারে, ম্যালেরিয়ায়, মামলা-মকর্দ্দমায়—।

তারাপদ কাকার বাড়ীর দিকে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। বাড়ীর প্রায় কাছে এসে পড়েছি, এমন সময় একটি মেয়েকে ঘড়ায় ক'রে জল নিয়ে যেতে দেখে একটু সরে দাঁড়ালাম। মেয়েটি কিন্তু পাশ কাটাবার চেষ্টা না করে সহজ ভাবে আমার মুখের দিকে চাইলে। এবার আর চিনতে বাকী রইল না।

"কবে এলে সরোজ-দা?"

"আজই এসেছি রে, তোর এ কি চেহারা হয়েছে!"

মাধুরীর বিয়ের খবর মায়ের চিঠিতে পেয়েছিলাম, তখন বোধ হয় আমি এলাহাবাদে। কত পরিবর্ত্তন—কাকা মারা গেছেন, মাধুরীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ওর একটা মেয়ে পর্য্যন্ত হয়েছে। ভাবে আভাষে বুঝলাম, অভাবেরও চরম সীমা।

মেয়ের কান্না শুনে মাধুরী ঘরের ভিতর উঠে গেল। এই অবসরে খুড়িমার কাছে মাধুরীর বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। খুড়িমা কেঁদে উঠলেন।

বিয়ের কথা যা শুনলাম তাতে মনে হ'ল মাধুরীর সারাজীবন দুঃখের বরাত ছিল। কাকা খুঁজে পেতে ভাল পাত্রই যোগাড় করেছিলেন! ছেলে পাশ-করা, কলকাতায় চাকরী করত, স্বভাব-চরিত্র ভাল; তার পর বিয়ের একবছরের মধ্যে ছেলেটির চাকরী যায়! চাকরী যাবার পর বার দুই এসেছিল, তার পর আজ বছর দুই খোঁজ নেই! চিঠিপত্র দিলেও উত্তর আসে না!

মাধুরী মেয়েটাকে আনিয়া মায়ের কোলে দিয়া গেল! মেয়ে দেখতে খুব সুশ্রী হয় নি!

খুড়িমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "দুঃখু কি আর এক রকমের, এদিকে বাপের হদিস নেই, হয়েছে এক মেয়ের ঢিবি···।"

বললাম, "মেয়ে হয়েছে তার এখুনি কি? ওর বাপও দেখবেন এসে পড়বে।"

"লক্ষ্মী ছাড়া মেয়ের কপালের জোরে সে ছোঁড়া হয় ত

যার আসবেই না। কত কপালের জোর, বিয়ে হ'তে হ'তেই, চাকরী গেল ছোঁড়ার।"

বললাম, "এর উপর আর ওকে বকবেন না।"

মাধুরীকে দেখছিলাম দূর থেকে। বিয়ের পর সবাই একটু আধটু বদলায়। কিন্তু এত পরিবর্তন! ও ছিল দা হাস্যময়ী—গম্ভীর হ'তেই জানত না। কারণে অকারণে কে হাসিটাই হাসত। মায়ের কাছে এর জন্যে লাঞ্ছনাও য়েছে কম না। আজ মাধুরীকে রোয়াকের এক কোণে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে আগেকার কত কথাই মনে পড়ে যায়।

খুড়িমা তখনও আপন মনে বকছেন, "কর্তার সাধ ছিল পাশ-করা ছেলে ঘরে আনবেন; সাধ মিটিয়ে তিনি ভালয় ভালয় স্বগ্যে গেছেন, এখন আমি ভুগি ঐ অলুক্ষুণে মেয়ে নিয়ে—।"

মাধুরী ততক্ষণ প্রদীপ জেলে শাঁক বাজাচ্ছে। খুড়িমা হাকলেন, "তুলসীতলায় পিদিম দেখালি নে? এক কথা রোজ রোজ কতবার বলতে হবে।"

খুড়িমার অনুমতি নিয়ে এবার উঠলাম। মাধুরীও ততক্ষণ প্রদীপ হাতে উঠোনে নেমেছে। ওর মুখের দিকে চাইতে পারলাম না—আমার সামনেই খুড়িমা এত বকলেন ওকে। মাধুরীও কোনও কথা কইলে না, পাশ কাটিয়ে স'রে দাঁড়ালো।

মাধুরীকে সোজাসুজি ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করব মনে ক'রে পরের দিন আবার গেলাম ওদের বাড়ীতে। গিয়ে দেখি, রোয়াকের উপর পড়ে মেয়েটা কাঁদছে, মাধুরী বা খুড়িমা কেউ নেই।

মাধুরীর স্বামী আর যাই হোক, ভয়ানক নির্দ্দয়। দু'বছর খোঁজ নেই। ছেলেমেয়ে হ'লেও তো অনেকে জড়িয়ে পড়ে। হয় ত বদমায়েস লোক, চাকরীর কথাটাই মিথ্যে। কাকা যেমন ভালমানুষ ছিলেন, ওঁকে ঠকানো মোটেই শক্ত না। কিন্তু মাধুরী, সেও কি বোঝে নি—বুঝলেই বা কি করতে পারে সে? ক'টা বছরেকী হয়ে গেল, বিয়ের ব্যাপারটাই দুঃস্বপ্ন। অথচ আসলে যে সেটা স্বপ্ন নয়, মেয়েটাই তার সাক্ষী।

এক একদিন গিয়েছে, খুড়িমার মার খেয়ে মাধুরী সারাদিন আমাদের বাড়ী লুকিয়ে আছে। মাকে কি ক'রে জব্দ করা যায়, তার পরামর্শ চেয়েছে।

আমি বলতাম, "দাঁড়া, খুব বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোকে অনেক দূর রেখে আসব।"

চোখ দুটো আরও বড় বড় করে মাধুরী বলত, "মা সেখানেও যাবে সরোজ-দা।"

এ সব অনেক দিন আগেকার কথা। অনেক বড় কথা ভুলে গেছি, কিন্তু এই ছোট্ট কথাটা আজও মনে আছে। এ সব মাধুরীর মনে থাকবার নয়। বড় লোক ছেড়ে বিয়ের সময় কোনও সাহায্যই করতে পারি নি।

এমন সময় মাধুরী বাড়ী এল, হাতে এক রাশ কাঁথা-কাপড়। সেগুলো মেলে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলে, "মাও বুঝি বাড়ী নেই?"

"দেখছি না তো খুড়িমাকে।"

"বাঁচা গেছে। মার কান্নার জ্বালায় টিঁকবার জো নেই। জানো সরোজ-দা, মা রাত্রে মোটে দেখতে পায় না। জিতেন ডাক্তার বলছিল কাঁদতে কাঁদতে অমন হয়েছে।"

কাপড় ছেড়ে এসে মাধুরী রোয়াকের খুঁটি ধরে এসে দাঁড়ালো।

"একটা কথা বলব সরোজ-দা? দুটো মুড়ি দেব—ঘরে ভাজা?"

"জিজ্ঞেস না করে বুঝি দেওয়া যায় না?"

মাধুরী এবার লজ্জিত হয়ে চলে গেল। ওর এই সঙ্কোচের কারণ বোঝা শক্ত নয়; ওর ধারণা আমি আর সেই মানুষটি নেই, কত দিন কত দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি ও খবর রাখে।

একটু পরেই মাধুরী এক বাটী মুড়ি আর কাঁটাল-বীচি ভাজা আমার সামনে এনে দিল। ছোট কথাটাই কেমন মনে থাকে, নইলে কাঁটালের বীচি মনে থাকবার কথা নয়।

কি বলি, কি বলি ভাবতে ভাবতে প্রথমেই বললাম, "আচ্ছা সুরেনবাবু যে ভাললোক না, তা কোনও দিন বুঝতে পারিস নি?"

মাধুরী হয়ত রোয়াকের এক কোণে বসতে যাচ্ছিল,

আবার উঠে দাঁড়ালো, বললে, "সরোজ-দা, মায়ের পাল্লায় পড়ে গাঁয়ের অনেক কর্ত্তার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়ে গেছে, তোমার সঙ্গে অন্য কথা হোক। এমন দিন যায় না যে দিন পথে ঘাটে একজন অন্ততঃ ঐ কথা না তোলে।

বুঝলাম প্রথমেই ও প্রশ্নটা ঠিক হয় নি। অন্য কথা পাড়লাম।

"তোর স্বামীর এত দিন খোঁজ নেই, কথাটা আমাকে জানানো উচিত ছিল?"

"আমিই জানাতে দেই নি সরোজ-দা।"

"এটা তোর ছেলেমানুষি।"

"তুমি শুনলে এ নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলবে তাই। আমার বিয়ের সুবিধের জন্যে বাবাকে একবার গানের মাষ্টার রাখতে বলেছিলে মনে আছে?"

"পুরোনো কথা তুলে তুই শুধু আজ আমাকে আঘাত ক'রছিস মাধুরী।"

ওর মুখখানা এবার অন্ধকার হ'য়ে গেল। ঢোক গিলে বললে, "আমি তা বলি নি সরোজ-দা, তুমি সব জিনিষ নিয়ে খুব ভাবতে, খুব চেষ্টা ছিল, তাই।

খুব স্পষ্ট না হলেও ওর বক্তব্য আমি বুঝলাম। আর বুঝলাম, ওর সরল মনটা আজও তেমনি সরল আছে; সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানুষকে বারবার ভুল বুঝেই ফেলছি।

আমার বাড়াবাড়ির ইতিহাস যা শুনলাম, তা অস্বীকার করব কেমন করে? এই সঙ্গে যদি বলত—খুব বড় লোকের সঙ্গে অনেক দূরে বিয়ে দেবো বলেছিলাম?

ভাবতে ভাবতে মুড়িগুলো খেয়ে ফেলেছি। বললাম, "আর দুটো মুড়ি দিবি নাকি?"

"আর মুড়ি খেলে ভাত খেতে পারবে না, বাড়ী গেলে বকুনি খাবে সরোজ-দা।"

"বকবে কে? তোর বৌদি তো আসে নি।"

"কেন জেঠিমা বুঝি বকতে পারেন না?"

কথাটা বলেই মাধুরী যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লো। তার পর হঠাৎ কি ভেবে হেসে উঠল। সে-কি হাসি, মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে মুখ লাল হ'য়ে উঠল। ঘরের ভিতর গিয়ে আমার জন্যে একটু গুড় আর জল নিয়ে এল। তখনও তেমনি হাসছে।

সেই আগেকার মত বাধাহীন সহজ সরল হাসি।

বললাম, "এত হাসছিস কেন মাধুরী?"

"হাসছি কেন?" বলতে বলতে মুখের কাপড় সরিয়ে একেবারে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

সামনে এসে বললে, "তোমার ভগ্নীপতি এক দিন ঐখানে বসে মুড়ি খাচ্ছিল, আমি কাছে আসতেই ঐ রকম আস্তে আস্তে বললে, আর দুটো মুড়ি দেবে নাকি—মা উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল কিনা।"

কথাটা কোনও রকমে শেষ ক'রে মাধুরী হাসতে হাসতে ঘরের ভিতর চলে গেল। এত তুচ্ছ কারণে মানুষ এত হাসতে পারে!

একটু পরেই আবার ফিরে এল। এই মেয়েটাই যে, একটু আগে হাসছিল, কে বলবে? যে স্মৃতি ওকে হাসিয়েছিল, সেই স্মৃতিই হয়ত আবার ওকে গম্ভীর ক'রে তুলেছে।

ভাবছিলাম, মাধুরীর স্বামীকে খুঁজে বের করবার ভার এখন সম্পূর্ণ আমার। আর সবার খোঁজা একরকম শেষ হয়েছে। রোয়াকের এক কোণে মাধুরী বসে রইল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বললে, "সরোজ-দা, একটা কাজ তোমাকে করতেই হবে এবার।" একটু থেমে বললে, "কলকাতায় নাকি লোক খুঁজে বের করা যায় না?"

"এ খবরটা কে দিল তোকে?"

"ওপাড়ার নিতাই কাকা কলকাতায় চাকরি করে, বিপিন-দা দুধ বেচতে যায়, ওরাই বলছিল।"

এ প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্যটুকু বুঝতে বাকী রইল না।

সব কথা আমিই বললাম, "তোকে নতুন ক'রে বলতে হবে না কিছু, তোর স্বামীকে খুঁজে বের করার ভার আমি নিলাম; তোদের দুঃখের ভাগ নিতে দিস্ নি এত দিন, তার জন্যে অন্ততঃ আমায় দুষতে পারবি না। আমার অনেক কথাই রাখতে পারি নি জানি, এখন আর সে-সব ভেবে আপশোষ ক'রে লাভ নেই—তবে এটা জেনে রাখ, আজ যখন দুঃখের ভাগ দিতে চাচ্ছিস, তখন অন্ততঃ চুপ ক'রে বসে থাকব না।"

মাধুরীর চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠেছে, আমার দৃষ্টি

এড়িয়ে গেল না। এই চোখের জলই ওর জীবনে এখন বড় সত্যি, অথচ হাসির আড়ালে সেই কান্নাটুকু চেপে রাখবার কি প্রয়াস।

এর পর অনেক কথা ও নিজেই বললে। মনে হ'ল মাধুরী ওর স্বামীকে মোটে চিনতেই পারে নি। লোকটা বড় বড় উপদেশ দিত ওকে, পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকত, ফলে মাধুরী লোকটিকে খারাপ ভাবতেই পারে না।

পরের দিন কলকাতায় রওনা হলাম।

বাড়ী ঘুরে সোজা উঠলাম শৈলজার বাড়ী। ওকে সব কথা খুলে বললাম। কাগজে বিজ্ঞাপন দেব ঠিক ক'রে নাম আর কলকাতার মেসের ঠিকানাটা নিয়ে এসেছিলাম।

অদ্ভুত যোগাযোগ। নাম-ঠিকানা শৈলজার হাতে পড়তেই ও লাফিয়ে উঠল, বললে, "সুরেন চাটুয্যে, দু-নম্বর মতি সর্দ্দারের লেন, আরে এ যে আমাদের মাষ্টার মশায়, মানে, আগে থাকৃতেন ঐ ঠিকানায়,—কানাই শীলের গলিতে—মানে এখন থাকেন।"

কত কথার মধ্যে মাষ্টার মশায়ের নামটি জানা হয়নি এতদিন। মাষ্টার মশায় মাধুরীর স্বামী। কথাটা কোন রকমেই আন্দাজ করতে পারিনি।

ভাবছিলাম, কত তাড়াতাড়ি মাধুরীকে খবরটা পাঠিয়ে দেওয়া যায়। শেষে টেলিগ্রাম করে দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। বাড়ী ফিরে শুনলাম, মাষ্টার মশায় দু'বার এসেছেন আমার খোঁজে, আবার আসবেন বলে গেছেন।

না খেয়ে মাষ্টার মশায়ের জন্যে ব'সে থাকলাম। মাধুরীও ঘণ্টাখানেক বাদে খবরটা পেয়ে যাবে। ওর আনন্দের খানিকটা কল্পনা ক'রে নিয়ে আমি নিজেই আত্মহারা হ'য়ে উঠলাম। কতদিন কত দেবতার পায়ে এরই জন্যে ও নীরব প্রার্থনা জানিয়েছে; ওর মনে সেই সব দেবতার পাশে আমিও হয়ত একটা আসন পেয়ে যাব।

মাষ্টার মশায় যখন এলেন তখন অনেক রাত। আমাকে এত খোঁজার কারণ শুনে হাসি পেল। ভবানীপুরের কোথায় যেন কে এক বড় পণ্ডিত কাল থেকে ভাগবত পাঠ করবেন, তাই শুনবার জন্যে আমাকে বলতে এসেছেন। আমার ভিতর কোথায় এমন ভাগবত-নিষ্ঠার পরিচয় পেলেন কে জানে। লোকটা সত্যিই সরল, মাধুরী ভুল বোঝেনি।

মাষ্টার মশায়ের কথা শেষ হ'লে আমার কথা পাড়লাম।

"আপনি ফকিরহাটে বিয়ে ক'রেছেন, আমাকে এতদিন বলেন নি তো?"

"সে কথা কেন বলুন তো?"

"আমারও যে বাড়ী ঐখানে; আপনি তারাপদ চক্রবর্ত্তীর মেয়েকে বিয়ে ক'রেছেন তো?"

"আজ্ঞে।"

লক্ষ্য করলাম মাষ্টার মশায় যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছেন। তারপরেই বললাম, "আমি মাধুরীকে ছেলে-বেলা থেকেই চিনি।"

অনেকক্ষণ আর কোনও কথা হ'ল না—লোকটা একেবারে তন্ময় হ'য়ে রইল।

"আপনি কতদিন ফকিরহাটে যান নি!"

"কাশী যাবার আগে বোধ হয় একবার যাই।"

"তারপর আর খোঁজ খবর রাখেন না!"

"না খোঁজখবর আর কি··· আছে সব ভালই হয়ত।"

"ওদের জন্যে আপনার কষ্টই হয় না?···থাকেন তো এখানে মেসে পড়ে।"

"কষ্ট আর কি? ভাবলেই ভাবনা—মানে সেই—ভাববার তুমি কে, সব ভাবনারই মূলে যিনি ভাব তুমি তাঁকে—ভাবলেই ভাবনা। আপনি চলে যাবার পর খগেন শাস্ত্রীর পাঠ হ'ল গীতামন্দিরে, অমন সুন্দর পাঠ অনেকদিন শুনিনি আচ্ছা, রাত হ'ল উঠি সরোজবাবু।"

উঠতে দিলাম না। আরও ঘণ্টাখানেক বসিয়ে মাধুরীর অনেক কথাই জোর ক'রে শোনালাম। কি জানি বুঝতে পারি না, যে লোক এত বিচক্ষণ, এত সরল, এত শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ যাঁর কণ্ঠাগ্রে, সে লোক এত অবিবেচক হয় কি ক'রে! অথচ সব কথা বলার পর মানুষটা যেন একটু বদলে গেল—অনেক কথা নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন।

ব'ললাম, "তা হ'লে যান, ওদের একটু দেখাশোনা ক'রে আসুন"

"গেলেও হয়।"

"কবে যাবেন বলুন।"

"গেলেই হ'ল একদিন।"

"একদিন না, কালকেই যান।"

"কালকেই?"

"হ্যাঁ কালকেই, টাকা না থাকে বলুন।"

"কাল শৈলজা বাবু দিয়েছেন।"

ভবানীপুরের পাঠ আরম্ভ হবে কাল, সুতরাং কালকেই যে পাঠাতে পারব এতটা প্রথমে আশা করিনি। পৌঁছেই একখানা চিঠি দিতে বলে দিলাম।

পাঁচ-সাত দিন পরে মাধুরীর নিজের হাতের একখানা চিঠি পেয়ে আশ্বস্ত হ'লাম। সুদীর্ঘ চিঠি। মাধুরীর এ চিঠি লিখতে অনেকদিন লেগেছে। একটা কথাই যেন সারা চিঠিতে লেখা—'আমার খুব আনন্দ হ'য়েছে'—যে কথাটি চিঠির কোথাও লেখা নেই।

মাধুরীর চিঠিখানা পাওয়ার পর প্রায় মাস ছয়েক কেটে গেছে। এর মধ্যে আবার তিন মাসের জন্যে কানপুর বদলি হ'য়ে গেলাম। নতুন জায়গায় নানা কাজের চিন্তায় ওদের কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। আবার মাঝে মাঝে মনে যে হয়নি এমন না—গঙ্গার ঘাটে একদিন একটি মেয়েকে দেখে মাধুরীর কথা মনে পড়ে গেল—সেদিন অনেক রাত ওদের দু'জনের কথা ভেবেছি। কাজের তাড়ায় কলকাতায় ফিরে শৈলজার সঙ্গে দেখা করতেও ফুরসুৎ পাইনি।

অফিস থেকে ফিরবার পথে শৈলজার সঙ্গে একদিন হঠাৎ দেখা। অনেক কথার পর শৈলজা মাষ্টার মশায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার ধারণা ছিল মাষ্টার মশায় ফিরেছেন অনেকদিন, অথচ শুনলাম আজও ফেরেন নি!

মেসে খোঁজ নিলাম—কেউ কিছু বলতে পারে না। ব্যাপার কি? এত দিন কি শ্বশুর-বাড়ীতেই, না আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা!

দিন কয়েক পরে বাড়ী থেকে চিঠি পেলাম, মাষ্টার আজও ফকিরহাটে সে খবরও এল। লোকটা নানা দিক দিয়ে অদ্ভুত। কথাবার্ত্তায়, বেশভূষায়, হাঁটা চলায় সব দিক দিয়েই একটা বৈশিষ্ট্য মনে ছাপ ধরিয়ে দেয়। যাওয়ার সময় তো এ রকম জোর ক'রেই পাঠালাম, আবার গিয়েও ফিরবার নাম নেই ছ'মাস।

পূজোর ছুটীতে এবার অনেকদিন পর সস্ত্রীক বাড়ী গেলাম। মাধুরী খবর পেয়ে ছুটে এল। তার বৌদির সঙ্গে কথা শেষ হ'লে নিতান্ত শান্ত ভাবে আমার নানা খবর নিল। ওকে যতটা খুশী দেখব মনে ক'রেছিলাম, মুখ দেখে কিন্তু তা মনে হ'ল না; ভারি আশ্চর্য্য লাগছিল, এত কথার মধ্যে ও মাষ্টার মশায়ের কথাই তুললে না।

"সুরেনবাবু কেমন আছেন মাধুরী?"

"বেশ আছেন।"

এ ধরণের সংক্ষিপ্ত উত্তর আমি আশা করিনি। আসলে কোনও উত্তরই চাইনি—সুরেনবাবুর কথা তোলাই আমার উদ্দেশ্য। অথচ, ভাল ক'রে কথা তুলবার আগেই মাধুরী চ'লে গেল।

বিকেল বেলা ঘুরতে ঘুরতে গেলাম ওদের বাড়ীর দিকে।

বাড়ী ঢুকতেই খুড়িমার সামনে পড়ে গেলাম। এবার আবার কান্নাকাটি করার অর্থ বুঝতে পারলাম না। মাষ্টার মশায়ের কথা তুলতেই খুড়িমা একেবারে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন।

কান্নার বেগ থামলে বললেন, "পোড়া কপাল আমাদের, নইলে ঐ হাবাতে মিনসে আমাদের ঘাড়ে চাপে—ঘোড়া খোঁড়া হয়েছে, কাজ নেই, কম্ম নেই, দিন রাত ঐখেনে ব'সে ব'সে বুড়বুড় করছে।"

খুড়িমার আক্রমণ সবটাই মাষ্টার মশায়ের উপর। ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে বোধ হয়, নইলে আমার সামনেই খুড়িমা গালিপর্ব্ব শেষ ক'রে ফেললেন।

রোয়াকের এক কোণে পাতা একটা তক্তপোষের উপর মাষ্টার মশায় বসে আছেন, হাতের সঙ্গে জড়ানো একটা হরিনামের ঝুলি, গায়ে সেই খদ্দরের জামা। নিতান্ত নিরীহ লোকটি।

খুড়িমা বোধ হয় আর এক দফা আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মাষ্টার মশায়ের কাছে বসলাম। মালা নিয়ে একেবারে তন্ময় হ'য়ে আছেন।

বললাম, "কেমন আছেন মাষ্টার মশায়?"

"এই যে আসুন, ভাল আছি, বেশ ভালই আছি।"

"কলকাতায় যাবেন না?"

"না, বেশ কেটে যাচ্ছে, অনেক সময় পাচ্ছি, তাই মালা আরম্ভ ক'রলাম।"

"তাতো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু পাঠতো শোনা হচ্ছে না?"

"শ্রীহরির ইচ্ছে থাকলে হবে; এখেনেও ক-দিন পাঠ করেছি, শুনতে চায় না কেউ। সংকীর্ত্তন আরম্ভ করব ভাবছি।"

এর উপর আবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলে খুড়িমার রাগটা কি ভাবে প্রকাশ পাবে তাই ভাবছিলাম।

ঘরের ভিতর থেকে খুড়িমার গলা শোনা যাচ্ছিল—মাধুরীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছেন বোধ হয়। দু-একটা কথা বোঝা গেল—বস্তা বস্তা গিলতে দিচ্ছ বলি এসব আসে কোথেকে…।

ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ঝগড়াটা আমায় শুনিয়ে না করলেই পারতেন খুড়িমা। সেদিন মাধুরী আর লজ্জায় আমার সামনে আসতেই পারলে না। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আর কয়েকটি কথা বলে চ'লে যাচ্ছিলাম—খুড়িমা আবার নিয়ে গিয়ে বসালেন রান্নাঘরের দাওয়ায়।

বললেন, "আবার হতভাগার গুণপনা শোনো বাবা, মেয়েটাকে বলে কি না ঐ রকম দিনরাত জপ করতে। আবার ক'দিন দেখছি মাছ ছাড়ানোর জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে—মর মুখপোড়া, তুই থাকতেই মাছ ছাড়বে কেন রে…।"

খুড়িমার মুখদোষ আছে তা আমি কেন পাড়ার সবাই জানে। কিন্তু আমি যেন আর বসতে পারলাম না, এক রকম জোর ক'রেই উঠে পড়লাম।

আমি উঠলেও খুড়িমা ছাড়বার পাত্র না, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত এলেন। সারা পথ আরও কত কথা।

"তোমায় বলব কি বাবা, রাত দুপুরে উঠে শুনি হরিহরি করছে—রাতেও চোখে ঘুম নেই।"

রাস্তার মোড়ের জামতলাটাতে এসে বললেন, "আর একটা কথা বলি বাবা, তুমি আমাদের ঘরের ছেলে, তোমাকে সব কথা বলা চলে—ক-দিন দেখছি, মেয়েটাকে ঘরে শুতে দিচ্ছে না, বলে অন্য যায়গায় শোওগে যাও—শুনেছ বাবা এমন কথা—তবু যদি রোজগার করতিস, সওয়া যেত তোর বুজরুকী—বলে বিষ নেই…।"

খুড়িমার অতিরঞ্জন খানিকটা হয়ত আছে, কিন্তু সবটাই কি তাই? মাধুরীর কাছ থেকে কথা আদায় করাও কঠিন। বাড়ীতে মার কাছে শুনলাম, মাধুরী মার কাছে এসে ক'দিন কান্নাকাটি করেছে। খুড়িমার কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না।

সেবার এলে মাধুরী ওর অনেক কথা আমায় জানিয়েছে, সাধ্যমত তার প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি। এবার ওকে জানবার সুযোগই পেলাম না। খুড়িমা রোজগারের কথা তুললেন,—মাধুরীর লাঞ্ছনার মূলে হয়ত সেই কথাটাই আসল।

পরের দিন অনেক ভেবেচিন্তে পনরটা টাকা নিয়ে গিয়ে খুড়িমার হাতে দিলাম, বললাম, "সুরেনবাবুর কলকাতায় পাওনা ছিল, কাল দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

খুড়িমাকে বোঝা ভার, টাকা পেয়েও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কর্ত্তা বেঁচে থাকতে অমন টাকা কত নিয়ে এসেছেন, আজ তাঁর নিজের ছেলে বেঁচে থাকলে কি হ'ত। ইত্যাদি।

অনেক কষ্টে পালিয়ে এলাম। মাধুরীর সঙ্গে দেখা হ'ল না। বাড়ীতে ছিল না বোধ হয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছি সবে, এমন সময় মাধুরী এল ছুটতে ছুটতে। আমার ঘরে যখন ঢুকেছে তখনও হাঁপাচ্ছে।

এসেই বললে, "মাকে টাকা দিয়ে আসতে কে বললে সরোজ-দা?"

সামলে নিয়ে বললাম, "তোমাদের টাকা আর কাকে দেব?"

"আমার কাছে লুকিয়ে কি হবে সরোজ-দা?"

আমার কৃতিত্ব মাধুরীর কাছে ধরা পড়ে যাবে তা জানতাম। ধরা পড়ে ওর কাছে সব কথা খুলে বললাম। বললাম, "খুড়িমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই কাজটা করেছি।"

"তাই বল, দান ক'রেছ? মার কাছে থেকে টাকা

ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না সরোজ-দা, নইলে তোমার টাকা তোমাকে ফিরিয়ে দিতাম।"

বলতে বলতে মাধুরী কেঁদে ফেললে। আমার সামনে এত সহজে আগে কোন দিন কাঁদতে দেখি নি। আজ আর যেন কোনও সঙ্কোচ নেই ওর। চোখের জল গাল বেয়ে পড়তে লাগল।

একটু পরে ধীরে ধীরে বললে, "আমার একটু উপকার করবে সরোজ-দা? এবার তোমাদের মাষ্টার মশায়কে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। নিয়ে যাবে বল?"

তখনও কান্না থামে নি। অনেক দিনের রুদ্ধ কান্না হঠাৎ যেন প্রকাশের পথ পেয়েছে।

"একবার বড্ড উপকার করেছ, আর একটু উপকার করবে সরোজ-দা, বল করবে।

এ কথার কি উত্তর দিব? চুপ ক'রে রইলাম। তখনও মাধুরী বলছে, "এ উপকারটুকু করবে সরোজ-দা, বল করবে।"

দিশেহারা হ'য়ে বলে উঠলাম, "তোর যাতে উপকার হয় তা নিশ্চয় করব মাধুরী।"

এর পর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল মাধুরী। তার পর কি ভেবে হঠাৎ হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ মনে হ'ল, ও যে ধরণের মেয়ে তাতে পাগল হ'য়েও যেতে পারে। ওর এবারকার অভিযোগের প্রতিকার করা হয়ত আমার সব চেষ্টার বাইরে।

ভোরের কবিতা

শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

ঘোর খুলে দেখি ভোর হ'য়ে গেছে···
ঘোর কেটে যায় আঁধারে,
ঝিরঝিরে বায় ধীর বহে যায়
নাড়ায়ে বৃক্ষ পাতারে···
টুপ্‌, টুপ্‌, টুপ নূপুর-বিলাসে
শিশির ঝুরিছে শেষ-নিশ্বাসে
প্রান্তর-বুক শোভনিয়া আসে
সে কোন্ বারতা মাখানো—
প্রথম-আলোক-চন্দন-রাগে···
জানো···এর কথা কে জানো?···

কে শুনেছ সেই প্রভাত-পাখীর
মধু কাকলীর কলরব?
সবারি দুয়ারে কেঁদে ফিরে যায়
তবু নাহি মানে পরাভব···
তাই না কবিরে মিনতি জানায়
সেই ভাষা—যারে নিবেদিতে চায়
তারে নিয়ে যেন প্রথম উষায়
ঝরা বকুলের আধারে—
সবারি দুয়ারে এনে দেয় কবি—
(তাই) ভোরের কাব্য সাধারে!

আসামের বনে-জঙ্গলে

(শিকার-কাহিনী)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

রাত্রে খাইতে বসিয়া বিভূতি বলিল, "কাল তো ারে যাচ্ছি শণিতপুর টাকা আনতে। যেতে একদিন সতে একদিন। যাবে না কি তুমি আমার সঙ্গে।"

পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই রকম 'এক্স-কারশনের' সখ ামার পুরা মাত্রায়। বিভূতির কথায় আমি তো এক-ম লাফাইয়া উঠিলাম বলিলেই হয়, বলিলাম, "যাব না একথা আবার জিজ্ঞাস করতে হয় নাকি? যাব তো কি এখানে বসে বসে নেমতন্ন খাব আর বিছানায় ড়ে গড়াগড়ি দেব! তুমিও যেমন।"

আমার কথায় বিভূতি হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "আরে, ামি তাই বল্‌ছি না কি? তুমি যাবে বলেই তো থাটা তোমাকে বললাম। দু'জনে গল্প করতে করতে াজাসে যাব কাড়ার জুড়ী চেপে—তারপর শিকার তো াছেই।"

রাত্রেই যাত্রার আয়োজন করিয়া রাখিলাম, অর্থাৎ ন্দুক টোটা ইত্যাদি গুছাইয়া লইলাম। অন্ধকার াকিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া ়ই বন্ধু প্রস্তুত হইলাম। ইতিমধ্যে কাড়ার জুড়ীও াসিয়া হাজির। মহিষ দুইটা বেশ বড়, দেখলেই ুঝাযায় খুব বলবান। ওভারকোটে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া কাড়ার জুড়ীতে সওয়ার হইলাম—দুইজন সশস্ত্র বরকন্দাজও সঙ্গে চলিল।

তখনও ভাল করিয়া চারিদিক ফরসা হয় নাই। হিংস্র অহিংস্র অনেক জানোয়ারই আমাদের পথের সম্মুখে আসিয়া চকিতের মধ্যেই বনে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। চারিদিক পাখীর কলরবে মুখরিত। কত রং-বেরঙের পাখী যে দেখিলাম তাহার সীমা নাই। ভোরের একটা মোহ যেন আমাকেও পাইয়া বসিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রকৃতি যেন নব নব রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছে। ভোরের এই মনোরম দৃশ্য পার্ব্বত্য অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

হঠাৎ পর্ব্বতের উপর হইতে বাঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন ভাসিয়া আসিল—প্রভাতের শান্ত প্রকৃতি এই গর্জ্জনে কাঁপিয়া উঠিল। আমারও ভাবরাজ্য নিমেষের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত সারেই হাতের দৃঢ় মুষ্টি পাশে-রক্ষিত বন্দুকটিকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বসিল। বন্দুক লইয়া এক লাফে গাড়ী হইতে নামিয়া রাস্তায় দাঁড়াইলাম। কিন্তু, কোথায় বাঘ? ত্রিসীমানার মধ্যে কোন বাঘ দেখিতে পাইলাম না। কয়েকটা হায়না ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ীর সম্মুখ ও পিছন দিয়া নেকড়ে হরিণ প্রভৃতি জানোয়ার দৌড়িয়া বামদিকের জঙ্গলে প্রবেশ করিল। কেহ কেহ বা মহিষের শিং নাড়া দেখিয়া মুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর বিরক্তিসূচক একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া পড়ি তো মরি করিয়া ছুটিয়া পালাইল।

পাশের বনে জানোয়ারদের এই চাঞ্চল্য, ওদিকে ঊর্দ্ধ লোকেও বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। ছোট, বড়, মাঝারি নানা রকমের পাখী পর্দ্দায় বে-পর্দ্দায় উদাত্ত, অনুদাত্ত, প্লুত স্বর তুলিয়া ঊর্দ্ধাকাশকে যেন ঘোলাটে করিয়া ফেলিল। এত যে কাণ্ড কাড়ার জুড়ীর কিন্তু সে-দিকে ভ্রুক্ষেপও নাই। মহিষ দুইটি দিব্যি গদাইলস্করী চালে চড়াই উৎরাই করিয়া চলিতে লাগিল। আমারও যেন একটু ভ্যাবাচেকা লাগিয়া গেল—হাতের বন্দুক রহিয়া গেল হাতেই।

কাড়ার জুড়ী চলিতে চলিতে হঠাৎ রাস্তা ছাড়িয়া অন্যদিকে চলিতে লাগিল এবং একটা নীচু পাহাড়ের কাছে

আসিয়া গড় গড় করিয়া খানিকটা নীচে নামিয়া গেল এবং একটা ঝোপের আড়ালে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা যে কি হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিস্মিত হইয়া গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কিহে, গাড়ী এভাবে রাস্তা ছেড়ে এখানে এসে দাঁড়িয়ে রইল যে?"

গাড়োয়ান কিছু দূরের একটি পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দেখুন হুজুর, হাতীর পাল পাহাড় থেকে নাবছে।"

খানিকটা দূরে একটা পাহাড় বেশ ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে—গাছপালা, ঝাড়-জঙ্গল কিছুই নাই, একেবারে নেড়া পাহাড়। শুধু পাথর দেখা যাইতেছে। ঐ পাহাড়ের উপর কয়েকটি হাতী। একটা হাতী শুঁড় উঁচু করিয়া তুলিয়া চারিটি পা দিয়া সাতার দেওয়ার মত হড়্কাইতে হড়্কাইতে নীচে নামিয়া পড়িল। তারপর শুঁড় তুলিয়া একটু নাচিয়া কুঁদিয়া একপাশে যাইয়া দাঁড়াইল। তারপর আরও একটা হাতী ঐ ভাবে নাচিয়া প্রথমটির পাশে যাইয়া দাঁড়াইল। তারপর আর একটি। এইভাবে একে একে সব কয়টি হাতী নীচে নামিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। সকলের শেষে নামিল দলপতি। সবশুদ্ধ সাতটা হাতী। দলপতির চেহারা কি বিরাট—যেন একটা পাহাড়। দাঁত দুইটাও খুব লম্বা।

হাতীগুলির কাণ্ড দেখিয়া তো আমি অবাক। বন্ধুকে বলিলাম, "ভালুক পাহাড় থেকে পাথরের মত গড়িয়ে নামে জানি, তাই বলে হাতীর মত অত বড় প্রকাণ্ড জানোয়ারও গড়িয়ে হড়্কে হড়্কে নামতে পারে তা তো জানতুম না। ওদের কি লাগে না নাকি?"

বিভূতি বলিল, "দেখেছ তো ওদের যাতায়াতের পথ। ওদের পাহাড় থেকে নামাও দেখলে আজ। একদিন ওদের থাকবার আড্ডাও দেখাব। সবই যেন ওদের অদ্ভুত।"

সাতটা হাতীর নামিতে প্রায় আধঘণ্টা লাগিয়া গেল। দলপতি (দেশীনাম গুণ্ডা হাতী) সর্ব্বশেষে নামিয়া আগাইয়া চলিল, অন্যান্য হাতীগুলি সারি বাঁধিয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। উহারা আসিতেছিল আমাদের দিকেই, কিন্তু খানিকদূর আসিয়াই বাঁদিকে ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমাদের কাড়ার জুড়ী আবার চলিতে লাগিল। একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, দলে দলে হরিণ 'কুইক মার্চ্চ' করিয়া চলিয়া যাইতেছে। অনুমানে বুঝা গেল ওদিকে হাতীর পাল গিয়াছে বলিয়া ভয়ে উহারা অপর দিকে পালাইয়া যাইতেছে।

এতক্ষণে রীতিমত সকাল হইয়া গিয়াছে—বহুদূরের জিনিষও বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দেখিলাম, বেশ খানিকটা দূরে দুইজন লোক রাস্তার উপর কালো কালো দুইটা জন্তুর সহিত যেন ছুটপুটি করিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া গাড়োয়ানও খুব দ্রুত কাড়ার জুড়ীকে চালাইতে লাগিল। অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমার শরীরও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম, দুইটি লোক দুইটি লাঠি মাত্র সম্বল করিয়া দুইটি ভালুকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। কি ভীষণ ব্যাপার। অথচ গুলি করিবারও উপায় নাই। ভালুক দুইটির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য লোক দুইটি একবার এদিক, একবার ওদিক সরিয়া দাঁড়াইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভালুকদুইটিও তাহাদের সঙ্গে ঘুরিতেছে। কাজেই গুলি ভালুকের গায়ে না লাগিয়া মানুষের গায়েও লাগিতে পারে। অথচ শুধু লাঠি সম্বল করিয়া কতক্ষণই বা আত্মরক্ষা করিবে

আমরা দুই বন্ধু বন্দুক হাতে লইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া লোক দুইটির সাহায্যার্থ দৌড়াইতে লাগিলাম। বরকন্দাজরাও আমাদের পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। খানিকটা কাছাকাছি আসিয়াছি এমন সময় দেখি, একটা ভালুক একজনের লাঠির একটা মাথা ধরিয়া ফেলিয়াছে এবং লোকটিকে ধরিবার জন্য লাঠি ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। লোকটিও যথাসাধ্য নিজকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা কম করিতেছে না। মানুষে আর ভালুকে কি ভয়ঙ্কর 'টাগ অব্ ওয়ার'!

ভালুকটা যে ভাবে দাঁড়াইয়া লাঠি ধরিয়া টানিতেছিল তাহাতে বন্দুকের নিশানা করা কঠিন নয়। এই সুযোগ আর মুহূর্ত্তও উপেক্ষা চলে না। আমি দাঁড়াইয়া সামান্য

একটু দম লইয়াই গুলি করিলাম। গুলিটা লাগিল ভালুকের ঘাড়ে। গুলি খাইয়া ভালুক তো চীৎকার করিয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু লাঠি ছাড়িল না। গুলিতে ভালুক একটুও কাবু হইল না। পড়িয়া গিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এমন জোরে লাঠি ধরিয়া এক টান দিল যে, লোকটির হাত হইতে লাঠি গেল ফস্‌কাইয়া। টাল সামলাইতে না পারিয়া লোকটি পড়িয়া গিয়া গড়াইতে গড়াইতে রাস্তার নীচে যাইয়া পড়িল। ভালুকটাও লাঠি ফেলিয়া লোকটাকে ধরিতে যাইবে এমন সময় আর একটি গুলি করিলাম। গুলি খাইয়া ভালুকটা থমকিয়া দাঁড়াইল। এই অবসরে তড়িৎগতিতে আবার গুলি করিলাম। এবার ভালুকটা মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

ওদিকে বিভূতিও নিকটে আসিয়া অপর ভালুকটিকে গুলি করিয়াছিল। এই ভালুকটা ছিল ভারী ভীরু। গুলি খাইয়াই চীৎকার করিতে করিতে জঙ্গলের দিকে দৌড়াইল। বিভূতি আরও একটা গুলি করিল, কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। এই সুযোগে ভালুকটা প্রাণ লইয়া পগার পার। আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। বরকন্দাজরাও আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ভালুকটার সন্ধানে জঙ্গলের দিকে দৌড়াইল।

আমি যে ভালুকটাকে গুলি করিয়াছিলাম সে ভালুকটা ছিল ভারী তেজী। তিন-তিনটা গুলি খাইয়াও উহার কিছুই হয় নাই। বরং আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং গর্জ্জন করিতে করিতে লোকটাকে চার্জ্জ করিল। লোকটির দিকে এতক্ষণ দৃষ্টি দিবার ফুরসৎই হয় নাই। এখন চাহিয়া দেখিলাম নিশ্চল, নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে। ভালুককে লক্ষ্য করিয়া আরও একটা গুলি করিলাম। গুলি দাবনা ভেদ করিয়া বুকের ভিতর দিয়া অপর দাবনা ফুঁড়িয়া চলিয়া গেল। গুলিতে দুই হাত ভাঙ্গিয়া ঝুলিতে লাগিল, কিন্তু ভালুকটাও যেন শেষ চেষ্টা করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল। কি কঠিন প্রাণ ভালুকটির, কী তীব্র জিঘাংসা। মর-মর হইয়াও গড়াইতে গড়াইতে লোকটার দিকে চলিয়াছে। কিন্তু আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। আমি ভালুকটার আরও কাছে যাইয়া এবার মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম। এবারের গুলি একেবারে অব্যর্থ। বিকট একটা চীৎকার করিয়া সেই যে নিস্পন্দ হইয়া ভালুকটা পড়িল আর উঠিল না—সব শেষ।

দুইটি লোকই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। মাথায় ও চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে জ্ঞান হইল। দ্বিতীয় লোকটি তো জ্ঞান হইয়াই ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটি জল খাইয়া ফেলিল, তার পর রাস্তার উপরেই সটান হইয়া শুইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় ভালুকটাও আর শেষ পর্য্যন্ত পলাইয়া পার পাইল না। বরকন্দাজদের গুলি খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

এতক্ষণ যুদ্ধের পর আমরাও বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বরকন্দাজরাই পাহাড় হইতে কিছু শুক্‌না কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আগুন জ্বালাইল। জল গরম করিয়া চা তৈয়ার করা হইল। চা-জলখাবার লোক দুইটিকে খাইতে দিয়া আমরাও খাইলাম। কাড়ার জুড়ী পুনরায় চলিতে লাগিল। মৃত ভালুক দুইটি গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া হইল।

বেশ বেলা হইয়াছে, প্রায় দুপ্রহর। রৌদ্রের খুব তেজ। আমাদের দেশের মতই মনে হইতে লাগিল। এই দিবা-দ্বিপ্রহরেও দুই একটা ক্ষুধার্ত্ত হায়নাকে রাস্তা পার হইয়া যাইতে দেখিলাম। কিন্তু অপর কোন বন্য জন্তুর দেখা পাই নাই। বন্ধু বলিল, এদিকের জঙ্গলে নাকি ভয় নাই। আর পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলও খুব বিরল হইয়া আসিয়াছে—শুধু নেড়া পাহাড়। বাকী দিনটুকুতে বাস্তবিকই আর কোন জন্তু জানোয়ারের সহিত আমাদের মুলাকাৎ হয় নাই। বাকী পথটা নির্ব্বিঘ্নে পাড়ি দিয়া সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শনিতপুরে আসিয়া ডাক-বাংলায় উঠিলাম।

শনিতপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে অবস্থিত। বেশ সুন্দর পল্লীটি—প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পরের দিন অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সঙ্গীয় শিকারীদের সহিত পল্লীর বহু লোকের পরিচয় হইয়া গেল। আমরা দুইটি ভালুক শিকার করিয়া আনিয়াছি শুনিয়া দলে দলে বালক, বৃদ্ধ, যুবক, নর-নারী ভালুক দেখিবার জন্য ভীড়

যাইয়া ফেলিল। আমাদের ঐ দিনই ফিরিতে হইবে। বিভূতি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি তাহার কাজ শেষ করিয়া লইল। দক্ষিণ হস্তের কার্য্য শেষ করিয়া বেলা ১১টার সময় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আমাদের যাত্রা সুরু করিলাম।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রথম দিকটা বেশ নিরাপদ। আমরা নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় যাইতে লাগিলাম। কিন্তু কথায় বলে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়।' আমাদের অবস্থাটাও হইল তাই। অপরাহ্ণ সময় যে স্থান দিয়া আমাদের কাড়ার জুড়ী চলিতে লাগিল সে স্থানটিতে বাঘের না হউক ভালুকের ভয় খুবই বেশী। এত বেশী যে শুধু কথা দিয়া তাহা বুঝান কঠিন। বিভূতি বলিল, "ভালুকের অত্যাচার এখানটায় এত বেশী যে রাতদিন লোকেরা তটস্থ হয়েই আছে। শুনেছি, এখানে নাকি একটি অতিকায় ভালুকী আছে। তার বাচ্চাও আছে দু'টি। ভালুকীটার আকৃতি যেমন বিরাট, গায়ে শক্তিও নাকি অসাধারণ আর হিংস্রতায় তার দোসর নাকি আর নাই। তার অত্যাচারে ১০।১২ মাইল পর্য্যন্ত লোকেরা ত্রাহি ত্রাহি করছে। ভালুকীটা নাকি অনেক মানুষও মেরেছে।"

বন্ধুর কথা শুনিয়া বলিলাম, "এ দেশে ভালুক যে রকম সস্তা দেখতে পাচ্ছি তাতে কোন কিছুতেই আর আশ্চর্য্য হই না, আর হায়না নেকড়ে তো দেখছি যেন পাড়াপড়শী।"

আমার মন্তব্য শুনিয়া বন্ধু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "যা বলেছ ভাই, হিংস্র জানোয়ারগুলোও দিন রাত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সময় অসময় বোধটা ওদের মোটেই নেই। ভালুকগুলো তো দুষ্টু ছেলের মত এর বাড়ী ওর বাড়ী করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের বাস তো এ দেশে বড় বেশী নেই—মানুষই হচ্ছে এখানে মাইনরিটী। কাজেই ভালুকরা মেজরিটীর অধিকারে মানুষকে 'ডোণ্ট কেয়ার' ক'রেই চলে।"

জুড়ী গাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছি। জুড়ী একটা বাঁধের নিকটে পৌঁছিল। ছোট্ট বাঁধ. কিন্তু জল খুব পরিষ্কার—একেবারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। বাঁধের চারিদিকে সারি সারি অনেকগুলি গাছ—যেন কেউ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজাইয়া গাছগুলি লাগাইয়াছে। চারিদিকেই পাহাড়—ধাপের পর ধাপে ক্রমশঃ উঁচু হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

বাঁধের ধারে আসিয়া গাড়ী থামিল। কাড়ার জুড়ীতে যে কি আরাম তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া তো আর কেউ জানে না। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া হাতপায়ের আড়ষ্ট ভাবটি কাটাইয়া লইলাম। শুকনা কাঠের তো অভাবই নাই। তাহাই কিছু সংগ্রহ করিয়া আগুন করা হইল। সেই আগুনে জল গরম করিয়া চায়ের ব্যবস্থা করা গেল। চা-জলখাবার খাইয়া শরীরটা একটু চাঙ্গা করিয়া লইলাম। মহিষগুলিও জলে নামিয়া এদিক ওদিক সাঁতার দিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। রাত্রির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শীতে একেবারে জমাইয়া ফেলিল। পথে জন্তু জানোয়ারদের কথা আর বলিব না—সে তো আছেই।

দীর্ঘ পথ বহিয়া গাড়ী চলিয়াছে। ভীষণ শীত—রাত্রিও অনেকটা হইয়াছে। কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া বেশ একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল। হঠাৎ আচম্‌কা তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেল—গাড়ীটা বেশ দুলিতেছে—ভূমিকম্প নাকি? নাঃ, গাড়ী যে একবার ডাইনে আর একবার বামে ঘুরিতে লাগিল—গাড়োয়ান সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও কাড়া দুইটিকে সংযত রাখিতে পারিতেছে না। ইতিমধ্যে আর দুই একবার বেশ বড় ঝাকুনি লাগিল। গাড়ীর পিছনে পিছনে আসিতেছিল দুইজন বরকন্দাজ। তাহারা বোধ হয় একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিল। বন্ধুবর একটা হাঁক দিতেই তাহারা 'হুজৌর' বলিয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিতে লাগিল। তার পরই বরকন্দাজদের চীৎকার শুনা গেল—"ওরে বাবা রে, ভল্লু।"

বরকন্দাজদের চীৎকার শুনিয়া গাড়ীর পিছনের পর্দ্দা তুলিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে তো একেবারে চক্ষু স্থির। প্রকাণ্ড একটা ভালুক দুই হাতে গাড়ীর দুই পাশের কাঠ ধরিয়া ঝাকুনি দিতেছে আর শুভ্র দন্ত-রুচিকৌমুদী বিকাশ করিয়া গর্‌গর্ করিতেছে—যেন কাল মেঘের কোলে বিদ্যুতের চমক। ওঃ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য—আমাদেরই একেবারে

াছে—দুই-তিন হাতের মধ্যে। বাঁ হাতে বন্দুক টানিয়া ইয়া গুলি করিলাম। গুলিতে জখম হইয়া ভালুকের াগ যেন আরও বাড়িয়া গেল। দাঁত দিয়া গাড়ীর কাঠ ামড়াইয়া এবং দুই হাতে ঝাকুনি দিয়া গাড়ীর পিছনটা কেবারে তছনছ করিয়া ফেলিল। আরও একটা গুলি করিলাম। দ্বিতীয় গুলি খাইয়াও ভালুকের কিছুই হইল া—আবার গুলি করিলাম। এবার গুলি খাইয়া ভালুকটা াড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কি বিপদ! তিন-তিনটা গুলি খাইয়া ভালুকের কিছু হইল না—এ যেন বুলেট-প্রুফ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমাদের অবস্থাও উঠিল বেশ সঙ্গীন হইয়া। চতুর্থবার গুলি করিলাম—এবারের গুলিতে কাজ হইল। ভালুকটা গাড়ী ছাড়িয়া ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

গাড়ীর বাহিরের ব্যাপার আরও গুরুতর। বরকন্দাজ দুই জন 'ভল্লু' বলিয়া চিৎকার দিয়া রাস্তার পাশে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। সেই যে পড়িয়াছিল আর উঠিবার নাম নাই। ভালুকটা গুলি খাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল, কিন্তু হেঁচড়াইতে হেচড়াইতে চলিল বরকন্দাজের দিকে। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া আর একটা গুলি করিয়া রাইফেলে টোটা ভরিয়া লইলাম। শেষের গুলি খাইয়া ভালুকটা রাস্তার উপর গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, এখন দেখিলাম দুইটা বাচ্ছা ভালুক রাস্তার ধারে বসিয়া আছে। বড় ভালুকটাকে গোঁঙাইতে ও ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া বাচ্ছা দুইটি উহার কাছে আসিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেল। ওদের পিছনে দৌড়ান বৃথা—বিশেষতঃ এই গভীর রাত্রে—দিনে হইলে কি করিতাম বলা যায় না। কিন্তু এই রাত্রিতে বাচ্ছা দুটিকে 'অনারেবলি রিটি্ট' করিতে দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। বড় ভালুকটার ছট্‌ফটানি ইতিমধ্যে থামিয়া গিয়াছে, দেহ তাহার নিস্পন্দ, অসাড়, প্রাণহীন।

বরকন্দাজ দুইটি এবার সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া আসিল। বিভূতি উহাদের উপর খুব চটিয়া গেল, বলিল, "খুব সাহসী তো তোমরা দু-জন। সব শুদ্ধই তো মরছিলাম এবার। যাও, কাঠ যোগাড় করে আগুন কর।"

বন্ধু এবার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমিই বাঁচালে এ যাত্রায়। সত্যি, আমি যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। লাগে নি তো কোথাও?"

লাগে নি আমার কোথাও বটে, তবে ক্লান্তি একটু এসেছিল বৈকি। সংক্ষেপে বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর দিলাম, "না ভাই, লাগে নি কোথাও।"

শুকনা কাঠ জ্বালাইয়া আগুন করা হইয়াছে—বেশ বড় আগুন। আগুনের সেই উজ্জ্বল আলোকে দেখিলাম, একটা নেকড়ে জঙ্গল হইতে বাহির হইতেছে। একজন বরকন্দাজ গুলি করিল। গুলি খাইয়া নেকড়েটা লাফাইতে লাফাইতে আমাদের দিকেই আসিতে লাগিল। এবার দুই জন বরকন্দাজই এক সঙ্গে গুলি করিল। নেকড়ে এবারে একেবারে ঠাণ্ডা।

চা খাওয়া শেষ হইলে ভালুক ও নেকড়েটাকে গাড়ীতে তুলিয়া আবার আমরা চলিতে লাগিলাম। বাকী পথটা বেশ ভালয় ভালয় পাড়ি দিলাম।

বাগানে যখন ফিরিলাম তখন ভোর হইয়া গিয়াছে।

অতিকায় ভালুক শীকারের কথা শুনিয়া বড় সাহেব নিজেই বন্ধুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় সাহেব ভালুকটা দেখিয়া ভারী খুসী, বলিলেন, "মিঃ ভট্টাচারিয়া, চলুন ভালুকটা সঙ্গে ক'রে আপনাকে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যাই।"

আমি রাজী হইলাম। আহারাদির পর বড় সাহেবের সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও অতিকায় ভালুকটা দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। বলিলেন, "এই ভালুকটার অত্যাচার বড় বেশী হয়ে পড়েছিল, কেউ একে এ পর্য্যন্ত মারতে পারে নি। বহু লোকের উপকার করলেন আপনি।"

ভালুক দেখিতে বহুলোক আসিয়া জুটিল। তাহারা সকলেই দুই হাত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সকলের নিকট বিদায় লইয়া সেই দিনই আমরা বাগানে ফিরিয়া আসিলাম। • ক্রমশঃ

এপিঠ ও ওপিঠ

(নক্সা)

শ্রীসুধাংশু রায়

(১)

কয়েক দিন আগের ঘটনা। সময়—১০টা ২৫ মিনিট, সকাল বেলা—স্থান বালীগঞ্জ ষ্টেশন। অত্যন্ত ভীড়—অধিকাংশই 'কলেজ ষ্টুডেণ্ট' বা অফিসের বাবু। ট্রেন 'ইন' করিয়াছে; দ্রুতপদে 'ইণ্টার ক্লাসে'র দিকে যাইতেছি, কারণ দেরী হইলে দাঁড়াইয়া থাকার সম্ভাবনা ষোল আনা। সামনেই 'ফিমেল ইণ্টার'—ভিতরে কয়েকটি তরুণী নামতে ইচ্ছুক। কিন্তু বিস্তর ধাক্কাধাক্কি করিয়াও দরজাটা খুলিতে পারিতেছেন না। এক ভদ্রলোক আমার ঠিক সামনেই চলিতেছিলেন—হাত বাড়াইয়া দরজাটা খুলিয়া দিলেন প্রায় এক টানেই। গাড়ীর ভিতর হইতে শুষ্ক কৃতজ্ঞতার ছিটাফোঁটা কয়েকটি ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল: "ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ—many thanks."

ভদ্রলোকটি নির্লিপ্তভাবে একবার মেয়েদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "হেঁ হেঁ হেঁ—ধন্যবাদের কি আছে, ধন্যবাদের কি আছে!" তার পর বিজয়ী বীরের মত পাশের কামরায় যাইয়া উঠিলেন। মেয়ে-কামরা হইতে মেয়েরাও নামিয়া পড়িয়াছেন। ভদ্রলোকটি যে কামরায় উঠিলেন তাড়াতাড়ির মধ্যে আমাকেও সেই কামরাতেই উঠিয়া পড়িতে হইল এবং বসিতে পারিলাম বা বসিলাম ঠিক ঐ ভদ্রলোকটির সামনেই।

ভদ্রলোকটির বয়স পঁয়ত্রিশ-ছয়ত্রিশ হইবে, বোধ হয় কোন অফিসের বাবু। তিনি বসিয়াছিলেন বেশ অনেকটা জায়গা নিয়া, কারণ চেহারাখানি তার বেশ একটু—। ভদ্রলোকের ডান পাশে বসিয়াছে দু'টি যুবক—বোধ হয় 'কলেজ ষ্টুডেণ্ট'। আর দরজায় দাঁড়াইয়া আর একটি ভদ্রলোক একটু নিরীহ ও লাজুক গোছের। একজন যুবক দাঁড়ান ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসে পড়ুন না?"

তাহার বলার লক্ষ্য ছিল বোধ হয়—পূর্ব্ব কথিত ভদ্রলোকটির (যিনি এক টানে মেয়েদের কামরার দরজা খুলিয়া দিয়াছিলেন) বাঁ পাশে যে সঙ্কীর্ণ স্থানটুকু আছে তাহাই। কিন্তু উক্ত নিরীহ ভদ্রলোকটি একটু থতমত ভাবে কলেজ ষ্টুডেণ্ট দুইটির মধ্যখানেই বসিয়া পড়িলেন। ফলে তিন জনেরই যথেষ্ট অসুবিধা হইতে লাগিল। যে যুবকটি নিরীহ ভদ্রলোকটিকে আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি পূর্ব্বোক্ত মোটা ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "একটু সরে বসুন না মশাই দয়া করে।"

বস্তুত তাঁহার বাঁ পাশের ঐ সঙ্কীর্ণ স্থানটুকু ছাড়া আমাদের গাড়ীর দুইটি 'বেঞ্চে'র আর কোথাও একটু স্থানও ছিল না। ভদ্রলোকটি কিন্তু অম্লান বদনে উত্তর করিলেন, "কেন, আপনি উঠে এসে বসতে পারেন না?"

গাড়ীর বাইরের ঘটনাটা বোধ হয় আমি ছাড়া আর কারও চোখে পড়ে নাই। এখন কিন্তু অনেক জোড়া চোখ এক সঙ্গে ভদ্রলোকের মুখের উপর ন্যস্ত হইল। ভদ্রলোক নির্ব্বিকার ভাবে ঘাড় ঘুরাইয়া বাইরের দিকে তাকাইয়া আছেন। অনুরোধকারী ছেলেটি একটু হাসিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিল।

(২)

আর একদিনের ঘটনা। বালীগঞ্জের কোন একটি রাস্তায় চলিতেছি। গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর অনেক আগেই হঠাৎ বৃষ্টি নামিল এবং ছত্রবিহীন আমার যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দুই দিকে তাকাইয়া দেখিলাম দাঁড়াইবার মত কোন জায়গা নাই।

ঢ় বড় গেটওয়ালা বাড়ীগুলির মধ্যে হঠাৎ ঢুকিয়া পড়াও :ল না। নিরাপদও নয় হয়ত। সুতরাং চলিতে াগিলাম। খানিকটা আসিয়া একট আশ্রয়ের মত মিলিল। কটা বড় গেটের উপর একটা চামেলীর ঝাড় ঘন হইয়া ;কিয়া আছে। নিরুপায় হইয়া তাহার নীচেই আশ্রয় ;ইলাম। গেটের পরেই বাঁধান চত্বর, তারপরই র্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সিঁড়ি। সিঁড়ির ওপর চওড়া বারান্দায় ।কটা গোলাকৃতি টেবিল, কয়েকটা চেয়ার ও একপাশে গাটা দুই সোফা। টেবিলের চারদিকে বসিয়া কয়েকজন ব্য যুবক তাস খেলিতে ছিলেন। অন্তেরা খবরের কাগজে ও অন্য ব্যাপারে ব্যাপৃত। কেহ কেহ চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়াই আবার স্ব স্ব কাজে মনোনিবেশ করিলেন। আমি খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া মাথা বাঁচাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বৃষ্টি থামিল না। চামেলীর ঝাড়ও আর পরোপকার করিতে রাজী হইল না। অবশেষে ভিজিয়াই চলিতে সুরু করিলাম।

সেই দিন বিকালে। বেলেঘাটা মেন রোডে একটা কাজ সারিয়া বাসের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। হঠাৎ জোরে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। পাশেই ছিল একটা খড়ের দোকান, তাহাতেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

ছোট্ট ঘর, ভিতরের অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া একটা বাঁশের মাচা। তারি নীচে কুচান খড় গাদা করা। আমি ঘরে ঢুকিতেই একটি হিন্দুস্থানী যুবক—বয়স ২৫।২৬ হইবে,—জিজ্ঞাসা করিল "বাবুজী, বৈঠিয়ে গা ?"

আমি বলিলাম "না—আমি এখনি যাব, বাসের জন্য অপেক্ষা করছি।"

বাস কিন্তু অনেকক্ষণের মধ্যে আসিল না—বৃষ্টিও কমিল না। ঘরের সামনে একটু দরজার মত রাখিয়া একটা বাঁশের আড়ের মত বাঁধা আছে—বোধ হয় রাস্তার গরু-বাছুরগুলি যাহাতে খড়ের লোভে অনধিকার চর্চ্চা না করে, সেই উদ্দেশ্যে। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি বাঁশের আড়টার উপরই উঠিয়া বসিলাম। লোকটা পাশের খড়-কুচি ভর্ত্তি চটের থলিটা দেখাইয়া বিনীত ভাবে বলিল "বাবুজী বোড়িকা উপর বৈঠিয়ে, আরাম হোগা"।

এই লোকটির চোখে এই দুইটি আসনের মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ। আমি তাহাকে খুসী করিবার জন্যই উঠিয়া থলেটার উপর বসিলাম। একটু পরে বাস আসিলে লোকটি আমাকে দরজা পর্য্যন্ত দিয়া গেল—যেন আমি তার বিশিষ্ট অতিথি—নিমন্ত্রণ রক্ষার পর বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছি।

চাঁদ

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মৈত্র

যবে আকাশেতে উঠেছিল কিশোর বেলায়,
একখানি চাঁদ—ভাঙ্গা মেঘের মেলায়!
সেদিন নয়ন তুলি,
সে চাঁদে দেখনি' ভুলি'
বৃথা সে মাধবী তুমি কাটালে হেলায়।

আজ তবে কেন দেখি চাঁদে,
কাজল তোমার আঁখি কাঁদে!
বিস্মরণের তীরে,
স্মৃতি কেন চাহ ফিরে
একদা ভাসালে যারে দূরের ভেলায়।

য়ূসুফ্ ও জুলেখা

(কাব্য-পরিচয়)

শ্রীনীরদকুমার রায়

হে পথিক!—
বারেক ভ্রমিয়া যাও আমার এ বসন্ত-আবাসে,
চিত্ত তব পূর্ণ করি লহ আসি গোলাপ-সুবাসে।
গোলাপের প্রতি কুঞ্জে কত না বিচিত্র সুষমায়,
সুরভি ওষধি সাথে ফুলকুল মানস মাতায়।
—জামী

১

প্রসিদ্ধ পারসিক সুফী কবি মৌলানা নূর্-উদ্দীন্ অব্দ্-অর্রহ্মান্ জামী প্রণীত 'য়ূসুফ্ ও জুলেখা' নামক গ্রন্থ একটি 'ঐতিহাসিক' প্রেম-কাব্য। এই কাব্যে কবি তাঁহার রচিত অপর প্রেম-কাব্য 'সলামান্ ও অব্সল্'এর মতই একদিকে দেখাইয়াছেন কামনা-লালসাময় পার্থিব প্রেমের অসারতা, ক্ষণস্থায়িত্ব, স্বার্থময় সংকীর্ণতা এবং তাহার সর্বনাশা ফল; অন্যদিকে গাহিয়াছেন ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নির্ভরের উপর প্রতিষ্ঠিত নির্মল প্রেমের স্থায়িত্ব, আনন্দ ও জয়ের গান।

গ্রন্থারম্ভে কবি ঈশ্বরের নিকট শক্তি বা প্রেরণা প্রার্থনা করিতেছেন—

হে ঈশ্বর!
আমার আশার গোলাপ-কলিকা ফুটায়ে দাও!
চির নবীন সে তোমার কুসুম-কানন হ'তে
একটি গোলাপ আমারে দেখায়ে দাও!
তাহারি হাসিতে উজলি উঠুক মোর কাননের কুসুমদল,
তাহারি সুবাসে ভরে যাক্ মোর মরম-তল!

আরও প্রার্থনা করিতেছেন, "এই চাঞ্চল্য ও অশান্তি-পূর্ণ পান্থনিবাসে যেন তোমার অচঞ্চল প্রসন্নতার সন্ধান পাই; আমার চিত্ত তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠুক; আমার জিহ্বা সতত তোমার প্রশংসায় রত হোক্!"

"আমার এই বাঁশীর ছন্দগুলি মাধুর্য্যময় হোক, এবং আমার গ্রন্থ যেন ধূপের সুবাস চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়।"

এই প্রার্থনার পরও কবি সংকোচ বোধ করিতেছেন বিষয়ের গুরুত্ব চিন্তা করিয়া, কিন্তু শেষে আবার নিজেকে উৎসাহিত করিয়া বলিতেছেন, "ভীরুতা পরিত্যাগ করিয়া এই কঠিন কাজে (কাব্য রচনায়) ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যাহা লিখিবার লিখিয়া ফেল জামী, ভালই হোক আর মন্দই হোক্।"

অতঃপর ঈশ্বরের স্তুতি করিয়া, তাঁহার সত্য অস্তিত্বের কথা স্মরণ ও প্রমাণ করিয়া, আনন্দানুভব করিতেছেন, আর নিজেকে এবং নিজের মধ্য দিয়া মানবকে সাবধান করিয়া দিতেছেন,—

হে হৃদয়! আর কতদিন এই চপল ভূমণ্ডলে
শিশুদের মত ছার ধূলা-খেলা লয়ে থাকিবে [illegible]ল?
তুমি তো সে নির্ভীক বিহঙ্গ, লালিত অতি যতনে,
এই জগতের পরপারে যে-ই কত নীড় বন্ধনে;
তুমি তো হেথায় প্রবাসী, কেন বা ভুলিছ আপন বাসা?
এই মরুভূমে পেচকের মত কেন কর যাওয়া আসা?
পৃথিবীর এই ক্লেদমাটি যত ঝেড়ে ফেল পাখা হ'তে—
মুক্ত-পক্ষে ধাও সে অমর-ধামের তোরণ-পথে।

এবং এই বলিয়া ঈশ্বরের হাতে মানুষকে সঁপিয়া দিতেছেন—

হে ঈশ্বর!—
সংসারে বিপাকে পড়ি নরনারী হয়ে অসহায়
চাহিলে তোমার পানে, তব আনুকূল্য যেন পায়!

পরে, রাজার, পয়গম্বরের এবং গুরুর স্তুতিবাদ ও দয়া ভিক্ষা

করিয়া, নিজের চিত্তকে নম্র করিয়া কবি এই পৃথিবীতে মানবের প্রেম ও সৌন্দর্য্যের রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন, এবং দেখাইতেছেন যে, সৌন্দর্য্য ও প্রেম হইতে উদ্ভূত প্রত্যেক মানব সেই অদ্বিতীয়ের নীড় হইতে উড়িয়া-আসা পক্ষীস্বরূপ এই জাগতিক বহুত্বের প্রকাশরূপ কুঞ্জে আসিয়া বসিয়াছে—

সে নিভৃত লোকে, যেথা প্রাণের প্রকাশ নাহি ছিল,—
অনস্তিত্বের কোণে জগত লুকায়ে পড়ে ছিল।
জাগে নাই দ্বিত্ব ভাব তখনো তাহার ভাবনায়,
'আমরা' বা 'তুমি' শব্দ আসে নাই তাহার ভাষায়।
সে সৌন্দর্য্য, যার কোনও বিজ্ঞাপন প্রয়োজন নাহি,—
স্বপ্রকাশ হইল সে আপন প্রভায় অবগাহি'।
অদৃষ্ট বাসর মধ্যে কন্যা সম সে সৌন্দর্য্য রয়;
প্রকৃতি তাহার পূত সর্ব্ব-পাপ-শঙ্কা-মুক্ত হয়।

কিন্তু এক সময়ে সেই সৌন্দর্য্য-লালসা নিজের মধ্য হইতেই মোহন প্রণয়ীর স্বর শুনিতে পাইল, এবং লীলামত্ত হইয়া সে প্রেমের অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বসিল। কবি বলিতেছেন—

যে হৃদয়ে প্রেম-ব্যথা নাই
সে হৃদয় হৃদয়ই নয়,
প্রেমহীন মানবের দেহ
কর্দ্দমের পিণ্ডসম রয়।
প্রেমের মধুর বেদনা হইতে
হিয়া যেন কভু দূরে না রহে;
প্রেম বিনা এই ধরণীর কোলে
মানব কেমনে জীবন বহে।

প্রেমের বন্দী হও যদি তুমি মুক্ত হতে চাও;
প্রেমের সকল বোঝা ফুল্লমনে বক্ষ পেতে নাও।
প্রেমের মদিরা পানে উত্তপ্ত আবেগ আসে প্রাণে;
আর যত বস্তু সবি স্বার্থ-দুষ্ট, অবসাদ আনে।
প্রেম হ'তে ফিরায়ো না তব মুখখান—
প্রেমের ভিতর দিয়া পাবে ঐশ্বরিক সত্যের সন্ধান।

তাই, কবি বলিতেছেন, যদি তাঁহার এই সত্যের তরু ঈশ্বরানুগ্রহে ফলবান হয়, তবে তিনি প্রেমের বেদনা এমন সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত করিবেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেরও মস্তিষ্কে আগুন ধরিয়া যাইবে, এবং—

সেই আগুনের ধূম ব্যপ্ত হবে সুনীল গগনে,
উদ্বেলিত হবে অশ্রু প্রতি তারকার আঁখি কোণে;
আর, হে আমার পরমপ্রিয়!
গ্রথিত করিয়া দিব তব বাক্য হেন ভিত্তি পরে,—
ভরিয়া তুলিবে মোর স্বর্গ তব করুণার ধারে।

কবি বাক্যের মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

বাক্য হয় প্রেম-গ্রন্থে ভূমিকা স্বরূপ,
রাগ-রঙ্গে ধরে নব মদিরার রূপ।
নূতন বা পুরাতন, যাহা কিছু পৃথিবীতে হয়,
বাক্য হ'তে হয় জন্ম সকলেরি,—জ্ঞানীজনে কয়।

এই বাক্যের দ্বারা কবি যুসুফের সৌন্দর্য্য ও জুলেখার ভালবাসা চিত্রিত করিলেন। যুসুফের দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। জুলেখার মতও কেহ ভালবাসিতে পারে নাই; বালিকা বয়স হইতে এই অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া ঐশ্বর্য্যে ও ভিক্ষাবৃত্তিমাত্রাবশেষ দারুণ দুর্দ্দশায় সমভাবে অনপচিত থাকিয়া নব নব রূপে দেখা দিয়াছে।

দারিদ্র্য, দুর্দ্দশা ও দুঃখবেদনার পর যখন তাহার নব যৌবন ফিরিয়া আসিল, তখনও সে শ্রদ্ধাপূরিত প্রেমের পথই ধরিয়া রহিল, এবং সে পথ হইতে বিচলিত হইল না। সেই পথেই তার জীবন, সেই পথেই তার মৃত্যু।

এই দুইজনের কাহিনী এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। কবির লেখনী এই দুটি প্রাণের সঞ্চিত বহু রত্নখণ্ড গ্রন্থের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন।

২

এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ কানান দেশের অধিবাসী জেকবের বারোটি পুত্র। সর্ব্বকনিষ্ঠ যুসুফ বা যোসেফ। ইনি পরে একজন ঈশ্বর-লগ্নাত্ম অবতার-পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। জগতের হিতের জন্যই ইঁহার জন্ম। এই শিশুর প্রতি পিতার সমস্ত হৃদয় লগ্ন ছিল। শিশুটি পরম সুন্দর। পিতার অবস্থাও ভাল। কানান ও সীরিয়া জুড়িয়া তাঁহার কাজ-কারবার ও খ্যাতি।

যোসেফের সৌন্দর্য্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এইখানে কবি নানা বিচিত্র উপমা ও উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে

সেই অতুলনীয় অপরাজিত সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় আতিশয্য দেখাইয়াছেন।

যোসেফকে দুই বৎসরের শিশু রাখিয়া তাহার মাতা পরলোক গমন করেন। যোসেফকে লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিলেন তাহার পিতৃষ্বসা। তিনি অন্যত্র থাকিতেন, কাজেই শিশুকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হইল। কিন্তু পিতা শিশুকে না দেখিয়া অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না, তাহাকে নিজের কাছে লইয়া আসিলেন। ওদিকে পিসিমারও সেই মায়াবী সুন্দর শিশুটির উপর মন পড়িয়া গিয়াছে; তাহাকে ছাড়িয়া, তাহাকে কোলে না লইয়া, তাহাকে আদর না করিয়া তাঁহার দিন কাটিতে চায় না। একটি মন্ত্রপূতকোমরবন্ধের সাহায্যে তিনি তাঁহার ভ্রাতার নিকট হইতে আবার যোসেফকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পরে পিসিমাতার মৃত্যু হইলে বালক যোসেফ বাড়ীতে আনীত হইয়া পিতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

যোসেফের প্রতি পিতার অত্যধিক স্নেহ অপর ভাইদের ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠিল। সেই ঈর্ষা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহা পরিণত হইল কনিষ্ঠ ভাইটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে।

যোসেফ এক দিন স্বপ্ন দেখিল, সূর্য্য, চন্দ্র ও এগারটি গ্রহ একত্র তাহার সম্মুখে নত হইয়া তাহাকে পূজা করিতেছে। এই স্বপ্নের কথা সে শুধু তাহার পিতাকে জানাইল। পিতা সে-কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেও ভ্রাতারা কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। যোসেফকে বিনাশ করিবার ষড়যন্ত্র সব ঠিক করিয়া একদিন তাহারা পিতাকে বলিল যে, তাহারা সকলে কনিষ্ঠ ভাইটিকে লইয়া মাঠে আমোদ-আহ্লাদ করিতে যাইবে। পিতার সম্মতি পাইয়া তাহারা তরুণ যোসেফকে লইয়া বাহির হইল, এবং একটা নির্জ্জন পথের ধারে এক কূপের' মধ্যে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল! পিতার চক্ষে ধূলি দিবার জন্য তাহারা রচনা করিল এক মিথ্যা কাহিনী।

হায়! ধিক্ এই চাতুরীপূর্ণ ধরণী, যেথায় প্রতিদিন এমনি ভাবে কোনও না কোনও সোনার চাঁদ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, এবং আত্মিক চারণভূমিতে বিচরণশীল নিষ্পাপ মৃগযূথ হিংস্র পশুর কবলে পতিত হইতেছে!

তিন দিন পরে একদল পথিক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। পথিপার্শ্বে কূপ দেখিয়া জলপানের আশায় সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। শ্রান্তি দূর হইলে তাহাদের মধ্যে মালেক নামে এক ব্যক্তি জল তুলিতে গিয়া কূপের মধ্যে চেতনা-লুপ্তপ্রায় যোসেফকে দেখিতে পাইল। মালেক এই সুন্দর তরুণ যুবককে কূপ হইতে তুলিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের গন্তব্যস্থান মিশর অভিমুখে রওনা হইল। স্নেহময় পিতা ও অন্যান্য স্বজনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যোসেফ এইরূপে দেশান্তরে নীত হইল।

৩

প্যালেস্টাইনের রাজা টাইমসের একটি মাত্র কন্যাসন্তান, নাম তার জুলেখা। এই কন্যা পরমাসুন্দরী, তাহার রূপের প্রভায় রাজপুরী আলোকিত। ঐশ্বর্য্য ও যত্নে লালিতা এই অপূর্ব্ব সুন্দরী জুলেখা বালিকা বয়সেই একরাত্রে স্বপ্নে যোসেফের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সেই অবধি স্বপ্নদৃষ্ট যোসেফের চিন্তায় বালিকার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রহিল। এই চিন্তা ক্রমে পরিণত হইল প্রণয়ে। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়দেবতাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষায় সে দগ্ধ হইতে লাগিল। হায়, মানবের চিত্ত!—

কল্পনার ডোরে বাঁধা পড়ে আছি মোরা সকলেই,
মনোহর বাহ্যদৃশ্যে সততই মুগ্ধ হয়ে রই;

কিন্তু মানুষ যদি—
বারেক বাহির ছাড়ি বস্তুর অন্তর-পানে চায়,
আর কি ফিরাবে আঁখি কখনো সে তাহার কায়ায়?
অর্পণ করিলে হস্ত জলপূর্ণ ভাণ্ডের গ্রীবায়,
তৃষ্ণার্ত্তের জ্ঞান হয় নিঃসংশয় জল আছে তায়;
নির্ম্মল নদীর জলে নিমজ্জিত হলে একবার,—
স্নিগ্ধ দেহে আর নাহি আসে ভাণ্ড স্মরণে তাহার।

জুলেখা যোসেফের রূপ-চিন্তায় মগ্ন। গিরির কঠিন প্রস্তর যেমন পদ্মরাগ মণির খনিকে আবৃত করিয়া রাখে, পুষ্পকলি যেমন প্রাণদ মধু রসটুকু তার বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, জুলেখাও তেমনি তার গোপন কথাটি নিজ অনুরাগ-দগ্ধ হৃদয়ের নিভৃত পরতে জড়াইয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে,—যেন তাহার কণামাত্রও বাহিরে আসিতে না পায়। সখীদের সঙ্গে তাহার মুখে সততই মৃদু হাসি খেলিতেছে, কিন্তু তাহার অন্তরদেশ ঘন বেণু-বনের মত শতগ্রন্থিতে জটিল হইয়া আছে। রাত্রে সে তাহার উচ্ছ্বসিত বেদনা লইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে, ক্রন্দনের বেগে তাহার পিঠ হাপরযন্ত্রের মত বাঁকিয়া যায়; বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু সেই যন্ত্রে যেন তন্ত্রী সন্নিবেশিত করে, এবং তার ক্লিষ্ট হৃদয়ের সহিত সমস্বরে বাঁধা এক বিষাদময় রাগিণী যেন সেই যন্ত্রটিতে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে!

রাজনন্দিনীর নয়ন ও অধর হইতে মণিমাণিক্য ঝরিয়া পড়িতে থাকে, যখন সে আকুল হইয়া বলে—

"হে অমল রত্ন! কোথায় থাক তুমি? তোমার নাম ত বল নি আমায়? আমার হৃদয় হরণ ক'রে তুমি লুকিয়ে রইলে? তোমার পরিচয় দাও! যদি রাজা হও, নাম কি তোমার? কোন্ রাজ্যের রাজা তুমি? যদি চাঁদ হও, কোন্ আকাশের চাঁদ তুমি?

এই প্রবল অনুরাগ প্রাণপণে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেও, নানা লক্ষণে সখীদের কাছে জুলেখা ধরা পড়িয়া গেল।

প্রেমের শরাসন হইতে সায়ক যখন কোথাও আসিয়া পড়ে, বিচার-বিবেচনার ঢাল দিয়া তাহা নিবারণ করা যায় না। সেই প্রেম-সায়ক কোনও গৃহমধ্যে অলক্ষিতে আসিয়া পড়িলেও, তাহার প্রবেশের শত প্রকার নিদর্শন ব্যক্ত হইয়া পড়ে। প্রেম ও মৃগনাভি-গন্ধ কিছুতেই লুকানো যায় না,—বিচক্ষণদিগের এই উক্তিটি অতি মনোহর।

বিরহ-দুঃখে ক্লিষ্টা জুলেখা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতে লাগিল,—আহার নাই, নিদ্রা নাই। নব-বিকশিত উজ্জ্বল গোলাপটি শুকাইয়া মলিন বিবর্ণ হইয়া গেল।

এমন সময়ে একদিন রাত্রে সে দ্বিতীয়বার স্বপ্নে যোসেফকে দেখিল। সেই হৃদয়-আলো-করা মুখখানি জুলেখার স্তিমিত প্রাণের প্রদীপটিকে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিল, এবং পতঙ্গের মত তাহাকে অভিভূত করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল।

এই বিহ্বল অবস্থায় তাহার হাত হইতে প্রজ্ঞার বল্গা খসিয়া পড়িল; বিচার-বুদ্ধির শৃঙ্খল হইতে নিজেকে সে মুক্ত করিয়া ফেলিল; নখে ছিন্ন গোলাপ-কলিকার মত তাহার প্রাণের আবরণটি শতধা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল।

দেখিতে দেখিতে স্বপ্ন মিলাইয়া গেল: সেই মোহনিয়া—

বিদ্যুৎ-ঝলক সম চলি গেল নয়ন ধাঁধিয়া,

সহসা জাগিয়া জুলেখা অবলম্বনহীনা লতার ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইল। তার সখী ও দাসীগণ শশব্যস্ত, এবং পিতামাতা উদ্বেগাকুল হইয়া পড়িলেন। হায় রে, কি চঞ্চল এই সাভিলাষ প্রেম! তাই কবি বলিতেছেন—

ছলনা-কুহকময়, হে প্রেম, তোমার আচরণ;
কখনো ঘাটাও শান্তি, কভু কর যুদ্ধ আনয়ন!
ভ্রমে পথহারা কর কখনো বা জ্ঞানীজনগণে,
জ্ঞানবান্ করে তোলো কখনো বা উদ্‌ভ্রান্ত জনে!

পিতামাতা সকল কথা জানিলেন। মাতা কন্যাকে তিরস্কার করিলেন, পিতা বিষাদে মুখ নত করিলেন। জুলেখার অবস্থা অবর্ণনীয়।

এমনি করিয়া যখন দিন আর যেন কাটিতে চায়না, তখন তৃতীয়বার স্বপ্নে মিলন ঘটিল। এবার কথাবার্ত্তা হইল। জুলেখা বলিল, "তোমায় ভেবে ভেবে আমার অবস্থা শোচনীয় ও নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে; আমার মা আমায় গঞ্জনা দিচ্ছেন, সখীরা সব ছেড়ে গিয়েছে আমায়, পিতার সুনাম নষ্ট হতে বসেছে; তোমার নাম-ধাম বল, আমার এই সঙ্কট ও দুঃখের মিয়াদ কমাও।" যোসেফ বলিল, "আমার ঠিকানা জান্‌লেই যদি তোমার কাজ হয় তো শোনো:—মিশরে আমি রাজার উজীর, এবং সেখানেই থাকি। রাজার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বলে আমার পদগৌরব ও মর্য্যাদা আছে।"

এই স্বপ্নের পর জুলেখা কিছু শান্ত হইল;

তাহার মানসিক স্থৈর্য্য ও বোধ-শক্তি ফিরিয়া আসিল। সখিদের ডাকিয়া সে বলিল, আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যে উৎসটুকু এতদিন শুকিয়ে গিয়েছিল, তা আবার আমার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে; আর আমার মনোবিকারের কোনও আশঙ্কা নেই।—এই সংবাদ পিতাকে জানানো হইলে তিনি স্বস্থচিত্ত হইলেন।

ইহার পর হইতে জুলেখা সকল সময় তাহার স্বপ্নের কথা নানা গল্প জড়িত করিয়া সখিদের কাছে বর্ণনা করিত, এবং মিশরে তাহার কে বন্ধু আছেন তাহার কথাও বলিত।

এদিকে জুলেখার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হওয়াতে, তাহার পাণিপ্রার্থী বহু বড় বড় রাজারাজড়ার দূত রাজা টাইমসের সভায় উপস্থিত হইতে লাগিল। কেবল মিশর হইতেই কেহ আসিল না। আহত ভাবে জুলেখা মনে মনে অনেক খেদ করিতে লাগিল, 'কেনই বা আমি জন্মিয়াছিলাম, কেনই বা মা আমায় দুধ খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। কোন্ নক্ষত্র আমার অদৃষ্টকে শাসন করিতেছে, জানি না; যেদিকে তাকাই, আমার কপাল-দোষে সেই দিকই মরুময়,—"অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুখায়ে যায়;"—যদি একখণ্ড মেঘ সমুদ্রতল হইতে উঠিয়া প্রত্যেক তৃষ্ণার্ত্তের মুখে তৃপ্তির জল ঢালিয়া দিতে দিতে আমার দগ্ধ মুখের পানে চায় ত সে শীতল জলের পরিবর্ত্তে অগ্নিবর্ষণ করিয়া দিবে! দুঃখের পর্ব্বতের পেষণে আমার মত তৃণ-খণ্ড কোথায় থাকিবে? হতাশার তরঙ্গের মধ্য দিয়া এই তৃণ-খণ্ড কেমন করিয়া পথ পাইবে?—হে দেবতা! আমায় কৃপা করা না করা তোমারই হাত! কিন্তু, আমি সুখী হই বা দুঃখী হই, আমার জীবন তিক্ত হোক কি মধুময় হোক, তাহাতে তোমার কি আসে যায়!'

এইভাবে জুলেখা দিনরাত আক্ষেপ করিতে থাকে। পিতা কন্যার মনোভাব অবগত হইয়াছিলেন। তিনি বিদেশীয় রাজদূতগণকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন যে, তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই মিশর-রাজের উজীরকে বাক্যদান করিয়াছেন।

ইহার পর, জুলেখার বিষয় জানাইয়া তিনি মিশরের উজীরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন; উজীরও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন। তখন জুলেখাকে উপযুক্ত লোকজন দাসদাসীর সঙ্গে মিশরে পাঠানো হইল। এতদিনে বুঝি জুলেখার—

অদৃষ্ট গোলাপ-কলি প্রস্ফুটিত হইতে চলিল,
ভাগ্য বিহঙ্গম তার পক্ষ মেলি যাত্রা আরম্ভিল।

তাহার স্বপ্নদৃষ্ট যে-সব ব্যাপারের উপর এতদিন বাধা-বন্ধন পড়িয়াছিল, কল্পনা আসিয়া সে সমস্ত শিথিল করিয়া-দিল।

সত্য বটে, যেখানেই দুঃখ কিম্বা সুখের উদয়,
স্বপ্ন বা কল্পনা হ'তে এ জগতে তারা আসে যায়।
ধন্য সেই, স্বপ্ন ও কল্পনা যেই জেনেছে অসার,—
ঘূর্ণাবর্ত্ত হ'তে সেই অবশেষে পেয়েছে উদ্ধার।

বিদায়ের সময় জুলেখাকে খুশী দেখিয়া রাজা টাইমস্ আনন্দিত হইলেন।

* * *

জুলেখা মিশরে পৌঁছিলে মিশর-রাজের উজীর সুসজ্জিত হইয়া পাত্র-মিত্র অনুচরগণসহ তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে রাজধানীর বাহিরে আসিলেন।

জুলেখা দূর হইতে মিশরের রাজধানীর দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। সহস্র গুম্বুজে সেই নগরী উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছিল, যেন প্রান্তহীন গগনের মেঘ চারিদিকে নক্ষত্রের শিলাবৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে।

উপযুক্ত জাঁকজমকের সহিত জুলেখা তার বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট পট্টাবাসে নীত হইল। সেখানে সে তাহার ধাত্রী, সখিগণ ও বহু দাসদাসী পরিবেষ্টিত হইয়া রহিল। কিন্তু—

এই ঘূর্ণ্যমান গ্রহ—ঐন্দ্রজালিক পুরাতন
দুঃখ দিতে মানবেরে কত খেলা করে উদ্ভাবন;
আশার শৃঙ্খলে বাঁধি দুর্ভাগারে লয়ে যায় টানি
নিরাশার পথে পুনঃ ফিরায় তাহারে অবমানি;
দেখায়ে রসাল ফল করে লুব্ধ বহুদূর হ'তে—
অতৃপ্ত আশার দাহ দহে যেন তারে ভালমতে।

জুলেখা কেবল ভাবিতেছে—মিশরের রাজার উজীর—সেই স্বপ্নের পরিচয়। এখনও তাঁহাকে দেখিতে পায়

়। একবার দেখিতে পায় কেমন করিয়া? সে যে র্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিকা!—এমন সময়ে রব উঠিল, ীর আসিয়াছেন তাহাকে রাজপুরীতে লইয়া যাইবার ।। দাসীরা তাঁহাকে দেখিয়াছে; তিনি জুলেখার াবাসের সম্মুখেই দাঁড়াইয়া কর্ম্মচারীদের সহিত াবার্ত্তা কহিতেছেন। জুলেখা পট্টাবাসের একটা দ্র দিয়া উজীরকে দেখিল, দেখিয়া চমকিত হইয়া ঠল—কে এ? এ তো সে নয়! সে প্রায় চীৎকার রিয়াই উঠিল। তাহার দেহ ঝিম্ ঝিম্ করিতে গিল, চোখের সম্মুখের সমস্ত আলোক যেন নিভিয়া ল। বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের সহিত তাহার অন্তরে াহাকার উঠিল—'এ কি অঘটন আমার কপালে। যাঁর াঁজে আমি এত দুঃখ দুর্দ্দশা স'য়ে এতদূর এলাম্ এ তো স নয়! যিনি স্বপ্নে তিনবার আমায় দেখা দিয়ে নিজের রিচয় দিয়েছিলেন, এ তো সে নয়! হায় হায়—

স্থির হতে নাহি পারি নিরন্তর তরঙ্গের ঘায়,—
কখনো স্বরগে তোলে, কভু রসাতলে লয়ে যায়:
সহসা দেখিনু এক তরী কোথা হতে উপনীত,—
প্রসন্ন অন্তরে ভাবি কার্য্য মোর হবে সুবিহিত;
অতি দ্রুত আসে তরী আমার সম্মুখে,—দেখি চেয়ে,—
হত্যার করাল মূর্ত্তি নক্র এক আসিয়াছে ধেয়ে!
সারা দুনিয়ার মাঝে আমা সম হতভাগ্য নাই!
হতভাগ্য যত আছে, মোর মত অসহায় নাই!

এইরূপ মানসিক দুরবস্থা লইয়া জুলেখাকে যাইতে হইল উজীর ও তাঁহার দলবলের সহিত রাজধানীর মধ্যে, এবং রাজধানীর জনবহুল পথের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে স্বর্গপুরীতুল্য চমকপ্রদ ঐশ্বর্য্যময় রাজপুরীতে। উজীর সাহ্লাদে জুলেখার পাল্‌কীর সম্মুখে স্বর্ণমুদ্রা ও রত্নকণিকা-সকল ছড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু জুলেখার চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুর মুক্তা ঝরিতে লাগিল! আসল মণি মুক্তায় তাহার তখন কি প্রয়োজন।—

অবিমিশ্র হতাশার অশ্রু যবে চক্ষু ভরি' বহে,
মণি ও মুকুতার স্থান কোথাও কি রহে?

জুলেখা উজীরের আবাসে নীত হইল। সেখানে ঐশ্বর্য্যলালিতা রাজকন্যার স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ত্রুটি হইল না। স্বয়ং উজীর দাসের মত তাহার অভাব পূর্ণ করিতে সদা প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু—

নীলোৎপল পরে যবে পড়ে সূর্য্যরশ্মি প্রভাময়,
শশীরে দেখিতে তার অভিলাষ কভু নাহি রয়।
পিপাসার্ত্ত প্রাণ যবে স্নিগ্ধ জল পানে ব্যগ্র হয়,
বিশুদ্ধ শর্করা আনি' কিবা ফল হবে সে সময়?

জুলেখার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় হইতে রক্তধারা বহিতেছে, কিন্তু তাহার মুখে হাসি। প্রকাশ্যে সকলের সঙ্গেই কথা-বার্ত্তা কহিতেছে, কিন্তু তাহার হৃদয় অন্যত্র বাঁধা রহিয়াছে, অন্যের পদানত হইয়া আছে। পিতামাতার স্নেহক্রোড় ছাড়িয়া আসিয়া এই অপরিচিত দেশে সুখে ও দুঃখে সেই এক বন্ধনে প্রাণমন লগ্ন করিয়া সে আর কাহারও সঙ্গে কোনো স্থায়ী বন্ধনে বাঁধা পড়িতে চাহিল না। যাহাদের সহিত তাহার দৈনিক সংস্পর্শ, বাহিরে বাহিরে তাহা তেমনি রহিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে সকলের সম্পর্ক হইতে নিজের মনকে মুক্ত করিয়া রাখিল।

নিভৃতে প্রেমাস্পদকে মনে মনে ডাকিয়া সে বলে, "আমার ইহজীবনের ধ্রুবতারা! তুমি তো এই মিশরের কথাই আমায় বলেছিলে! মিশরের উজীর বলেই তো তুমি তোমার পরিচয় আমায় দিয়েছিলে! অপরিচিতা একাকিনী আমি এই তো সেই মিশরেই এসেছি, তবে কেন নির্ম্মম অদৃষ্ট আমায় তোমার মিলন থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে? এস তুমি, এস, দেখা দাও! কবে তোমার দেখা পাব?—যখন আমার প্রাণের প্রবাহ নিঃশেষ হয়ে যাবে, যখন আমার জীবনের আস্তরণ আমি গুটিয়ে ফেলব, তখন কি এসে দেখা দেবে? প্রাণময় হয়ে এসে কি তখন আমার প্রাণের স্থান গ্রহণ করবে? তবে আমি তোমায় পাবার জন্য নিজের দিকেই চাইছি কেন?"

ক্রমশঃ

কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দু-দিন পরে কেদার একদিন সকালে বললেন—শরৎ মা, আমি আজকে একবার তালপুকুর যাবো খাজনা আদায় করতে, আমার আসতে একদিন দেরী হতে পারে, একটু সাবধানে থেকো।

শরৎ বলল—বেশি দেরি কোরো না বাবা, তুমি যেখানে যাও আসবার নামটি করতে চাও না তো? আমি একলা থাকবো মনে কোরো।

কেদার একবার বাড়ীর বার হোলে ফিরবার কথা ভুলে যান একথা শরৎ ভালরকমেই জানে। মুখে বললেও শরৎ জানে বাবা এখন দিন দু-তিনের মত গা ঢাকা দিলেন। সেদিন সে রাজলক্ষ্মীকে বলে পাঠালো একবার দেখা করতে।

দুপুরের পর রাজলক্ষ্মী এসে বললে—কি শরৎদিদি, ডেকেছিলে কি জন্যে?

—বাবা গিয়েছেন তালপুকুরে খাজনা আদায় করতে, আমাদের বাড়ী দু-দিন রাত্রে শুবি?

রাজলক্ষ্মী বললে—মা থাকতে না দিলে তো থাকা হবে না। আচ্ছা, বলে দেখবো এখন।

—এইখানেই খাবি কিন্তু এবেলা—

—ওই তো তোমার দোষ শরৎ-দি, কেন বাড়ী থেকে খেয়ে আসতে পারি নে?

—পারবি নে কেন। তবে দু-জনে মিলে খেলে বেশ একটু আনন্দ পাওয়া যায়। খাবি ঠিক বললাম কিন্তু।

দুপুরের অনেক পরে রাজলক্ষ্মী এসেছে। বেলা প্রায় গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। পুকুরঘাটে ছাতিমবনের দীর্ঘ ছায়া পড়ে গিয়েচে, যখন ওরা দুজনে পুকুরঘাটে এসে বসলো।

মুখে বিদেশে যাবার যত ইচ্ছেই ওরা প্রকাশ করুক, এই গ্রাম ওদের অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে গিয়েচে এর ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাস নিয়ে, ঘুঘু ও ছাতারে পাখীর ডাক নিয়ে—প্রথম হেমন্তে গাছের ডালে ডালে আলকুসী ফলের দুলুনি নিয়ে, এর সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে। শরৎ যখনই এই দীঘির বাঁধা ঘাটের পাড়ে বসে ছাতিমবনের দিকে তাকায়, তখন মনে হয় ওর, সে কত যুগ থেকে যেন এই গ্রামের মেয়ে, তার সমস্ত দেহমন চেতনাকে আশ্রয় করে আছে এই ভাঙ্গা গড়বাড়ী, এই কালো পায়রার দীঘি, এই পুরনো আমলের মন্দিরগুলো, এই ছাতিমবন, ইটের স্তূপ।

ঋতুতে ঋতুতে ওদের পরিবর্ত্তনশীল রূপ ওর মন ভুলিয়েচে। শরৎ অত ভাল করে বোঝে না, ঋতুর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তার মন তত সজাগ নয়, তবুও ভাল লাগে। বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও অন্য একটা অনুভূতি দিয়ে তার মন এর সৌন্দর্য্যকে নিতে পারে।

শরৎ বাসন পুকুরপাড়ে নামিয়েই বললে—রাজলক্ষ্মী, পাতাল কোঁড় তুলে আনবি? ওই উত্তর দেউলের ওদিকের জঙ্গলে সেদিন অনেক ফুটেছিল চল দেখে আসি।

—এখন বর্ষাকাল নয়, এখন বুঝি পাতাল কোঁড় ফোটে?

—ফুটে বনের তলা আলো করে আছে বলে ফোটে না! চল্ না দেখবি—

—আমার বড্ড ভয় করে শরৎ দি ও বনে যেতে, তুমি চলো আগে আগে—

বাসন সেখানেই পড়ে রইল। গড়শিবপুরে এ পর্য্যন্ত কোনো জিনিষ ফেলে রাখলে চুরি যায়নি। কতদিন যাবৎ দীঘির ঘাটে এঁটো বাসন জলে ডুবিয়ে রেখে চলে যায়, সারা রাত হয়তো পড়ে থাকে—তার পরদিন সকালে সে সব বাসন মাজা হয়—একটা ছোট তেল-মাখা বাটিও চুরি

নি। শরৎদের ঘরে বেশী যায়গা নেই বলে কত নিষপত্র বাইরেই পড়ে থাকে দিনরাত। শুধু গড়ের ধ্য বলে যে এমন তা নয়, এ সব পল্লী অঞ্চলে চোরের পদ্রব আদৌ নেই।

ঘন নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকে রাজলক্ষ্মীর গা ছম ছম রতে লাগলো। শরৎদি শক্ত মেয়েমানুষ, ওর সাহস লিহারি—ও সব পারে। বাবাঃ, এই বনে মানুষ ঢোকে াতাল কোঁড়ের লোভে?

—ও শরৎদিদি, সাপে খাবে না তো? তোমাদের ড়ের ইটের ফাটলে ফাটলে সাপ বাবা—

শরৎ কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললে—অমন করে ামার বাপের বাড়ীর নিন্দে করতে দেবো না তোকে—ামাদের এখানে যদি সাপ থাকতো তবে আমার এতদিন আর আস্ত থাকতে হোত না। আমার মতো নে-জঙ্গলে তো তুমি ঘোরো না? কি বর্ষা, কি রমকাল, ঝড় নেই, বিষ্টি নেই, অন্ধকার নেই—একলাটি বনের মধ্যে দিয়ে যাবো উত্তর-দেউলে সন্দে পিদিম দিতে—তা ছাড়া এই বনে কাঠ কুড়িয়ে বেড়াই, বাবা কি যোগাড় করে দেন?

এক জায়গায় রাজলক্ষ্মী থমকে দাঁড়িয়ে বললে—ত্যাখো ত্যাখো শরৎদিদি, কত পাতাল কোঁড়—বেশ বড় বড়—

শরৎ তাড়াতাড়ি এসে বললে—কই দেখি?...

পরে হেসে বলে উঠলো—দূর! ছাই পাতাল কোঁড়—ও সব ব্যাঙের ছাতা, অত বড় হয় না পাতাল কোঁড়—ও খেলে মরে যায় জানিস? বিষ—

—সত্যি শরৎ-দি?

—মিথ্যে বলচি? ব্যাঙের ছাতা বিষ—

—আমি খেলে মরে যাবো—

—বালাই ষাট—কি দুঃখে?

—বেঁচে বা কি সুখ শরৎদি? সত্যি বলচি—

—কেন, জীবনের উপর এত বিতেষ্টা হোল যে হঠাৎ?

—অনেকদিন থেকেই আছে। এক এক সময় ভাবি আমাদের মত মেয়ের বেঁচে কি হবে শরৎদি? না আছে রূপ, না আছে গুণ—এমনি করে কষ্টস্রেষ্ট করে ঘুঁটে কুড়িয়ে আর বাসন মেজেই তো সারাজীবন কাটবে?

—সুখ যদি জুটিয়ে দিই? তা হোলে কিন্তু—

—তোমার সেই সেদিনের কথা তো? তুমি পাগল শরৎ-দি—

—তুই রাজি হয়ে যা না?

—সেই জন্যে আটকে রয়েচে! তোমার যেমন কথা—

—এবার প্রভাস-দাকে বলবো, দেখিস হয় কি না—

হঠাৎ রাজলক্ষ্মী উৎকর্ণ হয়ে বললে—চুপ শরৎ-দি, বনের মধ্যে কারা আসচে—

শরতেরও তাই মনে হোল। কাদের পায়ের শব্দ বনের ওপাশে। শরৎ ও রাজলক্ষ্মী একটা গাছের আড়ালে লুকুলো। দু-জন লোক বনের মধ্যে কি করচে। কিসের শব্দ হচ্চে যেন। শরৎ চুপি চুপি বললে—কারা দেখতে পাচ্চিস?

—না, শরৎ-দি। চলো পালাই—

—পালাবো কেন? বাঘভাল্লুক তো নয়—তুই দাঁড়া না—

একটু সরে শরৎ আবার বললে—দেখেচিস মজা? রামলাল কাকার ছেলে সিদু আর ওপাড়ার জীবন শুঁড়ির ভাই হরে শুঁড়ি।

হঠাৎ শরৎ কড়া গলায় সুর চড়িয়ে বললে—কে ওখানে?

দুপ-দুপ দ্রুত পদশব্দ। তারপর সব চুপ চাপ।

শরৎ বললে—আয় তো গিয়ে দেখি—কি করছিল মুখপোড়ারা—

রাজলক্ষ্মী চেয়ে দেখলে শরতের যেন বনরক্ষিণী মূর্ত্তি। ভয় ও সঙ্কোচ এক মুহূর্ত্তে চলে গিয়েছে তার চোখমুখ থেকে। রাজলক্ষ্মী ভয় পেয়ে বললে—ও শরৎ-দি, ওদিকে যেও না—পরে শরৎ নিতান্তই গেল দেখে সে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে চললো। খানিকদূর গিয়ে দু-জনেই দেখলে যেখানে উত্তর-দেউলের পূব কোণে একটা ভাঙ্গা পাথরের মূর্ত্তি পড়ে আছে ঘন লতাপাতার ঝোপের মধ্যে—সেখানে একটা লোহার শাবল পড়ে আছে, কারা খানিকটা গর্ত্ত খুঁড়েচে আর কতকগুলো মাটীতে পোঁতা ইট সরিয়েচে।

শরৎ খিল খিল করে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়াদের বিশ্বাস গড়ের জঙ্গলে সর্ব্বত্র ওদের জন্যে টাকার হাঁড়ি

পোঁতা রয়েচে। গুপ্তধন তুলতে এসেছিল হতচ্ছাড়া ড্যাকরারা, এরকম দেখে আসচি ছেলেবেলা থেকে। কেউ এখানে খুঁড়চে, কেউ ওখানে খুঁড়চে—আর সব খুঁড়বে কিন্তু লুকিয়ে। পাছে ভাগ দিতে হয়? যাক—শাবলখানা লাভ হয়ে গেল। চল নিয়ে চল—

রাজলক্ষ্মীও হেসে কুটিপাটি; বললে—ভারি শাবলখানা নিয়ে পালাতে পারলে না। তোমার গলা শুনেই পালিয়েছে—তোমাকে সবাই ভয় করে শরৎ-দি—

বনের পথ দিয়ে ওরা। আবার যখন দীঘির ঘাটে এসে পৌছলো, তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে। আর রোদ নেই ঘাটের সিঁড়িতে, তেঁতুল গাছের ডালে দু-একটা বাদুড় এসে ঝুলতে সুরু করেচে। ওরা তাড়াতাড়ি বাসন মেজে নিয়ে বাড়ীর দিকে চললো।

শরৎ বললে এবার কিছু খা—তারপর বাড়ী গিয়ে বলে আয় খুড়ীমাকে এখানে থাকবার কথা রাতে।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্তভাবে বললে—না শরৎ-দি, সন্দের আর দেরি নেই। আমি আগে বাড়ী যাই। অনেকক্ষণ বেরিয়েচি বাড়ী থেকে, মা হয় তো ভাবচে—

—বোস আর একটু—একটু চা করি, খেয়ে যা—

শাবল ফেলে ওদের পালানো ব্যাপারটাতে শরৎ ও রাজলক্ষ্মী খুব মজা পেয়েচে। তাই নিয়ে হাসিখুসি ওদের যেন আর ফুরোতে চায় না।

রাজলক্ষ্মী বললে—তোমার সাহস আছে শরৎ-দিদি, আমি হোলে পালিয়ে আসতাম—

—ওই রকম না করলে হয় না, বুঝলি? সব সময় ভীতু হয়ে থাকলে সবাই পেয়ে বসে—আর কখনো ওরা আসবে না দেখিস।

—যদি আমার না আসা হয়, একলা থাকতে পারবে শরৎ-দি?

শরৎ হেসে বললে—কত বার তো থেকেচি। এমনিতেই বাবা এত রাত করে বাড়ী ফেরেন, এক একদিন আমার একঘুম হয়ে যায়। বাবার কি কোনো খেয়াল আছে নাকি?

তারপর সে ঈষৎ লাজুক মুখে মুখ নীচু করে বললে—বাবার জন্যে মন কেমন করচে—

—ওমা, সে কি শরৎ-দিদি! আজ তো জ্যাঠামশায় সবে গেলেন—

—সে জন্যে না। বিদেশে কোথায় খাবেন কোথায় শোবেন, উনি বাড়ী থেকে বেরুলেই আমার কেবল সেই ভাবনা।

—জলে তো আর পড়ে নেই? লোকের বাড়ী গিয়েই উঠেচেন তো—

—তুই জানিস নে ভাই—ওঁর নানান্ বাচবিচার। এটা খাবো না, ওটা খাবো না—দুনিয়ার আদ্ধেক জিনিষ তাঁর মুখে রোচে না। আমায় যে কত সাবধানে থাকতে হয়, তা যদি জানতিস্। পান থেকে চুণ খসলেই অমনি ভাতের থালা ঠেলে ফেলে উঠে গেলেন। আমার হয়েচে ওঁকে নিয়ে সব চেয়ে বড় ভাবনা। একেবারে ছেলে মানুষের মত।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বললে—তোমার বুড়ো ছেলেটি শরৎ-দিদি—আহা, কোথায় গেল, মায়ের প্রাণ, ভাবনা হবে না?

শরতের চোখ ছলছল করে উঠলো। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে—তাই এক এক সময় ভাবি ভগবান আমায় যেন এর মধ্যে টেনে নিও না। বুড়ো বয়সে বাবা বড় কষ্ট পাবেন। ওঁকে ফেলে আমার স্বর্গে গিয়েও সুখ হবে না—উনি মারা যান আগে, তারপর আমি কষ্ট পাই দুঃখ পাই, যা থাকে আমার ভাগ্যে।

—আমি এবার যাই শরৎ-দি—সন্দের আর দেরি কি?

—তুই কিন্তু আসবি ঠিক—খুব চেষ্টা করবি, কেমন তো? একলা আমি থাকতে পারি, সেজন্যে না। দু-জনে থাকলে বেশ একটু গল্পগুজব করা যেতো— মুখ বুজে এই নিবান্ধা পুরীর মধ্যে থাকতে বড় কষ্ট হয়।

রাজলক্ষ্মী চলে গেলে শরৎ সলতে পাকাতে বসলো—তারপর শাঁখ বাজিয়ে চৌকাঠে জলের ধারা দিয়ে তার অভ্যাস মত ছোট্ট একটি মাটীর প্রদীপ জেলে নিয়ে উত্তর-দেউলে সন্ধ্যাদীপ দিতে চললো। সঙ্গে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেউলে বসে প্রদীপ জ্বালাও চলে বটে, কিন্তু এদের বংশের নিয়ম ঘরের সন্ধ্যাদীপ থেকে জালিয়ে নিয়ে যেতে হয় মন্দিরের প্রদীপ। তবে যদি ঝড়েবৃষ্টিতে পথে সেটা

বে যায়, তখন অগত্যা সেখানে বসেই জ্বালাতে হয়—
পায় কি?

উত্তর-দেউলের পথে শরতের কেবলই মনে হচ্ছিল,
াবার হয় তো ওরা সেই খানে খুঁড়তে আরম্ভ করেচে।
একবার গিয়ে দেখবে নাকি? তা হোলে বেশ মজা
়—

কথাটা মনে আসতেই শরৎ আপন মনেই হি-হি করে
েসে উঠলো।

—উঃ, শাবল ফেলেই ছুট্ দিলে! এ গুপ্তধন না তুললে
য় মুখপোড়াদের! ওদের জন্যে আমার বাপ ঠাকুরদাদা
লসী কলসী মোহর পুঁতে রেখে গিয়েচে। যদি থাকে
তা আমরা নেবো, আমাদের জিনিষ—তোরা মরতে
াসিস্ কেন হতভাগারা?

শরৎ হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো এবং একটু অবাক হয়ে
চয়ে দেখলে একটা নতুন সিগারেটের বাক্স পড়ে আছে
ত্তর-দেউলের পৈঠার ওপরেই। এ বনের মধ্যে সন্ধ্যাবেলা
সিগারেট খেয়েচে কে? এখানকার লোকে সিগারেট খাবে
া, তাদের তামাক জোটে না সিগারেট তো দূরের কথা।
াক্সটা হেলাগোছা ভাবে ফেলা নয়, কে যেন তার যাবার
থে ইচ্ছে করে রেখেচে।

প্রদীপ দেখিয়ে এসে ও সিগারেটের বাক্সটা হাতে তুলে
নিলে, খালি বাক্স অবশ্যি।

রাংতাটা আছে ভেতরে। বেশ পাওয়া গিয়েচে।
সিগারেটের রাংতা বেশ জিনিষ। তবে এ গাঁয়ে মেলে
না, কে আর সিগারেট খাচ্চে।

শরতের হাত থেকে সিগারেটের বাক্সটা পড়ে গেল।
তার মধ্যে একখানা চিঠি! শরৎ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে
পড়ে দেখলে লেখা আছে—

> আমি তোমার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা মন্দিরের পেছনে কতক্ষণ বসেছিলাম। তুমি এলে না। তোমাকে কত ভালবাসি, তা তুমি জানো না। যদি সাহস দেও লক্ষ্মীটি, তবে কালও এই সময় এই খানেই থাকবো।

শরৎ খানিকটা অবাক হয়ে থেকে চারিদিকে চেয়ে
চেঁচিয়েই বললে—আ মরণ চুলোমুখো আপদগুলো! আচ্ছা,
আবার চিঠি লেখা পর্য্যন্ত সুরু করেচে—হ্যাঁ? এ সব
কি কম খ্যাংরার কাজ? কাল এসো, থেকো না জঙ্গলের
মধ্যে থেকো। বঁটি দিয়ে একটা নাক যদি কেটে না
নি তবে আমার নাম নেই—যমে ভুলে আছে কেন
তোমাদের, ও মুখপোড়ারা?

রাগে গরগর করতে করতে শরৎ বাড়ী এসে দেখলে
রাজলক্ষ্মী বসে আছে। বাড়ী থেকে সে একটা লণ্ঠন নিয়ে
এসেচে। শরৎ খুসি হয়ে বললে—এসেচিস ভাই!

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে—না, একেবারে আসিনি শরৎ-
দিদি। মা বললে বলে আয়, রাত্তিরে থাকা হবে না।

—সত্যি?

—সত্যি শরৎ-দি। আমি কি বাজে কথা বলচি?

—তবে তুই আর কষ্ট করে এলি কেন?

—কথাটা বলতে এলাম শরৎ-দিদি। তুমি আবার
হয়তো কি মনে করবে, তাই। রাজকন্যে তুমি।

রাজলক্ষ্মীর কথা বলার ধরণে শরতের সন্দেহ হোল।
সে হেসে বললে—যাঃ আর চালাকি করতে হবে না।
আমি আর অত বোকা নই—বুঝলি?

রাজলক্ষ্মী খিল খিল করে হেসে উঠে বললে—কিন্তু
তোমায় প্রথমটা কেমন ভাবিয়েছিলাম বলো না?

শরৎ বললে—যাঃ, আমি গোড়া থেকেই জানি।
খুড়ীমা এখানে রাত্তিরে থাকতে না দিলে তোকে আলো
নিয়ে আসতে দিতেন না। ও রাজলক্ষ্মী···একটা মজা
দেখবি ভাই?

বলেই শরৎ চিঠিখানা রাজলক্ষ্মীর হাতে দিয়ে বললে—
পড়ে ছাখ—

রাজলক্ষ্মী পড়ে বললে—এ কোথায় পেলে?

—উত্তর-দেউলের সিঁড়ির ওপর একটা সিগারেটের
খোলের মধ্যে ছিল।

—আশ্চর্য্য, আচ্ছা কে লিখলে বলো তো শরৎদি?

—তাই যদি জানবো তাহলে তো একেবারে শ্রাদ্ধের
চাল চড়িয়ে দিই তাদের—

—তুমি আগে যাদের কথা বলেছিলে—

—তারাই হবে হয় তো। নাও হতে পারে।
সিগারেট খাবে কে এ গাঁয়ে।

—কাউকে দেখলে, কি পায়ের শব্দ শুনলে ?

—শরৎ সুর বদলে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—বাদ দে ও সব কথা! বাবা নেই কিনা বাড়ীতে, বাবা না থাকলেই ওদের বিদ্ধি বাড়ে আমি জানি। যদি দেখতে পেতাম তবে না কথা ছিল!

রাজলক্ষ্মী বললে—আচ্ছা যদি আমি না আসতাম, তবে তুমি ভয় পেতে না শরৎ-দি, এই সব চিঠি পেয়ে—জ্যাঠামশায় নেই বাড়ী—

—দূর, কি আর ভয়! আমার ওসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে—

—একলাটি তো থাকতে হোত ?

—থাকিই তো। ভয় কোরে কি করবো? চিরদিনই যখন একা—

—তোমার বলিহারি সাহস শরৎ-দি! এই অরুণ্যি কি বনের মধ্যে—

—ঘরে বঁটি আছে, দা আছে—এগুক দিকি কে এগুবে শরৎ বামণীর সামনে—ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেবো না? কি খাবি বল রাত্রে—ও কথা যাক। ভাত না রুটি ?

—যা হয় করো। তুমি তো ভাত খাবে না, তবে রুটিই করো—দু-জনে মিলে তাই খাবো।

—বাইরে বসে আটাটা মেখে ফেলি—

—তুমি যাও শরৎ-দি—আমি মাখচি আটা—

দু-জনে গল্পেগুজবে রাঁধতে খেতে অনেক রাত করে ফেললে। তারপর দোর বন্ধ করে দু-জনে যখন শুয়ে পড়লো, তখন খুব সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে। বেশি রাত্রে শরৎ ঘুম ভেঙে উঠে রাজলক্ষ্মীর গা ঠেলে চুপি চুপি বললে—ও রাজলক্ষ্মী, ওঠ্—বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে যেন—

—রাজলক্ষ্মী ঘুমে জড়িত কণ্ঠে ভয়ের সুরে বললে—কোথায় শরৎ দি ?

—চুপ, চুপ, ওই শোন্ না—

রাজলক্ষ্মী বিছানায় উঠে বসে উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পেলে না!

শরৎ উঠে আলো জ্বাললে। তার ভয় ভয় করছিল। তবু সে সাহস করে আলো হাতে দোর খুলে বাইরে যাবার চেষ্টা করাতে রাজলক্ষ্মী ছুটে এসে ওর হাত ধরে বললে—খবরদার বাইরে যেও না শরৎ-দি, কার মনে কি আছে বলা যায় না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—

শরৎ কিন্তু ওর কথা না শুনেই দোর খুলে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। ফুট ফুট করচে জ্যোৎস্না, কেউ কোথাও নেই। তবুও তার স্পষ্ট মনে হোল খানিক আগে কেউ এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার কোন ভুল নেই।

হঠাৎ তার মনে পড়লো—আজ একাদশী তিথি!

তাদের এখানে প্রবাদ আছে, বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তি ত্রয়োদশী থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত তিন দিন, গভীর রাত্রিকালে নিজের জায়গা থেকে নড়ে'চড়ে বেড়ায় গড়বাড়ীর নির্জ্জন বনজঙ্গলের মধ্যে। সেই সময় যে সামনে পড়ে, তার বড় অশুভ দিন।

শরতের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

যদি সত্যিই তাই হয় ?

যদি সত্যিই বারাহী দেবীর বুভুক্ষু ভগ্ন পাষাণ বিগ্রহ রক্তের পিপাসায় তাদেরই ঘরের আনেচে কানাচে শিকার খুঁজে বেড়াতে বার হয়ে থাকে ?

শরৎ ভয় পেলেও মুখে কিছু বললে না। ধীরভাবে ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলে।

রাজলক্ষ্মী কলসী থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছিল, বললে—কিছু দেখলে শরৎ-দি ?

—না কিছু না। তুই শুয়ে পড়।

পরদিন বৈকালের দিকে প্রভাস ও আর একটি তরুণ সুদর্শন যুবক হঠাৎ এসে হাজির।

রাজলক্ষ্মী তখন সবে কি একটা ঘরের কাজ সেরে দীঘির ঘাটে শরতের কাছে যাবার যোগাড় করচে—এমন সময় ওদের দেখে জড়সড় হয়ে উঠলো।

প্রভাস বললে—ও খুকী, তুমি কি এ বাড়ীর মেয়ে? না, তোমাকে তো কখনো দেখিনি? বাড়ীর মানুষ সব গেল কোথায় ?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জমুখে বললে—শরৎ-দি দীঘির পাড়ে। ডেকে আনচি।

—হ্যাঁ গিয়ে বলো প্রভাস আর অরুণবাবু এসেচে।

শেষের নামটা উচ্চারিত হতে শুনে রাজলক্ষ্মীর মুখ তার নিজের অজ্ঞাতসারে রাঙা হয়ে উঠলো। সে জড়িত পদে কোনো রকমে ওদের সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে আড়ালে এনে এক ছুটে ঘাটের পাড়ে গিয়ে খবরটা দিলে শরৎকে।

শরৎ অবাক হয়ে বললে—তুই দেখে এলি ?

—ও মা, দেখে এলাম না তো কি ? এসো না—

শরৎ ব্যস্তভাবে দীঘির ঘাট থেকে উঠে এল। প্রভাস ততক্ষণ নিজেই একটা মাদুর পেতে বসে পড়েচে ওদের দাওয়ায়। হাসিমুখে বললে—আবার এসে পড়লাম। এখন একটু চা খাওয়াও তো দিদি—

—বসুন প্রভাস-দা। এক্ষুনি চা করে দিচ্চি—

প্রভাস পকেট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বার করে বললে—ভাল চা এনেচি। আর এতে আছে চিনি—

—আবার ওসব কেন প্রভাস-দা ? আমরা গরীব বলে কি একটু চা দিতে পারিনে আপনাদের ?

—ছিঃ অমন কথা বলতে নেই। সে ভেবে আনিনি, এখানে সব সময় ভাল চা তো পাওয়া যায় না পয়সা দিলেও। আর এ চিনি সে চিনি নয়, এ চায়ে খাওয়ার আলাদা চিনি। ছ্যাখো না—এ পাড়াগাঁয়ে কোথায় পাবে এ চিনি ?

শরং হাতে করে দেখলে চৌকো চৌকো লোবাঙ্কুসের মত জিনিষটা। এ আবার কি ধরণের চিনি! কখনো সে দেখেই নি। সহর বাজারে কত নতুন জিনিসই আছে !

প্রভাস বললে—কাকাবাবু কোথায় গেলেন ?

—বাবা গিয়েচেন খাজনার তাগাদায়। দু-তিন দিন দেরী হবে ফিরতে।

প্রভাস হতাশ মুখে বললে—তিনি বাড়ী নেই! এঃ তবে তো সব দিকেই গোলমাল হয়ে গেল।

—কেন কি গোলমাল ?

—আমি এসেছিলাম তোমাদের কলকাতা ঘুরিয়ে আনতে। মোটর ছিল সাথে। সেই ভেবেই অরুণকে সাথে নিয়ে এলাম।

—তাই তো, সে এখন আর কি করে হয় ?

—নিতান্তই আমার অদৃষ্ট।

—সে কি, আপনার অদৃষ্ট কেন প্রভাস-দা, আমাদের অদৃষ্ট।

—তা নয় দিদি, মুখে যাই বলো, প্রাচীন রাজবংশের মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে বেড়ানোর মধ্যে যে আনন্দ আছে—তা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে শরৎ-দি ? বিশেষ করে তুমি আর কাকাবাবু যখন কখনো কলকাতাতে যাও নি।

—কোথাও যাই নি—তায় কলকাতায়।

অরুণ এবার কথা বললে। সে অনেকক্ষণ থেকে একদৃষ্টে শরতের দিকে চেয়েছিল। শরতের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে অরুণ জিভ ও তালুর সাহায্যে এক প্রকার খেদসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বললে—ও ভাবলে একদিকে কষ্ট হয়, একদিকে আনন্দ হয়। আপনার এই সরলতার তুলনা নেই। অভিজ্ঞতা সব জায়গাতেই যে পূজো পাবে, তা পাবে না। অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক সময় অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি।

প্রভাস বললে—তাই তো, বড় যে ভাবনায় পড়া গেল দেখচি।

—ভাবনা আর কি, অন্য এক সময় নিয়ে যাবেন প্রভাস-দা।

প্রভাস কিছুক্ষণ বসে ভেবে ভেবে বললে—আচ্ছা, কোনো রকমেই এখন যাওয়া হয় না ? ধরো তুমি আর কাউকে নিয়ে না হয় আমাদের সঙ্গেই গেলে—

—আমি একাও আপনার সঙ্গে যেতে পারি প্রভাস-দা। আমার মন তেমন নীচ নয়। কিন্তু সে জন্যে নয়—বাবার বিনা অনুমতিতে কোথাও যেতে চাইনে। যদিও আমার মনে হয় আপনি নিয়ে গেলে বাবা তাতে অমত করবেন না।

অরুণ এবার বললে—তবে চলুন না কেন, গাড়ী রয়েচে—কাল সকালে বেরুলে বেলা বারোটার মধ্যে কলকাতা পৌঁছে যাওয়া যাবে। ইচ্ছে করেন, কাল রাতেই আবার আপনাকে এখানে পৌঁছে দেবো। কি বলেন প্রভাসবাবু ?

প্রভাস ঘাড় নেড়ে বললে—তা তো বটেই। তাই

চলো যাওয়া যাক—অবিশ্যি যদি তোমার মনের সঙ্গে খাপ খায়। কাল সকাল আমরা আসবো এখন আবার—

এরা উঠে গেলে রাজলক্ষ্মী দেখলে শরৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েচে। কি যেন ভাবচে আপন মনে। কিছুক্ষণ পরে শরৎ নিজেই বললে—তুই তো সব শুনলি, তোর কি মনে হয়—যাবো ওদের সঙ্গে? খুব ইচ্ছে করচে। কখনো দেখিনি কলকাতা সহর—

—তোমার ইচ্ছে শরৎ-দি। তুমি আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতী।

—তুই যাবি?

—আমার যেতে খুব ইচ্ছে—কিন্তু আমার যাওয়া হবে না শরৎ-দি। বাবা মা যেতে দেবে না।

—আমার সঙ্গে যাবি, এতে আর দোষ কি?

—তুমি যদি যাও, লোকে কোনো কথা ওঠাতে সাহস করবে না শরৎ-দি। কিন্তু আমায় কেউ-ছেড়ে কথা বলবে না। শেষকালে বাপ মা মুস্কিলে পড়ে যাবে বিয়ে দেবার সময়।

—বাবাঃ, এর মধ্যে এত কথা আছে? ধন্যি সব মন বটে।

—তুমি থাকো গাঁয়ের বাইরে। তা ছাড়া তুমি যে বংশের মেয়ে, তোমার নামে এ অঞ্চলের লোকে কিছু রটাতে সাহস করবে না। আমার বেলায় তা তো হবে না!

আরও কিছুক্ষণ পরে রান্না শেষ হয়ে গেল। শরৎ রাজলক্ষ্মীকে খেতে দিয়ে নিজে একটা বাটিতে চিঁড়ে ভাজা তেল নুন দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে বসলো।

রাজলক্ষ্মী খেতে খেতে বললে—ও সাত বাসি চিড়ে ভাজা কেন খাচ্চ শরৎ-দি? আমার জন্যে তো সেই কষ্ট করলেই, রান্না করলে, এখন নিজের জন্যে না হয় খানকতক পরোটা কি রুটি করে নিলেই পারতে?

শরৎ সলজ্জ হেসে বললে—ময়দা আর ছিল না। প্রভাস-দা আর অরুণবাবুকে তখন দু-খানা করে পরোটা করে দিলাম—যা ছিল সব ফুরিয়ে গেল।

—আমায় বললে না কেন শরৎ-দি? ওই তোমার বড় দোষ। আমায় বললে আমি বাড়ী থেকে নিয়ে আসতাম।

—থাক গে, খাওয়ার জন্যে কি? এখন কলকাতায় যাওয়ার কি করা যায় বল্। আর শোন্, ওই অরুণবাবু, দেখলি তো? পছন্দ হয়? এবার তবে কথাটা পাড়ি প্রভাস-দা'র কাছে?

রাজলক্ষ্মী জবাব দিতে একটু ইতস্তত: করে সঙ্কোচের সঙ্গে বললে—তা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু ও আমাদের কখনো হয়? বলে বামন হয়ে চাঁদে হাত—

—যদি ঘটিয়ে দিতে পারি?

রাজলক্ষ্মী মনে মনে ভাবলে—শরৎ-দি'র বয়েসই হয়েছে আমার চেয়ে বেশি। কিন্তু এদিকে বড় সরলা। অনেক জিনিসই আমি যা বুঝি, ও তাও বোঝে না। চিরকাল গাঁয়ের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে বাস করে এলো কি না?

সে মুখে বললে—দিতে পারো ভালই তো। বেশ কথা।

—ঘটকালির বখশিস দিবি কি?

—যা চাইবে শরৎ-দি।

—দেখিস তখন যেন আবার ভুলে যাস নে—

রাজলক্ষ্মীর খাওয়ার প্রবৃত্তি চলে গিয়েছিল শরৎকে বাসি চিঁড়ে ভাজা খেতে দেখে। তার ওপর যখন আবার শরৎ গরম দুধের বাটি এনে তার পাতের কাছে নামাতে গেল, সে একেবারে পিঁড়ির ওপর থেকে উঠে পড়লো। দুধটুকু থাকলে তবুও শরৎ-দি খেতে পাবে।

—ও কি, উঠলি যে?

রাজলক্ষ্মী ভাল করেই চেনে শরৎকে। সে যদি এখন আসল কথা বলে, তবে শরৎ ও দুধ ফেলে দেবে, তবু নিজে খাবে না। সুতরাং সে বললে—আর আমার খাওয়ার উপায় নেই শরৎ-দি, পেট খুব ভরে গিয়েছে। মরবো নাকি শেষে একরাশ খেয়ে?

—দুধ যে তোর জন্যে জ্বাল দিয়ে নিয়ে এলাম? কি হবে তবে?

রাজলক্ষ্মী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—কি হবে তা কি জানি। না হয় তুমি খেয়ে ফেল ওটুকু। আমার আর খাওয়ার উপায় দেখচি নে। জানোই তো আমার শরীর খারাপ, বেশি খেতে পারি নে।

অগত্যা শরৎকেই দুধটুকু খেয়ে ফেলতে হোল।

পর দিন সকালেই প্রভাস ও অরুণ আবার এসে হাজির প্রভাস বললে—কি ঠিক করলে দিদি?

—ও এখন হয়ে উঠবে না প্রভাস-দা। আপনারা যাবেন না, বসুন। চা আর খাবার করে দি, বসে গল্প করুন।

শরৎ কাল রাত্রে ভেবে ঠিক করেচে রাজলক্ষ্মীর বিবাহের প্রস্তাবটা সে আজই প্রভাসের কাছে উত্থাপিত করে দেখবে কি দাঁড়ায়। রাজলক্ষ্মীকে এজন্যে সে সরিয়ে দেবার জন্যে বললে—ভাই, তোদের বাড়ী থেকে এত কটা আটা কি ময়দা দৌড়ে নিয়ে আয় তো? কাল রাত্রে আমাদের ময়দা ফুরিয়েচে। প্রভাস-দা ও অরুণবাবুকে চায়ের সঙ্গে দু-খানা পরোটা ভেজে দিই। ক্রমশ:

সঞ্চয়ন

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ

[সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানির উদ্যোগে ভিজাগাপট্টমে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ভারতীয় জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানার ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ]

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য ভারতে প্রথম কারখানা স্থাপন করিয়া সিন্ধিয়া কোম্পানি স্বদেশী মনোভাবের প্রমাণ দিয়াছেন। ইহাতে জাতীয় শিল্প এবং দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যে কত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কংগ্রেস পূর্ব্বের মতই জাতীয় স্বাধীনতার আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক-রূপে বাঁচিয়া রহিয়াছে। এই স্বাধীনতালাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নবজীবন লাভও অসম্ভব।

বর্ত্তমানে উপকূল বাণিজ্যে আমাদের স্থান খুবই নগণ্য। বহিঃসমুদ্রের উপর আমাদের বাণিজ্যিক অধিকার একেবারেই নাই। এই ব্যবসায় বিদেশীদিগের এবং বিশেষ করিয়া গ্রেট বৃটেনের অধিকারভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু একশত বৎসরের কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে এই অবস্থা ছিল না। প্রাকৃতিক সুবিধা ও সম্পদে এবং কর্ম্মোৎসাহী মানুষে অধ্যুষিত এই ভারতভূমি সুদূর অতীতে জাহাজ-শিল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, বিস্ময়ের বিষয় হইল, বর্ত্তমানে সেই ভারত জাহাজ-শিল্পে এত রিক্ত ও দরিদ্র হইয়া গিয়াছে যে, নিজের জাহাজে বাণিজ্য বিস্তার করিতে সে সমর্থও নহে এবং তাহাকে সে সুযোগ দেওয়াও হয় না। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় চতুর্থক পর্য্যন্ত ভারতবাসীর জাহাজ নির্ম্মাণের দক্ষতা ছিল এবং সুদূর উপনিবেশসমূহে পণ্য-সম্ভার প্রেরণ করিত, ইহা ইতিহাসের কথা। বর্ত্তমানেও যে সেই প্রতিভা বিলুপ্ত হয় নাই তাহা সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানির সংগ্রাম ও সাফল্যের ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলণ্ডীয় সরকারের সাহায্যে ও বিদেশী স্বার্থের অন্যায় প্রতিযোগিতা এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য (বিরুদ্ধতা যদি না বলা হয়) অতিক্রম করিয়া এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিশ্বের জাহাজী ব্যবসায় ক্ষেত্রে নিজের স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে।

ভারতের ইতিহাসে খৃঃ পূর্ব্ব ২০০ অব্দ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাল ভারতের জাহাজ-শিল্পের গৌরবময় যুগ। ভারতীয়েরা উক্ত সময়ের মধ্যে ভারত ও চীনের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। গুপ্ত-যুগে ভারতীয় ঔপনিবেশিকরা পূর্ব্বে বোর্ণিও পর্য্যন্ত বাণিজ্য বিস্তার করে। পূর্ব্বে চীন হইতে পশ্চিমে রোম পর্য্যন্ত ভারতীয়দিগের বাণিজ্য চলিতে থাকে। দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া (খৃঃ পূর্ব্ব ৭০০ অব্দ হইতে ১২০০ অব্দ) ভারতের জাহাজ-শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিস্তার অক্ষুণ্ন বেগে উন্নতি লাভ করিতে থাকে। ভারতীয় নাবিকগণের দক্ষতা অদ্যাবধি অক্ষুণ্ন আছে। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ভাওনগরে 'দরিয়া দৌলত' নামে যে জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ১৮৩৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৮৭ বৎসরকাল একটানা বাণিজ্য-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের প্রত্যেক জাহাজকে বার বৎসর অন্তর ঢালিয়া মেরামত করিয়া লইতে হয়। বৃটিশ নৌবিভাগের জন্য বোম্বাইয়ে পূর্ব্বে (১০০ বৎসর পূর্ব্বে) বহু জাহাজ নির্ম্মিত হইত। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কলিকাতা, ও হুগলীর কথাও উল্লেখ করিতে হয়।

ভারতের উপকূলে প্রতি বৎসর ৭০ লক্ষ টন পণ্য জাহাজে স্থানান্তরিত হয়। ১৫ লক্ষ যাত্রী পশ্চিম-উপকূলে এবং ৫ লক্ষ যাত্রী ভারত ও ব্রহ্মের ভিতর প্রতি বৎসর যাতায়াত করে। বহিঃসমুদ্রের বাণিজ্যে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন পণ্যদ্রব্য এবং দুই লক্ষ যাত্রী প্রতি বৎসর জাহাজযোগে নীত বা প্রেরিত হয়। এই বিরাট আমদানী ও রপ্তানীর বাণিজ্যে বাৎসরিক চার শত কোটি টাকা খাটিয়া থাকে। ইহার মধ্যে ভারতবাসীর কোন অংশ নাই। ১৮৬০ হইতে ১৯২৫ সালের মধ্যে ভারতে ১০২টি জাহাজী ব্যবসায় কোম্পানী রেজিষ্টারভুক্ত হয়। ইহাদের সমগ্র মূলধনের পরিমাণ ৪৬ কোটি টাকা। বৃটিশ জাহাজী বাণিজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় ইহার অধিকাংশই

উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সিন্ধিয়া কোম্পানি ১৯১৯ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে বিদেশী কোম্পানিগুলির উগ্র বিরুদ্ধতা ও অন্যায় প্রতিযোগিতার সহিত সংগ্রাম করিয়া এই কোম্পানিকে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। চট্টগ্রামে কতিপয় স্বদেশভক্ত মুসলমানের উদ্যোগে যে জাহাজ কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকেও এই নির্মম প্রতিযোগিতার সহিত লড়িতে হইয়াছে। এই কোম্পানি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে এবং বি, আই, এস, এন কোম্পানির নিকট আত্মবিক্রয় করিবার উদ্যোগ করে, কিন্তু সিন্ধিয়া কোম্পানির সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া নিজের অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়।

জলপথে বাণিজ্য সম্পর্কে একটি কমিটি ১৮ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল মাত্র এইটুকু হইয়াছে যে, ভারতীয় উপকূল-বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের অংশ শতকরা পঁচিশ মাত্র। হজ্জ যাত্রীদিগের জন্য ১৯৩৭ সালে সিন্ধিয়া কোম্পানি দুইটি জাহাজ নির্ম্মাণ করে। কিন্তু বিদেশী কোম্পানিগুলি প্রতিযোগিতায় যাত্রীর মাশুলের হার ১৭৩৲ টাকা হইতে কমাইয়া ২৫৲ টাকা করিয়া ফেলে। আইন পরিষদের সদস্যদিগের এবং বাণিজ্য-সচিবের হস্তক্ষেপে একটা আপোষ হয়, তবুও তাহা সিন্ধিয়া কোম্পানির পক্ষে আর্থিক অসুবিধার কারণ হইয়া উঠে। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট জাতীয় জাহাজী ব্যবসায়ীদিগের জন্য এই যাত্রী বহন ব্যবসায়ে শতকরা ২৫ এবং বৃটিশ ব্যবসায়ীদিগের জন্য শতকরা ৭৫ অংশ সংরক্ষিত করিবার নির্দ্দেশ দেয়। সিন্ধিয়া কোম্পানি এই ব্যবস্থায় টিকিতে পারে নাই। তাহাদিগকে হজ্জযাত্রী বহন বন্ধ করিতে হয়।

ভারতে ভৈষজ্য ও রাসায়নিক শিল্প

[১৩৪৮। বৈশাখসংখ্যা 'বণিকে' প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম]

আমরা কতকগুলি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক' পদার্থ, ঔষধ এবং ঔষধের উপাদান সম্বন্ধে কিরূপ পরমুখাপেক্ষী, তাহা বিগত মহাযুদ্ধ এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরে কি পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

	টাকা
১৯৩৬-৩৭	২,৭২,১৯,৪২৫৲
১৯৩৭-৩৮	৩,৩২,৮২,০৫৫৲
১৯৩৮-৩৯	৪,৫১,৭৬,১৬৬৲

এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য যে সকল দেশ হইতে আসিত, যুদ্ধের ফলে তাহাদের অধিকাংশের সহিত আমাদের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে। সুতরাং পরিমাণ ও মূল্য এই উভয় দিক্‌ দিয়াই এই সকল জিনিষের আমদানী বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

কিছুকাল হইল, ভারত-গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিবের চেষ্টায় ভারতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণকে লইয়া একটি শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা-বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে যে সকল শিল্পসংক্রান্ত গুরুতর সমস্যা উপস্থিত, তাহার সাধান করা এবং কিরূপে দেশে প্রয়োজনীয় শিল্পগুলির উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ প্রদান করা এই বোর্ডের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

ভারী রাসায়নিক পদার্থসমূহ প্রধান প্রধান শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত লঘু রাসায়নিক ও ভেষজ পদার্থসমূহ ভেষজ-শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উভয় প্রকার শিল্পই সমভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশে ভৈষজ্য শিল্পের অবস্থা নিতান্ত অপরিণত। আমাদের দেশ হইতে লতা-গুল্ম-পত্রাদি এবং বিবিধ প্রকার ফল-মূলাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়া শিল্প-প্রক্রিয়ায় ভৈষজ্য-দ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া আমাদের দেশে ফিরিয়া আসে এবং আমরা মূল উপাদানগুলি যে মূল্যে বিক্রয় করি, তাহা হইতে প্রস্তুত ভৈষজ্য দ্রব্যাদি বহুগুণ অধিক মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকি। গত চারি বৎসরে এদেশে কি পরিমাণ ঔষধ আমদানী হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	টাকা
১৯৩৬-৩৭	২,০৬,৮৩,৪৬৩৲
১৯৩৭-৩৮	২,৩৬,১৬,৭৪০৲
১৯৩৮-৩৯	২,২০,৫৩,২৩০৲
১৯৩৯-৪০	২,৬১,২০,৮৩৭৲

বিদেশ হইতে আমদানী ঔষধের মূল্য এত অধিক যে, া ক্রয় করিয়া ব্যবহার করা অধিকাংশ রোগীর পক্ষেই াধ্য বা দুঃসাধ্য। যদি এই সকল ঔষধ প্রত্যেক প্রদেশে ্রযোগ্য লেবরেটরিতে বিশুদ্ধ ভেষজ-বিজ্ঞানসম্মত ায়ে প্রস্তুত হয়, তবে তাহার উৎপাদন-ব্যয়ও অনেক পড়িবে এবং মূল্যও তদনুসারে অনেক সুলভ হইবে। ন্তু গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যের অভাবে এদেশে উৎকৃষ্ট ধ প্রস্তুত করিয়া তাহা জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার াযোগী সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা কঠিন।

অনেক স্থলেই স্পিরিট ভৈষজ্য-শিল্পের একটি মূল ও য়োজনীয় উপাদান। কিন্তু আবকারী-বিভাগ মদ্য ভৃতি পানীয় স্পিরিট এবং ঔষধাদি প্রস্তুতকার্যে ব্যবহৃত পরিট এর মধ্যে যেরূপ পার্থক্য করা উচিত, তাহা করেন । এইজন্য গবর্ণমেণ্ট রাজস্ববৃদ্ধিকল্পে মদ্য প্রভৃতির পর অত্যধিক হারে ট্যাক্স ধার্য করিতে গিয়া এবং তিপয় প্রদেশে মদ্য প্রভৃতির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে ায়া যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে স্পিরিটের ম্বন্ধেও ব্যতিক্রম করা হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট স্পিরিটসম্পর্কে যে সমস্ত সুবিধা প্রদান রিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল দেশে রাসায়নিক শিল্পের ত উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে স্পিরিট ব্যবহারের মাত্রা অনুসারে আবকারী শুল্ক ধার্য রিয়া গবর্ণমেণ্ট আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। মদ্য প্রভৃতি পানীয় এবং ঔষধ, প্রসাধন-দ্রব্য ও গন্ধ-দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত স্পিরিটসম্পর্কে একই প্রকার ংজ্ঞা প্রয়োগ এবং একই প্রকার আবকারী-নীতি অবলম্বন করার দরুণ, ভারতবর্ষে স্পিরিট ও ভৈষজ্যশিল্পের উন্নতি বিশেষভাবে প্রতিহত হইয়াছে।

ভারত-গবর্ণবেণ্ট ১৯৩০ সালে একটি ভৈষজ্য বিষয়ক তদন্ত-কমিটী গঠন করেন। এই কমিটী ভেষজ-শিল্পের উৎকর্ষ সাধন সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, যখন বিদেশ হইতে স্পিরিট সহযোগে প্রস্তুত ঔষধাদির আমদানী-সংক্রান্ত বিধানের সহিত আবকারী-আইনের যে সকল নিয়ন্ত্রণ-বিধির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিহত হয় এবং ঔষধ-প্রস্তুতকারীগণ অনাবশ্যকরূপে বিড়ম্বিত হয়, তাহার তুলনা করা যায়, তখনই এদেশে কিরূপ বৈষম্য-মূলক আবকারী-বিধি প্রচলিত আছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়। কমিটীর মতে এইরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বিদেশ হইতে আমদানী মালের পক্ষে অনুকূল এবং ভারতীয় ঔষধ প্রস্তুতকারিগণের স্বার্থের প্রতিকূল।

১৯৩৭ সালে ভারত-গভর্ণমেণ্টের নির্দেশানুসারে দিল্লী নগরীতে ভারতের সমস্ত প্রদেশের এবং বিভিন্ন দেশীয়-রাজ্যের আবকারী কমিশনারদিগের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বিভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন প্রকার আবকারী-বিধান প্রবর্তিত আছে তাহা সংশোধনপূর্বক সকল প্রদেশের জন্য এক প্রকার আবকারী-বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে অদ্যাপি গভর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্তনের সুযোগ হইল না।

ভারতীয় স্পিরিট ও ভৈষজ্য শিল্পসম্পর্কে অনেকগুলি অসুবিধা আছে; তন্মধ্যে যে সকল কাঁচামাল বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে, তাহার উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক গ্রহণ, ভারতের কাঁচামাল ও দেশীয় ঔষধাদির উপর অত্যধিক হারে রেলভাড়া আদায় এবং সরকারী মেডিক্যাল ষ্টোর ডিপোতে ঔষধ প্রস্তুত ও বিদেশ হইতে ঔষধাদি আমদানীই প্রধান।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে যে সকল প্রয়োজনীয় কাঁচা ভেষজ আমদানী হয়, তাহাদের উপর আমদানী-শুল্ক দিতে হয় না। যুক্তরাজ্যে ভৈষজ্য-শিল্পের সাহায্যকল্পে ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে ৪০টিরও বেশী কাঁচামালের উপর শুল্ক রহিত করা হয়। পূর্বোক্ত ভেষজসংক্রান্ত তদন্ত-কমিটী যখন তাঁহাদের রিপোর্ট প্রদান করেন, তখন অপ্রাপ্য কাঁচা ভেষজের মূল্যের উপর শতকরা ২০৲ টাকা হারে আমদানী-শুল্ক নির্দিষ্ট ছিল। এই শুল্ক নির্ধারণের ফলে কাঁচামালের মূল্য অনেক বেশী হইয়া পড়িয়াছিল এবং বিদেশীয় শিল্পের তুলনায় দেশীয় শিল্প অসুবিধাগ্রস্ত হইয়াছিল। এই কারণে উক্ত তদন্ত-কমিটী এই শুল্ক সর্বতোভাবে রহিত করার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভারত-সরকার কেবল যে এই প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন,

তাহা নহে, পরন্তু শুল্কের হার শতকরা ২০৲ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৩০৲ টাকা করিয়াছেন।

বিদেশ হইতে যে সকল ঔষধ আমদানী করা হয়, তন্মধ্যে যতটুকু সুরাসার আছে, কেবল তাহার উপরই আমদানী-শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু এতদ্ব্যতীত ভেষজাংশ, বোতল, প্যাকিং দ্রব্যাদি, কর্ক, ক্যাপ্‌সুল প্রভৃতি বিদেশীয় জিনিষের উপর কোন শুল্ক দিতে হয় না। কিন্তু যদি ঠিক এই বোতল ও কর্ক প্রভৃতি পৃথক পৃথকভাবে ভারতে আমদানী করা হয়, তবে তাহার উপর অত্যন্ত অধিক হারে শুল্ক প্রদান করিতে হয়। দেশীয় শিল্পানুষ্ঠানগুলির পক্ষে এই সকল জিনিষ প্রয়োজন বলিয়া তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় এবং তাহার জন্য অত্যধিক হারে শুল্ক দিতে হয়।

রেলভাড়া সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করার দরুণ দেশীয় শিল্পগুলি বিশেষভাবে অসুবিধাগ্রস্ত হইয়াছে।

বর্তমান রেলওয়েগুলি দেশীয় ও বিদেশ হইতে আমদানী ঔষধ আর, আর ৮টি শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ১৯১০ সালে যেরূপ শ্রেণী-বিভাগের নিয়ম ছিল, তদনুসারে দেশীয় ঔষধগুলি আর, আর ২ এবং আমদানীকৃত ঔষধগুলি আর, আর ৪ শ্রেণীভুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯১২ সালে এই শ্রেণীবিভাগ রহিত করিয়া উভয়কেই একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ভারতীয় ভৈষজ্য শিল্পের সুবিধার জন্য তাহা আর, আর ৪ শ্রেণীভুক্ত করা আবশ্যক। ১৯২৯ সালে রেলওয়ে রেটস্ কমিটী কোন মামলায় দেশীয় ঔষধের উপর প্রচলিত ভাড়ার হার অসঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং নিম্নতর হারে ভাড়া নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সরকারী রেলওয়ে রেটস্-কমিটীর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব আদৌ কার্যে পরিণত করেন নাই এবং ভারতীয় শিল্প-সামগ্রীর উপর রেলভাড়ার দুর্বহভারও কিছুমাত্র অপনীত হয় নাই। ১৯২২ সালের পূর্বে প্রতি মণ দেশীয় ঔষধের উপর মাইল প্রতি ·৮৩৩ পাই ভাড়া নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু বর্তমান ভাড়ার হার ১·৩৪ পাই।

অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতে উৎপন্ন কতকগুলি কাঁচামাল ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে অধিকতর সুলভ মূল্যে ক্রয় করা যায়। এদেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঔষধ আনিতে হইলে অত্যধিক হারে রেল-ভাড়া দিতে হয়, পরন্তু বিদেশে যে সমস্ত কাঁচা ভেষজ-বস্তু প্রেরিত হয়, তাহাদের জন্য রেলওয়ে ও ষ্টীমার-ভাড়ার বিশেষ সুলভ হার নির্ধারিত আছে।

বর্তমান সরকারী নিয়মানুসারে সিভিল্ হাসপাতালগুলি ও ডিস্‌পেন্সারীসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধাদি সরকারী মেডিক্যাল্ ষ্টোর (সৈনিক বিভাগ) হইতে ক্রয় করা হয়। এই বিভাগ বিদেশ হইতে এই সকল জিনিষ ক্রয় করে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তাহা সরবরাহ করে। ঔষধ-সংক্রান্ত তদন্ত-কমিটী স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট দেশীয় ঔষধ বাজারে পাওয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনানুরূপ এই সকল ঔষধ ক্রয় করিয়া দেশীয় ভৈষজ্য শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত। কিন্তু এই সুপারিশ সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের পূর্বকার নীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই।

কৃত্রিম ঔষধের ব্যবসায়ের দরুণ দেশীয় ভৈষজ্য শিল্পের উন্নতি প্রতিহত হইয়াছে। দেশবাসীর দারিদ্র্যবশতঃ সস্তায় ঔষধ পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষার ফলেই কৃত্রিম ঔষধের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ঔষধসংক্রান্ত তদন্ত-কমিটীর অনুসন্ধান সমাপ্ত হওয়ার প্রায় দশ বৎসর পরে ১৯৩৯ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ঔষধ-নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত আইন (Drugs Act) প্রবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু আনুসঙ্গিক ঔষধ-প্রস্তুতসংক্রান্ত আইন (Pharmacy Act) প্রণয়ন বা প্রবর্তন করেন নাই। উক্ত ঔষধ-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনও এখনও কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হয় নাই এবং কখন যে হইবে, বলা কঠিন। এই আইনে ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তৃত দেশে যে বিভিন্ন প্রদেশ-সমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একই প্রকার বিধান প্রচলিত থাকা উচিত, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই। নির্দিষ্ট ঔষধের সংজ্ঞা নির্দেশকালে আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী ঔষধ এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ইহাতে এই সকল পেটেণ্ট ঔষধ কৃত্রিম হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। ড্রাগস্ টেক্‌নিক্যাল্ এড্‌ভাইজারি বোর্ডে ঔষধ প্রস্তুত-কারীদের কোন প্রতিনিধির স্থান নাই এবং উক্ত আইনের

রশিষ্টে ঔষধাদির মানসংক্রান্ত তপ্‌সিলে কেবল ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়াসংক্রান্ত ব্যবস্থাই বিশেষভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। এই সকল ত্রুটি থাকায় আইনের ফলোপধায়কতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

ইতঃপূর্বে ইণ্ডিয়ান্‌ কেমিক্যাল্‌ ম্যানুফ্যাক্‌চারাস এসোসিয়েশন্‌ সময়ে সময়ে স্পিরিট ও ভৈষজ্য-শিল্পসংক্রান্ত লিখিত প্রয়োজনের সম্বন্ধে ভারত-সরকারের নিকটে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বরাবরই এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। যদি গবর্ণমেণ্ট যথাসময়ে যথোচিত সাহায্য করিতেন, তবে ভারতবর্ষেও স্পিরিট-শিল্প এবং যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতে স্পিরিটের প্রয়োজন হয়, ঐ সকল ঔষধ-শিল্পের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত এবং ভারতবর্ষকে কি যুদ্ধ, কি শান্তির সময়ে উক্ত প্রকার স্পিরিট বা ঔষধের জন্য অসহায়ভাবে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইত না।

ভারতের বাহিরে পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টা

[১৩৪৮। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কৃষি-লক্ষ্মী' হইতে উদ্ধৃত]

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট-কমিটির এপ্রিল মাসের বুলেটিনে প্রকাশ, জাপানের প্রাক্তন অর্থসচিব মিঃ কে তাকাহাসির প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারি মিঃ উয়েৎসুকা ব্যবসায়ের ভিত্তিতে ভারতের বাহিরে ভারতীয় পাট উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া জাপানের পত্রিকাসমূহে দাবী করা হইয়াছে।

ব্রেজিল-সরকার ১৯২৫ সাল হইতে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে ভারতীয় পাট-উৎপাদনের জন্য গবেষণা করিতেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থকাম হইয়া তাঁহারা গবেষণা কার্য্য বন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করেন। অবশেষে ১৯৩৬ সালে মিঃ উয়েৎসুকার নির্দ্দেশানুযায়ী গবেষণা-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং এই বৎসর ব্রেজিলের বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট পাট জন্মে। পরে এমজান নদীর উভয় তীরে উৎকৃষ্ট পাট জন্মে। বর্ত্তমানে প্রতি বৎসরই এখানে পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আশা করা যায়, এ বৎসর ১৫০০ টনেরও বেশী পাট উৎপন্ন হইবে। এমন কি, অনেকে আশা করিতেছেন যে এই হারে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্রেজিলে ৫০ হাজার টন পাট জন্মিবে এবং ব্রেজিলে এক বৎসরে উৎপন্ন কফির জন্য যে থলিয়ার প্রয়োজন হয়, উহা এই পাট হইতেই প্রস্তুত করা চলিবে।

ইরাণ-গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরে ইরাণে অতিরিক্ত ২ হাজার মেট্রিক টন পাট ও ছয় শত মেট্রিক টন লাক্ষা উৎপাদন করা হইবে। বর্ত্তমানে পাট বা লাক্ষা কি পরিমাণ উৎপাদন করা হইতেছে, তাহা জানান হয় নাই। তবে প্রকাশ, ইরাণ-সরকার সম্প্রতি লক্ষা চাষ আরম্ভ করিয়াছেন।

দক্ষিণ অমেরিকায় এক প্রকার সামুদ্রিক তন্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পাট আমদানীর অসুবিধার জন্য এখানকার গবর্ণমেণ্ট পাটের পরিবর্ত্তে এই তন্তু দ্বারা থলিয়া নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কার্পেট, কম্বল, অয়েল-ক্লথ প্রভৃতি নির্ম্মাণে পাটের পরিবর্ত্তে এই তন্তু ব্যবহারের জন্যও পরীক্ষা কার্য্য চলিতেছে।

কাচ হইতে এক প্রকার তন্তু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। গ্রেটব্রিটেনে এতদিন অন্তঃবয়নের (বিদ্যুৎশক্তির বহিঃ-সঞ্চালন পথ রুদ্ধ করার) জন্য এই তন্তু ব্যবহার করা হইত। কিন্তু কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে নেকটাই, বিছানার চাদর প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্যও এই তন্তু ব্যবহার করা হইতেছে।

তবে ব্রিটেন এবং অন্যান্য স্থানের কফিআমদানীকারকগণ দাবি করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কফি চটের থলিয়াতেই সরবরাহ করিতে হইবে। পাট শিল্পের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তজ্জন্যই এই দাবি করা হইয়াছে।

সীমা

অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম-এ, আই-ই-এস্

ঊর্দ্ধে মোর তুমি নীলাকাশ,
আমি পাখী আছে ছুটি ডানা,
উড্ডয়ন তোমার ঠিকানা,
শূন্যভরা রয়েছে বাতাস।
ক্ষুদ্র নীড়ে করি আমি বাস,
বক্ষে তবু উড়িবার হানা
জাগে সদা, মানে না যে মানা
দুস্তর-তিতীর্ষু অভিলাষ।

ঊর্দ্ধ হ'তে ধাই ঊর্দ্ধ তরে
যত উড়ি, নব পক্ষোদ্‌গম
হয় তত, তুমি যে অগম
সে আতঙ্ক জাগে না অন্তরে।
ফুরাল' বায়ুর সূক্ষ্ম স্তর,
নাড়ি ডানা, ইথর নিথর।

ধন-সম্পদের গোড়ার কথা

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী বি-এল

২০

প্রত্যেক শ্রমিক-পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কি কি জিনিষ দরকার তাহার তালিকা তৈয়ার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা জানি, শ্রমিক খুব দরিদ্র হইলেও তাহার পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কতগুলি জিনিষ রোজই তাহার প্রয়োজন হয়; যেমন: আহার্য্য, জ্বালানি কাষ্ঠ। আবার কতগুলি জিনিষ আছে যেগুলি তিন মাস, চারমাস, ছয়মাস বা তাহা অপেক্ষা আরও বেশীদিন পর পর আবশ্যক হয়, যেমন: কাপড়, জামা, জুতা ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য শ্রমিককে বছর ভরিয়াই খরচ করিতে, কোনটার জন্য করিতে হয় প্রত্যেক দিন, কোনটা বা একমাস বা দুই মাস পরে, কোনটার জন্য বা বৎসরে চারি বার, কোনটার জন্য বা বৎসরে দুই বার বা একবার। যে ভাবেই খরচ করিতে হউক না কেন এই ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহার গড়পরতা দৈনিক মজুরি হইতে। মনে করুন, দৈনন্দিন যে-সকল দ্রব্য শ্রমিক-পরিবারের দরকার তাহার পরিমাণ ক, প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া সে

কল জিনিষ দরকার তাহার পরিমাণ খ, একমাস অন্তর
য সকল জিনিষ দরকার তাহার পরিমাণ গ, বৎসরে চারি
ার যে সকল দ্রব্য দরকার তাহার পরিমাণ ঘ, বৎসরে
ই বার যে সকল দ্রব্য দরকার তাহার পরিমাণ চ এবং
ৎসরে একবার যে-গুলি দরকার তাহার পরিমাণ ছ।
তাহা হইলে গড়পরতা দৈনিক এই সকল জিনিষের পরিমাণ
হইবে :

$$=\frac{৩৬৫ক+৫২খ+১২গ+৪ঘ+২চ+ছ}{৩৬৫}$$

যদি আমরা ধরিয়া লই যে, শ্রমিক-পরিবারের এই যে গড়পরতা দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাহাতে ছয় ঘণ্টা সামাজিক শ্রম সঞ্চিত আছে, তাহা হইলে এক দিনের শ্রম-শক্তিতে (কাজের দিনের পরিমাণ ১২ ঘণ্টা ধরিয়া) গড়ে অর্দ্ধদিনের সামাজিক শ্রম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই কথাটাকেই ঘুরাইয়া বলিলে বলিতে হয়, শ্রম-শক্তির দৈনিক উৎপাদনের জন্য কাজের দিনের অর্দ্ধেকের প্রয়োজন। শ্রম-শক্তির দৈনিক উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় শ্রম-পরিমাণই শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য নির্দ্ধারণ করে। এখন, অর্দ্ধদিনের গড়পরতা সামাজিক শ্রমের প্রতি-পরিমাণ যদি ১৲ টাকা হয় অথবা ১৲ টাকার মধ্যে যদি অর্দ্ধদিনের গড়পরতা সামাজিক শ্রম সঞ্চিত থাকে তাহা হইলে এই ১৲ টাকাই হইল এক দিনের শ্রম-শক্তির দাম। সুতরাং দৈনিক ১৲ টাকায় যদি শ্রম-শক্তি বিক্রীত হয় তাহা হইলে বলা যায়, শ্রমশক্তির মূল্যের সমান দামেই উহা বিক্রীত হইল। ইহাকে আমরা বলিতে পারি শ্রম-শক্তির সর্ব্বনিম্ন দাম অথবা শ্রমশক্তির মূল্যের সর্ব্বনিম্ন সীমা। ইহা অপেক্ষাও কম দামে শ্রম-শক্তি যদি বিক্রীত হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, শ্রম-শক্তি তাহার মূল্য অপেক্ষা কম দামে বিক্রীত হইয়াছে।

শ্রম-শক্তির মূল্য নির্দ্ধারণের এই যে উপায় প্রয়োজনের খাতিরেই তাহার উদ্ভব হইয়াছে। এই উপায়কে নিষ্ঠুরতা বলিলে শুধু সস্তা হৃদয়াবেগকেই প্রকাশ করা হয় মাত্র। কারণ বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমিক যদি তাহার শ্রম-শক্তিকে বিক্রয় না করে তাহা হইলে এই অবিক্রীত শ্রম-শক্তি তাহার কোনই কাজেই আসিবে না। শ্রমিক যদি শ্রমশক্তি বিক্রয় না করে তাহা হইলে নিষ্ঠুর প্রয়োজনের তাড়নায় 'সিস্‌মণ্ডি' (Sismondi) সঙ্গে তাহাকেও বলিতে হইবে, "যদি বিক্রয় করা না যায় তাহা হইলে শ্রম-সামর্থ্য কিছুই নয়।"

পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে আমরা ধরিয়া লইয়াছি শ্রম-শক্তির মূল্য ১৲ একটাকা। এই সঙ্গে এই কথাটাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে, একটা নির্দ্দিষ্ট দেশে, যুগে এবং উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রম-শক্তির এই মূল্য ধরা হইয়াছে। আমরা আরও ধরিয়া লইয়াছি, কাজের দিনের দৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টা এবং তন্মধ্যে ৬ ঘণ্টা শ্রমে যে মূল্য সৃষ্টি হয় তাহাকে টাকা-পয়সায় প্রকাশ করিলে দাঁড়ায় ১৲ এক টাকা। পুরা ১২ ঘণ্টা কাজ করিলে শ্রমিক তাহার শ্রম-শক্তির এই মূল্য পাইয়া থাকে। শ্রম-শক্তির একদিনের এই মূল্যকে যদি একদিনের শ্রমের মূল্য ধরা যায় তাহা হইলে ১২ ঘণ্টা শ্রমের মূল্য হইল ১৲ এক টাকা। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি শ্রম-শক্তির মূল্য দ্বারাই শ্রমের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় এবং উহাকে টাকা-পয়সায় প্রকাশ করিলেই আমরা শ্রমের স্বাভাবিক (natural or necessary) দাম পাইয়া থাকি। শ্রম-শক্তির এই দাম যদি উহার মূল্য অপেক্ষা উপরে উঠে বা নীচে নামে তাহা হইলে শ্রমের দামের সহিত উহার তথাকথিত মূল্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

ক্রমশঃ

পুস্তক-পরিচয়

মজদুর—শ্রীবিশ্ব বিশ্বাস। প্রকাশক—শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ, বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস, ৭২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১৭০। মূল্য দেড় টাকা।

যন্ত্র-শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবনে যে নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই মজদুরের ঘটনাবলী গড়িয়া উঠিয়াছে। পাটকলের শ্রমিক মাসানের জবাব হইয়া গেল অতি সামান্য কারণেই—মেয়ের অসুখের জন্য কাজে যাইতে তাহার একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। কাজটি ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতে যাইয়া চাবুক খাওয়া ছাড়া তাহার আর কিছুই লাভ হইল না। নূতন প্রতিষ্ঠিত আর একটা কলে চাকুরীর চেষ্টাও হইল ব্যর্থ। কারণ মিল-মালিকদের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বে যে-কলে সে কাজ করিত সেই কলের ম্যানেজারের সার্টিফিকেট চাই অথবা সরদারকে অন্ততঃ একশত টাকা দস্তুরী। উদ্‌ভ্রান্ত মাসান ঘুরিতে ঘুরিতে পুরাতন কলের সাহেবেরা যেখানে খেলিতেছিল তাহারি কাছে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। ফলে চুরির চেষ্টা করিবার মিথ্যা অভিযোগে একবৎসরের জন্য শ্রীঘর বাস। এদিকে মাসানের সঙ্গে সংসৃষ্ট সন্দেহে আরও কয়েক জনের চাকুরী খতম হইল। তারপর কলের মালিক ও মজুরদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত, মজুরদের ধর্ম্মঘট, পিকেটিং এবং ধর্ম্মঘট ভাঙ্গাইবার সনাতন কৌশলের ভিতর দিয়া উপন্যাসের গতি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

অভিজাত, ধনী, এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে মজুররা এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীব। এই জন্যই মজুর-জীবনের সুখ-দুঃখ ও সমস্যা লইয়া যে-রসসৃষ্টি অভিজাত, ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রসবোধের মাপ-কাঠিতে তাহা রসসৃষ্টি বলিয়া গণ্য না হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যুগধর্ম্মের প্রভাবে কোন কোন সাহিত্যিকের দৃষ্টি অভিজাত, ধনী এবং মধ্যবিত্তদের গতানুগতিক জীবনধারার পরিবর্ত্তে কৃষক ও শ্রমিকের জীবনের প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে। বিশ্ব বিশ্বাস এই জাতীয় সাহিত্যিক। রসসৃষ্টি হিসাবে মজদুর উৎকৃষ্ট না হইলেও মোটের উপর ভালই হইয়াছে। এই যুগ পরিবর্ত্তনের যুগে লেখকের নিকট হইতে বহুধা বিচ্ছিন্ন মানব-জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আরও উৎকৃষ্টতর রস-সৃষ্টির আশা আমরা করিতেছি।

চয়নিকা—রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৪৮)। সম্পাদক শ্রীসতীকুমার নাগ। কার্য্যালয়—১৭ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একাশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে যে-কয়েক-খান পত্রিকার জয়ন্তী সংখ্যা বাহির হইয়াছে তাহাদের মধ্যে চয়নিকার নিজস্ব একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেব, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, গোপাল ভৌমিক, রাখালদাস চক্রবর্ত্তী, প্রেমাংশু ঘোষ প্রভৃতির কবিতা এবং ব্রজবিহারী বর্ম্মণ, পরিমল গোস্বামী, সতীকুমার নাগ প্রভৃতির প্রবন্ধে এই সংখ্যাখানি সুসমৃদ্ধ। 'রবীন্দ্রনাথ ও সর্ব্বহারার চিত্র' শির্ষক প্রবন্ধে ব্রজবিহারী বর্ম্মণ নবযুগের নূতন দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে রবীন্দ্রসাহিত্যকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ দিকদিয়া রবীন্দ্র-নাথকে বুঝিবার চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে খুব বেশী হয় নাই। পরিমল গোস্বামীর 'রবীন্দ্রনাথের বই পড়' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার গঠন এবং পরিপুষ্টি সাধনে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় দানের কথা উল্লিখিত এবং তাঁহার সৃষ্ট ভাষার স্রোত বজায় রাখিবার উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে। 'আমাদের কবি' শীর্ষক প্রবন্ধে সতীকুমার নাগ কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করিয়াছেন। সরোজ আচার্য্যের 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের জাতীয় চেতনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা কিরূপে রাজনৈতিক, সামাজিক সকল প্রকার আন্দোলনের বিশুদ্ধ আদর্শগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়াছে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। 'বন্যা ও মিতা' প্রবন্ধে অত্রিকুমার বসু 'শেষের কবিতার' অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

চয়নিকার সাধারণ সংখ্যায় যেরূপ গল্প-উপন্যাসাদি প্রকাশিত এই সংখ্যাতেও পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা হইতে বঞ্চিত হন নাই। চয়নিকার রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা পড়িয়া রবীন্দ্র সাহিত্যামোদী মাত্রেই খুশী হইবেন। আমরা পত্রিকাখানির উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

Joint-Stock Companies Journal—Industries Number (30th June, 1941). Managing Editor—J. N. Lahiri. Associated Editors—S. C. Lahiri and R. Banerjee, M.A.

কার্য্যালয়—২, কমার্শিয়াল বিল্ডিং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানিজ জার্ণালে'র শিল্পসংখ্যা পড়িয়া আমরা বাস্তবিকই খুব খুশী হইয়াছি। এই বিশেষ সংখ্যাটি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্, শিল্পপতি এবং বৈজ্ঞানিকদের লিখিত অতি উচ্চ অঙ্গের প্রবন্ধসম্ভারে সমৃদ্ধ। শ্রীযুত পি, এন সিংহের 'ভারতের কাগজ শিল্প (Indian Paper Industries) প্রবন্ধে ভারতীয় কাগজশিল্পের ইতিহাস এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীযুত এন, কে মজুমদার 'বাংলার ব্যাঙ্কিং কোম্পানী' (Banking Companies of Bengal) শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলার ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার অতি মূল্যবান ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুত অমৃতলাল ওঝা মহাশয়ের 'কয়লা শিল্পের কেন উন্নতি হইতেছে না' (Why does not Coal Ind[illegible]y thrive) শীর্ষক প্রবন্ধে কয়লা শিল্পের উন্নতির বাধা কোথায় এবং এই বাধা অতিক্রম করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর আর্থিক সংগঠন সম্পর্কে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার প্রবন্ধটিতে যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে আর্থিক সংগঠন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক যে নীতি অনুসৃত হওয়ার আভাষ পাওয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীযুত সুবিনয় ভট্টাচার্য্য 'যুদ্ধ এবং কার্পাস শিল্প' (War and the Cotton Mill Industry) শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে আলোচনা করিয়া যুদ্ধের পরবর্ত্তী সঙ্কট প্রতি-রোধের উপায় নির্দ্ধারণের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুত এস, আর বিশ্বাস মহাশয়ের 'লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প' (Iron and steel Industry) শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতে কলকব্জা ইত্যাদি নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুত গোপালচন্দ্র নিয়োগী 'Nazi Economy—an Economy of War' শীর্ষক প্রবন্ধে নাৎসী অর্থ-নীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া জার্ম্মান অধিকৃত দেশগুলিতে উহা কিরূপভাবে কার্য্যকরী করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শিল্প, বাণিজ্য, ইনস্যুরেন্স, ব্যাঙ্কিং সম্পর্কে আরও অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

অহিংসায় স্ব-বিরোধ

অহিংস আন্দোলনের গোড়া হইতেই অহিংসা লইয়া গান্ধীজীর সহিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একটা লুকোচুরি লিয়া আসিতেছে। মহাত্মাজীর কাছে অহিংসা কোন র্মকৌশল নয়, উহা জীবনের ধর্ম্ম। কিন্তু অহিংস হওয়া তই কঠিন যে, মহাত্মাকেও এক সময় স্বীকার করিতে ইয়াছিল যে, অলক্ষিতে তাঁহার মধ্যেও হিংসা প্রবেশ রিয়াছিল। কথাটা খুব বেশী পুরাতনও নয়। কংগ্রেস নতৃবৃন্দ, এমন কি মহাত্মার অনুরক্ত ভক্তদের মধ্যেও নেকেই যে অহিংসায় পূর্ণ আস্থাবান্ নহেন তাহার রিচয় অনেকবার পাওয়া গিয়াছে। কংগ্রেসী প্রদেশ-লিতে আমরা দেখিয়াছি, কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী minimum iolence for maximum peace নীতির অনুসরণ রিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা অহিংসার সমাজ হইতে ্যত হন নাই। পুণায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ধিবেশনে আমরা সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ভুলাভাই দশাই, রাজগোপাল আচারিয়া, পণ্ডিত জওয়াহের লাল নহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদকেও হিংসার মর্থন করিতে দেখিয়াছি। তখন তো মহাত্মাজীর নতৃত্বের আসন পর্য্যন্ত ভরাডুবি হইবার উপক্রম ইয়াছিল। অথচ এই হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তুলিয়াই ুভাষচন্দ্রকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। কারণ, অহিংসার ্যাপারে মহাত্মাজীর সহিত তাঁহার তফাৎটা নাকি মৌলিক।

এই হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন লইয়াই সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীযুত কে, এম, মুন্সী এবং দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি অধ্যাপক ইন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, পদত্যাগ-পর্ব্ব এইখানেই শেষ হয় নাই, আরও কেহ কেহ হয়ত মুন্সীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারেন। এ সম্পর্কে শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই এবং বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুত মঙ্গলদাস পাকরাসের নাম শুনা যাইতেছে। তাঁহারাও নাকি জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িবেন। খারে, ব্রুবিম্যান, সুভাষচন্দ্র, স্বামী সহজানন্দ কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এখন চলিল পদত্যাগের পালা। আমরা শাস্তি বিধানও সমর্থন করি নাই, পদত্যাগও সমর্থন করি না। কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। মতান্তর হইলেই যদি শাস্তি দেওয়া হয় অথবা পদত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের শুধু শক্তিক্ষয়ই হইবে এবং ক্রমে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তে দলগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। মহাত্মা গান্ধী অহিংসা দ্বারা যে ভাবে কংগ্রেসের সদস্যদিগকে কচুকাটা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে যে 'ঠগ বাছিতেই গাঁ উজাড়' হইয়া যাইবে। ভাষ্য, টীকা এবং টিপ্পনীতে অহিংসা যেন এক বিপুলকায় ষ্টীম রোলারে পরিণত হইয়াছে। এই ষ্টীম রোলারকে নিয়োজিত করা হইয়াছে হিংসারূপ চীনাবাদাম ভাঙ্গিবার জন্য, অথচ এক ফাঁকে এই চীনবাদাম পিছলাইয়া বাহিরে যাইয়া পড়িয়াছে।

—

অখণ্ড হিন্দুস্থান ফ্রণ্ট

কংগ্রেস পরিত্যাগের পর শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সী অখণ্ড ভারতের ঐক্য ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অখণ্ড হিন্দুস্থান ফ্রণ্ট গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, এই ফ্রণ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে নিবদ্ধ থাকিবে না। ইহা হইবে ভারতের অখণ্ডতায় এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় বিশ্বাসী বিভিন্ন দল কর্ত্তৃক গঠিত সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে।

শ্রীযুত মুন্সী তো কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন, তাঁহার প্রস্তাবিত অখণ্ড হিন্দুস্থান ফ্রণ্টও কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ হইবে না। তবে কি তিনি নিজে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ না দিয়া বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থাতেই থাকিবেন? তাঁহার পক্ষে মডারেট দলে বা হিন্দু মহাসভায় যোগদান করা সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। যদি এই

অসম্ভব সম্ভব হয়, তবে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। যে-শক্তি তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির মূল তাহা না থাকিলে অখণ্ড হিন্দুস্থান ফ্রণ্ট গঠনও কার্য্য-করী হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন কংগ্রেসসেবীর পক্ষেই কংগ্রেস ত্যাগ না করিয়া এই ফ্রণ্টে যোগদান করা সম্ভব হইবে না। কাজেই তিনি যদি তাঁহার মতা-নুবর্ত্তী কংগ্রেস-সেবীদিগকে তাঁহারই মত কংগ্রেস ত্যাগে প্ররোচিত করেন, তাহা হইলে উহা ভারতের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকেই শক্তিহীন করার চেষ্টা বলিয়া গণ্য হইবে। তাঁহার প্রস্তাবিত ফ্রণ্টও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

ভারতের অখণ্ডতায় যাঁহারা বিশ্বাসী, ভারতে জাতীয় মনোভাবের যাঁহারা ধারক এবং বাহক তাঁহাদের দ্বারাই কংগ্রেস পরিচালিত। সুতরাং ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য কোন পৃথক ফ্রণ্ট গঠন করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া কেন কংগ্রেসসেবী মনে করিতে পারেন না। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যদি হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন উঠেই, তবে কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়াই তাহার মীমাংসা করা উচিত। শ্রীযুত মুন্সীর পক্ষে সে চেষ্টা করা কঠিন ছিল না। বরং এই বিষয়ে সুভাষবাবু অপেক্ষা তাঁহারই সুযোগ ছিল বেশী। কিন্তু তিনি যে-পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে প্রতিপত্তিশালী কংগ্রেসসেবীদের সমর্থন পাইবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। স্বার্থত্যাগ, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং নিপীড়ন সহ্য করার ভিতর দিয়া কংগ্রেসের মত আর কোন প্রতিষ্ঠান শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। অথচ তাঁহার প্রস্তাবিত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং নিপীড়ন সহ্য করার শক্তির প্রয়োজন তাহা হিন্দুসভার নিকট হইতে পাইবার আশা শ্রীযুত মুন্সীও বোধ হয় করেন না। শেষ পর্য্যন্ত বা তাঁহার কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করাই শুধু সার হয়।

—

সত্যাগ্রহ আন্দোলন কত দিন চলিবে

মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন ফল্গু-ধারার ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে। ইহা গণ-আন্দোলন নহে, কাজেই কোন উচ্ছ্বাস নাই, উদ্দাম গতিবেগও নাই। বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ আন্দোলন কর্ত্তৃপক্ষকে বিব্রত করিবার জন্য কল্পিত হয় নাই। যত দূর সম্ভব ইহা দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষকে বিব্রত না করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মহাত্মাজী এ সম্বন্ধে তাঁহার এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "বৃটিশ জাতি যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে বিব্রত তখন এই সংগ্রামে তাঁহাদিগকে অধিকতর বিব্রত না করার মধ্যেই এই সংগ্রামের শক্তি নিহিত আছে।"

কত দিন এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিবে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের সংগ্রাম অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চলিতে থাকিবে। অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের কমে ইহা শেষ হইবে না।" শুধু জেলগুলি পূর্ণ করার উপর তাঁহার আস্থা নাই। জেলগুলি পূর্ণ করিলেই ভারতের স্বাধীনতা আসিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি গঠনমূলক কার্য্যকেই আইন অমান্য আন্দোলনের ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। উক্ত বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, "ইহাতে (গঠনমূলক কার্য্য দ্বারা) ক্রমশঃ কর্ম্মীর মনে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও অহিংসার আদর্শ পুষ্টিলাভ করে।"

নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং অহিংসার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সত্যাগ্রহী নির্ব্বাচন করিবার উদ্দেশ্যেই আজকাল মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহীর নাম নির্ব্বাচনে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন।

—

ভারতের নয়া জঙ্গীলাট

জেনারেল স্যার ক্লড অচিনলেকের স্থানে মধ্য প্রাচ্যের প্রধান বৃটিশ সেনাপতি স্যার আর্চিবোল্ড ওয়েভেলকে ভারতের জঙ্গীলাট নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং স্যার ক্লড অচিনলেক মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান বৃটিশ সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। স্যার ক্লড অচিনলেক মাত্র পাঁচ মাস ভারতের জঙ্গীলাটরূপে কাজ করিয়াছেন। মাত্র গত জানুয়ারী মাসে তিনি ভারতের জঙ্গীলাট হইয়া আসিয়াছিলেন। অন্য সময় হইলে এই বিষয় লইয়া কাহারও কৌতূহল জাগ্রত হইত না, কিন্তু জার্ম্মানী রাশিয়া আক্রমণ করায় ইউরোপীয় যুদ্ধে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে

ারই ফলে এই নিয়োগ-বদলী লইয়া অনেক জল্পনা-
াার সৃষ্টি হইয়াছে।

সরকারী দপ্তর হইতে অবশ্য প্রচার করা হইয়াছে যে, কাল যুদ্ধ করিয়া জেনারেল ওয়েভেল একটু ক্লান্ত হইয়া য়াছেন। এই জন্য একটু বিশ্রাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে াকে ভারতের জঙ্গীলাট নিযুক্ত করা হইয়াছে। ান যুদ্ধে বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করিতে না পারিলেও ারেল ওয়েভেল আফ্রিকার যুদ্ধে এবং ইরাক ও রয়ায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জন্য নকে মনে করেন, জার্মানী কর্ত্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত য়ায় সামরিক দিক হইতে ভারতবর্ষের গুরুত্ব বৃদ্ধি য়াছে বলিয়া তাঁহাকে ভারতের জঙ্গীলাট নিযুক্ত করা য়াছে। পার্লামেণ্ট মহাসভার সদস্য মিঃ জে, জে, লসনও কথাই বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত ার জন্য বিপুল আয়োজন করা প্রয়োজন। ভারত-ব ও বড়লাটের প্রস্তাবিত 'ডিফেন্স এড্ভাইসারী উন্সিল' আজও গঠিত হয় নাই। বিদায়ী জঙ্গীলাট শ্য আইনসভার কতিপয় সদস্য লইয়া একটা দেশরক্ষা ঘটী গঠন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কংগ্রেস ও মুসলিম গের সদস্য নাই। নূতন জঙ্গীলাট বিচক্ষণ যোদ্ধা। নি উক্ত দেশরক্ষা কমিটীকে আরও বিস্তৃত করিতে চেষ্টা রবেন কিনা তাহা হয়ত শীঘ্রই আমরা জানিতে পারিব। ন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যদি বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূর রিবার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে দেশরক্ষা কমিটীতে া কংগ্রেসের যোগদানের কোন সম্ভাবনা দেখা ইতেছে না।

—

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণের প্রথম কারখানা

২১শে জুন ভিজাগাপট্টমে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন াম্পানীর উদ্যোগে ভারতে প্রথম জাহাজ-নির্ম্মাণ-ারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই ারখানার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। যে স্থানে ই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহার নাম 'গান্ধী গ্রাম' খা হইয়াছে। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিতে যাইয়া ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের প্রাচীন নৌ-শিল্পের ইতিহাস সম্বলিত যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই সংখ্যা মাতৃভূমির সঞ্চয়নে প্রদত্ত হইল।

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম কলিকাতাতেই এই কারখানা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের বিরোধিতার ফলে তাহা হয় নাই।

ভারতে এক কালে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা ছিল। কিন্তু একশত বৎসর হইল ভারতীয় নৌ-শিল্প বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় নৌ-শিল্পের বিলুপ্তির ইতিহাস আজ আর কাহারও নিকট অবিদিত নাই। ভারতীয় নৌ-শিল্পকে যুগোপযোগী করিয়া প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে বহু অন্তরায় রহিয়াছে। সরকারী সাহায্য ব্যতীত নৌ-শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সহজও নহে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া আবেদন-নিবেদন করা সত্ত্বেও সরকার এ সম্বন্ধে কিছু করেন নাই। বহু বাধা সত্ত্বেও সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা সার্থক হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

—

ভারত-সংক্রান্ত বক্তৃতার উপাদান

পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ সোরেন্সেনের একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ পায় যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের দপ্তর হইতে "ভারত-সংক্রান্ত বক্তৃতার উপাদান' শীর্ষক একটি পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছিল। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া যাহাতে ভুল না করেন ইহাই উক্ত পুস্তিকা প্রচারের উদ্দেশ্য। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার চেষ্টায় ঐ পুস্তিকার একখণ্ড ভারতে আনীত হয়। এই পুস্তিকার এক স্থানে বলা হইয়াছে, "আত্মীয়-স্বজনে অনুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন বৃটেনের মতে একটা পাপ, কিন্তু ভারতবাসীর মতে পুণ্য।" অনুচিত স্বজনপ্রীতি যে কাহার বেশী তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। উক্ত পুস্তিকার আর এক স্থানে আছে, "বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে ভারতের জনসাধারণ চিরকালই হত দরিদ্র ছিল, প্রাচুর্য্য তাহাদের কখনও ছিল না।" কিন্তু ভারতের

প্রচুর ঐশ্বর্য্যই যে ইউরোপীয় বণিকদিগকে ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, ইতিহাস আজও সে কথা ভুলে নাই।

সম্প্রতি প্রচার বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তিকা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসী সম্পর্কে এইরূপ মিথ্যা প্রচার প্রতিরোধ করিবার উপায় কি ?

—

খাওয়া-পরার সমস্যা

চাউল দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। কাপড়ের দামও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা কেন উচিত নয় তাহার সমর্থনে গবর্ণমেণ্ট যে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন তাহাতে অন্যান্য যুক্তির মধ্যে একটি হইল এই যে, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইলে কৃষকের সুবিধা হইবে। কিন্তু এ কথা তো সরকারের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয় যে, ধানের ফসল উঠিবার কয়েক মাসের মধ্যেই চির-অভাবগ্রস্ত কৃষক সমস্ত ধানই বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় এবং পরে তাহাদের খাইতে হয় চাউল কিনিয়া। বর্ত্তমানে কৃষকের হাতে ধান-চাউল কিছুই নাই, আছে শুধু অর্থাভাব। ধান-চাউল এখন ব্যবসায়ীদের হাতে। কাজেই অগ্নিমূল্যে চাউল ক্রয় করিতে হওয়ায় কৃষকদেরই বেশী কষ্ট হইতেছে।

চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চাউলের উৎপাদন হ্রাস এবং যুদ্ধের জন্য জলযানের অভাবে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানি কমিয়া যাওয়াই চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর বাংলা দেশে শতকরা ২০ ভাগ চাউল কম উৎপন্ন হইয়াছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে শতকরা ১৫ ভাগ কম। গত বৎসর অপেক্ষা এবার ব্রহ্মদেশ হইতে শতকরা ৩৩ ভাগ চাউল কম আমদানি হইয়াছে। চাউলের উৎপাদন হ্রাস এবং যুদ্ধের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চাউল আমদানি সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে গবর্ণমেণ্টের অবহিত হওয়া উচিত ছিল। এদিকে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট চাউল রপ্তানি সম্প্রতি বন্ধ করায় আমাদের অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া সরকারী ইস্তাহারে যে উক্তি করা হইয়াছে তাহা শেষ পর্য্যন্ত কতখানি কার্য্যকরী হইবে তাহা বলা কঠিন। যুদ্ধের পূর্ব্বে চাউলের যে দাম ছিল এখনও তাহাই থাকিবে তাহা অবশ্য আমরা আশা করি না, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

যুদ্ধের জন্য বিদেশী কাপড় এবং সুতার আমদানী হ্রাস পাওয়ায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের একটা নূতন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কাপড়ের দাম যদি এই ভাবে বাড়িতে থাকে তাহা হইলে যে শুধু দরিদ্র জনসাধারণেরই অসুবিধা হইবে তাহা নহে, বস্ত্রশিল্পের প্রসারের পক্ষেও প্রচুর বাধা সৃষ্টি হইবে। কাপড়ের উৎপাদন কিরূপে আরও বৃদ্ধি করা যায়, আশা করি কাপড়ের কলের মালিকগণ সে সম্বন্ধে অবহিত হইয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের স্থায়ী মঙ্গল বিধান করিবেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট

সিনেটের বিশেষ সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪১-৪২ সনের যে বাজেট পেশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরে আয় হইবে ৩৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫৫৫ টাকা এবং ৪১ লক্ষ ২২ হাজার ৮৮৪ টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং ঘাটতি পড়িবে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা। বৎসরের প্রারম্ভে যে টাকা তহবিল আছে তাহা হইতে ঘাটতি পূরণ করিয়া বৎসরের শেষে ১১,৯৭৫ টাকা তহবিল থাকিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

বাজেট পেশ করিতে যাইয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অবশ্য বলিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন হতাশার ভাব পোষণ করিবার কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার এই কথাতে দেশবাসী কি আশ্বস্ত হইতে পারিবে? গত তিন বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন দিকে বিস্তৃতি লাভ করাই উহার কারণ; কিন্তু তাঁহারা যদি সব দিক ভাল ভাবে বিবেচনা করিয়া ব্যয়বরাদ্দ না করেন তাহা হইলে কয়েক বৎসর পরেই আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা কঠিন হইবে। তখন হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফিস

করিয়া আয় বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু তে কেবল উচ্চশিক্ষা প্রতিহতই হইবে।

—

বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং

ললিতচন্দ্র হাইত নামক জনৈক যুবক স্ত্রী ও পুত্রকে । করিবার অভিযোগে আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। দণ্ড প্রদান করিতে া বিচারপতি বলিয়াছেন, "দারিদ্র্য এবং মর্য্যাদাহানির বনা নিশ্চয়ই দুইটি নরহত্যা করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত । যদি কোন স্বামী পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম হয় . তাহার উপর আবার পোষ্যবর্গকে হত্যা করে তাহা ল তাহা অপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনা আর কিছুই হইতে র না। আইন কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে র না যে, দারিদ্র্য ও পারিবারিক সম্মান হত্যার ক্তিকতার সমর্থক।"

আইন সম্পর্কে বিচারপতির নির্দ্ধারণ ঠিকই হইয়াছে। ন্তু দরিদ্রতা একটি সামাজিক পাপ। পরোক্ষ ভাবে াজ এবং রাষ্ট্র উভয়েই দরিদ্রতার জন্য দায়ী। আইনের ান মানুষেই রচনা করে। দরিদ্রের অন্ন সংস্থানের বস্থায় সমাজের উপেক্ষার ফলে যুগ যুগ ধরিয়া যে পাপ ীভূত হইয়াছে অতি কঠোর আইন দ্বারাও তাহার য়শ্চিত্ত হয় না, যত দিন না পাপের প্ররোচনা দূরীভূত রিবার ব্যবস্থা করা হয়।

—

যুদ্ধে বাঙ্গালী বৈমানিকের মৃত্যু

১৭ই জুন রাজকীয় বিমান বাহিনীর তরুণ বাঙ্গালী ইলট অফিসার শ্রীযুত কালীপ্রসাদ চৌধুরী লণ্ডনের উপর র্ম্মান বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে যুদ্ধনিরত অবস্থায় হত হইয়াছেন। শ্রীযুত চৌধুরী স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার P, এন, চৌধুরীর কনিষ্ঠপুত্র। গত সেপ্টেম্বর মাসে াজকীয় বিমান বাহিনীর অধীনে পাইলট অফিসার রূপে েনিং লইবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার য়স পঁচিশ বৎসর হইয়াছিল। তিনি নির্ভীক, কর্ত্তব্য-রায়ণ এবং সুনিপুণ বৈমানিক ছিলেন।

বীরের কর্ত্তব্য সাধন করিতে যাইয়া তিনি মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি, কিন্তু শোকাশ্রুপাত করিয়া বীরত্বের গৌরবময় স্মৃতির অবমাননা করিব না। তাঁহার অসম সাহসিকতা এবং বীরত্বের পুণ্যস্মৃতি চিরকাল বাঙ্গালী-যুবককে উদ্দীপিত করিয়া তুলিবে। শ্রীযুত চৌধুরীর মাতা বর্ত্তমান। পুত্রের মৃত্যু যতই গৌরবময় হউক, মায়ের প্রাণ তাহাতে সান্ত্বনা মানে না। আমরা পুত্রশোকসন্তপ্তা মিসেস্ চৌধুরীকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

—

পরলোকে গুরুসদয় দত্ত

১১ই আষাঢ় বুধবার প্রাতঃকালে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক এবং অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। গত তিন মাস যাবৎ তিনি প্যাঙ্ক্রিয়াস ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন।

গুরুসদয় দত্ত ১৮৮২ সালে শ্রীহট্ট জেলায় বীরশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৯০৪ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ সালে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯২৮ সালে বামুনগাছি গুলিবর্ষণের মোকদ্দমায় তিনি যে রায় প্রদান করেন তাহাতে পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং এই জন্য বিশেষ এক তদন্তের ব্যবস্থা হয়। নারীজাতির কল্যাণের জন্য তাঁহার স্বর্গগতা পত্নীর নামানুসারে তিনি সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে এই প্রতিষ্ঠানের চারিশত শাখা আছে। ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে তিনি ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যান। তাঁহার পল্লীসংস্কার আন্দোলন এই সময় হইতেই ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয়। ১৯৩২ সালে তিনি ব্রতচারী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।' এই আন্দোলনের ব্যাপকতা শুধু বাংলা দেশেই আবদ্ধ নয়, বাংলার বাহিরেও ইহা প্রসার লাভ করিয়াছে। সুলেখক এবং সাহিত্যিক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। গত ডিসেম্বর

মাসে জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে তিনি মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহার মধ্যে দেশাত্ম বোধের অভাব ছিল না। জনসেবার জন্য তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল এবং নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত তিনি তাঁহার কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সিভিলিয়ানদের তিনি আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন একনিষ্ঠ দেশ-সেবককে হারাইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—

স্যার চিন্তামণি পরলোকে

বিশিষ্ট উদারনৈতিক নেতা স্যার চিরভুরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি ১লা জুলাই অপরাহ্ণে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর যাবৎ তিনি হাঁপানী রোগে ভুগিতেছিলেন।

শ্রীযুত চিন্তামণি ১৮৮০ সালের ১২ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ সাল হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি যুক্তপ্রদেশের আইন সভার সদস্য ছিলেন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি যুক্ত প্রদেশের শিক্ষা ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু পরে উক্ত শাসন সংস্কারের অসারতা বুঝিতে পারিয়া মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করেন। রাজনীতিতে তিনি উদার-নৈতিক মতাবলম্বী ছিলেন। কিছুদিন কংগ্রেসের সেবাও তিনি করিয়াছেন। প্রথম হইতেই এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত লীডার পত্রিকার সহিত তিনি সংযুক্ত ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি উক্ত পত্রিকার চীফ্‌ এডিটার হন। তিনি নির্ভীক এবং তেজস্বী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় সংবাদপত্র-জগতের প্রভূত ক্ষতি হইল।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—

তেজস্বী মহিলা কর্ম্মী রেণুকা বসুর অকালমৃত্যু

বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী এবং ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীমতী রেণুকা বসুর অকালমৃত্যুতে আমরা গভীর ব্যথা অনুভব করিতেছি। ইডেন হাসপাতালে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিবার পর ১৮ই আষাঢ় বেলা ১০টায় তাঁহার মৃত্যু হয়। নবজাত শিশুটি জীবিত আছে।

শ্রীমতী রেণুকা বসু ঢাকা জেলার সোনারং নিবাসী বিনোদবিহারী সেন মহাশয়ের কন্যা। ১৯৩০ সালে বেথুন কলেজে ছাত্রী ধর্ম্মঘটে নেতৃত্ব করিবার অপরাধে তিনি কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হন। তিনি তখন বি-এ পড়িতেছিলেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। পরে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে ধৃত হইয়া দীর্ঘকাল বন্দীশিবিরে আটক ছিলেন। তাঁহার মাতামহ মুন্সীগঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন মহাশয়ের গৃহে তাঁহাকে অন্তরীণ করা হইলে গবর্ণমেণ্ট ভাতা না দেওয়ায় তিনি অন্তরীণ বিধি ভঙ্গ করেন। উক্ত অন্তরীণ বিধিভঙ্গের মামলায় তিনি যে যুক্তিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট যখন তাঁহাকে অন্তরীণ করিয়াছেন তখন তাঁহার ভাতার ব্যবস্থা করিতেও গবর্ণমেণ্ট বাধ্য। গত বৎসর ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী বর্ত্তমানে শ্রীকাইল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত অতীন্দ্রনাথ বসুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতীন্দ্রবাবুর এই গভীর পত্নী-শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

—

পরলোকে পোল্যাণ্ডের পিয়ানোবাদক ও রাজনীতিক

পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত পিয়ানোবাদক এবং রাজনীতিক ইগনাজ জন প্যাডেরি-উস্কী এক সপ্তাহ রোগ ভোগের পর ৩০শে জুন পরলোক গমন করিয়াছেন।

প্যাডেরিউস্কী ১৮৬০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁহার অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ২৭ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তিনি কখনও সর্ব্ব-সাধারণের সমক্ষে সঙ্গীতাসরে অবতীর্ণ হন নাই। ১৮৮৭

:ল ভিয়েনার জনসাধারণ সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীত বিদ্যায় হার অসাধারণত্বের পরিচয় পায়। গত মহাযুদ্ধের পর াল্যাণ্ডের আহত সৈনিকদের সাহাষ্যার্থ প্যারিস, লণ্ডন ং নিউইয়র্কে সঙ্গীত জলসা করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ :রেন। তাঁহারই চেষ্টায় প্রেসিডেণ্ট উইলসন স্বাধীন াল্যাণ্ড রাষ্ট্র গঠনে সম্মত হন। তাঁহারই চেষ্টায় নাডায় বিশ হাজার পোল সৈন্য সুশিক্ষিত হইয়া উঠে। 5 শেষ হইলে তিনি পোল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ন সপ্তাহের মধ্যেই স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়া নিজে হার প্রধান এবং পররাষ্ট্র সচিবের পদ গ্রহণ করেন। াল্যাণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি উহার প্রসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে পাল্যাণ্ডের নীতি লইয়া মার্শাল পিলসুদস্কীর সহিত াহার মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় এবং তিনি পদত্যাগ করেন। ৯২১ সালে তিনি রাজনীতির সহিত সকল সম্পর্ক রিত্যাগ করেন। অতঃপর কালিফোর্নিয়ায় যাইয়া সঙ্গীত র্চায় দিনাতিপাত করিতে থাকেন।

প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ এবং বিশিষ্ট রাজনীতিক হসাবে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

—

স্যার হরিসিং গৌড়ের লাঞ্ছনা

স্যার হরিসিং গৌড় একজন বিশিষ্ট ভারতবাসী। কিন্তু হইলে কি হইবে, 'কালা আদমী' বলিয়া লণ্ডনের একটি হোটেলে তাঁহার স্থান হয় নাই। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনে বাস করিতেছেন। তিনি যে বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন তাহাতে বোমা পড়ায় তিনি অন্যত্র এক হোটেলে থাকিতে যান, কিন্তু হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্থান দিতে অস্বীকৃত হয়। এ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টেও প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ মরিসন জানাইয়াছেন, উক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি যদি ব্যবস্থা করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি সুখীই হইতেন। কিন্তু ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

স্যার গৌড় ইংরেজ স্ত্রীর স্বামী হইলেও ভারতীয় নাম আর তাঁহার ঘুচিবার নহে। ভারতীয় বলিয়া তাঁহার এই অপমান সমগ্র ভারতবাসীকেই স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ না করিব ততদিন এইরূপ ভাবেই ভারতবাসীকে অপদস্থ হইতে হইবে।

—

পাটকল-শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা

ভারতীয় পাটকল-মালিক সমিতি পাটকলের শ্রমিকদের জন্য মাসিক এক টাকা হারে মাগ্‌গী ভাতা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই সমিতির অধীনে ৭৪টি মিল আছে। শ্রমিকদের বেতনের হার অনুপাতে এই ভাতার কোন তারতম্য হইবে না।

পাটকলগুলি অত্যধিক লাভ করিতেছে এবং খাদ্য-দ্রব্যাদির মূল্যও বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এক টাকা ভাতা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। রেলওয়ে শ্রমিকদের তিন টাকা হারে মাগ্‌গী ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে। পাটকলের শ্রমিকদের পক্ষ হইতেও তিন টাকাই দাবী করা হইয়াছিল। কল-মালিকের লাভ বাড়িলেই যে মজুরের মজুরি বাড়ে না এই ব্যাপারে তাহাই প্রমাণিত হইল। পাটকলের মালিকগণের পক্ষে বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা করা উচিত।

—

কলেজের সংখ্যা

কলেজী শিক্ষাসংক্রান্ত বৎসর আরম্ভ হয় জুন মাস হইতে। এবার নূতন সেসনের প্রারম্ভে বাংলা দেশে কলেজের সংখ্যা পাঁচটি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজের সংখ্যা ছিল ৬৪টি। ঐ সালে নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় দুইটি। ১৯৪০-৪১ সালে ছয়টি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মোট কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৯টি। বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট কলেজের সংখ্যা হইল ৮৪টি।

১৯৩৭-৩৮ সনে বাংলা ও আসামে শুধু মেয়েদের জন্য কলেজ ছিল মাত্র ৫টি। ১৯৪০-৪১ সনে উহার সংখ্যা ১১টিতে দাঁড়ায়। সম্প্রতি আর একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ১৯৪১-৪২ সনের প্রারম্ভে শুধু মেয়েদের জন্য কলেজের সংখ্যা ১২টি হইল। ইহা ব্যতীত ১৬টি কলেজে ছাত্র-ছাত্রী উভয়ই ভর্ত্তি করা হয়। দুইটি কলেজে মেয়েদের জন্য পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা আছে।

—

ইউরোপীয় যুদ্ধের নূতন অধ্যায়

ক্রীট যুদ্ধের পর জার্ম্মানীর আক্রমণ কোন্ দিকে চলিবে—জার্ম্মানী সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হইবে, না প্রচণ্ড বেগে বৃটেন আক্রমণ করিবে, এই চিন্তা লইয়া সকলে যখন মাথা ঘামাইতেছিল তখন সমগ্র পৃথিবীকে বিস্মিত করিয়া দিয়া হিটলার অতর্কিতে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়া বসিল। হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ অপ্রত্যাশিত না হইলেও এত শীঘ্র—রুশ-জার্ম্মান আক্রমণ চুক্তির দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই—রুশ-জার্ম্মান সংঘর্ষ বাঁধিয়া উঠিবে ইহা অনেকের মনেই স্থান

পায় নাই। ১৯৩৯ সনের ২৩শে আগষ্ট ১০ বৎসরের জন্য রাশিয়ার সহিত জার্ম্মানীর অনাক্রমণ চুক্তি হয়। এই চুক্তি সত্ত্বেও জার্ম্মানী যে রাশিয়া আক্রমণ করিতে পারে এ সম্বন্ধে ষ্ট্যালিন নিঃসন্দেহ ছিলেন। গত জানুয়ারী মাসে নববর্ষের বাণীতে এ কথাটা ষ্ট্যালিন স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। "সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছে, সকলে যেন প্রস্তুত থাকে," তাঁহার এই ঘোষণায় আসন্ন জার্ম্মান-আক্রমণের আশঙ্কাই প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি এই আক্রমণ যে আকস্মিক তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, আক্রমণের কয়েকদিন পূর্ব্বেও পূর্ব্বসীমান্তে জার্ম্মান-সৈন্য সমাবেশের সংবাদে যখন আসন্ন রুশ-জার্ম্মান সংঘর্ষের সম্ভাবনার কথা উঠিয়াছিল তখনও অনেকে উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই। জার্ম্মানী আক্রমণ করিয়াছে আগে, তারপর যুদ্ধ ঘোষণার নোট রাশিয়াকে প্রদান করিয়াছে। আক্রমণটা এতই অতর্কিত যে রুশ-সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও রাশিয়ার বিস্তীর্ণ নূতন সীমান্ত একরূপ অরক্ষিতই ছিল।

রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সকলের মনেই এই প্রশ্ন জাগিয়াছে, হিটলার হঠাৎ রাশিয়া আক্রমণ করিলেন কেন? অবশ্য হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণাতে আক্রমণের কারণও উল্লেখ করা হইয়াছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মান-বিরোধী নীতি এবং গ্রেট বৃটেনের সহিত অধিকতর রাজনৈতিক ও সামরিক ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ করা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি কম্যুনিজমের হাত হইতে সভ্যজগতকে রক্ষা করা এই আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়াও হিটলার দাবী করিয়াছেন।

নাৎসীবাদ যে কম্যুনিজমের ভীষণ শত্রু তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু কম্যুনিজম ধ্বংসের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছেন একথা বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষে কঠিন। কারণ বৃটেনের ন্যায় একটি প্রবল শক্তিশালী রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় শুধু জার্ম্মান-বিরোধী নীতি এবং বৃটেনের সহিত ঘনিষ্ঠতার অজুহাতে শত্রু বৃদ্ধি করিতে হিটলার সহজে ইচ্ছুক হন নাই, ইহাই অনেকের ধারণা। তাঁহাকে প্রয়োজনের চাপে পড়িয়াই রাশিয়াকে আক্রমণ করিতে হইয়াছে।

বৃটেনের সহিত যুদ্ধ আরও দীর্ঘকাল চালাইতে হইলে খাদ্য এবং তৈল উভয়ই জার্ম্মানীর প্রয়োজন। প্রকাশ, এই প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে হিটলার রাশিয়ার নিকট অর্থনৈতিক এবং সামরিক সহযোগিতার বিনিময়ে জার্ম্মানীর পক্ষে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষে তাহা করা সম্ভব নয়। কাজেই শস্যের জন্য ইউক্রেন এবং তৈলের জন্য ককেশাস দখল করিবার উদ্দেশ্যে হিটলারকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিতে হইয়াছে। হিটলার হয়ত ভাবিয়াছেন, তড়িৎ আক্রমণে রাশিয়াকে পরাস্ত করিতে পারিলে তো ভালই। খাদ্য এবং তৈল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি বৃটেনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন। কিন্তু রাশিয়া সামরিক শক্তিতে যে জার্ম্মানী অপেক্ষা ন্যূন নয়, একথা হিটলার অবশ্যই জানেন। বোধ হয় এই জন্যই, নাস্তিক বলশেভিকবাদের শত্রু রাশিয়ার গোঁড়া ধার্ম্মিকদের সাহায্য এবং সমর্থন পাইবার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে রাশিয়ার জন্য একজন জারও তিনি খাড়া করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যদি আশা করিয়া থাকেন যে, যুদ্ধে রাশিয়া বিজয়ী হইতে থাকিলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি শত্রুতা ভুলিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, তাহা হইলে তাঁহার জানিয়া রাখা উচিত, উহা তাঁহার বৃথা আশা। কম্যুনিজম পছন্দ না করিলেও বৃটেন এবং আমেরিকা রাশিয়াকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং নাৎসীবাদ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত এই সাহায্য তাহারা করিবেই। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের গোড়ায় জার্ম্মানী যদি প্রথমেই রাশিয়াকে আক্রমণ করিত তাহা হইলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি নিরপেক্ষ থাকিত কি না, সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। কিন্তু বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে বৃটেন এবং রাশিয়া পরস্পরের সহযোগিতায় নাৎসীবাদ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। নাৎসী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনের জন্য বৃটিশ ও সোভিয়েট উভয় গবর্ণমেণ্ট পরস্পরকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সমর্থন করার এবং পরস্পরের সম্মতি ব্যতীত পৃথক সন্ধি বা চুক্তি না করিবার প্রতিশ্রুতিতে একটি বৃটিশ-সোভিয়েট চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে।

—

রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধে জাপ মনোভাব

রাশিয়ার সহিত জাপানের নিরপেক্ষতা চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এই চুক্তির অবস্থা কি হইবে এবং জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর সহিত যোগদান করিবে কিনা, এই প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হইয়াছে। রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ সম্পর্কে জাপ পররাষ্ট্র সচিব যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তিনি সতর্কতাই জাপানের মূল নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কম্যুনিজমের প্রতি জাপানের মোটেই কোন প্রীতি নাই, বরং জাপান কম্যুনিজমের ঘোর শত্রু। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় জাপান সহসা কিছুই করিবে বলিয়া মনে হয় না। জাপান অপেক্ষা করিবে ঝাড় বুঝিয়া কোপ মারিবার জন্য, অর্থাৎ পাল্লা যে দিকে ঝুঁকিবে জাপানের পক্ষে সেই দিকে যোগ দেওয়া আশ্চর্য্য নয়।

—

রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের পরিস্থিতি

জার্ম্মানী রাশিয়া আক্রমণ করায় এই যুদ্ধের সম্ভাব্য [গ]তি সম্বন্ধে ঘরে-বাহিরে অনেক রকম আলোচনাই সুরু [হই]য়াছে। হিটলারের তড়িৎ আক্রমণের সম্মুখে গত [দু]ই বৎসরের মধ্যে ইউরোপের দ্বাদশটি রাজ্য, ফ্রান্সের মত [এক]টি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র সহ, নতি স্বীকার করিতে বাধ্য [হ]ওয়ায় সকলের মনে জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি সম্বন্ধে [এক]টা চমকপ্রদ বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এদিকে বিরুদ্ধ [প্র]চারের ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তির [উ]ৎকর্ষতা সম্বন্ধে একটা লঘু ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তার[প]র যুদ্ধের সংবাদ সম্পর্কে উভয় পক্ষ হইতে যে ইস্তাহার [প্র]কাশিত হয় তাহার মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী সংবাদ [দে]খা যায়। এই জন্যই যুদ্ধের সম্ভাব্য গতি লইয়া চায়ের [আ]সরে যে ধরণের দায়িত্বহীন মন্তব্য করা চলে সংবাদ-[প]ত্রের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

প্রথমে ইহা একটা সামগ্রিক (total) যুদ্ধ। কোন [এ]কটা বা একাধিক ক্ষেত্রে জয়লাভ করিলেও চূড়ান্ত জয়ের [স]ম্বন্ধে এখন কোন কথা বলা যায় না। বলা না গেলেও, ইহা [অ]তি সত্য কথা যে, সশস্ত্র যুদ্ধ তর্কযুদ্ধ নয়। ইহার শেষ [জ]য়-পরাজয় একটা হইবেই এবং উহাকে অস্বীকার [ক]রিবার উপায় থাকিবে না।

রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ চলিতেছে উত্তর-সাগর হইতে কৃষ্ণ-[স]াগর পর্য্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল দীর্ঘ রণক্ষেত্রে। রয়টারের সামরিক সমালোচক বলিয়াছেন, "রণক্ষেত্রের বিস্তার, সৈন্যসংখ্যা এবং সমরোপকরণের দিক হইতে ইহা ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ।" জার্ম্মানী তাহার নিজের সামরিক শক্তি ব্যতীত বিজিত দেশগুলির সৈন্যবল, অর্থবল এবং সমরোপকরণের পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ উভয়বিধ সাহায্যই এই যুদ্ধে পাইতেছে। রুমানিয়ার সৈন্যেরা তো ইতিমধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ফিন-ল্যাণ্ডের সৈন্যও জার্ম্মানীকে সাহায্য করিবে। রাশিয়ার সামরিক শক্তিও কম নয়। ১৯৪০ সালে রাশিয়ার সৈন্য-বল ছিল ১৬ লক্ষ ৭০হাজার। ইতিমধ্যে সৈন্যবল নিশ্চয়ই আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় সকলকেই সামরিক শিক্ষা লাভ করিতে হয়। ১৯৩৯ সালে রাশিয়ার যুদ্ধ-বিমানের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার এবং ট্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। প্যারাসুট বাহিনীর স্রষ্টাই হইল রাশিয়া। ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার, টর্পেডো, সাবমেরিণ প্রভৃতিতে রাশিয়া যে জার্ম্মানী হইতে বেশী পিছনে পড়িয়া আছে তাহা নয়। তবে এই সামরিক শক্তির পরীক্ষা আজও হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের যেটুকু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় জার্ম্মানী এতদিনে তাহার সমকক্ষ আর একটি শক্তির সম্মুখীন হইয়াছে।

যে বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ চলিতেছে তাহাকে উত্তর, দক্ষিণ এবং মধ্য এই তিন অংশে বিভক্ত করা যায়। উত্তর রণাঙ্গনে জার্ম্মানীর লক্ষ্য মুরমনস্ক বন্দর এবং লেনিনগ্রাড। রাশিয়ার এই বন্দরটি উত্তর মেরুসাগরে অবস্থিত একমাত্র বন্দর যাহার জল জমিয়া বরফ হয় না। গত যুদ্ধের সময় আমেরিকা এবং ব্রিটেনের সাহায্য এই বন্দর দিয়াই রাশিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল। লেনিন-গ্রাড একটি প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র। জার্ম্মানী উহা দখল করিতে পারিলে রাশিয়ার পক্ষে বাল্টিক সাগরে যাইবার আর উপায় নাই।

মধ্য রণাঙ্গনে জার্ম্মেনীর লক্ষ্য মস্কো এবং ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ। মস্কো অধিকার করিবার জন্য জার্ম্মানা সাঁড়াশীর মত অর্থাৎ দুই দিক হইতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে।

দক্ষিণ রণাঙ্গনে জার্ম্মানীর লক্ষ্য বেসারাবিয়া। কৃষ্ণ সাগরের তীরস্থ ওডেসা বন্দরও তাহাদের লক্ষ্য। ১২ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ জার্ম্মানী বস্ফরাস দখল করিবার জন্য বুলগেরিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। বস্ফরাস কৃষ্ণসাগর এবং মর্ম্মর সাগরের সংযোগকারী প্রণালী। ইহা অধিকারে আসিলে জার্ম্মানী বস্ফরাসের তীরস্থ তুরস্কের বন্দর স্কুটারী হইতে বাটুমে এবং বাটুম হইতে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী বাকুর দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। বাকুর তৈলের খনির প্রতি জার্ম্মানীর যথেষ্ট লোভ আছে। তবে বস্ফরাস দখল করিলে তুরস্কের নিরপেক্ষতা আর রক্ষিত হইবে না। যুদ্ধের সংবাদ আলোচনা করিলে দেখা যায়, রাশিয়া জার্ম্মানীর হঠাৎ আক্রমণের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়াছে।

জার্ম্মানী মুরমনস্ক বন্দর দখল করিতে পারে নাই, যদিও কয়েকদিন পূর্ব্বে উহা দখল করিয়াছে বলিয়া জার্ম্মানী দাবী করিয়াছিল। লেনিনগ্রাড, মস্কো এবং কিয়েভের দিকে জার্ম্মানীর অগ্রগতি রাশিয়া প্রতিহত করিয়াছে। তবে জার্ম্মানী দাবী করিয়াছে যে, তাহারা সমগ্র বেসারাবিয়া দখল করিয়াছে। রাশিয়ার প্রবল বাধায় জার্ম্মান আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং প্রায় দুই দিন পর্য্যন্ত জার্ম্মান আক্রমণ একরূপ নিশ্চল অবস্থায় থাকে। ইহা প্রবল ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ। ১২ই জুলাই পুনরায় জার্ম্মানবাহিনী 'ব্লিৎসক্রিগ' অর্থাৎ বিদ্যুতের মত বেগে আক্রমণ করিয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে জার্ম্মানী লাটভিয়া এবং এস্তোনিয়া ছাড়াইয়া এপর্য্যন্ত মূল সোভিয়েট সীমানায় পৌঁছিতে পারে নাই। জার্ম্মানী দাবী করিয়াছে, জার্ম্মান যন্ত্রসজ্জিত বাহিনী সোভিয়েট এস্তোনিয়ার সীমান্তবর্ত্তী পিপাস হ্রদের পূর্ব্বদিকে লেনিনগ্রাডের দিকে অগ্রসর হইতেছে। লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, বেসারাবিয়া রণাঙ্গনে রুশগণ পুনরায় ব্যূহ সংস্থাপন করিতেছে।

ষ্ট্যালিন লাইন ভেদ করার যে দাবী জার্ম্মানী করিয়াছে রাশিয়া কর্ত্তৃক তাহা সমর্থিত হয় নাই। জার্ম্মানী স্থানে স্থানে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রাশিয়া ইহার জবাবে কি করিতেছে তাহা জানা যায় নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা জানিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু বুঝা যাইতেছে, রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে জার্ম্মানী দ্রুত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না।

—

চীন-যুদ্ধের পঞ্চম বর্ষ

বর্ত্তমান জুলাই মাসে চীন-জাপান যুদ্ধের পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইল। ১৯৩৬ সালের ৭ই জুলাই জাপান চীন আক্রমণ করিবার সময় জাপ প্রধান মন্ত্রী আশা করিয়াছিলেন, তিন মাসের মধ্যেই চীন পরাজিত হইবে। কিন্তু তিন মাসের স্থানে তিন বৎসর—চার বৎসরও পার হইয়া গেল, তবু জাপান চীনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পারিল না।

যুদ্ধের সুরু হইতে ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে জাপান চীনের প্রধান প্রধান শহর, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি এবং রেলপথগুলি দখল করিয়া বসে। যুদ্ধের এই স্তরে চীন শুধু পিছু হটিতে থাকে বটে, কিন্তু এই সময়ই চীনের সামরিক শক্তিকেও সংগঠিত করা হয়। কারণ, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিয়াং-কাইশেক সচেষ্ট ছিলেন জাপানকে সন্তুষ্ট রাখিতে এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দমন করিতে। চীনকে সমরোপযোগী করিবার লক্ষ্য তখন তাঁহার ছিল না।

হ্যাঙ্কাউ-এর পতনের পর চীনের রাজধানী চুঙকিঙে স্থানান্তরিত করা হইল। এই সময় হইতে চীন সৈন্যবাহিনী জাপ-আক্রমণকে সম্মুখ ভাগে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করে এবং পশ্চাৎভাগে চীনের পার্টিজান গ্রুপগুলি অতর্কিত আক্রমণ করিয়া জাপ-সৈন্যবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। জাপ-অধিকৃত চীনের শহরগুলিতেই শুধু জাপানের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গরিলা আক্রমণের জন্য পল্লী অঞ্চলে জাপান প্রবেশ করিতে পারে নাই। অতঃপর ১৯৪০ সনের শেষ ভাগে—নবেম্বর মাস হইতে আরম্ভ হয় জাপানের পরাজয়ের পালা। জাপবাহিনীর পরাজয়ের সূচনা হয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনের কোয়াংশি প্রদেশ পরিত্যাগের সময় হইতে। ইহার পর উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ চীনের অনেক স্থান হইতেই জাপ সৈন্যকে পিছু হটিতে হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে চীনের জনগণের মধ্যে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া চিয়াংকাইশেক কম্যুনিষ্টদের চতুর্থ রুট আর্ম্মী ভাঙ্গিয়া দেন। কিন্তু শীঘ্র তাঁহার এই ভুল ভাঙ্গিয়াছে, তিনি কম্যুনিষ্টদের যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

বিগত চারি বৎসরের জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া চীন দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে—জাপসৈন্যকে সম্পূর্ণ রূপে চীন হইতে বিতাড়িত না করা পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ তাহাকে করিতে হইবে। জাপানও আজ বুঝিতেছে, চীনকে পরাজিত করা সহজ নয়, সম্ভবও নয় হয়ত। জাপ-পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্রসচিব এবং সমর-সচিবের উক্তিতেও এই সামরিক সঙ্কটের আশঙ্কা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

—

তৃতীয় বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪৮ } ৮ম সংখ্যা

বাংলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়*

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, জি-ডি-এ, আর-এ

বাংলার জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানী সমূহের রেজিষ্ট্রার

১৮৮০ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশে [ব্যা]ঙ্কিং কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছে মোট দেড় হাজার। [ই]হার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে প্রায় একহাজার [কো]ম্পানী। লোন অফিসগুলিকেও এই হিসাবের মধ্যে [ধরা] হইয়াছে। ১৮৮০ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত [চ]ল্লিশ বৎসরে মোট ১৫৬টি কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হয়, কিন্তু [১]৯২০ হইতে ১৯৪০সাল পর্য্যন্ত বিশ বৎসরের মধ্যে [রে]জেষ্ট্রী হইয়াছে ১ হাজার ৩ শত ৭৫টি কোম্পানী। [বা]ংলার ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির অর্দ্ধেক ব্যাঙ্কিং কোম্পানী, [বা]কী অর্দ্ধেক লোন অফিস। 'মেমোরেণ্ডাম অব [এ]সোসিয়েশনে' কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা [লি]খিত হয় তাহাকে ভিত্তি করিয়াই এই শ্রেণী-বিভাগ [ক]রা হইল। কিন্তু কাজ-কারবার পরিচালন ব্যাপারে [এ]ই দুইটি বিভাগের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা [দে]খিতে পাওয়া যায় না। এমন লোন অফিস খুব [ক]মই আছে যাহারা আমানত গ্রহণ করে না, কিম্বা [শু]ধু আদায়ীকৃত মূলধন (paid up capital) হইতেই [ঋ]ণ প্রদান করিয়া থাকে। তেমনি শুধু ব্যাঙ্কিং কার্য্যই [ক]রে, লোন অফিসের কাজ করে না এইরূপ ব্যাঙ্কিং [কো]ম্পানীও খুব বিরল।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রসার

গত বিশ বৎসরের মধ্যে এই যে এতগুলি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, ইহাকে ঠিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের কল্যাণপ্রসূ প্রসার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। গত যুদ্ধ-বিরতির (Armistice) অব্যবহিত পরবর্ত্তী দশকে (decade) পণ্যের দাম (price) চড়া থাকায় খাতকদের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা অব্যাহত ছিল। এই দশকের প্রথম কয়েক বৎসর কোম্পানীগুলির কাজ-কারবারও বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছিল এবং লাভও হইয়াছিল বেশ মোটা রকমের। কোম্পানীগুলির আদায়ীকৃত মূলধন বেশী ছিল না। কাজেই এই লাভ হইতে তাহারা উচ্চ হারেই লভ্যাংশ (dividend) প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, ব্যাঙ্কিং কোম্পানী গঠন করিবার জন্য একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কোন এক বৎসরের মধ্যেই (১৯২৭) গঠিত হইয়াছে ১ শত ৭৮টি কোম্পানী। মহকুমা অথবা জেলার ছোট সহরেও ২০টি, ৩০টি, ৪০টি এমন কি ৫০টি পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক আছে। এইরূপ ক্ষুদ্র স্থানে অতগুলি ব্যাঙ্কের স্থানীয় কোন প্রয়োজনীয়তা

* এই প্রবন্ধে যে অভিমত প্রকাশিত হইল তাহা লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত। সরকারী মতামতের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

আছে কি না, কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাগণ সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিয়াও দেখেন নাই। ইহার পরিণামে যে সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া আসিল তাহার তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে: (১) স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার অভাব, ফলে উপযুক্ত পরিমাণে কাজ সংগ্রহের অসামর্থ্য; (২) পণ্যের দাম হ্রাস হওয়ায় ঋণ পরিশোধ করিতে খাতকদের অক্ষমতা; (৩) *ব্যাঙ্কের টাকা খাটাইবার (investment) পদ্ধতি, অর্থাৎ দাদন-প্রণালী।*

দাদন-প্রণালী

ব্যাঙ্কের টাকা খাটাইবার মূলনীতি দুইটি: একটি অর্থের নিরাপত্তা (security) আর একটি দাদনী অর্থকে সহজে টাকায় পরিবর্ত্তিত করিবার সুবিধা (liquidity)। ব্যাঙ্কের অর্থ নিয়োগ করিবার সময় নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিতে যাইয়া ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলি শেষোক্ত নীতিটিকে সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষা করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির মধ্যে ভূ-সম্পত্তিকেই মনে করা হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। কিন্তু বিগত দশকের ঘটনাবলী দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা ভূ-সম্পত্তির নিরাপত্তাকে যতটা নির্ব্বিঘ্ন মনে করিয়াছিলেন আসলে উহা ততটা নির্ব্বিঘ্ন ছিল না। ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলিকে লোক-সান দিয়া একথা উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে, দশবৎসরের মধ্যে পল্লীর কৃষিভূমির (সহরের ভূ-সম্পত্তি হইতে স্বতন্ত্র) মূল্য অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। এমন কি এই মূল্যেও জমির ক্রেতা পাওয়া যায় না। দশবৎসর পরে দেখা গেল, অন্যপ্রকার সম্পত্তি (যেমন, পণ্য) অপেক্ষা ভূ-সম্পত্তির জামিনে দাদন দেওয়া অধিকতর নিরাপদ নহে। পণ্যের মূল্য হ্রাস হওয়াতেই হয়ত ভূমির মূল্য কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভূ-সম্পত্তির বেলায় দেখা গেল, একাদিক্রমে দশ বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসরেই মূল্য হ্রাস পাইতেছে। পণ্যের বেলায় কিন্তু মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি স্থিরীকৃত হয় একবৎসরের মধ্যেই। তারপর আবার ভূ-সম্পত্তি কিম্বা ভূমি-স্বত্বের (land qualifications) জামিনে টাকা ধার দেওয়ার সময় টাকা সহজে আদায় হওয়ার সুবিধার প্রতি মোটেই নজর দেওয়া হয় নাই। অধিকাংশ আমানতই অল্প দিনের জন্য, কাজেই আমানতকারীর প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক দিনই আমানতী টাকা হইতে কিছু টাকা যে ফেরৎ দিতে হয়, অথবা আমানতের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে আমানতী টাকা সাকুল্যই যে ফেরৎ দিতে হইবে, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ-রূপেই উপেক্ষা করা হইয়াছিল। ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, ব্যাঙ্কের সবটুকু সম্পদই আট্‌কা পড়িয়া গেল (frozen up) এবং গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমানতী টাকা ফেরৎ দেওয়া আর সম্ভব হইয়া উঠে নাই। আমানতকারীদের সহিত রফা-নিষ্পত্তি করিবার জন্য অনেক রকম পরিকল্পনাই উপস্থাপিত করা হইয়াছিল এবং আদালতও তাহা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ইহাতে একটা নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত টাকার জন্য দৈনিক দাবী মিটাইবার দুশ্চিন্তা হইতে ব্যাঙ্কগুলি রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু নির্দ্ধারিত সময় দশবৎসরের মধ্যেও আমানতকারী-দিগকে আমানতী টাকার কোন উল্লেখযোগ্য অংশ কোন ব্যাঙ্ক ফেরৎ দিতে পারে নাই। এই ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

প্রতিকারের উপায়

এই সঙ্কটে পাড়ি দিবার কোন উপায় কি নাই? হ্যাঁ, আছে বৈ কি উপায়, অবশ্য যদি আমরা বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইতে যথার্থই প্রস্তুত হইয়া থাকি। একটি উপায় কোম্পানীকে লিকুইডিশনে দেওয়া। ইহাতে আমানতকারী এবং অংশীদারগণ যে যাহা পাইবেন তাহাই লইয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু রোগমুক্তির এই উপায়টি ব্যাধি অপেক্ষাও অধিকতর বিপজ্জনক। ইহাই হইল প্রতিকারের শেষ পথ। এই শেষ পন্থা গ্রহণ করিবার আগে আরও কোন উপায় আছে কি না তাহা আমাদের দেখা দরকার।

কিন্তু প্রতিকারের যে উপায়ই প্রয়োগ করা হউক তাহা আমানতকারী এবং অংশীদারদের দিক হইতেই আসিতে হইবে। বাহির হইতে কোন সাহায্য পাইবার আশা করা—সে-সাহায্য সরকারী সাহায্যই হউক কিম্বা অপর কাহারই হউক—অলীক কল্পনা। এইরূপ সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি কখনও দেওয়া হয় নাই, ভবিষ্যতেও

রূপ সাহায্য আসিবে না। এইরূপ সাহায্য করা সম্ভবই কখনো।

কোম্পানী গুটাইয়া ফেলিবার সময় অংশীদারদের াগেই আমানতকারীদের প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে হইবে। স্তু নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারা যায় না। উদ্ধার রিতে গেলেও খুব বেশী লোকসান দিতে হয়। কোম্পানী াকুইডিশনে যাওয়া কিম্বা পাওনাদারের (creditor) হিত রফা-নিষ্পত্তি করা সম্পর্কে অতীতের অভিজ্ঞতা ইতে দেখা যায়, এই ব্যবস্থায় আমানতকারীগণ তাঁহাদের আমানতী টাকার অতি সামান্য অংশই ফেরৎ পাইবার াশা করিতে পারেন। এই অবস্থা যদি এড়াইতে হয় এবং াবসায়কে যদি আমরা চালু রাখিতে চাই, তাহা হইলে ামানতকারীদিগকে তাঁহাদের আমানতী সাকুল্য টাকাই ংশ (share) ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের মূলধনে পরিবর্ত্তিত রিতে হইবে অর্থাৎ আমানতের সব টাকাই 'শেয়ার ্যাপিটেলে' (share capital) পরিণত করিতে হইবে। বেশ্য তাঁহারা যদি বর্ত্তমান অংশীদারদের অপেক্ষা অগ্র-গ্রাহ্য preferential) অধিকার রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হন, াহা হইলে তাঁহাদের আমানতী টাকাকে অগ্র-গ্রাহ্য শেয়ার ক্যাপিটেলে' পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন এবং সেই ঙ্গে পরবর্ত্তীকালে কোম্পানী গুটান হইলে তাঁহাদের প্রদত্ত মূলধনের টাকা সর্ব্বাগ্রে ফেরৎ পাওয়ার অধিকারও তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন। প্রতিকারের ইহাই প্রথম মাত্রা (dose)। মনে হয়, ইহা খুব বেশী তিক্ত ঔষধ হইবে না।

কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এবং পূর্ব্ব হইতেই যাঁহারা অংশীদার আছেন তাঁহারা তাঁহাদের অংশের সাকুল্য টাকাই প্রদান করিবেন। বাকীদারদের (defaulters') অংশ (বাকীদার ডিরেক্টারদের অংশ সহ) বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। আমানতকারীগণ যদি তাঁহাদের আমানতী টাকা 'শেয়ার ক্যাপিটেলে' পরিবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে যে-সকল অংশীদারের শেয়ারের টাকা বাকী পড়িয়াছে তাঁহারা কেন উহা প্রদান করিবেন না অথবা ক্ষতি-স্বীকার করিবেন না তাহার কোন কারণ নাই। ইহাই হইল ঔষধের দ্বিতীয় মাত্রা।

তৃতীয় মাত্রা হইল মূলধন হ্রাস (Reduction of Capital) করা। হিসাব-পত্রে যে সকল ঋণ আছে (book debt) সেগুলিকে এবং অন্যান্য সম্পদকে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া নূতন করিয়া উহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সমস্ত অনাদায়ী ঋণ এবং মূল্য-হ্রাস (depreciation) আদায়ীকৃত মূলধন হইতে কাটা যাইবে (written off against paid up Capital)। এই সকল লোকসানকে বৎসরের পর বৎসর হিসাব-পত্রে লিখিত রাখার এবং প্রতি বৎসর 'ব্যালেন্স সিটে' (balance sheet) উল্লেখ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার কোন সার্থকতা নাই। ইহাতে বরং শুধু বিরুদ্ধ সমালোচনাই শুনিতে হয়। সুতরাং লোকসান-গুলিকে বাতিল করিয়া মূলধন হ্রাস অবশ্যই করিতে হইবে।

রোগী তখন চিকিৎসার পরবর্ত্তী স্তরের জন্য প্রস্তুত হইবে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের একীকরণই (Amalgamation) এই স্তর।

একীকরণ

কোনও স্থানের স্বতন্ত্র ব্যাঙ্কগুলিকে অথবা ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর শাখাগুলিকে উহাদের অস্তিত্বের জন্য স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। ক্ষুদ্র সহরে বহুসংখ্যক পৃথক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের স্বাস্থ্যকর প্রসারে (healthy growth) কোন সহায়তা করে নাই। ইহার কুফলের সম্বন্ধে এক কথায় বলিতে গেলে বীমা ব্যবসায়ের ভাষায় বলিতে হয়, 'ব্যবসায়ের ক্ষতিকারক' (selection against the office)। কোম্পানীগুলির মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতি-যোগিতার ফলে আমানতী টাকার সুদের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে, হ্রাস হইয়াছে প্রদত্ত ঋণের সুদের হার এবং দাদনের নিরাপত্তাকে সর্ব্বনিম্ন সীমায় টানিয়া আনা হইয়াছে। গড়পরতা কাজ-কারবারের পরিমাণ কম, কাজেই লাভের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। অধিকাংশ ছোট ছোট ব্যাঙ্কই বন্ধকী জিনিষ মজুত রাখিবার জন্য গুদাম ঘর রাখিতে পারে না, কাজেই জিনিষপত্রগুলি

পাহাড়া দিবার ব্যয় এত বেশী পড়ে যে, শেষ পর্য্যন্ত খাতক-ব্যবসায়ীর পক্ষে উহা বহন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং খাঁটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। প্রতিকারের উপায় একীকরণ।

ব্যাঙ্কগুলিকে একীকরণ করা যায় কি ভাবে? এ সম্বন্ধে একাধিক উপায় আছে। যে সকল ব্যাঙ্কিং কোম্পানী মিলিয়া এক হইতে চাহিবে তাহাদের মধ্যে যে কোম্পানী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, থাকিবে শুধু তাহারই অস্তিত্ব, বাকী সবগুলি উহার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। এই শ্রেণীর একীকরণকে বলে সমীকরণ (absorption)। যে সকল কোম্পানীকে সমীকৃত করা হইবে সেগুলিকে স্বেচ্ছায় কারবার গুটাইয়া লইতে হইবে এবং উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে সমীকরণকারী (absorbing) কোম্পানীর শেয়ারের বিনিময়ে গুটান ব্যাঙ্কগুলির সম্পদ এবং দেনা উক্ত কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা লিকুইডেটারকে দিতে হইবে। সমীকরণকারী কোম্পানীর প্রচলিত নাম বহাল থাকা সম্বন্ধে আপত্তি থাকিলে ভারতীয় কোম্পানী আইনের (Indian Companies Act) বিধান অনুসারে উক্ত কোম্পানীর নাম পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

উপায়ান্তর স্বরূপ, একীকৃত হইতে সম্মত কোম্পানীগুলির সম্পদ এবং দেনা গ্রহণ করিবার জন্য একটি নূতন কোম্পানী গঠন করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থাতেও উক্ত কোম্পানীগুলিকে স্বেচ্ছায় লিকুইডেশনে যাইতে হইবে এবং লিকুইডেটর পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

আমানতকে শেয়ার ক্যাপিটেলে পরিবর্ত্তিত করিলে আমানতকারী বলিয়া আর কেহ থাকিবে না. থাকিবে শুধু অংশীদার। সুতরাং একীকৃত হইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক কোম্পানীর অংশীদারগণ কর্ত্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবই বাধ্যকর এবং যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে, অর্থাৎ সমস্ত অংশীদারের প্রতিই ইহা বাধ্যকর হইবে। আলাপ-আলোচনা দ্বারাই হস্তান্তরের ভিত্তি স্থির করিতে হইবে। কাল্পনিক (fictitious) সম্পদগুলি যদি বাদ দেওয়া যায় এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ (tangible and intangible) স্থায়ী (fixed) সম্পদ এবং অস্থায়ী (floating) সম্পদগুলির মূল্য যদি আদায়যোগ্য ভাবে পুনরায় নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের পক্ষের সম্মতির ভিত্তি ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই গণ্য হইবে। বাহিরের কোন দেনা থাকিলে উহা বাদে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা সমীকরণকারী কোম্পানী সম্পূর্ণরূপে আদায়ীকৃত শেয়ার দ্বারা পরিশোধ করিবে। অবশ্য শেয়ারগুলি সমীকৃত কোম্পানীগুলির অংশীদারদিগকেই প্রদান করিতে হইবে।

তৃতীয় উপায়টি ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১৫৩ (ক) ধারার নূতন বিধানে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ধারায় বিধান করা হইয়াছে যে, একীকরণের পরিকল্পনা সহ আদালতে দরখাস্ত করিতে হইবে। আদালত যদি এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে ঐ সঙ্গে যে-সকল কোম্পানীকে একীকৃত করা হইল, কারবার না গুটাইয়াও ঐ কোম্পানীগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার (dissolve) আদেশ আদালত দিতে পারেন। ইহাতে কারবার গুটাইবার কার্য্যবিধিকে এড়াইতে পারা যায়। একীকরণের পরিকল্পনা যদি আদালত মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে কোন অসম্মত (dissentient) আমানতকারী বা মহাজন থাকিলেও উহা তাঁহাদের প্রতি বাধ্যকর হইবে, অবশ্য আমানতকারী এবং মহাজনদের সহিত ১৫৩ ধারা অনুযায়ী নির্দ্ধারিত রফা-নিষ্পত্তির সর্ত্তগুলি যদি উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভূত হয়। একীকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলার অনেকগুলি ব্যাঙ্কিং কোম্পানী সম্প্রতি এই উপায় গ্রহণ করিয়াছে।

একটি ক্ষুদ্র স্থানে অনেকগুলি স্বতন্ত্র ব্যাঙ্কিং কোম্পানী থাকার কুফল এইরূপ একীকরণের ফলে দূরীভূত হইবে অথবা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। অধিকন্তু কোম্পানী পরিচালনে খরচেরও যথেষ্ট সাশ্রয় হইবে এবং পরিচালন কার্য্যে দক্ষতাও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নিজেদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য আমানতকারী এবং অংশীদারগণ স্বেচ্ছায় নিজেদের যে স্বার্থ ত্যাগ করিবেন, তাহারই কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিলাম। কোম্পানীর ডিরেক্টারদিগকেও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। যদি কোন স্থানের ৫০টি কোম্পানী একীকৃত হয়, তাহা হইলে ৫০জন ম্যানেজিং ডিরেক্টার, ৫০ জন সহকারী ম্যানেজিং ডিরেক্টার এবং প্রায় ৫০০পাঁচশত ডিরেক্টারের আর

য়াজন থাকিবে না। কারণ, একীকৃত ব্যাঙ্কের অতগুলি নেজিং ডিরেক্টার, সহকারী ম্যানেজিং ডিরেক্টার অথবা রেক্টার থাকিতে পারিবে না। একীকৃত ব্যাঙ্কের বোর্ডে নেজিং ডিরেক্টার সহ সাতজনের বেশী—পাঁচজন লেই ভাল হয়—ডিরেক্টার থাকিবে না। আমার শ্চিত বিশ্বাস এই যে, এই পাঁচ শত ডিরেক্টার তাঁহাদের ধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং যে প্রদেশের অধিবাসী ওয়ার সম্মান এবং গৌরব তাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সেই দেশের বৃহত্তম স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার রিবেন।

পরিচালন কার্য্য (Management)

ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির পরিচালন কার্য্য রূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় অতীতে তাহা হয় নাই। রিচালন-কার্য্য প্রধানতঃ আইন-ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় ন্যান্য ব্যক্তিদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় থিবীর অন্যান্য দেশে যে ভাবে পরিচালিত হয় তাহা তো দূরের কথা, কলিকাতায় বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য যে বে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও তাঁহাদের কোন ধারণা ই। তাঁহাদের এই সীমাবদ্ধ দৃষ্টির জন্যই ব্যাঙ্ক বসায় বলিতে প্রকৃত পক্ষে যাহা বোঝায় তাহা না ড়িয়া তাঁহারা লোন অফিসের কারবার গড়িয়া লিয়াছেন।

ব্যাঙ্কের দাদন-প্রণালী সম্বন্ধেও তাঁহাদের কোন ভিজ্ঞতা নাই। আমানতগুলি অল্পদিনের জন্য—চলতি হসাবে আমানত, অথবা ছয়মাস, একবৎসর, দুই বৎসর কম্বা খুব বেশী হইলে তিন বৎসরের জন্য আমানত। মানতকারীদের প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক দিনই যে াহাদিগকে টাকা দিতে হইবে অথবা আমানতের মেয়াদ র্ণ হইলে আমনতী টাকা যে ফেরৎ দিতে হইবে, এই বিষয়টি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষা করিয়াছেন। যে উপায়টি তাঁহাদের নিকট নিরাপদ মনে হইয়াছিল (শেষ-পর্য্যন্ত উহা তাঁহাদের আশাকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছে) সেই উপায়ে তাঁহারা ব্যাঙ্কের টাকা নিয়োগ করিয়াছিলেন, অথচ এই দাদনকে সহজে টাকায় পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায় বলিয়া কোন ক্রমেই কল্পনা করা যায় না। ইহারই ফলে বর্ত্তমান সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে।

এইরূপভাবে একীকৃত প্রত্যেক ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কের কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল কর্ম্মচারী থাকিবেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারও ব্যাঙ্কিং শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া চাই—ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত হইলে আরও ভাল হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন বিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্কগুলির উপর যেরূপ কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তেমনি ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করিবার এবং উহাদের সহিত সহযোগিতা করিবার বিধানেরও প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা সত্যই অতি কল্যাণকর ব্যবস্থা। যথাযথ ভাবে হিসাব রক্ষা করা এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত একাউন্টেন্ট রাখা ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ পরিচালন কার্য্যের জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজন। একীকৃত ব্যাঙ্ককে ইহার জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রত্যেক দিনই ব্যাঙ্কের উদ্বর্ত্ত পত্র (Balance Sheet) তৈয়ার করিতে হইবে এবং বার্ষিক ও অর্দ্ধবার্ষিক হিসাব-নিকাশের তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে প্রত্যেক অংশীদারকে উদ্বর্ত্ত-পত্র এবং হিসাব প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের নীতি

ব্যাঙ্ক অনেক রকমের কাজ-কারবার করিতে পারে, যেমন :—(১) ভূ-সম্পত্তি বন্ধক রাখা, (২) শিল্পে অর্থ নিয়োগ, (৩) কৃষিতে অর্থ নিয়োগ, (৪) কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ (আসলে ইহা পণ্য চালান দেওয়ার কাজে বা ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য অর্থ নিয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়), (৫) ঋণ প্রদান (অবশ্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং ব্যতীত)।

এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর কারবার তাহার সবগুলিই কোন একটা ব্যাঙ্কের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব নয় এবং উচিৎ নয়, বিশেষতঃ যদি উহার কার্য্যকরী মূলধন অল্প দিনের মেয়াদে আমানতী টাকা দ্বারা গঠিত হয়। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর কারবার পরিচালনের জন্য আমাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে,

যেমন: (১) ভূমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক; ইহার আদায়ীকৃত মূলধন খুব বেশী হওয়া দরকার এবং ইহার ঋণ-পত্র (Debentures) ইস্যু হইবে ৫০ বৎসরের জন্য। (২) ইন্ডাষ্ট্রিয়েল ব্যাঙ্ক, ইহার ডিবেঞ্চার ৩০ বৎসরের জন্য ইস্যু করা হইবে। (৩) কৃষি ব্যাঙ্ক; দশ বৎসরের জন্য ইহার ডিবেঞ্চার ইস্যু করা হইবে অথবা আমানতের মেয়াদ হইবে দশবৎসর। (৪) লোন অফিস; শুধু আদায়ীকৃত মূলধন হইতেই ইহার সমস্ত কারবার চলিবে। (৫) কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক; এই সকল ব্যাঙ্ক অল্প দিনের মেয়াদে আমানত গ্রহণ করে, কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ পণ্য চালান দেওয়া ইত্যাদি কারবার ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করা এই সকল ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব নয়।

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

আমানতকারীদের প্রতিই প্রত্যেক ব্যাঙ্কের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। দেশের শিল্পোন্নতি সাধন করা ইত্যাদি স্বাদেশিকতার ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা এই প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। আমানতের মেয়াদ অল্প দিনের বলিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির দাদন-প্রণালী এমন হইবে যে, দাদনী অর্থ অল্প সময়ের মধ্যে টাকায় পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতবর্ষের যে কোন অংশ হইতে তিন মাসের মধ্যে এবং পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে ছয় মাসের মধ্যে দাদনী টাকা আদায় হইতে পারা চাই। কমার্শিয়াল বিলের ডিস্কাউন্ট করা, পণ্য বন্ধক রাখা, টাকা পাঠান (transfer remittance) ইত্যাদি এই জাতীয় দাদনের উদাহরণ। ভূ-সম্পত্তি অপেক্ষা পণ্য কম নিরাপদ নয়। কারণ, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভূ-সম্পত্তির মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যের পণ্য-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অধিকতর ক্ষতিকারক হইবে না।

বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করাই আমি পছন্দ করি। এ সম্বন্ধে আমি খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই যে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি অল্প দিনের মেয়াদে আমানত গ্রহণকরে বলিয়া উহাদের কারবার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং-এর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে হইবে।

সিডিউল ভুক্ত ব্যাঙ্ক

বাংলার ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির মধ্যে প্রায় ডজন-খানেক ব্যাঙ্ক আছে যাহাদের সমস্ত সম্পদ আবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই। কারণ, এই ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির দাদন-প্রণালী এরূপ যে, দাদনী অর্থ সহজেই টাকায় পরিবর্ত্তিত করিবার সুবিধা আছে। এই এক ডজন ব্যাঙ্কের মধ্যে ৭টি ব্যাঙ্ক সিডিউল ভুক্ত।

কিন্তু এই ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলিরও পরিচালন কার্য্য যেরূপ ভাবে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় সেরূপ ভাবে পরিচালিত হয় না। কারণ, তাহাদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার ফলে সুদের হার উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া আমনত সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করা হয়, দাদনের সুদের হারও লাভজনক নহে; প্রথম শ্রেণীর জামিনে দাদন দেওয়া হয় না। নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতাই ইহার কারণ। অর্থ প্রেরণের (remittances) এবং বিলের টাকা আদায়ের কমিশনের হার সর্ব্বনিম্ন সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা প্রভৃতি আরও অনেক কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্ক সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি একত্র সম্মিলীত হইয়া এসম্বন্ধে আলোচনা না করেন এবং আলোচনা করিয়া এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য যদি কোন পরিকল্পনা গঠন না করেন, তাহা হইলে এই ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলিও যে শীঘ্রই অ-লাভজনক হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহও নাই। এ ক্ষেত্রেও একীকরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে হয়। একীকৃত নূতন ব্যাঙ্ক বিস্তৃত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, কারবার পরিচালনের নীতিও হইবে একরূপ, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইবে এবং পরিচালন ব্যাপারে ব্যয়ের দিক দিয়াও অনেক সাশ্রয় হইবে। যদি শক্তিশালী 'ডিরেক্টার বোর্ড' কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালিত হয়, তাহা হইলে পরিচালন দক্ষতাও বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ ব্যাঙ্ক বাংলার শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে (Apex Central Bank of Bengal) পরিণত হইতে পারিবে এবং কতগুলি নির্দ্ধারিত সর্ত্তাধীনে মফঃস্বলের ব্যাঙ্কিং

স্পানীগুলি উহার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া filiated) চলিতে পারিবে। ইহাও আশা করা যায় সর্ত্তগুলি যদি প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে মফঃস্বলের ঙ্কগুলি ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত ব এবং বাংলার দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি অধিকতর সু-দিনের দেখিতে পাইবে, অতীতে যাহা সম্ভব হয় নাই।

যে সকল স্থানে ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনের উপযুক্ত স্থানীয় য়াজনীয়তা আছে শুধু সেইখানেই শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্ক .pex Bank) কিম্বা অন্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানী শাখা ব্যাঙ্ক ান করিবে। অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা আর থাকিবে এবং শাখা ব্যাঙ্কগুলির ব্যয়ের পরিমাণও নিম্নতম বে।

শিক্ষিত যুবকদের বেকার-সমস্যা

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং-এর উন্নতির মধ্যে এমন একটি রুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে যাহা এ পর্য্যন্ত হয় :পেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, না হয় তো উহার প্রতি রূপ মনোযোগ দেওয়া উচিৎ ছিল তাহা দেওয়া হয় ই। বহু সংখ্যক শিক্ষিত যুবক বেকার বসিয়া ইয়াছে। কারণ, চাকুরী আর মিলিতেছে না, প্রোফেশন-লিতেও রহিয়াছে প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক। তাঁহারা ষ-বাসও করিতে পারেন না, কারণ উহাতে লাভ নাই। কলের পক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়, ারণ উহাতে যে পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করা প্রয়োজন াহা অনেকেরই নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যকে তাঁহারা য়ের চক্ষে দেখেন, কারণ এই দিকটায় তাঁহারা খনও চেষ্টা করিয়া দেখেন নাই এবং ভয়ে এই দিকটা এড়াইয়া চলেন।

শিল্পে এবং কৃষিকার্য্যে উৎপাদিত পণ্য প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে-সকল উৎপাদক প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করেন তাহাদের পক্ষে এই বিপুল পণ্য-সম্ভার লাভজনক রূপে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। সুতরাং একশ্রেণী মধ্যবর্ত্তী লোকের প্রয়োজন হয় যাহারা পণ্য উৎপাদক এবং পণ্য ব্যবহারকারীর মধ্যে সংযোগস্থাপন করিয়া থাকেন। এই মধ্যবর্ত্তী লোকেরা সকলেই অবাঙ্গালী এবং স্বভাবতঃই এই উপায়টি তাহারা লাভজনক বলিয়া মনে করেন। আমরা কি এই ব্যাপারে কোন অংশই গ্রহণ করিতে পারি না? বাংলার উর্ব্বর ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদ প্রত্যেক গ্রামকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের এক একটি কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে। বাঙ্গালী যুবকরা এই ব্যবসা-বাণিজ্যের অংশ গ্রহণ করুন। পণ্যকে যে অবস্থায় ক্রয় করা হয় সেই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া অর্থাৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা কারখানার উৎপাদন-পদ্ধতির ভিতর দিয়া উহাকে না লইয়া পুনরায় উহাকে বিক্রয় করার নামই বাণিজ্য। তুলা ক্রয়ের পর উহা হইতে সূতা প্রস্তুত না করিয়া ঐ তুলাকেই আবার বিক্রয় করা, কিম্বা সূতা কিনিয়া কাপড় বয়ন না করিয়া ঐ সূতাই পুনরায় বিক্রয় করা প্রভৃতি বাণিজ্যের দৃষ্টান্ত। ক্রয় এবং বিক্রয় এই দুইটি শেষ প্রান্তের মধ্যে দামের (price) যে পার্থক্য, এই পার্থক্য হইতেই লাভটা আসিয়া থাকে। সুতরাং স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই বিভিন্ন পণ্যের পাইকারী এবং খুচরা দাম মুখস্থ করাইতে হইবে। দামের পার্থক্য হইতে তাহাদের মনে এবিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার উৎসাহ আসিবে।

উর্ব্বর এবং শস্য-শামল ভূমি-সম্পদ ব্যতীত বাংলায় দুইটি বন্দর আছে। একটি কলিকাতা এবং অপরটি চট্টগ্রাম। একটি বন্দর আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোন বন্দর নাই। রাজপুতনাতেও নাই। বাংলার তুলনায় ঐসকল প্রদেশের অনেক অসুবিধা। কলিকাতা ২০,০০০ সামরিক দ্রব্য সরবরাহ করে। কলিকাতার বন্দর হইতে কম পক্ষে ৫০০০ শ্রেণীর ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত দ্রব্য চালান হয়। অথচ বাঙ্গালী ইহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে লোক কলিকাতায় আসিয়া এই প্রথম শ্রেণীর বন্দরের কারবার হইতে প্রতিবৎসর প্রচুর লাভ করে। বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ, অথবা রেঙ্গুনে না যাইয়া, একরকম নিজের বাড়ীতে থাকিয়াই আমাদের বাঙ্গালী যুবকগণ অর্থ উপার্জ্জনের এই পন্থা গ্রহণ

করিতে মনোযোগী হইবেন, ইহা আশা করা কি সত্যই বৃথা? চাকুরী-জীবী হইয়াই তাঁহারা চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিবেন? মনিব হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি তাঁহারা কখনই পোষণ করিবেন না?

কিন্তু ব্যবসায়ের কৌশল কিরূপে শেখা যায়? কোথায় শিখিতে হইবে? ইহা শিক্ষা দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ব্যবস্থা নাই, থাকাও সম্ভব নয়। ব্যবসায়ের কৌশল শিক্ষা দিবার সামর্থ্য যাঁহাদের আছে তাঁহারা ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়ার মত করিয়া শিক্ষা দিতে জানেন না। তাঁহারা কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারাই শিক্ষা দিতে পারেন। কাহারা এই শিক্ষক? আমাদের শ্রদ্ধেয় মাড়োয়ারী এবং অবাঙ্গালী বন্ধুগণ। ইঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের অভিজ্ঞ শিক্ষক। তাঁহারা সর্ব্বদাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়ার মত করিয়া নয়, উদাহরণ দ্বারা। কিন্তু এই শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় নাই, বাঙ্গালী যুবকগণ এই শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহারা অধিকারী হন নাই—প্রাথমিক গুণগুলি তাঁহারা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। এই প্রাথমিক গুণ কি কি? আবার সেই কথাই বলিতে হয়, দৃষ্টান্ত হইতেই শিক্ষা করুন। এই গুণগুলি—কষ্ট-সহিষ্ণুতা, সাদাসিধা চাল-চলন, অতি সাধারণ আহার্য্য-গ্রহণ, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সততা, অপরের সহিত ব্যবহারে সততা এবং সাহসিকতা। দ্রোণাচার্য্য শিক্ষা দিতে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু একলব্যকে শিক্ষা দিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না, থাকিতেনও বহু দূরে, তথাপি একলব্য তাহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং সাধনা দ্বারা অনিচ্ছুক দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে তাহার প্রার্থিত শিক্ষা আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। তাই যদি হয়, তবে অর্থ উপার্জ্জনের এই পন্থাটিকে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক উপায়ে কাজে লাগাইবার জ্ঞান আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং শিক্ষা দিতে সমর্থ শিক্ষকদিগের নিকট হইতে অর্জ্জন করা আমাদের দেশের যুবকদের পক্ষে কি অসম্ভব? তাঁহারা দূরেও থাকেন না, শিক্ষা দিতে অনিচ্ছুকও নহেন, কিন্তু তাঁহারা কেবল নিজস্ব প্রণালীতেই শিক্ষা দিতে জানেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। এই শিক্ষা অর্জ্জন করিতে হয়। আপনি হয়ত বলিবেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও তো মূলধন দরকার। কিন্তু কি পরিমাণ মূলধন দরকার? এ সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে কি? এ বিষয়ে আপনি যদি লক্ষ্য করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, কলিকাতায় এমন লোকও অনেক আছে যাহারা **একটাকা** মূলধন লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেছে, আবার সেই ব্যবসাই **কোটিটাকা** মূলধন লইয়া করিতেছে এমন লোকও আছে। তা ছাড়া, একটাকা হইতে কোটি টাকার মধ্যবর্ত্তী বিভিন্ন পরিমাণ মূলধন দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্যও আছে অনেক। তাই বলিয়া একথা কেহ মনে করিবেন না যে, আমি গড়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার কথা বলিতেছি: গঙ্গানদীর গভীরতা যদি গড়ে তিন ফিটও হয়, তাহা হইলেও হাঁটিয়া গঙ্গা পার হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। আমি শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, অতি সামান্য পরিমাণ মূলধন লইয়াও যে কোন ব্যক্তি কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারেন। প্রথমে অতি অল্প পরিমাণ মূলধন লইয়াই আরম্ভ করা ভাল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুসারে এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, কুড়ি টাকা, পঁচিশ টাকা কিম্বা একশত টাকা লইয়াই আরম্ভ করা উচিত। প্রথমেই ইহার বেশী মূলধন লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করা উচিৎ নহে।

আমি দেখিয়াছি যে, পিতা কিম্বা শ্বশুর অথবা ভ্রাতা বা শ্যালকের নিকট হইতে মূলধন লইয়া যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করা হইয়াছে, সেখানে এই মূলধন সহজেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কারণ, মূলধন নিজের হইলে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইত এরূপ ক্ষেত্রে সেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। সুতরাং যিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করিবেন তিনি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিয়া তাঁহার কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহ করুন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করাই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। কিন্তু অর্থ বিনিয়োগ এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে যেন ব্যাঙ্কের একটি পয়সাও লোকসান না হয়। কিরূপে ইহা করা যাইতে

।? দশজন বেকার যুবকের অভিভাবক মিলিয়া ট সজ্ঘ গঠন করুন এবং প্রত্যেকে একশত টাকা য়া দিন। এই একহাজার টাকা কোন ব্যাঙ্কে স্থায়ী ানত রাখুন। অভিভাবকদের অনুমোদন অনুসারে ঃ উক্ত দশ জন যুবকের প্রত্যেককে উল্লিখিত স্থায়ী ানতের জামিনে একশত টাকা করিয়া ধার দিবে— শত টাকার বেশী নয়। কিছুদিন কারবার চালাইলেই ত্যক যুবকের যোগ্যতা-অযোগ্যতা প্রমাণিত হইয়া বে। ব্যাঙ্ক যদি তাঁহার সততা এবং কার্য্যদক্ষতায় ষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি নিজেই নিজের মূলধনের জন্য ঙ্কের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিবেন। ল্লখিত স্থায়ী আমানতের টাকাও জামিনের দায়িত্ব তে অব্যাহতি পাইবে এবং উহা দ্বারা অন্য উপযুক্ত র্থীকে সাহায্য করা যাইতে পারিবে। ব্যাঙ্ক যদি উক্ত কের সততা এবং কার্য্যদক্ষতাকে সন্তোষজনক বলিয়া ন না করে, তাহা হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে সরিয়া পড়িতে হইবে এবং তাঁহার নিকট যে টাকা অনাদায়ী থাকিবে স্থায়ী আমানতের টাকা হইতে তাহা আদায় করা হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামে এবং বন্দর হিসাবে কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে। আমাদের দেশের যুবকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের কৌশল শিক্ষা করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করিয়া দিন। যদি তাঁহারা সাফল্য অর্জ্জন করেন—আমার বিশ্বাস সাফল্য তাঁহারা অর্জ্জন করিবেনই—তাহা হইলে বাংলার প্রতি গৃহকে এবং পরিণামে সমগ্র বাংলাকে তাঁহারা সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলার এই নব অভ্যুদয়ে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি একটি অতি গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। *

* জয়েণ্ট-ষ্টক কেম্পোনীজ জার্ণালের ইন্‌ডাষ্ট্রি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ।

তাই যেন হয়

(গান)

শ্রীকমল রাণী মিত্র

তোমায় আমায় এবার দেখা হ'বে ?
তাই যেন হয়—
ওগো তাই যেন হয় অনন্ত গৌরবে !!
ফুলেরা নীল বনের মাঝে
কী কথা কয় বুঝি না যে,
প্রভাত কেন মুখর হ'লো পাখীর কলরবে !
তাই যেন হয়—
ওগো তাই যেন হয় অনন্ত গৌরবে !!

এমন কতোই ফাগুন এসে'
ফিরে' ফিরে'
রাঙা রঙের গান গেয়েছে
আমায় ঘিরে' ;—
তাইতো হৃদয় ভয়হারা নয়,
জানি নে যে এবার কী হয় !
—তবু যেন আকাশ কেমন ভ'রেছে উৎসবে।
তাই যেন হয়—
ওগো তাই যেন হয় অনন্ত-গৌরবে !!

"মরণের গলে মন্দার মালা—"

(গল্প)

শ্রীসুহাসিনীদেবী

কমরেড্ লিও সগোটভ যেন একটি জীবন্ত ইতিহাস। রুশ-বিপ্লবের আদ্যন্ত তার কণ্ঠস্থ। সে যখন বিপ্লবের কাহিনী বর্ণনা করে শ্রোতাদের মনে হয়, যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা তারা উল্টিয়ে যাচ্ছে, অথবা ছায়া-চিত্রে বিপ্লবী দলের বিজয় অভিযান স্বচক্ষে দেখছে। তার মুখে সে কাহিনী শুনতেও লাগে ভাল, আর অবসর থাকলে তাকে অনুরোধও করতে হয় না— একটা সূত্র ধরে সে নিজেই আরম্ভ করে দেয়। বাড়িয়ে বলবার অভ্যাস তার নেই, তা জানে সকলেই, তবু তাদের মনে হয়, যেন একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাস শুনছে।

সন্ধ্যায় পার্কে বসে গল্প করতে করতে কেউ হয়ত বলল, "উঃ, আজ বড্ড শীত পড়েছে—এমন শীত অনেক বছর পড়েনি।"

সগোটভ অমনি মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক, যা বলেছ কমরেড্। হ্যাবারগ্রাডের বিপ্লবের পর এমন শীত আর পড়ে নি। উঃ, কি শীত ছিল সেদিন।

তার পর আরম্ভ হ'ল হ্যাভারগ্রাড বিপ্লবের রোমাঞ্চকর কাহিনী, নিপীড়িত জনগণের ব্যথার ইতিহাস। চারিদিকে শ্রোতৃবৃন্দের ভিড় জমিয়া যায়, জনতার পর জনতা বাড়িয়া চলে। সগোটভ একটা উঁচু বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে রীতিমত বক্তৃতা সুরু করে দেয়, নাটকীয় ভঙ্গীতে দৃশ্যের পর দৃশ্য অবতারণা করে।

তরুণ কমরেডের দল—যাদের সেই স্মরণীয় দিনে শৈশব ঘোচেনি, তারা সাগ্রহে শোনে, বয়োবৃদ্ধ প্রত্যক্ষ-দর্শীরা বর্ণনা সমর্থন করে। ব্যাক্তিগত আলোচনা বিরাট জনসমষ্টির আনন্দের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

সকালবেলা সংবাদপত্রে হিটলারের ইহুদী-নির্য্যাতনের কাহিনী পড়তে পড়তে কেহ হয়ত মন্তব্য করল, "উঃ! কি অমানুষিক অত্যাচার—অভূতপূর্ব্ব—।"

সগোটভ তার কথায় সায় দিয়া বলে, "সত্যি কমরেড, অমানুষিক। তবে অভূতপূর্ব্ব নয়, জারের অত্যাচার এর চেয়ে কম ছিল না।"

সে মাথা নুইয়ে অতীতের দৃশ্য যেন সম্মুখে দেখতে পায়, বলে, "ইস্, ক্রশ এ্যাভিনিউর শিশু হত্যার দৃশ্য—উঃ।"

তারপর আরম্ভ হয় ক্রস-এভিনিউর শিশু-হত্যার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী।

* * *

সগোটভকে সবাই চিনে, কিন্তু পরিচয় জানেনা কেউ। কমরেড্ সগোটভ সাহসী, সুবক্তা, পরিশ্রমী, শাসন-পরিষদের সদস্য; কাজেই চিনে তাকে সকলেই, কিন্তু তার অতীত ইতিহাস কেউ জানে না, জানে না তার পিতৃ-পরিচয়, কোথায় তার বাড়ী। জানতে উৎসাহও কেউ দেখায় না, জেনেই বা লাভ কি! সগোটভ কাজ করে লোহার কারখানায়। দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ, লোহার তৈরী যেন তার মাংসপেশী। লোহার কারখানাতেই তাকে মানায় ভাল।

কারখানার প্রাঙ্গণে শ্রমিকদের জন্য একটা সভাগৃহ তৈরী হচ্ছে—বেশ বড় এবং উঁচু সভাগৃহ। ভারী ভারী সব কড়ি-বরগা আনা হয়েছে তার জন্যে। অনেক শ্রমিক কাজ করছে। আনন্দের অন্ত নেই তাদের—তাদের নিজ হাতে তৈরী হচ্ছে নিজেদের সভাগৃহ। সগোটভ ওদের সঙ্গেই কাজ করছে।

একটা ভারী বরগা তোলা হচ্ছে। ক্রেনের শিকলটা যেন আর এত ভার বইতে পারছে না—কট্-কট্ শব্দ করছে। কে একজন বলল, "ছিড়বে নাকি শিকলটা!"

সগোটভ হেসে উঠলো, বলল, "আরে—দূর! কি যে বলছ কমরেড্ তার ঠিক নেই। এটা কোন্ ক্রেণ

? এই ক্রেণটা দিয়েই জারের আড়াই মণ ওজনের ‌রর মূর্ত্তিটা পার্ক থেকে তুলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই ক্রেণ, আমি ঠিক বল্‌ছি।"

আবার সগোটেভের কাহিনী আরম্ভ হয়—সহকর্ম্মীরা ‌ করতে করতে শুনে।

আর একটা বরগা তোলা হচ্ছে—ক্রেণের শিকলটা ‌র সত্যি আর ভার বইতে পারছে না। ক্র্যাং—ক্র্যাং ং—বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছে। কিন্তু সগোটভের কাজ ‌ গল্প দুই-ই সমান তালে চলেছে।

হঠাৎ ক্রেণের শিকলটা একটা আর্ত্তনাদ ক'রে ‌াটাকে ছেড়ে দিল। আর সকলেই ছিল দূরে, কিন্তু ‌াহের আতিশয্যে সগোটভ বরগাটার নীচেই এসে ‌ছিল। বরগার একটা কোণের আঘাত লাগল তার ‌ায়—সে ছিটকে তিন হাত দূরে যেয়ে পড়্‌লো। পড়েই ‌ন্তু সে উঠে দাঁড়াল। মাথা থেকে রক্ত পড়ছে ধারে, ‌খে দেখছে ধুঁয়া। রুমাল বের করে সগোটভ রক্ত ‌তে লাগল। সহকর্ম্মীরা বলল, "তোমার মাথা খুব ‌ম হয়েছে কমরেড্‌, চল তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে ‌ই।"

একজন সহকর্ম্মী বলল, "এই নিয়ে আর হেঁটে যায় এম্বুলেন্স ডেকে আনছি।"

রক্ত মুছতে মুছতে সগোটভ বলল, "ও কিছু না, ‌ড়াটা একটু ছড়ে গেছে বোধ হয়।"

সে কি জানে তার আঘাত কত গুরুতর—ব্যথার ‌ব্রতায় বোধশক্তি তার হারিয়ে গেছে।

আর একজন বলল, "না কমরেড্‌, লেগেছে খুবই, ‌ালটা যে রক্তে লাল হয়ে গেছে। উঃ, এ যে একেবারে ‌ক্ত-পতাকা!"

সগোটভ রুমাল দিয়ে আঘাতের স্থানটা চেপে ধরে, ‌ন্তু গল্পের সূত্র যেন তাকে পেয়ে বসে। সে বলতে ‌রম্ভ করল, "না—না—ও কিছু নয় কমরেড্‌। তবে ‌—যা বলেছ, রক্ত-পতাকা—লাল নিশান নয়, রক্ত-‌তাকা। বেশ কথাটা! রক্ত-পতাকা—বড় সুন্দর ‌থাটা মনে পড়িয়ে দিলে কমরেড্‌। অতীতের মধুময় ‌থার ইতিহাস—রক্ত-পতাকা, ঠিক বলেছ।"

সকলেই বুঝিল, আর একটা গল্পের সূচনা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সগোটভের আঘাত গুরুতর, তাই সকলেই বলে ওঠল, "এখন থাক কমরেড্‌, চল আগে হাসপাতাল থেকে আসি।"

সগোটভ যেন তাদের কথা শুনতেই পেল না। পূর্ব্ব কথার সূত্র টেনে বলতে আরম্ভ করল:

"তখন তোমাদের অনেকেরই জন্ম হয় নি, অনেকে তখনও নিতান্ত শিশু, ঠিক এমন দিনে—হ্যাঁ, ঠিক এই দিনটাতেই—হ্যাঁ, ঠিক সতেরই নবেম্বর। সে দিন নেতারা সব পতাকা-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন—লাল পতাকা তুলতে হবে জার-প্রাসাদের সম্মুখের পার্কে। কিন্তু আগেই এল প্রবল বাধা। জারের আদেশে নেতারা সকলেই বন্দী হলেন। কর্ম্মীরাও সকলে ধরা পড়লো। বাকী রইল শুধু একজন—সে হচ্ছে আমি—সগোটভ। সহরের প্রতি গৃহ, প্রতি দোকান থেকে সমস্ত লাল কাপড়, লাল কাগজ ছিনিয়ে নেওয়া হ'ল। লাল রঙে কাপড় ছোপান পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে গেল।"

রক্তে সগোটভের রুমাল ভিজে গিয়েছে, তবু তার কাহিনী এগিয়ে চলে।

"পথে পথে কশাক প্রহরী, গলিতে গলিতে গুপ্তচর। পার্কে যাওয়া নিষিদ্ধ। আমি ছিলাম তখন ঐ পার্কেরই মালী, কাজেই ভিতরে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। আমি ঠিক করলাম, নেতৃবর্গের নির্দ্দেশ আমি পালন করবই—পতাকা তুলবই যেভাবে পারি।

"কথাটা স্ত্রীকে বললাম। সে ছিল ভারী ভাবপ্রবণ, বল্‌ল, হাঁ, পতাকা তুলতে হবে বৈকি?"

"আমার ছিল একটি মাত্র ছেলে—সাত-আট বছর বয়েস হবে। সে-ও তার মায়ের কথায় সায় দিল। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াল, কি করে তোলা যায়? পার্কের মালী আমি—আমার পার্কে যাওয়া আটকাবার উপায় নেই। কিন্তু লাল নিশান?

"স্ত্রী বলল—সে ভাবনা তোমার নয়, সে আমি যোগাড় করব—ঠিক কাজের সময় তোমার কাছে পৌছে যাবে।"

"কিন্তু পার্কে আমি একা গেলে তো চলবে না—স্ত্রীকেও যেতে হবে—সে-ই যে যোগাবে লাল নিশান।

স্ত্রী চললো আমার সঙ্গে। ছেলে আবদার ধরলো, সে-ও যাবে। মৃত্যুভয় যাদেরে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না, আমি তাদেরে বাধা দিব কি দিয়ে !"

বলতে বলতে সগোটভ মাথা থেকে রুমালটা তুলে নিল। লাল টক্‌টকে, রক্তে চুব্‌চুবে রুমালটা নিংড়ে নিতে নিতে সে বলল, "রক্ত দেখে ভয় পেয়োনা কমরেড্‌, এত কিছুই নয়। যে পতাকার ইতিহাস বলছি সে আরও লাল—অনেক বেশী লাল ছিল।"

তার কণ্ঠস্বর ক্লান্ত, তবু সে বলতে লাগল, "আমরা তিনজনেই পার্কে প্রবেশ করলাম। প্রহরীরা সকলেই আমাকে—আমাদের তিনজনকেই চিনে। তবু দেহ তল্লাসীর ত্রুটি হ'ল না, কিন্তু পেল না কিছুই। ভিতরে যেয়ে স্ত্রীকে চুপেচুপে জিজ্ঞেস করলুম, তবে কি আননি ?

"স্ত্রী হেসে বলল—ভয় নাই, এনেছি ঠিকই, কিন্তু উঠাবে কোথায় ?

"আমি ডালিয়ার ঝোপটা তাকে দেখালাম। ওরই পিছনে পতাকা-স্তম্ভ। দড়ি ঝুলানই আছে—শুধু বেঁধে টেনে তুললেই হ'ল। তবে একটু উঁচুতে—বেদীর উপর ক্রিসেনথিয়াম ফ্যাকটাসের ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে তুলতে হবে।

"স্ত্রী বলল—আচ্ছা, তুমি যাও, আমি খোকনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

"আমি ফুলগাছের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে বেদীর উপর উঠে দাঁড়ালাম। পার্কে আরও পতাকা স্তম্ভ ছিল, কিন্তু এইটিই ছিল নিভৃততম স্থানে। ত্রস্তমনে দড়ি ধরে অপেক্ষা করছি, কিন্তু পতাকা নিয়ে খোকন আসে না কেন ? ঝোপের ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলাম, আমার স্ত্রী বুকের দিকটায় জামার নীচে হাত ঢুকিয়ে কি একটা জিনিষ খোকনের হাতে দিল, তারপর তার গালে একটু চুমু খেয়ে বেঞ্চির গায়ে মাথা রেখে যেন ঘুমিয়ে পড়লো। মনে হ'ল স্ত্রী বেশ একটু ভয় পেয়েছে। হাজার হ'লেও মেয়ে মানুষ তো।

"দড়িটা ঠিক করে বাঁধতে লাগলুম। খোকন দৌড়ে এসে একটা পতাকা আমার হাতে দিল। কিন্তু একি, এতো ঠিক লাল নয়—আধা লাল। খোকনকে বললাম,—এতে তো হবে না, পতাকার আগাগোড়া ঠিক লাল তো হয় নি, মাঝে মাঝে একটু একটু সাদাও রয়েছে যে।

"খোকন আমার হাত থেকে পতাকাটা নিয়ে বলল—দড়িটা ঠিক ক'রে বাঁধ বাবা, আমি লাল পতাকা দিচ্ছি।

"দূরে একটা প্রহরী। মনে হ'ল যেন এই দিকেই আসছে। ভয় হ'ল, দেখতে পেয়েছে নাকি আমাকে ? উঁকি মেরে দেখতে দেখতে পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম,—শীগ্‌গির খোকন। একখানা কম্পিত হাতে আমার হাত লাগলো। খোকন আমার হাতে গুঁজে দিল একখানা ভিজে পতাকা। দড়িতে বাঁধতে গিয়ে দেখি লাল—খুবই লাল পতাকাখানা, কিন্তু চুবচুবে ভিজা—রক্তের উষ্ণতা তখনও তাতে রয়েছে।

ভাববার অবসর ছিল না। উঃ, হাত যেন আমার কাঁপছে, দড়িতে পতাকা বাঁধতে লাগলো যেন এক যুগ। যাক্‌, বাঁধা হয়ে গেলে টেনে তুলতে তুলতে পিছন ফিরে দেখি, স্ত্রী হাসিমুখে বেঞ্চের উপ শুয়ে পড়েছে, বুকের কাছে জামাটা তার ভিজে লাল হয়ে উঠেছে। খোকনের দিকে তাকাই—বেদীতে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল,—তার বুকের রক্তে বেদীমূল ভেসে যাচ্ছে। ভিজে পতাকা তখন স্তম্ভের আগায় উঠে গিয়েছে। স্ত্রী ও ছেলে এক সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ব্যয় ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো,—'রক্ত-পতাকা কী'—সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো—"জয়।" তার পর—

বলতে বলতে সগোটভ কাঁপছিল। অসহ্য ব্যথা। মাথার বোঝা যেন আর সে বইতে পারছে না। তবু সে বলতে লাগলো—সে পতাকা ছিল আমার এই রক্তমাখা রুমালের চেয়েও আরও বেশী লাল—সগোটভের স্ত্রী এবং সন্তানের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত। সেদিনের সেই রক্ত-পতাকার স্মরণে বল ভাই সব—রক্ত-পতাকা কী—শ্রোতৃবর্গের অশ্রুরুদ্ধ সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো—'জয়।'

ততক্ষণ সগোটভের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

রিয়াজ-উস্-সেলাত্বিন

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ,

রিয়াজ-উস্-সেলাত্বিন প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ রিয়া ইংরাজগণ কর্তৃক বাংলা অধিকৃত হওয়া পর্য্যন্ত াংলা প্রদেশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বইখানি চনা এবং চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সূচনাকে আবার ারিটি অংশে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম অংশে বাংলার ভৌগলিক পরিচয় প্রদান ও সীমা নির্দ্দেশ এবং দ্বিতীয় ংশে বাংলা ও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা ইয়াছে। তৃতীয় অংশে বাংলার কতকগুলি প্রসিদ্ধ গরের বিবরণ ও চতুর্থ অংশে বাংলায় ভারতীয় াজাদের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি হইয়া যে কল রাজা বাংলায় রাজত্ব করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল সুলতান বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিজের নামে খুত্‌বা (স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচিত হইবার একটি নিদর্শন) পাঠ করিয়াছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁহাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে যে সকল নাজিম (সৈন্যাধ্যক্ষ) মোগল সম্রাটদের প্রতিনিধি-স্বরূপ বাংলা শাসন করিয়াছেন তাঁহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায় দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির বাংলা ও দাক্ষিণাত্যে আগমনের বিবরণ এবং দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজকর্তৃক বাংলা ও দাক্ষিণাত্য অধিকারের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে।

লেখক গোলাম্ হোসেন খান যোধপুরী বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের নিকটবর্ত্তী মালদহ সহরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য সংক্রান্ত রেসিডেণ্ট মিষ্টার জর্জ্জ উড্‌নীর অধীনে ডাকমুন্সী বা পোষ্ট মাষ্টারের কাজ করিতেন। তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। সমসাময়িক সকল ইতিহাসই তিনি পাঠ করিয়াছেন। বাংলার ইতিহাস হিসাবে এই বইখানিই বোধ হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মোগল রাজত্ব কালের আরও অনেক ইতিহাসই আছে, কিন্তু পৃথক ভাবে কেবল বাংলা সম্বন্ধে লিখিত আর কোন ইতিহাস সম্ভবতঃ নাই। গোলাম হোসেন ১৮১৭ সালে প্রাণত্যাগ করেন।

বাংলা ও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য

বাংলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, পয়গম্বর নোহের পুত্র হাম পিতার আদেশে দক্ষিণ দিকে যাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে হিন্দ্, সিন্দ, হবস্, জনজ্, বর্‌বর্ ও নৌবা এবং ইঁহাদের প্রত্যেকে যে-যে স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই-সেই স্থান তাঁহার নামানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

প্রথম পুত্র হিন্দ্ হিন্দ দেশে আসিয়া বসবাস করেন এবং ঐ দেশ তাঁহার নামেই পরিচিত হয়। সিন্দ্ তাঁহার বড় ভাইএর সঙ্গে আসিয়া যে স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন ঐ স্থান তাঁহার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হিন্দের ছিল চারি পুত্র। প্রথম পুরব, দ্বিতীয় বঙ্গ, তৃতীয় দেকন্ ও চতুর্থ নহরবাল। হিন্দের ছেলে দেকনের তিন ছেলে। দেকন্ রাজ্য তাঁহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহাদের নাম মরহট, কনর ও তলঙ্গ। দেকন-বাসীরা তাঁহাদেরই বংশধর এবং আজ পর্য্যন্তও ওই তিন জাতিই ঐ দেশে বাস করিতেছে। নহরবালের তিন ছেলে—ভরবচ, কনাজ ও মালরাজ। হিন্দের প্রথম ছেলে পূরবের বিয়াল্লিশ জন পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের সন্তানসন্ততির সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায়

তাঁহাদের একজনকে নিজেদের মধ্যে সর্দ্দার মনোনীত করিয়া তাঁহারা রাজ্য শাসন করিতে থাকে।

হিন্দের ছেলে বঙ্গের অনেক পুত্রসন্তান হইয়াছিল ও তাঁহারা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। বাংলার নাম পূর্ব্বে ছিল বঙ্গ। 'আল' শব্দ যাহা বঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া বাংলা নাম হইয়াছে উহার অর্থ মাটির উঁচু ঢিপি। বাগান, ক্ষেত প্রভৃতির চারিদিকে উঁচু করিয়া মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে বাহিরের জল ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। ইহারই নাম আল। প্রাচীন কালে বাংলার রাজারা ১০।১২ হাত উঁচু ও বিশ হাত প্রশস্ত মাটির বাঁধদ্বারা বঙ্গের সীমানার চারিদিকে বাঁধিয়া দেন। ইহারই ভিতরে ক্ষেত, বাগান, বাড়ী-ঘর প্রভৃতি তৈয়ার করা হইত। এইজন্য এই প্রদেশকে 'বাঙ্গাল' নামে অভিহিত করা হয়। বাংলার আবহাওয়া ও শস্যাদি সম্পর্কে এই পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, বাংলার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। বৃষ্টিপাত ও সমুদ্রের নৈকট্যবশতঃ এখানকার মাটি অত্যন্ত ভিজা। বর্ষাকাল উর্দ্দিবেহেস্ত (এপ্রিল) হইতে আরম্ভ হয়। ইহাকে হিন্দিতে 'জৈঠ্' বলা হয়। বাংলায় একাদিক্রমে প্রায় ছয়মাস ধরিয়া বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু হিন্দুস্থানের অন্যান্য অঞ্চলে ইহার ব্যাতিক্রম দেখা যায়। তথায় খুরদাদের (মে) মধ্যভাগে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া শহরইওর (আগষ্ট) পর্য্যন্ত চারিমাস বৃষ্টিপাত হয়। শহরইওরকে হিন্দ্‌বাসীরা 'আশিন' বলে। বর্ষাঋতুতে এখানকার হাওয়া খারাপ হইয়া যায়, বিশেষতঃ বর্ষাকালের শেষ ভাগে। মানুষ ও জীবজন্তু প্রায়ই অসুস্থ হইয়া মারা যায়। মাটি অত্যন্ত ভিজা থাকে। সেইজন্য কোন কোন নগরে ইট ও চুণ দিয়া দোতলা বাড়ী তৈয়ার করিতে হয়। ইট চুণদ্বারা বাড়ী করা সত্ত্বেও নীচ তলার ঘর বসবাসের উপযুক্ত হয় না। যদি কেহ এই সব কোঠায় বাস করে, তাহা হইলে শীঘ্রই রোগাক্রান্ত হয়। স্বাভাবিক উর্ব্বরতা বশতঃ জমির উৎপাদিকাশক্তি খুব বেশী। কোন কোন শালিজাতীয় ধানগাছ শীর্ষভাগ জলে ডুবিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বর্ষাকালের জলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে। ধানের ছড়াগুলি কখনও ডুবিয়া যায় না। ঠিক তেমনি আবার ধানের একটি বীজ হইতে প্রায় ২।৩ সের ধান হয় এবং পূর্ণ এক বৎসরে তিন রকম ফসলের আবাদ হয়। মোটা অথবা সরু ধানই এই প্রদেশের প্রধান চাষ। গম, যব ও ডাল প্রভৃতির চাষ কদাচিত করা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যথেষ্ট পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহার জন্য অন্যান্য ঋতুতে বৃষ্টির অথবা কূপ ও নদীর জল সরবরাহ করিবার প্রয়োজন হয় না। আবার যদি বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত না হয়, তাহা হইলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

বাংলার অধিবাসীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, বাংলায় গ্রামের অধিবাসীরা শাসকের বেশ বাধ্য ও অন্যান্য প্রদেশের জমিদার ও প্রজাদের মত শাসকের সঙ্গে কোন ঝগড়া করে না। বৎসরের খাজনা ৮ মাসে আদায় করা হয় এবং ঐ খাজনা প্রজারা নিজেই কাচারীতে পৌছাইয়া দেয়। এই বন্দোবস্তের নিদর্শনকে 'নসক্' বলে। 'নসক্' আমিলের মোহর দেওয়া একটি কাগজের টুকরা। ইহা মোহরের, পাটোয়ারী ও কারকুনদের নিকট জমা থাকে। কিন্তু আদান-প্রদান, কেনাবেচা ও অন্যান্য সংসারিক ব্যাপারে বাঙ্গালীর মত ফাঁকিবাজ, ধূর্ত্ত ও শঠ এই পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। দেনার পরিশোধকে তাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করে না। একদিনের প্রতিজ্ঞাকে তাহারা এক বৎসরেও সম্পন্ন করে না। ধনী গরীব সকল বাঙ্গালীর খাদ্যই মাছ, চাউল, সরিষার তৈল, দৈ, ফল ও মিষ্টি। শুকনা লঙ্কা ও লবণ তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে খায়। কিন্তু লবণ এই প্রদেশের কোন কোন যায়গায় দুষ্প্রাপ্য। এই প্রদেশের লোকেরা এক কথায় মুখর, অভদ্র ও নোংড়া। গম ও যবের রুটী তাহারা মোটেই পছন্দ করে না। পাঠা ও পাখীর মাংস তাহাদের রুচির সঙ্গে খাপ খায় না। এমন কি মাংস খাইলেও অনেকেরই পাকস্থলী তাহা কবুল করিতে পারে না বলিয়া তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলে। ধনী গরীব স্ত্রী পুরুষই সকলেই একখানি মাত্র কাপড় ব্যবহার করে। পুরুষেরা যে শাদা কাপড় ব্যবহার করে তাহাকে সাধারণ লোকে 'ধুতি' বলে। ইহা নাভি হইতে জানু পর্য্যন্ত পরিধান করা হয়। তাহারা দুই-তিন হাত লম্বা কাপড় দিয়া এমন ভাবে মাথায়

াড়ী বাঁধে যে, তালু ও চুলের গোছা সমস্তই দেখা । স্ত্রীলোকের কাপড়কে 'শাড়ী' বলে। ইহার এক শ নাভির নীচ হইতে পা পর্য্যন্ত জড়ান হয় ও অন্য শ একপাশ দিয়া টানিয়া নিয়া গলায় ঝুলাইয়া দেয়। র অন্য কোন কাপড় পরিধান করে না। স্ত্রী-পুরুষ লেই সরিষার তৈল শরীরে মাখিয়া নদী বা পুকুরে ন করে। বাংলার মেয়েদের কোন পর্দ্দা নাই। কোন ন আবাদ করা ও পরিত্যাগ করা উভয়ই তাহাদের কট সমান। কারণ বাড়ীঘর খড়ের, অধিকাংশ পাত্রই টর। তামার পাত্রও দুই একটা থাকে। যখনই হার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উঠিয়া যায়, তখনই বার নূতন করিয়া খড়ের ঘর তৈয়ার করে ও মাটির ান আনাইয়া নেয়। অধিকাংশেরই বাড়ী ঘর ঝোপ-লের মধ্যে এবং বাড়ীর চারিদিকেই গাছ থাকে। কোন এক বাড়ীতে আগুন লাগে, তাহা হইলে গ্রামকে ম পুড়িয়া যায়, বাড়ীঘরের কোন নিদর্শনই আর পাওয়া না। বাড়ীর চারিদিকের গাছগুলি হইতে কতকটা মান করিতে পারা যায় মাত্র।

অধিকাংশ লোকই জলপথে চলা-ফেরা করে, বিশেষতঃ কালে। বর্ষাকালে চলাফেরার জন্য ছোটবড় নানা ম নৌকা আছে। স্থলপথে চলাফেরার জন্যও আবার হাসন, পাল্কী ও জোয়ালা আছে। কোন কোন যায়গায় তী ধরা হয়। ভাল ঘোড়া দুষ্প্রাপ্য, পাওয়া গেলেও বই দাম। এই প্রদেশে এক আশ্চর্য্যরকমের নৌকা তৈয়ার । উহা দুর্গ অবরোধ করিতে কাজে লাগে। এইজন্য ড় বড় নৌকার অগ্রভাগকে এমন লম্বা করিয়া প্রস্তুত রা হয় যে, যখনই নৌকা গিয়া দুর্গের প্রাচীরে লাগে খনই সৈন্যরা প্রাচীরের উপর দিয়া দুর্গের মধ্যে প্রবেশ রিতে পারে। এই অগ্রভাগকে দেশী ভাষায় 'গল্‌ওই' লে। তিসি গাছ হইতে বেশ সুন্দর একরকম গালিচা তয়ার হয়। হীরা, মুক্তা, জহরৎ ও পশম এই প্রদেশে াওয়া যায় না, অন্যান্য দেশ হইতে এই প্রদেশের বন্দর মূহে আমদানী করা হয়। এই প্রদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল াম। কোন কোন যায়গায় বেশ বড়, মিষ্ট, সুস্বাদু ও াশ বিহীন আম পাওয়া যায়। ইহাদের আঁটি খুব ছোট। বৎসর তিনের মধ্যেই মানুষের সমান উঁচু আমগাছগুলিতে ফল ধরে। নানা রকমের কমলা এ দেশে প্রচুর হয়। বড় বড় কমলাগুলিকে 'কোন্‌লা' ও ছোটগুলিকে 'নারঙ্গী' বলে। কাগ্‌জী লেবু, আতাফল, নারিকেল, সুপারী, তাল, কাঁঠাল ও কলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আঙ্গুর, তরমুজ ও অন্যান্য ফল এদেশে হয় না। যদিও আঙ্গুর ও তরমুজের বিচি এদেশে অনেক সময় রোপণ করা হয়, কিন্তু কখনই ভাল হয় নাই। লাল, সাদা ও কাল প্রভৃতি নানা রঙের সুন্দর ও সুস্বাদু ইক্ষু এদেশে পাওয়া যায়। আদা ও মরিচ কোন কোন যায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে হয়। পানও প্রচুর উৎপন্ন হয়। সুন্দর সুন্দর রেশম প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং রেশমের কাপড় এদেশে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হয়। তুলা হইতেও বেশ ভাল ভাল কাপড় বোনা হয়। বাংলাদেশে ছোট বড় অনেক নদী আছে। পুকুরের সংখ্যা একেবারে হিসাবের বাহিরে। কূপের জল খুব কমই পান করা হয়। কারণ পুকুর ও নদীর জল যথেষ্ট পাওয়া যায়। অধিকাংশ কূপের জল লবণাক্ত। তা ছাড়া অল্প খনন করিলেই জল পাওয়া যায়।

নদীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গঙ্গা। ইহা হিন্দুস্থানের উত্তর দিকের পাহাড়সমূহে অবস্থিত 'গোমুখ' হইতে উৎপন্ন হইয়া 'ফরখাবাদ', 'এলাহাবাদ' ও বিহারের মধ্য দিয়া বাংলায় পৌছিয়াছে এবং বাংলার 'সরকার বারকোবাদের' নিকট 'কাজিহট্টা' নামক স্থানে উহা 'পদ্মা' নাম ধারণ করিয়াছে। ঐ স্থান হইতে গঙ্গার একটি শাখা মুর্শিদাবাদ হইয়া নদীয়ায় গিয়াছে। তথায় 'জলঙ্গ' নদীর সহিত মিলিত হইয়া সাগরে পড়িয়াছে। ইহার নাম ভাগীরথী। গঙ্গা এলাহাবাদে 'শোন' (যমুনা) ও সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থানটি অত্যন্ত প্রশস্ত। হিন্দুরা ইহাকে ত্রিবেণী বলে। হিন্দুদের নিকট ইহা পবিত্র তীর্থ। হাজীপুরের নিকট গঙ্গা আবার 'গন্দক', 'সুর' ও 'সুনের' সহিত একত্রিত হইয়াছে। গঙ্গা চট্টগ্রাম ও সমুদ্রে পৌছার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। হিন্দুরা ইহাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের জলকে পবিত্র মনে করা

হয়। তাহারা মনে করে যে, এই সকল স্থানে বিশেষতঃ বেনারস, এলাহাবাদ হরিদ্বার প্রভৃতি গঙ্গার কতকগুলি ঘাটে স্নান করিলে সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায়। ধনী লোকেরা অনেক দূর হইতে গঙ্গার জল আনিয়া রাখিয়া দেয় এবং কোন পবিত্র দিনে ইহার পূজা করে। ইহা সত্য যে, স্বাদ, স্বচ্ছতা এবং হজম শক্তির দিক দিয়া গঙ্গার জলের তুলনা হয় না। গঙ্গা হইতে আর কোন বড় নদী বাংলায় নাই।

ব্রহ্মপুত্র নামে আর একটি বড় নদী আছে। ইহা 'খত্না' ও 'কোচে'র মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া 'বাজুহা' সহরের মধ্য দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে এবং চাটগাঁওএর নিকট ইহা 'মেঘনা' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ছোট নদীর সংখ্যা হিসাবের বাহিরে। ঐ সকল নদীর উভয় পাশে ধানের চাষ করা হয়। অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাংলার আর একটি বিশেষত্ব এই যে আম ও লেবু গাছের শাখা হইতে কলম করিয়া মাটিতে রোপণ করা হয়। এই সকল কলমের গাছে এক বৎসরের মধ্যেই ফল ধরে।

গাঢ় ঘুমে অচেতন

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল

সারা দেশ আজ গাঢ় ঘুমে অচেতন,
সর্ব্বঅঙ্গ তার পঙ্গুর লীলাভূমি,
শত আঘাতেও চেতনা নাহিক যার
তাহারে জাগাবে—চেতন করিবে তুমি?

বহু শতাব্দী ডাকনি যাহারে কাছে,
ঘৃণা অপমানে রাখিয়াছ দূরে দূরে,
পেটে নাই যা'র ক্ষুধার অন্নটুকু,—
লাঞ্ছনা সহি' কাঁদিতেছে মাথা খুঁড়ে!

আঘাতে আঘাতে মনের কামনা যত,
বাড়েনি,—পায়নি আলোকের কোনো সাড়া,
প্রাণটুকু শুধু ধিকি ধিকি করে বুকে,
বেঁচে আছে তবু হ'য়ে প্রাণে আধ মরা!

দুঃখ দৈন্য মড়ক দোসর তা'র,
শত নাগপাশে বাঁধা নিতি শত পাকে,
পথের কুকুর তার চেয়ে বুঝি ভাল,
একটু আঘাতে জাগায়ে তুলিবে তাকে?

আগে দাও তা'রে ক্ষুধার অন্ন মুখে
তৃষিত কণ্ঠে স্নিগ্ধ শীতল ধারা
অপমান জ্বালা—স্নেহের প্রলেপ দিয়ে,
শুনাও তাহারে—জগতে মানুষ তা'রা!

তাহাদের মাঝে কাঁদে নিতি ভগবান,
চায় আলো—চায় সুখ ও শান্তি বুকে,
তাহাদেরি মাঝে—তোমারি রক্তধারা,
তবে ত জাগিবে হাসিটি ফুটিবে মুখে!

চলন্তিকা

(কথিকা)

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী, এম-এ

তিনটি জেলে। ভারী গরীব তারা। সহরের এক প্রান্তে লতায়-পাতায় ঘেরা তাদের মায়ার জাল—তিনখানি পর্ণ-কুটীর। সহরের বড় বড় অট্টালিকার পাশে ওগুলো যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—একান্ত রিক্ত, সম্পূর্ণ নিঃসহায়ের মত।

কাজ তাদের তিন জনেরই করতে হয়। আসুক ঝড়—আসুক প্রলয়—বিশ্রাম তাদের ভাগ্যে জোটে না। তাদের অবসর মানে, সেদিনকার মত উপোস—আর সঙ্গে সঙ্গে উপোস তাদের বৃহৎ পরিবারের। কঠোর তাদের পরিশ্রম—স্বল্প তাদের উপার্জ্জন অথচ পোষ্য তাদের অনেক।

কাজ—কাজ—কাজ। কিন্তু হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরেও ক্ষুধা তাদের মেটে না—শুধু দাউ দাউ ক'রে বেড়ে ওঠে ওদের পেটের আগুন। কাজের বদলে ভাগ্যে তাদের মেলে শুধু দারিদ্র্য, রোগশোক আর অকাল-মৃত্যু।

তিনটি ছোট্ট ডিঙ্গি তাদের সম্বল। তাই নিয়ে রোজ তারা মাছ ধরতে যায় বড়নদীতে—সমুদ্রে। পিছনে পড়ে থাকে অসহায় তিনটি সংসার, আর তিনটি নারীর অশ্রুভারাক্রান্ত দেহ আর চিন্তাকুল হৃদয়। সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়েও ওই মুখ তিনখানিই তারা ভাবতে থাকে—ওতেই ওদের যেন চরম সুখ।...

'গুড়্—গুড়্—গুড়্'—সেদিন রাতে মেঘ ডেকে ওঠলো। জেলেরা গিয়েছে ডিঙ্গি নিয়ে বাহির-সমুদ্রে মাছ ধরতে—কাজ তাদের করতেই হবে, নইলে যে উপোস সকলেরই। রাত্রি ঘনিয়ে এল তার দুর্য্যোগ নিয়ে। মেয়েরা ছেলেদের ঘুম পাড়িয়ে লণ্ঠন নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সমুদ্রের দিকে। ফেনিল জলধির অশান্ত উচ্ছ্বাসের দিকে তারা তাকিয়ে থাকে, আলো উপরে উঠিয়ে একটু একটু দোলা দেয়...বুকের রুদ্ধ চিন্তা তাদের চোখ ছাপিয়ে ঝর্-ঝর্ ক'রে ঝরে পড়ে। কিন্তু কেউ ফিরে এল না রাত্তিরে —পাওয়া গেল না তাদের কোন সাড়া।...কেবল মেঘের ডাক—ঝড়ের মাতামাতি আর সমুদ্রের গর্জ্জন !

ভোর হ'ল যখন, তখন ঝড় থেমে গেছে—সমুদ্রের ক্ষুব্ধ আক্রোশ হয়েছে শান্ত। আকাশ আর সাগর যেন নিলীমায় নীল। সাগরের বেলাভূমিতে প্রভাত-কিরণে চিক্-চিক্ কোরছে বালুকারাশি—আর তারই ওপর প'ড়ে রয়েছে তিনটি প্রাণহীন দেহ—হিম শীতল তাদের স্পর্শ; আর তাই আঁকড়ে ধ'রে চুল এলিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে তিনটি নারী। বাইরের শান্ত প্রকৃতির মাঝেও বুকে তাদের প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে—উদ্বেল অশান্ত সে ঝড়।...

এমনিই হয়। গরীব যারা—কাজ করতেই তারা জগতে আসে—কাজের ভিতর দিয়েই তারা এগিয়ে চলে—কাজের মধ্যেই তাদের জীবনের হয় অবসান। গরীব পুরুষ শত বিপদ অগ্রাহ্য ক'রেও ক'রবে কাজ—আর তাদের নারী ফেল্‌বে অশ্রু।...এই নিয়েই জগৎ চলে—এগিয়ে চলে, কোথায় কে জানে ? *

* কবি Kingsleyর *Three Fishers* নামক কবিতা অবলম্বনে।

আসামের বনে-জঙ্গলে

(শিকার-কাহিনী)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

শনিবারে চা-বাগানের কুলীদের সকাল সকাল ছুটী হওয়ারই নিয়ম—অন্ততঃ কাগজে-পত্রে তাই লেখা আছে, আর দরকার মাফিক এই নিয়মটাকে বেশ উঁচু গলায় প্রচারও করা হয়। শুনিয়া আমরাও ভাবি, সত্যই তো চা-বাগানের কুলীদের সুখের আর সীমা নাই—সপ্তাহে একদিন পুরা ছুটী, তার উপর আবার শনিবারে হাফ্। আর চাই কি? কিন্তু কাজের বেলায় ছুটীটা যে কি রকম দেওয়া হয় তাহা এই শনিবারে নিজেই প্রত্যক্ষ করিলাম।

তিনঘোরী চা-বাগানে এই আমার প্রথম শনিবার। শনিবার বলিয়াই আমাদের দুই বন্ধুর বড় সাহেবের বাংলোয় চা-পানের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বিকালে ৪টার সময় আমি আর বিভূতি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। খানাপিনার আয়োজন বেশ প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছিল। দুই বন্ধুতে তাহার সদ্ব্যবহার করিতেও ত্রুটি করিলাম না। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্পও চলিতে লাগিল—অবশ্য শুধু শিকারের গল্পই।

বড় সাহেব বলিলেন, "চলুন ভট্টাচারিয়া, কাল একবার শিকারে বেরুনো যাক, কি বলেন?

শিকারের নামে আমি তো এক পায়ে খাড়া, বলিলাম, "নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে!"

বন্ধু এই সুযোগে বড় সাহেবকে তাঁহার গৃহে 'লাইট রিফ্রেশমেণ্টের' নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলিল। বড় সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ, আপনাদের 'ডিস' তো আমার কাছে বেশ ভালই লাগে। বেশ, একটু সকাল করেই আমি যাব—চা খাওয়ার পর ওখান থেকেই শিকারে বেরুবো।"

পরের দিন বেলা দুইটার সময় সাহেব নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। বন্ধু-পত্নী বড় সাহেবের জন্য নানা রকম নোনতা এবং ক্ষীর ও ছানার খাবার তৈয়ার করিয়াছিলেন। একটা বড় টেবিলে বিভিন্ন ডিসে সব সাজাইয়া দেওয়া হইল। দেখিয়া বড় সাহেব তো খুব খুসী। সব ডিস হইতেই কিছু কিছু খাইলেন আর বাঙ্গালীদের তৈয়ারী মিষ্টান্নের প্রশংসাও করিলেন অজস্র।

খাওয়া শেষ করিয়া পাইপ ভরিতে ভরিতে সাহেব বলিলেন, "চলুন এবার, আর দেরী নয়। বেলাবেলী না বেরুলে শিকার করব কখন?"

আজকের শিকারের আয়োজনটা করা হয়েছে বেশ বড় রকমের। শিকারীতে আর দেহরক্ষীতে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক—একটা বাহিনী বলিলেও হয়। তার উপর আমরা তিন জন তো আছিই বোঝার উপর শাকের আঁটির মত।

অনেক চড়াই উৎরাই করিয়া আমরা একটা উপত্যকায় আসিয়া পৌছিলাম। গাছপালা এখানে খুবই কম—একরকম নাই বলিলেও চলে। অনেকটা পথ ভাঙ্গিতে হইয়াছে, কাজেই প্রথমে একটু বিশ্রাম করা গেল। তিন দলে বিভক্ত হইয়া তিন দিকে যাওয়াই স্থির হইল। সাহেব তাঁহার দলবল লইয়া যাবেন ডান দিকে, বন্ধু বিভূতি বাম দিকে আর আমি সোজা সম্মুখের দিকে। সম্মুখে একটা নদী। নদী পর্য্যন্ত সকলে এক সঙ্গেই গেলাম। তারপর তিন দিকে তিন দলের যাত্রা সুরু হইল। স্থির হইল, অপর দুই দল দুই দিক হইতে ঘুরিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে।

আমার সঙ্গে জন দশেক শিকারী। অনেক বন-জঙ্গল এবং চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিয়া আমরা একটা ছোট পাহাড়ের উপর উঠিলাম। এখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকের অবস্থাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ বহু-লোকের একটা কোলাহল শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিন চারিটি বন্দুকের আওয়াজও শুনিতে পাইলাম। মনে

করিলাম, সাহেবের লোকজনেরাই কোলাহল করিতেছে, হয়ত কোন বড় শিকার মিলিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, কিন্তু বোঝা গেল না কিছুই। এ অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহাই ভাবিতেছি। আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া একজন শিকারী বলিল, "ঐ দেখুন হুজুর, ঘাসের জঙ্গল তোলপাড় ক'রে কি একটা জানোয়ার এই দিকেই আসছে।"

পাহাড়ের তলা হইতেই ঘাসের জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে —খুব লম্বা লম্বা ঘাস, মানুষের মাথার উপরেও প্রায় হাত-খানেক উঁচু হইবে। শিকারীর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ অনুসরণে চাহিয়া দেখিলাম, ঘাসবনের একটা জায়গা ভীষণ ভাবে আলোড়িত হইতেছে এবং আলোড়নটা ক্রমেই আমাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কি জানোয়ার কে জানে? শিকারীদিগকে বলিলাম, "চল, আমরা লুকিয়ে থাকি একখানে। দেখা যাক কি জানোয়ার।"

আমরা সকলেই একটা ঝোপের আড়ালে যাইয়া আত্ম-গোপন করিলাম। আলোড়নটা যখন ঘাসবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌছিল, তখন দেখি, একটা অতিকায় হরিণ ঘাসের বন হইতে বাহির হইল। ঘাসবন হইতে বাহির হইয়া হরিণটা পাহাড় বাহিয়া আমাদের দিকেই আসিতে লাগিল। কেন যে ও এত দ্রুত ছুটিয়া আসিতে-ছিল, সে প্রশ্নটা আমার মনেই আসে নাই। তাই কাল বিলম্ব না করিয়া গুলি করিয়া বসিলাম। বন্দুকের আওয়াজের পর মুহূর্ত্তেই ভীষণ এক গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। কিন্তু কোথা হইতে গর্জ্জনটা আসিল তাহা আমরা ঠিক করিতে পারিলাম না। এদিকে হরিণ তো গুলি খাইয়া একবার লাফাইয়া উঠিল, তারপর গড়াইতে গড়াইতে নীচে একেবারে ঘাসবনের কাছে যাইয়া পড়িল। ঘাসের বন এখন স্থির—কোন চাঞ্চল্যই আর উহার মধ্যে দেখা যাইতেছে না। পাহাড় হইতে এবার আমরা নামিতে সুরু করিলাম। প্রায় অর্দ্ধেক পথ নামিয়াছি এমন সময় আবার কোলাহল, বন্দুকের শব্দ ও বাঘের গর্জ্জন শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ঘাসবনের দিকে চাহিয়া দেখি, তাই তো, ঘাসের মাথা ছাড়াইয়া কয়েকটি বেয়নেটের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। যাক্, তাহা হইলে বড় সাহেবের দল একটা বাঘকে chase করিয়া এই দিকেই আসিতেছে।

এই অবস্থায় আমিও আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। আমরা দুইজন দুইজন করিয়া ভাগ হইয়া গেলাম এবং দশ হাত দূরে দূরে ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। নজর আমাদের চারিদিকেই রহিল। হঠাৎ নজরে পড়িল, কাছেই একটা প্রকাণ্ড বাঘ একটা টিলার উপর লাফাইয়া উঠিতেছে। উপরে উঠিয়া বাঘটা এদিক ওদিক কিছুক্ষণ তাকাইয়া দেখিল, তারপর লাফাইতে লাফাইতে আমাদের পাহাড়ের দিকেই আসিতে লাগিল। যখন বুঝিলাম বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিয়াছে তখনই বাঘের মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম। গুলি খাইয়া বাঘটা একটা বিকট গর্জ্জন করিয়া লাফাইয়া উঠিল—মতলবটা এক লাফেই আমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়া। কিন্তু আমরা প্রায় বিশ-পঁচিশ হাত উপরে। কাজেই নিম্ন স্থান হইতে এতটা উপরে আমাদের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়া আর তাহার হইল না, তবে অনেকটা কাছেই আসিয়া পড়িয়াছিল বটে—কিন্তু পড়িল আমাদের নিকট হইতে প্রায় ১০।১২ হাত দূরে একটা ঢালু পাথরের উপরে। এবার আরও একটা গুলি করিলাম। পাথরটা ঢালু বলিয়া গুলি খাইয়া বাঘ আর টাল সামলাইতে পারিল না। গড়াইতে গড়াইতে ঘাসবনের দিকে যাইতে লাগিল।

এদিকে বেয়নেটের অগ্রভাগগুলি ক্রমেই আগাইয়া আসিয়া ঘাসবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—আর কেহ নহে বড় সাহেব এবং তাঁহার দলবল। আহত বাঘটাকে ওভাবে তাহাদেরই দিকে যাইতে দেখিয়া তিন জন শিকারী একই সঙ্গে উহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। ইতিপূর্ব্বে আমার গুলিটা উহার মাথায় লাগায় বাঘ অনেকটা কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। এবার একসঙ্গে তিনটা গুলি খাইয়া ব্যাঘ্রপ্রবরের বিপুল বপু অন্তিম চীৎকার করিয়া ঘাসবনের শেষপ্রান্তে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল।

বড় সাহেব দলবল সহ মৃত বাঘটার কাছে যাইয়া দাঁড়াইলেন। আমরাও পাহাড় হইতে নামিয়া তাঁহাদের কাছে গেলাম। বাঘের ঘটনাটা বড় সাহেবের নিকট

শুনিলাম। বাঘটা অতর্কিতে বড় সাহেবেকে আক্রমণ করিবার জন্য অনেকটা উঁচু হইতেই লাফ দিয়াছিল, কিন্তু পা হড়্কাইয়া নীচে পড়িয়া যায়। বাঘটা তখন বোধ হয় নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া দৌড়িয়া এই দিকে (আমরা যেখানে ছিলাম) আসিতেছিল। তখন বড় সাহেব তাঁহার শিকারী দল লইয়া বাঘের পিছনে পিছনে তাড়া করেন। শেষটায় ব্যাঘ্রবধ পর্ব্বে ফিনিশিং টাচ্‌টা (finishing touch) দিলাম আমরাই।

কয়েকজনে মিলিয়া বাঘ ও হরিণটাকে বাগানে লইয়া চলিল, আমাদের দুই দলও নূতন শিকারের সন্ধানে চলিতে লাগিলাম। একটা পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিতেছি, হঠাৎ একটা নেকড়ে উপরের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আমাদের দিকে তাড়া করিয়া আসিল, কিন্তু লোকজনের আধিক্য দেখিয়াই বোধহয় একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। এইবার আমি গুলি করিলাম। গুলি খাইয়া নেকড়েটা লাফাইয়া উঠিয়া গড়াইতে গড়াইতে আমাদের কাছেই আসিয়া পড়িল। কিন্তু আমি গুলি করিবার সুযোগ পাওয়ার পূর্ব্বেই মাটি হইতে উঠিয়া আমারই দিকে ঝাপাইয়া আসিতে লাগিল। এরকম ঘটনার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। নেকড়েটা আমার খুবই কাছে,—এই অবস্থায় ভাবিবার সময়ই বা কোথায়। শিকারীদের আত্মরক্ষার স্বাভাবিক অভ্যাসের ফলেই আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে এক পাশে সরিয়া গিয়া বসিয়া পড়িলাম। ফলে আমার পিছনে যে শিকারী ছিল নেকড়েটা যাইয়া তাহারই উপরে পড়িল। নেকড়ের ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া শিকারী তো কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল। শিকারী পড়িয়া যাওয়ায় নেকড়েও তাল সামলাইতে পারিল না। আরও সামনের দিকে খানিকটা আগাইয়া যাইয়া হড়্কাইতে হড়্কাইতে পাঁচ-সাত হাত নীচে যাইয়া পড়িল। আমি এবার বন্দুক লইয়া তৈয়ারীই ছিলাম—নেকড়েকে আর উঠিবার অবসর না দিয়াই গুলি করিলাম। নেকড়েটা যেখানে পড়িয়াছিল তাহার কাছেই আর একজন শিকারী দাঁড়াইয়াছিল। গুলি খাইয়া নেকড়ে যখন মাথা তুলিতে চেষ্টা করিল তখনই নেকড়ের মাথায় ভোজালীর এক কোপ মারিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে নেকড়েরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

নেকড়েটাকে লইয়া আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। খানিক দূর যাইয়া দেখিলাম জায়গাটা বেশ ফাঁকা। এখানে আমরা সকলেই একটু বিশ্রাম করিতে বসিলাম। কিন্তু বিশ্রাম করা আর ঘটিয়া উঠিল না। কিছু দূরে একটা সুবৃহৎ হরিণ নজরে পড়িল। দুইজন শিকারী সঙ্গে লইয়া হরিণ শিকারের জন্য কিছু নীচে নামিয়া গেলাম। আমাদের ভাজ পাইয়া হরিণটা দ্রুত গতিতে পলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই আমার গুলি তাহাকে বিদ্ধ করিল। গুলি খাইয়াও হরিণ দৌড়াইতে লাগিল, কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না, মুখ থুবড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। কাছে যাইয়া দেখিলাম মরিয়া গিয়াছে।

নেকড়ে ও হরিণ লইয়া ছয়জন শিকারী বাগানে ফিরিয়া গেল। আমার সঙ্গী রহিল মাত্র চারিজন। শিকার-বাহকদের সঙ্গে আমরা কিছু দূর গেলাম, তারপর পূর্ব্বোল্লিখিত নদীর দিকে চলিলাম। চারিদিক লক্ষ্য রাখিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় একজন শিকারী বলিয়া উঠিল—'হুজুর' এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার বেল্ট ধরিয়া একটানে আমাকে একেবারে তাহার কাছে আনিয়া ফেলিল। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কি, কি, ব্যাপার কি?"

শিকারী আমাকে ছাড়িয়া দিয়া উপরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "ঐ দেখুন হুজুর, পাহাড় থেকে একটা প্রকাণ্ড পাথর গড়িয়ে আসছে, আর একটু হ'লেই আপনার উপরে পড়তো।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই বেশ বড় একখণ্ড কাল পাথর গড়াইয়া আমি যেখানে ছিলাম সেখানে আসিয়া পড়িল। আর একটু হইলেই আমি পাথর চাপা পড়িতাম। কিন্তু ব্যাপার কি? হঠাৎ এভাবে এখানে পাথর গড়াইয়া পড়িবার তো কথা নয়—এরকম পাহাড় তো নয় এটা! কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। কাল পাথরখানা পড়িয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল—ও বাবা, এ যে প্রকাণ্ড এক ভালুক। কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইলে শিকারীর চলে না। বিস্ময় চাপিয়া রাখিয়া আমাকে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইল—সব শিকারীকেই এমন করিতে হয়, নতুবা শিকারীলীলা

যে কোন মুহূর্ত্তে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা। আমি তড়িৎ গতিতে হাতের বন্দুক তুলিয়া ভালুকের বক্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম। গুলিবিদ্ধ হইয়াও ভালুকটা কাবু হইল না, বিকট চীৎকার করিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিল। আবার গুলি করিলাম। দুইজন শিকারীও আমার দুই পাশ দিয়া একটু আগাইয়া গেল। দুই গুলি খাইয়াও ভালুকের যেন কিছুই হইল না। সে আগাইয়া আমাদের খুবই কাছে আসিয়া পড়িল এবং একজন শিকারীর বন্দুকের নল ধরিয়া টানাটানি সুরু করিয়া দিল। শিকারীটি ছিল খুবই ওস্তাদ শিকারী। সে বন্দুক শক্ত করিয়া ধরিয়া নলের মুখ ভালুকের বুকে চাপিয়া ধরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের ঘোড়া টিপিল। গুলি ভালুকের বক্ষদেশ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। ভালুকটা অস্ফুট স্বরে গোঙ্‌রাইতে গোঙ্‌রাইতে আড় হইয়া পড়িয়া গেল, তবু মরিল না। আর একজন শিকারী আর একটা গুলি করিয়া উহাকে একেবারে ঠাণ্ডা করিয়া দিল।

আমার সঙ্গে ছিল চারিজন লোক। তাহাদের মধ্যে দুইজন মৃত ভালুক লইয়া বাগানে ফিরিয়া গেল। আমার সঙ্গে রহিল মাত্র আর দুই জন। অবশ্য বাগান কাছেই, কাজেই সঙ্গে দুইজন শিকারী থাকিলেই যথেষ্ট।

আমরা তিনজন আর একটা পাহাড়ের উপর উঠিলাম। চারিদিকই বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। ডান দিকে চাহিয়া দেখি, বড় সাহেব তাহার দলবল লইয়া আসিতেছেন। বন্ধু বিভূতি এবং তাঁহার দলকেও বাম দিক হইতে আসিতে দেখিলাম। কাজেই সঙ্গে মাত্র দুইজন শিকারী থাকিলেও বিপদের আশঙ্কা নাই। আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর যাইতেই একটা হরিণকে চরিতে দেখিলাম। আমার এখন লক্ষ্য হইল হরিণ। অনেকটা দূর—তাই ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিতে লাগিলাম। হরিণের দিকেই ছিল বিশেষ লক্ষ্য, যেন চোখের আড়াল হইয়া না যায়। হঠাৎ মনে হইল শিকারী দুইজন আর আমার সঙ্গে নাই। তাই তো কোথায় গেল ওরা? একটু দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেই হইল। দেখিলাম তাহারা হারায় নাই, খানিকটা দূরে আমার দিকেই আসিতেছে। এবার আবার নিশ্চিন্ত মনে হরিণ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। নদীর কিনারায় আসিয়া পড়িয়াছি। ক্ষীণতোয়া পার্ব্বত্য নদী,—জলের গভীরতা বিঘৎখানিক হইবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু জলস্রোত বেশ তরতর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। খাতগর্ভ খুব গভীর। অসংখ্য উপলখণ্ডের মধ্যদিয়া জলস্রোত কল কল শব্দ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে—চারিদিকে নিবিড় বনের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই হিংস্র জন্তুর অতর্কিত আক্রমণ আশঙ্কা মনকে ভীত, সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। আনন্দ ও ভয়ের সংমিশ্রণে মনের কি অপূর্ব্ব ভাব, বর্ণনা করিয়া কাহাকেও বুঝান যায় না, শুধু উপলব্ধিই করিতে হয়।

হরিণটা নদীগর্ভেই নামিতেছিল। উহার নিকট হইতে অনেকটা দূরে আমিও নদীগর্ভেই নামিতে লাগিলাম। হরিণ পাহাড়ে পর্ব্বতে চলিয়া ফিরিয়া অভ্যস্ত—স্বচ্ছন্দে নদীর খাড়া ধার বাহিয়া নামিতে লাগিল। কিন্তু আজন্ম সমতল ভূমিতে বিচরণশীল, আমারই হইল বিপদ। বন্দুকটা ছিল হাতে, উহা পিঠে বাঁধিয়া অতি সন্তর্পণে দুই হাত দুই পায়ে ভর করিয়া নামিতে লাগিলাম। কিন্তু নামা কি যায়? পায়ের নীচের প্রস্তরখণ্ডগুলি কোথাও টলমল করে, কোথাও বা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়, কেহ কেহ বা যেন আমার প্রতি অত্যধিক প্রীতি-বশতঃ আমাকে লইয়াই গড়াইয়া পড়িতে চায়। কি যে বিপদেই পড়িলাম! অথচ নামিয়াছি মাত্র অর্দ্ধেক পথ। হাতের কাছে একটা গাছের শিকড় পাইয়া তাহাই ধরিয়া নামিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু পায়ের নীচের প্রস্তর খণ্ড গড়াইয়া নীচে পড়িল, আমি শুধু গাছের শিকড় অবলম্বন করিয়া ঝুলিয়া রহিলাম। কিন্তু শিকড়টাও আর আমার ভার বহন করিতে রাজি হইল না—ছিঁড়িয়া গেল। আমি গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে একটা বড় পাথরে আট-কাইয়া পড়িয়া বাঁচিয়া গেলাম। যদিও সামান্য একটু খানিই গড়াইয়া পড়িয়াছিলাম, তবু ঝাকুনিটা বেশ লাগিয়াছিল। শিকারীর পুরু এবং আঁটা পোষাক পরা, দুই হাটুতেই 'নী-কাপ'* (Knee cup) আঁটা, কাজেই বিশেষ কিছুই লাগে নাই।

একটু সামলাইয়া লইয়াই প্রথমে বন্দুকটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—না, ঠিকই আছে। হঠাৎ উপরের জঙ্গলে একটা শব্দ হইল, একখণ্ড পাথরও আমার নিকট দিয়া গড়াইয়া পড়িল। এবার সত্যই আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। সঙ্গের শিকারী দুইজনেরও দেখা নাই। তারাই বা গেল কোথায়। উপর হইতে কিম্বা দুই পাশ হইতে বন্যজন্তু আক্রমণ করিতে পারে। বিশ্রাম করিবার বা চিন্তা করিবার সময় আমার নাই। হরিণটাও দূরে একটা বাঁকের প্রায় কাছাকাছি গিয়াছে, আর একটু পরেই বাঁকের মোড়ে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি—বলিতে গেলে একরকম গড়াইতে গড়াইতে নদীগর্ভে যাইয়া পৌছিলাম। তারপর অগ্রসর হইতে লাগিলাম হরিণটার দিকে—অবশ্য ধীরে ধীরে; কারণ, একটু দম লওয়ার খুবই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল আমার।

হরিণটা এবার বামদিকের পাড়ের উপর উঠিতে লাগিল। অগত্যা আমাকেও একটা সুবিধাজনক স্থান দেখিয়া পাড়ে উঠিতে হইল। কিন্তু পাড়ে উঠিয়া হরিণটাকে দেখিতে পাইলাম না। কোথায় গেল? নিশ্চয়ই কোন ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে পড়িয়াছে। পাশেই একটা ছোট টিলা—তাহারই উপর আমি উঠিয়া দেখিলাম, এবার হরিণটা একটা পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। আমি বন্দুকের নিশানা করিবার আগেই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। হঠাৎ একটা নেকড়ে হরিণের উপর লাফাইয়া পড়িল—কিন্তু নেকড়েটা তাক ঠিক করিতে পারে নাই—হরিণের উপর না পড়িয়া পড়িল উহাকে ডিঙ্গাইয়া। আর কি হরিণের নাগাল পাওয়া যায়—বিদ্যুৎবেগে দৌড়িয়া জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। নেকড়েটা হরিণকে তো শিকার করিতে পারিলই না, অধিকন্তু খাড়া পাথরের গায়ে তাল সামলাইতে না পারিয়া গড়াইতে গড়াইতে নদীগর্ভে যাইয়া পড়িল।

এদিকে সন্ধ্যা হইতে বেশী দেরী নাই। কিন্তু সঙ্গী দুইজন হারাইয়া গিয়াছে—নিকটে জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। বাগান কাছে হইলেও ফিরিয়া যাওয়া বড় সহজ নয়। কি করা যায়! কিসের যেন শব্দ শুনিতে পাইলাম—যেন কেউ কাঠ কাটিতেছে। শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। বাঘ-ভালুকের ভয় করিয়াই আর কি করিব—সহায়-সম্বল বন্দুক তো সঙ্গেই রহিয়াছে।

তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া পা হড়্‌কাইয়া গেল। পড়িয়া গেলাম বটে, কিন্তু গড়াইয়া নীচে পড়িলাম না—একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে আটকাইয়া গেলাম। তাল সামলাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াই বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। বাম হাতে বর্শা এবং ডান হাতে একটা ভোজালী লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এক বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি। সন্ধ্যা হইয়াছে, কিন্তু অন্ধকার তখনো হয় নাই। কিন্তু কে এই বীরাঙ্গনা? এই শ্বাপদশঙ্কুল স্থানে বর্শা এবং ভোজালী মাত্র সম্বল করিয়া বিচরণ করা তো কম সাহসের কথা নয়। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগ না হইলে হয়ত পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বর প্রার্থনাই করিয়া বসিতাম। কিন্তু যে অবস্থার ফেরে পড়িয়াছি তাহাতে অতদূর না গেলেও বিস্ময় কাটিল না। তাইতো, বীরাঙ্গনা যে আমারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে! ও বাবা, এ যে আবার ভোজালীও তুলিল! না—যাক, বাঁচা গেল। বীরাঙ্গনা ভোজালীসহ হাত তুলিয়া আমাকে সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর যে একা এখানে?"

আশ্বস্ত হইলাম, বনদেবী নয়, মানবী—পাহাড়ী রমণী। কিন্তু আমাকে চিনিল কি করিয়া? এই প্রশ্ন অপেক্ষা বড় প্রশ্ন বাগানে যাইবার পথ চেনা! স্ত্রীলোকটির প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "হরিণের পেছনে তাড়া করতে যেয়ে সঙ্গীদের হারিয়ে ফেলেছি। বাগান কোন দিকে বলতে পার?"

"আসুন হুজুর, আমার সঙ্গে, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" এই বলিয়া মেয়েটি কতকগুলি 'জড়ি'—শিকড় ও ছাল পিঠে বাঁধিয়া লইল।

আমি আগে আগে চলিলাম। পিছন হইতে মেয়েটি পথ নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। কথায় কথায় বুঝিলাম মেয়েটি ঔষধের জন্য 'জড়ি' সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল। আমার পতনের শব্দ শুনিয়া ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

খানিকদূর অগ্রসর হইয়া নিকটেই অনেক লোকের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম। একটু পরেই তাহারা আমাদের কাছে আসিয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে একজন আগাইয়া আসিয়া আমাকে সেলাম করিয়া বলিল, "আপনাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলাম হুজুর।"

লোকটি আমার একেবারে অচেনা নয়—চা-বাগানেরই দফাদার। কিন্তু আমাকে খুঁজিতে যাইতেছে, ব্যাপার কি? আমি সত্যই হারাইয়া গিয়াছি নাকি? আর এ রকম সংবাদ রটাইল বা কে? যাহা হউক আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বড় সাহেব আর বাবু কোথায়?"

"তাঁরা আপনাকেই খুঁজছেন হুজুর।"

তাই তো, ব্যাপার মন্দ নয়। বলিলাম, "যাও তাঁদেরে বলো গে আমি এখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছি।"

ওরা চলিয়া গেল। আমি একটা পাথরের উপর বসিলাম। সেই পাহাড়ী বীর রমণী দাঁড়াইয়া রহিল। আধঘণ্টা খানেক পরে বড় সাহেব ও বিভূতি হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া উপস্থিত, জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। সাহেব শুনিয়া সেই পাহাড়ী মেয়েটিকে দুই টাকা বকশিস দিলেন। মেয়েটি সেলাম করিয়া আগাইয়া আসিল এবং দুই হাত পাতিয়া টাকা লইয়া পিছু হটিয়া গিয়া যথাস্থানে দাঁড়াইল।

আমরা সদলবলে বাংলোয় ফিরিয়া দেখিলাম জল-যোগের আয়োজন প্রস্তুত। ক্ষুধাও লাগিয়াছিল বেশ। জলযোগের সদ্ব্যবহারে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হইল না। খাইতে খাইতে সাহেব বলিলেন, "এ সব জঙ্গলে হাঁটিয়া শিকার করা বড় কষ্টকর। সামনের শিকারের দিন হাতীর ব্যবস্থা করা যাবে, কি বলেন?

হাতীতে চড়িয়া শিকার! আমি এক বাক্যে সাহেবকে সমর্থন করিলাম।

যে পাহাড়ী মেয়েটি আমাকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল, পরে জানা গেল, তাহার স্বামী আমার বন্ধুরই দেহরক্ষী এবং সে আমার সঙ্গেই আজ ছিল। বন্ধু স্বামী-স্ত্রী দুইজনকেই রাত্রে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া দিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রাবণ-নিশীথে

(গান)

অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, এম-এ

শ্রাবণ গহন মেঘে দিবা হল অবসান,
আজি এ নিবিড় রাতে তোমারে শুনাব গান।
ও দু'টি অধর মাঝে
নীরব মিনতি বাজে
মলিন নয়নে ভাসে ছল ছল অভিমান॥

অসীম তিমির মাঝে জল ঝরে অবিরল।
রজনী গভীর হল, আঁধার ধরণীতল॥
কখন তুলসী ছায়ে
প্রদীপ নিবেছে বায়ে
বিপুল মৌন মাঝে জাগিছে ধরার প্রাণ॥

শিবনাথ বাবুর স্ত্রী

(গল্প)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শিবনাথ মিত্রের মৃত্যুর পর বৎসর পার হইতে না হইতেই ছেলেরা পৃথকান্ন হইল। শিবনাথবাবুর চারি পুত্র এবং এক স্ত্রী, কিন্তু ভাগ হইল মাত্র তিনটি। কারণ, ছোট ছেলে হরি আধ্‌পাগলা গোছের—নিজের ভাল-মন্দ কিছুই সে বোঝে না। তাহাকে ফাঁকি দেওয়া খুবই সহজ হইল। দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশের মায়েরা তখনও পুত্রদের সহিত স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাইবার অধিকারী হন নাই। কাজেই সুনন্দাও স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে কোন অংশই আর পাইল না।

শিবনাথবাবু মহকুমার ফৌজদারী কাছারীতে কাজ করিতেন। গ্রামে পৈতৃক জমিজমাও কিছু ছিল। কিন্তু নগদ টাকা তিনি বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সামান্য যাহা কিছু ছিল ছেলেদের শ্রাদ্ধ হইতেই তাহার প্রায় সবটুকুই খরচ হইয়া গেল। মূল্যবান সম্পত্তির মধ্যে সহরে তিনি একখানা বাড়ী রাখিয়া গিয়াছিলেন—বেশ বড় বাড়ী, অনেকটা যায়গা।

বড় তিন ছেলে বাড়ীখানা তিন অংশে ভাগ করিয়া লইল। মাকে বলিল, "তোমার আবার ভাবনা কি মা! থাকবার জন্যে একখানা ঘর তুলে দিব—রান্নাটা অবশ্যি ঘরের বারান্দাতেই ক'রে নিতে হবে, তাছাড়া আর উপায় নেই। আর হরি—সে তোমাকে সঙ্গেই থাক্‌বে খাবে। তোমাদের দু'জনের খরচই বা এমন কি লাগবে? জিনিষপত্র যা সস্তা, আমরা তিনভাই মাসে তিনটাকা ক'রে দিলে দিব্যি চলে যাবে তোমার আর হরির। আর আমরা তো রয়েইছি—তোমাকে আর হরিকে তো আর ফেলে দিতে পারবো না?"

সুনন্দা এই প্রস্তাবেই রাজী হইলেন, বলিলেন, "যা ভাল বুঝিস কর্ বাবা, আমি আর কি বলব।"

এই প্রস্তাবে রাজী না হইয়াই বা আর কি উপায়ই বা তাহার ছিল।

* * *

বড় তিন ছেলেরই বিবাহ হইয়াছে। বড় এবং মেঝছেলের ছেলেপিলেও হইয়াছে, কেবল সেজোরই কোন সন্তানাদি হয় নাই। বড় ছেলে মহেন্দ্রনাথ ডাক্তারী করে—হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। তাহার চার ছেলে এক মেয়ে। মেঝছেলে নরেন্দ্রনাথ উকীল। তাহার মাত্র দুই মেয়ে। সেজো ছেলে যোগেন্দ্রনাথ। আজ টিউশনি, কাল মাষ্টারী—এই ভাবেই তাহার দিন চলে অর্থাৎ কোন স্থায়ী কাজের সুবিধা সে করিয়া উঠিতে পারে নাই।

মাস ছয়েক বেশ ভাল ভাবেই কাটিল। পরের ছয় মাসও কাটিল একরকম মন্দ নয়। কিন্তু তারপরেই চাকা বিপরীত দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। মহেন্দ্রনাথের আমাশয় হইল। প্রথম প্রথম নিজেই দুই-চারি ফোঁটা ঔষধ খাইল, কিন্তু কিছুই হইল না। বাধ্য হইয়া ডাক্তার ডাকিতেই হইল। কিন্তু রোগের যেন আর হ্রাস-বৃদ্ধি নাই—একভাবেই চলিয়াছে। রোজগার বন্ধ, নিজের সংসারই চলে না, তার উপর চিকিৎসার ব্যয়। বাধ্য হইয়া মাকে মাসিক তিনটাকা করিয়া দেওয়া বন্ধ করিতে হইল। সুনন্দাকে মাঝে মাঝেই সে বলে "টাকার জন্যে তুমি ভেবো না মা, আমি ভাল হয়েই তোমার সব টাকাই দিয়ে দিব। শীগ্‌গির সেরে উঠি—শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর।"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে সুনন্দা বলেন, "টাকার কথা এখন থাক, তুই আগে সেরে ওঠ। তোরই তো ওষুধপথ্য চলছে না, ঋণে ডুবে যাচ্ছিস্—আমাকে আর দিবি কোত্থেকে! তুই সেরে ওঠ, তোরা বেঁচে থাকলে আমার আবার টাকার ভাবনা।"

মায়ের আশীর্ব্বাদ, ডাক্তারের ঔষধ---কিছুতেই কিছু হইল না। দীর্ঘদিন ভুগিয়া এবং স্ত্রী-পুত্রের ঘাড়ে বিপুল ঋণভার চাপাইয়া মহেন্দ্রনাথ একদিন পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। বিধবা বড়বউ এবং তাহার ছেলেমেয়েরা সত্যই অকূল সাগরে পড়িল। ঋণ পরিশোধ না করিলে বাড়িয়াই চলে—জল-ঝড়, হাজাশুকা কিছুই মানে না। কাজেই বাড়ীতে তাহাদের যে অংশ ছিল তাহার বেশীর ভাগই বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে হইল। যেটুকু বাকী রহিল তাহারই উপর একখানা চালা বাঁধিয়া কোন রকমে মাথা গুঁজিবার স্থান করিয়া লইল।

সুনন্দাই আর তাহাদিগকে কি সাহায্য করিবেন—সম্বল তো মাত্র ৬৲ টাকা। নরেন্দ্রনাথেরও ওকালতীর অবস্থা তেমন ভাল নয়। মক্কেল যা-ও বা কিছু আছে, কিন্তু পয়সা নাই। তবু কোন রকমে তাহার দিন চলে। এই কোন রকমে চলাও ক্রমে কঠিন হইয়া উঠিল, নরেন্দ্রনাথকে ধরিল ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায়। বন্ধু-বান্ধবরা পরামর্শ দিল, "চেঞ্জে যাও একটা স্বাস্থ্যকর যায়গা দেখে। জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া পালাবার পথ পাবে না।"

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া নরেন্দ্রনাথ বলে, "যেতে তো বলছ, কিন্তু টাকা কই?"

"টাকা—আরে জীবন আগে না টাকা আগে। বেঁচে না থাকলে বাড়ী-ঘর-দোর দিয়েই বা কি হবে বলতো?"

টাকা সংগ্রহের উপায়টা বন্ধুদের উত্তরের মধ্যেই ইঙ্গিতে বলা হইয়া গিয়াছে। অবশেষে নরেন্দ্রনাথকে এই ইঙ্গিতই গ্রহণ করিতে হইল। বাড়ী বন্ধক দিয়া নরেন্দ্রনাথ সপরিবারে বিন্ধ্যাচল যাত্রা করিল।

বিন্ধ্যাচলে যাইয়া জল-হাওয়ার গুণে নরেন্দ্রনাথ অনেকটা উপকার বোধ করিল। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইয়া দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। তখন শীতকাল। একদিন বেশ অতিরিক্ত রকম ঠাণ্ডা পড়িল। ঠাণ্ডা লাগিয়া মেঝ বউ-এর কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিল---সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না, মিরজাপুর হইতে ডাক্তার আনাইয়াও দেখান হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,---স্বামী-কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া ভাগ্যবতী মেঝবউ মহাপ্রস্থান করিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিন্ধ্যাচল আর নরেন্দ্রনাথের ভাল লাগিল না। মেয়ে দুইটি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সংসার কাণ্ডারীবিহীন—নাওয়া-খাওয়ার অনিয়মে ডিস্‌পেপসিয়া আবার দেখা দিল। সুনন্দা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন মেজ ছেলেকে পুনরায় বিবাহ করাইবার জন্য। নরেন্দ্রনাথ প্রথমে মৃদু আপত্তি তুলিলেন, কিন্তু সংসারে চিরদিন যাহা ঘটিয়া আসিতেছে তাহার ব্যতিক্রম হইল না। একদিন লাল চেলী পরিয়া এবং টোপর মাথায় দিয়া নরেন্দ্রনাথ নববধূ ঘরে লইয়া আসিল।

বধূটি বয়স্থা এবং বেশ সেয়ানা। কিন্তু সংসারে আয় নাই, তার উপর সতীনের দুইটি মেয়ে। কাজেই প্রথম হইতেই বধূর মন উত্যক্ত হইয়া উঠিল—রাতদিন খিটিমিটি, অশান্তি। মাকে আর নিয়মমত টাকা দেওয়া হ না। একমাস দিলে দুইমাস বাকী পড়ে। এই ভাবেই দিন চলে।

নরেন্দ্রনাথের মেয়ে দুইটি বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। উপায় কি? ঋণের বোঝা বৃদ্ধি করিয়া মেয়ে দুইটিকে কোন রকমে পার করিল। এদিকে দ্বিতীয় পক্ষেরও তিন-চারিটি সন্তান হইয়া সংসার বাড়িয়া চলিয়াছে। কুটুম্ব-স্বজনেরও আমদানী কম হয় না,—দ্বিতীয় পক্ষের ভাই, মামা, কাকা, মা, মাসী হামেশাই যাতায়াত করিতেছে। এজন্যও খরচ বড় কম হয় না! কাজেই এক বাড়ীতে থাকিলেও নিজের মায়ের তত্ত্বতালাসী করিবার সময় কোথায়? তাঁহার খাওয়া হইল কি না হইল, পরনের কাপড় আছে কি নাই, কে খবর রাখে?

সুনন্দা নিজের জন্য ভাবেন না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে খায় ছোট ছেলে হরি। তাই উপবাস যেদিন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে সে দিন বাধ্য হইয়া নূতন মেঝ বউ-এর কাছে যাইতেই হয়। কিন্তু নূতন মেজ বউ ঝঙ্কার দিয়া উঠে, "রোজ রোজ বিরক্ত করতে লজ্জা হয় না! খ্যান্‌-খ্যান্ প্যান্‌-প্যান্ লেগেই আছে,—কি জ্বালাতনেই যে পড়েছি?"

দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে করিতে সুনন্দার মেজাজও কিছু রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, তবু শান্ত কণ্ঠেই বলেন "আমার টাকা কয়টা নিয়ম মত দিয়ে দিলেই তো হয়,

তা'হলে তো আর বিরক্ত করতে আসি না। আমি না খেয়ে থাকলে কি তোমাদের ভাল হবে মা ?"

কত কষ্টে যে মায়ের মুখ দিয়ে এইকথা বাহির হইল তাহা সুনন্দা ছাড়া আর কেহ বুঝিবে না। কিন্তু আর যাবে কোথা, মেজ বউ একেবারে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করে, "বড় আস্পর্দ্ধা দেখছি যে। আমার বাড়ীতে এসে আমারই অকল্যাণ গাওয়া! বের হও এখান থেকে এখনি—দূর হও—নইলে অপমান ক'রে বের করে দেব।"

হায় রে, ইহার পরেও আর অপমানের বাকী রহিল কি ? চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সুনন্দা ফিরিয়া আসেন। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—তার উপর একটা হাবা ছেলে গলায় ঝুলিতেছে। পরের কাছেই হাত পাতিতে পারা যায় কয় দিন! কত লোকই তো মরিতেছে—তাঁহার মরণ হয় না কেন? বাসন-পত্র দুই-চারিখানা যাহা ছিল তাহাও শেষ হইয়া আসিয়াছে। সোনা-দানা যাহা ছিল তাহা পূর্ব্বেই পুত্রবধূদিগকে দিয়া দিয়াছেন। হায়রে, এত আশা-ভরসার পুত্র-পরিজন।

এই সময়ে সেজো পুত্রও বেকিয়া বসিল—তাহার আয় কমিয়া গিয়াছে, মাকে মাসোহারার টাকা দেওয়া আর সম্ভব না।

পুত্রদের কথা ভাবিয়া সুনন্দা একদিন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কতই না স্বপ্ন দেখিতেন। আজ তাহাদের বীভৎসরূপ দেখয়া শিহরিয়া উঠিলেন, অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে বাহির হইল,—"হা ভগবান।"

সুনন্দা বৃদ্ধা হইয়াছেন। বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষেও ভাল করিয়া দেখেন না, কানেও কম শোনেন। একদিন রাত্রে উঠিয়া বাহিরে যাইবেন, চৌকাঠে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চেতনাও লুপ্ত হইল। সারাটা রাত্রি ঐ খানেই পড়িয়া রহিলেন। প্রাতঃকালে বড়বউ শাশুড়ীকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মেজ বউ-এর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সেজবউ তো বাপের বাড়ীতেই থাকে।

বড়বউ-এর সেবাশুশ্রূষাতেই সুনন্দা এবারের মত বাঁচিয়া গেলেন—অর্থাৎ তাহার দুঃখের মেয়াদ আরও দীর্ঘ হইল। পাড়ারই দুই-একজন দয়া করিয়া একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তারটি নূতন—সবে মাত্র মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন। ডাক্তারসুলভ স্বভাব তখনো তিনি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ছাত্র-সুলভ দয়াদাক্ষিণ্য লইয়াই তিনি সুনন্দার চিকিৎসা করিলেন, শেষ পর্য্যন্ত ঔষধের দাম পর্য্যন্ত নিলেন না।

সময় বুঝিয়া নরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে তাহার যে অংশ ছিল অর্দ্ধেকটা বেশ চড়া দামেই বিক্রয় করিয়া ফেলিল। ঋণ শোধ করিয়াও তাহার হাতে কিছু রহিয়া গেল। সেই টাকা দিয়া কিছু ধানের জমি কিনিল।

বাড়ীর যে অংশ নরেন্দ্রনাথ বিক্রী করিল তাহারই উপরই সুনন্দার থাকিবার ঘরখানা। হঠাৎ একদিন ঘর ছাড়িয়া দিবার নোটিশ পাইয়া সুনন্দা তো অবাক। প্রথমে তাহার বিশ্বাস হইল না। মেজ ছেলেকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যারে নরেন, এই যে ঘর ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দিয়ে গেল আমাকে—ব্যাপারটা কি বলতো।"

"ব্যাপার আবার কি ? আমার সম্পত্তি আমি বিক্রী করেছি।"

"কিন্তু আমি দাঁড়াই কোথা বল তো ?"

"বিক্রী যখন করেছি, ছেড়ে দিতে তোমাকে হবেই। যায়গা তো রয়েছে আরও, একখানা ঘরে তুলে থাকবে।"

পুত্রের উত্তর শুনিয়া সুনন্দা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তোরা বেঁচে থাকতেই আমার এই দুর্দ্দশা করলি। ঈশ্বর কি এত অবিচার সহ্য করবেন ?"

নরেন্দ্রনাথ একটা কটূক্তি করিয়া উঠিল—, "বিষ নাই সাপের কুলোপানা চক্কর—ঢোড়া সাপের কামড়ে কিছু হয় না।"

মেজ বউ এই সময় সেখানে যাইয়া বলিল, "যে বেহায়া তোমার মা—অমনি যাবে ভেবেছ—"

সুনন্দার দুই চক্ষু বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একবার মাত্র উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিলেন।

এই ঘটনার পর খুব বেশী দিন কাটিল না। মাত্র তিন দিনের জ্বরেই নরেন্দ্রনাথ ইহলোকের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল।

পুত্র যতই খারাপ হউক, যত অন্যায়ই করুক, সুনন্দা মা। হায় রে মায়ের প্রাণ—মায়ার বন্ধন। সুনন্দা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বাছাকে তো আমি শাপ দেই নাই। তুমি তো সবই জানো ভগবান, তবে কেন এমন হলো।"

মেজবউ এর শোকে অল্পেই ভাঁটা পড়িল। বাসাটা ভাড়া দিয়া, জমি বন্দোবস্ত করিয়া এবং টাকাপয়সা যাহা আদায় হইল লইয়া সে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

সুনন্দাকে ঘর ছাড়িয়া দিতে হইল। সেজ ছেলের অংশে একখানা ছোট চালা তুলিয়া দিন গুণিতে লাগিলেন।

*　　*　　*　　*

বৈকালে ডাক্তার বাবু ডাক্তারখানায় বসিয়া রোগী দেখিতেছিলেন, এমন সময় একটি রুগ্না বৃদ্ধা অতিকষ্টে দেহভার বহন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই বৃদ্ধা ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, বলিল, "আমার একটা গতি করতেই হবে ডাক্তারবাবু—আর যে পারি না।"

ডাক্তারবাবু প্রথমে বৃদ্ধাকে চিনিতে পারেন নাই অথচ চিনি-চিনি বলিয়া মনে হয়। হঠাৎ মনে পড়িল, এঁরই চিকিৎসা তিনি কয়েকমাস পূর্ব্বে করিয়াছেন—শিবনাথ বাবুর স্ত্রী।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন, "ওখানে মাটিতে বসে কেন মা, চেয়ারটাতে বসুন। তারপর ধীরে-সুস্থে বলুন কি অসুখ আপনার।"

সুনন্দার তখন উঠিবার ক্ষমতা নাই। ডাক্তার বাবুই তাঁহাকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিলেন।

সুনন্দা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আর বাবা অসুখ! মরে গেলেই বাঁচি এখন। আমি হয়েছি যমের অরুচি। হা ভগবান, সত্যই কি তুমি আছ—কি কঠিন বিধাতা তুমি!"

কি যে হইয়াছে ডাক্তার বাবু তাহা বুঝিতে পারেন না, সান্ত্বনার সুরে বলেন, "কার অসুখ সব কথা খুলে বলুন মা, ভাবনা আপনার নাই একটুকও, আমি করব ব্যবস্থা।"

"করবে বাবা, ব্যবস্থা করবে? আমি তাহলে বাঁচি—এমন ওষুধ দিও যে, আমি যেন চিরকালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ি—আর যেন ঘুম আমার না ভাঙ্গে। একবার বহু চেষ্টা করে বাঁচিয়ে ছিলে, আবার আমাকে বাঁচাও। আর পারি না।

দুঃখে, দুর্ব্বলতায় সুনন্দার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

কি করিতে পারেন ডাক্তার বাবু—কি ক্ষমতা আছে তাঁহার। সুনন্দার এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কে, ভগবান না সমাজ? ডাক্তার বাবুর মনে শত প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, কিন্তু সমাধান খুঁজিয়া পান না। তাঁহার দুই চোখ দিয়া দর-দর ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।

ডাক্তারখানার সম্মুখের রাস্তা দিয়া তখন দলে দলে লোক চলিয়াছে—বালক, যুবক, বৃদ্ধ। অলকা রঙ্গমঞ্চে প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর আজ প্রাচ্য নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন।

য়ুসুফ ও জুলেখা

(কাব্য-পরিচয়)

শ্রীনীরদকুমার রায়

৪

ওদিকে পথিকদলমধ্যস্থ মালেকের সঙ্গে তাহার পণ্য-দাসরূপে তরুণ সুন্দর যোসেফ যখন মিশরে উপনীত হইল, তখন তাহাকে দেখিয়া মিশরবাসীদের মধ্যে কথা উঠিল যে, মালেক একটি হিব্রু দাসকে লইয়া আসিয়াছে, সে দাস তো নয়, একটি রত্ন! ভাস্বর সূর্য্যের মত তার রূপ—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—চিত্রিত ছবির মত—সযত্ন-ক্ষোদিত মূর্ত্তির মত অনবদ্য তার দেহ-সৌষ্ঠব; রাজসিংহাসনেই তাহাকে মানায়।

মিশরের রাজার কানে এই গুজব পৌছিলে, তিনি উজীরকে বলিলেন, "যাও তো এই পথিকদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই চাঁদটিকে দেখে এসো তো; আর রাজ-পুরীতে তাকে শীঘ্র নিয়ে এস। মিশর ছাড়া এমন সৌন্দর্য্য আর কোথাও হয় নাকি?" উজীর গিয়া যোসেফকে দেখিয়াই আবিষ্ট চিত্তে তাহার সম্মুখে নত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যোসেফ তাঁহাকে উঠাইয়া বলিল, "শুধু তাঁর কাছেই আপনার মাথা নত করবেন যিনি আপনার ওই মাথার উপর চিরদিন আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেছেন।" উজীর তাহাকে রাজার আদেশ জানাইলে সে নির্ভয়ে যাইতে সম্মত হইল; তবে দিন দুই-তিন সে বিশ্রাম চায়, তার পর যাইবে। উজীর ফিরিয়া গিয়া রাজার কাছে সংক্ষেপে যোসেফের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, রাজধানীর দাসের হাটে দুই-তিন দিন পরে তাহাকে আনা হইবে বিক্রয়ের জন্য। শুনিয়া রাজা বলিলেন "আমার রাজ্যের সুন্দরী-শ্রেষ্ঠাদের সুসজ্জিতা করে তার সামনে একবার দাঁড় করাও তো, দেখি তার রূপ কোথায় থাকে!"

যোসেফ নীলনদীতে স্নান করিয়া পরিচ্ছন্ন হইয়া নির্দ্দিষ্ট একটা উচ্চ আসনে গিয়া বসিল। তাহাকে দেখিয়া যত সুন্দর-সুন্দরীরা লজ্জায় ম্লান ও অধোবদন হইল।

এদিকে প্রণয়পীড়িতা জুলেখা তার হৃদয়জ্বালা জুড়াইবার আশায় পালকী করিয়া কখনো বহিঃ-প্রান্তরে, কখনো ঘরের মধ্যে নিরালায় বার বার আসা যাওয়া করিত।

সে দিন সে অভ্যাসমত পালকী চড়িয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। ফিরিবার মুখে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে খোলা জায়গাটায় অত্যন্ত ভিড় দেখিয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এত ভিড় ও গোলমাল কিসের? একজন বলিল, কানানের শুভনামধারী এক যুবক এসেছে, সে নাকি এক-জন দাস। তবে সত্যি কথা এই যে, দাস কখনই সে নয়, সূর্য্যির মত ঝল্‌মলে তার গায়ের রং, রাজপুত্তুরের মত চেহারা, সিংহাসনে বস্‌বার মত। জুলেখা কৌতূহলাবিষ্ট হইল। পালকীর চিক্ ঈষৎ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—ঐ উচ্চ আসনে বসিয়া কে?—এ কি?—সেই তো! সেই স্বপ্নে দেখা! একবার নয়, দুই বার নয়, তিন বার সে দেখিয়াছে, ও-মুখ তো ভুলিবার নয়! অজ্ঞাতে, অনবধানে সহসা তার মুখ হইতে একটা চীৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আত্ম-সংবরণ করিয়া, সে তাহার ধাত্রীকে কথাটা জানাইল এবং নিজ অদৃষ্টের অভাবনীয় বৈচিত্র্যের বিষয় ব্যক্ত করিয়া খেদ করিতে লাগিল। ধাত্রী সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, তোমার আশা সফল হইয়া যাইবে, যেমন করিয়া হোক্।'

ইহার পর দাস-বিক্রয়ের স্থানে যোসেফকে আনা হইল, জুলেখা খবর পাইয়া উপযুক্ত যানে দাস-দাসী সঙ্গে লইয়া সেখানে গেল এবং যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য ডাকিয়াছিল, তাহার ঘোষিত অর্থের দ্বিগুণ মূল্যে

যোসেফকে কিনিয়া, উজীর ও রাজার অনুমতি লইয়া তাহাকে নিজ বাসস্থানে লইয়া গেল। এত দিনের এত কষ্ট, অদর্শনের এত যাতনা হইতে জুলেখা যেন শান্তি পাইল এবং আনন্দের অশ্রু-মুক্তা বর্ষণ করিতে লাগিল। ভাবিল, হে দেবতা, আমি কি জাগিয়া আছি, না স্বপ্ন দেখিতেছি! আমার প্রাণের এক মাত্র যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা কি আজ মিটিতে চলিল? আমার জীবনের কালরাত্রির পর শুভ্র উজ্জ্বল দিন যে আসিবে তাহা ভাবি নাই;—

দুঃখময় এ জগতে কেবা আছে আমা সম দুখী?
দুঃখ দুর্দ্দশার পর কেবা হয় আমা সম সুখী?

জলবিহীন মীনের মত বালুকাশয্যায় আমার প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হইয়াছিল, কৃপার মেঘ হইতে তখন এমন একটা প্লাবন নামিয়া আসিল যাহা আমাকে মৃত্যুর মরুস্থল হইতে নিরাপদ প্রাণের নদীতে আনিয়া দিল। রাত্রির অন্ধকারে দিশেহারা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখন আমি মৃত্যুগহ্বরের মুখে আসিয়া পড়িলাম, দিগন্ত হইতে তখন এক তমোহর চন্দ্র উদিত হইয়া আমায় সৌভাগ্যের পথ দেখাইয়া দিল। আমার মুমূর্ষু অবস্থায় যেন কোন এক খিজির অকস্মাৎ আসিয়া তাঁহার সঞ্জীবন-বারি আমার উপর নিষেক করিয়া দিলেন। ভাগ্য এখন আমার বন্ধু হইয়াছে এবং অদৃষ্ট আর বোধ হয় আমায় সঙ্কটে ফেলিবে না। আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে এই সকল সূক্ষ্ম চিন্তার জাল সে বুনিতে লাগিল।

৫

এই সময়ে 'আদিস্'-বংশীয়া বাজিঘা নামে এক তরুণী যোসেফের রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া, তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। বাজিঘা একদিন তাহার গৃহ হইতে সহরে আসিল, এবং সঙ্গীতাকৃষ্টা হরিণীর মত যোসেফের আবাসে যাইয়া উপস্থিত হইল। বাজিঘা জীবনে কখনো এমন সুন্দর পুরুষ দেখে নাই: আত্মহারা হইয়া সে বলিয়া উঠিল, হে সুন্দর! এত সুন্দর তোমায় কে করেছে?

যোসেফ যখন সেই অপরিচিতা সুন্দরী তরুণীর এই স্তুতিসূচক প্রশ্ন শুনিল, তখন তাহার প্রাণের উৎসমুখ হইতে আত্মশক্তি-সঞ্চারী এই প্রশান্ত বাক্য নিসৃত হইল—

"আমি সেই মহান শিল্পীর হাতে গড়া; মোর প্রাণ
তাঁরি কৃপাসিন্ধু হতে একবিন্দু পেয়ে পূর্ণকাম।
তাঁরি পূর্ণতার এক কণারূপে ত্রিদিব শোভিত,
তাঁরি সৌন্দর্য্যের পুষ্প-কলি রূপে ধরা মুদিত;

*　　*　　*　　*

তাঁহারি ইচ্ছায় যত বিশ্বপরমাণু ধরিয়াছে মুকুরের রূপ;
প্রতি মুকুরের বুকে রেখেছেন বিম্বিত করিয়া নিজ
প্রতিরূপ।

ভাল যাহা কিছু দেখ নিজ চোখে,—দেখ' ভাল ক'রে,—
তাঁরি নিজ প্রতিবিম্ব সর্ব্বত্র পাইবে দেখিবারে।

*　　*　　*　　*

রূপ-লুব্ধ মন সদা বাসনার বাণে বিদ্ধ হয়;
বাসনার বস্তু যত, ক্ষণে আছে ক্ষণে হয় লয়।"

এইরূপে যোসফ যখন বাজিঘার সম্মুখে নিজ সত্তাকে ঈশ্বরের মুকুররূপে তুলিয়া ধরিল, তখন এই মনস্বিনী সেই মুকুরে সত্যের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দেখিয়া কৃত্রিম শূন্যগর্ভ পার্থিব বস্তু হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিয়া সত্য-বস্তুটিকে গ্রহণ করিল; এবং কৃতজ্ঞচিত্তে যোসেফকে বলিল, "আপনার কথায় আমার চোখের সাম্‌নে সত্যের পথ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। এখন সমস্ত অসত্য অবিশুদ্ধ বস্তুর কামনা থেকে সরে যাওয়াই ভাল। আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, সেই পরমাত্মার কাছে আমায় এনে দিয়েছেন; ঈশ্বর আপনাকে এর পুরস্কার দিবেন।" এই বলিয়া বিদায় লইয়া সে চলিয়া গেল। বাসনা-মুক্ত হইয়া সে আর সেই রূপ-অভিযানের মোহময় পথে থাকিবে কেন? সংসার, ঐশ্বর্য্য ও অধীনতার পাশ ছিন্ন করিয়া সে সকল দুঃখী-দুস্থের দিকে তাহার স্নেহ-হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল। এইরূপে তাহার সমস্ত ধনসম্পদ নিঃশেষিত হইল। সুখ-সমৃদ্ধির দিনের পর যখন রাত্রি আসিল, তখন তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার মত সংস্থানও রহিল না। ত্যাগ-পূত এই সেবার দ্বারা যখন তাহার জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করিল, তখন সে বীরের মত মৃত্যুর সম্মুখেও আনন্দ করিতে লাগিল। কবি

বলিতেছেন, হে মানব-হৃদয়! এই মহীয়সীর নিকট হইতে জীবনজয়ীর বীরত্বটুকু শিখিয়া লও!—

বৃথা আড়ম্বর পূজা করি তুমি যাপিলে জীবন
অস্থায়ী বস্তুর ধ্যানে মগ্ন সদা ছিল তব মন।
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে বাহ্য-সৌন্দর্য্যের হইতেছে ক্ষয়
আবর্ত্তিত বস্তু সবি দিনে দিনে রূপান্তর হয়।
হেথা সেথা শাখে শাখে ঘুরে ফিরে পাবেনা আরাম,—
বিশ্ব অতিক্রম করি' চিরতরে লভিও বিশ্রাম!
রূপ আছে লক্ষ লক্ষ এ জগতে,—কিন্তু আত্মা এক;
বাহ্য-রূপে লগ্ন যে-ই তার প্রতি চেতনা বারেক।
বহুরে পূজিতে গেলে আছে সদা অনর্থের ভয়,—
'একে'র দুর্ভেদ্য দুর্গেতে লও সতত আশ্রয়।

৬

ভাগ্য যখন জুলেখার জালে পড়িল,—অপ্রত্যাশিতভাবে সে যখন তাহার বাঞ্ছিতকে কাছে পাইল, তখন সে নানা-ভাবে যোসেফের সেবা-যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যোসেফও নিজের ভ্রমণ-কাহিনী তাহাকে শুনাইল। যখন ভাইয়ের নিষ্ঠুরতায় কূপের মধ্যে পতিত হইবার কথা সে বলিল, তখন জুলেখার মন বলিল যে, এই কারণেই ঠিক সেই সময়ে সে অত্যন্ত দুর্দ্দশা ও হতাশার মধ্যে প'ড়িয়াছিল। জুলেখার সেই সকল কষ্টের কথা শুনিয়া যোসেফ ব্যথিত হইল; এবং গভীর সহানুভূতি ও স্বভাবগত সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত বলিল,—

বিধাতার কঠোরতা স্পর্শ নাহি করুক তোমায়।
অদৃষ্টের কশাঘাত হ'তে মুক্ত রহ এ ধরায়!
আজি তব কি দশা হইতে পারে বলা নাহি যায়;—
দুঃখের সাগরে মগ্ন আত্মা তব হেন মনে লয়।
তুমি সেই শুষ্ক পত্র,—বাতাসের প্রতি সঞ্চরণে
উলটি পালটি পড়ে, কোথা থামে কেহ নাহি জানে।

জুলেখা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া উত্তর দিল—

'হতবুদ্ধি আজি আমি; বড় দুঃখময় মোর প্রাণ,
কিন্তু, কোথা উৎস যে তাহার, কিছু নাহিক সন্ধান।'

এই রূপে দুইজনের পরিচয় নিকটতর হইতে লাগিল।

যোসেফ একদিন জুলেখাকে বলিল যে তাহাকে মেষ পালকের কাজ দেওয়া হোক;—এই কাজটি তাহার ভাল লাগে, কেননা মহাপুরুষ ও পয়গাম্বরেরা প্রায় সকলেই মেষ চড়াইতেন। তাহার ইচ্ছা পূরণ করা হইল।......যোসেফ যখন মেষ চরাইতে যায়, তখন জুলেখার সমস্ত হৃদয়, মন, চিন্তা, উদ্বেগ রক্ষী-কুকুরের মত যোসেফের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। যোসেফের জন্য অন্যান্য রক্ষকও অবশ্য নিযুক্ত আছে; পাছে তাহার কোনও অনিষ্ট ঘটে এই ভয়ে জুলেখা আরও লোকজন তাহার সঙ্গে দেয়। জুলেখা যোসেফকে হৃদয়ের রাজা এবং মেষপালক—এই উভয় পদই স্বেচ্ছায় দান করিল।

জুলেখা যতদিন যোসেফকে দেখে নাই, ততদিন সে স্বপ্নে বা কল্পনায় মিলনের আনন্দে মগ্ন থাকিত, যদিও তাহাকে দেখিবার ও পাইবার অভিলাষ প্রবল ছিল। এখন কাছে পাইয়া সে আশা-আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত হইতে লাগিল, এবং অধীর হইয়া উঠিল।

চোখ যখন কোনও উদ্যানের দিকে চাহিয়া দেখে, তখন কুঞ্জলতা-ফুলের মতই সে গোলাপের অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে। প্রথমে গোপালের শোভাদর্শনেই চক্ষু সন্তুষ্ট থাকে; দর্শনের পর ক্রমে চয়নের আকাঙ্ক্ষায় হস্ত প্রসারিত হয়। কিন্তু যোসেফ তাহাকে কিছুতেই ধরা দিল না। তাহার মন জুলেখার চিন্তার দাগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। কিন্তু জুলেখা তাহার হৃদয় হইতে যোসেফের চিন্তাকে দূর করিতে পারিল না। যাতনা-দীর্ণ হৃদয়ের কি সুন্দর ছবি কবি আঁকিয়াছেন—

গোলাপ হারাতে পারে সুষমা তাহার,
মৃগনাভি হারায় সৌরভ;—
প্রেমিক কখনো ত্যজে প্রেম দুর্নিবার—
এই চিন্তা তবু অসম্ভব!

জুলেখা তাহার ধাত্রীকে যোসেফের নিকট প্রেরণ করিল। যোসেফ বলিল, এই প্রতারণার জাল দিয়ে আমায় আর বেষ্টন কোরো না। যিনি আমায় স্বর্ণ দিয়ে ক্রয় করেছেন, আমি তাঁর কৃতদাস, তাঁর সেবাকার্য্যে আমি প্রাণমন লগ্ন করে রাখব; তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার কখনো শেষ হবে না। লালসার কুমন্ত্রণায় কর্ণপাত করা

পাপ,—আমার দ্বারা তা হবেনা। সেই পরম পবিত্র ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে কোন-না-কোন বিশেষ অভ্যাস বা প্রবণতার বীজ রোপণ করে রেখেছেন। যার প্রকৃতিতে পবিত্রতার বৈশিষ্ট্য আছে, সে সকল সময়েই যা' ভাল তাই করে। যাও, রাজকন্যা জুলেখাকে তাঁর এ অভিলাষ সংহরণ করে নিতে বলো; তিনি যেন তাঁর নিজের ও আমার আত্মা,—উভয়কেই রেহাই দেন; কেননা, সেই পবিত্র ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থেকে আমি সকল লালসাময় প্রবৃত্তি হ'তে মুক্ত অকলঙ্ক থাক্‌বার আশা পোষণ করি,।"

কিন্তু কামনা এত সহজে দমিবার নয়। ইহার পর জুলেখা একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান সজ্জিত করিয়া, একদিন সন্ধ্যার পর যোসেফকে সেখানে বসাইয়া রাখিল, এবং সেই মনোরম কুঞ্জকাননে তাহার মন ভুলাইবার জন্য সুসজ্জিতা সুন্দরী দাসীদিগকে সেখানে পাঠাইয়া দিল। নিশীথিনী যখন—

নবোঢ়া বধূর মত প্রমোদ-লীলায় মগ্ন হয়ে,
গোলাপ-পল্লব বর্ষী অন্ধকার কুন্তল ছড়ায়ে,
কৃত্তিকার পুষ্পগুচ্ছ কর্ণ-চূড়ে করিয়া ধারণ
হাতে নিল লীলা-ভঙ্গে চন্দ্রমার উজ্জ্বল দর্পণ,

তখন নানা ভাব-ভঙ্গী সহকারে কুমারীগণ যোসেফের আসন ঘিরিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া যোসেফের মনে একমাত্র সঙ্কল্প উদিত হইল যে, তাহাদিগকে সত্যের সেবা-কার্য্যে চালিত করিতে হইবে। সকল সন্দেহ-ভঞ্জনকারী দিব্য সত্য এবং সকলের প্রাণ-স্বরূপ সেই ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠার অমৃতময় বাণী শান্ত-মধুর কণ্ঠে সে উচ্চারণ করিল। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল, "এত সুন্দর তোমরা,—তোমরা তো সকলের সম্মানার্হ—সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী—তোমরা কেন এই হেয় পথ বরণ করিবে?

পূজাযোগ্যা হয়ে কেন হেয় পথ করিবে বরণ?
সতত নির্ভয় চিতে লও সবে সত্যের শরণ।
জগতের পারে আছে একমাত্র মোদের ঈশ্বর,—
পথভ্রান্ত কতজনে পথ দেখাইল নিরন্তর;
মোদের মৃত্তিকা সাথে নিজ কৃপাকণা মিশাইল,
আত্মজ্ঞান হতে তাহে তেজগর্ভ বীজ রোপি দিল;
সেই বীজ হাতে উঠে নব নব অঙ্কুর সবল,
বৃক্ষরূপে এ উদ্যানে লাভ করে পূর্ণতা অমল।
মৃত্তিকার মূল হ'তে ঊর্দ্ধে করি নিজে আকর্ষণ
'ঈশ্বর-পূজা'র ফল সেই তরু করে উৎপাদন।
তাই, ঈশ্বরের পূজাতেই হস্তচয় উঠুক সবার;—
জানিবে,—তিনিই শুধু পরাৎপর যোগ্য প্রশংসার।

যোসেফের কথাগুলি সকলের মনে প্রভাব বিস্তার করিল। সকলে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার প্রশংসা করিতে করিতে তাহার পায়ের কাছে বসিয়া উপদেশ লইতে লাগিল।

প্রত্যুষে জুলেখা আসিয়া দেখে, এই কাণ্ড—

সকলের জিহ্বা হ'তে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' রব,
সবে কটি-বদ্ধ যেন সেবা-প্রেরণায় অভিনব!
যোসেফের মুখের ভাব দেখিয়া সে অবাক!—
এক ফল হ'তে যথা অপর ফলেতে রং ধরে,
সুন্দরী-সংস্পর্শে নব সৌন্দর্য্য পাইল সুন্দরে!

কিন্তু কামনাভিভূতা জুলেখার হৃদয় ইহাতে নিরাশায় ভরিয়া গেল। ঘরে ফিরিয়া সে যোসেফের সহিত মিলনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য, ধাত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। খেদের সহিত বলিল—

শুধু তার বিমোহন রূপ
মোর দুর্ভাগ্যের হেতু নয়;
তার চোখে অপদার্থ আমি,—
এই চিন্তা দহিছে হৃদয়।

তখন ধাত্রী নূতন একটা মহল নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে যোসেফ ও জুলেখার কল্পিত মিলনের নানাভঙ্গীর চিত্রসকল সর্ব্বত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত করাইয়া রাখিল। সেই মহলের মধ্যে যোসেফকে আনাইয়া, তাহাকে সুকোমল মহার্ঘ সুখাসনে আসীন করাইয়া, জুলেখা তাহার মিলন ভিক্ষা করিল। যোসেফ চারিদিকের চিত্রগুলির প্রতি একবার চোখ বুলাইয়াই সেই যে মুখ নত করিল, জুলেখার শত কাকুতিমিনতি ও ছলা-কলাতেও সে ভুলিল না, চোখও তুলিল না। নতমুখে ব্যথার সুরে সে বলিল, "কত রাজ-রাজড়া আপনার দাস; আমায় এই

দুঃখের নিগড় থেকে মুক্ত করে দিন। এমন করে আপনার সঙ্গে থাকতে আমার মনের তুষ্টি কিছুমাত্র নেই ;—

"তুমি অগ্নিশিখা সমা, আমি মাত্র শুষ্ক তুলা সম,
অগ্নির সহিত তুলা কতক্ষণ যুঝিতে সক্ষম ?

"যাহা ঈশ্বরের সম্মত নয় তাহা আমি করিতে পারি না ; তিনি সমস্তই দেখিতে পান—দু'টি জিনিষ এই বাসনার পথে বাধা দিচ্ছে ; ঈশ্বরের অসন্তোষ ও তিরস্কার, এবং উজীরের ক্রোধ।"

কিন্তু জুলেখা আজ কোনও কথাই কানে তোলে না ; নানাভাবে সে যোসেফকে বিব্রত করিয়া তুলিল। কিছুতেই জুলেখার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া অবশেষে পলায়নই একমাত্র উপায় স্থির করিয়া সে দৌড়িয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিতেই দৈবক্রমে সে পড়িয়া গেল উজীরের সম্মুখে। জুলেখাও যোসেফের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়াছিল ; উজীরকে সম্মুখে দেখিয়া সে মরিয়া হইয়া উঠিল ; উন্মত্তভাবে সে যোসোফের অনুরাগের কথা ব্যক্ত করিল। এবং লালসা-দুষ্ট-প্রেমের পরিণাম সচরাচর যাহা হয়, এস্থলেও তাহাই হইল,—সে ক্রোধের বসে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া যোসেফকেই দোষী বলিয়া অভিযোগ করিল। ফলে যোসেফ কারাগারে বন্দী হইয়া রহিল, এবং জুলেখা তীব্র যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। কবি বলিতেছেন—

হীনপ্রাণা নারী যবে মিথ্যার প্রদীপ দেয় জ্বেলে ;
উজ্জ্বল রাখিতে তারে—তৈল নয়—অশ্রু দেয় ঢেলে ;
সে প্রদীপে নারীগণ অশ্রু-তৈল ঢালিতে থাকিলে
সমগ্র পৃথিবী দগ্ধ হয়ে যেতে পারে ক্ষণকালে।

অতঃপর যোসেফের অপরাধের বিচার হইল। ঈশ্বরের কৃপায় একটি শিশুর সাক্ষীতে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইল, এবং সে মুক্ত হইল। কিন্তু মিশরের রাজধানীর সুন্দরীগণ রাজার পূর্ব্ব ঈঙ্গিত স্মরণে সাহস পাইয়া আবার তাহার পিছনে লাগিল। বহু কঠোর পরীক্ষায় পড়িয়া যোসেফ ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। সুন্দরীদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও যোসেফের অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির জয় হইল, সে নিজ পবিত্র ভাবগুলি আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিল।

তখন, বাদুরেরা যেমন সূর্য্যোদয়ে উজ্জ্বল আলোক হইতে পলাইয়া অন্ধকার কোণ আশ্রয় করে, সুন্দরীরাও তেমনি যোসেফের পূত-চরিত্রের অমল জ্যোতির নিকটতর পরিচয় পাইয়া হতাশ হইয়া রণে ভঙ্গ দিল।

কিন্তু তাহারা এই হতাশা লইয়া সোজাসুজি ঘরে ফিরিতে পারিল না। তাহারা জুলেখার কাছে গেল, এবং চাতুরী খেলিয়া, তাহার চক্ষে ধূলা দিয়া বলিল, 'হায়, অত্যাচারিতা হতভাগিনী! তোমার মত এমন সুন্দরী শ্রেষ্ঠা রাজকন্যা কি এইরূপে প্রত্যাখ্যাতা হইবার যোগ্যা ? আমরা তো আমাদের জিহ্বা ক্ষুরধার করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই কঠোরমতি পুরুষের লৌহকঠিন প্রাণে তাহা কিছুতেই বিঁধিল না। জেল্-ই তাহার উপযুক্ত স্থান ; তাহাকে আবার জেলে পুরিয়া দাও, এবং অগ্নিকুণ্ডের মত তাহা অসহ্য করিয়া তোলো ; প্রচণ্ড উত্তাপে ঐ লৌহ ক্রমশঃ নরম হইয়া যাইবে।"

তাহাদের এই কথা জুলেখার মনে ধরিল। স্বার্থময় বাসনা নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, নিজের সুখের জন্য, দস্যুর মত যে-গৃহ সে বিধ্বস্ত করিয়াছে তাহার মধ্যস্থ ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবার জন্য, প্রেমাস্পদকে দুঃখ দিতে প্রবৃত্ত হইল। পরিপূর্ণ সুপবিত্র প্রেম যাহার লাভ হয় নাই, যে নিজস্ব অভিপ্রায়-সিদ্ধিরই অভিলাষী হয়, সে চাহে তাহার প্রেমের পাত্র সর্ব্বদা তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকুক, এবং নিজে যাহা শ্রেয় বুঝিবে, তাহাকেও সেইমত চলিতে হইবে।

মনে মনে তখন অসৎ সঙ্কল্প পোষণ [illegible] জুলেখা একরাত্রে উজীরের সাথে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল এবং নিজ হৃদয়ের অনুরাগ সম্বন্ধে আরও বিশেষভাবে বুঝাইবার পর অনুরাগের স্বরে বলিল, "মিশরে এসে এই যুবকের জন্যই আমি আমার সুনাম হারালাম, মিশরের লোকদের চক্ষে হেয় হ'য়ে গেলাম !... ...এই যুবককে জেলে পাঠানোই ঠিক হবে ; আর,—তার অপদার্থতার ও নির্লজ্জতার কথা শহরের রাস্তায় রাস্তায় প্রচার করে দেওয়া উচিত। যে-দুষ্টপাপী তার মনিবের সম্পত্তির অংশভোগী হবার স্পর্দ্ধা করে, তাকে এম্‌নি করে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। যখন সকল লোকে আমার ক্রোধের নিদর্শনরূপ তার এই শাস্তি দেখবে, তখন আমার সম্বন্ধে মন্দ চিন্তা তারা ছেড়ে দেবে।" ক্রমশঃ

রবীন্দ্রজীবনী
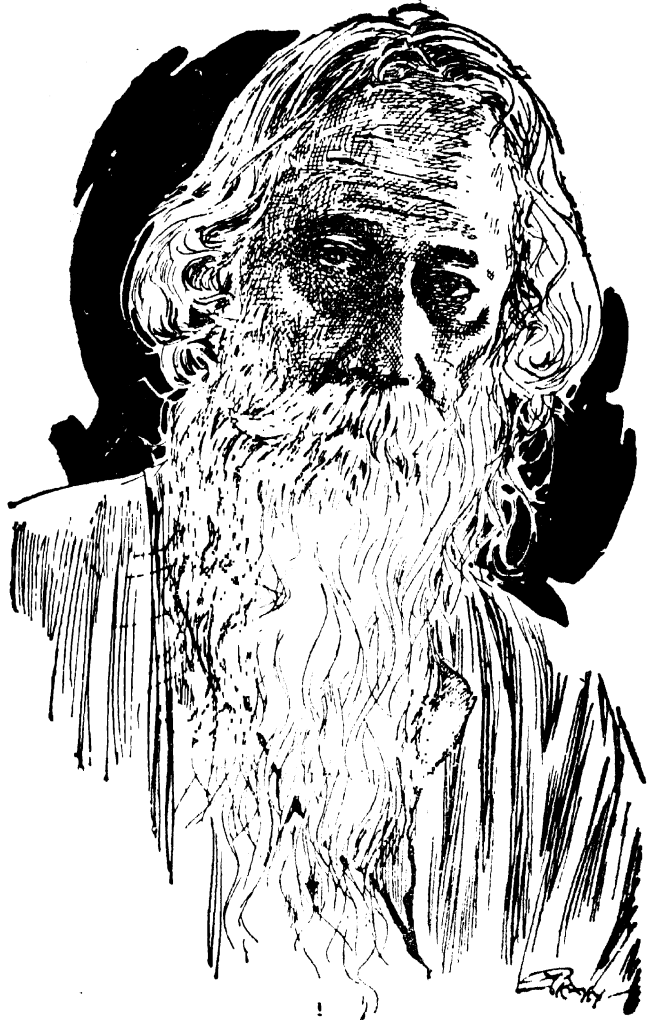
রবীন্দ্রনাথ বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, ইংরেজী ১৮৬১ সালের ৭ই মে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি চতুর্দ্দশ সন্তান। তাঁহার মাতার নাম সারদাদেবী।

রবীন্দ্রনাথকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বাড়ীতে অতি উত্তম ব্যবস্থা ছিল। তিনি কিছুদিন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পড়িয়াছিলেন। অতঃপর কিছুদিন নর্ম্মাল স্কুলে পড়িয়া পরে বেঙ্গল একাডেমী নামক ফিরিঙ্গী স্কুলেও দিন কতক পড়েন। স্কুলে পড়িবার সময়েই তিনি কবি-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বোলপুরে কিছু জমি ক্রয় করিয়া একটি একতল বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান শান্তিনিকেতন এইখানেই প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ১২৭৯ সালের ২৫শে মাঘ রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার হয়। উপনয়নের পর পিতার সহিত তিনি বোলপুরে গমন করেন। রবীন্দ্রনাথ বোলপুর হইতে তাঁহার পিতার সহিত সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, অমৃতসর, ডালহৌসী পাহাড় প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। ডালহৌসী পাহাড়ে থাকিবার সময় তিনি পিতার নিকট সংস্কৃত-ব্যাকরণ, জ্যোতিষতত্ত্ব এবং ইংরেজী পড়িতেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় বেঙ্গল একাডেমীতে ভর্ত্তি হন। কিন্তু এই স্কুল তাঁহার ভাল না লাগায় তাঁহাকে সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া

দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের ১৩ বৎসর ৭ মাস বয়সের সময় তাঁহার কবিতা সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। কবিতাটির নাম 'অভিলাষ'। উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা রচিত হইয়াছিল আরও একবৎসর পূর্ব্বে। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৩ বৎসর ১০ মাস তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

তাঁহার বাল্যকালে জোড়াসাঁকোর বাড়ী ভারতীয় সঙ্গীতের আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। বিখ্যাত ধ্রুপদী বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় জোড়সাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতের আসরে যোগদান করিতেন। তাঁহারই নিকট রাগ-সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের হাতে খড়ি হয়, কিন্তু অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাঁহাকে সঙ্গীত-সৃষ্টির পথ ধরাইয়াছিলেন। পনর বৎসর বয়স হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহায্যে হিন্দি গান ভাঙ্গিয়া তাঁহার সঙ্গীত রচনার সূত্রপাত হয়। প্রসিদ্ধ ধ্রুপদীয়া যদুভট্টের নিকটও তিনি কিছু দিন সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই ধ্রুপদের আবহাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হওয়াতেই বোধ হয় তাঁহার সঙ্গীতের গঠনে ধ্রুপদের প্রভাব লক্ষিত হয়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে তিনি প্রথমে ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্ত্তি হন। পরে তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। বিলাতে বাস করিবার সময় তিনি পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় গ্লাডষ্টোন এবং ব্রাইটের বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভারতী পত্রিকায় ইউরোপ প্রবাসীর পত্র শিরোনামে তাঁহার বিলাত-প্রবাসের বিবরণ প্রকাশিত হয়। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার বাল্মিকি-প্রতিভা রচিত হয়।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু মত পরিবর্ত্তন হওয়ায় পথ হইতেই তিনি ফিরিয়া আসেন এবং মুসৌরিতে পিতার নিকট যান। অতঃপর তিনি চন্দননগরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট অবস্থান করেন। এই সময়েই তাঁহার সন্ধ্যা সঙ্গীত রচনা সুরু হয়। সন্ধ্যা সঙ্গীতের পর প্রকাশিত হয় প্রভাত সঙ্গীত। এই গানগুলি ছোট হইলেও ভাবের প্রাচুর্য্যে ভরপূর। ইহার পর কবির বিবিধ প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়। বিবিধ প্রসঙ্গের পর তিনি 'বৌঠাকুরাণীর হাট' রচনা করেন। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল ভবতারিণী, ঠাকুরবাড়ীতে তাঁহার নাম রাখা হয় মৃণালিনী।

১২৯২ সালে বৈশাখ মাসে ঠাকুরবাড়ী হইতে 'বালক' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন, কিন্তু পত্রিকা পরিচালনার ভার পরে রবীন্দ্রনাথের উপরেই। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' প্রভৃতি শিশুদের জন্য লিখিত প্রসিদ্ধ কবিতা 'বালকে' প্রকাশিত হয়। 'বালক' মাত্র এক বৎসর টিকিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান মাধুরীলতা বা বেলার জন্ম হয় বাংলা ১২৯৩ সালের ৯ই কার্ত্তিক। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলিকাতায়। এই উপলক্ষে "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" এই গানটি তিনি রচনা করেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনিই উহা গাহিয়াছিলেন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার 'মায়ার খেলা' নামক গীতিনাট্য রচিত হয়। ১২৯৫ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ১২৯৬ সালে রাজর্ষি উপন্যাসের আখ্যায়িকা অবলম্বনে নাট্যকাব্য 'বিসর্জ্জন' রচনা করেন। লর্ড ক্রসের বিলের প্রতিবাদে আহূত সভায় রবীন্দ্রনাথ 'মন্ত্রিঅভিষেক' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। ১২৯৭ সালের গোড়ার দিকে তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানে মন না টিকায় অল্প কিছুদিন পরেই দেশে ফিরিয়া আসেন। 'হিতবাদী' পত্রিকা প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন উহাতে নিয়মিত লিখিয়াছিলেন। পরে হিতবাদীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বহু শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সাধনায় 'পঞ্চভূতের ডায়ারী' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই পত্রিকাতেই 'বিদায় অভিশাপ' নাটিকা প্রকাশিত হয়।

'সোনার তরী' কবিতাটি লিখিত হয় ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে। 'সাধনা'র যুগ রবীন্দ্রনাথের তীব্র স্বদেশ-প্রেমের যুগ। 'সাধনা'র চতুর্থ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ উহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৩০৫ সালে তিনি 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক হন। প্রেস বিলের প্রতিবাদ আহূত সভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাধিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন।

১৯০১ সাল কবির জীবনে একটি বিশিষ্ট বৎসর। এই সময়েই শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাই পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হইয়াছে। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' বাহির হয়। ১৯০২ সালে কবির পত্নী বিয়োগ হয়।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে কর্ম্মীরূপে অবতীর্ণ হন। স্থানে স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রাম্য সমিতি গঠন প্রভৃতি কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। বঙ্গচ্ছেদের দিনকে স্মরণীয় করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'রাখি বন্ধন' অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেন।

কলিকাতা হইতে ১৩১২ সালে 'ভাণ্ডার' নামক একখানি পত্রিকা বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথ উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৩১৪ সালের ভাদ্র হইতে তাঁহার 'গোরা' নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাস প্রবাসীতে বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ১৩১৪ সালে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভা-পতিত্ব করেন। প্রাদেশিক সম্মেলনীতে সর্ব্বপ্রথম বাংলায় অভিভাষণ পাঠ করেন তিনিই। ১৩১৭ সালের ভাদ্র মাসে 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। উহার ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন।

১৯১৫ সালে (বাংলা ১৩২২ সাল) তিনি নাইট উপাধি প্রাপ্ত হন। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে তিনি নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯১৮ সালে (বাংলা ৮ই পৌষ, ১৩২৫) বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯২৪ সালে লিয়াং চি-চাও এর আমন্ত্রণে তিনি চীন যাত্রা করেন। চীন হইতে তিনি জাপানে যান। এই সালেই আমেরিকার স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি আমন্ত্রিত হন। ১৯২৫ সালে তিনি ইটালীতে গমন করেন। ১৯২৬ সালের ৩১শে মে মুসোলিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ সালের আগষ্ট মাসে তিনি নরওয়ে যাত্রা করেন এবং নরওয়ের রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৯২৭ সালে জাভা, সুমাত্রা, বালি, মালাক্কা প্রভৃতি ভ্রমণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের প্রথম অধি-বেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৮ সালে বিলাতে হিবার্ট লেকচার দিতে তিনি আহূত হন। ১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে তিনি রাশিয়ায় গমন করেন। ১৯৩১ সালে হিজলী জেলের হত্যাকাণ্ডে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন এবং তীব্রভাবে উহার প্রতিবাদ করেন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে টাউন হল ও ময়দানে আহূত সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

১৯৩২ সালে তিনি বিমান পথে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ করেন। এই সালেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩২-৩৩ সালের জন্য 'কমলা বক্তৃতা' দিবার জন্যও তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হয়। ১৯৩৫ সালের ১৫ই জুলাই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার বিরুদ্ধে আহূত সভায় কবি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। লাহোর ছাত্র সম্মেলনে তিনি অভিভাষণ দান করেন। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-লিট উপাধি দান করেন। ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় কবি বাংলায় অভিভাষণ প্রদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনের ইতিহাসে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাংলা অভিভাষণ। ১৯৩৮ সালে জাপানের কবি নোগুচির পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জাপানের পররাজ্য লিপ্সার তীব্র নিন্দা করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি তিনি মহাজাতি সদনের

উদ্বোধন করেন। ১৯৪০ সালের ২৮শে জানুয়ারী তিনি বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্পর্কে বাণী প্রদান করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী শান্তিনিকেতনে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার হয়। ১৯৪০ সালের ৭ই আগষ্ট শান্তিনিকেতনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার তাঁহাকে ডি লিট উপাধি দ্বারা বিভূষিত করেন।

বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার (ইং ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট) বেলা ১২টা ১৩ মিনিটের সময় কবি ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্র-স্মরণে

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের সাথে সাথে ভারতীয় প্রতিভার একটি গৌরবময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হয়ে গেল। যে বিরাট পুরুষ তাঁর প্রতিভার আলোকে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন তাঁর অভাব আজ দেশ তথা সমগ্র জগতের সুধীজন ও রস-পিপাসু সম্প্রদায় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছেন।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাব্য, সাহিত্য, সমাজ এবং জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে তাঁর ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছেন। তাই তাঁর কবিতায় যেমন 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' তেমনি কবি নিজেও 'ভূমা'র মাঝে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে আমাদের জীবনে মাধুর্য্যের এক অপরূপ আস্বাদ দিয়েছেন। তাঁর কর্ম্মজীবনের মাঝে পেয়েছি আমরা অনেক, তথাপি পাবার যেন আরও অনেক কিছুই ছিল।

সত্যই রবীন্দ্র-প্রতিভা এমনি বহুমুখী যে, তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। কাব্যে, গানে, নাটকে, উপন্যাসে, ছোট-গল্পে, সমালোচনায়, পরিভাষা সঙ্কলনে—সাহিত্যের এমন একটি ক্ষেত্র নেই যা রবীন্দ্রনাথের দানে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি। পরবর্ত্তীকালে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ চিত্রের এক অভিনব রূপ দিয়েছেন। এমন বহুমুখী প্রতিভার সন্ধান সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে তাই কমই মেলে।

আমাদের বাঙলা তথা ভারতের সাহিত্য ও জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈশিষ্ট্য নিয়ে যুগ-স্রষ্টা রূপে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেশ ও জাতি তাঁর নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ বিগত অনেক বৎসরের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্ততঃ কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে একথা তো খুব জোরের সাথেই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হলেও এই বিরাট প্রতিভার প্রভাব আরও অনেক দিন ধরে আমাদের সাহিত্যে ক্রিয়া করবে।

বর্ত্তমান বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের কাঠামো রবীন্দ্রনাথের অক্লান্ত সাধনায় এক নতুন রূপ নিয়েছে। কাব্যের ভাষা যে আজ অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়েছে সেও রবীন্দ্রনাথের অফুরন্ত প্রতিভার অপরূপ অবদান।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে জাতীয় জীবনের অধঃপতনের মাঝে আমাদের জাতি নিরাশার আবর্ত্তে হাবুডুবু খাচ্ছিল। এতটুকু আশার বাণী শোনবার সৌভাগ্য কারও ঘটে ওঠে নি। আনন্দের কণা মাত্রও যেন আমাদের জীবনের মাঝে খুঁজে পাবার উপায় ছিল না। নিরানন্দময় জীবনধারার মাঝে প্রকৃতির অফুরন্ত আলোকরশ্মি ম্লান আভা নিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেত—এতটুকু সাড়া জাগাবার মতো কিছুই যেন তাতে ছিল না। সেই নিরাশার অন্ধকারে সমগ্র ভারত মৃত্যুর করালছায়ায় ভয়ে শিউরে উঠছিল—ভারত ইতিহাসের সত্যই সে এক চরম দুর্দ্দিন। জাতীয় জীবনের চিন্তার দৈন্যের মরুভূমিতে পথ-প্রদর্শকের দেখা না পেলে অন্ধকারের কোন অতল গহ্বরে আমরা তলিয়ে যেতাম—! সে দুর্দ্দিনে ভারত তার পথ-প্রদর্শক

পেয়েছিল,—আর সে পথের সন্ধান এসেছিল আমাদের এই দীনা বঙ্গ-জননীর সন্তানদের কাছ থেকে। যদি ভারতের ইতিহাসে বাঙলার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময়ের কথা উল্লেখ করতে হয় তবে সে উনবিংশ শতকের বাঙলা। সে-যুগের সাথে তুলনা করা যায় গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগ আর ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের যুগ। তাই বাঙলার উনবিংশ শতক,—তোমায় প্রণাম জানাই! সেই উনবিংশ শতকে এখানে যুগস্রষ্টা মহামানবের উদাত্ত-ধ্বনি উঠেছিল—জ্ঞান ও কর্ম্মের জ্যোতিতে সমগ্র ভারতকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন তাঁরা। ভারত-ইতিহাসের অবহেলিত বাঙলা সমগ্র ভারতের জনগণের পথের সন্ধান দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাঙলার সেই গৌরবময় যুগের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। জাতীয় জীবনের নিরাশার আঁধার ভেদ করে রবীন্দ্রনাথ এলেন তাঁর অফুরন্ত আলোক ও আনন্দের পশরা নিয়ে। তাঁর কাব্যে আর গানে গভীর আঁধারের মাঝেও যেন পথরেখা খুঁজে পেলাম —জীবনের সব কিছু নিষ্করুণতার মাঝে মুহূর্ত্তের জন্যও যেন আনন্দের ভাবঘন রূপ অনুভব করলাম।

রবীন্দ্র-কাব্যের মূলসূত্র যে কী তা নিয়ে অনেকে অনেকভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের বিষয়-বস্তু এত বৈচিত্র্যপূর্ণ আর এত বিভিন্ন ভাবে রূপায়িত যে, সে আলোচনা এত ক্ষুদ্র পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কিন্তু কাব্যের বিষয় বস্তু যাই হোক না কেন, এই বিশ্ববৈচিত্র্যের শত বিভেদের মাঝে একটি সুগভীর একাত্মবোধের ধ্বনি তাঁর কাব্যকে এক অতীন্দ্রিয় লোকের সুষমায় মণ্ডিত করে তোলে। তাঁর নিজের কথায় 'তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্ঘখানি'—এ যেন রবীন্দ্র-কাব্যের একটি বিশিষ্ট সুর। তাই রবীন্দ্র-কাব্য উপনিষদের উদাত্ত স্বরে যেন আমাদের অন্তরে সুরের মাধুর্য্যে শাশ্বত সঙ্গীতরূপে জেগে থাকে। আর 'আশাবাদী' রবীন্দ্রনাথের সাথে তুলনা করা চলে শুধু ব্রাউনিং-এরই।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চিন্তা-ধারার ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ। বিশেষ ভাবে 'গোরা'তে যে চিন্তার স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নত বলিষ্ঠ মনের সন্ধান পাই—প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে তা যেন চিন্তারও অতীত ছিল।
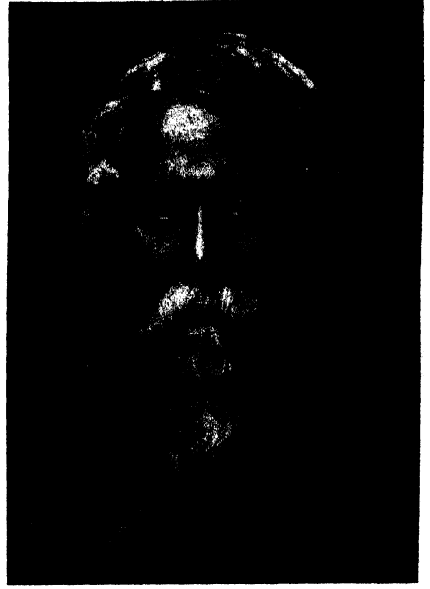
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৌন্দর্য্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথে এমন একটি রসপিপাসু অন্তরের সন্ধান পাই—যাতে 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথের উচ্চতা আশে পাশের আর দশজনকে ছাপিয়ে ওঠে। সূক্ষ্ম সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সে সমালোচনা অনেক সময় ব্যঙ্গ বিদ্রূপে কঠিন হয়ে উঠলেও—ভাঁড়ামীর পর্য্যায়ে কোনো মুহূর্ত্তেই নেমে আসে না। বরং সূক্ষ্ম রসসৃষ্টির মাঝেই রূপায়িত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার মাঝে এমন একটি সুস্থ মনের সন্ধান মেলে যা অনেক শ্রেষ্ঠ সমালোচকের মাঝেও দেখতে পাই নে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'—সাহেবদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি যে সমস্ত কটাক্ষপাত আছে এবং ব্যক্তিগত অবান্তর আক্রমণ আছে—রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই তার প্রতিবাদ না করে পারেন নি।

সাহিত্য ক্ষেত্রে নব ভাবের পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ—কর্ম্মজীবনেও রবীন্দ্রনাথ একজন যথার্থ নেতা এবং জাতির মর্ম্মস্থল তাঁর চিন্তার আলোক সম্পাতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ইংরেজ শাসনের শিক্ষাধারার গলদ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমালোচনার সূত্রপাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথে—সেই চিন্তা-ধারার পরিণতি দেখতে পাই। যে শিক্ষা মানুষে মানুষে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভেদ-বুদ্ধি দূর করতে পারে না—যে শিক্ষা শিক্ষিতকে দেশের কোটী কোটী মূক জনসাধারণ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায় সে শিক্ষার বিরুদ্ধে সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী সমৃদ্ধ। তাঁর 'শিক্ষার বিকিরণ' পুস্তিকায় যথার্থ শিক্ষা-ব্রতীর দরদ দিয়ে তিনি দেশের শিক্ষা-সমস্যার সুন্দর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে শুধু লিখেই তিনি ক্ষান্ত হন নি—শান্তিনিকেতনের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধারা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে।

খাঁটি সৌন্দর্য্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ দেশের মূক জন-সাধারণের দুঃখ-দৈন্যে কখনই শান্ত থাকতে পারে নি। তাই জাতীয় জাগরণের অগ্রদূতরূপে তাঁর কবিতা এ দেশের প্রতি ধূলিকণার প্রতি মমতায় ভরে উঠেছে। জাতীয় আন্দোলনের উদ্বোধনে জাতির মর্ম্মবেদনা তাঁর লেখার মাঝে তেজোদ্দীপ্ত রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মিস ইলেনর র‍্যাথবোনের খোলা চিঠির জবাবে তাঁর প্রত্যুত্তর বহুদিন তেজস্বিতা ও দেশ-প্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন রূপে জাতির অন্তরে জেগে রইবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বর আজ কোন অজানায় মিলিয়ে গেছে। ভারতের প্রাচীন ঋষিদের মতো জাতীয় উদ্বোধনের মন্ত্র উচ্চারণ করে অর্দ্ধ শতাব্দীকাল জাতিকে আশা ও আনন্দের সঞ্জীবনী ধারায় জাগিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আজ এক অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরের আহ্বানে প্রিয় দেশ ও জাতিকে ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু যে আদর্শের প্রেরণা ও যে বাণী তিনি দিয়ে গেছেন তার অনবদ্য ঝঙ্কার আমাদের মাঝে অনন্তকাল ধরে জেগে রইবে—আশা-আনন্দ-দোলায় বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের বংশ-পরিচয়

বাংলার রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বীতরাগ ছিলেন অন্যতম। ইহা খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। বীতরাগের দক্ষ, সুষেণ, ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি এই চারি পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষের চৌদ্দজন সন্তান হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে ধীর নামক পুত্র আদিশূরের পুত্র ভূ-শূরের নিকট হইতে বালার্থগুড় (মুর্শিদাবাদ জিলা) নামক গ্রাম প্রাপ্ত হন। গুড়গ্রামের অধিবাসী বলিয়া তিনি ধীরগুড়ী বা ধীরগুড় নামে পরিচিত ছিলেন। ধীরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ রঘুপতি আচার্য্য কনকদাঁড় গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার সন্তান-সন্ততিরা কনকদণ্ডীগুড়

আখ্যা প্রাপ্ত হন। রঘুপতির অধস্তন চতুর্থ পুরুষ জয়-কৃষ্ণের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম নাগর রায় ও দক্ষিণানাথ।

দক্ষিণানাথের কমলদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব এই চারিপুত্র জন্ম। দক্ষিণানাথ রায়চৌধুরী উপাধী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার চারিপুত্রের মধ্যে জয়দেব ও কমলদেব মুসলমান হইয়া যান। রতিদেব ও শুকদেব দক্ষিণডিহি গ্রামে বাস করিতেন, কিন্তু সামাজিক উৎ-পীড়নে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রাম পরিত্যাগ করিতে হয়। শুকদেব লোভ প্রদর্শন এবং ছলচাতুরী অবলম্বন করিয়া এক ফুলের মুখুটির সহিত ভগ্নীর এবং একজন শ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয়ের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। জামাতার নাম জগন্নাথ কুশারী। এই জগন্নাথ কুশারীই কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ।

কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষিতীশের পঞ্চম পুত্রের নাম ভট্টনারায়ণ। কুশারীরা এই ভট্টনারায়ণের বংশজাত। জগন্নাথ কুশারী ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন কুশারীর আট-দশপুরুষ পরবর্ত্তী। ইহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। জগন্নাথ কুশারী যশোহরের পীরালী ব্রাহ্মণ শুকদেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিবাহের পর জগন্নাথ পিঠাভোগের জমিদারী পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরের প্রদত্ত খুলনা জেলার উত্তরপাড়া গ্রামের সংলগ্ন বারপাড়া গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

জগন্নাথের দ্বিতীয় পুত্রের নাম পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের পুত্র বলরাম। বলরামের পুত্র হরিহর। হরিহরের পুত্র রামানন্দ। রামানন্দের মহেশ্বর এবং শুকদেব নামক দুই পুত্র ছিল। মহেশ্বর হইতেই কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো এবং কয়লা-ঘাটার ঠাকুর গোষ্ঠীর উৎপত্তি। চোরবাগানের ঠাকুর গোষ্ঠীর উৎপত্তি শুকদেব হইতে।

জ্ঞাতিদের সহিত কলহে বিরক্ত হইয়া মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন ও ভ্রাতা শুকদেব কলিকাতা গ্রামের দক্ষিণস্থ গোবিন্দপুর গ্রামে আসিয়া আদি গঙ্গার তীরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ঐ স্থানে বহু জেলে মালো এবং কৈবর্ত্তদের
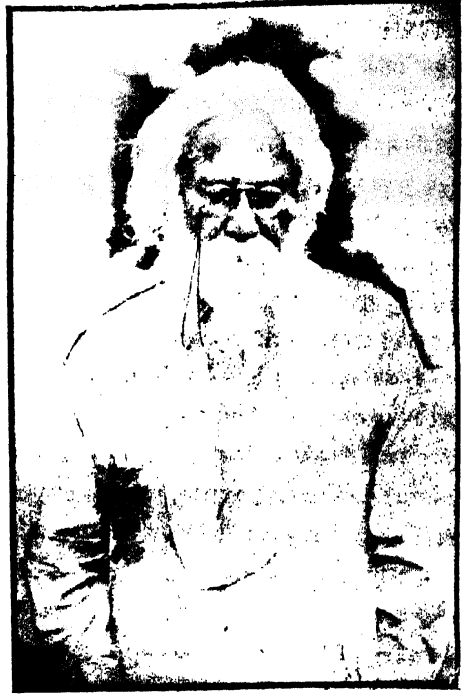
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাস ছিল। তাহারা মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন এবং ভ্রাতা শুকদেবকে ঠাকুর মশাই বলিয়া ডাকিত। সেই হইতেই তাঁহারা ঠাকুর নামে পরিচিত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে ঠাকুর পদবী প্রবর্ত্তিত হয়।

পঞ্চানন ঠাকুরের দুই পুত্র—জয়রাম ও রামসন্তোষ। শুকদেবেরমাত্র একটি পুত্রসন্তান হয়। তাঁহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র। জয়রাম ও রামসন্তোষ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান গড়ের মাঠ ও ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের স্থানে বাড়ী, বৈঠকখানা, বাগানবাড়ী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করেন। জয়রাম হইতেই ঠাকুর বাড়ীর ঐশ্বর্য্যের সূত্রপাত।

জয়রামের চারিপুত্র নীলমণি, অনাদিরাম, দর্পনারায়ণ, এবং গোবিন্দরাম। তাঁহার পুত্রদের নিকট হইতে কোম্পানী গড়ের মাঠস্থ বাড়ী ইত্যাদি ক্রয় করিয়া লইলে নীলমণি পাথুরিয়াঘাটার রামচন্দ্র কলুর নিকট হইতে ২০ বিঘা জমি ক্রয় করেন। পরে আরও পাঁচবিঘা জমি

ক্রয় করা হয় এবং জয়রামের চারিপুত্রই এখানে সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং নীলমণি হইতেই ঠাকুর গোষ্ঠীর কলিকাতায় বাসের সূত্রপাত।

নীলমণি ও দর্পনারায়ণের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় নীলমণি নগদ একলক্ষ টাকা লইয়া পাথুরিয়াঘাটার বাড়ী ও দেবোত্তর সম্পত্তি দর্পনারায়ণকে দিয়া যান। জয়রাম ঠাকুর নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে ৩০০ বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হন। সে সকল জমি দর্পনারায়ণকে দিয়া তিনি পৃথক হইয়া যান। নীলমণি জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের নিকট হইতে বর্ত্তমান জোড়াসাঁকো বাড়ীর একবিঘা জমি দেবোত্তর প্রাপ্ত হন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ঠাকুর বংশের বাস আরম্ভ হয়। পাথুরিয়াঘাটা মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন, রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন, মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার প্রভৃতি নীলমণির ভ্রাতাদের বংশধর।

নীলমণির রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ এই তিন পুত্র জন্মে। রামমণির স্ত্রীর নাম মেনকাদেবী। রামমণির তিন পুত্র—রাধানাথ, মহারাজা রমানাথ ও দ্বারকানাথ। আড়ম্বর ও দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য দ্বারকানাথ প্রিন্স দ্বারকানাথ আখ্যা প্রাপ্ত হন। দ্বারকানাথের তিন পুত্র—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। খ্যাতনামা চিত্র-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্যঙ্গচিত্রে সিদ্ধহস্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরীন্দ্রনাথের প্রপৌত্র।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পনরটি সন্তান হয়। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির চতুর্দ্দশ সন্তান। পনরটি পুত্রকন্যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন অবসান হওয়ায় একমাত্র রহিলেন বর্ণকুমারী।

১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবী পরলোক গমন করেন। রবীন্দ্রনাথের দুই পুত্র, তিন কন্যা। দ্বিতীয় পুত্র শমীন্দ্র অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কন্যা মাধুরীলতা ও রেণুকাও জীবিত নাই। তাঁহারা উভয়েই সন্তান-হীনা। তৃতীয় কন্যা মীরার এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র নিত্যেন্দ্র ১৯৩৬ সালে জার্ম্মানীতে পরলোক গমন করেন। কৃপালনীর সহিত কন্যা নন্দিতার বিবাহ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের কোন সন্তানাদি হয় নাই। তিনিই বর্ত্তমানে শান্তি-নিকেতনের কর্ম্ম-সচিব।

—ফটো [illegible]

অন্তিমশয়নে রবীন্দ্রনাথ

প্রবাসীর সৌজন্যে

কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাস যেন একটু হতাশের সুরে বললে—তা হোলে যাওয়া হোল না তোমার? এবার গেলেই বেশ হোত।

শরৎ বললে—না এবার হবে না।

—তোমার বন্ধুটিকে নিয়ে চলো না কেন?

—কে? রাজলক্ষ্মীর কথা বলচেন?...আচ্ছা, একটা কথা বলবো? রাজলক্ষ্মীকে কেমন লাগলো আপনাদের?

প্রভাস একটু বিস্ময়ের সুরে বললে—কেন বল তো? ভালই লেগেচে।

—গরীব বাপ-মা, বিয়ে দিতে পারচে না। ওর জন্য একটা পাত্র দেখে দিন না কেন প্রভাস-দা? বড্ড উপকার করা হবে। একটা কথা শুনুন প্রভাস-দা—

প্রভাস শরতের পিছু পিছু বাড়ীর পিছনদিকে গেল।

শরৎ বললে—আচ্ছা প্রভাস-দা, অরুণ বাবুর সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বিয়ে দিন না কেন জুটিয়ে? পালটি ঘর। চমৎকার হবে—

প্রভাস যেন ঠিক এধরণের কথা আশা করে নি শরতের মুখ থেকে। সে আশাহতের সুরে বললে—তা—তা—দেখলেও হয়।

শরতের যদি কিছুমাত্র সাংসারিক ও সামাজিক জ্ঞান থাকতো তবে প্রভাসকে চিনে নিতে সে পারতো এই এক মুহূর্ত্তেই। কিন্তু শরৎ যদিও বয়সে যুবতী, সারল্যে ও ব্যবহারিক অনভিজ্ঞতায় সে বালিকা। সুতরাং সে প্রভাসের স্বরূপ ধরতে পারলে না।

সে আরও আগ্রহের সঙ্গে বললে—তাই দেখুন না প্রভাস-দা? আপনি করলে অনেক সহজ হয়ে যায় কাজটা—

প্রভাস অন্যমনস্কভাবে কি একটা কথা ভাবছিল। দু-একবার যেন কোনো একটা কথা বলবার জন্যে শরতের মুখের দিকে চাইলেও—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বললে না।

দু-জনকে চা করে দিয়ে শরৎ পথের দিকে চেয়ে আছে—এমন সময় দেখা গেল রাজলক্ষ্মী ফিরে আসচে। সে দাওয়া থেকে নেমে রাজলক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বললে—এনেছিস ময়দা? দে আমার কাছে।

—আমি যাই শরৎ-দি, মা বলে দিয়েচে বাড়ী ফিরতে—

—কেন বল তো? প্রভাস-দারা এখানে বসে আছে বলে?

রাজলক্ষ্মী অপ্রতিভ মুখে বললে—তাই শরৎ-দি, জানোই তো, আমরা গরীব, এখানে ওদের সঙ্গে বসে থাকলে হয়তো কথা উঠবে। মা বড় ভয় করে ওসব।

—তা হোলে তুই যা—গিয়ে মান বজায় রাখ্—

রাজলক্ষ্মী হাসতে হাসতে চলে গেল।

প্রভাসদের খাবার করে দিতে বেলা প্রায় আটটা বেজে গেল। ওরা উঠতে যাবে এমন সময় শরৎ গড়ের খালের দিকে চেয়ে আহ্লাদের সঙ্গে বলে উঠলো—বাবা আসচেন!

প্রভাস ও অরুণ দুজনেই যেন চমকে উঠে সেদিকে চেয়ে দেখলে। ওদের মুখ দেখে মনে হবার কথা নয় যে কেদারের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তনে তারা খুব খুশী।

তবুও প্রভাস এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে কেদারের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। কেদার আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন—এই যে প্রভাস কখন এলে? ভালো সব?... আমি—হ্যাঁ—তাই বেরিয়েছিলাম বটে। সাংকিনী আর মাকড়ার বিলে বাচ হচ্চে খবর পেলাম পথেই। খাজনা আদায় করতে যখন যাওয়া—আর সবই জেলে প্রজা—বাচ্ শেষ না হোলে কাউকে বাড়ী পাওয়া যাবে না তাও বটে—আর মস্ত কথা হচ্চে বাচ্ না মিটে গেলে ওদের হাতে পয়সা আসবে না। তাই ফিরে এলাম!

প্রভাস বললে—ভালই হলো। শরৎ তো ছোটবোনের

মত—আপনাদের কলকাতা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো বলে মোটর এনেছি এবার। আপনি ছিলেন না বলে একটু মুস্কিল ছিল। শরৎ-দি বলেছিল যাবে। আমার সঙ্গে যাবে এ আর বেশি কথা কি? নিজের দাদার মত—তবুও আপনি এলেন—বড় ভালই হোল। কাল সকালে চলুন কাকাবাবু কলকাতায়—

শরৎ প্রভাসের কথা শুনে একটু অবাক হয়ে ভাবলে—কই, সে কখন প্রভাস-দা'র সঙ্গে কলকাতায় যাবে বললে? প্রভাস-দা'র ভুল হয়েছে শুনতে—কিন্তু সে তো আজ দু-বার তিনবার বলেচে তার যাওয়া হবে না।

কেদার বললেন—তা বেশ কথা। চল না, ভালোই তো। অনেককাল থেকে কলকাতায় যাবো যাবো ভাবি—তা হয়ে ওঠে না। মন্দ কি?

প্রভাস ও অরুণ একসঙ্গে খুশীর সঙ্গে বলে উঠলো—কাল সকালেই চলুন তবে! সে কথা তো আমরাও বলচি।

—কখন গিয়ে পৌঁচবো?

—বেলা বারোটার মধ্যে। কোনো কষ্ট হবে না—আপনাদের যাতে সব রকম সুবিধে হয়—

—এখানে কাল সকালে তোমরা খাবে—খেয়ে গাড়ীতে ওঠা যাবে—

শরৎও বাবার অনুরোধে যোগ দিয়ে বললে—হ্যাঁ প্রভাস-দা, অরুণ বাবুকে নিয়ে কাল সকালে এখানেই খাবেন। না, কোনো কথা শুনবো না। এখানে খেতেই হবে—

প্রভাস বললে—রাজলক্ষ্মী বলে সেই মেয়েটি যাবে না কি? তারও যায়গা হয়ে যাবে। বড় গাড়ী।

শরৎ বললে—না, তার যাবার সুবিধে হবে না। আমায় সে বলে গেল এই মাত্র।

প্রভাস বললে—তা হোলে কাকাবাবু কাল সকালেই আসবো তো?

—হ্যাঁ, এখানে তোমরা খাবে যে সকালে। তারপর রওনা হওয়া যাবে। অরুণকেও নিয়ে এসো—

দুপুরের পরে রাজলক্ষ্মী এল। শরৎ দাওয়ায় বসে পুরোনো টিনের তোরঙ্গটা থেকে তার ও বাবার কাপড় বার করতে ব্যস্ত। রাজলক্ষ্মীকে দেখে বললে—এই যে আয় রাজলক্ষ্মী, সব কাপড়ই ছেঁড়া, যেটাতে হাত দিই। আমার তবু দু-খানা বেরিয়েচে, বাবার দেখচি আস্ত কাপড় বাক্সে একখানাও নেই। কি নিয়ে যে যাবেন কলকাতায়—

—তা হোলে যাচ্চ সত্যিই শরৎ-দি? কাকাবাবু কোথায়?

—যাই, একবার বেড়িয়েই আসি। বসে বসে বাবার কাপড়গুলো এখন সেলাই করবো—কেনবার পয়সা নেই যে নতুন একজোড়া ধুতি কিনে নেবো—বেশি ছেঁড়া নয়, একটু আধটু সেলাই করলে কেউ টেরও পাবে না। বাবা নেই বাড়ী। এই মাত্র পাড়ার দিকে গেলেন।

শরতের মনে খুব আনন্দ হয়েচে বাইরে বেড়াতে যাবার এই সুযোগ পেয়ে। সে বসে বসে কেবল সেই গল্পই করতে লাগল রাজলক্ষ্মীর কাছে। কতকাল আগে তার শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিল—ভাল মনেও পড়ে না—সে-ও তো বেশি দূরে নয়, টুঙি মাজদে গ্রামের কাছে বল্লভপুরের ভাদুড়ীদের বাড়ী। মাজদিয়া ষ্টেশনে নেমে তিন ক্রোশ গরুর গাড়ীতে গিয়ে কি একটা ছোট্ট নদীর ধারে। তাদেরও অবস্থা খারাপ—আগে একসময় ও-অঞ্চলের ভাদুড়ীদের নামডাক ছিল, সে নাকি অনেককাল আগে। এখন সতেরো সরিকে ভাগ হয়ে আর সবাই মিলে বাড়ী বসে খেয়ে বেজায় গরীব হয়ে পড়েচে।

রাজলক্ষ্মী বললে—সেখানে তোমায় নিয়ে যায় না শরৎ-দি?

—কে নিয়ে যাবে ভাই?

—তোমার দেওর ভাসুর নেই?

—আপন ভাসুরই তো রয়েচেন। হোলে হবে কি, তাঁর বেজায় পুরী পাল্লা—সাত মেয়ে, পাঁচ ছেলে—নিজের গুলো সামলাতে পারেন না—খেতে দিতে পারেন না—আমাকে নিয়ে যাবেন। আজ তেরো বছর কপাল পুড়েচে, কখনও একখানা থান কাপড় দিয়ে খোঁজ করেন নি। আর খোঁজ করলেও কি হোত, আমি কি বাবাকে ফেলে সেখানে গিয়ে থাকতে পারি? সে গাঁয়ে আমার মনও টেঁকে না।

—যদি এখন তারা নিতে আসে শরৎ-দি?

—আমি ইচ্ছে করে যাইনে—তবে ভাসুর যদি পেড়াপীড়ি করেন—না গিয়ে আর উপায় কি?

—কতদিন থাকতে পারো? বলো না শরৎ-দি?

—কেন বল্‌তো আজ আবার তুই আমার শ্বশুরবাড়ী নিয়ে পড়লি কেন?

রাজলক্ষ্মী মুখে আঁচল দিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে উঠলো। তারপর বল্লে—দাও গুছিয়ে দিই কি জিনিসপত্তর আছে—মা বলছিল—

--কি বলছিলেন খুড়ীমা?

—ভাগ্যিস্ কাকাবাবু এসে গিয়েচেন তাই। নইলে তোমার একা যাওয়া উচিত হোত না প্রভাস বাবুর সঙ্গে—

শরতের চোখ দুটি যেন ক্ষণ কালের জন্যে জলে উঠলো। মুখের রং গেল বদলে—রাজলক্ষ্মী জানে শরৎ-দিদি রাগলে ওর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে আগে। রাজলক্ষ্মী ভয় পেল মনে মনে, হয় তো তার এ কথা বলা উচিত হয়নি, কিন্তু বলতে তাকে হবেই শরৎ-দির ভালোর জন্যে। না বলে সে পারে না। কতবার তার মনে হয়েচে শরৎ-দিদি তার ছোট বোন, সে-ই এই সংসারানভিজ্ঞা, বালিকাপ্রকৃতির দিদিকে সব বিপদ থেকে, কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

শরৎ কড়া সুরে বল্লে—কেন উচিত হোত না, এক-শো বার হোত। খুড়ীমাকে গিয়ে বোলো রাজলক্ষ্মী—শরৎ যেখানে ভাল ভাবে সেখানে আপনার লোকের মতই ব্যবহার করে—পর ভাবে না। তার মন যেখানে সায় দেয় সেখানে যেতে তার এতটুকু ভয় নেই—আমি কারো কথা—

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বল্লে—ওকি শরৎ-দি, তোমার পায়ে-পড়ি শরৎ-দি, অমন চটে যেও না ছিঃ—

—তবে তুই এমন কথা বলিস কেন, খুড়ীমাই বা কেন বলেন? তিনি কি ভাবেন—

--শোনো আমার কথা। মা সে কথা বলে নি। কিন্তু একা মেয়েমানুষ যদি বিপদে পড় তখন তোমায় দেখবে কে? সেই কথাই মা বলছিল। তুমি যত ভাল ভাবো লোককে সকলেই অত ভাল নয়। তুমি সংসারের কি বোঝ? মার বয়েস তোমার চেয়ে তো কত বেশি—সেদিক থেকে মা যা বলেচে মিথ্যে বলে নি। লক্ষ্মী দিদি, অমন রাগে না, রাগলেই সংসারে কাজ চলে? আমি তোমায় কত ভালবাসি, মা কত ভালবাসে—তা তুমি বুঝি জানো না? মা আমায় গাঁয়ে কারোর বাড়ী যেতে দেয় না—কিন্তু তোমাদের বাড়ী আসতে চাইলে কখনো কোন আপত্তি করে নি।

শরতের রাগ ততক্ষণ চলে গিয়েচে। সে রাজলক্ষ্মীর হাত ধরে বল্লে—কিছু মনে করিস্‌নে রাজি—

—না, মনে তো করি নে—আমি জানি শরৎদি ছেলে-মানুষের মত, এই রেগে উঠলো, এই জল হয়ে গেল। রাগ তোমার বেশিক্ষণ শরীরে থাকে না—গঙ্গাজলে ধোয়া মন যে! সাধে কি বড়বংশের মেয়ে বলে তোমাকে শরৎ-দি?

শরৎ সলজ্জ-মুখে বললে—যা যা আর বকিস নে—থাম্ তুই।

এই সময় দূর থেকে কেদারকে আসতে দেখে রাজলক্ষ্মী বললে কাকাবাবু আসচেন, শরৎদি—কথা থাক্ কি কি কাজ করতে হবে, কি গুছিয়ে দিতে হবে বলে দাও।

—কি আর গুছিয়ে দিবি! দু-পাঁচ দিনের জন্যে তো যাওয়া। হ্যাঁরে উত্তর-দেউলে সন্দে-পিদিম দেওয়ার জন্যে বামী বাগ্দীকে ঠিক করে দিতে পারবি? আমি এসে তাকে চার আনা পয়সা দেবো।

রাজলক্ষ্মী বল্লে—বলে দেখবো—কিন্তু সে রাজি হবে না। সন্দে বেলা সে ঘেঁসবে উত্তর-দেউলের অরুণ্যি বিজেবনে? বাপ্‌রে! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না কেন? আমি তোমার সন্দে দেবো রোজ রোজ—

শরৎ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—তুই দিবি সন্দে-পিদিম—উত্তর-দেউলে?

রাজলক্ষ্মী হেসে বল্লে—কেন হবে না? পানুকে সঙ্গে নিয়ে আসবো—আর সন্দের একঘণ্টা আগে আলো জেলে রেখে চলে যাবো। তোমাদের ঘরবাড়ীও তো দেখাশুনো করতে হবে আমার? অমনি দিয়ে যাবো পিদিম জেলে।

—তাহোলে তো বেঁচে যাই রাজলক্ষ্মী। ওই একটা মস্ত ভাবনা আমার তা জানিস? মনে মনে ভাবি,

আমি বেঁচে থাকতে পূর্ব্বপুরুষের দেউলে আলো জ্বালাব না—তা কখনই হতে দেবো না প্রাণ ধরে। আর একটা কথা শিখিয়ে দি, যখন পিদিম হাতে নিয়ে দেউলে যাবি—তখন বেতবনের জঙ্গলে বারহী দেবীর যে ভাঙ্গা মূর্ত্তি আছে সেখানটাতে একবার উদ্দেশ্যে পিদিমটা তুলে দেখাবি।

রাজলক্ষীর মুখে কেমন ভয়ের ছায়া নামলো—সে বললে—ওমা, ওই ভাঙ্গা কালীর মূর্ত্তি। ওখানে যেতে ভয় করে।

—কালী নয়—ও বারাহী বলে এক পুরোনো আমলের দেবীমূর্ত্তি। বহু কাল পুজোও হয়নি। কেমন চড়কের সময় সন্নিসিরা একবার ওখানে এসে নেচে যায় দেখিসনি?

—তা যাক নেচে। আমি ওখানে যেতে পারবো না শরৎ-দি। মাপ করো।

----তুই যদি না পারিস্—তবে আমার যাওয়া হবে না। আমি বারাহী দেবীকে ফেলে রেখে যেতে পারবো না।

রাজলক্ষী বললে—না দিদি, সত্যি কিছু ভাল লাগচে না। তুমি চলে যাবে, আমার মন কাঁদবে সত্যিই। তাই বলছিলাম পারবো না, যদি তোমার যাওয়ায় বাধা দিতে পারি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্চে, এ কাজ ভাল না। শরৎ-দিদি—কখনো কোনো জায়গায় যায় না, কিছু দেখেনি—ওই যাক্। ঘুরে আসুক।

কেদার গামছা পরে পুকুরে স্নান করে এসে বললেন—ওমা শরৎ, একটা ডাব খাওয়াতে পারবি?

—না বাবা একটা ছোট্ট ডাব ওবেলা ঠাকুরদের দিয়েচি—এবেলা আর কিছু নেই। পুণ্য বাগদীকে ডেকে নিয়ে আসবো?

না থাক্ মা, সব গুছিয়ে নিয়ে রাখো—রাজলক্ষী মা এলি কখন? তা তুই একটু সাহায্য কর না!

—ও তো করচেই বাবা। ও উত্তর-দেউলে পিদিম দেবে পর্য্যন্ত বলচে। এ গাঁয়ের মধ্যে আর কেউ এতদূর আসেও না, খোঁজখবরও নেয় না। ও আছে তাই তবু মানুষের মুখ দেখতে পাই।

পরদিন প্রভাসের মোটর সামনের বারুইদ'র বিল পার হয়ে যাওয়ার পরে কেদারের মুখে প্রথম কথা ফুটলো। পেছনের সিটে তিনি মেয়েকে নিয়ে বসেচেন—সামনের সিটে বসেচে অরুণ ও প্রভাস—অরুণ গাড়ী চালাচ্চে।

কেদার মাঝে মাঝে বিস্ময়সূচক দু-একটা রব করছিলেন এতক্ষণ—এইবার মেয়েকে সম্বোধন করে প্রথম কথা বললেন।

—ও শরৎ, কি জোরে যায় বটে মটোর গাড়ী, বারুইদ'র বিল গড়শিবপুর থেকে পাক্কা চার ক্রোশ রাস্তা। হেঁটে আসলে দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার কম পৌঁছুনো যায় না—আর এই দ্যাখো, চোখের পাতা পাল্টাতে না পাল্টাতে এসে হাজির বারুইদ'র বিলে—

—হাজির কি বাবা, বিল পেরিয়েও তো গেল!

—ও মানুষ না পাখী? কি জোরেই যায় তাই ভাবচি।

—হ্যাঁ বাবা, কলকাতা কতদূর বললে প্রভাস-দা?

—বেলা বারোটা কি একটার মধ্যে যাবো বলচে। ত্রিশ ক্রোশ হবে এখান থেকে কলকাতা।

প্রভাস সামনের সিটে বসে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বললে—কাকাবাবু কখনো কলকাতায় এসেছিলেন?

কেদার বললেন—তা দু-বার এর আগে আমি কলকাতা ঘুরে এসেছি। তবে সে অনেক দিন আগের কথা। প্রায় দু-যুগ হোল।

অরুণ বললে—সে কলকাতা আর নেই, গিয়ে দেখবেন। শরৎ-দি, আপনি কখনো যাননি কলকাতায় এর আগে?

—নাঃ, আমি কোথাও যাই নি—

—কলকাতাতেও না?

—কলকাতা তো কলকাতা! বলে কখনো রাণাঘাট কি রকম সহর তাই দেখিনি! রাজী হয়ে গেল তাই বাবা, নইলে আমার আসা হোত না। পিদিম দেখানোর জন্যেই তো যত গোলমাল।

আশ্চর্য্যের ওপর আশ্চর্য্য! ধর্ম্মদাসপুরে এসে গাড়ী দাঁড়িয়েছে ছায়ায়। এখনি এল ধর্ম্মদাসপুরে। কেদার খাজনা আদায় করতে বেরিয়েচেন সকালে—বেলা এগারোটার কমে ধর্ম্মদাসপুরে পৌঁছুতে পারেন নি। আর

সেই ধর্ম্মদাসপুর পার হয়ে গেল বড় জোর চল্লিশ মিনিটে। কি তারও কমে।

শরৎকে বললেন—মা, এই দ্যাখো ধর্ম্মদাসপুর গেল, সেই যে একবার ওল এনেছিলাম মনে আছে? সে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কি জোরে যাচ্চে একবার ভেবে দ্যাখো দিকিন্?···হ্যাঁ, গাড়ী বের করেচে বটে সায়েবেরা!

শরৎ ক্রমাগত ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করতে লাগলো—বাবা, আর কত দেরী আছে কলকাতা? কতক্ষণে আমরা কলকাতা পৌছবো?

প্রায় ঘণ্টা চারেক একটানা ছোটার পরে একটা সহর বাজারের মত জায়গায় গাড়ী ঢুকলো। কেদার বললেন—এটা কি জায়গা?

প্রভাস বললে—এটা বারাসাত। আর বেশি দূর নেই কলকাতা। এখান থেকে একটু চা খেয়ে নেবেন কাকাবাবু?

কেদার বললেন—কেন এখানে কি তোমার কোনো জানাশুনো লোকের বাড়ী আছে নাকি? চা খাবে কোথায়?

—না, জানাশুনো কেউ নেই। দোকানে খাবো। চায়ের দোকান আছে অনেক—

—না বাপু। তোমরা খাও—আমি দোকানের চা কখন খাইনি—ও আমার ঘেন্না করে। আমি বরং একটু তামাক ধরিয়ে খাই। অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হয় নি।

দোকানের চা শরৎও খেলে না। অরুণ ও প্রভাস নিজেরা গাড়ীর কাছে চা আনিয়ে খেলে। কেদার আরাম করে হুঁকো টানতে টানতে বললে—চা ভালো?

প্রভাস ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে—কেন, মন্দ না। খাবেন, আনাবো?

—না, আমি সে জন্যে বলচি নে। আমি দোকানের চা কখনো খাই নি, ও খাবোও না কখনো। তোমরা খাও। আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের কত বাচবিচার।

গাড়ী ছেড়ে যশোর রোড দিয়ে অনেকখানি এসে একটা বড় লোকের বাগানবাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। ফটক থেকে লাল সুরকির রাস্তা সামনের সুদৃশ্য অট্টালিকাটির গাড়ী-বারান্দাতে গিয়ে শেষ হয়েচে। পথের দু-ধারে এরিকা পামের বড় বড় চারা গাছ, ক্রোটন, শেফালি, চাঁপা, আম, গোলাপজাম প্রভৃতি নানারকম গাছ।

প্রভাস বললে—আপনারা নামুন—এবেলা এখানে থাকবেন আপনারা। এটা অরুণদের বাগানবাড়ী, ওর দাদামশায়ের তৈরী বাড়ী এটা। কেদার ও শরৎ দু-জনেই বাড়ী দেখে আনন্দে ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলেন। এমন বাড়ীতে বাস করবার কল্পনাও কখনো তাঁরা করেন নি। মার্ব্বেল পাথরে বাঁধানো মেজে, ছোট বড় আট-দশটা ঘর। বড় বড় আয়না, ইলেকট্রিক পাখা, আলো, কৌচ, কেদারা। তবে দেখে মনে হয় এখানে যেন কেউ বাস করেনি কোনো দিন, সব জিনিসই খুব পুরোনো—দু-একটা ঘর ছাড়া অন্য ঘরগুলোতে ধূলো, মাকড়সার জাল বোঝাই।

কেদার কথাটা বললেন প্রভাসকে।

প্রভাস বললে—ওর দাদাবাবু সৌখীন লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েচেন আজ বছর কয়েক। এখন মাঝে মাঝে অরুণেরা আসে—সব সময় কেউ থাকে না।

শরৎ বললে—এটাই কি কলকাতা প্রভাস-দা?

—না, এটাকে বলে দমদমা। এর পরেই কলকাতা সুরু হোল। তোমরা বিশ্রাম কর—ওবেলা কলকাতা বেড়িয়ে নিয়ে আসবো। এখুনি ঝি আসবে, যা দরকার হয় বলে দিও ঝিকে—সব গুছিয়ে এনে দেবে। ঠাকুর আসবে এখন—

শরৎ বললে—কি ঠাকুর?

—রান্না করতে আসবে ঠাকুর?

—বাবা ঠাকুরের হাতে রান্না খেতে পারবেন না প্রভাস-দা, ঠাকুর আসবার দরকার নেই। আমি আছি তবে কি জন্যে?

—কলকাতায় এলে একটু বেড়াবে না, বসে বসে রান্না করবে গড়শিবপুরের মত? বাঃ—

—তা হোক্ গে। আমার রান্না করতে কতক্ষণ যাবে বলুন তো? ক'জন লোকের রান্না করতে হবে?

প্রভাস ও অরুণ শরতের প্রশ্ন শুনে হেসে বললে—ক'জনের লোকের রান্না আবার। তোমাদের দু-জনের, আবার কে আসবে তোমার এখানে খেতে? তুমি তো

আর রাঁধুনী বামুনী নও যে দেশশুদ্ধু লোকের রেঁধে বেড়াবে? আচ্ছা, আমরা এখন আসি কাকাবাবু। বিকেলে ছ'টার সময় আবার আসবো। মলঙ্গা লেনে আমাদের যে বাড়ী আছে সেখানে নিয়ে যাবো ওবেলা।

ওরা গাড়ী নিয়ে চলে গেলে কেদার আর একবার তামাক সাজতে বসলেন।

শরৎ চারিদিকে বেড়িয়ে এসে বললে—বাঃ, চমৎকার জায়গা। ওদিকে একটা বাঁধাঘাটওয়ালা পুকুর। দেখবে এসো না বাবা? তোমার কেবল তামাক খাওয়া আর তামাক খাওয়া? এই তো একবার খেলে বারাসাত না কি জায়গায়?

কেদার অগত্যা উঠে মেয়ের পিছু পিছু গিয়ে পুকুর দেখে এলেন। বাঁধা ঘাট অনেক দিনের পুরোনো—কতকাল এ ঘাট যেন কেউ ব্যবহার করে নি। পুকুরের ওপারেও বাগান, কিন্তু ওদিকটাতে আগাছার জঙ্গল বড় বেশি।

শরৎ বললে—বাবা, খিদে পেয়েচে?

—নাঃ—

—ঠিক পেয়েচে বাবা। উড়িয়ে দিলে শুনবো না। ভাঁড়ারে জিনিসপত্র সব আছে দেখে এসেচি—হালুয়া আর লুচি করে আনি।

কেদার চুপ করে তামাক টানতে লাগলেন—মেয়ের কাজে বাধা দেবার বিশেষ কোনো লক্ষণ প্রকাশ করলেন না অবশ্যি। শরৎ কিন্তু অল্প একটু পরে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে—বাবা মুস্কিল বেধেচে—

—কি রে?

—এখানে তো দেখচি পাথুরে কয়লা জ্বালানো উনুন। কাঠের উনুন নেই। কয়লা কি করে জ্বালতে হয় জানি নে যে বাবা? ঝি না এলে হবেই না দেখচি।

শরৎ ছেলেমানুষের মত আনন্দে বাগানের সব জায়গায় বেড়িয়ে ফুল তুলে ডাল ভেঙে এ গাছতলায় লোহার বেঞ্চিতে বসে ও গাছতলার লোহার বেঞ্চিতে বসে উৎপাৎ করে বেড়াতে লাগলো। বেশ সুন্দর ছায়াভরা বাগান। কত রকমের ফুল—অধিকাংশই যে চেনে না, নামও জানে না। কেদার মেয়ের পীড়াপীড়িতে এক জায়গায় গিয়ে লোহার বেঞ্চিতে খানিকটা বসে কলের পুতুলের মত দু-একবার মাথা দুলিয়ে বলতে লাগলেন—বাঃ, বেশ—বাঃ—

বেলা যখন বেশ পড়ে এসেচে, তখন প্রভাস মোটর নিয়ে এসে বললে—আসুন কাকাবাবু, চলো শরৎ—কাকাবাবুকে কিছু খাইয়েচ?

শরৎ হেসে বললে—তা হয় নি। ঝি তো মোটেই আসেনি।

—তুমি তো বললে তুমিই করবে? জিনিসপত্র তো আছে।

—কয়লার উনুনে জ্বাল দিতে জানিনে, কয়লা ধরাতে জানিনে। তাতেই তো হোল না।

প্রভাস চিন্তিতমুখে বললে—তাই তো। এ তো বড় মুস্কিল হোল!—

কেদার বললেন—কিছু মুস্কিল নয় হে প্রভাস। চলো তুমি, ফিরে এসে বরং জলযোগ করা যাবে—

প্রভাস বললে—যদি নিকটের ভাল দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে আনি, তা আপনার চলবে না কাকাবাবু?

শরৎ হেসে বললে—বাবা ওসব খাবেন না প্রভাস-দা, তা ছাড়া আমি তা খেতেও দেবো না। কলকাতা সহরে শুনেচি বড় অসুখ বিসুখ, যেখান সেখান থেকে খাবার খাওয়া ওঁর সইবে না।

অগত্যা সকলে মোটরে উঠে বসলেন, গাড়ী ছাড়লো।

প্রথমে যশোর রোডের দু-ধারে [illegible]বাগানবাড়ী ও কচুরীপানা বোঝাই ছোট বড় জলা ছাড়িয়ে বেলগেছের মোড়ের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য দেখে পিতাপুত্রী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে পড়লো। ওদের দুজনের মুখে আর কোনো কথা নেই। গাড়ী ওখান থেকে এসে পড়লো কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে—এবং দু-ধারের দোকান পসার, থিয়েটার, সিনেমা, ইলেট্রিক আলোয় বিজ্ঞাপন, দোকানের বাইরে শো-কেসে বহুবিচিত্র কাপড়, পোষাক, পুতুল, আয়না, সেণ্ট, সাবান, স্নো প্রভৃতির সুদৃশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে গাড়ী এসে পড়লো হ্যারিসন রোডের মোড়ে এবং এখান থেকে গাড়ী ঘুরে গেল হাওড়ার পুলের ওপর ও পার হয়ে হাওড়া ষ্টেশনের গাড়ীবারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

পুল পার হবার সময় প্রভাস বললে—এই দেখুন

হাওড়ার পুল, নীচে গঙ্গা—আমরা যাচ্চি হাওড়া ষ্টেশনে।

এবারও কেদার বা শরৎ কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরুলো না।

প্রভাস গাড়ী থামিয়ে বললে—কাকাবাবু, চলুন ষ্টেশনের রেষ্টোরেণ্ট থেকে আপনাকে চা খাইয়ে আনি—খাবেন কি ?

কেদারের কোনো আপত্তি ছিল না—কিন্তু মেয়ে বাপের পরকালের দিকে অত্যন্ত সতর্কদৃষ্টি রেখেচে—বাবা নাস্তিক মানুষ—ওঁর এ বয়েসে কোনো অশাস্ত্রীয় অনাচারের সংস্পর্শে কখনো সে আসতে দেবে না কেদার তা ভাল জানতেন। তিনি মেয়ের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইলেন বটে, কিন্তু শরৎ তাঁর মুখের দিকে ভাল করে না চেয়েই বললে—চলুন প্রভাস-দা, উনি ওখানে খাবেন না—

অগত্যা প্রভাস আবার গাড়ী ছেড়ে হাওড়ার পুলের ওপর এল এবং আস্তে আস্তে চলতে লাগলো।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই দেখুন সব জাহাজ, শরৎ-দি দ্যাখো—সমুদ্রে যে সব জাহাজ যায়, ওই দাঁড়িয়ে আছে—

ষ্ট্রাণ্ড রোড্ দিয়ে গাড়ী এল আউট্রাম ঘাটে। ওদের দু-জনকে নামিয়ে নিয়ে প্রভাস আউট্রাম ঘাটের জেটিতে গিয়ে একখানা বেঞ্চিতে বসলো। সামনের গঙ্গাবক্ষে ছোট বড় ষ্টীমার বাঁশি বাজিয়ে চলেচে, বড় বড় ভড় ও বজরা ডাঙ্গার দিকে নোঙর করে রেখেচে, সার্চ্চলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাল একখানা বড় ষ্টীমার আস্তে আস্তে যাচ্চে নদীর মাঝখান বেয়ে, সুবেশা নরনারীরা জেটির ওপর বেড়িয়ে বেড়াচ্চে—চারিদিকে একটা যেন আনন্দ ও উৎসাহের কোলাহল।

একটা বড় বয়া ঢেউয়ের স্রোতে দুলচে দেখে শরৎ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওটা কি ?

প্রভাস বললে—জাহাজ বাঁধে ওই আংটাতে, বয়া বলে ওকে—আরও অনেক আছে নদীতে—

এতক্ষণ ওদের দু-জনের কথা যেন ফুটলো। কেদার নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—বাপরে, এ কি কাণ্ড! হ্যাঁ, সহর তো সহর, বলিহারি সহর বটে বাবা।

শরৎ বললে—সত্যি বাবা, এমন কখনো ভাবিনি। এ যেন যাদুকরের কাণ্ড! আচ্ছা, এখানে জলের ওপর ঘর কেন ?

প্রভাস বুঝিয়ে দিয়ে বললে—শরৎ-দি, কাকাবাবুকে এবার চা খাওয়ানো চলবে এখানে ? খুবভাল বন্দোবস্ত।

শরৎ রাজি হোল না। বাবাকে পরকালে যমের বাড়ী সে কখনো পাঠাতে পারবে না। যা নাস্তিক উনি, এমনি কি গতি হয় ওঁর কে জানে। তার ওপর রাশ আলগা দিলে কি আর রক্ষা আছে ? বাবা ধেই ধেই করে নৃত্য করে বেড়াবেন এই কলকাতা সহরে।

প্রভাসের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শরৎ একটু বিরক্তই হোল। সে যখন বলচে যে বাবা যেখানে সেখানে খাবেন না, তখন তাঁকে অত প্রলোভন দেখাবার মানে কি ?

বললে—আচ্ছা প্রভাস-দা, ওঁকে খাইয়ে কেন বাবার জাতটা মারবেন এ কদিনের জন্যে ? ও কথাই ছেড়ে দিন।

এবার কিন্তু কেদার বিদ্রোহ ঘোষণা করে বললেন—হ্যাঃ যত সব! একদিন কোথাও চা খেলেই একেবারে নরকে যেতে হবে! নরক অত সোজা নয়, পরকালও অমন ঠুনকো জিনিস নয়! চলো সবাই মিলে চা খেয়ে আসা যাক হে—

শরৎ দৃঢ়স্বরে বললে—না, তা কখনো হবে না। যাও দিকি ? সন্দে-আহ্নিক তো কর না কোনোকালে আবার ছত্রিশ জাতের হাতের জল না খেলে চলবে না তোমার বাবা ?

কেদারের সাহসের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল। প্রভাসও আর অনুরোধ করলে না, তিনিও আর যেতে চাইলেন না। ওখান থেকে সবাই এল ইডেন গার্ডেনে। রাত প্রায় সাড়ে আটটা, বহু সুসজ্জিত সাহেব-মেমকে বেড়াতে দেখে শরৎ তো একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। এত সাহেব-মেম একসঙ্গে কখনো দেখা দূরে থাক, কল্পনাও করেনি কোনো দিন। শরৎ হাঁ করে একদৃষ্টে এরিকা পামের কুঞ্জের মধ্যে বেঞ্চিতে উপবেশন রত দুটি সুবেশ, সুদর্শন সাহেব ও মেমের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ কি ভেবে তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তেই আঁচল দিয়ে

ক্ষিপ্রহস্তে সে মুছে ফেললে। শরতের মনে পড়লো, গ্রামের লোকের দুঃখদারিদ্র্য, কত ভাগ্যহত, দীনহীন ব্যক্তি সেখানে কখনো জীবনে আনন্দের মুখ দেখলে না। ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ডে ব্যাণ্ড বাজছিল অনেকক্ষণ থেকে। শরৎ অনেকক্ষণ বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনলে। কিন্তু ওর ভালো লাগলো না। সবই যেন বেসুরো, তার অনভ্যস্ত কানে পদে পদে সুরের খুঁৎ ধরা পড়ছিলো।

প্রভাস বল্লে—সিনেমা দেখবে তো বলো নিয়ে যাই।

শরৎ কখনো না দেখলেও সিনেমা সম্বন্ধে গড়শিবপুরে থাকিতেই সহর-প্রত্যাগতা নববিবাহিতা বালিকা কিংবা বধূদের মুখে অনেক গল্প শুনেচে। বাবাকে এমন জিনিস দেখাতেই হবে, সে নিজে দেখুক না দেখুক। কিন্তু আজ আর নয়—বাবার কিছু খাওয়া হয়নি বিকেল থেকে। একবার তার মনে হোল বাবা চা খেতে চাইচেন, খান বরং কোনো ভাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দোকানে বসে! কি আর হবে! বাবা যা' নাস্তিক, এত বয়েস হোল একবার পৈতে গাছটা হাতে করে গায়ত্রী জপটা করেন না কোনো-দিন, পরকালে ওঁর অধগতি ঠেকাবার সাধ্যি হবে না শরতের—সুতরাং ইহকালে যে ক'দিন বাঁচেন, অন্ততঃ সুখ করে যান। ইহকালে পরকালে দু-কালেই কষ্ট করে আর কি হবে?

শরৎ বল্লে—বাবাকে চা খাইয়ে নিই কোনো দোকানে বসে। ভাল দোকান দেখে—ব্রাহ্মণের দোকান নেই?

কেদার অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইলেন। প্রভাস বিপন্ন মুখে বললে—ব্রাহ্মণের দোকান—তাইতো—ব্রাহ্মণের দোকান তো এদিকে দেখচি নে—আচ্ছা, হয়েচে—এক উড়ে বামুন ঘড়া করে চা বেচে ওই মোড়টাতে, ভাঁড়ে করে দেয়—সেই সবচেয়ে ভালো। চলুন নিয়ে যাই।

চা পান শেষ করে ওরা আবার মোটরে চৌরঙ্গী পার হয়ে পার্কষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত গেল। এক জায়গায় এসে কেদার বললেন—এখানটাতে একটু নেমে হেঁটে দেখলে হোত না প্রভাস? বেশ দেখাচ্চে—গাড়ী এক জায়গায় রেখে ওরা পায়ে হেঁটে চৌরঙ্গীর চওড়া ফুটপথ দিয়ে আবার ধর্ম্মতলার মোড়ের দিকে আসতে লাগল দোকান, হোটেলগুলির আলোকোজ্জ্বল অভ্যন্তর ও শো কেসগুলির বিচিত্র পণ্যসজ্জা ওদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েচে—শরৎ তো একেবারে বিস্ময়বিমুগ্ধ।

কতকাল মেয়েমানুষ হয়েও সে জিনিসপত্রের লোভ করেনি। জিনিসপত্র অধিকার করে রাখবার মেয়েদের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চেপে চেপে রাখে মনের মধ্যে, শরতের সে সব বহুদিন চলে গিয়েছিল মন থেকে মুছে—কিন্তু আজ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠচে তারা।

একটা দোকানে ক্রিষ্টালের চমৎকার ফুলদানি দেখে শরৎ ভাবলে—আহা, একটা ওইরকম ফুলদানি কেনা যেতো!—বুনোফুল কত ফোটে এই সময় কালো পায়রার দীঘির পাড়ের জঙ্গলে, সাজিয়ে রাখতো সে রোজ রোজ। একটা চমৎকার পুতুল সাদা পাথরের, একটা কি অদ্ভুত রংএর কাঁচের বল তার মধ্যে বিজলির আলো জ্বলচে··· কি চমৎকার চমৎকার শাড়ী একটা বাঙালীর দোকানে, রাজলক্ষ্মীর জন্যে ওইরকম শাড়ী একখানা যদি নিয়ে যাওয়া যেতো! জন্মে সে এরকম রঙের আর এ রকম পাড়ের শাড়ী কখনো দেখেনি।

প্রভাস বললে—এটাকে বলে নিউমার্কেট। চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে এলাম—চলুন শরৎদিদির জন্যে কিছু ফল কিনি।

শরৎ বললে—না, আমার জন্যে আবার কেন খরচ করবেন প্রভাস-দা? ফল কিনতে হবে না আপনার।

প্রভাস ওদের কথা না শুনে ফলের দোকানের দিকে সকলকে নিয়ে গেল। এর নাম ফলের দোকান! শরৎ ভেবেছিল, বুঝি ঝুড়িতে করে তাদের দেশের হাটের মত কলা, পেঁপে, বাতাবী নেবু বিক্রি হচ্চে রাস্তার ধারে—এরই নাম ফলের দোকান। কিন্তু এ কি ব্যাপার! এত স্তূপীকৃত বেদানা, কমলালেবু, কিস্‌মিস্‌, আনারস, আঙ্গুর যে একজায়গায় থাকতে পারে, এ কথা সে জানতো এখানে আসবার আগে? তবুও তো এগুলো তার পরিচিত ফল, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে অন্য কত শত প্রকারের ফল রয়েচে যা সে কখনো চক্ষেও দেখেনি—নামও শোনেনি।

শরৎ জিজ্ঞেস করলে—কাগজে জড়ানো জড়ানো ওগুলো কি ফল প্রভাস-দা?

—ও আপেল। কালিফোর্নিয়া বলে একটা দেশ

আছে আমেরিকায়, সেখান থেকে এসেচে। তোমার জন্যে নেবো শরৎ-দি? আর কিছু আঙুর নিই। কাকাবাবু আনারস ভালবাসেন?

একটা বড় ঠোঙায় ফল কিনে ওরা নিউমার্কেটের বিভিন্ন দিকে বেড়াতে বেড়াতে একজায়গায় এল—সেখানে একটা আস্ত বাঘের হাঁ-করা মুণ্ড মেজের ওপর দেখে শরৎ চমকে উঠে বাবাকে দেখিয়ে বললে—বাবা, একটা বাঘের মাথা!

কেদারও অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে।

প্রভাস বললে—এরা জন্তুর চামড়া আর মাথা এরকম সাজিয়ে বিক্রি করে। এদের বলে ট্যাক্সিডারমিষ্ট। এরকম অনেক দোকান আছে।

এইবার সত্যি সত্যি একটা জিনিস পছন্দ হয়েচে বটে শরতের। ওই বাঘের মুণ্ডু শুদ্ধ, ছালখানা। তার নিজের শাড়ীর দরকার নেই, গহনা দরকার নেই—সে সব দিন হয়ে গিয়েচে তার জীবনে। কিন্তু এই একটা পছন্দসই জিনিস যদি সে নিজের দখলে নিজের ঘর সাজিয়ে রাখতে পারতো, তবে সুখ ছিল পাঁচজনকে দেখিয়ে, নিজে পাঁচবার দেখে, পাঁচজনকে ওর গল্প করে। ডেকে এনে পাঁচজনকে দেখাবার মত জিনিস বটে!

মুখ ফুটে সে প্রভাসকে দামটা জিজ্ঞেস্ করলে। প্রভাস দোকানে ঢুকে বললে—ওটা বিক্রির জন্যে নয়। দোকান সাজাবার জন্যে। তবে ওরকম ওদের আছে,—আড়াই শো টাকা দাম। ক্রমশঃ

এক্সপিরিয়ান্স

শ্রীমৃণাল দত্তগুপ্ত

অনেকদিন এলোমেলো ঘুরে বেড়ালুম। এক পার হ'য়ে দুই, দুই কেটে গিয়ে তিন বছরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছি। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের দিক থেকে সদুপদেশের কার্পণ্য নেই, কিন্তু কোন উপদেশই শেষ পর্য্যন্ত ধোপে টেকসই করাতে পারি না। আমি জানি, দোষ আমার কিছুই নেই, কিন্তু আমার বিচারের ভার পড়ে যেয়ে অন্যের হাতে। এখানেই আমার ট্রাজেডি।

সবাই স্বেচ্ছায় আমার বিচারের অধিকার নিয়ে বসেছে, তাই ব'লে আমি তাদের কথায় মাথা ঘামাতেই বা যাই কেন? কিন্তু নিজেও যে হাল ঠিক রাখ্‌তে পারছি না। হাতে জোর আছে ঠিকই, হালই যে কাজ করতে চাইছে না। তবু ধরেই আছি যদি কোনরকমে কূলকিনারায় পৌছতে পারি। কিন্তু দিন দিন কূল যেন চোখের আড়ালেই চলে যাচ্ছে।

ডালহৌসী স্কোয়ার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার অবধি চষে ফেলেছি, ও-সমস্ত যায়গার ফুটপাতের ইটের হিসেব পর্য্যন্ত মুখে মুখে ব'লে দিতে পারি। ওখানে সূর্য্য কখন কত ডিগ্রী angle ক'রে কিরণ দেয় তাও অজানা নেই, কিন্তু ইটের হিসেব ক'রে আর angle এর মাপ জেনে দেহের mass অথবা volume যাই বলি না কেন কমিয়ে ফেলেছি—যাকে বলে, 'indestructibility of energy.' বিজ্ঞানের কোন খুঁত নেই,—এক গ্যাছে আর এক এসেছে—ব্যাস, আর চাই কি?

এ তো গেল কথার কথা! Theory গিলছি বটে, কিন্তু পেট ভ'রছে না। মাঝে মাঝে Physiological revolution-এর সাড়া পাচ্ছি। পেটের সমস্ত নাড়ীগুলিও দল বেঁধে অধিকার দাবী ক'রছে—। কিন্তু অধিকার মঞ্জুরের কোন উপায় দেখছি না, বিল পাশ হবার অনেক দেরী। Revolutionটা দিন দিনই খুব acute হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। আগে হ'ত দিনে একবার, তারপর দু'বার, ক্রমে তিনবার

—এখন একঘণ্টা দু'ঘণ্টা অন্তর। Revolutionকে বেশী এগোতে দেয়া চলে না, বাধ্য হ'য়ে পরিশেষে টালা ট্যাঙ্ক থেকে যে বস্তু রাস্তায় রাস্তায় সরবরাহ করা হয় তার কাছে যেয়ে দাঁড়াতে হয়।

অনেক চেষ্টা করে একটা আস্তানা খুঁজে পেয়েছি। এখানে সূর্য্য angle কর্ত্তে সাহস পায়নি, বেশ জোর ক'রেই তাকে ঢুকতে বারণ করা হ'য়েছে। সব যায়গায় autocracy চলে না—যাও বাবা, ডালহৌসী স্কোয়ারে যাও, এখানে নয়। হাওয়াকে একটু liberty দেয়া হয়েছে—তাকে মাঝে মাঝে আসতে দেয়া হয়, তবে ব'লে দেয়া হ'য়েছে যে আসতে হ'লে সম্পূর্ণ democratic spirit নিয়ে আসতে হবে। আমাদের সঙ্গীসাথী ঘোষ গরুবাছুর যারা এখানে গোয়াল বেঁধে রয়েছে তাদের আগে একটু সাড়া দিয়ে আসতে হবে, নইলে চলবে কেন? যাক্, হাওয়া বেয়াড়া নয়,—কথা রেখেছে।

এখানে কিছুদিন কেটে যেতে লাগল। Bravo! my optimism! মন যেন কিছুতেই দমবার নয়, "Stern unbinding mind apt to all adversities." শেষটায় এই apt to all adversities-এর limit দাঁড়ালো যেয়ে দিনে একবার ক'রে ছোলা ভাজায়। Long live ভজুয়া—হয়ত আগের জন্মে কিছু পুণ্যি ক'রেছিলুম নইলে এমন room-mate জুটবে কেন? একেবারে ready meal. সাবাস্ ভজুয়ার দেহের ক্ষমতা! দিনে দু'একবার এরকম delicious dish খেয়ে around the world I survey. পিঠে দু'দশ মণ যাই চাপিয়ে দাও না কেন, সেকেণ্ডের কাঁটার মত হিড়হিড় ক'রে চ'লে যাবে। ওর oratoryও মন্দ নয়, বাঁ হাতের তলায় খৈনি রেখে রাত দুপুর অবধি ব'কে যাবে—যেন Mark Antony.

কিছুদিন বাদে ভজুয়ার সঙ্গ ছেড়ে দিলুম, কেননা এ ভাবে দিন কাটালে জীবনটা একেবারে static হ'য়ে যাবে। একদিন সুরসুর ক'রে বেড়িয়ে পড়লুম।

চৌরঙ্গী পার হ'য়ে গঙ্গার দিকে হেটে চলেছিলুম। দিনটা মেঘলা ছিল অথচ বৃষ্টি-বাদল কিছুই নেই। খোলা মাঠের মাঝ দিয়ে চ'লতে চ'লতে অনেক কিছুই ভাবতে লাগলুম, Scheme, Plan বা ও জাতীয় কিছুই নয়, একেবারে সোজাপথের কথা। আবার physiological revolution.—এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলুম কাছে কেউ নেই সবে বস্তুটি তুলে নিতে যাচ্ছি, utter disappointment! সোঁ ক'রে পেছন থেকে কে এসে মুখে ক'রে নিয়ে পালাল। পেছন ফিরে দেখি—দিব্যি একজন মেমসাহেব—আমি তাকাতেই তিনি ঝাঁকিয়ে ব'ললেন "Come here Jack"

ততক্ষণ বস্তুটি Jack এর safest custodyতে স্থান নিয়েছে। মেমসাহেবের পেছন পেছন চ'লতে লাগলুম যদি কিছু আলাপের সুযোগ মেলে—অন্ততঃ কোন reference—এই ছোট খাট যাই হ'ক না কেন?

Fool's Paradise! একখানা ট্যাক্সি হাঁকিয়ে মেমসাহেব শোঁ ক'রে বেড়িয়ে গেল।

এবার ভাবলুম আর নয়, অনেক হয়েছে, এখন সোজাপথ। কিছুক্ষণ ঘোরা ফেরা ক'রবার পর হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে পৌছিলুম। ট্রেন ছাড়তে তখনও দেরী ছিল—যাক্, টিকিট কেনার বালাই নেই।

"সুখেন"—পেছন থেকে ডাক এল।

ফিরে দেখি আমারই আগেকার মেসের রুম-মেট্। বললাম, "কি ভাই?"

"তোমার একখানা চিঠি আছে। সবে আজ এসেছে,—আমি আর খুলে দেখতেও সময় পাইনি,—I thing it is from your sweet heart. Oh! my God,—that carries the fragrant of love! যাক্, কিছু খাইয়ে দাও।"

আমি বললুম, "বেশত।"

"কবে?"

"এই যেদিন বল"—আমার address হয়ত জাননা—সবে বদলি ক'রেছি। কাল তোমাকে office থেকে ring ক'রব, আরও অনেক কথা আছে। cheer you!"

চিঠি নিয়ে একটা গ্যাস পোষ্টের নীচে ব'সে পড়লুম—বুক দুর দুর করছিল— "Love in a hut is love cinders ashes and dust". Keats বেঁচে নেই—কিন্তু বেড়ে লিখেছিল— যেন আমার মাসতুত ভাই। জানল কি করে? O. K—Experience. এবার আমার

পালা দেখাদিল, "এভাবে ক'লকাতার তিনতলায় ব'সে রাজধানীর হাওয়া খেলে চ'লবে কেন? মাঝে মাঝে বাড়ীর খোঁজ ক'রতে হয়—মিনুর জ্বর, কানুর পেটের অসুখ, ঘরে একটি পয়সাও নেই, গয়লার টাকা বাকী আছে।"

ব্যস্‌, চিঠিখানা বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লুম,—বেড়ে আছি—ভাবলুম এখনই বন্ধুটিকে ডেকে এনে কিছু খাইয়ে দি।

গাড়ী ছাড়ার সময় হ'য়ে আসছে, কোন রকমে একখানা কোণের বেঞ্চে যায়গা ক'রে নিয়েছি। ভাবলুম এবার কবিতা লেখা যাক,—যদি কিছু হয়। পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বের ক'রে ফেললুম। জয় মা সরস্বতী! শক্তি দাও। ও বাবা! পেটের মাঝে যেন চীন-জাপানের লড়াই সুরু হ'য়ে গিয়েছে। তবু tenacity, "পাষাণ ভাঙ্গিয়ে আনিব সুধাধারা।"

কামরার মাঝে হরেক রকমের যাত্রী,—কেউ খইনি টিপছে, কেউ দশবছর মেসে চাকরীর অভিজ্ঞতা জানিয়ে ঘি, ময়দা আর দস্তুরীর হিসেব কসছে, কেউবা—রামা হো —রামা।

অসম্ভব! তাড়াতাড়ি কাগজ খানা ভাঁজ ক'রে পকেটে গুঁজে ফেললুম,—কাজ নেই বাবা সুধাধারা দিয়ে। বেনারস ষ্টেশনে এসে নেমেছি। জ্যোৎস্না রাত্রি,—ফাঁকা ফাঁকা মেঘের মাঝে চাঁদের আলো একটা ঘোলাটে রংএর সৃষ্টি ক'রেছিল,—বুকটা আনন্দে ভ'রে উ'ঠছিল, যেন কোন জ্বালাযন্ত্রণা নেই, "Anon to my eternal journey."

কে যেন পেছন থেকে চোখ টিপে ধ'রল, তার পরই হো হো ক'রে হেসে উ'ঠলো, "সুখেন তুই! Oh, after a long time,"

আমার ছেলেবেলার বন্ধু অপূর্ব্ব, সঙ্গে একটি সুন্দরী তরুণী, সবুজ রঙের শাড়ীর আঁচল বাতাসে পত্‌পত্‌ ক'রছিল। জিজ্ঞাস ক'রলুম, "অপূর্ব্ব,—I think—"

"হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে introduce ক'রিয়ে দি, my wife".

উভয়ে নমস্কার জানালুম।—অনেক কথা হ'ল, তারপর আবার গাড়ী ছাড়বার পালা, "to my eternal journey.

অপূর্ব্ব আর আমি একসঙ্গে ছেলেবেলায় গ'ড়ে উঠেছিলুম। কথা ছিল দু'জনে বড় চাকরী ক'রব, বিয়ে ক'রব, একসঙ্গে ঘর বেঁধে থাকব। আজ অপূর্ব্ব তিন'শ টাকা মাইনের চাকরী করে, বিয়ে ক'রেছে। আমিও এগুতে ছিলুম, মাঝ পথে বাধা পড়ে গেল,—তবুও ছুটছি—দিশেহারা, লক্ষ্যহারা, ভবঘুরে,—কোথায় আছি জানি না, কোথায় যাব তাও জানি না—আছে শুধু কতকগুলি জীবনের experinece. তাই ভাবছি—আর নয়, "Anon to my eternal journey."

গান

অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম-এ, আই-ই-এস্

যে মধু-গীতিটি তুলেছিলে মোর প্রাণে
তার সুরে সুর পারি নি ত আমি দিতে,
তোমার রাগিনী কণ্ঠে উচ্চারিতে
ভেঙে গেল গলা, থামালে তোমার গানে।
তদবধি আমি কত না নূতন তানে
তোমার সে সুর গুন্‌-গুন্‌ করি চিতে,
পারি না তাহারে স্বরে মোর তুলে নিতে,
কী বেদনা পাই পরান আমার জানে!
সে গানের সুর নীরবে ধেয়ান করি,
মৌনের মাঝে দিশা যেন পাই খুঁজে,
শুব্ধতা মোর সুরে তব ওঠে ভরি'
শুনি সেই রব শ্রবণ নয়ন বুঁজে।
ধমনীর স্রোতে বহে সেই সুরধুনী,
শব্দবিহীন কলকল্লোল শুনি।

ধন-সম্পদের গোড়ার কথা

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

প্রকৃত পক্ষে শ্রম-শক্তির মূল্যকে শ্রমের মূল্য বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত। শ্রম যে-মূল্য সৃষ্টি করে তাহা অপেক্ষা শ্রমের মূল্য কম হইতেই হইবে। কারণ, নিজের মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করার পরেও শ্রমশক্তি যাহাতে পণ্য উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে পুঁজিপতিগণ তাহার জন্য সর্ব্বদাই উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমাদের পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে ১২ ঘণ্টার জন্য নিয়োজিত শ্রম-শক্তির মূল্য ১৲ এক টাকা। ছয় ঘণ্টা শ্রম করিলেই ১৲ টাকা মূল্য অর্থাৎ এক টাকা মূল্যের পণ্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রম-শক্তি বার ঘণ্টা খাটিয়া যে-মূল্য সৃষ্টি করে তাহার পরিমাণ ২৲ দুই টাকা। এই দুই টাকা মূল্য সৃষ্টি হওয়া শ্রম-শক্তির মূল্যের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে কি পরিমাণ সময় ব্যাপিয়া শ্রম-শক্তি কজে করে তাহারই উপরে। তাহা হইলে, যে-শ্রমের মূল্য ১৲ টাকা সে সৃষ্টি করিল ২৲ দুই টাকা মূল্য, ইহা একটা হাস্যকর ব্যাপার নয় কি?

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে আরও একটি ব্যাপার আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই ১৲ এক টাকা মূল্য যাহা আসলে ৬ ঘণ্টা শ্রমের মূল্য তাহাই পুরা ১২ ঘণ্টার মূল্য বা দাম বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এই বার ঘণ্টার মধ্যে রহিয়াছে আরও ৬ ঘণ্টা যাহার মূল্য দেওয়া হয় নাই। প্রথম দৃষ্টিতে বিষয়টি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কারণ মজুরি-প্রথার আবরণে সমস্ত ব্যাপারটা আবৃত থাকায় আমাদের মনে হয়, শ্রমিকের মজুরি তো দৈনিক ১৲ এক টাকাই স্থির হইল এবং আরও স্থির হইল যে, সে দৈনিক ১২ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিবে। তাহা হইলে ছয় ঘণ্টা শ্রমের মূল্য সে পাইল না এ কথা কিরূপে স্বীকার করা যায়? প্রথম দৃষ্টিতে এইরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলে দৈনিক মজুরির প্রকৃত স্বরূপটা ধরা পড়িয়া যায়। গ্রীক্ ও রোমান সভ্যতার যুগে মজুর ছিল ক্রীতদাস। আর্য্যগণ যখন ভারতে আসিলেন তখন পরাজিত অনার্য্য জাতির লোকদিগকে তাঁহারা ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছিলেন। ক্রীতদাসরা ছিল প্রভুর সম্পত্তি। তাহাদের পরিশ্রমে যাহা কিছু উৎপন্ন হইত ক্রীতদাসদের প্রভুরাই হইতেন তাহার মালিক। মজুরির কোন বালাই ছিল না—গোলামদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া কর্ম্মক্ষম রাখিতে পারিলেই হইত। ক্রীতদাসদের খোরাক-পোষাকের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাও তাহাদেরই শ্রমে উৎপন্ন হইত, যদিও এই সকল দ্রব্যের মালিক হইতেন ক্রীতদাসদের প্রভু। সুতরাং ক্রীতদাসদের শ্রমেরও কতক অংশ তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিতে নিয়োজিত হইত, অর্থাৎ কতটুকু সময় তাহারা শ্রম করিত নিজের জন্যই। কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় ক্রীতদাসের সমস্ত শ্রমই unpaid অ-প্রদত্ত মূল্য অর্থাৎ ক্রীতদাস তাহার শ্রমের জন্য কোন মূল্যই পাইত না। মধ্যযুগের প্রারম্ভে ক্র[illegible]সরা দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইল, তাহারা তখন হইল চাষী, কিন্তু চাষের জমিতে তাহাদের কোন স্বত্ব ছিল না, জমি ছিল জমিদারের। জমিদাররা তাঁহাদের জমিগুলি দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন—এক ভাগে থাকিত তাঁহাদের খাসের জমি আর এক ভাগ জমি অর্দ্ধক্রীতদাস চাষীদিগকে দেওয়া হইত এই সর্ত্তে যে, তাহারা সপ্তাহে তিন দিন জমিদারের খাসের জমিতে কাজ করিবে এবং অবশিষ্ট কয়েকদিন তাহাদের নিজেদের দখলের জমি চাষ করিবে। সোজা কথায়, সপ্তাহে তিনদিন জমিদারের জমিতে কাজ করার বদলে তাহারা জমিদারের নিকট হইতে কোন মজুরি পাইত না, পাইত কিছু জমি যে-জমি চাষ-আবাদ করিয়া তাহার সমস্ত শস্যই অর্দ্ধক্রীতদাস চাষীরা গ্রহণ

করিত। সুতরাং ফিউডাল যুগে অর্থাৎ অর্দ্ধক্রীতদাস চাষীর যুগে চাষীরা সপ্তাহের সব কয়টা দিনই নিজের জন্য কাজ করিত এ কথা বলিবার উপায় ছিল না। অর্দ্ধক্রীতদাস চাষীরা যে সপ্তাহের কয়েকটা দিন জমিদারের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য খাটিত, এ কথাটা লুকাইবার কোন প্রয়োজন সে যুগে ছিল না। এই ব্যাপারটাকে উল্টাইয়া দেখিলেই মজুরির রহস্যটা আমাদের কাছে ধরা পড়িবে। চাষী যদি জমিদারের সমস্ত জমিতেই সপ্তাহের সাতদিন কাজ করে এবং তাহার পরিবর্ত্তে সপ্তাহের শেষে নগদ টাকায় মজুরি পায় তাহা হইলে কি এই কথাই আমাদের মনে হইবে না যে, চাষী তাহার নিজের ও পরিবারের খোরপোষের বিনিময়ে সমস্ত সপ্তাহটাই মনিবের কাজ করিতেছে। পূর্ব্বে চাষী জমির মালিকের জন্য সপ্তাহে যে কয়েকটা দিন খাটিত এই কয়েকটা দিন সে নিজের জন্য কিছু করিত না, উহা ছিল তাহার অ-প্রদত্ত মূল্য (unpaid) শ্রম, তাহা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয় না। কিন্তু ক্রীতদাস-প্রথায় ক্রীতদাস তাহার নিজের ভরণ-পোষণ উপযোগী দ্রব্যের জন্য যে শ্রম করিত, আমাদের মনে হয়, তাহাও সে করিত তাহার প্রভুর জন্য বিনা পয়সায়। আর মজুরি-প্রথায় মজুর তাহার মনিবের জন্য বিনা পয়সায় যে শ্রম করে তাহার জন্যও সে পয়সা পায় বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মে। এইখানেই মজুরি-প্রথার বৈশিষ্ট্য। শ্রম-শক্তির মূল্যকে শ্রমের মূল্য বলিয়া কেন গণ্য করা হয় তাহার কারণও ইহা দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি।

তথা কথিত শ্রমের মূল্য অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরি কি ভাবে নির্দ্ধারিত হয় তাহার আলোচনা আমরা করিলাম। এখন আমরা দেখিব, কলযন্ত্রের ব্যবহারে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি স্বাভাবিক নিয়মে বর্দ্ধিত হওয়ার এবং পুঁজিপতিদের চেষ্টায় শ্রমের গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ার—অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে শ্রম ব্যয়িত হওয়ার সুবিধাটা পুঁজিপতিরাই পাইতেছেন, না শ্রমিকরা পাইতেছে। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি লইয়া আমরা প্রথমে আলোচনা করিব।

শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ যতই বাড়ুক বা কমুক না কেন, নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কাজের দিনগুলির প্রত্যেকটিতে সমপরিমাণ মূল্যই উৎপন্ন হইবে, কিন্তু পৃথক ভাবে প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্য যথাক্রমে কমিবে ও বাড়িবে, অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধিতে কমিবে এবং হ্রাসে বাড়িবে। মনে করুন, কাজের দিনের দৈর্ঘ্য ১২ বার ঘণ্টা এবং বার ঘণ্টায় যে পণ্য উৎপন্ন হয় তাহার মূল্য ছয় টাকা অর্থাৎ বার ঘণ্টার শ্রমে উৎপন্ন মূল্যের পরিমাণ ৬৲ ছয় টাকা। এখন শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ব্যবহার-মূল্য অর্থাৎ ব্যবহার্য্য পণ্যের সংখ্যা বা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে বটে, কিন্তু উৎপাদিত মোট মূল্যের পরিমাণ ঠিকই থাকিবে অর্থাৎ ৬৲ ছয় টাকাই থাকিবে। তবে ঐ মোট মূল্য অর্থাৎ ৬৲ টাকা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বা অধিক পরিমাণ পণ্যের মধ্যে বিভক্ত হইবে বলিয়া পৃথকভাবে প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্য কমিয়া যাইবে। (মাতৃভূমি, ১৩৪৭ সন ফাল্গুন সংখ্যা ১১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তেমনি শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলেও ঐ ১২ঘণ্টার মধ্যে ৬৲ টাকা মূল্যই উৎপন্ন হইবে, কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যা বা পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ফলে ৬৲ টাকা মূল্য অল্প সংখ্যক বা অল্প পরিমাণ পণ্যের মধ্যে বিভক্ত হইবে এবং পৃথকভাবে প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

ক্রমশঃ

সঞ্চয়ন

মিশরের বর্ত্তমান অবস্থা

[১৩৪৮।৯ই শ্রাবণ তারিখের 'নয়াবাংলা' হইতে উদ্ধৃত]

মিশর একটি মুসলমান-প্রধান দেশ। মিশরের আইনে রাজাকে অবশ্যই মুসলমান হইতে হইবে। রাজা যদি কখনও অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করিতে হইবে।

গত যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিশর তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্ম্মান পক্ষ অবলম্বন করায় এবং যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করায় তুর্কী সাম্রাজ্যর অন্যান্য দেশের ন্যায় মিশরও তুর্কীদের হাতছাড়া হইয়া যায় এবং মিশরের শাসনভার ইংরেজদের হাতে আসে। তুর্কীদের আমলে তুর্কীখলিফার প্রতিনিধি হিসাবে একজন খেদিব (গবর্ণর) মিশরের শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেন। ম্যাণ্ডেট অনুসারে শাসনভার ইংরেজদের হাতে আসার পর বৃটিশ হাই কমিশনারের ক্ষমতায় পরিচালিত হইয়া একজন রাজা দেশের প্রতিনিধি হইতে নির্ব্বাচিত মন্ত্রিসভার সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেন। এই হইল মিশরের পূর্ব্ব কথা। বর্ত্তমানে শাসনব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ইংরেজদ্বারা প্রভাবিত শাসনতন্ত্রে মিশরের জনসাধারণ সন্তুষ্ট নহেন। মিশরের জনসাধারণ দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মিশরসীমান্তে অবস্থিত সুদান দাবী করে। ইহার জন্য বহু অপ্রীতিকর ঘটনারও সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক আন্দোলনের পরেই তাহারা শাসনকার্য্যে কিছু কিছু সুবিধা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু মিশরীয়রা তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তুর্কীদের শাসন সময়েও স্বাধীনতার জন্য তাহারা অনেকবার বিদ্রোহ করিয়াছিল। মিশরের বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মোহম্মদ আলী।

মিশরের শাসনতন্ত্রের কথা আলোচনা করিতে গেলে ১৯২৩ সালের কথাই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হয়। তৎকালীন রাজা ফুয়াদ শাসনতন্ত্র রচনার ভার একটি কমিটির হস্তে অর্পণ করেন। ত্রিশজন সদস্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। মিশরে পার্লামেণ্টারী প্রথার প্রচলন হয় তখন হইতেই। পার্লামেণ্টারী প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও বৃটিশের বিশেষ ক্ষমতা লোপ পায় নাই। জনসাধারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধিকার হ্রাস এবং গণতন্ত্র প্রসারের দাবী করিয়া আন্দোলন করিতে থাকে। ফলে ১৯২৩ সালের এই শাসনতন্ত্র ১৯২৮ সাল হইতে এক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকে এবং ১৯৩০ সালে একটি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত শেষোক্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ সালে পুনরায় ১৯২৩ সালের শাসন-ব্যবস্থা সংশোধিত হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থা ৭ ভাগে বিভক্ত: ১। গবর্ণমেণ্টের প্রকৃতি, ২। মিশরীয়দের অধিকার ও কর্ত্তব্য, ৩। ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়, ৪। আর্থিক ব্যবস্থা, ৫। সশস্ত্র বাহিনী, ৬। সাধারণ কারবার ইত্যাদি, ৭। চূড়ান্ত এবং সাময়িক বিধিব্যবস্থা।

এই শাসনতন্ত্র অনুসারে মিশর একটি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন রাষ্ট্র। দেশের সর্ব্বোচ্চ স্থানে বংশমূলক অধিকার সম্পন্ন একজন রাজা অধিষ্ঠিত। আইনের চক্ষে সকল মিশরীয় সমান এবং প্রতিনিধিসভা এই শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত।

দেশের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী রাজা। রাজার বংশধরগণ বংশানুক্রমে রাজ্য শাসনের অধিকারী। রাজার কোন সন্তান না থাকিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইতে পারিবেন। যদি রাজবংশের কোন পুরুষসন্তান না থাকে, তবে রাজা পার্লামেণ্টের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিবেন।

রাজার ক্ষমতা সীমাহীন। তিনি পার্লামেণ্টের অধিবেশন ইচ্ছামত আহ্বান করিতে পারেন, আবার ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়াও দিতে পারেন এবং যে কোন আইনে সম্মতি দিতে পারেন। রাজাই স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনীর অধিনায়ক। ক্ষমতা অনুসারে তিনি ইচ্ছা করিলে যুদ্ধ ঘোষণা অথবা সন্ধি করিতে পারেন। অবশ্য রাজাকে দেশের শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিতে হইবে এবং তিনি তাহার ক্ষমতা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত করিবেন। দেশের স্বার্থের বিরোধী কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না ও পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোন ষ্টেটের মালিক হইতে পারিবেন না। মন্ত্রি-সভার পক্ষে পার্লামেণ্টের আস্থা না থাকিলে সাধারণতঃ মন্ত্রি-সভাকে পদত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু রাজা ইচ্ছা করিলে মন্ত্রি-সভা ভাঙ্গিয়া না-ও দিতে পারেন। পার্লামেণ্টে কোন আইন পাশ হওয়ার একমাস মধ্যে রাজা তাহা বাতিল বা গ্রহণ না করিলে অধিক সংখ্যক ভোটের জোরে পার্লামেণ্ট তাহা পাশ ও জারী করিতে পারেন। শাসনতন্ত্রে রাজার ভাতার ব্যবস্থা আছে। রাজার নিজস্ব একটি মন্ত্রি-সভা বা পরামর্শ সংঘ আছে। রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে একটি রিজেন্সি কমিটি দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত হয়।

মন্ত্রি-সভা কেবলমাত্র মিশরীয়দিগকে লইয়াই গঠিত হইতে হইবে। কিন্তু রাজবংশের কেহ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সকল আদেশই রাজা এবং মন্ত্রীর স্বাক্ষরে প্রচারিত হয়। মন্ত্রিরা রাজা এবং পার্লামেণ্টের উভয় সভার নিকট দায়ী থাকেন। বর্ত্তমানে মন্ত্রি-সভার দপ্তর ১২ ভাগে বিভক্ত। পার্লামেণ্ট দুইভাগে বিভক্ত: সেনেট ও চেম্বার অফ ডিপুটীজ। দেশের জন-সংখ্যানুপাতে সেনেটের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। প্রতি ৯০,০০০ হাজারে ১ জন সেনেটর নির্ব্বাচিত হয়। নির্ব্বাচিত সেনেটরের ৫ ভাগের ১ ভাগ সভ্য রাজা কর্ত্তৃক মনোনীত হয়। প্রতি ৬০,০০০ হাজারে একজন ডেপুটী নির্ব্বাচিত হয়। ৩০ বৎসরের কম বয়স্ক হইলে প্রতিনিধি সভার সদস্য হইতে পারা যায় না। উভয় পরিষদের অধিবেশন একই সময় হয় এবং বৎসরে প্রায় ৬ মাস কাল অধিবেশন চলে। উভয় পরিষদের প্রতিনিধিরা রাজানুগত্য ও শাসনবিধির প্রতি শপথ গ্রহণ করে। রাজাই পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন। পার্লামেণ্টের বক্তৃতায় সভ্যদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। শাসনকার্য্যের সাধারণ ব্যয় এবং সৈন্যসংখ্যা ও সৈন্য বিভাগের ব্যয় পার্লামেণ্ট নির্দ্ধারিত করেন।

মিশরের প্রধান সহরগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি ৩,০০০ অংশে বিভক্ত হইয়া একজন ওমাদার (শাসনকর্ত্তা) কর্ত্তৃক শাসিত হয়। মিশরে বহু বিদেশীয়ের বাস বলিয়া ১৪টি বড় বড় সহরে সমসংখ্যক মিশরীয় ও বিদেশীয়ের সাহায্যে কার্য্য পরিচালিত হয়। অবশ্য সব যায়গায়ই কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

মিশরের বিচার বিভাগ ৪টি বিভাগে বিভক্ত। ১। জাতীয় আদালত, ২। ব্যক্তিগত আইনের আদালত, ৩। আন্তর্জ্জাতিক আদালত, ৪। মিশ্র আদালত।

প্রথম আদালতে মিশরীয় প্রজাদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার হয় এবং দ্বিতীয় আদালতে সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারের মীমাংসা হয়। তৃতীয় আদালতে বিদেশীয়দের বিচার হয় এবং চতুর্থ আদালতে মিশরীয় ও বিদেশী ঘটিত মামলার বিচার হয়।

১৮৮১ সালে আরবী পাশার বিদ্রোহের পর হইতেই মিশরে রাজনৈতিক দলসমূহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু মিশরে বৃটিশদের আগমনের পর হইতেই জাতীয় আন্দোলনের সমস্যা জটিল হইয়া উঠে। প্রায় প্রত্যেক দলের সহিতই বৃটিশ স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সালে মিশরের সহিত বৃটিশের যে সন্ধি হয় তাহাতে জাতীয় দল ব্যতীত অন্য সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধিতে বৃটিশ মিশরের অনেক দাবী স্বীকার করেন। ফলে মিশরের বৃটিশ হাই কমিশনারের পদ লোপ পায় এবং তৎস্থলে একজন বৃটিশ দূত নিযুক্ত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজনৈতিক দল হইল জাতীয় দল। মোস্তাফা কামাল পাশা ১৯০৭ সালে ইহার গোড়া পত্তন করেন। এই দলের দাবী হইল—মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতা, সুয়েজের পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের দাবী ও সুদানের উপর দাবী। দ্বিতীয় দল হইল অভিজাত, ধনী এবং বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত উদারনৈতিক দল। ১৯২২ সালে এই দল প্রতিষ্ঠিত

হয়। বর্ত্তমানে মামুদ পাশা এই দলের নেতা। এই দলের দাবীও জাতীয় দলের দাবীর অনুরূপ তবে, এই দল বৃটিশের সহিত ঘনিষ্ঠভাব বজায় রাখার বিশেষ পক্ষপাতী। তৃতীয় দল হইল ওয়াফদ দল। জগলুল পাশা এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৩ সাল হইতে এই দল অন্যান্য দল অপেক্ষা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। দেশের সর্ব্বত্র এই দলের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকবার নির্ব্বাচনে এই দলই বিশষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। এই দলের উদ্দেশ্য হইল বিদেশীয়দের শোষণ হইতে দেশকে রক্ষা করা। এই দলের সদস্যরা বহুবার প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ করিয়া অনেক নির্যাতন ভোগ করিয়াছিল। ১৯২৭ সালে জগলুল পাশার মৃত্যুর পর নাহাস পাশা এই দলের নেতা নির্ব্বাচিত হন। নাহাস পাশা ১৯৩৬ সালে মিশরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং সেই সময়ই বৃটিশের সহিত মিশরের নূতন চুক্তি হয়। অন্যান্য দলের ন্যায় ওয়াফদ দলও দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা, মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ এবং সুদানের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবী করে। নাহাস পাশার সহিত বিরোধ হেতু ওয়াফদ দলের অন্যতম প্রতিপত্তিশালী নেতা ডাঃ আহামদ মাহের সা'দিষ্ট নাম দিয়া অপর একটি দল গঠন করায় গত নির্ব্বাচনে ওয়াফদ দলের প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে পার্লামেণ্টে ওয়াফদ দলের সদস্যসংখ্যা মাত্র ১৩ জন, পক্ষান্তরে নূতন সা'দিষ্ট দলের সদস্যসংখ্যা ৮৯ জন। কিন্তু বেশী সদস্য হইতেছে উদারনৈতিক দলের। এই দলের সদস্য-সংখ্যা হইতেছে ৯৩ জন। উদারনৈতিক দলই বর্ত্তমানে শাসনকার্য্য পরিচালিত করেন। এই দলের অন্যতম নেতা শাব্রী পাশা বর্ত্তমানে মিশরের প্রধান মন্ত্রী। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভায় সকল দলের সদস্যই বিদ্যমান।

সুয়েজের জন্য চক্রশক্তির দৃষ্টি বহুদিন হইতে মিশরের উপর নিবদ্ধ আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত মিশর সক্রিয়ভাবে যোগদান না করিলেও পরোক্ষভাবে মিশর যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। প্রাচ্যে বৃটিশের শ্রেষ্ঠ সামরিক কেন্দ্রস্থল হইল মিশর। ইতিমধ্যে মিশরের কয়েকটি সহরে শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণও হইয়া গিয়াছে।

(সৈয়দ ফয়েজ আহমদ)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

(অজ্ঞাত)

নহ কবি, নহ ঋষি,
মূর্ত্ত গীত-সুর,
অনন্তের কণ্ঠে তুমি
করুণ মধুর।

পুস্তক-পরিচয়
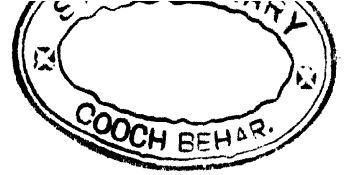
যোগের পথে আলো—শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত Lights of Yogaএর শ্রীমোহিনী মোহন দত্ত ও শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক অনুবাদ। ২৫ এ বকুলবাগান রো হইতে কালচার পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য মাত্র একটাকা।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণের যোগসম্বন্ধীয় নানা প্রশ্নের উত্তরে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে সঙ্কলন করিয়া ইংরাজি Lights of Yoga গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আলোচ্য পুস্তকখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ।

অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমোহিনী মোহন দত্ত ও শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়। উভয়েরই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতি আছে। অনুবাদও হইয়াছে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল এবং মূলানুগ। যথাসম্ভব বলিলাম এই জন্য যে এই ধরণের পুস্তকে কিছু কিছু দার্শনিক শব্দ থাকা অবশ্যম্ভাবী। পুস্তকের শেষে এইরূপ দুরূহ দার্শনিক শব্দগুলির ইংরাজি অনুবাদ দেওয়াতে পুস্তকটি অনেক সহজপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দের যোগসম্বন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রদ্ধাবান্ পাঠকসম্প্রদায়ের এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়াতে অনেক সুবিধা হইবে, বিশেষ করিয়া ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের। তাঁহারা এই পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের যোগের মূল তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। ছাপা, কাগজ উত্তম। মূল্য পুস্তকের পক্ষে বেশি নহে।

বসন্তে—গল্পসংগ্রহ—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত ও শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু চিত্রিত। ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত। ২১৪+১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৷০ টাকা।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক ছোটগল্প রচনায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরই চৌদ্দটি হাসির গল্প লইয়া বসন্তে প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলির প্রত্যেকটিই মনোরম ও একটি সরস মাধুর্য্যে মণ্ডিত। কেবল গুরুগম্ভীর''প্রশ্ন' গল্পটি এর ব্যতিক্রম—লেখক সেজন্য 'নিবেদনে' ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন। গল্পগুলির মধ্যে আমাদের শিবপুরের গণেশের দলের 'পাকাদেখা' গল্পটি সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে। নির্দ্দোষ হাস্যরসে এর তুলনা মেলা ভার। 'বসন্তে' 'উমেশকা বোহিন', 'তীর্থ ফেরৎ', 'সব ঝাণ্ডা' প্রভৃতি গল্পগুলিও চমৎকার। বাংলা সাহিত্যে 'বসন্তে' স্থায়ী আসন লাভ করিবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়।

বিনয় বাবু সুবিখ্যাত শিল্পী। তাঁর সুন্দর রেখাচিত্রগুলি সত্যই পুস্তকের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। পরশুরামের সঙ্গে নারদের মতো আশা করি এ সংযোগ চিরস্থায়ী হইবে।

লাইনো ছাপা। সুন্দর শাদা সিল্কের বাঁধাই। সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া। জ্যাকেটের উপরকার বহুবর্ণ চিত্রটি সত্যই চমৎকার।

পুস্তকের সজ্জা সুরুচির পরিচায়ক এবং তদনুযায়ী মূল্য অল্পই হইয়াছে বলিতে হইবে। ছাপার ভুল দু'একটি থাকিলেও বেশি নয়। ছাপার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে পুস্তকটি বাংলা সাহিত্যে আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হইবার যোগ্য। মোট কথা পুস্তকটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রকাশক চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

কৃষকের দাবী—(২য় সংস্করণ)—আলফাজ উদ্দীন, সাং আন্ধারমাণিক, ষ্টেশন মেহেন্দিগঞ্জ, জিলা বাখরগঞ্জ, পৃষ্ঠা ৩০। মূল্য দুই আনা।

কৃষকের দাবী সম্পর্কে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পুস্তিকাখানি যে বহুল প্রচারিত তাহা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পুস্তিকাখানির কতক অংশ কবিতায় এবং কতক গদ্যে লিখিত। লেখক পল্লীবাসী এবং দরদী কৃষক-কর্ম্মী। সহজ ও সরল ভাষায় তিনি কৃষকের দাবী সকলের নিকট পেশ করিয়াছেন, প্রশ্ন করিয়াছেন, "আজ কৃষকের পেটে অন্ন নাই, পরনে বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ ও পথ্য নাই, কেমন করে এমনটি হলো? তাকি চিন্তা করবে না?" তিনি কৃষকদের উন্নতির জন্য ২৬টি দাবী উপস্থিত করিয়াছেন এবং আইন সভার সদস্য-দিগকে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, "বলিতে গেলে এমন কোন সভ্য বাদ নাই যিনি কৃষক ও মজুর দলের সহিত এই সম্পর্কে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না হইয়াছেন। এখন যদি কাউন্সিল গৃহের সুরম্য সভ্যাসনে বসিয়া তাঁহাদের সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যান তবে সেটা আমাদের দুরদৃষ্ট এবং তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নহে।"

পুস্তিকাখানিতে ভাষার ঝঙ্কার নাই, আছে বাংলার কৃষকের জন্য সত্যিকার দরদ।

গীতিকাগুলি—শ্রীকেশবলাল দাস। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট, বনগাঁ, রেলবাজার, যশোহর এবং কলিকাতার পুস্তকালয় সমূহ। পৃষ্ঠা—১৭৪। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই দুই টাকা, সাধারণ বাঁধাই দেড় টাকা।

গীতিকাগুলি একখানি গীতিকাব্য। কবি খুব সহজ ও সরল ভাষায় এবং ছন্দে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে ছন্দঃপতন হওয়ায় রসোপভোগে ব্যাঘাত জন্মিলেও গীতি-কবিতাগুলিতে আন্তরি-কতার স্বচ্ছন্দ বিকাশ হইয়াছে। কোন কোন গীতিকবিতায় রবীন্দ্র-নাথের ভাব, ভাষা এবং ছন্দের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এযুগে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিয়া কাব্য-রচনা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নহে। আমরা তাঁহার কবিজীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ভারত-গৌরব-রবি রবি অস্তমিত

ভারতের গৌরব-রবি রবীন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নাই,—৭ই আগষ্ট বেলা ১২টা ১৩ মিনিটের সময় তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইয়াছে। অতি আপনার জনের চিরবিচ্ছেদে সমগ্র দেশ আজ মুহ্যমান।

রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, তাঁহার অপরিমেয় অবদান শুধু বাঙ্গালীকে নয়, শুধু ভারতবাসীকে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আজ তাঁহার সদ্যবিয়োগব্যাথায় চিত্ত আমাদের কাতর। বেদন-বিধুর চিত্তে তাঁহার দরদী ও মরমী প্রাণের কথাই শুধু ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতেছে। প্রত্যক্ষ নির্ম্মম সত্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না যে, সত্যই তাঁহাকে আমরা চিরকালের জন্য হারাইয়াছি। তাঁহার অন্তরের নিবিড়তম যে দরদ তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতিকে অজস্র ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছে তাহা অনন্ত কালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, যে গীতিকাব্যের কলকণ্ঠে তিনি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন তাহা আজ চিরনীরব একথা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। নির্ম্মম হইলেও একথা অতি সত্য যে, তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত রূপ আর আমরা দেখিতে পাইব না, তাঁহার ছন্দের ঝঙ্কার আর আমরা শুনিতে পাইব না, এই নশ্বর পৃথিবী হইতে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কাব্যে, প্রবন্ধে, সমালোচনায় তিনি বাংলা সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন। তাই বাংলা সাহিত্যের এই যুগ বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-যুগ। বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে কতই না স্থর-বৈচিত্র্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সুরের সহিত কথার মিলনে সঙ্গীত-জগতে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এক নূতন ধারার। রাগ সঙ্গীতের দরবারে রবীন্দ্র-সঙ্গীত আজও হয় ত তাঁহার যোগ্য ও ন্যায্য আসন লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু জনগণের মনের আসনে তাঁহার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্র-চিত্রকলা বিচার করিতে পারা যায় এরূপ কোন মানদণ্ড কি প্রাচীতে, কি প্রতিচীতে তুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষাগুরু তুই-ই। আমাদের দেশের কলেজী শিক্ষার অসারতা তিনি বুঝিতে পারিয়াই শিক্ষাদানের নূতন আদর্শে বিশ্বভারতী গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং নিজেও অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। তিনি একজন সুদক্ষ সম্পাদক এবং সাংবাদিকও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দক্ষ অভিনেতা এবং নিপুণ নৃত্যশিল্পীও ছিলেন এবং অভিনয় এবং নৃত্য শিক্ষাদিতেও তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল।

বঙ্গভঙ্গের পরে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পরে প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেও ভারতের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার তিনিই ছিলেন নায়ক—তিনিই সযত্নে উহার আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের জাতীয় ভাবেরও তিনি ছিলেন প্রতীক—একজন শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী। 'মানুষের অধিকারে বঞ্চিত' সর্ব্বহারাদের প্রতি তাঁহার দরদ ছিল অসীম। অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁহার হৃদয়-বীণায় দীপকের ঝঙ্কার উঠিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে তাঁহার অমূল্য অবদানের উত্তরাধিকারী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রাখিয়া গিয়াছেন আমাদের জন্য একত্বের বাণী আর তাঁহার অসমাপ্ত কর্ত্তব্য বিশ্বভারতীর দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথ আজ আর নাই, কিন্তু বিশ্ব-মানবের মধ্যে আবার তাঁহাকে আমরা ফিরিয়া পাইয়াছি। তাঁহার একত্বের সাধনা, বিশ্বভারতীর জন্য তাঁহার অসমাপ্ত কর্ত্তব্যকে যদি আমরা সার্থক করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলেই তাঁহার অমর আত্মা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিবে।

সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদ

গত ২১শে জুলাই ভারত-গবর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে বড়লাটের শাসন-পরিষদ সম্প্রসারণের এবং ৩০ জন সদস্য লইয়া জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, যুদ্ধসম্পর্কিত কাজের চাপ বাড়িয়া যাওয়ায় আইন, সরবরাহ, বাণিজ্য ও শ্রম-সংক্রান্ত দপ্তর পৃথক করার উদ্দেশ্যে বড়লাটের শাসন-পরিষদ সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমিসংক্রান্ত দপ্তরটিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ও বিদেশ প্রবাসী ভারতীয় এই চারিটি স্বতন্ত্র দপ্তরে বিভক্ত করিয়া প্রচার ও জনরক্ষণ নামে দুইটি স্বতন্ত্র দপ্তর সৃষ্টি করা হইয়াছে। সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদের সদস্যগণ প্রত্যেকে বৎসরে ৮০ হাজার টাকার স্থলে ৬৬ হাজার টাকা বেতন পাইবেন।

বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদে যে-সকল নূতন সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে ভারত-সচিব মিঃ আমেরীর অভিমত অনুসারে তাঁহারা সকলেই যোগ্যতাসম্পন্ন, অভিজ্ঞ এবং কর্ম্মকুশল। তাঁহাদের এই সকল গুণাবলী সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের কেহই ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধি নহেন। এই জন্য সম্প্রসারিত শাসন পরিষদ যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে কেহই সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। লীগ-দলপতি মিঃ জিন্না এবং বহু নরমপন্থী নেতাও ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন। ইহাতেই সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদের স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে। মহাত্মা গান্ধী তো এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবারই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। ভারতের সাতটি প্রদেশে এখন শাসন-তান্ত্রিক অচল অবস্থা বর্ত্তমান। গোড়াতেই যেখানে গলদ সেখানে জনকয়েক বশম্বদ ব্যক্তিকে লইয়া বড়লাটের শাসন-পরিষদ সম্প্রসারিত করিয়া ভারতীয় জনগণের বিশ্বাস অর্জ্জন করা সম্ভব নহে, একথা কি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াও বুঝিবেন না?

—

ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র

সম্প্রতি পার্লামেণ্টে বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদ এবং জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠন সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করিতে যাইয়া ভারত-সচিব মিঃ আমেরী ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের পথে এক নূতন সমস্যা দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি নাকি তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছেন, ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া কেন্দ্রে পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতি চলিতে পারে না। তাঁহার অভিমত এই যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতাও দেওয়া হইবে, ভারতে গণ-তন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে, কিন্তু থাকিবে না শুধু পার্লেমেণ্টারী শাসন-পদ্ধতি। এই উদ্ভট জিনিষটি যে কি তাহা ভারত-সচিব নিজেও এখনও ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই। তবে ভারতের জন্য একটা সোনার পিতলের কলস তৈয়ারী হওয়া অসম্ভব না-ও হইতে পারে।

—

প্রাদেশিক নির্ব্বাচন স্থগিত রহিল

ভারতের প্রাদেশিক আইন-সভাগুলির আয়ু প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, এমন সময় যুদ্ধের পরেও এক বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করা হইল। কারণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে, নির্ব্বাচন হইলে ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত জন্মিবে। তাছাড়া ভারতের সাম্প্রদায়িক মনোভাব এরূপ যে, নির্ব্বাচন আরম্ভ হইলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি আরও বাড়িয়া যাইবে। এই দুইটি কারণের সারবত্তা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যুদ্ধ হইতে আমরা বহুদূরে। সুদূর প্রাচ্যে জাপান অবশ্য হুমকী দিতেছে, কিন্তু বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিতে পারে এরূপ কিছু জাপান করিবে, তাহা বিশ্বাস হয় না। ম্যাক-ডোনাল্ড সাহেবের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলেই এদেশে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা ইহার প্রতিকারের উপায় নহে। বরং নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিলেই সাম্প্রদায়িক বিকৃত মনোভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা।

নির্ব্বাচন স্থগিত রাখায় নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর প্রতিও অবিচার করা হইল। ইতিপূর্ব্বে যাঁহাদিগকে তাঁহারা প্রতিনিধি স্বরূপ আইন সভায় পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে নির্ব্বাচকমণ্ডলী বর্ত্তমানে কি ধারণা পোষণ করেন, তাহা জানাইবার সুযোগ তাঁহাদিগকে দেওয়া উচিত ছিল।

—

মিঃ গার্ণারের রিপোর্ট

ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশগুলি পরীক্ষা করিয়া তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ সি, ডব্লু, গার্ণারের উপর ভারার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্ট এতদিন সরকার প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি উহা প্রকাশিত হইয়াছে। জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়াও ভূমিরাজস্ব কমিশনের প্রধান সুপারিশ। অথচ মিঃ গার্ণার এ সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব ক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের কোন লাভ হইবে না। এ সম্বন্ধে তিনি যে-সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিবার এখানে স্থানাভাব। জমিদারী ক্রয় করা না করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার ভার তিনি গবর্ণমেণ্টের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে অল্প খানিকটা জায়গায় এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

এইরূপ একটা রিপোর্টের জন্য মিঃ গার্ণারের উপর ভারার্পণ করিবার যে কি প্রয়োজন ছিল, তাহা আমরা বুঝিলাম না। জমিদারী ক্রয় করার উদ্দেশ্য সরকারের লাভ বৃদ্ধি করা নহে, উদ্দেশ্য কৃষকের উন্নতি করা। কৃষকের যদি অবস্থা ভাল হয়, তাহা হইলে জমিদারী প্রথা বিলোপ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অল্প আয় হইলেই বা ক্ষতি কি? বরং দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলে পরিণামে সরকারেরই আয় বৃদ্ধি হইতে পারে।

—

ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশের ভাগ্য

ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে কি করা সরকার স্থির করিয়াছেন তাহা আজিও অপ্রকাশ। ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে মিঃ গার্ণার তাঁহার রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন, অথচ এত দিনের মধ্যে সরকার কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন নাই, ইহা খুবই আশ্চর্য্যের কথা। গত ১২ই শ্রাবণ মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সরকার কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত না করিয়া কেবল তৎ-সম্পর্কে আলোচনা করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সুপারিশ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় সদস্যদের মতামত বিবেচনা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যেই নাকি গবর্ণমেণ্ট উক্ত আলোচনার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে দুই দিন ব্যাপিয়া ভূমিরাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা দল জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জমিদারী প্রথার সমর্থনেও অনেক সদস্য বক্তৃতা করিয়াছেন। কাজেই এই আলোচনা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে কতটুকু কি সুবিধা হইল তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ব্যাপার যেরূপ গড়াইতেছে তাহা দেখিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য ভূমিরাজস্ব কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা সরকারের নাই, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

—

ব্যবস্থা পরিষদে হট্টগোল

৪ঠা এবং ৫ই আগষ্ট এক মুলতুবী প্রস্তাব লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক তুমুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাবের বিষয়বস্তু যে কি তাহা জনসাধারণের অজ্ঞাত। শুধু এইটুকু জানা গিয়াছে যে, মুলতুবী প্রস্তাবটি জনৈক মাননীয় মন্ত্রীর ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য উত্থাপিত করা হইয়াছিল। আমরা সহজ বুদ্ধিতে বুঝি, অভিযোগ সম্বন্ধে একটা তদন্ত কমিটী নিয়োগ করিলেই গোলমাল চুকিয়া যাইত। মন্ত্রিমণ্ডলী যে কেন এই দিক্ দিয়া ঘেঁষিতে চান নাই তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

এই মুলতুবী প্রস্তাবের বিষয়টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত না করিবার জন্য স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার যে রুলিং দিয়াছেন তাহাতে সংবাদপত্রের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এইরূপ নজীর বহাল থাকা উচিত নহে।

—

কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের সংশোধন বিল

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বিতীয় সংশোধন বিল লইয়া বিরোধীদলের সহিত সরকারের একটা সাময়িক আপোষ হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বিলটি পুনরায় সিলেক্ট কমিটীতে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং বিরোধী দল হইতে আরও পাঁচজন নূতন সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই আপোষ একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। ইহাকে স্থায়িত্ব দান করিতে হইলে সরকার পক্ষকে খোলা মন লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা সিলেক্ট কমিটীতে আছেন এবং নূতন যাঁহারা গৃহীত হইলেন তাঁহাদের দায়িত্ব খুব গুরুতর। কর্পোরেশনের মর্য্যাদা এবং করদাতাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি বিলের সংশোধন তাঁহারা করিতে পারেন, তাহা হইলেই শুধু এই সাময়িক আপোষ সার্থক হইতে পারে।

—

সাংবাদিক ও সরকার

সংবাদপত্রে বিবৃতি বা রিপোর্ট প্রকাশ সম্বন্ধে সাংবাদিক সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশনের প্রস্তাব দুইটি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় সরকারের সহিত সাংবাদিকদের একটা গুরুতর মতভেদের অবসান হইল।

প্রথম প্রস্তাবের মূল কথা হইল এই যে, সংবাদপত্র বা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক আবশ্যক মনে না করিলে কোন বিবৃতি বা রিপোর্ট প্রেস-পরামর্শদাতার নিকট পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন না। তবে সরকার পক্ষের আপত্তিজনক সংবাদ প্রকাশিত হইলে প্রয়োজনবোধে উক্ত সংবাদপত্র বা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে। একাধিক বার সতর্ক করিয়া দেওয়ার পরও আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তি দেওয়া যাইবে।

সোজাসুজি ভাবে হুকুম দেওয়া অপেক্ষা সদিচ্ছা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতা দ্বারাই কাজ অধিকতর সুন্দর রূপে সম্পাদিত হইতে পারে। যদি আন্তরিকতার সহিত এই প্রস্তাব দুইটি কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে কি সংবাদপত্রের পক্ষে, কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কাহারও পক্ষেই কোন অভিযোগ করিবার কিছু থাকিবে না।

—

ভাত-কাপড়ের সমস্যা

অবশেষে চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য গবর্ণমেণ্ট বাঁধিয়া না দিয়া পারিলেন না। বিলম্বে হইলেও সরকার যে ইহা করিয়াছেন তাহাতে দরিদ্রের কষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে।

কাপড়ের দাম জুলাই মাসের মধ্যভাগ হইতে অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলা গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার জারী করিয়া পাইকারী বিক্রেতাগণকে সতর্ক করিয়াছেন। ইহার ফলও কিছু ফলিয়াছিল। কিন্তু আবার দাম বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বাধ্য হইয়া সরকারকে আবার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতে হইয়াছে। সরকার বেশী দাম দিয়া কাপড় না কিনিতে জনসাধারণকে উপদেশও দিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে এই উপদেশ পালন করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতাই যে প্রবল পক্ষ।

কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে একটা দাঁও মারিবার উদ্দেশ্য আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। সরকারেরও ধারণা তাই। ইহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে, কয়েক মাসের মধ্যে হাজার হাজার গাঁইট জাপানী কাপড় পুনরায় বোম্বাইতে চালান দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। তারপর পূজা আসিতেছে, তাহার পরেই আসিবে ঈদ। কাজেই কাপড় বাজারে না ছাড়িয়া দাম বৃদ্ধি করিতে পাইকারী বিক্রেতাদের উদ্দেশ্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বাংলার বাহিরের মিলগুলিরও পূজা উপলক্ষে দাঁও মারিবার প্রবৃত্তি হয়ত জাগিয়াছে। কাজেই ভারত-গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় বাংলা সরকার অতি সত্বর সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে কাপড়ের দাম নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে উদ্যোগী হইবেন, ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

—

মুসলিম লীগের শাস্তিবিধান

মুসলিম লীগের যে-সকল সদস্য লীগের অনুমতি না লইয়াই বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদ এবং দেশ-

রক্ষা কাউন্সিলের সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য জিন্নাসাহেব খড়্গ-পাণি হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু এই সকল অপরাধীরা প্রত্যেকেই লীগের এক একটি স্তম্ভ। তাঁহাদিগকে লীগ হইতে বাহির করিয়া দিলে লীগের আর থাকিবে কি ? তাই মনে হয়, শেষ পর্য্যন্ত বুঝি জিন্নাসাহেবকে শাস্তির অস্ত্র সম্বরণ করিতেই হয়। মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের ভিতর দিয়া যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই, শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে শাস্তি প্রদান করিতে যাইয়া সেই প্রতিষ্ঠানের নেতাকে শতবার ইতস্ততঃ করিতে হয়।

—

যুদ্ধের পরিস্থিতি

প্রায় দুই মাস হইল রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও কোন পক্ষই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। রুশ-জার্ম্মান রণাঙ্গন চারিটি প্রধান অংশে বিভক্ত। একটি লেনিনগ্রাডের দিকে জার্ম্মান আক্রমণ। এখানে চারিটি ক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিতেছে : লাডোগা হ্রদের পূর্ব্ব এবং পশ্চিম তীরে এবং পেইপাস হ্রদের উত্তর এবং দক্ষিণ তীরে। এই চারিটি ক্ষেত্রে প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে, কিন্তু জার্ম্মানী রাশিয়ার প্রবল প্রতিরোধকে হটাইতে পারিতেছে না।

মস্কোর দিকে আক্রমণ যুদ্ধের দ্বিতীয় প্রধান অংশ। রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের ইহাই প্রধানতম রণাঙ্গন। এখানেও দুই দিকেই প্রবলভাবে যুদ্ধ চলিতেছে। এখানে যুদ্ধ চলিতেছে স্মোলেনস্ক, কেরোস্তিন, বিয়েলা-টিসারবেলভ এবং এস্তোনিয়ার রণাঙ্গনে। স্মোলেনস্ক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তবু জার্ম্মানী এখানে কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সেই জন্যই জার্ম্মানীর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ওডেসার দিকে।

কিয়েভের দিকে জার্ম্মানীর তৃতীয় আক্রমণ চলিতেছে। সাঁড়াশীর ন্যায় দুই বাহু দ্বারা জার্ম্মানী আক্রমণ চালাইতেছে। আক্রমণের তীব্রতা যেমন হ্রাস পায় নাই, তেমনি রাশিয়ার প্রতিরোধও প্রবলভাবেই চলিতেছে।

জার্ম্মানীর চতুর্থ আক্রমণ ওডেসার দিকে। এই ক্ষেত্রে রুমানীয়ার সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক ওডেসা বন্দর পরিবেষ্টিত হওয়ার দাবী করা হইয়াছে। কিন্তু রাশিয়া কর্ত্তৃক তাহা স্বীকৃত হয় নাই। তাহারা উহাকে হিটলারের রঙীন স্বপ্ন বলিয়াই মনে করে। সুইডিস সমরবিশেষজ্ঞদের মতে রুশীয়গণ ওডেসা পরিত্যাগের পক্ষপাতী নহে। ওডেসা পরিবেষ্টিত হইলেও তাহারা নাকি অন্যত্র যাইবে না।

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই গুরুতর ক্ষতি হইতেছে। রাশিয়া ক্ষতির কথা স্বীকার করে, কিন্তু জার্ম্মানী করে না। এ সম্পর্কে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধে জার্ম্মানীর পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছে। জার্ম্মানীর পক্ষে রুমানিয়ার সাড়ে চারি লক্ষ সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে। প্রকাশ, তন্মধ্যে ৩০ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছে, হতাহতের সংখ্যা লক্ষাধিক।

—

সুদূর প্রাচীতে

ভিসির সহিত জাপানের এক চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তির বলে জাপান ইন্দোচীনের কয়েকটি ঘাঁটিতে সৈন্য সমাবেশ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। তাহারা সৈন্য সমাবেশ হইয়াও গিয়াছে। অতঃপর জাপান কোন দিকে হানা দিবে তাহাই সকলের চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। জাপান এখন থাইল্যাণ্ডও আক্রমণ করিতে পারে, আবার রাশিয়াকেও আক্রমণ করিয়া বসিতে পারে। কোন্‌টা করিবে এখনও স্থির নাই। কিন্তু দুর্যোগের মেঘ সুদূর প্রাচীতে ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়।

—

বাংলায় রেশমের চাষ

১৯২১ সালে বাঙ্গালাদেশে প্রায় ৩,৯০০০০ বিঘা তুঁতের জমি ছিল। কিন্তু উহা কমিতে কমিতে ১৯৩২ সালে ৭৫০০০ হাজার বিঘাতে দাঁড়াইয়াছিল এবং ১৯৩৮ সালে মাত্র ৩০০০০ হাজার বিঘাতে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩২ সালের গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাংলায় ৫০,০০০০০ লক্ষ টাকার রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ১৯৩৮ সালে উহা কমিয়া ২০,০০০০০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বাংলায় রেশম আমদানীর উপর শতকরা ৫০ টাকা শুল্ক ধার্য্য থাকা সত্ত্বেও প্রতি বৎসর এই বাঙ্গালায় ১৫।১৬ লক্ষ টাকার রেশম সূতা আমদানী হইয়াছে।

—

মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

তৃতীয় বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৮ | ১০ম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা

শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম-এ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেহরক্ষার অব্যবহিত পর হইতেই তাঁর স্মৃতিরক্ষার সম্পর্কে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা ও আলোচনা চলিয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে ইহা লইয়া বাদ-বিসম্বাদের ঝড়ঝাপটার পূর্ব্বাভাসও যে লক্ষিত না হইতেছে তা নয়,—যার প্রমাণ মিলিবে মডার্ণ রিভিউ, প্রবাসী ও দৈনিক আনন্দবাজারের সাম্প্রতিক কোন কোন সংখ্যায়। কেহ কেহ বা এই সূত্রে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশচ্ছলে কৌতুকপ্রদ মনোবৃত্তির ও দৃষ্টিভঙ্গীরও সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন সম্পর্কে এমনই কয়েক জন সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পী কিছুকাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রের মারফত এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন, যাহা হইতে জানা যায়, বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণজনিত শোক তাঁদের এতই বিরাট ও অতলস্পর্শী যে, সভাসমিতি করিয়া তার প্রকাশ শুধু যে অসম্ভব তাই নয়,— সভাসমিতি ব্যাপারটাকেই তুচ্ছ ও অনাবশ্যক জ্ঞানে রাজনীতিবিদ, ব্যবহারজীবী ও ব্যবসায়ীদের স্তরের লোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া নিজেরা কেবল "সকল আর্টের উৎস নীরব চিন্তায়" এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-স্মৃতির অনুধ্যানে তাঁদের অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেই অধিকতর সমুৎসুক। সমসাময়িক সাহিত্যের লেখক মাত্রেই যখন সাহিত্যিক পদবাচ্য নন,—তখন তাঁদের বিবেচনায় লেখক মাত্রেরই বা সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র শোকসভার অনুষ্ঠান সম্পর্কীয় কোন প্রস্তাব অচল ও অগ্রাহ্য। চিত্রকর সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত এঁরা অবশ্য করেন নাই। তবে চিত্রকর বলিতে যখন "বিজ্ঞাপন-চিত্রশিল্পী"-ও বাদ পড়ে না, তখন সে ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ তাঁরা একই মত পোষণ করেন। এঁদের মতে এসব বাহ্যিক অনুষ্ঠান অপেক্ষা সৃজন-মূলক লেখার জন্য দুই কিম্বা তিন বৎসর পর পর সহস্রেক পরিমাণ মুদ্রায় পুরস্কারের ব্যবস্থাই কবিগুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রকৃষ্টতম পন্থা। মূল প্রস্তাবের মধ্যে অবশ্য অসঙ্গতি বড় একটা নাই। কিন্তু এই অযাচিত দংষ্ট্রানখরসঙ্কুল বিবৃতিটির মধ্যে যে জিনিষটা সবচেয়ে শালীনতা হীন ও ধৃষ্টতা ব্যঞ্জক তা এই যে,—বিশ্বকবির তিরোভাবে গোটাদেশের উচ্ছ্বিত শোকাবেগ যে সময়টিতে এই সব সভাসমিতিরই মাঝে পূর্ণরূপে বাঙ্ময় ও অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে—ঠিক তখন একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শুধু সে-সবের প্রতি অশ্রদ্ধারই ভাব পোষণ করিতেছেন তা নয়, দুর্বিনীত আত্মশ্লাঘার ও অশোভন আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবাদিতার মোহে নিজেদের নিষ্কর্ম্মকে লইয়াও একদিকে যেমন তাঁরা উৎকট দম্ভের উচ্ছ্বাস করিয়াছেন, অন্যদিকে আত্মগণ্ডীর বহির্ভূত সন্তপ্তদের স্বতোচ্ছ্বসিত শোক ও বেদনার অকপট অভিব্যক্তির উদ্দেশে অকারণ রূঢ় কটাক্ষপাত করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই!

কাব্য ও গানের রাজা রবীন্দ্রনাথকে জাতি কখনো ভুলিবে না; কবির পূর্ণ মর্য্যাদা যে সে অকুণ্ঠিত চিত্তে

দিতে পারে, তার প্রমাণ কিছুকাল যাবৎ হাটে মাঠে বাটে সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি। বাঙ্গালীর প্রাণে আজো তাঁর সুর বিচিত্র অনুরণনে ঝঙ্কৃত হইয়া ফিরিতেছে,—কণ্ঠে তার তাঁরই বাণী ও ভাষা। নিজ অন্তরে জাতি তাঁর যে বিরাট স্মৃতিসৌধ রচনা করিয়াছে, তার তুলনায় বাহ্যিক কোন স্মৃতিরক্ষার পরিকল্পনা অবশ্য নগণ্য। পরিতাপের বিষয় শুধু এই যে,—যে মুহূর্ত্তটি বিশেষ করিয়া ধনী-নিধ'ন, বুদ্ধিজীবী-বিষয়ী, ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদ নির্ব্বিশেষে একযোগে আপামর জনসাধারণের অশ্রু মোচনের সময়,—মনেপ্রাণে অনুভব করিবার ক্ষণ যে, জাতীয় জীবনের কতখানি স্থান শূন্য রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, ঠিক তখন আমরা করিয়াছি বাগযুদ্ধের ও বিতর্কসঙ্কুল অসময়োচিত এ'সব প্রসঙ্গের অবতারণা!

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা সম্পর্কিত যে কয়টি প্রস্তাব ইতোমধ্যে উত্থাপিত হইয়াছে, তাদেরে ধীরভাবে যাচাই করিয়া দেখিবার আবশ্যকতা আছে। "মহাজাতি সদন" বিষয়ক প্রস্তাবটি যে সর্ব্বজনগ্রাহ্য নয়, উল্লিখিত বাগবিতণ্ডাই তার প্রমাণ। পক্ষান্তরে সৃজনমূলক সাহিত্য রচনার জন্য পুরস্কারের বিধি-ব্যবস্থার কথাও দেশবাসীর নিকট হইতে সাড়া তেমনটি পাওয়া যায় নাই—দু'একটি সংবাদপত্র নিতান্ত মামুলী ভাবে এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। তথাপি ইহা ঠিক যে, মতটি একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। এজন্য প্রয়োজন স্থায়ী একটি অর্থভাণ্ডারের যার সংগ্রহের ও তত্ত্বাবধানের ভার নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকিবে। এ ব্যাপারে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদই হয়ত উদ্যোগী হইয়া প্রস্তাবটি বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন,—কারণ ইহাই বাংলা দেশের সাহিত্যবিষয়ক একমাত্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, যার প্রতি জনসাধারণের আস্থা আছে। রবীন্দ্রনাথও অনেক কাল ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

জনৈক প্রখ্যাতনামা কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মবৎসর হইতে "রবি-অব্দ" প্রচলনের পক্ষপাতী,—কাগজে এ'রূপ প্রকাশ। প্রস্তাবটি কার্য্যকরী নয় শুধু এই কারণেই যে, এরূপ অব্দ —[illegible] না। বাংলা দেশের এমনি বহুতর "অব্দে"র উল্লেখ পত্রিকায় রহিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু একমাত্র খৃষ্টাব্দ ও বঙ্গাব্দ ব্যতীত অন্য সবকয়টিই দেশে অচল। ইংরেজী সনের আমাদের দরকার মামলা-মকদ্দমা, ব্যবসায় ও সরকারী কাজের খাতিরে; বঙ্গাব্দের আবশ্যক বাঙালীর পূজা-পার্ব্বণ, জন্ম, বিবাহ প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মের তাগিদে। বাকী সবকটি সাল ও অব্দই নিরর্থক ও অবান্তর। প্রস্তাবিত 'রবি-অব্দ' শুধু পাঁজি-পুঁথিতেই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে মাত্র।

সেদিনকার কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত শোক-সভায় দুইটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। তার একটি ছিল—রবীন্দ্র সাহিত্য প্রচারকল্পে কবির রচনার অনুবাদ প্রকাশ এবং কবির প্রামাণিক জীবনী রচনা। অপরটি ছিল—রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপযুক্ত পন্থা নির্দ্দেশ। রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচার ব্যাপারে মুখ্যতঃ বি[illegible]-ভারতী গ্রন্থালয়েরই অবহিত হওয়া আবশ্যক, কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব লেখার স্বত্ব বর্ত্তমানে বোধ হয় একমাত্র বিশ্বভারতী কর্ত্তৃকই সংরক্ষিত। ইহারই আনুকূল্যে প্রকাশিত শ্রীযুত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্র-জী[illegible]নী উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ; কিন্তু বর্ত্তমানে উহা অ[illegible] অবস্থায় আছে, কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ১৩৪৩ [illegible]ের পরবর্ত্তী কোন কথা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বইখানিকে শেষ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। তবে কবিগুরুর সাহিত্য-জীবনের পরিচিতি হিসাবেই ইহা মূল্যবান। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারাবাহিক ইতিহাস এ যাবৎ কোন লেখকই রচনা করেন নাই। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলায়' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অনিবার্য্য কারণে অনেক কথাই এড়াইয়া গিয়াছেন। শুধু কাব্যালোচনা নয়—কবির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানা জীবন-চরিতের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এ কাজে ক্ষমতাশালী লেখকগণের এখনই ব্রতী হওয়া উচিত। তাঁর সমসাময়িক আত্মীয় বন্ধু ও অন্তরঙ্গ এখনো আমাদের মধ্যে বিদ্যমান যাঁরা এ জীবনী-রচনার উপকরণ জোগাইতে সমর্থ হইবেন

বিশ্বভারতী সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সম্বন্ধে একটা ক[illegible] আমার বার বার মনে হইয়াছে—যার সহিত হয়

অনেকেরই মতের মিল না-ও হইতে পারে। ইহা অবশ্য অবিসংবাদিত যে, রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবনের বিশিষ্ট ও মুখ্য একটা ধারা এই বিশ্বভারতীরই মাঝে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের সংস্কৃতিগত মহামিলনের যে স্বপ্ন দ্রষ্টা ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ জীবনভর দেখিয়া আসিয়াছেন, বিশ্বভারতীতে তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন তার রূপ ও প্রাণ। তাকে সক্রিয় ও জীবন্ত রাখিবার ভার উত্তরাধিকার সূত্রে সমগ্র জাতির উপরই বর্ত্তিয়াছে। কিন্তু ইহাতে চিন্তনীয় ও করণীয় বিস্তর কিছু আছে। প্রতিষ্ঠান বিশেষকে জীয়াইয়া রাখিবার মত অর্থের সংস্থান দুরূহ নয়। কিন্তু ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক কার্য্যকারিতা ও মূল্য এবম্বিধ বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি না থাকে, তবে তাকে অক্ষয় করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা নিরর্থক। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের আওতায় যে জিনিষকে দাঁড় করানো সম্ভবপর হইয়াছিল, তাঁর অবর্ত্তমানে তাকে পূর্ণ গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই শুধু পর্য্যাপ্ত নয়, তার একটা নিজস্ব বাজার-দরেরও বিধিব্যবস্থা করা দরকার—যা অভিভাবক ও ছাত্র সম্প্রদায়কে ইহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারে। অর্থ-সমস্যার দিনে অর্থনৈতিক এ দিকটা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পক্ষান্তরে বিশ্বপ্রেম-মূলক যে আদর্শের অনুপ্রেরণায় বিশ্বভারতীর পত্তন, জগৎ আজো তাকে ব্যাপক রূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই—তার পরিপন্থী অবস্থা যে বিশ্বসভ্যতায় আজো যে অটুট রহিয়া গিয়াছে, আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসই সে সাক্ষ্য দিবে। তাদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচাইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের ছিল, কিন্তু সাধারণ স্তরের লোকের আদর্শের প্রতি অমন ধারা অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রত্যয় নাই। বিশ্বভারতীর ভিত্তি দৃঢ়তর ও অক্ষয় রাখিতে হইলে আবশ্যক দুটি জিনিষের, প্রথমতঃ, ইহার সহিত অনন্যসাধারণ কোন ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ সংযোগবিধান; দ্বিতীয়তঃ রাজশক্তির পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা। শেষোক্তটির জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সহিত সুনির্দ্ধারক একটা মীমাংসার এবং ব্যবস্থাপক পরিষদের যোগে যথোপযুক্ত আইন-কানুন বিধি-বদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষের এবং দেশের নেতৃস্থানীয় সুধী সম্প্রদায়ের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সব প্রসঙ্গ অবশ্য গৌণ। মুখ্যতঃ আমার বক্তব্য এই যে, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথেরই স্মৃতি রক্ষা করিতে গিয়া একমাত্র বিশ্ব-ভারতীর স্থায়িত্ব সম্পর্কীয় আন্দোলন ও প্রচেষ্টাকেই যদি চরম মনে করিতে হয়, তবে ব্যাপারটা "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজারই" নামান্তর হইয়া দাঁড়াইবে। সমগ্র বাংলা তথা ভারত রবীন্দ্রনাথের নিকট চিরন্তনরূপে ঋণী রহিয়া গিয়াছে, তাঁর সৃষ্ট কাব্যের, রসের ও সাহিত্যের জন্য,—তাঁর প্রচারিত সর্ব্ববিধ গতানুগতিকতার পরিপন্থী সুমহান্ ভাব ও আদর্শের জন্য। এ ঋণভারের কিছুটা জাতিকে পরিশোধ করিতে হইবে—বিশ্বভারতীকে সঞ্জীবিত ও অক্ষয় রাখিয়া। এ তার কর্ত্তব্যের ও ব্রতের সামিল; সুদিনে ও দুর্দ্দৈবে স্বজনের গচ্ছিত ধন-সম্ভারের ন্যায় এ প্রতিষ্ঠানকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু স্মৃতিরক্ষা ব্যাপারটা একান্তভাবে স্বতন্ত্র একটা জিনিষ, তার স্বতন্ত্র একটা রচনা ও পদ্ধতি আছে, যা জাতিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাতে চাই জাতির নিজস্ব এবং স্বপরিকল্পিত কিছু দান, যে পরিকল্পনার মাঝে রহিয়া গিয়াছে অন্তরে তার কবির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধার ও প্রীতি-ভালবাসার সুনিবিড় ছাপ। এ হিসাবে বিশ্বভারতীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যতীতও আমাদের হয়ত আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে।

কলিকাতা মহানগরীর সহিত রবীন্দ্রনাথ আজীবন অবিচ্ছেদ্য রূপে বিজড়িত ছিলেন। ইহাই ছিল তাঁর শৈশবের ও বাল্যের লীলানিকেতন; এখানেই তাঁর প্রতিভার প্রথম উন্মেষ ও সম্যক বিকাশ; এখানেই তাঁর পরিনির্ব্বাণ। এদিক দিয়া কবির স্মৃতিরক্ষা সম্পর্কে পৌরজনের বিশেষ একটা দায়িত্ব আছে, যার ভার তাঁদের পক্ষ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনেরই গ্রহণ করা সমীচীন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে রবীন্দ্রনাথের নামে সহরের কেন্দ্রস্থলে কোন পার্ক বা প্রমোদোদ্যান সংস্থাপিত হইতে পারে, যেখানে তাঁর জীবনপ্রতিম মর্ম্মর মূর্ত্তি রক্ষিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে যে স্থানটিতে তাঁর নশ্বর দেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে, তথায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ

নির্ম্মাণেরও ব্যবস্থা করা উচিত। এরূপ একটা স্মৃতিস্তম্ভের পরিকল্পনা গোড়া হইতেই ছিল শুনিয়াছি। কবির স্মৃতিদীপশিখা চিরপ্রোজ্জ্বল রাখিবার অন্যতম উপায়—স্থায়ীরূপে তাঁর রচিত কাব্য, সাহিত্য ও ভাবধারার আলোচনার ও পঠন-পাঠনের সুবন্দোবস্ত করা, যাতে দেশের তরুণ ও যুবক সম্প্রদায় কাল নির্ব্বিশেষে তাঁকে নিবিড় রূপে চিনিবার সুযোগ পায়, তাঁর মহান্ ব্যক্তিত্ব অন্তরে তাদের স্ফুটতর হইয়া উঠে। ইহা সম্ভবপর যদি বঙ্গদেশের বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে বাংলা সাহিত্যের বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-যুগ সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যাপনার ও প্রশ্নপত্রের প্রবর্ত্তন হয়। পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যও ইহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় রচনায় সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে, কারণ নূতন এই অধ্যাপনার বিধিব্যবস্থার ফলে সমসাময়িক লেখকগণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ও রবীন্দ্র-জীবনের বিশদ আলোচনায় ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হইবেন নিঃসন্দেহ। নূতন কোন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি অর্থসাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু নূতন কোন বিষয়ের অধ্যাপনার ও পরীক্ষা গ্রহণের প্রচলন হয়ত সর্ব্বক্ষেত্রে তা নয়। এজন্য প্রয়োজন শুধু কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে রাজী করাইবার জন্য অনুকূল জনমত সৃজনের। দেশের নেতাগণ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং সংবাদপত্রসেবীদের সমবেত আগ্রহে ও চেষ্টায় এ আন্দোলন সম্যক সফল হইয়া উঠিতে পারে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ দেশের ভাবজগৎ ও চিন্তাজগৎ যে মহামানবের অলোকসামান্য মনীষার আলোকে দীপ্ত হইয়া আসিয়াছে, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যিনি বাঙালী তথা ভারতবাসীর অন্তররসের, আনন্দের ও প্রেরণার পূত মন্দাকিনী ধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁর স্মৃতি রক্ষার পরিকল্পনায় তাঁরই মানস কন্যা বিশ্বভারতীর দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য সুনিশ্চয়, কিন্তু ইহারও অতিরিক্ত আরো কিছু করণীয় আমাদের আছে। এ প্রবন্ধে তারই একটা ইঙ্গিত করিলাম মাত্র।

ভাববিলাসী বলিয়া আমাদের একটা অপবাদ আছে, যার অর্থ শুধু এই যে, কথায় আমরা যতটা পটু, কাজে ততটা নই। বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, হেম, নবীন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল অথবা শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে কোন স্মৃতিরক্ষার সুব্যবস্থা বাঙ্গালী আজও করিতে পারে নাই, যাকে লইয়া জাতির আত্মপ্রসাদ করা চলে। যাঁর লোকোত্তর প্রতিভা এবং একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধনা বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, অন্ততঃ সেই রবীন্দ্রনাথের বেলায় যাতে তার ব্যতিক্রম ঘটে তৎপ্রতি দেশবাসীর লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন আছে।

কাঁচা মাটি

(গল্প)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

সতু-যতুদের মামা দীননাথ হাজরা স্বদেশী-টদেশী বিশেষ ভাল বাসিতেন না, বলিতেন, 'এগুলো হয় একটা হুজুগ, না হয় মাথা ঠোকাঠুকি।' প্রমাণস্বরূপ তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে নজির তুলিতেন—"আমরাই এককালে স্কুল-কলেজ ছেড়ে সাহেব দেখলেই ইটপাটকেল ছুড়েছি—সুরেন বাড়ুয্যেকে কাঁধে তুলে সারা সহরময় ঘুরেছি, আবার দেখ আমরাই এখন—।" কাজেই সতুরা যাহাতে ঐ হাঙ্গামায় জড়াইয়া না পড়ে সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেন। কারণ ভবিষ্যতে নাকি সতুরা জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট না হোক চাকরী-বাকরী একটা তাহাদের করিতেই হইবে, অতএব ভাল মনে পড়াশুনা করাই ভাল।

স্বদেশী যে কি জিনিষ তাহা সতু-যতুরা তেমন বুঝিত না, তবে মাঠে যদি শিরাজী সাহেব কিংবা কুলগুপ্তের বক্তৃতা থাকিত তবে তাহারা একটু উসখুস করিত। শিরাজী সাহেব যখন বিরক্তির সঙ্গে বলিতেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করতে হলে দেশনেতার হতে হবে বিশ্বাসঘাতক, তাকে এমন দলে যোগ দিতে হবে যারা এই দুই সম্প্রদায়ের শরীরের রক্ত নিয়ে পাগড়ী ছুপিয়ে রাখে। তাদেরই উস্কিয়ে দিয়ে এমন ভাবে আঘাত করতে হবে যাতে এই বন্ধনটা সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়ে উঠবে, বন্ধনটা হয়ে উঠবে তখনই আরও দৃঢ়, বিবাদের মোড়টাকে দিবে ঘুরিয়ে। তখন হাত-তালির শব্দে কানে তালা লাগিত।

সতু যতুকে বলিত—বুঝলি ?

যতু ঘাড় নাড়িয়া বলিত—'উহু'

'ঐ পুলিশদের সম্বন্ধে বললে—

যতু খুশী হইয়া উঠিত।

কুল গুপ্ত বক্তৃতা দিতে উঠিয়া প্রথমে বলিলেন—আমরা প্রথম ভাগে পড়েছি, গৌরকায়, চৌর ধায়, এখন জীবনের প্রান্তে এসে দেখছি ঠিকই তাই।

একটা হাসির হররা ছুটিল।

যতু সতুকে জিজ্ঞাসা করিল 'সাহেবদের সম্বন্ধে বলল বুঝি ?'

সতু তখন কুল গুপ্তের বক্তৃতা শুনিতেছে—'আর আমাদের অবস্থা খৈ খাই, দই নাই।'

স্বদেশীতে যোগ দেওয়া তাহাদের এইটুকু পর্য্যন্তই। ইহার বেশী অগ্রসর হইতে ভাল লাগিত কি না তাহাও ভাবিয়া দেখে নাই, কারণ মামাকে তাহারা ভয় করিত মনে প্রাণে।

মামা মামীমাকে বলিলেন, "একটা গণ্ডী করে দাও অর্থাৎ সকালবেলা পড়বে বাজার করবে, তার পর স্কুলে যাবে, বিকালে ফুট-ফরমাইস খাটিয়ে 'এনগেজড্' রাখবে, খেলতে যেতে দেবে না।"

হাজরা মহাশয় সপ্তাহে দুই দিন থাকিতেন বাহিরে কার্য্য উপলক্ষে, কাজেই স্ত্রীর উপর তার অনেকখানি ভরসা রাখিতে হইত।

সতুদের মামীমার বয়স খুব বেশী নয়। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে পুলিশও যেমন দুই-একটাই দেখিয়াছেন, গান্ধী-টুপীপরা স্বদেশীওয়ালাও তেমনই দুই-চারিটির বেশী দেখেন নাই। পল্লীগ্রামে যেমন অসঙ্কোচে পুলিশের নিন্দা করিতে পারা যায়, তেমনি স্বদেশীওয়ালাদের সুখ্যাতি গাইতেও গলা খাটো করিতে হয় না। এইরূপ পরিবেশের মধ্যেই চারুপ্রভা এতখানি বড় হইয়াছে, কাজেই তাহার মন স্বদেশীওয়ালাদের দিকে একটু ঝুকিয়াই পড়িয়া ছিল অর্থাৎ যখন তাহারা 'বন্দে মাতরম' করিয়া পথ দিয়া যাইত, তখন চারু জানালা খুলিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। চারু হাজরা মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, সে ইচ্ছা করিলে যে স্বামীর আদেশ রদ না করিতে পারত তাহা নয়, তবে চারুর কাছে স্বামী দেবতা।

দীনু বোঝাইতেন—এই স্বদেশীপনাটা একটা সোনার

হরিণ বুঝেছে, এতে সোণা থাকলেও প্রাণ নেই, এই জনতায় উদ্দীপনা আছে, জীবন নেই—স্বদেশী হুজুগ আছে স্বদেশ-প্রেম নেই—কাজেই—'

চারু বলিল—তোমার যত কথা, মহাত্মা আছেন, নেহরু আছেন—

যতু দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—শিরাজী সাহেব, ফুলবাবু এরাও ত আছেন—

দীনু যতুকে ঠাস করিয়া এক চড় কসি: বলিলেন—ও: আমি বাড়ী না থাকলে তোমাদের সব করা হয় কেমন ?'

স্কুলে যাইবার সময় যতুকে সতু খুঁজিয়া পায় না। খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে গোয়াল ঘরে যাইয়া দেখিল, যতু তকলিতে সুতা কাটিতেছে। খবরের কাগজে মোড়া পেঁজা তুলা জড়ান, আর একটা কাঠিতে কতগুলি সুতা জড়ান। তকলিটা সুতার ভারে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।

যতু বলিল, "দেখতো দাদা, দু-খানা কাপড় করতে আর কতটা সুতা লাগবে ? দু-খানা কাপড় তোর আর আমার—কেমন মজা হবে নিজের তৈরী কাপড় পরব —হিঃ হিঃ হিঃ—"

"বুনোবি কোত্থেকে ?—"

"সে আমি ঠিক করেছি—সমরেশ বাবু বলেছেন, তিনি তৈরী করে দেবেন।

"সর্ব্বনাশ সমরেশ বাবুর সঙ্গে মিশিশ না কিন্তু—মামা বারণ করে দিয়েছেন, ওঁর কাছে নাকি গোলাগুলি আছে—"

"মামা জানলে ত," যতু ঘাড় নাড়িয়া বলিল।

"জানবে নিশ্চয়ই, তা'লে আর পিঠের চামড়া থাকবে না।"

"বা রে, তবে কে করে দেবে ?"

"সে দেখব'খন, তুই এখন চল ত স্কুলে।"

চারিদিকে বন্দেমাতরম ছড়াইয়া পড়িয়াছে—বাড়ীতে বাড়ীতে লবণ তৈয়ার করিবার জন্য গোপনে চেষ্টা চলিতেছে, গ্রামে গ্রামে তালগাছ কাটিয়া ফেলিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ভদ্রলোক কুঠার লইয়া ছুটিতেছেন। সকলেই বুঝিয়াছে, তাড়ি খাইবার মত পাপ আর নাই, কিন্তু তবু তালগাছ না কাটিলে তাহারা সংযমী হইতে পারিতেছে না। তাই এই অভিযান। ছেলেরা স্কুল ছাড়িয়া পিকেটিং করিতে চলিয়াছে। মহিলারা সুদৃশ্য খদ্দরের শাড়ীতে বিদেশী সুগন্ধ মাখিয়া ছেলেদের প্রেরণা জোগাইতেছেন। বৃদ্ধ রমাপতি বসু মহাশয় তাঁহার একটানা পঞ্চাশ বৎসরের অভ্যাস গাঁজায় টান একবেলা না মারিয়া গাঁজাখোরদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন, গাঁজা না খাইলেও চলে। এক মাড়োয়ারীর গদী হইতে বিদেশী কাপড় টানিয়া বাহির করিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইল। পথে ঘাটে বিড়ির দোকান হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল। নেশা যদি না-ই ছাড়িতে পারা যায়—ছাড়িও না—তবে বিড়ি খাও—খুব বেশী করিয়া খাও, ধুমপায়ীরা ইহাই রটাইয়া দিল।

সতু-যতু রাস্তাঘাটে এই সব দেখে, কিন্তু কোথায়ও দাঁড়ায় না। তাহাদের স্কুলে যাইতেই হয়! আর লুকোচুরি করিয়া স্কুলে যাইতে তাহাদের মন্দও লাগে না। এ যেন এক প্রকারের কাণামাছি খেলা। পিকেটারদের সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা করিয়া যাহারা স্কুলে যাইয়া থাকে—সতুরাও তাহাদের দলে; নষ্টচন্দ্রায় চুরি করিলে যেমন পাপ হয় না, পিকেটারদের ফাঁকি দিলেও যেন তেমনই আনন্দ পাওয়া যায়। পুলিশ লব কথাটি শুনিলেই পিছনে ধাওয়া করে এবং নিষিদ্ধ [illegible]কের তল্লাসে বাড়ী বাড়ী ঘেরাও করিয়া দাঁড়ায়। দীনু বার বার চারু ও সতুকে উপদেশ প্রয়োগ করিতেছেন।

সতুকে সেদিন বলিলেন—ঐ হারাণের সঙ্গে বেড়িও না—

"কেন, হারাণত আমাদের ক্লাসের ফাষ্ট বয়।"

সতু মহাভারত পড়িতেছিল বইটি বন্ধ করিয়া জবাব দিল। সে কোন ক্রমেই স্বদেশীর দিকে ঘেঁসেনা তবুও, মামার এত সন্দেহ ভাল লাগে না।

দীনুবাবু রাগিয়া বলিলেন, "তা সে যে বয়ই হোক, ও ছোঁড়ার কাকা এরই ভেতর দু-বার জেল খেটেছে।"

কথা বলিতে বলিতে দীনুর নজর গেল সতুর মহাভারতের ভিতরে—আর একখানা বই লুকান দেখা

যাইতেছে যেন। দীনুবাবু ছোঁ মারিয়া বইখানা টানিয়া বাহির করিয়া দেখেন—গীতা—

"গীতা কোথায় পেলি?"

"আমি কিনেছি—"

দীনুবাবু রাগিয়া বলিলেন—"কিনেছিস্, ওরে হারামজাদা কিনেছিস,—কেন কিনেছিস্।"

দীনুবাবু ভাবিতেই পারেন নাই সতু স্বীকার করিবে সে বই কিনিয়াছে। লক্ষ্মীছাড়াটা যদি বলিত কুড়াইয়া পাইয়াছে তবে সতুর মহাভারত এমন কি অশুদ্ধ হইত? না, সতুর স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে, সে অন্যায় স্বীকার-করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না গুরুজনের সম্মুখে!

সতু তখন বলিতেছে,—"আমাকে 'বিশ্বরূপ দর্শনটা' আবৃত্তি করতে হবে কিনা তাই—"

"বলি সে সবে তোদের এত বালাই কেন, ঐসব হিংস্রুটে বই বাড়ীতে রাখিস—তোরা কি আমার হাতে দড়ি না দিয়ে ছাড়বিনা না কি?"

শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, আকাশে মেঘ জমাট হইয়াই আছে, থাকিয়া থাকিয়া সজোরে বৃষ্টি আসিতেছে। পথঘাট কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে, ধরিত্রী দেবী যেন গলিয়া পচিয়া একরকম নির্বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

যতু চোরের মত কোথা হইতে বাড়ী ফিরিল,—হাতে একজোড়া আনকোরা খদ্দরের কাপড়।

"দেখ্ দাদা, দেখেছিস আমারই তৈরী সুতোর কাপড়—এইখানা তোর এইখানা আমার, কেমন?"

"তুই বুঝি সমরেশবাবুর কাছে গিয়েছিল" সতু কহিল।

যতু একটু আমতা আমতা করিয়া বলে—"না, হ্যাঁ, দেখ্ সমরেশবাবুর কাছেই—আমি তাঁকে বল্লুম দেখুন, আপনার সঙ্গে আমি মিশবও না, দাদাও বলব না, কিন্তু আপনি আমার কাপড় তৈরী করে দেবেন, আমি দস্তুরমত আপনাকে পয়সা দেব। তা' সমরেশদা কাপড় বানিয়ে দিলেন পয়সা নিলেন না, বললেন, ভাইটি চিরকাল এমনই কাপড় তৈরী করে পর তা হলেই হবে। আমি তার সঙ্গে আর আলাপ করিনি—"

সতু যতুর চেয়ে কয়েক বছরের বড়, ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে। যতুর এই সরলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যায়। এ সংসারে তাহাদের গৌরব দেখিলে যাহারা গৌরব বোধ করিতে পারিতেন তাঁহারা আজ বাঁচিয়া নাই! মা অনেক আগেই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং যতুর বয়স যখন চার তখন বাবাও চলিয়া গেলেন। আজ যেন তাঁহারা আসিয়া সতুর অন্তরে স্থান করিয়া লইয়াছেন। সতুর দৃষ্টিতে এমন এক অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল যে, ঐ নির্ব্বোধ যতু পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেল।

তবু সতু যতুকে সাবধান করিয়া দিল, "যতু, খবর্দ্দার খদ্দরের কাপড় পরিসনে কিন্তু, মামা এসব পছন্দ করে না।"

সতু কাপড়টা নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, "ছাখ্ দাদা, সব তাতেই যদি মামা বকে তবে আমরা কি কিছুই করব না?"

সতু যেন অনেকটা মনস্তত্ত্ববিদ হইয়া পড়িয়াছে। সে যেন দিব্য দৃষ্টি দিয়া যতুর মনের বিদ্রোহ-ভাবটির স্বরূপ দেখিতে পায়। যতুর মনের এই ক্ষুব্ধতা তাহাকেও যেন বিপ্লবী করিয়া তোলে। যতু তখন নূতন কাপড় পরিতেছে। সতু কহিল, "এখন পারিসনে যতু, মামীমা দেখলে মুস্কিল হবে।"

যতু কাপড়টা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, রাগে সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করে—তবে কি আমি কাপড় পরতেও পারব না নাকি?

সতু নির্ব্বাক।

যতু হঠাৎ সমস্যার সমাধান করিয়া বলিল—দাদা, বাগানে গিয়ে পরিগে কেমন?

সতু বলিল—"যা,"

'তুই যাবিনে?'

'না, মামীমা ডাকবে হয়ত।'

'তবে আমিও পরব না,' যতু বাঁকিয়া দাঁড়াইল।

হঠাৎ সতু সচকিত হইয়া বলে, 'যতু, মামীমা আসছে, কাপড় লুকিয়ে ফেল।'

যতু তাড়াতাড়ি পুঁটলী করিয়া কাপড় দুইখানা

তাহাদের বইয়ের আলমারীর পিছনে লুকাইয়া ফেলিল।

কিন্তু চারু ভিতরে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিল, কোন একটা লুকোচুরি চলিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি লুকোলি দেখি।' বলিয়া সে নিজেই আলমারীর তলা হইতে কাপড় বাহির করিয়া দেখিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, —'কোথায় পেলি ?'

যতু সমস্ত আগাগোড়া বলিল।

'তা, তোরা লুকোলি কেন, পর তো দেখি ?'

সতু বলিল—'মামা বকবে যে।'

'তোরা পর না,' চারু আদেশের সুরে বলিল। সতু যতু উৎফুল্ল হইয়া কাপড় পরিতে লাগিল।

এমন সময় সামনের বিনোদবাবুর বাড়ীতে কিসের গোলমাল শোনা গেল, চারু বারান্দায় আসিয়া দেখে, বিনোদবাবুর বাড়ী পুলিশে ঘেরাও করিয়াছে। বিনোদ বাবুর ছেলেকে পুলিশে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তল্লাসীর ভাণ করিয়া পথের উপর বাক্স ডেস্ক আনিয়া তচনছ করিতেছে। মুহূর্ত্তে চারুর সাংসারিক বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তাইত সতুদের সে কিসের আস্কারা দিতেছে! চারু ঝড়ের মত ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের বলিল—কাপড় খুলে ফেল, তোরা কাপড় পুড়িয়ে ফেল।

সতু আর যতু মামীমার ভাবান্তরে বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চারু অধীর হইয়া বলিল—'কি বলছি তোদের কানে যাচ্ছে না, আচ্ছা বেয়াড়া তো তোরা—এই সব কাপড় পরে তোমরা স্বদেশী করবে কেমন ?'

সতু সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বদলাইয়া ফেলিল—যতু ইতস্ততঃ করিতেছিল, চারু তাহার পরিধান হইতেই টানিয়া খুলিয়া লইয়া গেল।

যতু কাঁদিল না, এক মুহূর্ত্তে সে যেন বুদ্ধিমান হইয়া উঠিল। সতুকে নির্ব্বাক দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল—'যাকগে, আমরা বড় হলে ওরকম কত কাপড় বুনতে পারব, না-রে দাদা।'

যেন যতুর কিছুই হয় নাই।

গভীর রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সতু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে —কিন্তু যতুর আর ঘুম হয় না; কেন যেন সে অস্বস্তি বোধ করিতেছে, ধীরে ধীরে দাদার পিঠ হাতড়াইয়া ডাকে। সতু বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুই এখনও ঘুমোসনি!"

"না ঘুমিয়েছিলাম; তুইও ত' ঘুমোসনি দেখছি, আচ্ছা দাদা, মামীমা কি সত্যি কাপড় পুড়িয়ে ফেলল।"

সতু রাত্রির এই অফুরন্ত অবসরে যতুর মনটা যেন খুলিয়া খতাইয়া দেখিয়া লইল। সতুর মনে হইল, যতুকে যেন কাহারা পিষিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। সতু হঠাৎ আবেগ বিক্ষুব্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—"যতু, খুব বড় হবি—এমন হতে হবে—যাতে কাউকে আর বড় বলে মানতে হবে না।"

যতু বোকার মত জিজ্ঞাসা করিল,—"কত বড়, কুলবাবুর মত।"

"দূর পাগল, ওতে হবেনা, শুধু স্বদেশী করলেই বড় হয় না। তাই যদি হত তবে পাশে দুই দুইটে মানুষ শিবাজী সাহেব আর কুল গুপ্ত থাকতে মামার মত এমন নিরীহ লোক বাস করতে পারত না। এমন বড় হতে হবে যার কথা না শুনে মানুষের আর উপায় থাকে না, যার কথার হুকুমে, চোখের আগুনে সব মানুষ কাছে এসে দাঁড়ায়; যার কথায় কোন ভুলচুক থাকে না, যার কথায় অমাবস্যাও পূর্ণিমা হয়ে যাবে।'

সতু একসঙ্গে এতকথা কোনদিন বলে নাই। আর এমনভাবে সে বলিতেও পারেনা। যেন অন্তরের এক নিরুদ্ধ আবেগের উৎস-মুখ বাধা-বন্ধনহীন হইয়া তীব্রবেগে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। সতু যদি এই সময় নিজকে একটু ভাবিত তবে সেও অবাক হইয়া যাইত।

যতু বলিল, "অত বড় কি করে হওয়া যাবে—"

"চল্, আমরা সামনের ঐ পাহাড়টায় চলে যাই—ঐখানে হয়ত অনেক সাধুসন্ন্যাসী আছে, কিংবা নাইবা থাকল তারা—আমাদের ভয় কিরে, আমাদের মা নেই, বাবা নেই, কেউ আমাদের জন্যে ভাববে না। আমরা বনে বনে ঘুরে বেড়াব, ফল-মূল খাব, মানুষের মুখ দেখবনা অনেকদিন, আর গাছপালা পশুপক্ষীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে যাব অনেক কথা, যা খুসী তাই—তারপর

একদিন বন থেকে বেরিয়ে এসে তপস্যার জোরে সব লোকদের ডেকে বলব—আমাদের কথা শোন সব মানুষেরা—"

"ধ্যেৎ তাহলেই বুঝি বড় হওয়া যায়—একি ম্যাজকি নাকি।"

সতুর দুর্দ্দমনীয় আবেগের সম্মুখে যতু হেন কঠিন সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"তুই বিশ্বাস করবিনে—যে যত নিজের সঙ্গে কথা বলতে পারে সে তত পরকে কথা শোনাতে পারে। তোর ত মনে নেই, বাবা একদিন মাকে এই কথা বলেছিলেন। জানিস্, বাবা খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন—তুই মনে করেছিলি—আমি নিজের মন-গড়া বলেছি।

"আচ্ছা যদি বলে বাঘ ভালুক থাকে?" "থাকলে তারা আমাদের খাবে, আমরা মরে যাব। তাতে ভয় কিরে, দেখিস্নি সেদিন ভোলাদা বি-এ পাশের খবর মামাকে দিতে আসতে পথে ইটের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে কেমন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। অমন হাসিখুসী ভোলাদা কেমন দেখতে দেখতে মারা গেল। আমরা বনে না গেলেও ত' অমনই মারা যেতে পারি।"

সতু যেন তাহার স্বর্গগত পিতার প্রতিনিধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সতুর কথা বলিবার ঝোঁক কাটিয়া গেলে, সে হঠাৎ বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া নিজের দিকে বারবার তাকাইয়া দেখিতে থাকে, নিজকে সে পরীক্ষা করিতেছে তাহার যেন বিশ্বাস হইতেছেনা সে নিজে সেই সতুই আছে কিনা। এমন রাত্রের অন্ধকারে কি করিয়া তাহার এমন আত্মঅচৈতন্য ভাব আসিয়া পড়ে আর বিদ্যুতের আলোতেই বা কেন সে স্বাভাবিক সতু হইয়া দাঁড়ায় তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

যতু শুইয়াছিল সে কহিল, "বুঝলি দাদা, আমার যেন মনে হল, এইমাত্র আমাদের ঘর থেকে বাবা বেরিয়ে গেলেন।"

সতুর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—ভয়ে নয়, কিন্তু কিসে তা সে জানে না।

যতু সতুকে কহিল—চল্ এই রাত্রেই বেরিয়ে পড়ি দাদা—

সতু বলিল—"কোথায়?"

"সেই বনে—"

ধ্যেৎ পাগল নাকি, আমি কি বল্লাম আর তাতেই তুই মেতে উঠলি!"

সতু যেন বিদ্যুতের আলোয় নিজের বুদ্ধিটাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে সতুর বিশ্বাসই যেন হইল না সে এতকথা বলিয়াছে।

বাহিরে তখন প্রবলবেগে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বৃষ্টির জল বাহিরের গাছপালা ঘরবাড়ীতে পড়িয়া এক তুমুল হট্টগোল জুড়িয়া দিল। পাশের ঘরে মামা নাক ডাকাইতেছেন। মামীমা সশব্দে দুয়ার জানালা বন্ধ করিতেছে। পরে তাহাদের ঘরের দরজায় মামীমা আসিয়া বলিলেন—সতু, তোরা এত রাত্রে আলো জ্বেলে কি করছিস্; দোরটা খোল্ত একটু—

চারু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"শিয়রের জানালাটা দিয়ে দে, বৃষ্টির ছাঁট লাগবে।"

চারু সেই খোলা জানালা দিয়া একবার বাহিরে তাকাইয়া দেখিল ঘন কালিমাখা আকাশ, যেন এই আকাশে আর কোন রঙ ছিলনা কোনদিন। পরক্ষণেই তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে যতুর তৈরী কাপড় বাহির করিয়া যতুকে দিয়া কহিল—এই নে তোদের কাপড় বাক্সে ভাল করে তুলে রাখ, এবার পূজোর সময় যখন বাড়ী যাবি তখন সেখানে গিয়ে পরিস—

যতু বিস্মিত হইয়া বলিল---"তুমি পোড়াওনি কাপড়, মামীমা?"

"দূর পাগলা সবজিনিষই কি পোড়ানো যায় রে। তোর মামা বলছিল কি জানিস্! তোর এ কাপড়খানা নাকি তুই কেঁদে ভিজিয়ে রেখেছিস—তাই এ পুড়বে না। যে জিনিষে তাপ নেই সে জিনিস আগুনে পোড়ে না—"

যতু হাসিয়া বলিল—না মামীমা, আমি ত একটুও কাঁদিনি! আর তা ছাড়া কাপড় একটু শুকিয়ে নিলেই হ'ত—বৃষ্টির ভেতর এসেছিলাম কি না তাই ভেজা ছিল।

চারু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"যাক্ তোরা রেখে দে।"

চারু নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

যতু সতুকে বলিল, "মামার চেয়ে মামীমাই ভাল না রে?"

যতু কাপড়জোড়া রাখিবার জন্য তাহাদের ভাঙা টিনের তোরঙ্গটি খুলিতেই দুটি তেলেপোকা উড়িয়া বাহির হইল।

"মনে করিস ত দাদা, কাল ন্যাপথোলিন আনতে হবে।"

স্কুলে আজ জোর পিকেটিং চলিতেছে। ভলান্টিয়ারেরা স্কুলে ঢুকিবার কোন পথই আর বাকী রাখে নাই। ভলান্টিয়ারের সাদাটুপী আর পুলিশের লাল পাগড়ী মিলিয়া সে এক অদ্ভুত শোভা। কিন্তু বৈচিত্র্য কিছুই নাই। একদল আসিয়া পিকেটিং করিতেছে আর পুলিশবাহিনী পাইকারী হিসাবে গ্রেপ্তার করিয়া সত্যাগ্রহীদের স্রোত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বৃথাই বাঁধন কষাকষি—পদ্মা আজ কীর্ত্তিনাশা। স্কুল বন্ধ থাকিলে যে এমন কিছু বড় কাজ হইবে তাহা নয়—তবুও সহরের সমস্ত লোক এখানেই আসিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আজ আর কেহ দর্শক নাই, সব ভলান্টিয়ার, কাহারও পুলিশের লাঠিতে মাথা ফাটিতেছে, কাহারও বা পিঠে পড়িতেছে কালো দাগ।

এমন সময় কুলবাবু তাঁহার ছেলে নান্তকে সঙ্গে লইয়া সেখানকার ভলান্টিয়ারদের ইন্‌চার্জ্জকে বলিলেন, "দেখুন নান্তকে স্কুলে যেতেই হবে, কারণ ও ষ্টাইপেণ্ড পায়—স্কুলে না গেলে ৩০৲ টাকা ষ্টাইপেণ্ডটা কাটা যাবে—বুঝতেই ত পারেন গবর্ণমেণ্ট স্কুল!"

ইনচার্জ্জ মহাশয় মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, কংগ্রেসের একনিষ্ঠ চাঁদা-দাতা ও প্রবীণ বক্তা শ্রীযুক্ত কুলবাবুর কথার প্রতিবাদ না করিতে পারিয়া মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন।

কুলবাবু তখন ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন—"কিন্তু নান্তকে যেতেই হবে—আর মহাত্মা কি বলেছেন জানেন, সত্যাগ্রহীরা কারও উপর জুলুম করবে না, আপনারা সত্য-ভ্রষ্ট হলে আমরা আপনাদের মানব কেন।"

বন্দেমাতরমে দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। কুলবাবুও বন্দেমাতরম বলিলেন। পুলিশেরা লাঠি উঁচাইয়া বলিতেছে 'এই বোলো মাত।' বাস্তববিজ্ঞানীরা এতদিনে প্রহ্লাদোপাখ্যানকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিল।

ইনচার্জ্জ মহাশয় অগত্যা একজন পিকেটারকে একটু সরাইয়া দিলেন, যাহাতে একটি লোক মাত্র যাইতে পারে। কিন্তু চক্ষের নিমেষে একটি ছোট ছেলে কুলবাবুর দুই পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া স্কুলের ভিতর দৌড়াইয়া গেল। কুলবাবু বিরক্তির সঙ্গে দুই পা পিছাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা ঝানু ছেলে ত।" যাহা হউক কুলবাবু হয় ত প্রথম ভাগের 'বেণী বড় দুরন্ত ছেলে'র কথা মনে করিয়া নান্তকে ডাকিয়া ঢুকিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁহার সামনে পথ আটকাইয়া শুইয়া পড়িল সতু। সতু ভাবিয়া দেখিল না মামার শাসন, ভাবিল না ভবিষ্যতের কথা। সতু বিরক্ত হইয়া পিকেটিং করিতে বসিয়া গেল। দেশপ্রেমও কি পক্ষপাতিত্ব ঘেঁসিয়া চলে?

কুলবাবু তাহাকে ধমকাইয়া বলিলেন—"এই ছোকরা, তোমার গান্ধীক্যাপ কোথায়?"

কিন্তু সতুর নূতন স্বরে যে বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারিত হইল তাহাতে সমস্ত ভলান্টিয়ার কুলবাবু ও ইনচার্জ্জ মহাশয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত্তে সতু নায়ক হইয়া উঠিল। সে যেন সকলকে দেখাইয়া দিল, এমনি করিয়া লুকোচুরির অন্যায় এই সত্যাগ্রহীর অন্তর বহিয়া অনুক্ষণ চলিতেছে। সতু পিকেটারদিগকে বলিতে লাগিল "আমার মাথায় গান্ধীটুপী নেই, কারণ আমি দেশপ্রেম বুঝি না, কিন্তু আমি বুঝি যে কাজটা আপনারা করতে চলেছেন তার ভেতর এমন ভাবে ফাঁকির চাবিকাটি আপনাদের নেতার হাতে জমা করে দিয়েছেন কেন? আপনাদের সঙ্গে আমার কোন সহযোগ নেই, কিন্তু আপনাদের এই অন্যায় করার উত্তেজনার সঙ্গে আমার অসহযোগ আছে।

কুলবাবু ও ইনচার্জ্জ মহাশয় এই ছেলেটার কথায় এতগুলি লোকের মধ্যে ঘামিয়া উঠিলেন এবং কুলবাবু প্রায়

বিয়াই গেলেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এই ডেঁপো ছোড়াটিকে বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না, অথচ পুলিশেরা এখনও ইহাকে সহিয়া যাইতেছে। তিনি নিতান্ত অভিমানেই পুলিশ অফিসারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কী মশায়, এখন বুঝি আপনাদের শান্তি ভঙ্গ হয় না কেমন, যত দোষ কেবল আমাদের বেলাতেই! হুঁ, জানি, জানি—"

পুলিশ অফিসারটি কুলবাবুর কথায় বোধ হয় একটু বিস্মিত হইলেন—কারণ ঐ ছেলেটার ভিতর যতটা পরিণত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এই ভদ্রলোকের কথা বলার ভেতর ততখানিই ছেলেমী প্রকাশ পাইতেছে। পুলিশ অফিসারটি ঐতিহাসিকের মত ভাবিতে লাগিলেন, ইহাই কি গান্ধীযুগ? কিন্তু ঐতিহাসিক পুলিশ অফিসারের হুকুমে অবশেষে সতুকে 'প্রিজনভ্যান' এ চাপিতেই হইল, তুমুল শব্দে বন্দেমাতরম ধ্বনিত হইল। কুলবাবু নান্তুকে লইয়া স্কুলে ঢুকিবার জন্য পুনরায় পা বাড়াইলেন।

যতু ভাবিতেছিল—দাদা কুলবাবুর চেয়ে অনেক বড়; যতুর আনন্দ হইতে লাগিল, দাদা দশজনের সামনে কেমন বক্তৃতা দিয়া গেল, দশটা লোকে তাহার কথা শুনিল মন দিয়া। কিন্তু যতুকে দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। সে ছুটিয়া বাড়ী আসিয়া মামাকে খবর দিল।

মামা ত খবর শুনিয়া লাফাইয়া চীৎকার করিয়া আয়না চিরুণী ভাঙিয়া চুরিয়া রাগিয়া আগুন হইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

যতু কিছু বলিল না, ধীরে ধীরে তোরঙ্গটি খুলিয়া কাপড় জোড়া বাহির করিয়া একবার তাহার দিকে চাহিল, তারপর উঠানে আসিয়া হঠাৎ তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল।

চারু পাড়ার কালোর পিসীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল—বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কি করলি রে—

যতু বলিল—মামীমা বড় হতে হবে, অনেক বড়, এমন বড় হব যে খদ্দর পুড়ে গেলেও আমি বড়ই থাকব, কুলবাবুর মত খদ্দর পরে বড় হব না।

কালোর পিসী বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন—ছেলেগুলো সব বুড়োমীর অবতার হয়ে উঠেছে, আমাদের কালোটাও অমনি—

কিন্তু চারু তখন দেখিতেছে, কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছেলেটার মনেও আগুন ধরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ আগুনে উত্তাপের চেয়ে জালাই যেন বেশী।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র, এম-এ

হে ধরণী! শরতের প্রথম প্রভাতে
শ্যামল সহাস স্নিগ্ধ তৃণে তৃণে পত্রে পত্রে
বনানীর লতায় লতায় জানি তব
অশ্রুজল পড়িবে গড়ায়ে।
এমনি সে একদিনে—
ভুলে গেছ আজ তুমি,
তোমার বেদনা দিয়ে যে কবিরে এনেছিলে ডাকি
তৃষিত জীবনে তব বাজাতে মধুর,
দৈন্যহীন, দ্বিধাহীন, ক্লান্তিহীন সুর—
সে আজ গিয়াছে চলি,
তোমার মিনতি শত উপেক্ষায় দলি
অমরার রূপলোকে—জীবনের তীরে,
মৃত্যুর প্রাচীর যেথা শঙ্কার শৃঙ্খল পরি
স্তব্ধ হয়ে রয় নতশিরে।
কেমনে ভুলিবে তারে
আপনার রূপে রসে দিনে দিনে যারে
গড়িলে অক্ষয় করি,
জীবন-দেউলে তব
বাজিছে আজিও বাঁশী যার,
বিস্মৃতি আপনি যারে সঁপিয়াছে অর্ঘ্য দেবতার।

কবি ও কাব্য

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষীরোদ ভট্টাচার্য্য

মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতির সহিত সাহিত্যের ক্রমাভিব্যক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাগর অভিমুখে প্রবাহিত নদী যেমন ক্রমশঃ বিস্তৃত ও গভীর হইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, তেমনি ক্রমবিস্তৃতির সহিত সাহিত্যও বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হয়। আমাদের চিন্তা ও ভাবধারা চিত্র, গল্প, নৃত্য, গীত, গদ্য, পদ্য, কাব্য এবং দর্শনের ভিতর দিয়া বহুমুখী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্য তাই মানুষের ভাব-বৈচিত্র্যের একটি ব্যঞ্জনামাত্র—সাহিত্যর অন্যতম শাখা। "যুগ পরম্পরায় প্রবাহিত মানবের প্রকৃষ্ট চিন্তা ধারার লিপিবদ্ধ ইতিহাসের নামই সাহিত্য।" (ইমারসন)।

সভ্যতার আদিম যুগ হইতে প্রকৃষ্ট চিন্তাগুলি ও জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী মানুষ ছন্দে গাঁথিয়া রাখিত। দার্শনিক তত্ত্ব, সমাজ-রীতি ও সংসারের সুখ-দুঃখের কাহিনীগুলিও ছন্দে গ্রথিত দেখিতে পাওয়া যায়। জনসমাজে ছন্দের স্বচ্ছন্দ গতি-সঞ্চারেই এইগুলির আবৃত্তি সুললিত ও মাধুর্য্যময় হইয়া উঠিত। কিন্তু কাল-প্রবাহে কাব্য-রসধারা অন্তর্নিহিত শক্তির প্রাচুর্য্যে ও বৈচিত্র্যে নিজস্ব পথ সৃষ্টি করিয়া লইল। ছন্দোবদ্ধ যে কোন রচনাকে পদ্য বলা হইলেও, কাব্যের প্রকৃতগত বৈশিষ্ট্য না থাকিলে তাহাকে কাব্য বলা যাইতে পারে না। শুধু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছন্দিত ও ভাবাপ্লুত অন্তর-উচ্ছাসই কাব্য পর্য্যায়ে স্থান পাইল। প্রকৃতগত এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কাব্য সাহিত্যের অন্যান্য শাখা হইতে পৃথক সত্তা লাভ করিয়াছে। ভাবোচ্ছাসের সহজ গতিভঙ্গী,—ছন্দ—কাব্যের আকৃতিগত পার্থক্য দান করিল। ছন্দিত রূপ তাই কবিতার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আর অন্তঃসারী ভাবাপ্লুত রসধারা তাহার প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য। নিখুঁত ছন্দবিন্যস্ত চিন্তাধারাই কাব্য নয়, আবার সাবলীল ভাবধারা ছন্দোময়ী না হইলে তাহাকে কাব্য বলা যায় না।

তিরিশ দিবসে হয় মাস সেপ্টেম্বর।
এরূপ এপ্রিল আর জুন নবেম্বর॥

পয়ারটিতে ছন্দ ও মিলের অভাব না থাকিলেও ইহাকে কাব্য বলা যায় না। এইরূপ নীরস ঘটনা বিবৃতি, তত্ত্ব প্রকাশ, নীতিকথা প্রভৃতিতে ছন্দ-বৈশিষ্ট্য থাকিলেও অন্তরের সহজ ভাবস্পন্দন,—রসধারা,—না থাকায় তাহা কাব্য নামে অভিহিত হইতে পারে না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ছন্দকে,—কাব্যের আকৃতিগত রূপকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় চিন্তাধারা বিবিধ আকারে প্রকাশ করা হইত। তখনকার দিনের যাহা কিছু উল্লেখযোগ্য সকলই ছন্দে প্রকাশ করিয়া সুখপাঠ্য করা হইত। বিশিষ্ট কর্ম্ম, উপদেশ ও ঘটনা-বিবরণ বিভিন্ন ছন্দে ও অলঙ্কারে প্রকাশ করিয়া পদ্য আখ্যা দেওয়া হইত। কিন্তু কাব্যরস-সম্পদ না থাকায়, কাব্যের আসরে তাহাদের এখন আর স্থান হয় না।

ছন্দের শৃঙ্খলে ও অলঙ্কারের ঝাঁকে জাতির রসাত্মক ভাবধারা প্রতি পদে বন্ধন অনুভব করিলেও উহা প্রাণহীন হইয়া যায় নাই। ছন্দোবন্ধের মধ্যেও উহা মধ্যে মধ্যে রন্ধ্রপথে আলোক-রেখার মত আত্মপ্রকাশ করিত। ছন্দ-প্রাধান্যের যুগেও ভাবসম্পদ বিশিষ্ট কবিতার সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল।

অঝোর ঝরয়ে মোর নয়নের পানি।
বাঁশীর শবদে বড়াই হারায়িলোঁ পরাণী॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনিয়ার উদ্ধৃত পদে ভাবরস-প্রবাহ ছন্দের নিগড় অতিক্রম করিয়া উৎসারিত হইয়াছে।

বন্ধনক্লিষ্ট ভাবাত্মক রসধারা এইরূপে যখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় শৃঙ্খল-পাশের ফাঁক দিয়া উঁকি দিতেছিল, মধুসূদন তখন তাহারই জন্য বহন করিয়া আনিলেন নবযুগের মুক্তির বাণী। তাঁহার কবি-প্রতিভা, ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণ, খেদ প্রভৃতি রসের উন্মাদ লহরী সৃষ্টি করিয়া কবিতাকে

শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিল। বৈষ্ণবের করুণ মধুর বংশী ধ্বনির সুর-লহরীর পর মধুসূদনের শক্তিমান্ শৃঙ্গধ্বনি বাঙ্গালীর মনকে কাব্যের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট করিল। সেই নব অভ্যুদয়ের যুগে, "মধুসূদন হলেন বাংলা সাহিত্যের সত্যকার আদি কবি।···তিনি বাংলা কাব্যের গতানুগতিকতা ভেঙ্গে আধুনিক কাব্যের পথ, ভাব প্রাধান্য ও বিষয় বস্তুর দিকে নজর উন্মুখ করলেন।··· কবি চিত্তের এমন অকুণ্ঠিত প্রকাশ বাংলা কাব্যে এতদিন হয় নি।" আমরা আরও বলি যে, মধুসূদন তাঁহার নিজস্ব অনুভূতির প্রগাঢ়তায় ও ব্যক্তিত্বের গভীর ব্যঞ্জনায় কাব্যের নূতন রূপ দান করিয়াছেন। ঘটনা বিবৃতিকে, কবি আপন জীবনরসে সজীব করিয়া তুলিয়া কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমায় গড়িল যে আশে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী। কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে— ···
ছিল না কি ভাব ধন, কহ লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার,···

ছন্দ-অলঙ্কার নিপীড়িত, 'চীন-নারী সম পদ', সত্য সত্যই কবির প্রাণে কাব্য-লক্ষ্মীকে মুক্তিদানের প্রেরণা আনিয়াছিল। দুর্ব্বার গতিতে তাঁহার কাব্য-ভাবস্রোত ছন্দের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া চলিল। ভাব-বৈচিত্র্যের সহজশ্রী ও অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য বিকশিত করিয়া তিনি কাব্যকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিলেন। অলঙ্কার-ভূষণের কথা বাঙ্গালী যেন একেবারে ভুলিয়া গেল। এইরূপে বিভিন্ন রস-বৈচিত্র্যে, মাধুর্য্যে পাঠকের মন হরণ করিয়া, ছন্দ ও অলঙ্কার হইতে তাহাদের দৃষ্টি অপসৃত করিয়া মধুসূদন কাব্যের ভাব-স্রোতকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। কাব্য-রসিক বাঙ্গালী কাব্যরস প্লাবনে আত্মহারা হইল। ভাবোন্মাদনায় ছন্দালঙ্কারের বৈশিষ্ট্য সে ভুলিতে বসিল।

আজ এই অতি-আধুনিকতার যুগে কবিতার আকৃতি-গত রূপটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, তাহার অন্তরগত ভাবকেই একমাত্র সম্পদ মনে করিয়া যে একশ্রেণীর গদ্য কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহারও সর্ব্ব প্রথম প্রেরণা বোধ করি মধুসূদনের ভাব প্রধান কবিতায় উৎসারিত। অলঙ্কারকে ভাবের ঘরে বন্ধক রাখিয়া এই শ্রেণীর আধুনিক কবি নিরাভরণ ও ছন্দবিহীন কাব্য সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন।

তোমাকে (মৃত্যুকে) দেখিনি।
তবু জানি নিশ্চয়ই দেখা হবে একদিন।
যে দিন পৃথিবীতে প্রথম এলাম,
সেদিন থেকেই তোমার অভিসার আমার অভিমুখে।
টানি যখন বুকে নেবে,
আনন্দে মূর্চ্ছা যাব
এ জীবনে আর জাগব না।
সেই মুহূর্ত্তটির অপেক্ষা করছি পলে পলে।

রচনাটি সহজ ভাবপ্লাবনে উৎসারিত। স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে স্বাধীন গতি ও স্থিতি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে সত্য, কিন্তু ভাবপুষ্ট রচনাটিতে সাবলীল উচ্ছ্বাস থাকিলেও কবিতার ছন্দায়িত সঙ্গীত-মাধুর্য্য অনুভূত হয় না। কাব্যের রূপে বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে মনীষিগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, "কবি স্রষ্টা"। অনেকাংশে কথাটি সত্য। কবি নিত্য নূতন সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু অভিনব সৃষ্টি কেবল কাব্যেরই বৈশিষ্ট্য নয়। কথা-শিল্পী, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিকেরা নবতর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাই শুধু স্রষ্টা বলিলেই কবিকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় না। কেহ বা বলিয়াছেন, "কল্পনায় রূপায়িত মানুষের উৎকৃষ্ট ভাবধারাই কাব্য।" ইহাতেও কাব্যের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হয় না। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাও মানুষের উৎকৃষ্ট ভাব ধারাকেই পরিস্ফুট করিয়া থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর এক শ্রেণীর কবি ও সমালোচকেরা কাব্যে ছন্দের বিশিষ্ট স্থান স্বীকার করিতে চাহেন নাই। সত্য-সুন্দরকে সুব্যক্ত করিতে পারিলে কাব্য-দ্বার উন্মুক্ত করা হইল বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন্ এবং বলিতেন, "অন্তর-উৎস প্রবাহিত ভাবধারাই কাব্য।" কিন্তু ইঁহাদের রচনার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহাদের ভাবরস-পরিপুষ্ট কবিতাগুলির প্রকাশভঙ্গী

স্বতঃই ছন্দোময়ী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের বিখ্যাত কবিতাগুলি হইতেও যদি ছন্দের লীলা ও স্পন্দন বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কাব্যরস মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

কাব্যের পূর্ণ রূপ কি? কবির অন্তর-ঘন ভাবধারার সহজাত ছন্দায়িত প্রকাশ হইল কাব্য। কবির আন্তর ভাবোচ্ছাস যখন অনুরূপ ছন্দ-বৈচিত্র্যে প্রবাহিত হয়, তখন তাহা রসাপ্লুত কাব্য হইয়া ওঠে। ভাবরসাত্মক প্রবাহটি যেন পার্ব্বত্য নির্ঝরের স্রোতোধারা, কোথাও ক্ষীণ, কোথাও খর; ইহার গতি কোথাও কুটিল, কোথাও সরল—এইভাবে নানা ভঙ্গীতে, স্বচ্ছন্দ গতিতে, অভিনব সুর-মূর্চ্ছনায় প্রবাহিত হয়। কবির ভাবধারা অনুরূপ লীলায়িত গতিতে অনুরণন ও স্পন্দনে, নিত্য নবছন্দ সৃষ্টি করিয়া লয়। ছন্দ তাই ভাবের নিগড় নয়, ভাবের বাহন। আদি কবি বাল্মীকির ও ভাবোচ্ছ্বাসিত হৃদয়ের প্রথম উক্তি, "মা নিষাদ…" ভাবের বন্যায় ভাষা ও ছন্দ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। রসাত্মক ভাবধারা উচ্ছ্বাস ও গতি-বৈচিত্র্যে যে অনুরূপ ছন্দ সৃষ্টি করিয়া লয় তাহা নিঃসন্দেহ। কবির অন্তর উপচাইয়া-পড়া ভাবরস উচ্ছ্বাসেই হইল ছন্দের জন্ম। ছন্দোময় ভাবোচ্ছ্বাস হইল কাব্য। তাই কাব্যের জন্ম হইল কবির প্রাণে আর তাহার প্রকাশ হইল সহজাত লীলায়িত ছন্দে। অদম্য ভাবোচ্ছ্বাস পীড়িত কবি প্রাণের আকুতি রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির কবিত্ব লাভে বর্ণনা করিয়াছেন।

—রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদ মন্দ্রে বারংবার আবর্ত্তিয়া মুখে
নবছন্দ। বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্ত্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত,
তারে লয়ে কী করিবে, ভাবে মুনি কী তার উদ্দেশ,

কবির প্রাণে ভাবের বন্যা আসিলে কি দুর্দ্দমনীয় শক্তিবলে যে তাহা বাহিরিয়া আসিতে চায়, কবিতাটিতে তাহা সুপ্রকাশিত হইয়াছে! সে ঐ পাষাণ-কারা ভাঙা পাগলপারা নির্ঝরের অনির্ব্বার গতির মত, জাগ্রত আবেগ ও বাসনা রুধিয়া রাখিতে পারে না।

প্রশ্ন হইতেছে কেবল মাত্র কবি অমর আনন্দের ও ভাবোচ্ছাসের অধিকারী হন কেন? একই রং, রূপ, গন্ধ ও সৌন্দর্য্য যাহা সাধারণের অন্তরে কোন বিশেষ বার্ত্তা বহন করিয়া আনে না, কবির প্রাণে তাহা অমর রসোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে ও তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তোলে। কোন্ যাদু স্পর্শে যে কবির অনুভূতি সজাগ হইয়া ওঠে, কবি ঋষি ও স্রষ্টা হইয়া ওঠেন তাহা জানা যায় না—হয়ত কারণ নাই বলিয়াই। স্বপ্নাবেশে যেমন অভিনব রূপ-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া যায়, নিদ্রিতের চক্ষে এক অজানা বিশ্ব আবির্ভূত হয় এবং সেই স্বপ্নের বিশ্বকে স্বপ্নাবিষ্ট বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করে, তেমনই আপন আন্তর আবেগ-মুগ্ধ কবি অভিনব আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া গিয়া অফুরন্ত আনন্দের উৎস চির-সুন্দরের সহিত অনুভূতিতে সাক্ষাৎ লাভ করেন। কবি তাই অনুপ্রাণিত, ঋষি, রসসাগর ও রসিক। তিনি তাই অ-সাধারণ,—দ্রষ্টা, স্রষ্টাও।

কবির সৃষ্টি চিন্তা-প্রসূত নয়, বোধি-তরঙ্গে উদ্বেলিত ভাবরসোদ্ভূত। সেই আন্তর প্লাবনে, অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ও সত্যের অভিনব ধারায় কবি নিজেকে বহাইয়া দেন। এই স্বতঃপ্রবাহিত ছন্দোময়ী রসধারাই কবিতা আর সেই রসের আধার হইলেন কবি। কবি তাই রসিক। গোকুলের সহস্র গোপিনীর মধ্যে যেমন কেবল শ্রীরাধার অন্তরেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ব্যাকুলতার স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়া ছিল, তেমন কেবলমাত্র কবির প্রাণেই রসের লীলা-স্রোত ছন্দোময়ী হইয়া উঠে। রসাপ্লুত হৃদয়ে কবি আপন ছন্দে যে গান গাহিয়া থাকেন, প্রাণ-ঘন আনন্দে তিনি যে কূজন করিয়া থাকেন তাহাই কাব্য। কবির ভাবধারা সাবলীল স্রোতের মত, প্রভাতী পাখীর আনন্দ-গানের মত, নির্ঝরের নৃত্যের মত সহজাত ও লীলায়িত ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে। কবির জীবন-বৃক্ষে কবিতা হইল কুসুম, ছন্দ তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্য আর ভাব তাহার সৌরভ। *

---

* শিলিগুড়ি 'উত্তরা' সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশ।

মা

(উপন্যাস)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

সে তখন পাঁচ বছর সবে পেরিয়েছে। খেলাঘরের রান্না ও পুতুলের ঘর-সংসার নিয়ে মহা ব্যস্ত হয়ে থাকে। এমন সময় একদিন তার বাবা তাকে ও তার মাকে নিয়ে এসে কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রেখে গেলেন। যে বাড়ীতে রাখলেন সেখানে তাঁর জ্যাঠতুতো ভাইদের সংসার। তিনি যে কয়দিন রইলেন সবাইকে থিয়েটারে, চিড়িয়াখানায়, যাদুঘরে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন, খুব হৈচৈ স্ফূর্ত্তি হয়েছিল। দার্জ্জিলিং-এর কাছাকাছি কোথায় তিনি ওভারসিয়ারের কাজ করতেন। একটু একটু মনে পড়ে জায়গাটায় খুব বন, তাদের প্রকাণ্ড দুটো কুকুর ছিল, ঘোড়া ছিল একটা। মা বলতো, "কালো মেয়ে বিয়ে দেব কি করে?" বাবা বলতেন, "কালো জগতের আলো, দেখে নিও কেমন বিয়ে দিই।"

মস্ত শরীর, ভারী গলা, প্রকাণ্ড গোঁফ হঠাৎ দেখলে ভয় হয়, বাবা ছিলেন তার সব খেলার সঙ্গী। কাঠের সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের ধাপে বসতেন তিনি, সব চেয়ে নীচু ধাপে বসতো সে, তার কোলে ন্যাকড়ার পুতুল লাল শালুতে জড়ানো। বাবা বলতেন, "কি গো আপনার ছেলেটি আজ কেমন আছে? জ্বর কমেছে তো?" সে উত্তর দিত, "কই আর কমলো, গা ত খুব গরম, মুস্কিলেই পড়েছি।" গা গরম হবার জন্যে বাবার পরামর্শে পুতুলকে রোদে শুইয়ে রাখতো মাঝে মাঝে।

বাবার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁকে ডাকতো কাকাবাবু। তিনি এলেই তাঁর মোটা লাঠিগাছা নিয়ে ঘোড়া তৈরী ক'রে সে সারা বাড়ী নেচে নেচে বেড়াতো। তার সখ দেখে বাবা বলতেন, "একটু বড় হ'লে সতুকে আমি 'পোনি' কিনে দেব।" মা অমনি বলতেন, "বৈ কি, ঘোড়ায় চড়ে ধিঙ্গী না হ'লে চলবে কেন, মেয়েরা ঘোড়ায় চড়লে বেড়ী ধরবে কে?"

কলকাতায় এসে প্রথম কয়দিন সে আড়ষ্ট হয়ে রইল, একেবারে একলা থেকে অভ্যেস। বাবা চলে যাবার পর দু-দিন সে কান্নাকাটি করে অস্থির হ'ল। তার পর ক্রমে বাড়ীর অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু একটু ভাব জমে উঠলো। তার মাও অনেকদিন পরে লোকজনের সঙ্গ পেয়ে খুব খুসী হ'লেন। বাড়ীটা ছিল ভবানীপুরের একটা গলির ভেতরে, কাছে একটা ছোট্ট পার্ক ছিল, বিকেলে সেখানে তারা বেড়াতে যেতো। রঙীন জামা পরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দোলনায় চড়তো, ছুটোছুটি করে খেলতো, দেখে দেখে প্রথমটায় সে অবাক হ'য়ে যেতো। এত সুন্দর ছেলেমেয়ে সব কোথা থেকে আসে, সে বুঝতে পারতো না।

তারা আসবার কয়েক দিন আগে তার এক কাকীমার একটি খোকা হয়েছিল। টুকটুকে মিষ্টি। সে গিয়ে বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখতো কত ছোট হাত, কতটুকু মুখখানা, কালো রেশমের মত চুল, গায়ে কি মিষ্টি গন্ধ। সারাক্ষণ কেন ঘুমোয়, সে জিজ্ঞেস করতো। তার কাকীমা হেসে তাকে আদর করতেন, "কি রে সতু তোরও ত ভাই হবে, খুব ভালোবাসবি তো ওকে? না হিংসে করবি?"

সে ঠিক বুঝতো না, না বুঝেই মাথা নাড়তো। তার মাও কাছেই বসে। কাকীমা হেসে মাকে বলেন, "মেয়ে বড় হয়েছে, আড়াআড়ি নয়, ভাইয়ের খুব ন্যাওটো হবে দেখো দিদি।"

মা বললেন, "ভাই হবে বলে যে নিশ্চিন্দি হয়ে রইলি, বোনও তো হ'তে পারে? তবে খুকী তো ছোট ছেলেপুলে দেখলে পাগল হয়ে যায়। ওখানে নেপালী একটা আয়া এক মেমের বাচ্চাকে নিয়ে যা পাগলামী করতো..."

ছোট্ট মোটাসোটা ফর্সা ছেলেটাকে মনেপড়লো

সতুর। পিঠে বেঁধে রাখতো তার মা, দিব্বি ঘুমতো সে। তার ভাই যদি আসে সে তো আড়ি দেবে না, কোলে করে ঝিনুকে দুধ খাওয়াবে, কিন্তু কবে সে আসবে?

কাকীমার খোকা চোখ মেলে চাইতো, কচি গলায় ঠিক বেড়ালছানার মত মিহি গলায় কাঁদতো। আবার হাসতেও শিখল শীগ্‌গিরই। বিছানার কাছ থেকে সতু নড়তে পারে না। তার পুতুল নিয়ে সে খেলা করতে ভুলে গেল, পুতুল তো চাইতে পারে না, কাঁদে না, হাসে হাসে না, হাঁ করে ঘুমিয়ে থাকে না! কাকীমা প্রথম প্রথম সে এলেই খুব আদর করতেন, কিন্তু সে যখন ময়লা জামায় রাজ্যির ধুলো মেখে খোকার গায়ে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তো তিনি বিরক্ত হ'তে সুরু করলেন; তিনি খুব পরিষ্কার, একটু খুঁৎখুঁতে। বুঝতে পেরে তার মা আড়ালে নিয়ে তাকে খুব ধমক দিলেন একদিন; তার পর থেকে খোকার কাছে যেতে সে ভয় পেতো কাকীমাকে ও মাকে, তবু চোরের মত না গিয়ে পারতো না। সে যে কিছু করতো তা নয়, কিন্তু খোকার সব কিছু দেখে দেখে তার যেন আর আশ মিটতো না।

কোথা থেকে ও এল কাকীমা? ঈশ্বর দিয়েছেন! ঈশ্বর কি ভালো, তাঁর কাছে বুঝি অনেক অনেক ছোট ছোট ছেলে থাকে, তিনি পাঠিয়ে দেন? সবাইকে দেন কাকীমা? যাদের কাছে পাঠান! তার মাকেও পাঠাবেন তবে?

একদিন বিকেলবেলা সে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জলখাবার খেতে বসেছে, মুড়ি আর জিলিপি। মণ্টুর জিলিপি ফুরিয়ে যাওয়ায় সে চারদিক চেয়ে হঠাৎ তার বাটী থেকে তুলে নিয়ে অন্য দিকে মুখ করে হঠাৎ ভালো-মানুষের মত খেতে সুরু করলে। সে অবাক হ'য়ে হাঁ করে ব্যাপারখানা দেখছিল এমন সময় চারদিকে একটা সাড়াশব্দ গোলমাল শোনা গেল। তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে দেখলে, জ্যাঠামশাই জ্যেঠিমাকে ডেকে চুপি চুপি কি কথা বলছেন আর জ্যেঠিমা চোখে আঁচল তুলে দিয়েছেন। সে শত্রুতা ভুলে জিজ্ঞেস করলে, মণ্টুদা জ্যেঠাইমা কাঁদছে কেন? মণ্টু কিছু বলবার আগেই হঠাৎ তার কানে এসে লাগলো মায়ের চীৎকার। কান্নার তীক্ষ্ণ স্বর এসে তার বুকে এসে লাগলো, মনটা কেমন যেন ক'রে উঠল তার, সে ছুটলো মায়ের কাছে।

তার পর সবাই মিলে কি ভয়ানক কান্নাকাটি। সেও কাঁদতে লাগলো। কেন, তা ঠিক সে জানে না, কিন্তু মা কেন অমন চুপটি ক'রে পড়ে আছে, সবাই মাথায় জল দিয়ে বাতাস করছে? কাকীমা তাকে কোলে নিয়ে বসে কাঁদছেন আর আদর করছেন তাকে। উঃ সে যদি বাবার কাছে চলে যেতে পারতো! কবে এসে তিনি নিয়ে যাবেন তাকে? এখানে তার ভাল লাগে না। বাবা তাকে কোলে নিয়ে মোটা গলায় বলবেন, ফেলে দিই খুকী, ফেলে দিই তোকে? সে প্রাণপণে তাঁর গলা জড়িয়ে থাকবে, ভয়ে আনন্দে মিশে কি ভালো লাগবে তার।

এর কিছুদিন পরে, কত দিন, কে জানে হঠাৎ আবার অনেক রাত্তিরে কে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল, চেয়ে দেখলে সে কাকীমার বিছানায় শুয়ে আছে, এখানে এল কি ক'রে? ওঃ ঠিক। কাল রাত্তিরে কাকীমা আদর ক'রে বললেন, সতু খোকার কাছে শুবি আয় আজ। তার ইচ্ছে করছিল না। দিনে যাই হোক রাত্তিরে মার কাছে না শুলে ভাল লাগে না তার, আর আজকাল মা যে তাকে কি আদর করেন বুকে চেপে ধরে চুমো দিয়ে দিয়ে তাকে অস্থির ক'রে তোলেন, আর দরদর করে কেবলই চোখের জল পড়তে থাকে। কত মিষ্টি ক'রে ভাঙা ভাঙা গলায় বলেন, "খুকী কি হ'ল রে আমাদের? আমরা কি করব বলতো? ওরে খুকী কোথায় ফেলে চলে গেলেন তোর মায়াও কি আটকালো না রে? তোকে তো কত ভালবাসতেন; খুকু তুই আমার বুক জুড়ে থাকবি তো, না তুইও ফাঁকি দিবি?" দিনের বেলায় মাকে বিশ্রী দেখাতো। গয়না খুলে ফেললে কেন মা? অমন বিচ্ছিরি কাপড় পড়লে কেন মা? মা কোন উত্তর না দিয়ে কাঁদতেন।

মণ্টুদা চুপি চুপি বলেছিল, তোর বাবা যে মরে গিয়েছে সতু, তাইতো কাকীমা অত কাঁদে। খুব ঝগড়া

হয়েছে তার মণ্টুর সঙ্গে একথা নিয়ে। মরে যাওয়া আবার কি? বাবা তো দার্জ্জিলিং গেছেন শীগ্‌গির আসবেন। মণ্টু বলে, হ্যাঁ মরে গেলে কেউ নাকি আবার আসে? খাটিয়ায় তুলে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যায় দেখিস্ নি? কেন, কাল যে দেখালাম? সে বলে, "দূর যা, বাবা কেন মরতে যাবেন?" মণ্টু বলেছে "আচ্ছা তোর মাকে জিজ্ঞেস কর্ না, তবে তো বিশ্বেস হবে?" মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, অজস্র চোখের জলের মধ্যে তিনি উত্তর দিয়েছেন যে বাবা স্বর্গে গেছেন।

স্বর্গ কোথায়?

৩

কাল রাত্তিরে মাকে ছেড়ে সে শুত না, কাকীমাকে বলেও ছিল সে কথা। তিনি তখন বললেন, আচ্ছা খোকার পাশে বসে ওর সঙ্গে একটু খেলা কর্ আমি খেয়ে আসি। খোকা পিট্‌পিট্ করে আলোর দিকে চেয়েছিল। তার পর কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে? হঠাৎ কাকীমা তাকে বুকে জড়িয়ে তুলে নিলেন। একটু একটু আলো হয়েছে কিছু ভাল দেখা যায় না। সে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখলে কাকীমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সে বললে, কাকীমা, মার কাছে যাবো। ঠোঁট কেঁপে উঠলো কাকীমার। "ওরে আমার সোনা মাণিক মাও যে তোকে ফাঁকি দিল।"

একটু বেলা হ'লে খাটিয়ায় তুলে হরিবোল দিয়ে মাকে নিয়ে গেল। কাকীমার হাত ধরে মায়ের কাছে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। কে যেন একজন লোক নীল রঙের র‍্যাপার গায়ে, তার হাতে একটা সন্দেশ দিয়েছিল, সে খায় নি, হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তার পর কয়েক রাত্রি সে কাকীমার বিছানায় শুয়েছিল। সারাদিন খোকার সঙ্গে খেলা করতো, কাকীমা একটুও আর রাগ করতেন না। একদিন বিকেলে সে খোকার কাছে বসে খাবার খাচ্ছিল, কাকীমা কাছে ছিলেন। হঠাৎ মণ্টুদা এসে হাজির। বললে, "সতু জিলিপী খাবি? এই নে।" সে বললে, "আমার আছে মণ্টুদা।" খুব উদার ভাবে মণ্টুদা বললে, "তা হোক্ আর একখানা খা। হ্যাঁরে সতু তুই চলে যাচ্ছিস?"

"কোথায়?"

"তবে যে শুনছি, তোর নিজের জ্যাঠা এসেচে দেশ থেকে, আমাদেরও নাকি জ্যাঠা, তবে তোর নিজের। কাল কালীঘাট গিয়ে পুজো দিয়ে পরশু তোকে নিয়ে যাবে?

"হ্যাঁ আমি গেলে তো?"

"এক কাজ কর্ না তোর জ্যাঠামশাইকে বলিস, তুই এখানে আমাদের কাছে থাক্‌বি, শান্তির সঙ্গে ইস্কুলে পড়তেও তো পারবি।"

তাকে কিন্তু যেতে হ'ল। সেদিন তার ভারী কষ্ট হয়েছিল, ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁপে কেঁপে সে জোরে জোরে কেঁদেছিল কাকীমার আঁচল ধরে। কাকীমাও কেঁদে-ছিলেন। তার সঙ্গে মায়ের বাক্সগুলি দেওয়া হ'ল। তাকে জামা, জুতো, খেলনা সকলেই কিনে দিয়েছিল, মণ্টুদা তার দোয়াতদানিটা দিয়েছিল, এমন কি মণ্টুদার মাষ্টার লজেঞ্চুস্ কিনে দিয়েছিলেন।

রেলগাড়ী, নৌকো, ঘোড়ার গাড়ী অনেক লোকজন দেখে দেখে তার মনটা একটু ভাল হ'ল। জ্যাঠামশাইয়ের মাথার চুল সাদা, রং খুব কালো, চোখে চশমা। অনেক বার অনেককে বলছিলেন, মশাই আর বলবেন না, ছেলে হবার জন্য বৌমা এলেন কলকাতায়, শরীরও ভাল ছিল না আর বনজঙ্গলে কেই বা দেখেশোনে। তিনি তো এলেন আর এদিকে ভাই আমার দু-দিনের জ্বরে মারা পড়লো। শ্রাদ্ধ হবার আগেই বৌমা ছেলে হ'তে গিয়ে শেষ হলেন। এখন বাপ-মা-মরা মেয়ে নিয়ে চলেছি। আমারও আবার বড় সংসার, গরীব মানুষ, ভাই ভাল কাজ পেয়েছিল, ওর দিকে সবাই মিলে চেয়েছিলাম। কোথায় তার ওপরে সব ভার ফেলে দিয়ে আমি যাবো, না, সেই আমায় পথে বসিয়ে গেল। তার ওপর এই মেয়ে।

অনেক বার শুনে শুনে এই কথাগুলো মনে গেঁথে গিয়েছিল তার।

জ্যাঠামশায়ের বাড়ী গিয়ে যখন পৌছুল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পাড়া-গাঁ, নৌকো থেকে নেমে তাকে হেঁটে আসতে

হয়েছিল। একজন লোক গায়ে জামা নেই হাতে একটা হ্যারিকেন; বললে, "কর্ত্তা এলেন বুঝি? এই মেয়ে? তা অতটুকুন মেয়ে যাবেন কি ক'রে কর্ত্তামশাই?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "পারবে, পারবে, আধ ক্রোশ পথ না হাঁটতে পারলে চলবে কেন? কপালে সুখ লেখা থাকলে আর···বলে তিনি তাকে বললেন, চল আমরা বাড়ী যাই।

একদিন বাবা মা আর সে আর তাদের আয়া আর কুকুর দুটো মিলে বেড়াতে গিয়েছিল আর ছিল বুড়ো চাপরাশী দাদা। বনের মধ্যে বড় একটা গাছের তলায় মা রেঁধেছিলেন; আয়া শুকনো পাতা আর ডাল কুড়িয়ে এনেছিল, সেও এনেছিল, তার পরে সবাই মিলে খেয়েছিল। বাবা সবচেয়ে বেশী খেয়েছিলেন। বেলা পড়লে মা বললেন, "চল এবার আমরা বাড়ী যাই।" বাড়ী ফিরে বাবা বললেন, "আর একটু চা খাবো কিন্তু।" মা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়েছিলেন, "এক্ষুণী এত খেয়ে এলে যে?" বাবা খুব হেসে হেসে বলেছিলেন "খুকী, শোন্ তোর মায়ের কথা, চা কি একটা খাবার হোল? তুইও খাবি না রে খুকী?"

সঙ্গের লোকটি বললে, আমি কোলে নিই কর্ত্তামশাই? হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে রাস্তাও সমান নয়, অভ্যাস তো নেই, পড়ে গিয়ে চোট্ পাবেন।

জ্যাঠামশাই রেগে বললেন, "তুই খাবারের ঝুড়িটা নে দেখি, কেমন হাঁটতে না পারে দেখছি, যা এগো।"

তার পায়ে নতুন জুতো ছিল হাঁটতে পা ছড়ে গিয়েছিল, খুব লাগছিল পায়ে। তবু জ্যাঠামশাইয়ের ভয়ে কিছু সে বলে নি। তার পরে ব্যাথায় তার চোখ দিয়ে যখন জল পড়তে সুরু করলে তখন হঠাৎ সেই লোকটি কাছে এসে তাকে কোলে তুলে নিলে। এবার আর জ্যাঠামশাই কিছু বললেন না।

বাড়ী পৌছে প্রথমেই সে তাড়াতাড়ি জুতোটা খুলে ফেললে। সবাই জোরে জোরে কাঁদছিল। একজন খুব কেঁদেছিলেন দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে, বল্ছিলেন, রাক্ষুসী মেয়ে বাপ-মা সবাইকে খেয়ে এসেছিস্। সে বুঝল না কার ওপরে তিনি এত রাগ করছেন। পরে জেনেছিল, তিনি তার ঠাকুমা হন।

খাওয়া হোল ডাল.ভাত ডাঁটা চচ্চড়ি। এতদিন কত কি খেতে হোত, সে এত খেতে পারতো না, কাকীমা তাকে জোর করে খাইয়ে দিতেন। আজ তার একটুও ভাল লাগছিল না। শুধু ডাল আর ভাত খেতে ডাঁটা চচ্চড়ি ঝাল বলে সে মুখে দিয়েই ঢক ঢক করে জল খেলো। তার পর সে হাত উঠিয়ে বসে রইল, ভাবল, দুধ দিয়ে খাব। কিন্তু কেউ দুধ দিল না।

কার বিছানায় কার পাশে তাকে শুতে দেওয়া হোল সে জানে না। ময়লা দুর্গন্ধ বিছানা, ঘরের কোনে কালি-পড়া একটা লণ্ঠন মিট্‌মিট করে জ্বলছে। ঘরের দেয়ালে চূণ-বালি নেই, দর্মার বেড়া। অনেক উঁচুতে কালো ডোরা একটা মশারী আড় ভাবে টাঙানো আছে, তখনও ফেলা হয় নি।

পাশে একটা ছোট্ট মানুষ ঘুমুচ্ছে দু-বার তিন বার তার মুখ ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলে সে, কিন্তু অল্প আলোয় দেখা গেল না।

নোটন নোটন পায়রা গুলো ঝোটন রেখেছে
বড় সায়েবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে,
দু-পারে রুই কাৎলা···
এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ,

মণ্টুদা বলেছে, "তোকে পুজোর সময় নিয়ে আসতে বলিস সতু, এখানে কি মজা হয়, গাঁয়ে কক্ষণো ওসব পাবি নে।"

পুজো কবে হবে?

পুজো সে জানে। বাবা রঙিন জামা কিনে আনেন তার জন্যে, মা খুব ভালো ভালো খাবার করেন। কাকাবাবু আসেন, সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়া হয়।

গতবারে নীল জামা সে পেয়েছিল, এবার সে শান্তির মত নীল জামা নেবে।

দু-পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে—
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে,
আজ দাদার···

মা সরে শোও, ঘুম পায় যে······।

এক

রান্নাঘরের দরজায় সবিতা পিঁড়ি পেতে বসেছিল, পিঠের কাপড় খুলে দিয়ে আঁচল নেড়ে নেড়ে একটু বাতাস করছিল। গাছের পাতা নড়ে না, কদিন যা গরম পড়েছে। ভাত নেমেছে, ডাল চড়েছে, ওবেলার তার নিজের জন্যে রান্না-করা তরকারী খানিকটা রেখে দিয়েছিল; আর যদি ওবাড়ীর চাকর একটু মাছ নিয়ে আসে। ছ'আনা পয়সা তাকে দিয়েছিল এক রকম লুকিয়ে। পাওয়া গেলে হয়, যা গরম, টাটকা মাছ অল্প পয়সার মেলা মুস্কিল।

শোবার ঘরে সাড়াশব্দ পাওয়া গেল, উৎকর্ণ হোল সবিতা। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে রান্না ঘরের দিকে। সে ডাক দিলে, খুকী এলি ?

লাল ডুরে শাড়ী পরা, খুব টেনে বিনুনী করে চুল বাঁধা, কপালে খয়েরী টিপ, অতসী ঘরে ঢুকলো। মিটমিটে টেমির আলোয় তেমন ভালো করে দেখা যায় না, তবু সবিতা নিজের হাতে সাজিয়ে দেওয়া মেয়ের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। এ নতুন নয়। যখনই অতসী কোথাও বেড়াতে যায়, হয় তো ঘণ্টা দুয়েক বাড়ী থাকে না, ফিরে এলে তাকে দেখে দেখে সবিতার আশ মেটে না। অমন রং কোথা থেকে সে পেল ? নিজের হাতটা চোখে পড়ে বিবর্ণ শীর্ণ, শির-ওঠা হাত, প্রথম যৌবনেও তার রং লোকে কালোই বলতো। তখন তবু মাথা ভর্ত্তি চুল ছিল, বড় বড় চোখ, সমস্ত শরীরে স্বাস্থ্য ও লাবণ্য ছিল, এখন জীবনের বিকেল বেলায় তাকে দেখে কলমী লতার মত সতেজ শ্যামল 'সবিতারাণী'কে খুজে পাওয়া শক্ত। 'সবিতা রাণী'! বিয়েতে মণ্টুদা গোলাপী কাগজে চিত্রি করে লাল কালীতে লেখা একখানা প্রীতি উপহার পাঠিয়ে ছিল 'স্নেহাস্পদা ভগিনী সবিতারাণীর শুভবিবাহে'। কবিতার ভাবটা হচ্ছে, এই দেখ আকাশ কি নীল, বাতাস কি মধুময় ? কেন প্রকৃতি আজ এমন মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করেছে ? কারণ, আমাদের সবিতারাণী কুসুম মালিকা হাতে নিয়ে কম্পিত বক্ষে শম্ভুনাথের গলায় পরাতে চলেছে। বাজ হে শঙ্খ, দাও গো উলু, শম্ভু সাগরে আজ সবিতা নির্ঝরিণী মিলিত হোল, দূরেতে দাঁড়ায়ে মণ্টুদাদা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, এই মিলন জয়যুক্ত হোক্।

যাক্, তবু একদিনের জন্যে সে একজনের কাছে সবিতারাণী হয়েছিল তো! বিয়ের আগে ছিল সে সতু, বিয়ের পরে স্বামীর ঘরে ছোট বৌ, আর এখন সে মা।

সবিতারাণী কোথাও কেউ নেই।

সেই মণ্টুদাই কি আছে নাকি ? কাঠের ব্যবসা করে সে নাকি এখন মস্ত বড়লোক, রেঙ্গুনে না কোথায় থাকে, এ সব উড়ো উড়ো খবর সে পেয়েছিল তাও অনেকদিন আগে।

যাকগে, পুরোণো দিন হারিয়ে গিয়েছে সে জন্য দুঃখ নেই তার। অমন চাঁদের মত ছেলেমেয়ে যার আছে অতীত হাতড়িয়ে স্মৃতির সম্বল খুঁজে তাকে ফিরতে হয় না। এমন কি স্বামী শোকও তাকে বিচলিত করতে পারে নি। স্বামীর সংসারে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে যখন সে আসে, বলতে গেলে তার সুখের জীবন সেইদিন থেকে সুরু। বিয়ের আগের দিনগুলোর কথা ভাবতে তার কোন আনন্দ হয় না। কেবল শরীর পণ্ড করে কাজ কর। ঠাকুরমার কোমরে মালিশ কর, জ্যাঠাইমার রান্নার সাহায্য কর, ছেলেপুলে কোলে রাখ, তাদের কাঁথা-কাপড় কেচে দাও, পুকুর-ঘাটে চাল ধুয়ে আন, ময়লা কাপড় টিন ভর্ত্তি করে সোডা দিয়ে সেদ্ধ কর, মাছটা কুটে দিয়ে যাও, ঠাকুমার কবিরাজী ঔষধ তৈরী কর, অনুপান খুঁজে আন, সারাদিন ও রাতের অনেকক্ষণ কাজে কাজে ঠাস বুনানি। অথচ এত কাজের মধ্যে তার কোন গৌরব নেই, কেউ একটা মিষ্টি কথা তাকে বলে নি, আদর যত্ন তো দূরের কথা, তবু তাকে কত দিন ভাতকাপড়ের খোঁটা সইতে হয়েছে। মায়ের বাক্স খুলে শাড়ীগুলি বাঁটোয়ারা করে নিলেন বাড়ীর সব বৌরা। গয়নাগুলো জ্যাঠাইমার দুই মেয়ের বিয়েতে কিছু কিছু করে দেওয়া হোল। অথচ সে মায়ের একটি শাড়ী কি একটি গয়না পায় নি। লাল চেলীর সস্তা শাড়ী ও শাঁখা পরে সে এ বাড়ীতে এসেছিল। কানে শুধু ঠাকুমার দেওয়া সেকেলে ঝুমকো একজোড়া ছিল। ঠাকুমাই যা একটু মমতা করতেন। তার হাতের সেবা

নইলে তাঁর চলতো না। মাঝে মাঝে বলতেন নিজের অদৃষ্ট পুড়িয়ে হতভাগী কি আমাকে ঠাকুর সেবা করতে এসেছিলি? কেউ দেখতে পারে না, সবাই দূর দূর করে, বেঁচে আছিস তাজ্জব লাগে।

তাঁর কথাগুলি সর্ব্বদাই রুক্ষ ছিল, তবু মনে একটু দরদ ছিল তার জন্যে সে বেশ বুঝতে পারতো। তিনি তাকে মোটেই যত্ন করতে পারতেন না, বরং সেই তাকে অষ্টপ্রহর সেবা যোগাত। তবু রাত্রে এক-একদিন হঠাৎ জেগে দেখেছে, তার মাথায় হাত রেখে ঠাকুমা বিড়বিড় করে কত কি বলছেন। তার বিয়ের একবছর আগে তিনি মারা যান।

তার বিয়ের সম্বন্ধ যিনি ঠিক করেছিলেন তাঁকেও একটু স্নেহের সঙ্গে মনে পড়ে। তিনি ছিলেন জ্যাঠাইমার বড় ভাই। তাঁকে জ্যাঠাইমার ছেলেমেয়েরা ডাকতো রাঙ্গামামা, সেও তাই ডাকতো। রাঙ্গামামার রূপ দেখলে পিলে চমকে যেত। যেমন কালো তেমনি মোটা ও বেঁটে, কিন্তু তবু তিনি এলে এ বাড়ীতে যেন উৎসব সুরু হয়ে যেত। বাড়ী কাঁপিয়ে উচ্চহাসি আর ঘরে ঘরে সবার সঙ্গে আড্ডা, ঘড়ি ঘড়ি তামাক খাওয়া আর ছেলেমেয়েদের পেট পুরে মিষ্টি খাওয়ানো, এই সব গুণে তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। সতুও যে আর সবার মতই খেলনা, খাবারের ভাগ পেতো, এতে জ্যাঠাইমা মোটেই খুসী হতেন না। তাঁর ভয়ে সতুও ঘেঁসতে চাইত না। রাঙ্গামামার কাছে যদিও তিনি এলেই কাজকর্ম্ম ফেলে ছুটতে ইচ্ছে হ'ত তার। কিন্তু রাঙ্গামামাকে এড়িয়ে চলে কারুর সধ্যে নয়। সতুকে তিনি যেন সবচেয়ে বেশী আদর করতেন, নিজের কাছে বসিয়ে সন্দেশ মুখে গুঁজে দিতেন। ঠাকুমা যখন বলতেন, ওই বাপ-মা খেকো মেয়েকে আবার অত সন্দেশ খাওয়ান কেন? তিনি উত্তর দিতেন, "বুঝলেন না মাঐ-মা, বাপ-মা খেয়ে পেট বড় হয়ে গিয়েছে, তাই সন্দেশ খাইয়ে পেট ভরিয়ে রাখি, নয়তো আপনাদেরই খেয়ে বসবে হয়তো।"

সে শুনেছে তার বিয়ের সম্বন্ধেও তিনি এনেছিলেন। তিনি ছিলেন তার জীবনের শুভগ্রহ।

[illegible] বাড়ীতে এসে সতীনের কিছু গয়না সে পেল। অনেক গয়না ছিল তাঁর, কিন্তু কতগুলো রেখে দেওয়া হ'ল অমরের বৌ এসে পরবে। সে যাই হোক, একগাছি কড়ি হার, একজোড়া মোটা বালা ও পাথর বসানো কানফুল প'রে, জামদানী ঢাকাই শাড়ী পরে লেস-বসানো জামা গায়ে দিয়ে সে যখন শাশুড়ীর সঙ্গে পাড়ার এক বড়লোকের বাড়ী বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়েছিল, তখন নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে হয়েছিল তার। সবাই বলেছিল,বেশ বৌ হয়েছে। হয়তো দ্বিতীয় পক্ষের বৌ বলে লোকে একটু সমবেদনায় দোষ-ত্রুটি তেমন করে ধরেনি। কিন্তু ওসব বুঝবার ক্ষমতাই তার ছিল না। দোজবর তাই কি? দোজবর কি তেজবরে বিয়ে হবে এটা সে একটুকু বেলা থেকেই জানে। কেন, তার জ্যাঠতুতো বোন বুঁচিদির বিয়ে হয় নি দোজবরের সঙ্গে? তার বর তো দেখতেও খারাপ। শম্ভুনাথের তো আর যাই হোক চেহারা ভাল ছিল, রং-ও ফর্সা ছিল। রগের কাছে চুলে পাক ধরেছিল আর ধরণ ধারণ খুব গম্ভীর, তাই যা বোঝা যাচ্ছিল যে এ প্রথম বিয়ে নয়।

"কেমন বৌ দেখলিরে খুকী?" অতসী বললে "বেশ ভাল বৌ মা, তবে খুব ছোট্ট, আমার এই এতখানি," বলে সে হাত দিয়ে কানের কাছাকাছি মাপ দেখিয়ে দিলে।

হাসি চেপে সবিতা বললে, "তা সবাই কি তোর মত ধ্যাড়ধেড়ে লম্বা না হলেই নয়? আমাদের সময় তো যে যত মাথায় ছোট থাকতো সেই তত টুকটুকে বৌ। আমি লম্বা ছিলাম বলে ঠাকুমা কত ভাবতেন; এখন সব দিনকাল বদলে গিয়েছে। মেয়েরাও বেঁটে হতে চায় না।"

অতসী কাছে এসে বললে, "আমি কিন্তু আর এক বছরে তোমায় ছাড়িয়ে যাব মা, তখন লোকের কাছে কি বোলব জান?"

গভীর স্নেহে মেয়ের কপালের ঘাম-ভেজা ছোট্ট চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে সে বলল, "কি বলবি?"

"বলব, ও তো আমার মা নয় ও আমার দিদি।" বলে খিলখিল করে হেসে উঠল অতসী।

সেও হেসে ফেলল, "ভর সন্ধ্যেবেলায় অতটা হাসিস নে বাবু, কে বলতে পারে কখন কার দিষ্টি লাগে!"

"ওসব আজগুবি কথা রাখতো। তুমি মা এতদিনেও একটু সহুরে হতে পারলে না, বড্ড গেঁয়ো তুমি।"

বাইরে আমগাছের মাথায় ঘুরঘুট্টি আঁধার হয়েছে, কয়েকটা তারা ঝক্‌ঝক করছে সামনের আকাশে। পাড়ার কালীমন্দিরে শেতল হচ্ছে, ঘণ্টা ও শাঁখের শব্দ আসছে মৃদু হয়ে।

ততক্ষণে অতসী করছে কি, উনুনের কাছে ছুটে গিয়ে ডালের কড়া নামিয়ে ফেলেছে। হাঁ হাঁ ক'রে উঠলো সবিতা, "ওরে করলি কি, আকাচা কাপড়ে ছুঁলি তো, সব তাতে তোমার হাত দেওয়া চাই?" অতসী সমান চড়া গলায় জবাব দিলে, "যাওতো তুমি এঘর থেকে যাওতো, নিত্যি দুবেলা তোমার রান্না খেয়ে অরুচি ধরেছে—আর এসব তো তুমি খাবে না আকাচা কাপড় হলেই কি।"

রান্না করা নিয়ে মায়ে-মেয়েতে নিত্য কলহ। আজ কালকার মেয়েরা যেন কি! বিয়ের আগে তো সে কাজ ফাঁকি দিতে পারলে বর্ত্তে যেত। মেয়েকে দেখে তার অবাক লাগে—ফাঁকি দিয়ে মায়ের হাতের কাজ কেড়ে নিতে পারলেই সে বাঁচে, অথচ কাজ না করে সে নিজেই বা করে কি? ওদের রেঁধে খাওয়ালে কত তৃপ্তি কত সুখ ওরা তো বোঝে না।

ও বাড়ীর চাকর কুঞ্জ মাছ নিয়ে এল, বেশ ভালো মাছ পাওয়া গিয়েছে, মাঝারি গোছের চিংড়ী।

"দেখ দিকি মা, তুমি মাছ রাঁধতে যাচ্ছিলে। দাদা কতবার বলেনি যে রাত্তিরে তুমি মাছ রাঁধলে সে 'হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্' করবে?"

"সে আবার কি?"

"খাবে না গো খাবে না সে, তুমি তবে রাঁধবে কার জন্যে? রোজ রোজ রাত্তিরে মাছ ছুঁয়ে চান করে জর না বাঁধালে ভাল লাগবে কেন?"

কি আর বলবে সবিতা চুপ করেই থাকে। জরও হয়েছে শত্তুর, লেগেই আছে পেছনে।

খুকী ভালই রাঁধে। কি ক'রে যে শিখল! সে তো ভুলেও একদিন মেয়েকে রান্না শেখাতে ব্যস্ত হয় নি। লাল ডুরে শাড়ী, খয়েরী রং-এর হাতকাটা সস্তা ছিটের ব্লাউজ গায়ে, আগুনের আঁচ লেগে মুখখানা ডালিম ফুলের মত লাল।

ডালে সম্বরা দিয়ে মাছ কুটতে বসে অতসী ফিরে তাকাল, "রাঁধতে পাওনি বলে রাগ করে বসে আছ বুঝি? বেশ থাক। আমি খাচ্ছিও না কিচ্ছু না। তোমার ছেলেই সব খাবে এখন।"

হেসে ফেলল সবিতা, "হ্যাঁ আমার দায় পড়েছে রাগ করতে। রাঁধতে দিলে নে ভালই তো, কেমন বাতাসে বসে আছি দিব্বি আরামে পা ছড়িয়ে।"

একটু ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে। কাছেই কোথায় কাঁঠালচাপা ফুটেছে, কড়া গন্ধ হাওয়ায়।

ক্রমশঃ

অবুঝ

শ্রীপ্রিয়লাল দাশ

কহিল সবুজ পত্র
গরবে বিভোর,
ওরে ও নীরস কাণ্ড,
কিবা কাজ তোর?

কাণ্ড কহিল হেসে,
তোর বাহাদুরি
এখুনি ফুরাবে ওরে—
আমি যদি মরি।

রাষ্ট্র ও রণ-নীতিতে আধুনিক চীন

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

চীন-যুদ্ধের চার বৎসর শেষ হ'য়ে গেছে। চীন আক্রমণের প্রথম দিকে জাপ-প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ের ঘোষণা শুনে কেউই সেদিন কল্পনা করতে পারেনি যে, চীন-যুদ্ধ পঞ্চম বর্ষেও পদার্পণ করবে। সদম্ভ ঘোষণায় প্রিন্স বলেছিলেন, তিন মাসের মধ্যেই বর্ব্বর চীনকে সভ্য না করে তিনি ছাড়বেন না। কিন্তু চীন এমনি উদ্ধত যে, সুসভ্য জাপ-প্রধান মন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সভ্যতার পথে এগিয়েতো গেলই না, উপরন্তু সারা এশিয়ায় সভ্যতা বিস্তারের পূর্ণাঙ্গ কল্পনা নব বিধানেরও মহা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বৎসরের পর বৎসর গড়িয়ে চলল, জাপান চীন-যুদ্ধের কোনও সুরাহা করতে পারল না। এদিকে ক্রমে ক্রমে ব্যয়-সঙ্কোচের খাতিরে প্রেক্ষাগৃহ, রেস্তোঁরা, নাট্যশালা প্রভৃতি রাজাদেশে বন্ধ হ'তে লাগল। জাপানের শিল্প-কেন্দ্রগুলি কাঁচা মালের অভাবে একে একে শুব্ধ হ'তে লাগল। বেকার-সমস্যা কাল বৈশাখীর মেঘমালার মত জাপানকে বুকের তলায় চেপে ধরল। বিধবা ও নিরন্নদের হাহাকারে আকাশ উঠল কেঁপে, জাতির ভবিষ্যৎ ছেলে-মেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় অশ্রু-চোখে ঘুরে বেড়াতে লাগল, লক্ষ লক্ষ যুবকের বুকের শোণিতে রণক্ষেত্র রক্ত-পিচ্ছিল হ'ল— তরুণ চীন স্বাধীনতার নূতন উদ্দীপনায় আক্রমণকারীর চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি সহ্য করেও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে চাইল না। এই চারিটি বৎসর দ্রুত যুদ্ধ-শেষের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কত প্রধান মন্ত্রী জাপানের তক্ত অলঙ্কৃত করলে আবার হতাশ হ'য়ে ম্লানমুখে কতজনকে বিদায় নিতে হ'ল—সে ইতিকথা কারোই অজানা নয়।

সান-ইয়াৎ-সেন চীনের বুকে প্রথম মুক্তির বীজ [illegible] তাকে ফলপ্রসূ করে তোলার ভার থাকে তাঁর প্রধান শিষ্য চিয়াং-কা-শেকের উপর। কম্যুনিষ্ট-বিরোধীদের প্ররোচনায় ও জাপানের ভ্রূকুটি-কুটিল ইঙ্গিতে সংগঠনের নীতি ছেড়ে জাপ-প্রভুদের খুসী করার জন্য চিয়াং শ্রেণী-বিরোধের আগুন চীনে জালল। কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলতে লাগল। তারপর কৌশলে শিয়ান্ শহরে কম্যুনিষ্টরা চিয়াংকে বন্দী করে। জাপানের অত্যুগ্র সাম্রাজ্য লিপ্সাকে বাধা দেবার সর্ত্তে বিরোধের অবসান হয়। চুক্তি-সর্ত্ত অনুযায়ী ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট গঠিত হ'ল। এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে, চীনের কম্যুনিষ্ট গরিলা বাহিনী এই শ্রেণী-বিরোধের (Class war) আশ্রয়ের গঠিত হবার সুযোগ পায়।

যুদ্ধারম্ভের পর চীনের পররাষ্ট্র নীতিতে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। বৃটেন ও আমেরিকা পূর্ব্ব হ'তেই শোষণের সূত্রে চীনের সঙ্গে জড়িত ছিল। জাপান অনেক চেষ্টা করেছিল উক্ত জাতি দু'টাকে চীন হ'তে সরিয়ে দিয়ে নিজের আসন সেখানে স্থাপন করতে; কিন্তু তারাই বা তাদের কায়েম স্বার্থটুকু সহজে ছাড়তে চাইবে কেন? যুদ্ধের সময়ে এই দ্বন্দ্বের সুযোগ চীন পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগাল। উক্ত জাতি-দ্বয় নিজেদের স্বার্থকে চীনের বুকে অটুট রাখার জন্য এবং সুযোগ পেলে তাকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য চীনের সাহায্যে এগিয়ে এল। আমেরিকা তার ধন-ভাণ্ডার খুলে দিল। বৃটেনও ব্রহ্ম-চীন-পথ মঞ্জুর করে, অস্ত্র সরবরাহ করে ও, অন্যান্য কতকগুলি সুবিধা দিয়ে চীনকে সাহায্য করতে লাগল। জাপান তখন অতি দ্রুত চীনের বন্দরগুলি গ্রাস করে চীনকে বাইরের সাহায্য হ'তে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করল। চীন তাতে কাবু হ'ল না, ব্রহ্মের পথে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করে প্রয়োজন মিটাল।

চীনের পররাষ্ট্র বিভাগ জাপ-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালাতে লাগল সামরিক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে। রাশিয়া চীনকে সাহায্য করতে রাজী হ'ল। কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে চিয়াং-এর বিরোধের মিটমাট হওয়ার ফলে চীন রাশিয়ার কিছুটা সহানুভূতি আকর্ষণেও সক্ষম হ'ল। বাহিরের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় রাশিয়াই চীনকে সক্রিয় সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশী। যুদ্ধের আবশ্যকীয় পণ্য সে চীনকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই দিয়েছে; তা ছাড়া বৈমানিক, স্বেচ্ছাসৈনিক ও সমর-বিশেষজ্ঞের সাহায্যও উপেক্ষণীয় নয়।

জাপান রাশিয়ার পুরাতন শত্রু। জাপানীদের চীন-আক্রমণ সাফল্য মণ্ডিত হ'লে রাশিয়াকে জাপানের সঙ্গে পিঠাপিঠি বাস করতে হ'বে—যা তার কখনো কাম্য হ'তে পারে না। চীনকে সাহায্য করার ব্যাপারেও রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে 'ডায়েলেক্‌টিক্' মতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'ডায়েলেক্‌টিক্' মতের বাংলায় বিশ্লেষণ করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বলা যেতে পারে। চীনকে রাশিয়া যতই সক্রিয় সাহায্য করবে জাপান ততই আঘাত পাবে বেশী। তাতে তার আক্রমণের শক্তি যাবে অনেকটা কমে। যদি শেষ পর্য্যন্ত জাপান জয়ীও হয় এবং প্রতিবেশী হিসেবে দু'টো শত্রুকে পাশাপাশি বাসই করতে হয়, তাহ'লেও রাশিয়াকে আক্রমণ করার শক্তি সংগ্রহ করতে জাপানকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হ'বে। ততদিনে রাশিয়ার সামরিক প্রস্তুতি ক্রোড় অঙ্কে উপনীত হবে। এই সমস্ত সুবিধার কথা বিবেচনা করেই রাশিয়া নীতিগত ভাবে চীনকে সাহায্য করেছে এত বেশী।

এমনি ভাবে বাহিরের তিনটি প্রথম শ্রেণীর জাতির সাহায্য পেয়ে চীন দৃঢ়ভাবে জাপানকে বাধা দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাতে একটু ব্যতিক্রম হ'ল। ইয়োরোপে জ্বলে উঠলো দ্বিতীয় মহাসমরের অগ্নিশিখা। বৃটিশ তাতে সাক্ষাৎ ভাবে নেমে পড়তে বাধ্য হ'ল। তাতে চীনকে সাহায্যের শক্তির তার কিছুটা শিথিল হ'ল সত্য; কিন্তু চীনকে তাতে খুব বেশী অসুবিধায় পড়তে হ'ল না। বৃটিশ যদি শুধু মাত্র জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত হ'ত তাতে চীন তার কাছ থেকে কোনও সাহায্য পেত কিনা বলা যায় না। অক্ষ-শক্তির সকল অংশীদার একযোগে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় জাপান তার যুদ্ধ-লিপ্ত শত্রু হিসাবে গণ্য হ'ল। জাপান বৃটিশ অধিকৃত ব্রহ্মদেশ ও ভারত আক্রমণ করতে পারে, সুতরাং জাপানকে সেই আক্রমণ হ'তে বিরত রাখতে চীনের শক্তি বৃদ্ধিই যুক্তিযুক্ত পন্থা। অবশ্য চেম্বারলেন যদিও এক সময় জাপানকে তোষণ নীতির দ্বারা সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্রহ্ম-চীন-পথ বন্ধ করে তোষণ নীতির প্রাথমিক কর্ত্তব্য সাধন করেছিলেন। জাপান তাতেও চীনের বুকে বৃটিশের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাইল না বা বন্ধুত্ব-জ্ঞাপক কোনও ইঙ্গিতই জাপান বৃটিশকে দেখাল না। তখন বৃটিশ চীনকে সাহায্য করার পন্থাই পুনরায় পরিগ্রহ করতে বাধ্য হ'ল।

যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল। কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে চিয়াংএর একটা আপোষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের গতিবিধির উপর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কখনো ফিরান নি। তাদের কর্ম্মতৎপরতার প্রতিটি সংবাদ চিয়াং রাখতেন। কম্যুনিষ্ট গরিলা বাহিনীর গতিবিধি রাজ্যের সর্ব্বত্র অবাধ হ'ল। উঁচু-নীচু সকলের সঙ্গেই তাদের মেলা-মেশার সুযোগ ছিল অপর্য্যাপ্ত। এই সুযোগের অপব্যবহার গরিলারা কখনো করেনি। অবসর সময় তারা জনসাধারণকে কম্যুনিষ্টমতবাদ বুঝাত এবং অবিশ্বাসীর সঙ্গে তুমুল তর্ক করে তাদেরও স্বমতে আনতে চেষ্টা করত। এমনি করে ক্রমে চীনের অধিকাংশ ধনিক প্রদেশই কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন হ'য়ে উঠল। চিয়াং প্রমাদ গুণলেন। এবং তিনি বিরোধের ধুয়া তুলে কম্যুনিষ্টদের কতক বাহিনী ভেঙ্গে দেবার আদেশ দিলেন। তাতে গরিলাদের কতক দল অবসর নিতে বাধ্য হ'ল। কিছুদিন তেমনি ভাবে চলল, কিন্তু তাতে চীনের অনুসৃত রণনীতির অনেকটা অসুবিধা হ'ল।

অবশেষে আবার তাদের ফিরিয়ে আনতে চিয়াং বাধ্য হ'লেন। অনেকে অনুমান করেন যে, এই কম্যুনিষ্ট বিতাড়নের অন্তরালে বিদেশীয় প্রভাবও কিছু নাকি ছিল।

কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে চিয়াং-এর এই বিরোধে রাশিয়া তার সাহায্য-নীতির বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম করল না। তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে শত্রুকে দুর্ব্বল করার নীতি হিসেবে সে তখনো চীনকে সমানই সাহায্য করেছে। গরিলারা আবার পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু নূতন বিপদ দেখা দিল। হঠাৎ হিটলার পাগলের মত রাশিয়ার ঘাড়ে ঝাপিয়ে পড়ল। রাশিয়া জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হ'য়ে পড়ল। জার্ম্মাণীর সঙ্গে রাশিয়ার এই বিরোধ শুধু স্বার্থ নিয়ে নয়—নীতির দ্বন্দ্ব। সুতরাং রাশিয়াকে সর্ব্বশক্তি নিয়োগে রণরঙ্গে মেতে উঠতে হ'ল। চীন অফুরন্ত সাহায্য হ'তে বঞ্চিত হ'ল বটে, কিন্তু অন্যদিক আবার তার উপর জাপানের চাপ অনেক শিথিল হ'য়ে গেল। জাপান তার জার্ম্মাণ মিতার মন রাখতে হাইনান প্রভৃতি কতকস্থানে সৈন্য সমাবেশ করে রাখল যাতে বৃটিশের প্রয়োজন হ'লেও তার বাহিনী বা নৌশক্তি প্রাচ্য সাম্রাজ্য রক্ষণ হ'তে সরিয়ে নিতে না পারে। পরোক্ষ ভাবে তাতে আমেরিকার উপরও কিছুটা চাপ দেওয়া রইল। লক্ষ লক্ষ সৈন্য জাপানের নিহত হ'য়েছে চীন-রণাঙ্গনে, সুতরাং এই সৈন্য সমাবেশ তাকে বাধ্য করেছে চীন হ'তে সৈন্য সরিয়ে নিতে।

তারপর রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ জাপানকে খুবই চঞ্চল করে তুলেছে। অক্ষশক্তি তাকে চাপ দিচ্ছে মঙ্গোলিয়া সীমান্তে রাশিয়াকে আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু জাপান চীন-সমস্যার কথা ভেবে মোটেই এগুতে পারছে না। রাশিয়া আক্রমণ করলে চীন রাশিয়ার সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করে যুদ্ধ চালাবে যাতে জাপানের বর্ত্তমান শক্তি তাকে বাঁচাতে পারবে বলে মনে হয় না। নৌ-বহর ও বাণিজ্য-বহরকে জাপান তলব করেছে। কি যে তার উদ্দেশ্য তা ঠিক বোঝা

যাই হোক, আহ্বান ও তলবের সুবিধা নিয়ে চীন তাব হৃত শহরগুলি ক্রমে ক্রমে পুনরধিকার করে চলেছে। জাপানী সৈন্যদের মধ্যে কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভাব এসে গেছে। তবে বোমারুরা প্রায়ই সংবাদ-পত্রে বড় হরপে ছাপাবার মত খোরাক সংগ্রহ করে দেয় বেপরোয়া বোমা বর্ষণ করে। চুংকিং শহরের উপর এই পর্য্যন্ত আটাশ বার বোমা বর্ষিত হ'য়েছে। এমনি ধারা অনেক শহরই তারা আক্রমণ করে চীনাদের পঙ্গপালের মত হত্যা করে। তাতে সামরিক দিকে তাদের কোন লাভ হয় কিনা জানি না, তবে হত্যার সংখ্যা উল্লেখ করে নিরীহ জাপানী জন-সাধারণকে শোষণের সুবিধা কিছুটা নিশ্চয়ই হয়।

যুদ্ধের সময় যাদের রাজ্যের উপর যুদ্ধ হয় তাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সাধারণ জীবন-যাত্রা অনেকাংশে ব্যাহত হ'তে বাধ্য। চীনের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক তাই। উপর হ'তে দেখলে মনে হয়, সারা জাতটাই একটা তীব্র মাদকের জোরে চলছে। সারা জাতিটাই যুদ্ধের জরুরী ব্যবস্থায় আত্ম-নিয়োগ করেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে সমাজ-ব্যবস্থার যতই অসুবিধা হোক না কেন তারা তা ভ্রূক্ষেপও করে না। স্বাধীনতা রক্ষা করার নেশায় আজ তারা মশগুল। স্ত্রীর সামনে স্বামীর দেহ ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে—কাঁদবার অবকাশ স্ত্রীর নেই। হয়ত আহতের শয্যাপাশে, নয়তো লাঙ্গলের খুটি ধরে কিম্বা শ্রমিক হিসাবে পুরুষের শূন্য স্থান চীনের নারীরা এগিয়ে এসে পূর্ণ করে দিচ্ছে। পুরুষকে তারা পেছনের সমস্ত বন্ধন কেটে যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়েছে; আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারের ভার মেয়েরাই হাতে নিয়েছে এবং নিপুণ ভাবে তা সম্পাদন করে যাচ্ছে। নগর-রক্ষী বাহিনী, শ্রমিক, চাষী, সেবিকা-বাহিনী প্রভৃতি কাজের ভিতর দিয়ে চীনা নারীরা দেশের সেবা করে যাচ্ছে অবিচল। নগরের পর নগর বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হ'য়ে যাচ্ছে; আত্মীয় বান্ধব, পতি-পুত্রহারা চীনরমণীগণ নিঃস্ব-ভাবে পশ্চাদপসরণ করেছে। এতটা নৃশংস ও বর্ব্বর অত্যাচার করেও জাপানীরা চীনা জন-সাধারণের নৈতিক

শক্তিকে দুর্ব্বল করতে পারেনি। জাপসৈন্য যতদিন যে স্থান অধিকার করে থাকে ততদিন তা জাপানের অধিকারে থাকে, সামরিক শক্তি প্রত্যাহার করলেই তা পুনরায় চীনারা নিয়ে নেয়; জন-সাধারণ জাপানীদের কোনও অবস্থায়ই কিছুমাত্র সাহায্য করে না। কিন্তু শুধু সামরিক শক্তি প্রয়োগে কোন জাতিকে কেউ আজ পর্য্যন্ত দখলে রাখতে পারেনি বা তা সম্ভবও নয়।

জাপানীরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করল যে, চীনাদের পঙ্গপালের মত হত্যা করা মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু তাদের বশে রাখা খুবই কষ্টকর। সেইজন্যই চীনাদের মধ্য হ'তেই একজনকে তাঁবেদার রূপে দাঁড় করিয়ে তাদের যদি ভেদনীতির নিষ্পেষণে ফেলা যায় তবে হয়ত অনেকটা সুফল পাওয়া যেতে পারে। দলত্যাগী ওয়াংকে জাপানীরা সাংহাইতে প্রতিষ্ঠা করল; কিন্তু তাতেও সুফল কিছুই পাওয়া গেল না। গুপ্ত-হত্যা ও ষড়যন্ত্রের জালে তাঁবেদার সঙ্ঘ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। ওয়াং-এর উপর জন-সাধারণের যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তাও নিঃশেষে মুছে গেল। ওয়াং জাপানীদের ঘাড়ে দুর্ব্বার বোঝার মত চেপে রইল।

এবার যুদ্ধের জরুরী অবস্থার জন্য চীনের সমাজ-জীবন কিরূপ পরিগ্রহ করেছে, তার একটু আভাষ দিয়েই চীনাদের রণনীতির মোটামুটি ব্যাখ্যা করব। চীনাদের গ্রাম্য জীবন যুদ্ধের জন্য ব্যাহত হ'লেও তার খুব বেশী বিবর্ত্তন হয় নি। জাপ-অধিকৃত স্থানের গ্রামগুলির শহরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। শহর ও শহরতলীর উপর জাপানীদের সামরিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল। অনেকটা সৈন্যদের ছাউনির মত তারা শহরগুলি ব্যবহার করতে লাগল। শহরের শৃঙ্খলা তারা ফিরিয়ে আনতে পারল না, কারণ যে কোন শহরই চীনেরা যখন ছেড়ে গেছে তাতে শত্রুর কোনও উপকারে শহর ব্যবহৃত হ'তে পারে তেমন কিছু তারা রেখে যায় নি। সুতরাং সে শহরগুলিকে ভূত-পূর্ব্ব শহর বলা যেতে পারে, বর্ত্তমানে তাদের শহর বলা শুধু নামের খাতিরে।

প্রতিটি শহরের পতনের পর শিশু, বৃদ্ধ ও নারীরা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, সমর্থ যুবক-যুবতীরা স্বাধীন চীনা-বাহিনীর সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করছে। তাই জাপ অধিকৃত অঞ্চলের চাষ-আবাদে বয়স্ক ও মেয়েদেরই দেখা যায় বেশী।

যুবকদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে জানে তাদের নিয়মিত সৈন্য-শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে নেওয়া হ'ল। অবশিষ্ট যুবকদের রণক্ষেত্রের বহু পশ্চাতে কোনও নিরাপদ স্থানে সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য পাঠান হ'ল। সেই দিনের যে শিক্ষানবীশরা আজ উন্নত ধরণের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে দেশের জন্য অস্ত্র ধরেছে এবং এখনো লক্ষ লক্ষ চীনা যুবক সামরিক শিক্ষাধীন। এ বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, জাপানীদের আক্রমণ কোনও কোনও ব্যাপারে চীনের পক্ষে মঙ্গলজনকই হ'য়েছে। অত অল্প সময়ের মধ্যে একটা গোটা জাতিকে সামরিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা অন্য সময়ে সম্ভবপর হ'ত না।

এ যুদ্ধ যে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হ'বে তা চীনারা জানত, তাই বালকদেরও তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যাতে বালকদের শিক্ষার কোনও অসুবিধা না হয় তার দিকে রাষ্ট্র-নায়কদের পূর্ণ দৃষ্টি আছে। তাদের সুদূর অভ্যন্তরের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। সেখানে তাদের সংস্কৃতি মূলক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক মনোবৃত্তিও গঠন করা হ'চ্ছে, যাতে ভবিষ্যৎ চীন বর্ত্তমানের চেয়েও আরও উন্নত হ'য়ে গঠিত হয়। আবার এদের মধ্যে যারা খুব ডানপিটে প্রকৃতির তাদের বেছে বেছে গুপ্তচরের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। এদের ভিতরও দু'টি দল গঠন করা হ'য়েছে। একদল সংবাদ সংগ্রহ করে, আর একদল তা সরবরাহ করে। গরিলাদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ খুব সুস্পষ্ট। এরা শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে ভিক্ষা, চাকরির সন্ধান ও ফিরি করবার জন্য ফলমূল নিয়ে যায় এবং ঘোরাফেরা করে সব সময় শত্রুর গতি-বিধির সন্ধান নিতে চেষ্টা করে। যখনই কিছু সংগ্রহ করতে পারে অন্য দলকে তা জানিয়ে দেয়। তারা পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, মরু—প্রকৃতির শত অসুবিধাকে উপেক্ষা করেও তা যথাস্থানে

পৌঁছে দেয়। অনেক সময় এ কাজে তাদের মৃত্যুকেও বরণ করতে হয়, তবুও তাদের দেশসেবার চেষ্টার বিন্দুমাত্রও বিরতি নেই। এদের সংবাদের উপর নির্ভর করে গরিলারা অনেক সময় নিতান্ত আকস্মিক আক্রমণ করে বড় বড় শত্রুদলকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করতে সক্ষম হ'য়েছে। তরুণ বয়সের বালকদের মধ্যে এ ধরণের স্বদেশ ও স্বাধীনতা-প্রীতি সত্যই উল্লেখযোগ্য।

চীনের নায়করা যুবক ও বালকদের যেমন ব্যবস্থা করেছেন যুবতীদের দিকেও তেমন তারা উদাসীন নন। এই চার বৎসরের শিক্ষায় 'নার্সিংকোরে সহস্র সহস্র চীনা তরুণী সেবার ব্রত গ্রহণ করেছে। তারা আজ সংসারের বন্ধন, পতি-পুত্রের মায়া সব ভুলে গিয়ে রণক্ষেত্রের গোলাগুলির মধ্যে বিভিন্ন কাজে নিজেদের নিয়োগ ক'রেছে। এই নারী-জাগরণের অন্তরালে চীনের চির শুভানুধ্যায়ী দু'জন মহিলার নাম না করে পারলাম না; তাঁরা হ'লেন মাদাম্ সান্-ইয়াৎ-সেন ও মাদাম্ চিয়াং। এঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা চীনের নারী-জাগরণে যুগান্তর নিয়ে এসেছে।

কম্যুনিষ্টদের স্বপ্ন 'ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট' যেদিন সিয়ান্ সহরে সত্যে পরিণত হ'ল, তা জাপানী রাষ্ট্র-কর্ণধারদের কানে মহা দুঃসংবাদের মতই গিয়ে পৌছাল। জাপানীরা এই সম্মিলিত শক্তিকে সুসজ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হবার সুযোগ দেওয়া মূর্খতারই নামান্তর মনে করল। চীন আক্রমণ করা সাব্যস্ত হ'ল। বিবাদ কি ভাবে সৃষ্টি করা যায় তার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের বেশী ভাবতে হয় না, যেমন আবিসিনিয়ার বেলায় ইটালিকেও বেশী ভাবতে হয়নি। এদেরও বেশী বেগ পেতে হ'ল না। জাপানীরা স্বদলের একজন সৈনিককে খোঁজার ছুতায় সীমান্তবর্ত্তী একটা চীনা শহরে প্রবেশ করতে চাইল। আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন কোনও শক্তি—সে যতই দুর্ব্বল হোক—পররাষ্ট্রকে সে সুযোগ দিতে পারে না। সুতরাং জাপানীরা চীন আক্রমণ করল। অবশ্য জাপানীদের খেয়াল মাফিক কাজ করলেও তারা চীন আক্রমণ করতই কারণ তাদের সৈন্য খোঁজাই মূল কারণ ছিলনা, উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণ করা। চীন তখনো তার শক্তি সুসংঠিত করতে পারেনি। শত্রুকে সম্মুখ যদ্ধে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব, তা তারা বুঝল। সামরিক সভায় সমগ্র সম্মিলিত নেতাদের উপস্থিতিতে স্থির হ'ল, গরিলা রণনীতিতে যুদ্ধ চালান হ'বে এবং শত্রু-সীমার পশ্চাতেও শক্তিশালী গরিলা বাহিনী নিয়োগ করা হ'বে।

গরিলা-রণনীতির মোটামুটি একটু আভাষ দিলেই চীনের রণনীতি অনেকটা পরিষ্কার হবে। গরিলা যুদ্ধ প্রথা সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা চলে। (১) প্রথম শত্রুর আক্রমণ অবস্থায় তাদের অগ্রগতিতে যতটা সম্ভব বাধা দিয়ে সুসজ্ঘবদ্ধ ভাবে পিছু হটতে হ'বে। (২) শত্রুকে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত রাখতে হ'বে, বিশ্রাম করে যাতে তারা শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে। শত্রুর দুর্ব্বলতার সুযোগে তাদের অনবরত অতর্কিত আক্রমণে দুর্ব্বল করে দিতে হ'বে। (৩) শত্রু যখন পিছু হটতে আরম্ভ করবে তখন ক্রমাগত চাপে চাপে তাদের পিষে মারতে হ'বে। যাতে তারা কোন সুরক্ষিত ঘাঁটিতে আশ্রয় নিতে না পারে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হ'বে।

সাধারণতঃ বাহিনীর সঙ্গে এমন অনেক কিছু ভারি জিনিষ থাকে যাতে তাদের চলাফেরা সময় এবং সুযোগ সাপেক্ষ হ'তে বাধ্য। গরিলাদের ও সব বালাই নেই, বেয়নেট চাপান এক-একটি বন্দুক মাত্র সম্বল। তাই আক্রমণের মুখ হ'তে আত্মরক্ষা করে সব সময়ই তারা পাশ কাটিয়ে চলে। পরিচয় পাবার মত কোনও ইউনিফর্ম তারা ব্যবহার করেনা। বেতাল দেখলেই পুরাদমে চাষ আবাদের কাজে আত্ম নিয়োগ করে বা গরু চরিয়ে দিন কাটায়। ছোট ছোট দল বলেই তারা এমনি ভাবে গ্রাম-বাসীর ভেতর মিশে যেতে পারে। আবার যখন সুযোগ আসে বন্দুক বের করে দলবদ্ধ হ'য়ে যায়।

কিন্তু গরিলাদের মত বিচ্ছিন্ন ভাবে সমগ্র বাহিনী চালনা করা সম্ভব নয়। তাই চীনের মূল বাহিনী সঙ্ঘবদ্ধ থেকেই যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় সংগ্রাম করতে করতে পিছু হ'টেছে। যাবার পথে রসদ, রাস্তা, ঘাট, নগর, শহর সব ধ্বংস করে গেছে যাতে শত্রু অধিকৃত স্থানে কোনও সাহায্য না পায়। এমনি ভাবে যতই জাপানীরা চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগল ততই তাদের অসুবিধা বাড়তে লাগল বেশী। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব্ব চলেছে পাল্টা আক্রমণ

দিয়ে। ততদিনে চীনা শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি হ'তে যথেষ্ট সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্যের সাহায্য পেয়েছে। আজ চীনের বাহিনী যে বিরাট এ বিষয়ে কারও মতান্তর নেই। বাহিরের শক্তি-সমূহের সাহচর্য্যে অস্ত্র-শস্ত্রেও সে আজ আর তেমন দুর্ব্বল নয়।

এদিকে নিয়মিত বাহিনী ছাড়াও শত্রুর সীমার পশ্চাতে বিরাট গরিলা বাহিনী বিচ্ছিন্ন ভাবে ইতস্ততঃ ধ্বংসের কাজে ব্যস্ত। জাপানীদের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল যে গরিলারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। গরিলারা যোগানদার কেন্দ্র হ'তে রসদ-পত্রাদি সরবরাহে বিপুল বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যে রাস্তা চীনের মূল বাহিনী নষ্ট করে দিয়ে গেল, জাপানীরা তা মেরামত করে কাজ চালাবার উপযোগী করে তুলল। কিন্তু সত্যিকার রাস্তা ব্যবহারের সময় দেখলে, কোন অলক্ষিত সময় গরিলারা তা নষ্ট করে দিয়ে গেছে। রেল লাইন উঠিয়ে ফেলা, রাস্তা ভেঙ্গে দেওয়া, টেলিগ্রাফের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা, সেতু নষ্ট করা, বিদ্যুৎ সরবরাহে বাধা সৃষ্টি—এই সবই হ'ল গরিলাদের কাজ। এই সব অসুবিধায় পড়ে অনেক স্থান হ'তে জাপানীরা গোটা বাহিনী পর্য্যন্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হ'য়েছে তেমন নজীরেরও অভাব নাই।

এই ক্ষুদ্র গুপ্তশত্রুর জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে জাপানীরা গরিলা ধ্বংসে কৃত সঙ্কল্প হ'ল। লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী জাপানীদের অত্যাচারের রথচক্রতলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।

অবশেষে সে অত্যাচারও তারা বন্ধ করতে বাধ্য হ'ল—অযথা অসামরিক গ্রামবাসীদের হত্যা করলে বিপ্লব যদি ছড়িয়ে পড়ে? আজও গরিলা-ভীতির অবসান তাদের হয়নি, বরং গরিলারা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হ'য়েছে। মাঝে ২।১টা দলকে তারা পাকড়াও করতে সক্ষমও হ'য়েছে বটে, কিন্তু কোনও তথ্যই তাদের কাছ থেকে আবিষ্কৃত হয় নি—অম্লান বদনে তারা দানব শক্তির অত্যাচারের তলে আত্মাহুতি দিয়েছে। গরিলা বাহিনীতে নারী পুরুষ দু-ই আছে। চীনের নারীরা আজ কাল সব কাজেই পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমান দায়িত্ব বহনে সক্ষম।

যে-গরিলা বাহিনী চীন-যুদ্ধের প্রায় গতি ফিরিয়ে দিয়েছে বলা চলে, কোথা হ'তে তারা এ শক্তি পেল তার আভাষটুকু জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। গরিলা-বাহিনীর অধিকাংশই চীনা কম্যুনিষ্ট দল হ'তে সংগৃহীত। নানকিং রাজশক্তির সঙ্গে কম্যুনিষ্টরা দীর্ঘদিন যুদ্ধরত ছিল। নানকিং রাজশক্তি অস্ত্রশস্ত্রে অনেক বেশী সজ্জিত হয়েও এদের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারে নি রণদক্ষতা ও পরিচালনার গুণে। এদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা অতি অল্প অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়েও শত্রুকে গুরুতর আঘাত হানতে পটু। অনশন বা অর্দ্ধাশনে থেকে দিনের পর দিন এরা অক্লান্ত সংগ্রাম করতে অভ্যস্ত। প্রকৃতির কোনও বাধাই এদের সহিষ্ণুতা ও শৃঙ্খলা নষ্ট করতে পারে না। চীনের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেছেন বিখ্যাত কম্যুনিষ্টদের 'লঙ্গ মার্চ্চ' তাঁদের অজানা নয়। কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়ে প্রকৃতির কত বিপর্যায়কে অতিক্রম করে এরা সুশৃঙ্খল ভাবে মাসের পর মাস শত শত মাইল অতিক্রম করে গেছে। লঙ্গ মার্চ্চই কম্যুনিষ্ট-বাহিনী ও গরিলা-বাহিনীর শৃঙ্খলা ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত। লঙ্গ মার্চ্চের অধিনায়ক ছিলেন 'চু-টে'। তাঁর উপযুক্ত শিক্ষা ও অমায়িক আচরণ সমগ্র কম্যুনিষ্ট অঞ্চলকে এক দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধশক্তিতে পরিণত করেছে। সুতরাং পরবর্ত্তীকালে তাদের রণদক্ষতা যদি জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সার মুখে ব্যর্থতার গ্লানি লেপে দিতে সক্ষম হয়, তা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় হবেনা—স্বাভাবিক বলেই মনে হবে।

অভিযোগ-ভরা অভিশাপ

(গল্প)

শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাংলার "নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ সঙ্ঘ" গঠনের জন্য কয়েকজন কর্ম্মঠ ও উৎসাহী যুবকের প্রয়োজন। আসুন দেখা করুন, সঙ্ঘে মিলিত হয়ে সাহায্য করুন।

—যমুনা দেবী।

এই বিজ্ঞাপনটুকু বাংলার অনেক যুব-মনকে আকর্ষণ করলে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক সভায় তারা মিলিত হ'ল। এই সঙ্ঘ গঠনের উদ্যোক্তা একজন নারী এবং তিনি বাংলার বাহিরের কোন ফিল্ম কোম্পানীর অভিনেত্রী। ইঁহারই নাম যমুনা দেবী।

সভার প্রারম্ভে সমবেত যুবকদিগকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—"আজ যে আপনাদের আমি ডেকে পাঠিয়েছি, আপনাদের সাহায্য চেয়েছি এ চাওয়ার প্রয়োজন বোধ হয় ছিল না। নারী নির্যাতন যে বাংলায় ছেয়ে ফেলেছে এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা পুরুষের অনেকদিন আগেই উচিত ছিল। তা হয় নি বলেই আমায় এই কাজে নামতে হ'ল। আপনারা কে কে সঙ্ঘের সেবক হয়ে কাজ করতে চান এই খাতায় সই করুন।"

সকলের সই করা হয়ে গেলে তিনি পুনরায় বললেন—"আমি একজন ফিল্ম অভিনেত্রী বলে ঘৃণা করবেন না। বাংলার মেয়ে আমি—আমার উপার্জ্জিত অর্থে আমি আপনাদের সাহায্য করবো। আপনারা সমস্ত নির্যাতিত অপমানিত নারীদের দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। আজ বাংলার সব চেয়ে বড় সমস্যা—নারীনিগ্রহ বন্ধ করা। যে জাতি তাদের নিজেদের নারীদের ধর্ম্মরক্ষা করতে পারে না তারা স্বাধীনতার দাবী করে কি করে? দিকে দিকে নারী নির্যাতনের সংবাদ শুনে কি মনে হয় না, বাঙ্গালী আজ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে? নারী-নিগ্রহকারীদের দমন ও শাস্তি বিধানের জন্য বাংলাদেশে একাধিক সমিতি আছে। কিন্তু এতেও কতটুকু কাজ হচ্ছে? মুসলমান সমাজ আজও এ বিষয়ে উদাসীন—তারই ফলে সমগ্র দেশের মুসলমান সমাজের বড় কম ক্ষতি হয় নি! তবুও হিন্দুদের উদাসীন থাকলে চলবে না—তাদের নারীরা দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক অপহৃত ও বলপূর্ব্বক অত্যাচরিত হলে সমাজে স্থান পায় না। সেই সব নারীদের বাঁচবার জন্যও কতটুকু উপায় করা হয়েছে? কেন হয় নি? আমাদের তাই করতে হবে।"

একটু থেমে আবার বললেন—আপনাদের সেই সঙ্গে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। সকলে বলুন পরমপিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করে প্রতিজ্ঞা করছি—আমরা বাংলার যথার্থ কল্যাণ চাই। বাংলাকে বাঁচাতে চাই, বাংলার শক্তিকে জাগাতে চাই। নারীর মর্য্যাদার প্রতি সচেতন হবো, দেশের সব চেয়ে লজ্জা ও কলঙ্কের কথা বাঙালী জাতি নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে না—তা দুর করবো। দুর্বৃত্তদের কাছে কোন লাঞ্ছনা, অবমাননা সহ্য করবো না।"

শেষে একটা প্রার্থনা করে সভা ভঙ্গ হ'ল।

উপস্থিত যুবকদের মধ্যে একজনের এই কাজে বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল—সে ছেলেটির নাম বিরল। সকলে আবার নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হবার কথা দি[illegible] চলে গেল। অনুষ্ঠানকর্ত্রী বিরলকে একটু অপেক্ষা কর[illegible] বললেন।

বিরল বললে—আমার সঙ্গে কি আপনার কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে?

—হ্যাঁ! বসুন!

—দেখুন, আমাকে আপনি অতটা 'আপনি' বলবেন না কারণ আমার চেয়ে আপনি অনেক বড়, মায়ের সমান।

ছেলেটির কথা শুনে সেই নারীর হৃদয় যেন একবার বিচলিত হয়ে উঠলো। কিন্তু তাকে তা জানতে না দিয়ে বললেন,—"বেশ! এতগুলি ছেলের মধ্যে এই কাজে তোমাকেই বেশী উৎসাহী দেখলুম। মনে হ'ল এই কাজ করার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই ছিল, তবে সে সুযোগ হয় নি।"

—হ্যাঁ! আমার মত আমার দাদুরও ইচ্ছা এমনিতর একটা সঙ্ঘ তৈরী করে এর প্রতিকার করা। যে দেশের সমাজ শুধু শাসন করে—শাসিতকে রক্ষা করবার কোন চেষ্টা করে না, আমরা সেই সমাজকে পথ দেখাব।

—তোমার দাদুও ঐ কথা বলেন?

—হ্যাঁ, বলেন বৈকি, মাঝে মাঝে আমাকে বলেন, পারিস দাদু ঐ রকম একটা কিছু করতে? একজনের দ্বারা এ কাজ হবার নয়—তাই এতদিন ইচ্ছা সত্ত্বেও কাজে লাগতে পারিনি। বলেন তো তাঁকেও আমাদের দলে আনতে পারি!

—তিনি যদি আসতে চান—কথাটা বলেই কি যেন ভেবে নারী উত্তর করলেন—না, না আসতে চাইলেও আসা হবে না। বৃদ্ধ-মন নিয়ে আমাদের কাজ চলবে না।

—আমিও তাই দাদুকে বলতুম। তিনি বলেন—মন যাই হোক, মত যা দিতে পারি তা বোধ হয় কেউ দিতে পারে না।

—তাঁর কি মত জেনে সঙ্ঘের সভায় কথা তুলো ভালো হবে।

—তাই করবো।

—এখন তবে এসো। সময় মত যখন ইচ্ছা হবে দেখা করো!

বিরল চলে গেল। যমুনা দেবী যতক্ষণ পারলে তার মধ্যে কি যেন দেখতে পাওয়ার আশায় চেয়ে রইলেন। তারপর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগলেন অতীত জীবনের কথা!

২

বাড়ীতে গিয়ে বিরল দাদুকে জানাল সঙ্ঘের কথা। বলল—এতদিনে তোমার অন্তরের কথা কার্য্যে পরিণত করবার ক্ষমতা ও সুযোগ ভগবান দিলেন।

—কিন্তু সে একজন নারী?

—হ্যাঁ, দাদু! বললুম তো কোন ফিল্ম কোম্পানীর অভিনেত্রী।

—তার আর কিছু পরিচয় পাওনি?

—না।

—সে নিজে বোধ হয় একজন নির্য্যাতিতা নারী। তাই সব নির্য্যাতিতার প্রতিরোধের জন্য এই দৃঢ়-পণ ও অর্থব্যয়।

—হতেও পারে! তিনি কি বলেন জান দাদু? সমিতির উদ্দেশ্যের কথা তাদের প্রতিজ্ঞার কথা বিরল বলতে থাকে। হঠাৎ দাদুকে যেন চোখ মুছতে দেখে বলল—কি দাদু তুমি কেঁদে ফেললে? ঐ সমস্ত কথা শুনে তোমাদের চোখে জল আসতে পারে—আমাদের কি হয় জান দাদু—রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

—তোমাদের তো হবেই—এই বয়স। তোমরা এদিকে না দেখলে কে দেখবে?

—আমার প্রতি তাঁর যেন কেমন একটু বেশী স্নেহ দেখলুম। সকলে চলে গেলে আমাকে বসিয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমার এদিকে একটু বিশেষ উৎসাহ।

—কি বললে?

—বললুম শুধু আমার নয়, দাদুরও!

—জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

—কেনোর কি আছে? এ করা তো সকলেরই উচিত।

—তবু মনে কি হয় না—এর ভিতর কিছু না থাকলে এমন হয় না। তার যেমন ঐ কাজ করতে এত উৎসাহ এর ভিতরও কিছু আছে মনে হচ্ছে। আমারও কি কিছু থাকতে নেই?

—কি আছে দাদু? কৈ এতদিন তো কিছু বল নি?

—এতদিন তার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু তা জেনে লাভ নেই—শুধু মনে রেখ এই যে যা কিছু করতে যাচ্ছ তা নারীজাতির জন্যে নয়, দেশের জন্যে নয়, নিজের জন্যেও বটে।

—নিশ্চয়! প্রত্যেক যুবকেরই এটাকে নিজেদের বলে মনে করা উচিত।

একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে তার দাদু বলে—হ্যাঁ!—তা দাদু একবার আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে? তোমাদের দলের একজন সঙ্গী করে নেবে?

—কোথায় যাবে সেখানে?

—ভয় নেই শুধু তাকে একবার দেখব!

—তাঁকে বলেছিলুম, তিনি বললেন—আমাদের কাজ যুব-মন নিয়ে। তবে তাঁর ছবি তোমায় দেখাতে পারি। সম্প্রতি সহরেও তাঁদের তোলা ছবি দেখান হবে।

—সেই ভাল। শেষে বৃদ্ধকে দেখে যদি নাক সিটকায় তখন তোমার হয় ত রাগ হতে পারে তার ওপর!

—হওয়া কি অসম্ভব? তাঁর কাছ থেকেই একখানা তাঁর ফটো এনে দেখাব তা হলে হবে ত?

৩

পরদিনই আবার বিরল সেখানে গেল। তাকে বসতে বলে যমুনা দেবী প্রশ্ন করল—আচ্ছা আমাকে তোমাদের কি মনে হয়?

—মনে হয়, জীবনে আপনিও মস্ত বড় একটা আঘাত পেয়েছেন! কত নারী কত ভাবে নির্যাতিত হয় তার প্রতিকার হয় কৈ?

—তোমার মা নেই না!

—না! কোনদিন দেখেছি বলে মনে হয় না। বাবাকেও বড় মনে পড়ে না। বরাবর দাদুর কাছেই আছি, দাদুকেই জানি।

—সঙ্ঘের সমস্ত ভার আমি তোমার হাতেই দিতে চাই!

—আমাকে এতটা—

—হ্যাঁ! সম্প্রতি আমাদের দল বাইরে যাবে, কবে ফিরবে জানি না। আমার যা কিছু আছে সব আমি দেবো—তোমরা সঙ্ঘকে বাঁচিয়ে রেখে কাজ করবে!

—করবো বইকি, প্রাণ দিয়ে করবো!

—তুমি করবে জানি, তোমার মাঝে সে শক্তি সুপ্ত রয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি।

যমুনা দেবীর কণ্ঠে একটা নিশ্চিন্ততার আভাস ফুটে উঠল। বিরলও নিজের ভিতর যেন একটা শক্তির সাড়া অনুভব করল, বলল—আপনার আশীর্ব্বাদ—আর—

—আশীর্ব্বাদ! আশীর্ব্বাদ নয় এ সকল নির্যাতিত নারীর অভিযোগ তোমার কাছে। এ অভিযোগ তোমায় শুনতে হবে, প্রতিকার করতে হবে—নইলে সেই অভিযোগ অভিশাপ হয়ে তোমার ওপর পড়বে।

বলতে বলতে যমুনা দেবীর কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ হয়ে উঠল। বিস্মিত দৃষ্টি যমুনা দেবীর মুখে নিবদ্ধ ক'রে বিরল বলে উঠল—অভিযোগ! অভিশাপ!

নিজকে সামলে নিয়ে যমুনা দেবী উত্তর দিল—হ্যাঁ! ভেবে দেখো কত বড় ভার তোমার মাথার উপর!

—আমার ওপর এত বড় ভার আপনি দিলেন!

—উপযুক্ত হাতেই উপযুক্ত ভার পড়েছে! এই নাও—

টেবিলের ড্রয়ার টেনে একতাড়া কাগজ বার করে বিরলের হাতে দিলেন। সব পড়ে বিরল কি একটু ভাবল, তার পর বলল—আপনার একটা ছবি বা ফটো দিতে পারেন?

বিস্মিত হয়ে যমুনা দেবী বললেন—কেন বল তো?

—আমার জন্যে নয়! দাদুর জন্যে!

—দাদু!

—তিনি আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি আনি নি।

যমুনা দেবীর বিস্ময় যেন আরও বেড়ে উঠল, কি যেন একটু ভাবল, তার পর বলল—আমাকে তিনি দেখতে চা'ন?

—হ্যাঁ!

পাশের দেওয়ালে একটা ফটো দেখে বিরল বলল—ঐ তো আপনার ফটো, ওটাই দিন না!

—ওটা থাক—আর একটা এনে দেবো!

দেওয়ালের আর এক পাশে দুখানা ছ[illegible] দেখে বিরল কিছু আশ্চর্য্য হয়ে বলল—এ ফটো দু'খানা কার?

বিরলের প্রশ্নে যমুনা দেবী যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল, বলল—কেন? কি দরকার?

—যাঁদের ফটো তাঁরা আপনার কে—

—আমার আবার কে? তোমার কেউ হন নাকি?

—ঐ তো আমার দাদুর ফটো!

—তোমার দাদু! তুমি কি—

যমুনা দেবী আর বলতে পারল না—না না, এ সে কি করতে যাচ্ছে! কাকে কি বলছে? প্রথমেই কি সে তাকে চিনতে পারে নি? তবে ক্ষণেকের দুর্ব্বলতায় সে কি করতে যাচ্ছে? তার পর নিজকে সংযত করে সে বলল—তোমার দাদু যে সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট সভ্য

নামে নয় অন্তরে, তাই তো ফটোটা সংগ্রহ করতে হয়েছে!

—ঐ ফটোয় মালা পরিয়ে তাঁর পূজা করেছেন?

—করা কি উচিত হয় নি?

—তিনি একথা শুনলে খুবই আনন্দিত হবেন। তাঁকে তা হলে আপনি জানেন—তিনি কিন্তু আপনাকে—

—তাঁকে দেখেছি অনেক দিন আগে। তিনিও দেখেছেন, মনে নেই—বয়সও হয়েছে সবই কি মনে থাকে?

তার পর সঙ্ঘের সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে সেদিনের মত বিরল বিদায় নিল।

৪

কয়েক দিন পরের কথা। দাদু নাতিকে ফটোর কথা জিজ্ঞাসা করতেই বিরল বলল—একদিন আনবো! যমুনা দেবী কি বললেন, জান দাদু, তিনি তোমায় দেখেছেন, তুমিও তাঁকে দেখেছ, মনে নেই!

—আমি দেখেছি?—দাদুর কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

—শুধু তাই নয় তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলুম তিনি তোমার একখানা ফটোতে মালা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন! জিজ্ঞাসা করতে বললেন—তিনি যে তোমায় পূজা করেন—তুমি সঙ্ঘের উদ্দেশ্য তার চেয়েও বেশী করে বোঝ তাই—পূজনীয়ও বটে!

দাদু এবার সত্যই বিচলিত হয়ে উঠলেন যেন আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন—সে হতভাগী তা হ'লে বেঁচে আছে! সেই এই সব কাজ করছে?

বিরলের কাছে সবই যেন ধাঁধা মনে হ'তে লাগলো—কার কথা বলছো দাদু—কে বেঁচে আছে?

—দাঁড়া, তার ছেলেবেলাকার ফটোটা নিয়ে আসি। আলমারী খুলে একখানা ফটো বের করে তিনি বিরলের হাতে দিয়ে বললেন—দেখ তো দাদু।

ফটোর দিকে চেয়ে বিরল বিস্মিত কণ্ঠে বলল—এই তো তাঁর ছেলেবেলার ফটো—তাঁর ঘরেও এমনি একটা দেখেছি! আপনি কোথায় পেলেন এটা?

—এ ফটো কার জানিস?

—কার দাদু?

অতি স্নেহে তাকে বুকে জড়িয়ে দাদু বললেন—তোরই অভাগিনী মা!

—আমার মা!

দাদু তার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে চোখ মুছতে লাগিলেন।

—তা হ'লে মা কি সত্যিই বেঁচে আছেন! তিনি এমনি ভাবে—না, না তিনি আমার মা নন। তা যদি হবে তবে ওখানে কেন?

—নিয়তির ফেরে দুর্বৃত্তের অত্যাচারে!

—বুঝেছি! তাই তারই অত্যাচারের প্রতিকারের জন্যে চেয়েছিলেন আমাদের মত যুবকদের সাহায্য। মা বলে যখন জানলুম তখন ওভাবে ওখানে থাকতে দেবো না—নিয়ে আসবো আমাদের বাড়ীতে।

—তার স্থান যে আর ঘরে হ'তে পারে না!

—কেন পারে না? নিশ্চয়ই পারে। সন্তানের চিরদিনের অধিকার মায়ের বক্ষ—সেই স্থান থেকে মায়ের স্নেহ হতে তোমরা আমাকে দূরে রেখে দিয়েছো! সমাজের ভয়ে এই করেছো—আমি এর প্রতিশোধ চাই। সমাজ আমার উপরে এত বড় অবিচার করেছে, আমার মাকে রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু নির্যাতন করবার বেলায় বেশ আছে।

বলতে বলতে বিরলের চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটে বের হ'তে লাগলো।

দাদু বললেন—সমাজকে যে মানতেই হবে—তাকে ধরেই আমরা দাঁড়িয়ে আছি!

—তাই বলে—আমার মাকে আমি পাবো না? মা থাকতেও জানবো মা নেই—আমার মা মরেছে! আমার মা প্রতিকার চেয়েছে—নারীর অভিযোগ তাঁরই অন্তরের বেদনা! মার স্থান যদি ঘরে না হয় আমিও ঘরে থাকবো না।

—আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে দাদু! তুমি যে আমাদের অন্ধের নড়ি!

—আর মা বুঝি আমাদের কেউ নয়? পরের স্নেহে পালিত হয়েছি বলে—আমার মাকে জানি নি বলে—এত দিনে জেনেও দূরে থাকতে হবে?

—সে যে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেছে!

—না। তিনি তো যান নি—তোমরাই তাঁকে সমাজের শাসনের ভয়ে দূরে রেখে দিয়েছো! মায়ের ছেলের স্নেহের অধিকারেও সমাজ হাত দেবে, এখানেও তারা চালাবে তাদের শাসন? কেন তিনি এমনি ভাবে সকলের হেয় হয়ে দূরে থাকবেন? আমি তো তাঁর উপযুক্ত ছেলে—শক্ত হয়ে সমাজের সেই শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো—দেখবো কার সাধ্য, কতখানি শক্তি সমাজের আমার মাকে ঘৃণা করে? মা ছেলের কাছে চিরদিনই পূজনীয়া সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা। সেই দেবীকে ঘৃণা করে কে?

—তাই তো বলেছিলুম দাদু! এমনিতর একটা সমস্যা যা ক্রমে বড় হয়ে জেগে উঠছে এই দেশে তার প্রতিকার চাই। নিজের মায়ের দুঃখ বড় প্রাণে বেজেছে, কিন্তু এই বাংলাতেই কত নারী যে তোমার মার কত সমাজের শাসনে, দুর্বৃত্তের নির্যাতনে আরও মত হীন দুঃখময় জীবন যাপন করছে তার সন্ধান রাখো? শুধু মাকে জানলে হবে না, দেশের সকল নির্যাতিতা নারীই তোমার মা! তাদের সকলের অভিযোগই তোমার মায়ের অভিযোগ! কেন নারী নির্যাতিত হয় দুর্বৃত্তের হাতে? নির্যাতিতা নারীর স্থান সমাজে কেন হয় না? এর মূলে কি পুরুষ-সমাজের সাহসের ক্ষমতার অভাব নয়? নারী হবেন লক্ষ্মী, সেই নারীকে রক্ষা করতে পারে না। দেশে তো যুবকদের অভাব নেই, তবে এ নির্যাতনের প্রতিকার হয় না কেন?

—এর প্রতিকারের জন্য আমি চেষ্টা করবো।

—শুধু চেষ্টা নয়—মনে কর এই তোমার মায়ের আদেশ তুমি তার একমাত্র পুত্র।

—আচ্ছা দাদু! সমাজ যখন মায়ের উপর এতবড় একটা দোষ চাপিয়ে দিলে, ঘরে স্থান দিলে না তখন মা কি কোন প্রতিবাদ করেন নি?

—কার কাছে করবে? কে শুনবে সে অভিযোগ? সমাজের শাসনকে মানতে হবে যে, নইলে সমাজে বাস করা চলে না!

—তাই সমাজ শাস্তি দিয়ে পথে দাঁড় করাতে পারে, নীতির দোহাই দিয়ে কঠোর হতে বলে—অন্তরে তোমরা তাকেই চেয়েছিলে। সেই সমাজের ভয়ে একজন আপনার জনকে পর করে দিলে। অন্তরের ইচ্ছা যেন কিছু নয়! স্নেহের রক্তের টান যে কত বড় বাঁধন তাকেও সমাজের শাসন শিথিল করে দেয়। অথচ তারই ভয়ে যে মেয়েকে এমনিভাবে পথে বার করে দিলে তার জীবন-যাত্রার উপায় কিছু করে দিয়েছিলে কি? তাঁর অবস্থা যে কি হবে সে কথা ভেবে কয়দিন অন্নজল ত্যাগ করেছো? দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে মেয়েরা নির্যাতিত হয়—তাকে যে সমাজের রক্ষা করা উচিত, করে নি সে কথা ভুলে গিয়ে শাসন করে থাকে। ঘরে তার স্থান হয় না! তখন তার উপায় কি থাকে বাঁচবার? বাধ্য হয়ে সে কি করতে পারে? আত্মহত্যা? নীতিকারের বিধানে সে মহাপাপ! তবে উপায়? শিক্ষিতা হলে কিছু উপায় হয়তো আছে, কিন্তু কয়জন বাঙালী নারী শিক্ষিতা? দুর্বৃত্তদেরই এতে প্রশ্রয় দেওয়া হয়! আগে মার কথা জিজ্ঞাসা করলে তুমি চোখ মুছতে, অন্য কথা বলতে! মনে করতুম মা মরে গেছে, তাই তুমি কাঁদো! তখন তো বুঝিনি যে মা আমার এমনিভাবে বেঁচেও মরে আছে!

অতি স্নেহে নাতিকে বুকে জড়িয়ে দাদু বলে—মার জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে, না?

—দুঃখ কি হয় না? দুর্বৃত্তের শাসন নেই, নিরীহ অবলা যে নারী তাদের উপর যত অত্যাচার! কিন্তু কতদিন মানুষ নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করবে? নারীই তাই চাইছে প্রতিকার! নারীর অভিশাপ যদি ব্যর্থ না হয় তবে বাংলার এই সব নির্যাতিত নারীর অন্তরের রক্তসম পড়া চোখের জল, অন্তরের অভিযোগ এখনও অভিশাপ রূপে দেয়নি, কিন্তু দেবে।

—তার সূচনা তো দেখা দিয়েছে নইলে সমাজের আর সে শাসন কৈ?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিরল বলে উঠল—শাসন নেই? শাসন আছে বৈকি—আছে কাপুরুষের শাসন—নেই আর্ত্তকে রক্ষা করবার ক্ষমতা, নিপীড়িতের প্রতি দরদ—আছে শুধু কাপুরুষের আত্মম্ভরিতা। কৈ বলুন? এখনও সমাজের ভয়? তবে আমার মাকে হারানো কি কিছুই নয়?

—সে কি আসতে চায়?

—তা জানি না, তবে অনুরোধ করবো!

—তা আর হয় না দাদু।

বিরলের চোখ ছাপিয়ে এবার জল বেরিয়েছে—হাত দিয়ে চোখের জল মুছে সে বলল—বুঝেছি! এত দিনেও যাদের মনে মেয়ের জন্য এতটুকু স্নেহ নেই, করুণা নেই তবে তার কিসের সন্দেহ? সে হয়তো ভুলতে পারে না তার বাপ-মাকে, আত্মীয়কে, কিন্তু তারা তাকে মন থেকে মুছে ফেলেছে। আমাকেও তোমাদের মন থেকে মুছে ফেলে দাও দাদু! এতদিন আমাকে পালন করেছো এই যথেষ্ট! তাও না করলে পারতে—মেরে ফেলাই ভাল ছিল। যে এতটুকু মাতৃস্নেহ পায়নি, মাকে মা বলে জানে নি, তার বাঁচার দরকার কি? আজ আমি মাকে পেয়েছি। মায়ের ছেলে মার কাছে যাচ্ছে—প্রণাম দাদু—বিদায়—

বিরল ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। দাদুর কাতর আহ্বান ফিরে আসার আর তার কানে পৌঁছাল না!

৫

সেদিন বিরল চলে যাবার পরের দিনই যমুনা সকল বেশ ছেড়ে সাধারণ পোষাকে ঝিকে বললে—ঝি!

—কি দিদিমণি!

কথাটা সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলেই হঠাৎ বেশের এমনি পরিবর্ত্তন দেখে যেন কেমন হয়ে গেল।

যমুনা তাকে একটা নোটের তাড়া দিয়ে বললে—আমি আর এখানে থাকবো না। চলে যাচ্ছি—

—কোথায় যাবে? এই ঘরবাড়ী—

—কোথায় যাবো জানি না—সব ঠিক থাকবে, তবে আমি শুধু থাকবো না।

ঝি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে—এতদিন তোমার সঙ্গে রইলুম, আজ আমাকে ছেড়ে—

—হ্যাঁ, কাকেও আর আমি সঙ্গে নেবো না।

—আজই যাবে?

—শুধু আজ নয়, এখনই! হয়তো দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি চলে গেলে তবে তুই যাবি! আজ এমনিভাবে হঠাৎ কেন চলে যাচ্ছি জানিস? যাকে বছর খানেকের তার দাদুর কাছে রেখে আজ সতের বছর দূরে থেকেছি, সে কাল এসেছিল! হয়তো দাদুর কাছে সব কথা শুনে জানবে আমিই তার মা। আমি তাকে পরিচয় দিতে পারিনি, পারবো না! তাকে আর একবার দেখলে সব হয়তো ভুলে যাবো! এবার বুঝতে পেরেছিস?

—হ্যাঁ!

—সে না আসা পর্য্যন্ত তুই থাকবি। সে আসবেই, থাকতে পারবে না—হয়তো এখনই এসে পড়বে! এই চাবি তাকে দিবি—ঐ দেরাজে সমিতির জন্য দানপত্র ও তার নামে চিঠি আছে! কোম্পানী থেকে সমিতিকে আমার পাওনা টাকা তাকে দেবে, তাতেই সমিতির কাজ চলবে!

যমুনা ধীরে ধীরে নীচে নেমে নিজেই একটা গাড়ী ডেকে তাতে উঠে পড়ল।

পরদিন সেই সময় বিরল সেখানে এসে ডাকল—মা—সামনে ঝিকে দেখে প্রশ্ন করল—জানো আমার মা কোথায়?

—তোমার মা?

—হ্যাঁ!

—কোম্পানীর সঙ্গে হঠাৎ বিদেশে চলে গেছেন এই ঘরবাড়ী সমিতির জন্য তোমার নামে দানপত্র করে গেছেন। আমাকেও কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দিয়েছেন। তাঁর কাছে যাবার জন্যে কোনদিন চেষ্টা করো না। তাঁর লেখা চিঠিখানা পড়ে কার্য্যসূচী তৈরী করে তাঁর নির্দ্দেশ মত কাজ করো।

—কৈ দেখি সে চিঠি!

—এই নাও চাবি! ঐ দেরাজ খুললেই পাবে! আমার তবে এবার ছুটি!

—না দাঁড়াও, চিঠিটা পড়তে দাও!

চিঠিটা খুলে পড়তে পড়তে কখন দুঃখে কেঁদে ফেলে কখনো উত্তেজিত হয়ে ওঠে—তাড়াতাড়ি শেষ করে বললে—কতক্ষণ গেছেন?

—সে জেনে লাভ নেই

—কিন্তু আমি যে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছি মার কাছেই—

—বেশ তো মার নির্দ্দেশ মত কাজ করো!

—ঠিক বলেছো!

—তবে আমি আসি!—

—না, আর একটু! মার কাছে তুমি নিশ্চয়ই অনেকদিন ছিলে, না? আমার কথা খুব বলতেন কেমন?

—হ্যাঁ! তিনি বলতেন, নিজে জেনে কিছু পাপ করেন নি, লেখাপড়া শিখেছিলেন তাই নিজেকে বাঁচিয়ে সৎপথে থেকে উপার্জ্জন করতে পেরেছেন! তাঁর এতখানি জীবনের মধ্যে যেসব অভিযোগ জেগে উঠেছে—যা নির্যাতিত নারীতে সম্ভব তা জেগেছে—তার সত্যিকারের প্রতিকার করতে পারবে একমাত্র তাঁর ছেলে! কারণ মায়ের দুঃখ অভিযোগ একমাত্র ছেলেই মোচন করতে পারে! যদি কোনদিন সেই ছেলের সন্ধান পান, কোন সূত্রে দেখা হয় সেই সময় তার কাছে নিজের জীবনকাহিনী লিখে জানাবেন। যতদিন না তা পারছেন ততদিন নিশ্চিন্ত হতে পারেননি।

— উঃ মাঃ—বলে বিরল সেখানে বসে পড়ে।

৬

তারপর কতদিন বিরলের কেটে গেছে সমিতির কাজে! নির্যাতিত নারীদের থাকবার জন্য স্থান করে দিয়েছে—সেখানে থেকে তারা স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করতে শিখছে। দিকে দিকে রেখে দিয়েছে যুবকদল যারা স্বয়ং সেবকবাহিনীরূপে সংগ্রহ করে নারীর অভিযোগ, রক্ষা করে সমস্ত নির্যাতিত, অপমানিত নরনারীকে দুবৃত্তের হাত হ'তে। সমিতির কাজ করে যে অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছে তাতে জেনেছে, নারী-নির্যাতন সম্পর্কে যতগুলি বিবরণ প্রকাশিত হয় এর অনেক বেশীই ঘটে থাকে, কিন্তু প্রকাশিত হয় না। তার কারণ শুধু সামাজিক কলঙ্ক ও নির্যাতনের ভয়, আর দুষ্ট দুর্বৃত্তের হাতে অধিকতর উৎপীড়নের ভয়। তারপর সাধারণতঃ নারীরা লজ্জাশীলা। সত্য হলেও সাধারণতঃ নালিশ করে না। পুলিশ কর্ম্মচারীরাও অপরাধীদের দণ্ডিত করবার জন্য ন্যায়সঙ্গত যথেষ্ট চেষ্টা করেন না। অনেক স্থলে অত্যাচরিতা নারীর বাড়ীর অবস্থা ভাল না হওয়ায় তারা ভাল উকিল বা কোন উকিলই দিতে পারে না—আসামীরা দিতে পারে। যথাসময়ে সংবাদ পেলে তবে তো অপরাধীকে দণ্ডিত করবার চেষ্টা তারা করবে? তারপর মোকদ্দমাও ফেঁসে যায়—অত্যাচারী গুণ্ডাদের ভয়ে অনেক সময় সাক্ষী বড় পাওয়া যায় না।

নির্যাতিত অপহৃত নারীদের সমাজে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থার চেষ্টা করে। দুষ্ট দুর্বৃত্তরা ষড়যন্ত্র করে যেসব নারীদের গৃহত্যাগ করায় তাদের সেই সব ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে দেয়।

কাজ করে করে সাফল্য লাভ করাতে উৎসাহ তার বেড়ে চলেছে। মায়ের জন্য আর তার দুঃখ বড় নেই—সে যে মায়ের কাজ করছে, তার মা একদিন ঐ দুর্বৃত্তদের দ্বারা অপহৃতা হয়, তারপর সমাজে, ঘরে স্থান না পেয়ে এমনি ভাবে দিন কাটাচ্ছে! মায়ের নির্দ্দিষ্ট পথে থেকে সে কি এই কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারবে না?

মন তার দৃঢ় বটে, কিন্তু বাধাও সে পাচ্ছে! কেন বাধা পায় এই সৎকার্য্যে? কে দেয়? সে কি কয়েক জন ধনী দ্বারা চালিত দুর্বৃত্তরা?

এক দিন বিরলের নামে উঠলো অভিযোগ। সে নাকি ভেতরে ভেতরে নিজেই নারী-নির্যাতনে সহায়তা করে! একটা দৃষ্টান্ত তারা দেখিয়ে [illegible] কয়েক জন তাকে অভিযুক্ত করে। এরাই ছিল বিরলের ঐ সঙ্ঘের শত্রু দুর্বৃত্তরা। তার মনে পড়ে, একদিন যে একটি আর্ত্ত তরুণীকে উদ্ধার করতে যায় দুর্বৃত্তরা আড়ালে থেকে কয়েক জন ধনী যুবককে ঘটনা অন্য ভাবে বুঝিয়ে দেয়! তারই ফলে সে অভিযুক্ত হল। তখন সে বুঝতে পারেনি ঐ তরুণী দুর্বৃত্তদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আর্ত্তের অভিনয় করেছিল!

কেমন করে সে প্রমাণ করবে সে নিরপরাধ! এর সমস্তই ঐ সব দুর্বৃত্তদের সাজানো তাকে অভিযুক্ত করতে! সে সময় সেখানে তার স্বপক্ষে বলবার জন্য কেউ তো ছিল না। তার কথা যা অতি সত্য সে কি কেউ বিশ্বাস করবে? কেনই বা তা করবে?

আদালতে বিচার চলল। সত্যকথা সে বললেও এতগুলো লোকের কথা আর তার একলার কথা বিচারক কোন্‌টা নেবেন? তারপর বিরলের মার পরিচয় সেখানে প্রচার করে তারা বললে—যার মা স্বামী-পুত্র থাকতেও ঘরের বাইরে এসেছিল, এখনও অভিনেত্রীর জীবন যাপন করছে—সেই ছেলে যে কত ভালো হবে তা বোঝা গেছে। তার সম্বন্ধে এমনি একটা ঘটনার কথা আর কি ভাবে সত্য বলে প্রমাণ করতে হবে?

বিচারে তার জেল হ'ল। সে ভাবতে থাকে, এভাবে শাস্তি না হয়ে তার মৃত্যুদণ্ড ভাল ছিল! তার মার সম্বন্ধে দুর্বৃত্তদের হীন কথাগুলো মনে হতে সে এক-একবার আর্ত্তনাদ করে, ওঠে। ইচ্ছা করে, বেরিয়ে আসে লোহার গরাদগুলো ভেঙ্গে, উপযুক্ত শাস্তি দেয় ঐ দুর্বৃত্তদের। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখে সে নিরুপায়! প্রকৃতিস্থ হয়ে সে ভাবতে থাকে—যা সে করছিল তাই কি সত্যিকারের প্রতিকারের পথ নয়? কিছু কি এর মধ্যে বাদ পড়ে গেছে? হয় তো গেছে, নইলে আজও দুর্বৃত্তরা বাধা দেয় কেমন করে? নারীর মধ্যেও এমনিতর নারী থাকে কেমন করে? নিজের প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই পায়—তা না থাকলে সংসার চলবে কেন? ভালমন্দ নিয়েই তো সংসার! মানুষের মধ্যে দেবতা যেমন আছে—পিশাচও আছে। যে-নারী জাতির কল্যাণের জন্যে সে এত করছে সেই নারীজাতিরই একজন এমনি ভাবে মিথ্যা অভিনয় করে তাকে শাস্তি দিলে! নারী নাকি বড় মিথ্যা বলে না—তবে একি হ'ল? বিচারক তো তারই কথায় বিচারে তার জেল স্থির করলেন।

অনেক পরে ভেবে দেখে, সে এক মস্ত বড় ভুল করেছে—তার প্রথম কাজ ছিল নরনারীর মনের পরিবর্ত্তন করা। তা না হ'লে যে কোনদিন সত্যিকারের প্রতিকার হবে না, হ'তে পারে না। দুর্বৃত্তরা ভয়ে দূরে থাকবে, কিন্তু গোপনে তারা ঠিক কাজ করে যাবে। যে পথে সে নেমেছে তার প্রতিকার একদিনে এক বৎসরে হবার নয়—হতে পারে না। কিন্তু তাকে যে পারতেই হবে—সে জীবনভোর কাজ করেও যদি তা না পারে, তার পরে আবার যারা আসবে তারা করে যাবে। এক দিন না একদিন শেষে প্রতিকার হবেই।

এইবার সে একবার ভগবানকে না ডেকে পারে না। বলে—ভগবান! বাংলা তোমার কাছে কি এমন অপরাধ করেছে যার জন্য দিন দিন এক-একটি সমস্যা জাগিয়ে তুলছো? এতে বাঙালী জাতির দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তুমি কি নীরব থাকবে? এদের গুরুতর শাস্তি দাও, নয় অন্ততঃ আমাদের মনে আত্মশক্তি জাগিয়ে দাও প্রত্যেকের মনে পবিত্র ভাব এনে দাও—মন দৃঢ় করতে শিখুক—প্রতিকার করতে যাতে পারে তাই কর! এ না হলে সকলের মনে সহজে পরিবর্ত্তন জাগা যে সম্ভব হয় না!

অপ্রত্যাশিতরূপে একদিন বিরল দেখল, সে মুক্তি পেয়েছে! কেমন করে এমন সম্ভব হ'ল জানতে চেয়ে দেখল—যে মেয়েটির কারণে তার জেল হয়েছিল সেই মেয়েটিই সত্যিকথা বলেছে। তখন সে দুর্বৃত্তদের ভয়ে সত্যকথা গোপন করেছিল। এখন দেখতে পেয়েছে, সত্যিকথা বলেও তাদের যে বাঁচবার উপায় আছে বা হয়েছে সে তা জানতো না। এখন সে আর তাদের ভয় করে না—মিছামিছি একজন ভদ্রলোকের ছেলে কেন শাস্তি পায়? ধর্ম্মের চাকা গেল ঘুরে, দুর্বৃত্তেরা শাস্তি পেলে।

আনন্দে মুখ তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। এত দিনে মায়ের কাজে সে অনেক দূর এগিয়েছে! মার কথা মনে হওয়াতে মাকে উদ্দেশ করে বলে—মা, তোমার এ অভিযোগ সকল নারী-জাতির অভিযোগ কি না জানি না—তবে দেখতে পাচ্ছি এর পিছনে রয়েছে মস্তবড় অভিশাপ। সে অভিশাপ সকলকেই পেতে হবে। বাংলাও পেয়ে আসছে, যত দিন না প্রতিকার হয় পাবেও! আমার কাছে এ তোমার অভিযোগ-ভরা অভিশাপ!

য়ুসুফ ও জুলেখা

(কাব্য-পরিচয়)

শ্রীনীরদকুমার রায়

১

যোসেফ লোকপরম্পরায় জুলেখার এই নিদারুণ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ও পরিবর্ত্তনের কথা শুনিল। যখন সে জানিল জুলেখা তাহারই জন্য কিরূপ কঠোর তপস্বিনীর জীবন যাপন করিতেছে এবং সেই একমাত্র পরমেশ্বরকে নিরন্তর ডাকিতেছে, তখন তাহার হৃদয় সমবেদনায় বিগলিত হইল এবং জুলেখার আত্মার উন্নতির জন্য সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল। তাহার প্রার্থনায় ও ইচ্ছাশক্তির বলে জুলেখার প্রাণে নূতন বল সঞ্চারিত হইল। পরে যোসেফ তাহার অন্তরঙ্গ কর্ম্মচারীকে (কঞ্চুকীকে) বলিল, "এই জুলেখা নষ্টসম্পদ ও নিতান্ত দুঃখপীড়িতা হইয়াছে। তাহাকে আমার নিভৃত কক্ষে (খাস্ কাম্‌রায়) যেখানে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আসিয়া বসেন সেই কক্ষে লইয়া আইস; তাহার দৈন্যদশা ও ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।"

তপস্বিনী, হৃতযৌবনা, করুণার মূর্ত্তি জুলেখা আনীত হইয়া যোসেফের কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়াছে। কর্ম্মচারী কক্ষমধ্যে আসিয়া যোসেফকে বলিল, "জুলেখা তাঁর কুটীরের সাম্‌নে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন আপনার ঘোড়ার লাগাম ধরবার জন্য। আপনার আজ্ঞায় তাঁকে এখানে এনেছি।" যোসেফ অনুমতি দিলে কর্ম্মচারী জুলেখাকে অবগুণ্ঠন খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। অনুমতি পাইয়া জুলেখা যোসেফের কক্ষে প্রবেশ করিল যেন একটি বিকশিত গোলাপপুষ্প, যদিও সে গোলাপের শোভা যেন করকাস্পর্শে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। তাহার মুখের মৃদু হাসিতে যেন অমিয় ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু, এ কি? যোসেফ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে কেন? সে ভাবিতেছে, এ কি হইল? জুলেখাকে আনিতে বলিলাম, ইহারা কাহাকে আনিল? ঠিক চিনিতে না পারিয়া আগন্তুকের নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। জুলেখা বলিল—

আমি সেই, যে একদা হেরি' তব সুন্দর আনন
উপেক্ষি' সকল নরে তোমারে করিল আকিঞ্চন;
ধনরত্ন যাহা ছিল তব সুখ তরে দিল ঢালি,
তোমারে বাসিয়া ভাল মন-প্রাণ আত্মা দিল ডালি,
তোমারি বিচ্ছেদে পুনঃ যৌবন করিল অপচয়,
আসিয়া পড়েছে এবে, দেখিতেছ, বার্দ্ধক্য-দশায়।—
রাজত্ব-সুন্দরী দেখি, অঙ্কে তব ফুল্ল, কুসুমিত,
আমি হেথা পরিত্যক্ত, বিস্মৃতির অতলে পতিত!

তখন চিনিতে পারিয়া যোসেফের প্রাণ করুণায় উচ্ছ্বসিত হইল এবং সে বেদনাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "জুলেখা, এ কি! তোমার এ কী অবস্থা হয়েছে? হায়, নিদারুণ অদৃষ্ট!"

'কোথা তব সে যৌবন, সে রূপ-মাধুরী?'—জিজ্ঞাসিল;
'তোমার মিলন বিনে পলায়েছে'—উত্তর [illegible]সিল।
জিজ্ঞাসিল, 'কোথা তব ধনরত্ন, রজত [illegible]রণ?
কোথা তব মস্তকের পুষ্পমাল্য, সুবর্ণ-ভূষণ?'
উত্তরিল, 'তব সৌন্দর্য্যের স্তুতি-মুক্তা যখনি'
ঢালিয়া দিয়াছে কেহ মোর শিরে, আমি তো তখনি'
স্বর্ণ ও মস্তক মম ধরেছি তাহারি পদতলে,
অলঙ্কার দিছি খুলি' মনানন্দে পুরস্কার ছলে।
গৌরব-মুকুট মম খুলি' পরায়েছি তার শিরে,
তাহার দেহলী-ধূলি লইয়াছি মাথার উপরে।
সোনারূপা ধনরত্ন কিছু আর নাহি মোর পাশে—
শুধু, প্রেম-রত্ন বুকে ল'য়ে দাঁড়ায়েছি তোমার সকাশে।'

ঈশ্বর-নিষ্ঠ যোসেফ তখন মিষ্ট স্বরে বলিল, "তোমার যা' ইচ্ছা আজ আমার কাছে ব্যক্ত কর, সাধ্যাতীত না হলে আমি তৎক্ষণাৎ পূরণ করবো।"

জুলেখা ধীরে ধীরে কহিল—

আর কোন অভিলাষ নাই মোর, শুধু মাত্র এই—
তোমার মিলন-সুখে যেন আমি স্থির হয়ে রই ;
দিবসে নিয়ত তুমি র'বে মোর আঁখির সম্মুখে,
নিশীথে তোমার পায় মাথা রাখি' র'ব সুপ্তিসুখে।

এই কথা শুনিয়া যোসেফ 'হাঁ' কি না কিছুই বলিল না ; অদৃষ্ট-লোকের নির্দ্দেশ পাইবার জন্য সে তখনি আত্মস্থ হইল, ক্রমে ধ্যানমগ্ন হইয়া যোসেফ অন্তরস্থ পবিত্র সত্তার বাণী শুনিতে পাইল—"জুলেখার কঠোর সাধনা ও চরম দৈন্য আমার ক্ষমার সমুদ্রে আলোড়ন আনিয়াছে। তুমি তাহার জীবনের সহিত তোমার জীবনের গ্রন্থি স্থায়ী ভাবে বন্ধন কর এবং যে-সকল দুষ্ট গ্রন্থি তাহার পথকে জটিল ও অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সেইগুলি খুলিয়া দাও।"

এই ঐশ্বরিক নির্দ্দেশ পাইয়া যোসেফ জুলেখার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইল। পূত চরিত্র যোসেফের সহিত মহার্ঘরত্ন জুলেখার মিলন হইল।

* * *

আশা পূরণের ইন্দ্রজাল-স্পর্শে, যোসেফের জীবনামৃতের সংস্পর্শে, ঈশ্বর-কৃপায় এখন জুলেখার পূর্ব্বরূপ বিকশিত হইয়া উঠিল ; ফুল্লযৌবনের সরস মাধুরী জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মত তাহার অঙ্গ বেষ্টন করিল ; তাহার সৌন্দর্য্য এক অসামান্য কমনীয়তা লাভ করিল। বৃদ্ধা যুবতীতে রূপান্তরিত হইল। সে পূর্ব্বের চেয়ে আরও সুন্দর হইল।

* * *

বিবাহের পর জুলেখা প্রথম রাত্রির বাসর-সজ্জায় বসিয়া ; তাহার হৃদয় দুরুদুরু করিতেছে ; ভাবিতেছে, 'হে ভগবান! আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি!' বুকের মাঝে কখনও তার আনন্দের আতিশয্য, কখনও ভয়। এখনও কি হতাশার আতঙ্ক তাহার মনে ছায়াপাত করিতেছে? সকল আশা ও আনন্দের মধ্যেও তাই সে এক-একবার ভাবিতেছে, 'আমার সুখের দিন চিরস্থায়ী হবে কিনা তা এখনো নিশ্চয় করে বলা যায় না, তবে ঈশ্বরের কৃপা সকলেরই প্রাপ্য, আর তাঁর কৃপায় নিরাশ হওয়া উচিত নয়।'

যাহা হউক, সূর্য্যালোকে অন্ধকার বিদূরিত হইল। জুলেখার সম্মুখে যোসেফ আসিতেই তাহার মনের ঐ অন্ধকারটুকু কাটিয়া গেল।

যখন যোসেফ জানিল, জুলেখার একাগ্র প্রেম ও একান্ত বিশ্বাস কত গভীর এবং সেই বিশ্বাস ও প্রেমের উন্মাদ গতি এতদিন সমভাবে তাহারই (যোসেফেরই) জন্য, তাহারই অভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে, তখন সে প্রেম-গদ্‌গদ চিত্তে সুমিষ্ট ভঙ্গীতে জুলেখাকে লইয়া গিয়া রত্নজড়িত স্বর্ণাসনে বসাইল এবং নিজ বক্ষ তাহার মস্তকের অবলম্বন করিয়া দিল।

১০

যে প্রেমিক অমল প্রেমের পথ ধ্রুব ধরে রয়,
সে-জন প্রেমের পাত্র একদিন হইবে নিশ্চয়।

জুলেখা শিশুবয়স হইতে ভালবাসিয়াই আসিয়াছে ; প্রথমে তার পুতুলখেলায় ভালবাসার খেলা, পরে তার প্রিয়তমের প্রতি লগ্ন হৃদয়ের সুখ-দুঃখ। এখন, যখন তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের সরলতা সকল বাধা-বিঘ্ন ও সীমা লঙ্ঘন করিয়া জয়ী হইয়াছে, তখন যোসেফের প্রাণেও অবশেষে তাহার ছোঁয়াচ লাগিল—ক্রমে এমন হইল যে—

তাহার হৃদয় 'পরে সে মোহিনী হেন শক্তি রাখে,—
হৃদয়-রাণীরে ছেড়ে একদণ্ড অন্যত্র না থাকে।

জুলেখার কিন্তু সর্ব্বদা সত্য ও শ্রেয়ের দিকে মন স্থির লগ্ন—

মিথ্যা তোষামোদে তুষ্ট কভু নাহি হয় তার মন,
অসত্য অন্যায় হ'তে সতত সে করে পলায়ন।

যোসেফ যখন দেখিল ধর্ম্মাচরণের দিকে জুলেখার মন ঝুঁকিয়াছে এবং ক্রমশঃ সেই দিকে সে অধিক মনোযোগ দিতেছে, তখন তাহার জন্য সেখানে সে একটি স্বর্ণময় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিল—প্রমোদ-আগার নয়, প্রার্থনা-আগার।—দুই শত দুর্লভ চিত্র এবং সহস্র সহস্র মুক্তা দিয়া সেই প্রার্থনা-আগার সুসজ্জিত করা হইল। যোসেফ জুলেখাকে বলিল, 'ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে নিত্য এই মন্দিরে গিয়া বসিও, তিনিই তোমায় দারিদ্র্যের পর ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন। বিরহের দুঃখ-দুর্দ্দশার স্বাদ গ্রহণ করাইয় পরে তিনি মিলনের রসায়ন পান করাইয়াছেন।'

এইরূপে মিলনের মধুময় আনন্দে তাহাদের যুক্ত জীবনের পূর্ণ চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইল।

তাহাদের বহু পুত্রকন্যা হইল এবং সেই পুত্র কন্যাদেরও পুত্র কন্যা জন্মিল।

এক রাত্রে যোসেফ স্বপ্নে দেখিল তাহার পিতা ও মাতা দেখা দিয়া বলিতেছেন, "হে পুত্র! এই কথাটি জানিয়া রাখ—

তোমার অদরশনে কাটায়েছি মোরা বহুদিন;
সাঙ্গ হয়ে এল তব এ পার্থিব জীবনের দিন;
রাখ তব পদ এবে পৃথিবীর জল-মাটি 'পরে,
আত্মার লক্ষ্যেতে—নিজ বাসে যেতে পথ ধরিবারে।"

এই স্বপ্নের কথা যোসেফ জুলেখাকে জানাইল এবং বলিল তাহার যাইবার সময় আসিয়াছে। শুনিয়া জুলেখার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—আসন্ন-বিচ্ছেদ-অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল তার প্রাণে।

এদিকে, সেই অনন্তধামে যাইবার জন্য যোসেফের আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। এই কথা জানিয়া সমূহ বিচ্ছেদ-ভাবনায় জুলেখা ধূলিধূসরিতা হইতে হইতে বলিল—

হে মরণ! তুমি তো শোকার্ত্ত জনে দাও রসায়ন,
ছিন্নহৃদয় মানবের তুমি প্রকৃষ্ট শরণ—
প্রিয়তম-সঙ্গ ছাড়া যদি মোরে করিবারে চাও,
দোহাই তোমার! তারে নিও পরে, আগে মোরে নাও!

যোসেফের অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে সে ফুল্ল মনে ইহজীবন হইতে হৃদয় সংহরণ করিয়া লইয়া নিস্পৃহ হইল। মৃত্যুসময়ে শুধু সে তাহার জুলেখার কথা বলিতে বলিতে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এখন জুলেখার দিকে সকলে চাহিয়া এই কামনা করিল, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের শক্তি যেন তাহার চিরদিন থাকে এবং ঈশ্বর যেন তাহাকে শান্তি ও পরিণামে আনন্দ প্রদান করেন।

কিন্তু যোসেফের মৃত্যুর পর মূর্চ্ছিতা জুলেখা কখনো চেতনা ও কখনো হতচেতনার মধ্যে উন্মাদের মত দিন কাটাইতে লাগিল। যোসেফকে ডাকিয়া সে বলে—

তুমি তো প্রস্তুত ছিলে প্রয়াণ করিতে সে ভবনে
যেথা হতে কভু মুখ আর না ফিরায় কোনো জনে;
ভাল হতো যদি আমি পারিতাম পক্ষ বিস্তারিয়া
অব্যাহত গতি লয়ে তব পাশে যাইতে উড়িয়া।

কয়েক দিনের মধ্যেই সে তাহার ধূলিমলিন ক্ষতবিক্ষত মুখখানি স্বামীর কবরের উপর রাখিয়া যেমনি সেই কবরের ধূলি চুম্বন করিল, অমনি তাহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল; বুঝি সেইক্ষণেই তাহার ব্যাকুল আত্মা প্রিয়তমের আত্মার সঙ্গে চিরমিলিত হইল!

ধন্য ধন্য সেই দেহ, শত ধন্য সেই আত্মা তার!
ঈশ্বরের বহু কৃপা হউক তাহার অধিকার!
তার সুমহান প্রেমে আত্মা তার থাক উদ্ভাসিত!
মর্ত্যের প্রণয়-ক্লিষ্ট পান্থ তাহে হোক আলোকিত!

জুলেখার দেহ যোসেফের সমাধির পার্শ্বেই সমাহিত করা হইল।—

ধন্য সে-প্রেমিক, যেই—যবে তার প্রাণ বাহিরায়,
প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের আশা লয়ে যায়

কবি-স্মরণে

শ্রীঅরবিন্দ রায়

(বয়স ১১ বৎসর)

হে কবি, তব শঙ্কিত হৃদয়
বারংবার মৃত্যুরে করেছে ভয়—
তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
পায় নি শান্তি তব মৃত্যুর সময়।

যুগ যুগ ধরি রবে তব গান
সোনার আখরে লেখা,
যতদিন ভবে রহিবে মানব
রবি যাবে নভে দেখা।

মানব—সে ভুলে যেতে পারে সবি,
তোমারে তো কেহ ভুলিবে না কবি,
রহিবে হৃদয়ে চিরজাগ্রত
তব অঙ্কিত ছবি।

কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরদিন প্রভাসের দলের কেউই বাগানবাড়ীতে এল না। শরৎ সন্ধ্যার দিকে বাগানে আপন মনে খানিকটা বেড়িয়ে বাবাকে ডেকে বললে—বাবা খাবে নাকি ?

কেদার বললেন—আজ এরা কেউ এল না কেন রে শরৎ ?

—তা কি জানি বাবা। বোধ হয় কোনো কাজ পড়েচে—

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু যা দেখবার দেখে নিতে পারলে হোত ভাল। আবার বাড়ী ফিরতে হবে সংক্রান্তির আগেই—

কেদারের আর তেমন ভাল লাগছিল না বটে, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন মেয়ের এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরবার ইচ্ছে নেই—তার এখন দেখবার বয়েস, কখনো কিছু দেখে নি, আছে আজীবন গড়শিবপুরের জঙ্গলে পড়ে। দেখতে চায় দেখুক—তিনি বাধা দিতে চান না।

শরৎ বললে—পেপে খাবে বাবা ? বাগানের গাছ থেকে পেড়েচি, চমৎকার গাছ-পাকা। নিয়ে আসি দাঁড়াও—

কেদার বললেন—আশপাশের বাগানবাড়ীতে লোক থাকে কি না জানিস কিছু মা ?

—চলো না তুমি পেঁপে খেয়ে নাও—দেখে আসি।

মিনিট পনেরো পরে দুজনে পাশের একটা অন্ধকার বাগানবাড়ীর ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন খোট্টা দারোয়ান ফটকের পাশের ছোট্ট একটা গুমটি ঘর থেকে বার হয়ে বললে—কেয়া মাংতা বাবুজি ?

কেদার হিন্দী বলতে পারেন না। উত্তর দিলেন—এ বাগানে কি আছে দারোয়ানজি ?

বাবুলোক হ্যায়—মাইজি ভি হ্যায়—যাইয়ে গা ?

—হ্যাঁ, আমার এই মেয়ে একবারটি বাগান দেখতে এসেচে—

—যাইয়ে—

বেশ বাগান। প্রভাসদের বাগানের চেয়ে বড় না হোলেও, নিতান্ত ছোট নয়। অনেক রকম ফুলের গাছ, ফুল ফুটেও আছে অনেক গাছে—সানবাঁধানো পুকুরের ঘাট, খানিকটা জায়গা তার দিয়ে ঘেরা তার মধ্যে হাঁস এবং মুরগী আটকানো। খুব খানিকটা এদিক-ওদিক লিচুতলা ও আমতলায় অন্ধকারে অন্ধকারে বেড়ানোর পরে ওরা গিয়ে একেবারে বাগানবাড়ীর সামনের সুরকি বিছানো পথে গিয়ে উঠলো। বাড়ীর বারান্দা থেকে কে একজন প্রৌঢ়কণ্ঠে হাঁক দিয়ে বললে—কে ওখানে ?

কেদার বললেন—এই আমরা। বাগান দেখতে এসেছিলাম—

একটি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধপধপে সাদা কোঁচানো কাপড় পরে খালি গায়ে রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে বললেন—আসুন আসুন—সঙ্গে মা রয়েচেন, তা উনি বাড়ীর মধ্যে যান না ? আমার স্ত্রী আছেন—

শরৎ পাশ পাঁচীলের সরু দরজা দিয়ে অন্দরে ঢুকলো। কেদার রোয়াকে উঠতেই ভদ্রলোক তাঁকে নিয়ে উপরে চেয়ারে বসালেন। বললেন—কোন্ বাগানে আছেন আপনারা ?

—এই দুখানা বাগানের পাশে। প্রভাসকে চেনেন কি বাবু ?

—না আমি নতুন এ বাগান কিনেচি, কারুর সঙ্গে চেনা হয় নি এখনও। তামাক খান কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ তা খাই—তবে আমার আবার হাঙ্গাম আছে—ব্রাহ্মণের হুঁকো না থাকলে—

—আপনি ব্রাহ্মণ বুঝি ? ও, বেশ বেশ। আমিও তাই আমার নাম শশিভূষণ চাটুয্যে—'এড়োদার' চাটুয্যে আমরা। ওরে ও নন্দে, তামাক নিয়ে আয়—

দুজনে কিছুক্ষণ তামাক খাওয়ার পরে চাটুয্যে মশাই বললেন—আচ্ছা, মশাই—এখানে টেক্স এত বেশি কেন বলতে পারেন—আমার এই বাগানে কোয়ার্টারে আট টাকা টেক্স। আপনি কত দেন বলুন তো। না হয় আমি একবার লেখালেখি করে দেখি—কলকাতায় আপনারা থাকেন কোথায়?

কেদার অপ্রতিভ মুখে বললেন আমার বাগান নয়—আমাদের বাড়ী ত কলকাতায় নয়। বেড়াতে এসেচি দু-দিনের জন্যে—কলকাতায় থাকি নে—

ও, আপনাদের দেশ কোথায়? গড়শিবপুর? সে কোন্ জেলা? ও, বেশ বেশ।

—বাবু কি এখানেই বাস করেন?

—না, আমার স্ত্রীর শরীর ভাল না, ডাক্তারে বলেচে কলকাতার বাইরে কিছুদিন থাকতে। তাই এলাম—যদি ভাল লাগে আর যদি শরীর সারে তবে থাকবো দু-তিন মাস। বেশ হ'ল মশায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে। আপনার গানটান আসে?

কেদার সলজ্জ বিনয়ের সুরে বললেন—ওই অল্প অল্প।

—তবে ভালই হ'ল—দুজনে মিলে বেশ একটু গান-বাজনা করা যাবে। কাল এখানে এসে বিকেলে চা খাবেন। বলা রইলো কিন্তু—বাজাতে পারেন?

—আজ্ঞে, সামান্য।

—সামান্য টামান্য না। গুণী লোক আপনি, দেখেই বুঝেচি। এখন খালি গলায় একখানা শুনিয়ে দিন না দয়া করে? তার পর কাল থেকে আমি সব জোগাড়যন্ত্র করে রাখবো এখন।

কেদার একখানা শ্যামা বিষয় গান ধরলেন, কিন্তু অপরিচিত জায়গায় তেমন সুবিধে করতে পারলেন না, কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকতে লাগলো—সতীশ কলুর দোকানে বসে গাইলে যেমনটি কোনো দিনই হয় নি। চাটুয্যে মশায় কিন্তু তাই শুনেই খুব খুসি হয়ে ওঠে বললে—বাঃ বাঃ, বেশ চমৎকার গলাটি আপনার। এ সব গান আজকাল বড় একটা শোনাই যায় না—সব থিয়েটারি গান শুনে শুনে কান পচে গেল, মশাই। বসুন

[illegible] আসি—

কেদার ভদ্রলোককে নিরস্ত করে বললেন—চা খেয়ে বেরিয়েছি, আমি দুবার চা খাইনে সন্ধের পর, রাতে ঘুম হয় না, বয়েস হয়েছে তো—এবার আপনি বরং একটা—

চাটুয্যে মশায়ও দেখা গেল বিনয়ের অবতার। তিনি গান গাইলেন না, কারণ তিনি বললেন, একে তিনি গান গান না, কারণ গানের গলা নেই তাঁর। যাও বা একটু আধটু হুঁ হুঁ করতেন, কেদারের মত গুণী লোকের সামনে তাঁর গলা দিয়ে কিছুই বেরুবে না। অবশেষে অনেক অনুরোধের পর চাটুয্যে মশায় একটা রামপ্রসাদী গেয়ে শোনালেন—কেদারের মনে হোল তাঁদের গ্রামের যাত্রা-দলের তিনকড়ি কাম'র এর চেয়ে অনেক ভাল গায়।

এই সময় শরৎ বাড়ীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বললে—চলো বাবা, রাত হয়ে গেল।

চাটুয্যে মশায় বললেন—এটি কে? মেয়ে বুঝি? তা মা যে আমার জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত ঘর আলো-করা মা দেখছি। বিয়ে দেন নি এখনও?

—বিয়ে দিয়েছিলাম চাটুয্যে মশাই—কিন্তু বরাত ভাল নয়, বিয়ের দু-বছর পরেই হাতের শাঁখা ঘুচে গেল। চলো মা, উঠি আজ চাটুয্যে মশাই, নমস্কার। বড় আনন্দ হোলো—মাঝে মাঝে আসবো কিন্তু।

—আসবেন বৈ কি, রোজ আসবেন আর এখানে চা খাবেন। মাকেও নিয়ে আসবেন, মায়ের কথা শুনে মনে বড় দুঃখ হোল—উনি আমার এখানে একটু মিষ্টিমুখ করবেন একদিন। নমস্কার।

পথে আসতে আসতে শরৎ বললে—গিন্নী বেশ লোক বাবা। আমায় কত আদর করলে, জল খাওয়ানোর জন্যে কত পীড়াপীড়ি—আমি খেলাম না, পরের বাড়ী খেতে লজ্জা করে—চিনি নে শুনি নে। আমায় আবার যেতে বলেছে।

—আমারও ভাল হোল, কর্ত্তা গান-বাজনা ভালবাসে, সখ আছে—এখানে সন্দেটা কাটানো যাবে—

ওরা নিজেদের বাগান-বাড়ীতে ঢুকেই দেখলে বাড়ীর সামনে প্রভাসের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পর বাড়ী পৌঁছেই প্রভাসের সঙ্গে দেখা হোল। সে বাড়ীর সামনে

গোল বারান্দায় বসে ছিল, বোধ হয় এদের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায়। কাছে এসে বললে—কোথায় গিয়েছিলেন কাকাবাবু। আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি। কিন্তু আজ যে বড্ড দেরি করে ফেললেন—সিনেমা যাবার সময় চলে গেল। সাড়ে ন'টার সময় যাবেন? প্রায় বারোটায় ভাঙবে।

শরৎ বললে—না প্রভাস-দা, অত রাত্রে ফিরলে বাবার শরীর খারাপ হবে। থাক না আজ, আর একদিন হবে এখন—

কেদার বললেন—তাই হবে এখন প্রভাস, আজ বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তুমি তো আজ ও-বেলা এলে না—এ-বেলাও আমরা সন্দে পর্য্যন্ত দেখে তবে বেরিয়েছি। কাল বরং যাওয়া যাবে এখন। বসো, চা খাও।

—না কাকা বাবু, আজ আর বসবো না। কাল তৈরি থাকবেন, আসবো বেলা পাঁচটার মধ্যে। কোনো অসুবিধে হচ্চে না?

—না না অসুবিধে কিসের? তুমি সেজন্যে কিছু ভেবো না।

পরদিন একেবারে দুপুরের পরই প্রভাস মোটর নিয়ে এল। শরৎ চা করে খাওয়ালে প্রভাসকে—তারপর সবাই মিলে মোটরে গিয়ে উঠলো। অনেক বড় বড় রাস্তা ও গাড়ী মোটরের ভিড় পেরিয়ে ওদের গাড়ী এসে একটা বড় বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। প্রভাস বললে—এই হোল সিনেমা ঘর—আপনারা গাড়ীতে বসুন, আমি টিকিট করে আনি—

শরৎ বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে চারি দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কত উঁচু ছাদ, ছাদের গায়ে বড় বড় আলোর ডুম, গদি-আঁটা চেয়ার বেঞ্চি ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক করছে, কত সাহেব মেম বাঙালীর ভিড়।

কেদার বললে—এ জায়গাটার নাম কি হে প্রভাস?

—আজ্ঞে এ হোল এলফিনষ্টোন পিকচার প্যালেস—একটা পার্শি কোম্পানী।

—বেশ বেশ। চমৎকার বাড়ীটা—না মা শরৎ? থাকি জঙ্গলে পড়ে, এমন ধারাটি কখনো দেখি নি—আর দেখবোই বা কোথায়? ইচ্ছে হয় সতীশ কলু, ছিবাস এদের নিয়ে এসে দেখাই। কিছুই দেখলে না ওরা, শুধু তেল মেপে আর দাঁড়ি-পাল্লা ধরেই জীবনটা কাটালে।

সারা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কেদার বলে উঠলেন—ও প্রভাস, এ কি হোল? ওদের আলো খারাপ হয়ে গেল বুঝি?

প্রভাস নিম্নস্বরে বললে—চুপ করুন কাকা বাবু, এবার ছবি আরম্ভ হবে।

সামনে সাদা কাপড়ের পর্দ্দাটার ওপরে যেন যাদুকরের মন্ত্রবলে মায়াপুরীর সৃষ্টি হয়ে গেল, দিব্যি বাড়ীঘর, লোক-জন কথা বলছে, রেলগাড়ী ছুটছে, সাহেব মেমের ছেলেমেয়েরা হাসি খেলা করছে, কাপড়ের পর্দ্দার ওপরে যেন আর একটা কলকাতা সহর।

কিন্তু ছবিতে কি করে কথা বলে? কেদার অনেক বার ঠাউরে দেখবার চেষ্টা করেও কিছু মীমাংসা করতে পারলেন না। অবিশ্যি এর মধ্যে ফাঁকি আছে নিশ্চয়ই, মানুষেই পেছন থেকে কথা বলছে কৌশল করে, মনে হচ্ছে যেন ছবির মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে—কিন্তু কেদার সেটা ধরে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হতে পারলেন না। একবার একটা মোটর গাড়ীর আওয়াজ শুনে কেদার দস্তুর মত অবাক হয়ে গেলেন। মানুষে কি মোটর গাড়ীর আওয়াজ বের করছে মুখ দিয়ে? বোধ হয় কোন কলের সাহায্যে ওই আওয়াজ করা হচ্ছে। কলে কি না হয়?

হঠাৎ সব আলো এক সঙ্গে আবার জ্বলে উঠলো। কেদার বললেন—শেষ হয়ে গেল বুঝি?

প্রভাস বললে—না কাকাবাবু, এখন কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে—তার পর আবার আরম্ভ হবে। চা খাবেন কি? বাহিরে আসুন তবে—

শরৎ বললে—প্রভাসদা, দোকানের চা আর ওঁকে খাওয়ানোর দরকার নেই—সত্যিক জাতের এঁটো পেয়ালায় চুমুক দিতে হবে—থাকগে। ওমা, ওই যে অরুণবাবু—উনি এলেন কোথা থেকে?

অরুণ কেদারকে প্রণাম করে বললে—কেমন লাগছে আপনার, ওঁর লাগছে কেমন? চলুন আজ সিনেমা ভাঙলে দমদমা পর্য্যন্ত আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবো—

কেদার বললেন—বেশ, তাহলে আমাদের ওখানেই আজ খেয়ে আসবে দুজনে—

—না আজ আর না, আর একদিন হবে এখন বরং।

এই সময় গিরীন বলে সেই লোকটিও এসে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো। প্রভাসকে সে কি একটা কথা বললে ইংরিজিতে।

প্রভাস বললে—কাকাবাবু, শরৎ দিদিকে আমার এই বন্ধু ওঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে বলছেন।

কেদার বললেন—বেশ তো। আজই?

—হ্যাঁ আজ, বায়োস্কোপের পরে।

ছবি ভাঙবার পরে সবাই মোটরে উঠলো। গিরীন ও প্রভাস বসেছে সামনে, কেদার, অরুণ আর শরৎ পেছনের সিটে। একটা গলির মধ্যে যায় একটা ছোট বাড়ীর সামনে গাড়ী গিয়ে দাঁড়ালো। গিরিন নেমে ডাক দিলে—ও রবি, রবি?

একটি ছেলে এসে দোর খুলে দিলে। গিরীন বললে তোমার এই পিসিমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাও—আসুন কেদারবাবু, বাইরের ঘরে আলো দিয়ে গিয়েছে।

সে বাড়ীতে বেশীক্ষণ দেরি হোল না। বাড়ীর মধ্যে থেকে সেই ছেলেটাই সকলকে চা ও খাবার দিয়ে গেল বাইরের ঘরে। একটু পরে শরৎ এসে বললে—চলো বাবা।

আবার দমদমার বাগানবাড়ী। রাত তখন খুব বেশি হয় নি—কেদার সুতরাং ওদের সকলকেই থেকে খেয়ে যেতে বললেন। হাজার হোক্, রাজবংশের ছেলে তিনি। নরজটা তাঁর কোন কালেই ছোট নয়। কিন্তু ওরা কেউ থাকতে রাজি হ'ল না—তবে এক পেয়ালা করে চা খেয়ে যেতে কেউ বিশেষ আপত্তি করলে না।

কেদার জিগ্যেস করলেন রাত্রে খেতে বসে—ওই ছেলেটির বাড়ীতে তোকে কিছু খেতে দেয় নি?

—দিয়েছিল, আমি খাই নি। তুমি?

—আমায় দিয়েছিল, আমি খেয়েওছিলাম।

—তা আর খাবে না কেন? তোমার কি জাতজন্মো কিছু আছে? বাচবিচের বলে জিনিষ নেই তোমার

—কেন?

—কেন? ওরা জাতে কি তার ঠিক নেই। বামুন নয়, কায়েতও নয়। আমি পরের বাড়ী গিয়ে কি করে তোমাকে বারণ করে পাঠাই?

—কি করে জানলে?

—ও মা, সে যেন কেমন। দু-তিনটি বৌ বাড়ীতে। সবাই সেজেগুজে পান মুখে দিয়ে বসে আছে। যে ছেলেটা দোর খুলে দিলে, ও বাড়ীর চাকর বলে মনে হ'ল। কেমন যেন—ভাল জাত নয় বাবা। একটি বৌ আমায় বেশ আদর যত্ন করেচে। বেশ মিষ্টি কথা বলে। আবার যেতে বললে। আমার ইচ্ছে হয় মাথা খুঁড়ে মরি বাবা, তুমি কেন ওদের বাড়ী জল খেলে? আমায় পান সেজে দিতে এসেছিল, আমি বললাম, পান খাই নে।

—তাতে আর কি হয়েচে?

—তোমার তো কিছু হয় না—কিন্তু আমার যে গা কেমন করে। আচ্ছা, গিরীনবাবুর বাড়ী নাকি ওটা?

—হ্যাঁ, তাই বললে।

—অনেক জিনিষপত্র আছে বাড়ীতে। ওরা বড় লোক বলে মনে হ'ল। হারমোনিয়ম, কলের গান, বাজনার জিনিষ—বেশ বিছানা পাতা চৌকি, বালিশ, তাকিয়া—দেওয়ালে সব ছবি। সেদিক থেকে খুব সাজানো-গোজানো।

—তা হবে না কেন মা, কলকাতার বড়লোক সব। এ কি আর আমাদের গাঁয়ের জঙ্গল পেয়েচ?

—তুমি আমাদের গাঁয়ের নিন্দে কোরো না অমন করে।

কেদার বললেন—তোদের গাঁ বুঝি আমাদের গাঁ নয় পাগলী? আচ্ছা, বল তো তোর এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না গ্রামে ফিরতে ইচ্ছে হচ্চে?

—এখন দুদিন এখানে থেকে দেখতে ইচ্ছে হয় বই কি বাবা। আমার কথা যদি বলো—আমার ইচ্ছে এখানে এখন কিছু দিন থেকে সব দেখি শুনি—গাঁ তো আছেই, সে আর কে নিচ্চে বলো।

পর দিন সকালে চাটুয্যে মশায় কেদারকে ডেকে

পাঠালেন। সেখানে গানের মজলিস্ হবে সন্ধ্যায়। কেদারকে আসবার জন্যে যথেষ্ট অনুরোধ করলেন তিনি। মজলিসে শুধু শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকলে চলবে না, কেদারকে গানও গাইতে হবে।

কেদার বললেন—আজ্ঞে, আমি বাজাতে পারি কিছু কিছু বটে—কিন্তু মজলিসে গাইতে সাহস করি নে।

—খুব ভাল কথা। কি বাজান বলুন?

—বেহালা যোগাড় করতে পারেন বাবু?

—বেহালা ওবেলা পাবেন। আনিয়ে রাখবো। সে দিন তো বলেন নি, আপনি বেহালা বাজাতে পারেন? আপনি দেখছি সত্যিই গুণী লোক। ওবেলা এখানে আহার করতে হবে কিন্তু। বাড়ীতে মাকে বলে আসবেন।

—আমার মেয়ে যেখানে সেখানে আমায় খেতে দেয় না, তবে আপনার বাড়ীতে সে নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি করবে না। তাই হবে।

—আপত্তি ওঠালেও শুনবো না তো কেদারবাবু? মার সঙ্গে নিজে গিয়ে ঝগড়া করে আসবো। আচ্ছা তাঁকে—

—সে কোথাও খায় না। তাকে আর বলার দরকার নেই।

বিকেলে চাও এখানে খাবেন—

বৈকালে কেদার সবে চাটুয্যে মশায়ের বাগানবাড়ীতে যাবার জন্যে বার হয়েছেন, এমন সময় প্রভাসের গাড়ী এসে ঢুকলো ফটকে। প্রভাস গাড়ী থেকে নেমে বললে—কাকাবাবু, কোথায় যাচ্ছেন?

কেদারের উত্তর শুনে প্রভাস হতাশের সুরে বললে—তাই তো, তা হলে আর দেখছি হোল না—

—কি হোল না হে?

শরৎ দিদিকে আজ একবার অরুণের বাড়ী আর আমার বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলাম, ওখান থেকে একেবারে নিউ মার্কেট দেখিয়ে—

—চলো একটু কিছু মুখে দিয়ে যাবে—এসো—

শরৎ ছুটে বাইরে এসে বললে—প্রভাস-দা! আসুন, আসুন—অরুণবাবু এসেছেন নাকি? বসুন প্রভাস-দা, চা খাবেন।

কেদার বললেন—বড় মুস্কিল হয়েছে মা, প্রভাস নিতে এসেছিল, এদিকে আমি যাচ্চি চাটুয্যেবাবুদের গানের আসরে। না গেলে ভদ্রতা থাকে না—ওবেলা বার বার বলে দিয়েছেন—

প্রভাসও দুঃখ প্রকাশ করলে। শরৎ-দিদিকে সে নিজের বাড়ী ও অরুণের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলাম—কিন্তু কাকাবাবু বেরিয়ে যাচ্চেন—

শরৎ বললে—বাবা, আমি যাই নে কেন প্রভাস-দার সঙ্গে? যাবো বাবা?

কেদার খুসীর সুরে বললে—তা বরং ভালো বাবা। তাই যাও প্রভাস—তুমি শরৎকে নিয়ে যাও—তবে একটু সকাল সকাল পৌঁছে দিয়ে যেও—

প্রভাস বললে—আজ্ঞে, তবে তাই। আমি খুব শিগগির দিয়ে যাবো। সে বিষয়ে ভাববেন না।

প্রভাসের গাড়ী একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রভাস নেমে দোর খুলে বললে—আসুন শরৎ-দিদি, ভেতরে আসুন।

শরৎ বললে—এটা কাদের বাড়ী প্রভাস-দা?

—এটা? এটা অরুণদেরই বাড়ী ধরুন—তবে অরুণ এখন বোধ হয় বাড়ী নেই—এল বলে।

শরৎকে নিয়ে গিয়ে প্রভাস একটা সুসজ্জিত ঘরে বসিয়ে ডাক দিলে—ও বৌদি, বৌদি, কে এসেচে দ্যাখো—

শরৎ চেয়ে দেখলে ঘরটার মেজেতে ফরাস বিছানা পাতা, দেওয়ালে বেশির ভাগ বিলিতি মেম-সাহেবদের ছবি, একদিকে একটা ছোট তক্তপোষের ওপর একটা গদি পাতা বিছানা—তাতে বালিশ নেই, গোটা দুই ডুগি-তবলা এবং একটা বেলো-খোলা বড় হার্ম্মোনিয়াম বিছানার ওপর বসানো। একটা খোল-মোড়া তানপুরা দেওয়ালের কোণের খাঁজে হেলান দেওয়ানো খুব বড় একটা কাঁসার পিকদানি তক্তপোষের পায়াটার কাছে। একদিকে বড় একটা কাঁচের আলমারি—তার মধ্যে টুকিটাকি সৌখীন কাঁচের ও মাটির জিনিস, গোটাকতক ছোট বড় বোতল, আরও কি কি। একটা বড় দেওয়াল ঘড়ি।

শরৎ ভাবলে—এদের বাড়ীতে গান-বাজনার চর্চ্চা

খুব আছে দেখচি। বাবাকে এখানে এনে ছেড়ে দিলে বাবার পোয়া বারো—

একটি সুবেশা মেয়ে এই সময় ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে—এই যে এসো ভাই—তোমার কথা কত শুনেচি প্রভাসবাবু ও অরুণবাবুর কাছে। এসো এই খাটের ওপর ভাল হয়ে বোসো ভাই—

মেয়েটিকে দেখে কিছু বয়েস আন্দাজ করা কিছু কঠিন হ'ল শরতের। ত্রিশও হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে—কম হবে না, বরং বেশিই হবে। কিন্তু কি সাজগোজ! মা গো, এই বয়েসে অত সাজগোজ কি গিন্নিবান্নি মেয়েমানুষের মানায়? আর অত পান খাওয়ার ঘটা!...পেটো-পাড়া চুলে ফিরিঙ্গি খোঁপা, গায়ে গহনাও মন্দ নেই—বাড়ীতে রয়েচে বসে এদিকে পায়ে আবার চটিজুতো—মখমলের উপর জরির কাজ করা। কলকাতার লোকের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

শরৎ গিয়ে খাটের ওপর বসলো বটে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে—কিন্তু তার গা কেমন ঘিন ঘিন করছিলো। পরের বিছানায় সে পারতপক্ষে কখনো বসে না—বিছানার কাপড় না ছাড়লে সংসারের কোনো জিনিসে সে হাত দিতে পারবে না—জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দিতে পারবে না। কথায় কথায় বিছানায় বসা আবার কি, কলকাতার লোকের আচার-বিচার বলে জিনিস নেই।

বৌটি তেমনি হাসিমুখে বললে—পান সাজবো ভাই? পানে দোক্তা খাও নাকি?

শরৎ মৃদু হেসে জানালে যে সে পান খায় না।

—পান খাও না—ওমা, তাই তো—আচ্ছা, দাঁড়াও ভাজা মশলা আনি—

—না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার ওসব কিছু লাগবে না—

ক্রমশঃ

আজি বন্ধু হয়েছ দুর্লভ

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল

সেদিন নিকটে ছিলে আজি বন্ধু, হয়েছ দুর্লভ!
আজি মনে পড়ে সেই জীবনের মহা মহোৎসব!
সেদিন আপনা ভুলে আসিয়াছ মোর শেষ পাশে,
তোমার কুন্তল উড়ে—খেলিয়াছে দুরন্ত বাতাসে!

কত কথা কত ব্যথা—জীবনের কত ইতিহাস
তোমার নয়ন কোণে সেইক্ষণে হয়েছে প্রকাশ,
সে ছবি জীবনে মোর হ'য়ে আছে আজো শুকতারা,
জ্বলিছে উজল হ'য়ে জীবনেতে স্বপনের পারা!

আজি এ বাদল রাতে সেই ছবি আঁখি-জলে খুঁজি,
আমার হারাণ ধন আসিয়াছে মেঘ-লোকে ব[illegible]!
জমান বুকের ব্যথা—কাজল মেঘের রূপে [illegible]সে,
তোমার দীরঘ শ্বাস কেঁদে মরে কেতকীর বাসে!

সেদিন হয়ত তোমা—হৃদয়ের মণিকোঠা খুলি',
নিতে পারিতাম বুকে—নিমেষের ভুলটুকু ভুলি',
সেদিন নিকটে ছিলে আজি বন্ধু, স্বপ্ন পারাবার,
দোঁহাকার মাঝে কাঁদি করিতেছে শুধু হাহাকার!

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসতীকুমার নাগ

এই ত সেদিন পঁচিশে বৈশাখ আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অশীতি বৎসরের জয়ন্তী-উৎসব হয়ে ছিল। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে রবীন্দ্রনাথের শতায়ু কামনা করা হ'ল।

কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়ান হ'ল।

আজ সত্যি কি কবির মৃত্যু হয়েছে? আমরা ত দেখতে পাচ্ছি কবির মৃত্যুর পরও তেমনি বাংলার সর্ব্বত্র তাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছে।

কবি আমাদের মধ্যেই বেঁচে আছেন। তাঁর মৃত্যু হয়নি!

তিনি বেঁচে থাকতে যে সম্মান, শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়ে ছিলেন আজ তাঁর প্রয়াণে ঠিক তত খানিই আমাদের কাছ থেকে পেলেন।

মৃত্যুর পরও যে মানুষের কাছ থেকে পায় শ্রদ্ধা, অর্ঘ্য সে এ সব মানুষের সেরা।

আজকের দিনে ঐ মৃত্যুই প্রমাণিত করে দিল তাঁর ব্যক্তিত্ব, মহিমা, শ্রেষ্ঠতা।

এ-কথা হয়ত বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের বিষয় নোতুন করে বলার আমাদের কিছু নাই।

তিনি বাংলা ভাষাকে যে এক নোতুন রূপ দিয়েছেন তাঁর লেখনীর মুখে বেঁচে রইবে যতদিন বাংলার সংস্কৃতি সভ্যতা থাকবে।

পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে সাহিত্যের মিলন সেতু রবীন্দ্রনাথই গড়েছেন। তাই তাঁর সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্য বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে আমরা অফুরন্ত আলোচনা করেছি, তাঁকে বিশ্লেষণ করে অনেক সমালোচনা করেছি, তাই তাঁর কথা বেশী করে বলার আর কি থাকতে পারে? তাই তাঁকে নিয়ে যদি কেউ কিছু বেশী লিখে নিজেকে প্রচার করতে চায় তবে তাকে বাতুল বলতে পারে কি?

নাঃ—অন্তরের প্রকৃত অনুভূতি নিয়েই আমরা তাঁর কথা বল্‌তে বল্‌তে উচ্ছ্বাসে ভরে উঠি।

রবীন্দ্রনাথকে আমারা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নিবিড় করে পেয়েছি।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই, যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখি যে আশী বছরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের সঙ্গে চলেছেন এগিয়ে দেহে ও মনে।

তিনি ছিলেন নবীনের অগ্রদূত চির সজীব চির নবীন।

আমরা দেখেছি এই সেদিনও যখন বাংলা সাহিত্যে চলেছিল একটা প্রগতি বন্যা; এখন তাঁর শেষের কবিতা আমরা দেখলুম বন্যা আর মিতাকে।

বন্যা আর মিতার কথা জ্ঞানের মধ্যে ঝংকার দিয়ে ওঠে কবি নিবারণ চক্রবর্ত্তীর কবিতার ছন্দে ছন্দে। এরা বেঁচে রইল আমাদের নবীন সমাজের বুকে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য শতমুখী প্রতিভায় প্রজ্জলিত।

শুধু এই নয়, রবীন্দ্রনাথ যে একজন দেশ-প্রেমিক ছিলেন সে পরিচয় পেয়েছি, সেদিন জালিয়ানওয়ালার নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড দিনের—তিনি স্বেচ্ছায় সরকার প্রদত্ত 'নাইট' পদবী বিসর্জ্জন দিয়ে জানিয়ে ছিলেন তার মর্ম্মের বেদনা। পরাধীন বাংলার বেদনায় তাঁর অন্তর সংগোপনে কেঁদে চলেছে তা আমরা জেনেছি সেদিনকার—'সভ্যতার সংকট' পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতীক শান্তিনিকেতন এ-কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারে। যতদিন ঐ নিকেতন থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৃষ্টি জানাবে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনা। যদি কোনদিন তাঁর গড়া জিনিষ ভেঙ্গেই যায় তবে বলতে হবে আমাদের দুর্ভাগ্য।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা আমরা তার পূজারী। তাঁর সাহিত্যের বেদীমূলে আমরা ফুল দিয়ে সাজাবো বিচিত্র বর্ণসুষমার সাত-রঙা রাম-ধনুর রঙে। তবেই তার সাহিত্য-সৃষ্টি হ'বে সার্থক।

দুঃখের সংবাদ জীবনে তিনি কোন দিন পান নি। চিরদিন সুখের মাঝখান দিয়ে কাটিছেন, যে শ্রেষ্ঠ গৌরব তিনি অর্জ্জন করে গেছেন তা পৃথিবীর কম লোকই পেয়েছে। তাই বলি—রবীন্দ্রনাথ চিরসুখী ও ভাগ্যবান পুরুষ।

সঞ্চয়ন

কলিকাতায় দুগ্ধ-ব্যবসায়

[১৩৪৮। আশ্বিন সংখ্যা বণিক হইতে উদ্ধৃত]

মানুষের সকল প্রকার খাদ্যের মধ্যে সম্ভবতঃ দুধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। খাদ্য হিসাবে ইহার মূল্য, সহজপাচ্যতা, দামের সুলভতা, সহজপ্রাপ্যতা এবং ইহার মধ্যে খাদ্যপ্রাণের আধিক্য ও কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপাদানের প্রচুর সমাবেশবশতঃ ইহার সহিত অপর কোন খাদ্যের তুলনা হয় না। দুগ্ধ শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, রোগী ও স্ত্রীলোক সকলেই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। উপকারিতা হিসাবে ১ সের দুগ্ধ, ৯টা ডিম, আধ সের মাংস অথবা ১ সের মাছের সমান। অনেকস্থলে একজন সুস্থ, পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিও ৯টা ডিম কি ১ সের মাছ খাইয়া হজম করিতে পারে না, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র শিশুও একসের দুধ খাইয়া অনায়াসে হজম করিতে পারে। দুধে শতকরা ১৩ ভাগ কঠিন পদার্থ শতকরা ৮৭ ভাগ জলীয় অংশের সহিত এমন সুষ্ঠুভাবে মিশিয়া আছে যে, মিশ্রণের দরুণ দুগ্ধ সেবনের ফলে দেহে নূতন অণু গঠিত হয়, জীর্ণদেহ সংস্কৃত হয়, শরীরে তাপ উৎপন্ন হয়। নিম্নে কয়েকটি দেশের দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ও ইহাদের প্রদত্ত দুগ্ধের পরিমাণ দেওয়া হইল :—

দেশ	দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা	দুগ্ধের পরিমাণ	দোহাল অবস্থায় প্রতি গাভীর প্রদত্ত দুগ্ধের পরিমাণ
			পাউণ্ড
জার্ম্মাণি	১০,২৪৭,০০০	৬৬০,৬৪১,০০০	৫,৩০৫
ডেন্‌মার্ক	১,৬১০,০০০	১,৩৭,০৬৮,০০০	৭,০০৫
বেলজিয়ম	৯৮৩,০০০	৮২,৩৮৪,০০০	৬,৮৮৯
ইংলণ্ড	২,৬৩২,০০০	১৭৮,৪২১,০০০	৫,৫৭৬
হল্যাণ্ড	১,৪৭৫,০০০	১৩৫,৫৩৪,০০০	৭,৫৫৯
সুইজারল্যাণ্ড	৮৭৯,০০০	৬৯,৪২৩,০০০	৬,৪৯৮
সমগ্র ইউরোপ	৪৭,৭৮৫,০০০	২,৫৯০,০০৬,০০০	৪,৪৬০
ভারতবর্ষ	৪৫,৫০০,০০০	২৮৯,১০০,০০০	৫২৫
[illegible]	[illegible]১৩০,০০০	৩১,৮০১,০০০	৪২০

উক্ত তালিকা হইতে ভারতবর্ষ গো-সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও দুগ্ধ-সম্পদে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কত দরিদ্র, তাহা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে। যে দেশের গাভীগুলি যত বেশী পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে, সেই দেশের লোকেরাও তত বেশী পরিমাণে দুধ খাইয়া পুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করে। অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক, পাঞ্জাবেও একটি দুগ্ধবতী গাভী বৎসরে ২,১১৯ পাউণ্ড দুধ দেয়, আর বাংলার স্বল্প-দুধা খাদ্যাভাবে শীর্ণ গাভীর স্তন হইতে বৎসরে গড়ে ৪২০ পাউণ্ড বা মোটামুটি ৫ মণ বা দৈনিক ৯ ছটাকের বেশী দুগ্ধ নিঃসৃত হয় না। সুতরাং বাঙালীর মাথাপিছু যে ২.৯ আউন্সের বেশী দুধ জোটে না, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।

বাংলাদেশে গাভীর এই দুর্দশার প্রধানতঃ তিনটি কারণ আছে—(১) গোচারণভূমিগুলির অধিকাংশই শস্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, (২) গাভী-পালকেরা অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া উপযুক্ত আহার্যের সংস্থান করিতে পারে না, (৩) প্রজননকারী বৃষগুলি নিতান্তই নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

ভারতবর্ষে বৎসরে ১৮০ কোটি টাকার ৬১ কোটি ৯৮ লক্ষ মণ গরু ও মহিষের দুধ উৎপন্ন হয়। ইহার শতকরা ২৭ ভাগ দুগ্ধস্বরূপে লোকে পান করিয়া থাকে, শতকরা ৫৮ ভাগ হইতে ঘৃত ও ১৫ ভাগ হইতে দুগ্ধজাত অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং অফিসার ইতঃপূর্বে ভারতবর্ষে দুগ্ধের উৎপাদন, ব্যবহার ও বিক্রয় সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, উহা হইতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরগুলিতে প্রতিদিন যে পরিমাণ দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়, তাহার হিসাব উদ্ধৃত হইল :—

	মিউনিসিপালিটির এলাকার মধ্যে উৎপন্ন	সন্নিহিত গ্রামাঞ্চল হইতে আমদানী
	মণ	মণ
কলিকাতা	১৭২৭	২৭২৭
বোম্বাই	২৫০০	১২৫০

	মিউনিসিপ্যালিটির এলকার মধ্যে উৎপন্ন	সন্নিহিত গ্রামাঞ্চল হইতে আমদানী
াদ্রাজ	৯৭২	২৯৩
াহোর	৫৯৪	৬১৩
াগপুর	২৬৬	৯১
ক্ষ্ণৌ	৫৮৫	১১৪
দিল্লী	৩২৫	১,২০০
করাচী	৪২০	৯৮০
পুণা	৬২৫	২০০
শিকারপুর	৩৫০	৭০
হায়দরাবাদ	৭৩৩	১৫৪
আগ্রা	৪৭৮	৫৪
শতকরা হার	৫৯	৪১

কলিকাতায় প্রতিদিন প্রায় ৪৪০০ মণ দুগ্ধ বিক্রয় হয়। ইহার মধ্যে ১,৭০০ মণ কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকার মধ্যে এবং ২,৭০০ মণ কলিকাতার উপকণ্ঠ ও দূরবর্তী গ্রামসমূহে উৎপন্ন হয়।

কলিকাতায় বিক্রীত দুগ্ধের ১০০ প্রকার নমুনা লইয়া দুগ্ধের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে,

১৯টি নমুনায় জলের ভাগ শতকরা ১০ ভাগের কম

৬২টি ,, ,, ,, ১০ হইতে ২৫ ভাগ

১৬টি ,, ,, ,, ২৫ ,, ৫০ ,,

৩টি ,, ,, ,, ৫০ ভাগেরও বেশী।

দুধে জল মিশান কলিকাতার নিত্যকার ঘটনা। ইহাতে কোন খরচ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক সময়েই দুধের সহিত বিশুদ্ধ কলের জল মিশান হয় না। পচা ডোবা, পানা পুকুর প্রভৃতির জলও অনেক সময় দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

বর্তমানে দুগ্ধ বিক্রেতাদের এই অসাধুতা নিবারণের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই কাজের জন্য যে সকল ইন্স্পেক্টর বা অন্য কর্মচারী আছে, তাহাদের অনেকেরই ত্রুটিতে এই অসাধুতা প্রশ্রয় পাইতেছে। পুরাতন যুগের দুগ্ধ-পরীক্ষা যন্ত্রও ধূর্ত দুগ্ধব্যবসায়িগণের চতুরতার নিকট পরাজিত হইয়াছে। ইহারা দুধে চিনি বা অন্যান্য দ্রব্য মিশাইয়া জল মিশ্রিত দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক রাখিতেছে। সংশয়ের বিষয়ীভূত সকল প্রকার দুধের নমুনার অল্প সময়ের মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নাই। আর দুগ্ধ-পরিদর্শকগণ সাধারণতঃ দুগ্ধসংক্রান্ত রসায়ন-বিদ্যার সহিত পরিচিত নহেন।

জল ব্যতীত বিক্রেতারা অন্যান্য জিনিষও দুধের সঙ্গে মিশাইয়া থাকে। দুধ মন্থন করিয়া সর তুলিয়া যে জলীয় অংশ থাকে, তাহা অথবা দুধের সরচূর্ণ জলের সহিত মিশাইয়া তাহা কিম্বা কলা, ময়দা প্রভৃতি জিনিষ দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া তাহা খাঁটি দুধ বলিয়া চালাইয়া থাকে। বাসি দুধের দোষ সারাইবার জন্য তাহারা ফর্মেলিন (বিষ), বোরিক এসিড, হাইড্রোজেন-পারক্সাইড্ প্রভৃতি মিশাইয়া থাকে। অভিজ্ঞ রসায়নবিদের পরীক্ষা ব্যতীত এই সকল ভেজাল ধরিবার কোন উপায় নাই। কলিকাতাবাসী যে প্রতিদিন দুগ্ধের নামে কত অনিষ্টকর বস্তু গলাধঃকরণ করিয়া স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কলিকাতা কর্পোরেশন কতিপয় স্বাস্থ্য-পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল পরিদর্শক যে কি পরিমাণে তাহাদের কর্তব্য পালন করেন, তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্য এবং দুগ্ধে ভেজাল মিশ্রণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমরা কলিকাতার মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছি।

গাভীগুলি সাধারণতঃ গোশালায় অপরিচ্ছন্ন কাঁচা ভিটায় শয়ন করিয়া থাকে, গোময়, গোমূত্র প্রভৃতি তাহাদের স্তনে লিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময়েই গোয়ালারা গাভীর পালান কিম্বা দুধ দুহিবার পাত্র উত্তমরূপে ধৌত করে না, কিংবা দুধ দুহিবার সময় নিজেদের হাতও ভালরূপে ধোয় না। তারপর তাহারা দুধ খোলা ভাঁড়ে করিয়া সহরের নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করে, কিম্বা খোলা ভাঁড়ে করিয়াই সহরের উপকণ্ঠ বা গ্রাম হইতে দুধ গাড়ীতে লইয়া আসে এবং গাড়ীর ঝাঁকানীতে যাহাতে দুধ পড়িয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য ভাঁড়ের মধ্যে ডালসহ খেজুরপাতা কিম্বা ময়লা খড় গুঁজিয়া দিয়া থাকে। ইহাতে দুগ্ধের বিশুদ্ধতা যে কতদূর রক্ষিত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কখনও

কখনও লোক্যাল প্যাসেঞ্জার ট্রেণে রাণাঘাট, চাকদহ প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতেও খোলা ভাঁড়ে দুধ আসিয়া থাকে। এই সকল ভাঁড়ে যাত্রীদের পদধূলি বা নিষ্ঠীবন যে সময়ে সময়ে নিক্ষিপ্ত না হয়, তার কোন প্রমাণ নাই, ইহার উপর এঞ্জিনের কয়লার গুঁড়া ত আছেই। যাহারা দুধ সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এই সকল অনাচারের বিষয় অবগত আছেন, তাহারা জানিয়া শুনিয়া পরিবারস্থ শিশু ও রোগীদের জন্য এইরূপ দুধ কিরূপে ক্রয় করিতে পারেন? তবে যাহারা জানিয়া শুনিয়া ও নির্বিকারচিত্তে কিম্বা পয়সা বা ঝঞ্ঝাট বাঁচাইবার জন্য এরূপ দুধ কিনেন, তাহাদিগকে অবশ্যই ফলভোগী হইতে হইবে। সহরের নানাস্থানে যে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃতের ভাণ্ডারস্বরূপ ডেয়ারি নামধেয় দোকানগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোথা হইতে দুগ্ধ ও ঘৃত আমদানী হইয়া থাকে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অধিকাংশ স্থলেই নিতান্ত নিরাশ হইতে হয়।

আবার গোয়ালারা অনেক বাড়ীতে গরু লইয়া গিয়া দুধ দুহিয়া দিয়া আসে। এই সকল গরুর অনেক স্থলেই বাছুর থাকে না; মৃত বাছুরের শুষ্ক চর্মাবরণকে বাছুরের রূপ দিয়া ইহারা তাহার দ্বারা দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য এইরূপ দুগ্ধ রুচি ও স্বাস্থ্য উভয় দিক্ দিয়াই নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ এই সকল গাভী সহরের মধ্যে বদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে রক্ষিত হয় এবং উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য বা কাঁচা ঘাস পায় না। সুতরাং ইহাদের দুগ্ধে পুষ্টিকর উপাদানের নিতান্তই অভাব পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ দুধের ১০টি নমুনা লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ইহার মধ্যে শতকরা ২ হইতে ৩ ভাগ চর্বি আছে; কিন্তু যে সকল গাভী কাঁচা ঘাস খায়, তাহাদের দুগ্ধে শতকরা ৪ হইতে ৫ ভাগ পর্যন্ত চর্বি থাকে।

দুগ্ধ সম্বন্ধে অনাচারের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল অনাচারের প্রতিকারকল্পে গবর্ণমেণ্ট, জনসাধারণ ও কর্পোরেশনের একযোগে কাজ করা আবশ্যক। প্রধানতঃ দুধে ভেজাল ও অপরিচ্ছন্নতা এবং বিক্রেতাদের ও গোয়ালাদের নানাপ্রকার কদর্য অভ্যাস নিবারণকল্পে কঠোর আইন প্রবর্তিত হওয়া দরকার।

এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট, কর্পোরেশন ও জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের একটি বৈঠক আহূত হওয়া প্রয়োজন। এই বৈঠকে দুগ্ধসম্পর্কে বর্তমানে যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাও প্রতীকারের উপায় নির্ধারণের জন্য এবং উৎকৃষ্ট প্রজনন ব্যবস্থা, গাভীর পুষ্টিসাধন ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি তদন্ত-কমিটী গঠিত হওয়া উচিত। কমিটীর প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে যথোচিত বিবেচনার পর তাহা কার্যে পরিণত করা এবং বর্তমান দুর্নীতি প্রতিরোধের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।*

* প্রধানতঃ Financial Times পত্রে মিঃ ডি, সি, ঘোষ, বি-এ লিখিত Milk Supply in Calcutta শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

পুস্তক-পরিচয়

শারদীয়া (সচিত্র)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১০৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ জেনারেল প্রিণ্টার্স র‍্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম্-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২০০+৮ পৃষ্ঠা মূল্য দুই টাকা।

শরৎচন্দ্রের পর যে কয়জন ভাল গল্প লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। হাস্যরসাত্মক ছোট গল্পে তাঁহার তুলনা নাই। তাঁহার হাসির গল্পগুলি কাহাকেও আঘাত করে না—নিজস্ব মধুর এবং উজ্জ্বল হাস্যরসের প্রবাহে নিজেরা ঝলমল করে—দুঃখের সংসারে ক্ষণিকের আনন্দলোক সৃষ্টি করে। শিশুচরিত্র সৃষ্টিতেও তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'পৌতু', 'বাদল' প্রভৃতি গল্পগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও এগুলি সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার অশ্রু ও হাসির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে। এইখানেই তাঁহার যথার্থ শক্তির পরিচয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার ন্যায় অশ্রু ও হাসির এমন অপরূপ সমন্বয় করিতে আর কেহ পারেন নাই। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'শ্যামলরাণী', 'শারদীয়া' প্রভৃতি গল্পগুলিকে এই পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। যে সূক্ষ্ম পর্দ্দার উপর এই শ্রেণীর গল্পের বুনন তাহাতে একটু এদিক ওদিক হইলেই সম্পূর্ণ রসহানি হইবার সম্ভাবনা। তাই স্বল্প শক্তিশালী লেখকের পক্ষে এই ধরণের গল্প লেখা সম্ভব নয়। বিভূতিবাবু এই জাতীয় গল্পে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাই তাঁহাকে বর্ত্তমান বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্পলেখক বলিয়া অভিহিত করা যায়। এদিক দিয়া তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই।

শারদীয়া বিভূতিভূষণের এগারটি গল্পের সমষ্টি। প্রত্যেকটি গল্পই চমৎকার। বিশেষ করিয়া 'শারদীয়া', 'নামমাহাত্ম্য', 'অশরীরী', 'ঘরজামাই', 'ধর্ম্মতলা-টু-কলেজ-স্কোয়ার' প্রভৃতি গল্পগুলি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে।

বিনয়কৃষ্ণ বসু সুবিখ্যাত শিল্পী। তাঁহার রেখাচিত্রগুলি পুস্তকের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। তবে আরও কয়েকখানি বেশী চিত্র থাকিলে আরও ভাল লাগিত।

ছাপা বাঁধাই চমৎকার। সুন্দর পুরু মেলোটিণ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা। পুস্তকের সজ্জার অনুপাতে দাম অল্পই হইয়াছে বলিতে হইবে।

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

মহারাষ্ট্রের মহাপুরুষ শ্রীসৈ বাবা—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, এ-সি-ডব্লু-এ (লণ্ডন) প্রকাশক—চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, ১৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। দাম চার আনা।

ভারতের বুকে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে মহাপুরুষের জীবনী এখানে আলোচিত হইতেছে তিনি মহারাষ্ট্র দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত ছিল সর্ব্বমানবিক এবং উদার। ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকদের কাছে এই জীবনচরিতখানি ভাল লাগিবে। বইখানি সুলিখিত। বর্ত্তমান যুগে এই পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া উচিত।

স. চ. র.

On Cheques (চেক্ সম্বন্ধে)—এস, মোতায়েদ। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৬৪, মূল্য ১৲।

বর্ত্তমানে দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে জনসাধারণের সহিত ব্যাঙ্কের যোগাযোগও ক্রমেই দৃঢ় হইতেছে। ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের সহিত যোগাযোগের অন্যতম প্রধান সূত্র হইতেছে 'চেক্'। কিন্তু 'চেকে'র ব্যবহার প্রণালী এবং আইনগত সমস্যা সম্বন্ধে চেক-ব্যবহারকারী জনসাধারণের তো দূরের কথা, ব্যাঙ্কের বহু বড় কর্ত্তা ও এজেণ্ট ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদেরও অজ্ঞ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রয় এবং আমানত সংগ্রহের উপরই উচ্চতন পদাধিকার নির্ভর করে বলিয়া ব্যাঙ্কিং বিষয়ে পরিচালক ও কর্ম্মচারীদের অজ্ঞতা থাকিয়া যায়।

আলোচ্য পুস্তকখানি প্রধানতঃ কর্ম্মচারীদের জ্ঞানার্থে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার চেকের ব্যবহারিক ও আইনের দিক হইতে বিষয়টি বিশেষ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। গ্রন্থকার নিজে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত থাকায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহাদের উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে এবং সাধারণ চেক ব্যবহারকারীও পুস্তক হইতে বহু জানিবার বিষয় পাইবেন। কিছু কিছু নজীর উদ্ধৃত করিলে পুস্তকের মূল্য বাড়িত। পাতার সংখ্যা হিসাবে পুস্তকের দাম কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়। ছাপা, কাগজ ভাল।

শিল্প ও সম্পদ—সম্পাদক শ্রীকমলচন্দ্র নাগ। অর্থনীতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা। প্রতি সংখ্যা /• আনা, বার্ষিক ২৲ টাকা। কার্য্যালয় ২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গালী ব্যবসামুখী নহে বলিয়া বাংলা ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনার দৈন্য দেখা যায়। সম্প্রতি সুর কিছু ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে সাময়িক পত্রিকাদিতে অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হইতেছে, দুই-একখানি অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতির ব্যবসা-বিমুখতা দূর করিতে হইলে ব্যবসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিশেষ বিস্তার হওয়া প্রয়োজন। তাই, 'শিল্প সম্পদ'কে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। ইহার প্রথম সংখ্যাখানি দেখিয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। এই সংখ্যায় "ছোট ব্যাঙ্কের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য," আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী, কাজের কথা, চিত্রে একটি বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের পরিচয়, দেবজ্যোতি বর্ম্মণের 'বাঙ্গালীর সম্পদ,' বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগীর "যৌথকারবারে গণতন্ত্র" প্রবন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে যৌথকারবারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বিষয়ক আলোচনায় পাঠক বহু চিন্তার খোরাক পাইবেন। আমরা পত্রিকাখানির দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজ ও সামাজিক স্বভাব

শ্রীজগদীশ বসু

ব্যক্তিই সমাজের পাঁজর। তবে কেবল গণিতিক নিয়মে ব্যষ্টির যোগফলটাই নিছক সামাজিক নক্সা নয়—কারণ সমাজের গ্রথিত একত্রিক পটটি একটা জটিল কাঠামো। ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির সম্পর্ক ও সম্বন্ধে প্রকৃতিগত ও পরিমাণগত নৈকট্য এবং তফাৎ। ব্যষ্টির সমষ্টিতেই সমাজ নয়, ব্যষ্টির সমষ্টি অপেক্ষাও সমাজ বৃহৎ। জটিল যন্ত্রের মধ্যে যেমন রকমারি কারিকুরী ও সূক্ষ্ম ফের-প্যাচ রয়েছে সমাজেও তাই—একটা রিষ্টওয়াচের অভ্যন্তর ভাগের মতই সমাজের অন্তর্ভাগে সূক্ষ্ম কলকব্জার সুসম্বদ্ধ সজ্জা। রিষ্টওয়াচটির দেহ থেকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুলে নিয়ে আবার এলোপাথারী জুড়ে দেওয়া চলে না, ঘড়ি টিক্ দেয় না। কারণ, ঘড়ির এক অংশের সংগে অপর অংশের দৃঢ়ীভূত সংযোগ—কলকব্জার অতি নির্দ্দিষ্ট সজ্জা ও সম্বন্ধ তখনো গড়ে উঠেনি। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থায় ঘড়ির নির্দ্দিষ্ট অংশগুলি নিজ নিজ জায়গায় পড়া মাত্রেই ঘড়ির জীবন-যন্ত্রে চেতনা জাগবে। ঘড়ির গঠন-কাঠামোর মতই সামাজিক গঠন-কাঠামো এক ও অভিন্ন। ব্যক্তির সংকলনেই তো সমাজ, কিন্তু শ্রমের শৃঙ্খলায় ব্যক্তিতে সমাজে শৃঙ্খল; নির্দ্দেশিত মুহূর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট আসনে নিরূপিত জায়গায় ব্যক্তি যদি সক্রিয় না থাকে, পরস্পর শ্রমের প্রয়োজন ও বন্ধনে যদি না মিলিত হয়, তবে সমাজের কর্ম্ম প্রবাহ চলতে পারে না। শ্রম-কর্ম্মের নিষ্ঠা ও নিয়মে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গ্রন্থি পড়ে, ব্যক্তি ও সমাজ সর্বাঙ্গীন শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত হয়।

সমাজের বিচিত্রতা নিরুপম। সমাজের পাঁজর এই অগণিত নরনারী পরস্পরের উপর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে অহরহঃ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায়—মানুষের নিছক সংকলনেই সমাজের বহির্ঠাট হোলেও সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে কর্ম্মের তাগিদ ও তাগাদায় ছোট ছোট চক্র গঠিত হয়। এই চক্র অগণিত। পৃথিবীর সকল হাটের মানুষের সংগে এই চক্র-পরিসর মধ্যের ব্যক্তিদের অলক্ষ্যের সাধারণ সংযোগ থাকলেও আপন আপন চক্রে আন্তঃ-সম্পর্কের ফলে প্রত্যেকের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। আসলে, সংকীর্ণ সীমানা মধ্যেই মানুষে মানুষ নিবিড় অন্তরঙ্গতা জন্মে। এই সংকীর্ণ সীমানার সঙ্ঘের সহিত সন্নিহিত সীমানার জনপদের আবার সঙ্ঘগত সংযোগ গড়ে ওঠে। ব্যক্তি ব্যক্তিকে অবিরত প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবান্বিত না করলেও অনেক সময় সঙ্ঘগত ভাবেই প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার টানাপোরেন চলে। লৌকিক সমাজের বিরাট গঠন-পদ্ধতির মধ্যে খণ্ড-পদ্ধতির অংশ স্বরূপ এই সঙ্ঘ এবং শ্রেণীসমূহ পারস্পরকে জীয়াইয়া জড়িত থাকে, জলের মধ্যে যেমন থাকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের জীবন্ত কণা। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে কোন ব্যক্তির আদম বা রবিনসনের মত অলৌকিক ও রহস্যাচ্ছন্ন কোন রূপ নেই। বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবের ঊর্দ্ধে, অন্য অগণিত ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঊর্দ্ধে, সামাজিক উপাদান প্রসূত সুরভিত জ্ঞান-রা[illegible] ঊর্দ্ধে, ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ঊর্দ্ধে ও সামাজি[illegible] প্রাচীরের অন্তঃসীমার ঊর্দ্ধে ব্যক্তির কোন রূপ নেই—ব্যক্তিকে কল্পনাও করা যায় না। ব্যক্তি সমাজের নিকট শতরঞ্চের ঘুটি স্বরূপ। ব্যক্তির দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়া, অনুভূতি ও অভিপ্রায় সামাজিক ঘটনারই ফল। সামাজিক ঘটনার তাপমান যন্ত্রে ব্যক্তির অভিপ্রায় উঠে-নামে। ব্যক্তি বিশেষের অভিপ্রায় সামাজিক ঘটনায় প্রকাশ পায় না (কেবল সার্ব্বজনীন ভাবে পায়), কিন্তু ব্যক্তির মানসিক অশান্তি ও সংশয়ের মূলে সামাজিক ঘটনা প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করে। ব্যক্তিকে অনেকটা জোরের সংগেই সমাজ আকর্ষণ করে, কারণ সামাজিক শক্তিপুঞ্জের চাপ ব্যক্তির অনুভূতি ও অভিপ্রায়ে প্রতিফলিত হয়ে তার ক্রিয়ার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়,—ধনিক যেমন ধনবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচাতে

গিয়ে ভাবী বিপ্লবের মৃত্যু-বাজনা না শুনেই মহাযুদ্ধের অবতারণা করে ও চলিত ব্যবস্থার যবনিকাপাত হয়। ব্যষ্টির সামাজিক অস্তিত্বই তার পরিচয়। সংকীর্ণ অর্থেও সমাজ বলতে শুধু মনুষ্যগণ না বুঝে, সংযোজিত ব্যবস্থাকেই বুঝতে হবে। মানুষ সমাজস্থ কাজের ভৌতিক দেহ আর সমাজ একটা কারখানা বা ব্যক্তির কার্য্যের যন্ত্রশালা বিশেষ। কিন্তু মানুষ শুধু জৈবিক দেহ-সার-সর্ব্বস্ব নয়—তার ধ্যান, ধারণা, ভাব, ভাবনা, চিন্তা, চেষ্টা, প্রজ্ঞা ও অভীপ্সা প্রভৃতিরও পরিবর্ত্তন, রূপান্তর আছে। ব্যক্তির মধ্যেকার সম্পর্কে শুধু ব্যবহারিক সম্পর্কই সব কিছু নয়—মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ারও অবকাশ আছে। সমাজের কারখানায় শুধু জাগতিক দ্রব্যই উৎপাদিত হয় না, তথাকথিত ঐতিহ্য ও কৃষ্টিও জন্মলাভ করে। অর্থাৎ সমাজে বস্তু ও আইডিয়া দুই-ই উৎপাদিত হয়। এই ভাবধারা একবার উৎসারিত হলে ভাবরাজ্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারিত হতে পারে। কাজেই, সমাজে ব্যক্তি, আইডিয়া বা বস্তু কেউই স্বতন্ত্র ও অনন্য-নিরপেক্ষ নয়—ব্যক্তি, বস্তু ও আইডিয়া এই তিনের সমন্বয়েই সমাজের গতিপথ মসৃন। সমাজ ব্যক্তি-বর্জিত হ'লে আইডিয়াও লোপাট হ'য়ে যায়, জলের ওপর ভাসমান তেলের মত সাঁতার কাটে না এবং বস্তুর অস্তিত্বও অবান্তর হ'য়ে দাঁড়ায়।

ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের ওপরই নির্ভরশীল। স্পষ্টতঃ ও প্রত্যক্ষতঃ ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই মানুষ সীমাবদ্ধ। প্রকৃতি থেকে সে অবিচ্ছিন্ন, পারিপার্শ্বিক তাকে ঘিরে রেখেছে। অবশ্য প্রকৃতিকেও মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে ও আদেশ প্রতিপালন করিয়ে নেয়, কিন্তু তার পারিপার্শ্বিকও নিরপেক্ষ থাকে না। ক্যাণ্টের কথায়—মানুষকে বুঝতে হলে তার পারিপার্শ্বিক সমাজকে বুঝতে হবে এবং মানুষের জীবিকা-নির্ব্বাহ ও জীবনযাত্রার যৌথ আঘাত-অভিঘাতের দরুণ যে পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি হয় তা-ও অবহিত হ'তে হবে। তাই, সমাজের মুখ্য টাইপ ব্যক্তিকে তীক্ষ্ণভাবে নাড়াচাড়া ক'রে দেখতে হয়—যা নইলে সমাজটাই ফাঁকি হ'য়ে দাঁড়ায়। অধ্যাত্মবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের মত ঐশ্বরিক প্রভায় সমাজ-বিজ্ঞান কারও সামনে জলজল করে না। অবশ্য মৌমাছি শীর্ষক রচনায় লেখককে মধুপের গুঞ্জন ধ্বনির ব্যাখ্যান ক'রতে হয় না, এবং প্রতিবেশী মৌমাছিদের উপর অন্য মৌমাছিদের ব্যবহারের রকমারিত্ব দেখানো ও মধুপ-সমাজের আচার-অনুষ্ঠান পর্ব্ব বিবৃত করা অবান্তর মনে হয়। কারণ, মধুপ-সমাজের অভিনব সাধনা, আধ্যাত্মিক মার্গ পরিক্রমা ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পরিমাপ ক'রতে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু মানুষ মৌমাছির মত ব্যস্ত হ'লেও আসলে মৌমাছি নয়—তাই মানুষের বেলায় ও-সবের বিচার, বিশ্লেষণ নিখুঁৎ-ভাবে দরকার। কেন না, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অন্তঃ-ক্রিয়ার ফল যে কোন জীব অপেক্ষা উন্নত ও বলিষ্ঠ। কিন্তু মানুষের সব রকম জটিল ও দুরূহ মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবের বাহার শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তির মন রয়েছে সে ব্যক্তির দেহও আছে এবং নশ্বর হ'লেও এই পাপের পৃথিবীতে দেহটাই মানুষের সর্ব্বস্ব। এই দেহ শ্রমের কঙ্কাল, এই দেহের ঘাম ও রক্ত দিয়েই শ্রম প্রক্রিয়ার মারফৎ মানুষের সমাজ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। এই নিয়মাবলীর আওতার বাইরে যাবার মানুষের ক্ষমতা নেই। হিমালয়ের অরণ্য থেকে ল্যাঙ্কোশায়ার নগরীর সকল মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, পরাধীন ঔপনিবেশিক, রাজনীতিক, ইঞ্জিনীয়ার, কারিগর, অর্গানাইজার সবাই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের জন্য কাজের মধ্যেই নিমগ্ন। কেন না, যখন উৎপাদিত পণ্য দেশ-দেশান্তরে রপ্তানী হয়—ফ্যাক্টরী থেকে বিদেশের বাজারে, বাজার থেকে ব্যবসায়ীর বিপণি, ও বিপণি থেকে ক্রেতার ঘরে পৌছায় তখন সংগে সংগে পারস্পরিক ব্যক্তির মধ্যে একটা সম্পর্কও গড়ে ওঠে। এই মৌলিক সম্পর্ক বা বন্ধন বা অনুরূপ অযুত সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তি প্রভাবিত হ'য়ে গ্রথিত হয়। এই ভাবেই সঙ্ঘ, রাষ্ট্র, গীর্জ্জা, পার্টি ও শ্রেণীসমূহ গড়ে উঠে সমাজ-কাঠামো তৈরী হয়। সমাজের দেহের মধ্যে শরীরের টিস্যুর মত অসংখ্য সঙ্ঘ রয়েছে। সঙ্ঘসমূহ সংগঠিত হয়েছে আবার ব্যক্তির সংকলনে। তাই এই নির্দ্দিষ্ট সঙ্ঘের ব্যক্তিরা সমধর্ম্মী ও তাদের ঐক্য আদর্শ। চিন্তায়, ক্রিয়ায়, আলাপে, আড্ডায় তাদের মধ্যে একটি ট্রেডমার্ক সামঞ্জস্যই লক্ষ্যে

আসে, এবং যে কোন উন্নত বা অধস্তন সঙ্ঘের জীবন-যাত্রার অনুকৃতি বিরল দেখা যায়। এই সঙ্ঘগুলিকেই ব্যাপকভাবে যোগ দিলে সমাজে যুযুৎসু শ্রেণীসমূহের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। স্ব-শ্রেণীজাত সন্তান হিসাবে ব্যক্তির নিজস্ব সঞ্চরণের এলাকা—কোন পার্টি, ট্রেড য়ুনিয়ন, কৃষক পরিষদ, পার্লামেণ্ট বা বণিক সঙ্ঘ প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তির সত্বা ও আত্মা এই ব্যাপকক্ষেত্রে একেবারে অবলুপ্ত হ'য়ে যায়—তার শ্রেণী-সত্বাই তখন প্রাধান্য লাভ করে ও প্রতিভাত হয়। যীশু ও চৈতন্যের চৈতন্যও এই শ্রেণী-রূপের মধ্যে অভিসিঞ্চিত না হ'য়ে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত হ'তে পারে না। এই ভাবে ব্যক্তির অভিলিপ্সা, সক্রিয়তা, পরিবর্ত্তন বা রূপাবর্ত্তন তার শ্রেণী-ক্রিয়াশীলতার অঙ্গাগী লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়।

আসলে তা'হলে ব্যক্তির সমষ্টিই যে সমাজ বা ব্যক্তির ইচ্ছাই যে সমাজের ইচ্ছা এ কথা উপলব্ধিত হয় না—মানুষের সংখ্যা ও সমষ্টি বাদেও সমাজের প্রকৃতিতে আসল ও অভিনব হচ্ছে শ্রম-পদ্ধতির মধ্যে সমষ্টির সমাবেশ ও সঞ্চরণতা। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে শ্রমই রাখছে নাড়ীর যোগাযোগ। শ্রমের আবার মানসিকতার ক্ষেত্রেও রয়েছে হিপ্নোটিক ক্রিয়া, কথাটায় জটিলতার অবকাশ আছে। শ্রমই পণ্যের মূল্য, বা শ্রমই হচ্ছে পণ্যের সামাজিক উপাদান। পণ্যমূল্য রিলেটিভ নয় বা ব্যক্তির আন্দাজী নিরিখে পণ্যমূল্য নির্দ্দিষ্ট হয় না, পণ্যের মধ্যে পুঞ্জীভূত শ্রমশক্তিই পণ্য-মূল্যের চালক শক্তি, অর্থাৎ সামাজিক শ্রমই পণ্যের মূল্যের প্রাণকোষ। ব্যক্তির অভিপ্রায়ে একটি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের স্বাধীন মূল্য তার নিজ প্রয়োজনেই হতে পারে মাত্র। অপর পক্ষে প্রকৃত মূল্যের প্রভাব প্রত্যেককেই প্রভাবিত করায় দ্রব্য হয়ে ওঠে পণ্য। পণ্যমূল্য সামাজিক শ্রমের বিকাশ বলেই মানুষ সমাজস্থ শ্রম-বিভাগের অধীন আর ব্যক্তির শ্রম হচ্ছে সমাজে ব্যয়িত শ্রম-সমষ্টির অংশ ও অঙ্গ মাত্র। (সমাজে ব্যয়িত শ্রম কথাটার তাৎপর্য্য এই যে—সমাজের অভাব পূরণের জন্যই পণ্যের প্রকাশ, তাই পণ্যে নিহিত সব শ্রমই সামাজিক শ্রম।) কাজেই পণ্যের মূল্য স্বতন্ত্র—ব্যক্তি-স্বীকৃত ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অর্থাৎ ব্যক্তির সক্রিয়তা পণ্যের মধ্যে সঞ্চিত থাকলেও মূল্যের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিও সমষ্টির স্বীকৃত এবং কাজেই সমাজ-জীবনের নিয়ামক। মানসিকতার ক্ষেত্রেও এই স্বতঃসিদ্ধের ব্যতিক্রম নাই। জাগতিক ও লৌকিক যা কিছু—যেমন ধর্ম্ম, দর্শন, আর্ট, বিজ্ঞান, আইন, কলা, রাষ্ট্রীয় রূপ বা আরও হাল্‌কা ব্যাপার রীতি, ফ্যাশন, ব্যবহার, আচার প্রভৃতি সবই সমাজ-জীবনের উৎপাদিত ফল, গ্রথিত ব্যষ্টি সমূহের শ্রম-সমষ্টির উপহার। এক কথায় সমাজ-জীবনের ভূমিকা থেকে পরিশিষ্ট অবধি প্রতিটি অধ্যায় পুঞ্জীভূত সামাজিক শ্রমের বিকাশ।

ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতাই যেমন সমাজের একমাত্র সম্পদ নয়, তেমনি একক মাত্র ব্যক্তির অনুভূতি ও আইডিয়ার সমষ্টি থেকেই সমাজের মনোজীবনের রচনা নয়—পরিবেশ ও প্রতিবেশের সামিয়ানার তলেই সমাজের মনোজীবনের পরিপুষ্টি, প্রতিবেশী ও প্রতিবেশের নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য্যের ফল স্বরূপ সমাজের নূতন সূতিকাগৃহে তার জন্ম। সামাজিক পরিবেষ্টনের পরিবর্ত্তনের সংগে মানুষের রূপাবর্ত্তনের তাই সহোদর সম্বন্ধ। মনের ও মানুষের এই পরিবর্ত্তন বা রূপাবর্ত্তন সামাজিক উৎপাদন-শক্তির ক্রম-বিবর্ত্তনের ফল ও ফসল। সমাজের রঙ্গমঞ্চে মানুষের লীলা তাই পরিবেষ্টন-সঞ্জাত। সামাজিক প্রতিস্থিতির গুণে তার বিকাশ ও স্থিতিকালে নিষ্ফলতা। সমাজের বিকাশমান অবস্থায় তারা ডেভেল্‌পড, জরিষ্ণু অবস্থায় ডেকাডেণ্ট এবং বিশেষ অবস্থায় বিশেষ মানুষের অভ্যুদয় দৈবী শক্তির মত।

সমাজ-বেড়ার বহির্ভাগে বা সমাজকে খাঁচায় বন্ধ করে ব্যক্তির অস্তিত্বের ধারণা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ব্যক্তির ফরমুলা ও ফরমায়েসেই যে সমাজের সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ এ ধারণাও তাজ্জবকর। 'পৃথিবীর জরায়ু' থেকে নিষ্কাষিত আদিম যাযাবর মানুষ পরিবার ও পরি-জনের মধ্যে জীবনযাপন করা যে আনন্দকর ও রোমাঞ্চময় হঠাৎ এক সুপ্রভাতে এ কথা আবিষ্কার করে নাই—কিংবা নাইলের এক আমলকীবনে জনসভা করে এই উদ্দেশে একটা সমাজ বানাইবার প্রস্তাব আনে নাই—সমাজে

অনিরুদ্ধ জয়যাত্রার গতি-প্রবাহ চিরকাল দিয়াছে সংহত সামাজিক উপাদন। মানুষের সংগে মানুষের একত্রিক বসবাস এবং সংকেত, ধ্বনি ও আওয়াজের মধ্য দিয়া মনোভাব প্রকাশের পূর্ব্বে ভাষা সৃষ্টির কল্পনা যেমন পাগলামী, তেমনিতর পাগলামি হলো সমাজের বহির্ভাগে মানবিক অস্তিত্ব ও তার উৎপাদন প্রয়াসের ধারণা করা।

জন্ম মূহূর্ত্তে জীবন স্বাধীন, জীবনের বা মানুষের এই স্বাধীনতা নিশ্চিত করবার জন্যই সে সংগী ও সমাজের সান্নিধ্য খোঁজে। সমাজের সংগে সম্বন্ধ রাখতে বেয়াড়াপনা করলেই সমাজ তাকে চাবুকে বদ্ধ রাখে—রাজার বেয়াদপীপনা বেয়াড়া হলেই সমাজ তাকে লাথি মেরে তাড়াতে কসুর করে না, সমাজের ভার ব্যক্তি নিতে উদ্যত হলে—সমাজের হাড়কাঠে ব্যক্তি অনতিবিলম্বে বলি পড়ে।

মানুষের সামাজিক গুণের স্ফুরণ হয়েছে সমাজে, জীবন সুরভিত ও উপচীয়মান হয়েছে বিস্তীর্ণ সামাজিক পরিধিতে—সমাজকে যে মানে নাই, সমাজ তাকে অস্বীকার করেছে সমাজের বশ্যতা স্বীকার করবার পরেই সমাজ ব্যক্তিকে গ্রহণ ও বরণ করেছে, ঠিক যেমন ব্যক্তির পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মধ্যে আপন পুষ্টি মেনে নিয়ে ভাষা হয়েছে সমৃদ্ধতর।

সমাজই মানুষকে সামাজিক স্বভাব ও গুণে ভূষিত করে, সমাজের ভাবধারা বিমুক্ত হয়ে তার আস্ফালন অচিন্তনীয়। সমাজের মিউজিয়মেই মানুষের আবির্ভাব, বিকাশ ও বিলয় ঘটে। সমাজস্থ প্রাণী সমাজের বেড়া ডিঙিয়ে বাস করতে পারে না। প্রাণী মাত্রেই প্রকৃতগত ভাবে প্রকৃত সামাজিক জীব, কেন না—প্রাণীর সৃষ্টি কাল থেকেই সমাজে প্রাণের সঞ্চার। ভূমিতে পড়া মাত্রেই মানুষ সমাজ-ভূমিষ্ঠ ও সমাজ-জীব—অর্থাৎ সহচরের মত সামাজিক পরিবেষ্টন অনুক্ষণ তার সংগী। ব্যক্তির মনে সমাজ নিরন্তর তার পরিবেষ্টন-ক্রিয়া মুদ্রন করে বলে এ কথা মনে করা স্বাভাবিক যে, ব্যক্তির স্বভাবে পরিবেষ্টনের দাগ ও ছাপ থাকে। একটা নির্দ্দিষ্ট সমাজের পারিপার্শ্বিকতায় যে ঢংয়ের স্বভাব গড়ে ওঠে ভিন্ন সমাজের পরিমণ্ডলে তেমনিটি হয় না। "সঙ্গই সংগীর দর্পণ"—মানুষের সংসর্গ ও সংসদ্ দেখেই মানুষের প্রকৃতিকে চেনা যায় আর এই সংসর্গই সামাজিক পরিবেষ্টন।

প্রশ্ন উঠবে তাহলে ব্যক্তি কি ইতিহাসের ফাউ, ব্যক্তির ভূমিকা কি মাঠে মারা যায়? মানুষের সঞ্চয়নে যখন সমাজ, তখন সমাজের ঘটনা-প্রবাহে অবশ্যই ব্যক্তির সুস্পষ্ট প্রভাব থাকে, সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ মানুষের সক্রিয়তা, অভিপ্রায় ও অনুভূতির অভিব্যক্তি অবশ্যই সমাজের শরীরে প্রকাশ পায়—মানুষ নিজে তার ইতিহাস গড়ে। কিন্তু কোন সংহত পরিকল্পনা অনুযায়ী সংহত প্রেরণা নিয়ে নয়—কতগুলি প্রক্রিয়ার মারফৎ। তাদের মধ্যে অর্থ নৈতিক সম্পর্কই শেষ পর্য্যন্ত সব নিয়ন্ত্রিত করে, তা সে রাজনৈতিক ও ভাবধারাগত সম্পর্কের দ্বারা যতই প্রভাবান্বিত হোক। এ যেন একটা রঙীন সুতো অন্য সব সম্পর্ককে বেঁধে রেখেছে ও তাদের বুঝবার উপযোগী করে দিচ্ছে।

মানুষ নিজে তার ইতিহাস গড়ে—তবে নির্দ্দিষ্ট রূপে নির্দ্ধারিত কোন সমাজে নয়। তাদের পরস্পরের প্রেরণা হয় পরস্পরের বিরোধী; কাজেই এমন সব সমাজে দেখা দেয় দৈবের রূপ নিয়ে একটা অনিবার্যতা যা সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করে। আবার, যে অনিবার্যতা এখানে দৈবের রূপ নিয়ে দেখা দেয় তাও মূলত: অর্থনৈতিক। তথাকথিক মহামানবের প্রশ্নও এখানে বিশ্লিষিত হবে। একটা বিশিষ্ট দেশে, একটা বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে যে বিশেষ করে একটা লোকের আবির্ভাব হয় আর কোথাও হয় না, সেটা অবশ্য দৈব। কিন্তু তাকে যদি আমরা ছেড়েও দিই, তবু তার পরিবর্ত্তে একজনের দরকার হয় এবং কালচক্রে সে পরিবর্ত্ত পাওয়াও যায়। বিশেষ করে কর্সিকাবাসী নেপোলিয়নই যে ফরাসী গণতন্ত্রের বিধ্বংসকারী সংগ্রামের অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে, সামরিক এক-নায়ক রূপে, দেখা দিলেন সেটা অবশ্য দৈব। কিন্তু নেপোলিয়ন না থাকলেও আর একজন কেউ তার জায়গা নিত; যখনই কোন মানুষের দরকার হয়েছে, তখনই তেমন লোক পাওয়া গেছে, এই ঘটনাই তার প্রমাণ আর সিজার, অগাস্টাস, ক্রমওয়েল প্রভৃতি তার উদাহরণ।" (এঙ্গেলসের 'ঐতিহাসিক জড়বাদ'—পৃষ্ঠা ২৬-২৭)

এর পরের প্রশ্ন, ব্যক্তির প্রভাব যখন সমাজের উপর পড়ে, তখন সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রভাব কী ভাবে নির্দ্ধারিত হয় এবং তা পরিমাপ করা সম্ভব কি না?—মানুষের চিন্তা স্বাধীন নয়, বহিঃপরিমণ্ডলের প্রভাবাধীন। ব্যক্তির জীবন, তার পেশা, পারিবারিক জীবন, সংসার, গ্রুপ, শ্রেণী এবং তদানীন্তন সমাজের অবস্থা প্রভৃতি সাপেক্ষ,—তার কার্য এই যাবতীয় অবস্থার অনুপ্রেরণা-সঞ্জাত। অর্থাৎ, ব্যক্তির মন ও মনন ক্রিয়া বহিঃপ্রকৃতি বা সামাজিক পরিস্থিতির পরিরূপ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বাঙলার গণ-বিদ্রোহের অধিনায়ক গোপালের নামের অবতারণা করা যেতে পারে। রাজা স্বেচ্ছাচারী, কামান্ধ, সামন্ত জমিদারের বর্দ্ধমান অবিচার ও অত্যাচার, গৌড়ের বিভিন্ন এলাকায় দুভিক্ষ, কৃষি ও কৃষকের সংকট, কঠোর করভাবে পীড়িত জনসাধারণের মনে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ, ফলে এই সংকটপূর্ণ অবস্থা হ'তে মুক্তি পাবার জন্য রাজা এবং রাষ্ট্রিক কাঠামোর অবলোপ ও পরিবর্তন। এই অবস্থার মধ্যেই সামাজিক জীব গোপালের উদ্ভব ও অভ্যুত্থান—এই পরিস্থিতি প্রভাবেই গোপালের অসংখ্য সহকর্মী ও সমর্থকের সম্রাট ও সরকার-বিরোধী মনোভাব এবং মানসিক অবস্থার পরিপুষ্টি। সামাজিক বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলাজনিত অবস্থা হ'তেই এখানের ব্যক্তির ভূমিকা প্রকটিত ও সামাজিক অবস্থাই ব্যষ্টির মনোভাবের নিয়ামক।

গোড়া থেকেই ব্যক্তির মধ্যে তার পরিমণ্ডল প্রভাব বিস্তার করে। ঘরে-বাইরে, পার্কে, হোটেলে, সিনেমায় শিক্ষায়তনে, সর্ব্বত্র শিক্ষানবিশ হিসেব মানুষ পাঠ নিচ্ছে—তার কথার ঢং-য়ে সামাজিক ভাষা বিবর্ত্তের নমুনা, তার চিন্তাপ্রণালীতে পূর্ব্বপুরুষদের ধারণার প্রতিফলন, তার চারপাশের পরিচরদের সব রকম ধরণ ও ধারণার সে অবিকল ছায়া—পলে পলে স্পন্দনের মত নব নব চিন্তার সঞ্চয়ে সে ফেঁপে উঠছে। এই হচ্ছে 'রাম ও রহিম' বা ব্যক্তিমাত্রেরই বিশ্লেষিত চেহারা ও সামগ্রিক রূপ। গোড়ায় ব্যক্তিকে বলা যায় সমাজ-পুস্তকের সূচী বা এক-একজন 'ব্যক্তি' হচ্ছে 'সামাজিক প্রভাবের কালিতে' ছাপা এক-একটা সংকলন।

ব্যক্তি বা মানুষের প্রকৃতি বলতে যদি এই বুঝায় যে মানুষ যেমন অবিকল ঠিক সেই প্রকৃতি তা'হলেই মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি বদলাতে বাধ্য এবং এই পরিবর্ত্তন দ্রুতও হোতে পারে। কেন না, অবিকল মানুষ নিথর ও মৃত নয়—গতিবান্ ও প্রাণবান্ এবং তার দেহ, মন ও মস্তিষ্কের একচ্ছত্র অভিভাবক হোল প্রকৃতি ও পরিমণ্ডল। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেষ্টনের বৈগুণ্যেই তাই মানুষের চেহারা বদলায়। নোতুন সামাজিক ও প্রাকৃতিক জগৎ সোভিয়েট রাশিয়ায় যে নূতন নমুনায় মানুষের প্রকৃতি গড়ে উঠছে এ কথা কি অবশ্য স্বীকার্য নয়?

মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বদলায় কি-না সেটা অবশ্য ভাববার বিষয়:—সামাজিক পরিস্থিতি থেকেই ব্যক্তির মানসিক প্রবৃত্তির উদ্ভব। কেন না, মানুষ প্রকৃতির সন্তান। কোন এক বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে মানুষের জন্ম। মানুষের সকল প্রকার প্রবৃত্তি ও প্রেরণার মূল চালক তাই প্রকৃতি। কিন্তু মানুষের প্রকৃতির গঠন-কাঠামো পৈতৃক নকসায় তৈরী ব'লে বাজনাটা যত বেশী বেজেছে আসলে তত নয়—একই পিতার যমজ সন্তানের মধ্যে একজন কঙ্গোর জঙ্গলে আর একজন লণ্ডনের বস্তিতে যদি লালিত হয় তা'হলে তাদের পিতৃরক্ত এক হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ দুটি স্বতন্ত্র ও আলাদা মানুষ হবে—তাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, আদর্শ ও ধারণা হবে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। সাধারণতঃ পৈতৃকগুণ দু'ভাবে সন্তানে বর্ত্তায়—প্রাকৃতিক ভাবে ও পালনের গুণে। পিতামাতার যৌনকোষ হ'তে মানুষ যা পায় তা থেকেই তার নীল বা পীত চোখ, ভাসা নাক বা ভাসা চোখ, কালো চামড়া বা শ্বেত চামড়া ইত্যাদি হ'তে পারে এবং তা প্রাকৃতিকভাবেই হয়। অবশ্য একথাও ঠিক যে, পিতৃরক্ত নিয়ন্ত্রণ করে প্রজনন-বিশেষজ্ঞেরা ভাবীদিনে মানুষ-জাতির উন্নতি করতে অসমর্থ হবেন না। কিন্তু আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ও লালন-পালনের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যা পাই তাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যুগ যুগ ব্যাপী অক্লান্ত সাধনার অক্ষয় সঞ্চয়ে নীতি, আদর্শ, আবিষ্কার, আর্ট, আইন, কারখানা-শিল্প এবং সাহিত্যের আমরা উত্তরাধিকারী—এবং উইল সূত্রে

প্রাপ্ত উত্তরসাধকদের এই সংগৃহীত ও সংরক্ষিত ঐশ্বর্যই আমাদের বাঁচবার ও বড় হবার একমাত্র বিত্ত। কিন্তু সমাজ-ভাণ্ডারে সঞ্চিত এই বিপুল জ্ঞানের সম্ভার মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মৌলিক গবেষণা মাত্র। শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ তাদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে শেখে—কি ক'রে চুল আঁচড়ায়, কি ক'রে ঘুসি বাগায়, কেমন ক'রে কথা বলে, কি কথা বলতে হয়, কি কাজ করতে হয়, এবং কিসে বিশ্বাস রাখতে হয়। মানুষ মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা না ক'রে মেসিনের মত তাই ক'রে যায়, কেন না সব জিনিষই গ্রহণযোগ্য ব'লে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ধরণীর ঐতিহ্য-কোষে তাদের এক ফোঁটাও মৌলিক দান না থাকলেও ব্যক্তিবিশেষকে সেজন্যে দায়ী করা চলে না—কারণ এই সম্মোহিত চৈতন্যই বর্ত্তমান প্রথার বৈশিষ্ট্য।

অনেকের ধারণা মানুষের মননশক্তি প্রগতি-প্রবণ, যার জন্যে মানুষের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিচিত্র বিকাশ। কিন্তু ইতিহাস সুষ্ঠুভাবে দেখিয়েছে যে, যুগ এবং সভ্যতা মাঝে মাঝে অত্যাশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে এবং তার পরেই নগ্নভাবে বর্ব্বরতা করেছে আত্মপ্রকাশ। মনের প্রগতি-প্রবণতা তাই অবিশ্বাস্য এবং রূপকথার মতই আজগুবি। ক্রমবিবর্তন থিয়োরীর বিকৃতি দ্বারা হয়ত একে সমর্থন করার চেষ্টা চলে, কিন্তু বনমানুষ থেকে ক্রমবিবর্তনে যেমন মানুষ, তেমনি ভাবেই কি আমাদের সমাজের ক্রমবিকাশ নয়, অনুরূপ অভিব্যক্তিবাদের নিয়মানুক্রমেই কি মনের বিকাশমান গঠন নয়?

বনস্পতি ও জানোয়ারের অভিব্যক্তি আছে আর সমাজের প্রগতি ও পরিপুষ্টি কি থমকে গিয়েছে? জীবন্ত অস্তিত্ব দিয়েই সমাজের জটিল সংকলন, কিন্তু তার চিন্তা ও ক্রিয়া প্রকৃতির ভ্রূকুটি ও বাস্তব পরিবেষ্টন দ্বারাই পরিচালিত—এবং মানুষের কর্মের চালক। সমাজের অতিক্রান্ত ইতিহাস ঘাঁটলেই পরিবর্তিত পরিবেষ্টনে মানুষের চিন্তা-ক্রিয়ার তারতম্য ধরা পড়বে। আদিম মানুষের সহজাত সমস্যা ছিল—খাদ্য। গুল্ম, তরুলতা আর জন্তু-জানোয়ারের সন্ধানে পাথরের হাতিয়ার নিয়ে তারা অরণ্যে অরণ্যে সমগ্রজীবন যাপন করত—আশ্রয়, বাসগৃহ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির দিকে তাদের নজর দেবার অবকাশ ছিল না—খাদ্যের সন্ধানে আবহাওয়ার মর্জ্জির উপর নির্ভর কোরে তাকে অরণ্যে অরণ্যে টহল দিয়ে বেড়াবার জন্যে দলবদ্ধ হোতে হোত। তার বাঁচবার সম্বল পাথরের অস্ত্রই ছিল তদানীন্তন সমাজের উৎপাদন-শক্তি, আর ছিল প্রাকৃতিক তাড়নায় দলবদ্ধভাবে বাস করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ। এই ভাবে দলবদ্ধ হ'য়ে খাটবার জন্যে সংগৃহীত আহার্যের উপর সকলের সমান অধিকার ছিল, উৎপাদিত দ্রব্য ও উৎপাদন-শক্তির উপর ব্যক্তির মালিকানা ছিল না—আদিম সমাজ ছিল শ্রেণীশূন্য ও সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, কিন্তু স্তরে স্তরে এই আদিম সমাজের পরিবর্ত্তন হবার সংগে সংগে মানুষের রূপাবর্তন ঘটেছে, উৎপাদন-পদ্ধতির ও জীবিকা অর্জনের উপায়ের রূপান্তরের সঙ্গেই উৎপাদনকালীন সম্বন্ধের অথবা মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটেছে। যে-সম্বন্ধ আদিম সমাজে ছিল সহযোগিতা ও সাহায্যের সম্বন্ধ পরে শ্রেণী-বিভমান সমাজে তাই দাঁড়িয়েছে প্রভুত্ব ও শোষণের সম্বন্ধে। কেন না, পরবর্তী পদ্ধতির সংকীর্ণ দিগ্‌মণ্ডলই মানুষকে শাইলকের মত নির্দয়ভাবে হিসেব করতে শিখিয়েছে। সমাজের গুণাত্মক অবস্থান্তর ঘটেছে। এই অবস্থান্তর সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যয় ছিল কিনা তার খতিয়ানের প্রয়োজন হয় নি। ব্যক্তির ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও চেতনার অপেক্ষা ক'রে সামাজিক পরিবর্তন স্থিত থাকে নি। বরং সমাজ ও সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা ব্যক্তিরই চেতনা ও অভিপ্রায়ের ধারা ঘুরে গেছে। সমাজে ব্যক্তির ইচ্ছা ও চেতনা বুদ্‌বুদবৎ বলেই তাকে সমাজ ও সামাজিক অবস্থান্তরের নাম-ভূমিকায় ফেলা হয় নি। মূল সূত্রানুযায়ী ব্যক্তি ক্ষুদ্র। কোনো পরিবর্ত্তনের নব পর্যায়ে যে বিধিব্যবস্থা, নিয়মনীতি, আইনকানুন, ধারণাসমষ্টি ও পরিশীলন্ সম্পদ গড়ে উঠেছে, সংক্রামক ভাবে ব্যক্তি তাতে আচ্ছন্ন ও আক্রান্ত হয়েছে। ব্যক্তিই তার প্রতিনিধি বিশেষ। কাজেই মানুষ ও মতবাদ হচ্ছে বাস্তব অবস্থার জাতক, পরিমণ্ডল তার গর্ভধারিণী।

অবস্থা বিশেষে ব্যক্তির প্রাধান্য অবশ্য বিশেষ ক'রে বিজ্ঞাপিত হয়। সেও পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্য মতে

ব্যক্তির আটপৌরে জীবনের সঙ্গে রাজনীতিক নেতার তফাৎ নজরে পড়বার মত। অভিজ্ঞতা, মনের মজবুত গঠন ও অবস্থা বুঝে বিদ্যুৎবেগে ব্যবস্থা নিরূপণের মত তৎপরতা প্রভৃতি যোগ্য রাজনীতিক নেতার গুণ, কিন্তু শক্ত য়ুনিয়ন, মজবুত পার্টি ও গণ-আনুগত্য না থাকলে এই উপযুক্ত নেতৃত্বেরও অপমৃত্যু হোতে বাধ্য। আবার এই যোগাযোগ ব্যক্তির পক্ষে অভিনব আবির্ভাবের সুযোগ। ঠিক এরই মত প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার জন্যে এক জন বিজ্ঞানীও হয়ত গোপালকের বৃত্তি নিয়ে বিজ্ঞানাগার ভুলে থাকতে পারে। কিংবা অনুকূল যোগাযোগ থাকলে একজন পেশদারী গোপালক হয়ত এডিসনের মত বিজ্ঞানী বা গোর্কির মত সাহিত্য-স্রষ্টা হোতে পারে। ব্যক্তির এই অধঃপতন কিংবা অগ্রগতি সমাজের চাকায় বাঁধা। দৈব-দাওয়াই মানুষের বড় হবার মূলে ফলপ্রসূ নয়—সামাজিক প্রভাবই ব্যক্তির জীবনকে স্ফুরণ করবার শ্রেষ্ঠ দাওয়াই। কারণ ব্যক্তি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা সামাজিক ব্যক্তি। সমাজ, শ্রেণী বা গ্রুপের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তার প্রকাশ এবং পরিণতি। সমাজের অন্তর্বিভাগীয় উপাদানে তার সত্তা ও বিবেক উজ্জীবিত। কাজেই, ব্যক্তির উপর সমাজের অখণ্ড আধিপত্য—এবং সমাজই ব্যক্তির চিন্তা, চৈতন্য, স্বভাব ও বিবেকের উপর সম্রাট।

অন্তঃশীলা

অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম-এ, আই-ই-এস

জীবনে আমার অন্তঃশীলা তুমি
তাইত শ্যামলে তুলিছ ভরিয়া এ উষর মরুভূমি।
তাইত তোমার আমার মাঝারে
সূক্ষ্ম রেখায় হাজারে হাজারে
বহে প্রবাহিনীধারা,
কোমল সবুজ তৃণদলমূলে প্রাণরস ঢালে তারা।

ঘাসে ঘাসে ফুল ফোটে,
হোক স্বল্পায়ু কত পতঙ্গ পুষ্পে পুষ্পে জোটে।
আসে ধেনুদল তৃণ-শষ্পাহরণে,
সুখে নিষ্পন্ন হয় এই বুকে নিদ্রালু রোমন্থনে।
অন্তর হ'তে বাহির হইয়া এস,
শূন্যতা মোর ধীরে তোলো ভরি ধূসর ধূলিতে মেশ'।

বালুকাবিথারে হেথা একদিন দীপ্ত সৌরকরে
তপ্ত পরাণ রুদ্ধশ্বাসে রচিত এ মরুপরে
স্বপনের মরীচিকা
নিঃশেষে আজ মুছিয়া গেছে সে লিখা।
যাযাবর মেঘ ঢালে বারিধারা,
আর নহি আমি শূন্য সাহারা।

ধীরে বনশ্রী লভিল ছিল যে মরু
দিকে দিকে ছায়াতরু
উর্দ্ধে তুলিছে শির।
ভূমি কম্পনে মাটি ফেটে চৌচির,
ভূধর-মালায় বক্ষ পীনোন্নত,
উপত্যকাতে রচি সরোবর নির্ঝর-ধারে [illegible]!

সে আমি আর ত' এ আমি নহিক কভু,
অতীতের স্মৃতি ভুলি নি ভুলি নি তবু।
কি নব বিবর্তন
জীবনে আমার করিয়াছ আনয়ন।
ভিতর হইতে বাহিরে উঠেছ ফুটি,
শত আবরণ বাধা বন্ধন টুটি।

হে মোর চিত্রকর,
শূন্য এ পট বর্ণরেখায় ভরিছ নিরন্তর
তোমার তুলির লেখা
বুঝি অনুভবে, পাই না তোমার দেখা।
নয়নে নয়ন রাখি
কবে দিবে দেখা সে আশায় বসে থাকি।

ভারতীয় সমস্যা

ভারত সম্পর্কে বৃটেনের নীতির যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, আটলাণ্টিক সনদের চার্চ্চিলভাষ্য, এবং ভারত সচিব আমেরীর বিবৃতে তাহা সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। সম্প্রতি লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিয়াছি। 'টাইমস' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, "ভারত স্বাধীন এবং স্বায়ত্ত শাসন সম্পন্ন হউক, ইংলণ্ডে সাধারণ ভাবে সকলেই ইহা চাহিয়া থাকে। তবে ইহা সকলে চাহে যে, ভারতবাসীদের প্রতি ন্যায় বিচারের ভিত্তিতেই যেন নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়।"

এই ন্যায় বিচারের ভিত্তি যে কি 'টাইমস' পত্রিকা তাহা বলেন নাই। কিন্তু গত ১লা আগষ্ট কমন্স সভায় ভারত সচিব মিঃ আমেরী বলিয়াছেন, "ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী ও স্বার্থের পক্ষে উপযোগী শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারণ করাই আজিকার বড় সমস্যা।" বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং স্বার্থ কোন দেশে থাকিলেই সে দেশ স্বায়ত্ত শাসন পাইতে পারে না, বা সকল দল বা সম্প্রদায় এবং স্বার্থ একমত না হইলে শাসনতন্ত্র রচিত হইতে পারে না, এরূপ কোন নজীর পৃথিবীর শাসন-তান্ত্রিক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দলের মতৈক্য না হইলে যদি স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া না যায়, তাহা হইলে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বায়ত্ত শাসন পাইত না। আয়র্লেণ্ডকে যখন স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় তখন কি আয়র্লেণ্ডের সকল দল সম্পূর্ণরূপে এক মত হইতে পারিয়াছিল? ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ইংলণ্ডের সকল দলই কি এক মত পোষণ করিয়া থাকেন? আটলাণ্টিক সনদে ইউরোপের নাৎসী অধীকৃত দেশগুলিকে যে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, সে সকল দেশের সকল দলই কি শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে এক মত? বৃটেন ও আমেরিকা চীনের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু চীনদেশেও কি ভারতবর্ষের মত বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ নাই? বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং তাহাদের মধ্যে মতভেদ সত্বেও অনেক দেশ স্বাধীনতা পাইয়াছে এবং অনেক দেশকে স্বাধীনতা দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাধা সৃষ্টি হইয়াছে শুধু ভারতবর্ষের বেলাতেই।

স্বাধীনতা অর্জ্জন এবং স্বাধীনতা রক্ষা দুইয়ের জন্যই সম্মিলিত ফ্রণ্ট প্রয়োজন। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ সম্পূর্ণরূপে সকল দলের এক মত হওয়া দরকার স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যও যদি সেইরূপ এক মত হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ কেন কোন দেশেরই স্বাধীনতা পাওয়া উচিত নয়।

—

বৃত্তি-মূলক ভোটাধিকার

ভারত-সচিব মিঃ আমেরী গত ১লা আগষ্ট কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র চলিতে পারে না।" কিন্তু কি চলিতে পারে? আমরা বৃত্তিমূলক ভোটাধিকার এবং ভোটের বলে অপরিবর্ত্তনীয় শাসন পরিষদের কথা শুনিতেছি। রিফর্ম কমিশনার রূপে মিঃ আর, ভি, হডসন ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহার আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুই জানা যায় না; তবে হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর বক্তৃতা এবং বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ মুন্সীর প্রবন্ধ হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, উক্ত বৃত্তিমূলক ভোটাধিকার এবং অপরিবর্ত্তনীয় শাসনপরিষদ গঠনের সহিত রিফর্ম কমিশনার রূপে মিঃ হডসনের ভারতে আগমনের সম্পর্ক আছে।

বৃত্তিমূলক ভোটাধিকারের কথাটা নূতন নয়। গিল্ড স্যোসিয়ালিষ্টরা বৃত্তিমূলক ভোটাধিকারের পক্ষপাতী। কিন্তু বৃটেন যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে না চায়, তাহা

হইলে বৃত্তিমূলক ভোটাধিকার পাইলেই আমরা স্বায়ত্ত শাসন পাইয়া গেলাম তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। গোলটেবিল বৈঠকের সময় মিঃ চার্চ্চিলও বৃত্তিমূলক ভোটাধিকার এবং অপরিবর্ত্তনীয় শাসন পরিষদের কথা বলিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল কোন দিন কোন কথা রাখিয়া ঢাকিয়া বলেন নাই। বৃত্তিমূলক ভোটাধিকার প্রচলিত হইলেই গণতন্ত্র বিলুপ্ত হইবে তাহা আমরা মনে করি না। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিলের অভিপ্রায়ের সহিত সমঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিবেচনা করিলে, বৃত্তিমূলক ভোটাধিকার এবং অপরিবর্ত্তনীয় শাসন পরিষদ সম্পর্কে উৎসাহিত হওয়ার কোন কারণ আমাদের নাই।

১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে মিঃ চার্চ্চিল এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসই (ভারতের) চরম লক্ষ্য বলিয়া আমরা সর্ব্বদা কল্পনা করিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কিত নীতি কোন সময় কার্য্যে পরিণত করা হইবে, তাহা যুদ্ধের সময় ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যে ভাবে সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন সেইরূপ কেবল শিষ্টাচার মূলক অর্থে ব্যতীত অন্য কোন অর্থে কেহই কল্পনা করেন নাই।" সুতরাং বৃত্তিমূলক ভোটাধিকার দ্বারা 'বৃটিশ সাম্রাজ্যর মুকুট মণি' ভারতবর্ষের দাবীকে এড়াইবার চেষ্টা বলিয়াই সকলের মনে হইবে।

—

মার্কিন প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মসূচীতে ভারতীয় সমস্যার অবশ্য কোন স্থান নাই, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল দলই আগ্রহশীল। ভারতবাসীর স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর প্রতিও তাঁহাদের সহানুভূতি আছে। কাজেই ভারতবর্ষকে লইয়া আমেরিকার কাছে বৃটেনকে মাঝে মাঝে বেশ বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমেরিকা হইতে পাঁচটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল। গত ৮ই সেপ্টেম্বর ভারতসচিব মিঃ আমেরী বেতারযোগে এই প্রশ্নপঞ্চকের উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু রয়টার ভারতসচিবের এই উত্তরগুলি আমাদিগকে পরিবেশন করিয়াছেন গত ৩০শে সেপ্টেম্বর। এত বিলম্বের কারণটা আমরা কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ কোন টেক্সই দেয় না, টেকনিক্যাল দিক হইতে কথাটা সত্য। কিন্তু হোম-চার্জরূপে, আই-সি-এসদের পেন্সন রূপে, ভারতে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ কোম্পানীগুলির লভ্যাংশ রূপে ভারত হইতে যে কোটি কোটি টাকা বৃটেনে যাইতেছে মিঃ আমেরী মার্কিন প্রশ্নের উত্তরে সে সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্রও করেন নাই। ভারতের পক্ষ হইতে বড়লাট যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই; একথা ঠিক। কিন্তু যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদ-গুলির সহিত কি কখনও কোন আলোচনা করা হইয়াছে? ভারত যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার মত সে-ও স্বাধীন ভাবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যোগদান করুক, ইহাই ভারতবর্ষের দাবী।

ভারতসচিব বলিয়াছেন, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতের এগারটি প্রদেশ পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনাধিকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাই যদি হইত, তাহা হইলে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে ভারতের সাতটি প্রদেশে এই ভাবে শাসন-কার্য্য পরিচালনা হইতে নিজদিগকে দূরে সরাইয়া সম্ভব হইত কি? কংগ্রেস কেন মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিল, একথার ধার[illegible]শ দিয়াও ভারতসচিব যান নাই। ভারতের কোন দলই যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত ভারত শাসন আইনের অধ্যায়টি কার্য্যকরী করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাতেই উহার যথার্থ স্বরূপ বোঝা যাইতেছে। যুদ্ধের মধ্যেই যদি আটলাণ্টিক সনদ রচিত হইতে পারে, তাহা হইলে ভারতের দাবী কবে পূরণ করা হইবে সে কথাটা জানাইয়া দেওয়া কোনই কঠিন কাজ নহে। জওয়াহেরলালের কারাদণ্ড সম্পর্কে বিলাতের সংবাদপত্রেও প্রতিবাদ ও তাঁহার মুক্তির দাবী করা হইয়াছে।

বস্তুত: ভারতসচিব মার্কিন প্রশ্নপঞ্চকের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশিত হয় নাই।

—

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

এবার নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার পণ্ডিত অমরনাথ ঝা মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "যদি মানুষকে বাঁচিতে হয় এবং যদি শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে তাঁহার গরিমা পুনরায় লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষককে নূতন ভাবে সমাজ গঠন করিতে হইবে, জীবনকে দিতে হইবে নূতন রূপ।" শিক্ষাই যে জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রধানতম উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। উদ্দেশ্য অনুযায়ীই শিক্ষার পরিকল্পনা গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরিকল্পনা গঠনে শিক্ষকের ক্ষমতা ও দায়িত্বের স্বরূপও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। শিক্ষা যাঁহারা দান করেন শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কোন অধিকার আজও তাঁহারা লাভ করেন নাই। রাষ্ট্রশক্তি যাঁহাদের হাতে, কোথাও পরোক্ষ ভাবে এবং কোথাও প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁহারাই। যখন যে-শ্রেণী রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন তখন সেই শ্রেণী বিশেষের দিক হইতেই শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত এবং পদ্ধতি পরিচালিত হইয়া থাকে। পণ্ডিত অমরনাথ ঝাও শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে খাওয়া-পরাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মানুষের খাওয়া-পরা যে অপরিহার্য্য তাহাও তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কোন-না-কোন বিষয়ে যোগ্যতা প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকা অর্জ্জন করিবার সুযোগ সকলে পায় কি? পিতার বা অভিভাবকের আর্থিক অসামর্থ্যই ছাত্রের সমস্ত যোগ্যতাকে ব্যর্থ করিয়া দেয় না কি? বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে যোগ্যতারও যোগ্য সমাদর হইবে না। কিন্তু কি আদর্শ লক্ষ্য করিয়া সমাজ-জীবনে পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে? পণ্ডিত অমরনাথ ঝা তাঁহার শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব মুক্ত হইয়া কোন সুস্পষ্ট আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। শিক্ষা-সমস্যা শুধু শিক্ষার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, উহা সমাজ-জীবনের বৃহত্তম সমস্যা।

শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সম্মেলনের শিল্প শাখার সভাপতি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডাঃ সৈয়দ হাসান প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিল্প-শিক্ষার সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। ভারতে শিল্প বিস্তারের জন্য শুধু উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহই যথেষ্ট নয়, দক্ষ শিল্পীরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বেকার-সমস্যার সমাধান এবং শিল্পের বিস্তার সাধন, এই দুইটি ছাড়াও শিল্প-শিক্ষার আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন আছে। ডাঃ সৈয়দ হাসান বলিয়াছেন, "রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যও দেশের অর্থ শিল্প-বিস্তারের জন্য নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক।" রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির পথে অর্থনৈতিক পরাধীনতা যে একটা প্রবল বাধা তাহা উপলব্ধি করিবার সময় বহিয়া যাইতেছে। অথচ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্প শিক্ষার কোন স্থান নাই। শিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা ব্যয়বহুল। ইহার জন্য ভাল ভাল কারখানা এবং রসায়নাগার চাই। কিন্তু যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহা ব্যয়বহুল বলিয়া পাশ কাটাইয়া যাইবার উপায় নাই।

শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন

নিখিল ভারত শিক্ষাসম্মেলনে ভারতগর্ভমেণ্টের শিক্ষা-কমিশনার মিঃ জন সার্জ্জেণ্ট যুদ্ধোত্তর শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জনশিক্ষা সুদৃঢ় ও বিস্তৃত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা হওয়ার আবশ্যকতার কথা বলিয়াছেন। এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু ভারতের বিশেষ অবস্থার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা বলিতে তিনি কি বোঝেন তাহা তিনি বলেন নাই। যুদ্ধের পরে পৃথিবীতে পরিবর্ত্তন আসিলেও ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবে কি না কে জানে? তবুও শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আমরাও চাই। এই পরিবর্ত্তন শিক্ষা-ব্যবস্থার ডালপালার নয়। শিক্ষাব্যবস্থার যাঁহারা কর্ণধার ইহা তাঁহাদের মনঃপূত হইবে কি?

—

অষ্ট্রেলিয়া ও ভারত

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে ইষ্টার্ণ গ্রুপ কাউন্সিলের অষ্ট্রেলিয়ান সদস্য স্যার বেট্রাম ষ্টিভেনস্ অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের সংস্কৃতিগত সহযোগিতার কথা বলিয়াছেন। সহযোগিতা খুব ভাল, কিন্তু শুধু একদিকের চেষ্টায় তাহা হয় না। বোম্বাই সহরে অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কথা স্যার ষ্টিভেনসের নিশ্চয়ই মনে আছে। ইষ্টার্ণ গ্রুপ কাউন্সিলের অধিবেশনে তাঁহারই স্বদেশবাসী বলিয়াছিলেন, শিল্পের দিক দিয়া অষ্ট্রেলিয়া যে দিকে অগ্রসর হইতেছে ভারতের সেদিকে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। একথাও স্যার ষ্টিভেনস্ নিশ্চয়ই ভুলিয়া যান নাই। শিল্প-বাণিজ্যের দিক দিয়া সহযোগিতার যদি অভাব হয়, তবে সংস্কৃতিগত ফাঁকা সহযোগিতার কোন অর্থ হয় কি?

—

দেউলী বন্দীশিবির

১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত বিনা-বিচারে বহু বন্দীকে দেউলী বন্দীশিবিরে আটক রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই বন্দী-শিবির উঠিয়া যায়। বর্ত্তমানে আবার তথায় রাজবন্দীদিগকে রাখা হইতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ এন, এম যোশী ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া গত জুলাই মাসে দেউলী বন্দীশিবির পরিদর্শন করেন। ঐ সময় তথায় মোট ২১৫ জন রাজবন্দী ছিলেন, তন্মধ্যে ১০৩ জন পাঞ্জাব প্রদেশের, ৮১ জন যুক্তপ্রদেশের এবং অবশিষ্ট সকলে অন্যান্য প্রদেশের।

রাজবন্দী হিসাবে তাঁহাদের যাহা মূলগত অভিযোগ মিঃ যোশী পরিদর্শনান্তে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। রাজবন্দিগণ তাঁহাদিগকে নিজ নিজ প্রদেশে প্রেরণের, শ্রেণী বিভাগ উঠাইয়া দেওয়ার, আহার্য্যের জন্য ভাতা বৃদ্ধি, অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও স্বাচ্ছন্দ্যের জিনিষপত্র, এবং পারিবারিক ভাতার দাবী করিয়াছেন।

দেউলী স্থানটি ম্যালেরিয়াযুক্ত, বন্দীদের বাড়ী হইতে বহু দূরবর্ত্তী। ব্যয়বাহুল্য করিয়া বন্দীদের সহিত দেখা করিতে যাওয়া অনেক আত্মীয়স্বজনের পক্ষেই সম্ভব হয় না। মিঃ যোশী বন্দীদিগকে নিজ নিজ প্রদেশে স্থানান্তরিত করিতে অথবা বন্দীদের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহাদের আত্মীয়দের দেউলী যাতায়াতের ব্যয় বহন করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই অনুরোধ অযৌক্তিক নয়। শ্রেণীবিভাগের মধ্যেও যে অনেক গলদ আছে মিঃ যোশী তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। দেউলীর রাজবন্দীদের মধ্যে দুই-তিনজন ব্যতীত আর কেহই পারিবারিক ভাতা পান নাই। ২১৫ জন বন্দীর মধ্যে দুই-তিনজন ব্যতীত আর কাহারও পারিবারিক ভাতার প্রয়োজন নাই, তাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব।

বিনা বিচারে বন্দী করিবার দায়িত্ব যখন গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিবার দায়িত্বও গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে হইবে। যে সকল রাজবন্দীর পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব আছে তাঁহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ভাতা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

—

কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু ব্যতীত কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা প্রায় সকলেই জেলের বাহিরে আসিয়াছেন। যাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত রাজগোপাল আচারি এবং শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নীতি সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীযুত রাজগোপাল আচারির দলভুক্ত মিঃ রাজন শুধু বলিয়াছেন যে, তাঁহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবেন না। মিঃ আসফ আলী বলিতেছেন, নীতি পরিবর্ত্তন নয়, নীতির পুনর্ব্বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তনের জন্য রীতিমত প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তির কথা এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের একসঙ্গে তিন ফ্রণ্টে কাজ করা উচিত। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কর্ত্তা

যখন মহাত্মা গান্ধী তখন তিনি যদি দরকার মনে করেন তবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অবশ্যই চলিবে। কিন্তু তিনি মনে করেন, কেন্দ্রীয় আইন সভায় কংগ্রেসের যোগদান এবং সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা উচিত। শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে পুণাপ্রস্তাব গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিতে পারিবে।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার দেখা গিয়াছে, শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি যাহা বলেন, তাহা তাঁহার একার কথা নহে। তিনি যাহা বলেন তাহা কংগ্রেসী নেতাদের একটি দলের মত ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্বগ্রহণে বিরত ছিল তখন শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তিই প্রথমে কংগ্রেস কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছিলেন। বাদ-প্রতিবাদ অনেক হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মতই কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। এবারও যখন তিনি কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছেন, তখন বোঝা যাইতেছে, কংগ্রেসের নীতির একটা পরিবর্ত্তন আসন্ন।

—

ব্রহ্মের চাউল ও তূলা

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর, ব্রহ্ম-ভারত ইমিগ্রেশন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে এবং উহা এখনও মঞ্জুর করা হয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট চাউল ও তূলা রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বাজারে খাদ্যদ্রব্য হিসাবে চাউলের স্থান তৃতীয়। সমগ্র পৃথিবীতে যত চাউল উৎপন্ন হয় তাহার দুই-তৃতীয়াংশ চাউল উৎপন্ন হয় ভারত ও চীনদেশে। ভারতে মোট আবাদি জমির শতকরা ১৮ ভাগ জমিতে ধানের আবাদ হয়, অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসর ৭৬ কোটি ২৬ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে এক বাংলা দেশেই ২১ কোটিরও অধিক একর জমিতে ধানের আবাদ হয়।

১৯২৭-২৮ সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে গড়ে ২৯ কোটি টন ধান ভারতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে চাউল আমদানী না করিলে ভারতের চলে না। যে-সকল দেশ হইতে ভারতে চাউল আমদানী করা হয় তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশের স্থানই প্রধান। ব্রহ্মদেশ প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী করে। ইহার প্রায় অর্দ্ধেক আসে ভারতে। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানীর যে ব্যবসা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাতে। ব্রহ্ম-সরকার চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এই চাউলের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রহ্মদেশের সমস্ত চাউল ক্রয় করিবার এবং ব্রহ্মদেশ হইতে অন্য দেশে চালান দিবার একচেটিয়া অধিকার ব্রহ্ম-গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে যে তূলা উৎপন্ন হয় তাহার চারি ভাগের তিন ভাগ তূলাই বিদেশে অর্থাৎ জাপানে এবং জাপ-নিয়ন্ত্রিত চীনে রপ্তানী হয়। ১৯৪০-৪১ সালে ব্রহ্মদেশে ১৯৬০০ টন তূলা উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮০০০ টন তূলাই রপ্তানী করা যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু জাপানের সহিত কাজ-কারবার তো বন্ধ। ভারতের কাপড়ের কলগুলি আফ্রিকার তূলার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু যুদ্ধের জন্য আফ্রিকার তূলা পাওয়া সহজ নয়। ব্রহ্মদেশের তূলা দ্বারা এই চাহিদা মিটাইতে পারা যাইত। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে অনেক অসুবিধা হইবে।

—

মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন

গত যুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়াছিল যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে। এবার যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতেই জিনিষের দাম বাড়িয়া উঠে। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে বৃদ্ধিটা কিছুদিন সংযত থাকিলেও গত এপ্রিল হইতে পুনরায় দাম বাড়িতে থাকে। আগষ্ট মাসে সর্ব্বপ্রকার পণ্যের দাম গড়পড়তা শতকরা ৫১ ভাগ বাড়িয়াছে।

খাদ্যশস্য, সুতা এবং কাপড়ের দামই খুব বেশী বাড়িয়াছে।

মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা এই যে, প্রাথমিক পাইকারী বিক্রয়ের দাম নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। এই জন্যই বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারত-গবর্ণমেণ্ট নয়া দিল্লীতে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। এই সম্মেলন উদ্বোধন করিতে যাইয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়র গরীবের জন্য অল্প দামে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈয়ারীর কথা বলিয়াছেন। সম্মেলনীর পূর্ণ কার্য্যবিবরণ এখনও আমরা পাই নাই। যেটুকু পাইয়াছি তাহাতে প্রকাশ, কোন না কোন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তিত হইবে। হইলেই ভাল। কারণ দামের অত্যধিক বৃদ্ধি শিল্প বিস্তারের পক্ষেও প্রতিকূল।

—

সিংহল-ভারত ইমিগ্রেশন চুক্তি

সিংহল-ভারত ইমিগ্রেশন চুক্তি সম্পর্কে ভারতীয় এবং সিংহলী প্রতিনিধিদের সম্মিলিত সুপারিশ জনসাধারণের অভিমত সংগ্রহের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম, আলোচনার ফল নাকি খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবিত খসড়া পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। এই চুক্তির সর্ত্তাবলীর সম্পূর্ণ আলোচনা করিবার এখানে স্থানাভাব। তবে এইটুকু মাত্র সংক্ষেপে আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে, যে সাত লক্ষ ভারতীয় শ্রমিক সিংহলে কাজ করিতেছে এই চুক্তি সম্পাদিত হইলে তাহারা ভূমিহীন, গ্রামহীন অর্দ্ধক্রীতদাসে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। যে সকল ভারতীয় তিন বৎসরের কম সিংহলে বাস করিয়াছে তাহারা চিরদিনের জন্য 'সার্ফে' পরিণত হইবে। ডোমিসাইলড্ হওয়ার পদ্ধতিও অত্যন্ত জটিল করা হইয়াছে। বার মাসের অধিক সিংহলের বাহিরে থাকিলে ডোমিসাইলড্‌দেরও পুনঃপ্রবেশের অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থাদ্বারা সিংহল প্রবাসী ভারতীয়দের গুরুতর অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

—

দুর্গত পল্লীবাংলা

১৯৪০-৪১ সালের বাংলার ভূমিরাজস্ব বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, বর্দ্ধমান জিলার ক্যানেল অঞ্চল, হাওড়া, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং জলপাইগুড়ি ব্যতীত উক্ত বৎসরে বাংলার কোন জিলাতেই উল্লেখযোগ্য আর্থিক উন্নতি হয় নাই। উক্ত রিপোর্টে ১৯৪১ সনের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্তের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পর ঘূর্ণিবাত্যার ফলে নোয়াখালী, বরিশাল, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলা হইতেও দারুণ অন্নকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি বর্দ্ধমান বিভাগের নদীগুলিতে প্রবল বন্যা নামিয়া আসায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী জেলার বহুস্থান বন্যাপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বন্যাপীড়িত অঞ্চল হইতে বিপন্ন জনগণের দুরবস্থার মর্ম্মন্তুদ সংবাদ আসিতেছে। আমরা আশা করিতেছি, পল্লীবাংলার দুর্গত জনগণ সহৃদয় দেশবাসীর অকাতর দান হইতে বঞ্চিত হইবে না।

—

বাংলার জনসংখ্যা

বাংলার লোকগণনার সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই আদামসুমারী অনুসারে দেশীয় রাজ্য সহ বাংলার জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬১৪৬০০০০ জন। তন্মধ্যে বৃটিশ বাংলার জনসংখ্যা ৬০৩০০০০০ জন। এই হিসাবে দেখা যায়, গত আদমসুমারীর তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা কুড়িজন এবং হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ২২ জন বাড়িয়াছে। হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত ৪৩·৮ এবং মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ৫৪·৭৩ হইয়াছে।

—

কুইনাইনের দাম

কুইনাইন আবাদ সম্পর্কে ১৯৩৯-৪০ সনের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, সালফেট অব কুইনাইনের সরকারী দাম প্রতি পাউণ্ড ১৮৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকা করা হইয়াছে। এই দাম বৃদ্ধি করা হইয়াছে ১৯৪০ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে। কুইনাইনের উৎপাদন-ব্যয় প্রতি পাউণ্ডে ৭৲

টাকার বেশী পড়ে না। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই কুইনাইন অনেক সস্তা করিতে পারেন। ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত বাংলা দেশে কুইনাইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলাই বাহুল্য। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য জন-স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কুইনাইন খুব সস্তা করা।

—

বঙ্গীয় সময়

বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১লা অক্টোবর হইতে বাংলা দেশের সমস্ত গবর্ণমেণ্ট অফিসগুলিতে বর্ত্তমান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম এক ঘণ্টা আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ের নাম রাখা হইয়াছে বঙ্গীয় সময় (Bengal time)। কলিকাতার সময় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে ২৪ মিনিট আগে চলে। সুতরাং বঙ্গীয় সময় কলিকাতার সময় হইতে ৩৬ মিনিট আগে চলিবে। আলোক নিয়ন্ত্রণের জন্য সন্ধ্যার পর কলিকাতার রাজপথে লোক চলাচল যাহাতে কম হয় তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অফিসগুলি বন্ধ হইলেও সন্ধ্যার অনেক পর পর্য্যন্তও কলিকাতা সহরের কাজকর্ম্ম বন্ধ হয় না। কাজেই বেঙ্গল টাইমের সার্থকতা বোঝা কঠিন। গরীব কেরাণীবাবুদের অপেক্ষা তাঁহাদের গৃহিণীদেরই এই ব্যবস্থায় কষ্ট হইয়াছে বেশী। সম্মুখে শীত আসিতেছে। তখন তো তাঁহাদের কষ্টের অবধি থাকিবে না।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ-বোর্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ-বোর্ডের গত বৎসরের (১৯৪১ সনের ৩১শে মে যে বৎসর শেষ হইয়াছে) রিপোর্ট হইতে জানা যায়, এই বৎসরে ২০০টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিয়োগ-বোর্ডের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বোর্ড ১০৫ জনকে চাকুরীর সংস্থান বা চাকুরীর জন্য শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরে পারিয়াছিলেন ৮১ জনকে। বোর্ডের চেষ্টা ক্রমেই সাফল্য লাভ করিতেছে, ইহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। বোর্ডের রিপোর্টে প্রকাশ, ইঞ্জিনিয়ারিং জানা যুবকের পক্ষেই কাজ পাওয়া সহজ হয়। ইহা আমাদের জেনারেল এডুকেশনের ব্যর্থতার পরিচায়ক।

—

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মঙ্গল সমিতির ১৯৪০-৪১ সনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে দেখা যায়, গত বিশ বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ১৯২০ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালের ছাত্রগণ উচ্চতায়, দেহসৌষ্ঠবে এবং শারীরিক শক্তিতে অনেক উন্নত হইয়াছে। ইহা সুসংবাদ বটে। কিন্তু চিন্তার কথাও যে একেবারে নাই তাহা নহে। যে-সকল ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেরই দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ আছে এবং তাহাদের দেহে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা উন্নত না হইলে, শুধু ছাত্র-মঙ্গল সমিতির রিপোর্টে ইহার প্রতিকার হইবে না।

—

মস্কোর সঙ্কট

শতাধিক দিবস পার হইয়া গিয়াছে রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ চলিতেছে। শীতের এই প্রাক্কালে মস্কো লইয়া যুদ্ধ একটা সঙ্কট অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে জার্ম্মানী বিভিন্ন কেন্দ্রে রাশিয়াকে আক্রমণ করিতে থাকে। মস্কো লক্ষ্য করিয়াও ইতিপূর্ব্বে আক্রমণ চলিয়াছিল। গত জুলাই মাসে মস্কোর দিকে আক্রমণ পরিত্যক্ত হওয়ার পর বর্ত্তমানে পক্ষাধিক কাল হইল পুনরাক্রমণ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

জার্ম্মানী ইউক্রাইনের রাজধানী কিয়েভ দখল করিয়াছে। রাশিয়ানরা ওডেসাও পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু প্রাণপাত সংগ্রাম করিয়াও জার্ম্মানরা লেনিগ্রাড দখল করিতে পারে নাই। আজ সমগ্র জগৎ স্পন্দিতবক্ষে মস্কোর যুদ্ধ লক্ষ্য করিতেছে। নেপোলিয়ন যে পথে মস্কো আক্রমণ করিয়াছিলেন জার্ম্মানরাও সেই পথে অগ্রসর হইতেছে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ছয় লক্ষ সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ন

রুশ অভিযান আরম্ভ করেন। মস্কো হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী বোরোডিনোতে তিন লক্ষ সত্তর হাজার রুশ সৈন্য নেপোলিয়ানকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু নেপোলিয়ন জয় লাভ করিয়া মস্কো প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাত দিন পরে সমগ্র মস্কো সহর বিরাট অনলকুণ্ডে পরিণত হয়। ২৪শে অক্টোবর নেপোলিয়ন পশ্চাৎ অপসরণ করেন। তাঁহার বিরাট সৈন্যবাহিনীর প্রতি সাত জনের একজন মাত্র দেশে ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মস্কো সহর শত ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। দ্বাদশ শতাব্দীতে কিয়েভের রাজা ভ্লাডিমারের পুত্র ডোল গারুকী এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে মস্কো রাশিয়ার কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠান রূপে পরিণত হয়। ১৭০৩ সালে রাজা পিটার এই সহরকে রাজধানীর গৌরব হইতে বঞ্চিত করেন। কিন্তু এই গৌরব আবার সে ফিরিয়া পাইয়াছে। মস্কো আজ বিপ্লবী রাশিয়ার নব সভ্যতার কেন্দ্র স্থল। বলশেভিকরা ইহাকে রক্ষার জন্য সুদৃঢ় ব্যবস্থা করিয়াছে।

নাৎসী জার্ম্মানী তাহার সমগ্র সামরিক শক্তি লইয়া উত্তর-পশ্চিমে কালিনিন হইতে ভিয়াজমা ও কালুগার মধ্যদিয়া তুলা পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে মস্কোর দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু রাশিয়ানরা দৃঢ়তা হারায় নাই। তাহাদের মধ্যে কোন মার্শাল প্যাতাও নাই। মস্কো প্যারিশ নগরীও নহে। ইহাই একমাত্র ভরসা।

—

চীন-গণতন্ত্রের ত্রিংশ বার্ষিকী

গত ১০ই অক্টোবর চীন-গণতন্ত্রের ত্রিংশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারই পূর্ব্ব দিন চীন-সৈন্যবাহিনী ইচাং সহরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়ায় চীন-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গৌরব পূর্ণ বিজয়-উৎসবের আনন্দ বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৯১১ সালের বিপ্লবের মধ্যে চীনের মাঞ্চু রাজত্বের অবসান হয় এবং ১০ই অক্টোবর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঃ সানইয়াৎ সানের নেতৃত্বে পরিচালিত তুং-মে-হুই নামক গুপ্ত সমিতির চেষ্টায় এই বিপ্লব সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে এই গুপ্ত সমিতিই প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলে পরিণত হইয়া কুয়োমিনটাং নাম গ্রহণ করে। সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ডাঃ সান-ইয়াৎ-সান রাশিয়ার সাম্যবাদী দলের আদর্শে কুয়োমিণ্টাং দলকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সাম্যবাদের ভয়ে চীনের ধনিক ও বণিক শ্রেণী শঙ্কিত হইয়া উঠে এবং ক্যাণ্টেনের বণিকগণ বিদ্রোহ করে। কুয়োমিণ্টাং দল এই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু চীনের গঠন কার্য্য অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই ডাঃ সান-ইয়াৎ-সান ১৯২৫ সালের ১১ই মার্চ্চ পরলোক গমন করেন। অতঃপর কুয়োমিণ্টাং দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন চিয়াং কাইশেক।

চিয়াং কাইশেক সাম্যবাদ পছন্দ করেন না। তাই চীন হইতে সাম্যবাদীর বিতাড়ন পর্ব্ব আরম্ভ হইল, আর এক দিকে চলিল জাপানকে সন্তুষ্ট করিবার প্রচেষ্টা। ফলে চীনের সামরিকশক্তি গঠিত হইল না। বস্তুতঃ চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীনের ইতিহাস সাম্যবাদী বিতাড়ন এবং জাপ-তোষণ নীতির ইতিহাস।

চীন-জাপান যুদ্ধের অবস্থা এখন অনেকটা চীনের অনুকূল। চীন-গণতন্ত্রের ত্রিংশ বার্ষিকী উপলক্ষে চিয়াং কাইশেক সমগ্র চীন-জাতির নিকট যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে এই আশার সুরই ধ্বনিত হইয়াছে।

—

মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

তৃতীয় বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ | ১১শ সংখ্যা

অভিব্যক্তিবাদের ইতিহাস

অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, এম-এ

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে গোপন রহস্য অন্তর্নিহিত রয়েছে তার আবরণ উন্মোচন করবার চেষ্টা করে আসছে নানাভাবে—সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। কী প্রকারে মহাশূন্যের মধ্যে এই বস্তুময় জগৎ সৃষ্ট হল, কেমন করে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রথম আবির্ভূত হল শ্যামলা ধরণীর বুকে, মানবের অভ্যুদয়ই বা কেমন করে ঘটেছিল কত শত যুগ পূর্বে, এ নিয়ে সে চিন্তা করে আসছে তার জ্ঞানোন্মেষের সুদূর শৈশব থেকে। পৃথিবীর সকল দেশের প্রাচীন দর্শন, বিজ্ঞান বা ধর্মশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু না কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। আমাদের পুরাণের পাঁচটি লক্ষণের * মধ্যে একটি হল সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা—ব্রহ্মাণ্ড থেকে মানুষের ডিম পর্যন্ত সব রকম ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে এতে। দর্শনশাস্ত্রে প্রকৃতি পুরুষ, আত্মা পরমাত্মা, জড় চেতন, কর্তৃকর্মবাদ, পরমাণুবাদ, পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব, সপ্তবিংশতিতত্ত্ব, প্রভৃতি নিয়ে অনেক কথাই লেখা হয়েছে। শঙ্করাচার্য তো মূলই অস্বীকার করে সব উড়িয়ে দিলেন মায়াবাদ প্রচার করে। উপনিষদের ঋষিরা আবার কেউ কেউ বললেন, আনন্দ থেকেই† জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, অন্ন থেকেই হয়েছে, এমনি সব কথা। খৃষ্টানদের বাইবেলেও সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা আছে, তার মতে ঈশ্বর ইচ্ছামতো ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টি করেন। এমন কি অনার্য সাঁওতালদের শাস্ত্রগ্রন্থ না থাকলেও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা নিজস্ব মতবাদ আছে। তাদের মতে সুদূর অতীতে কেঁচো নামক জীবটিই জগৎ সৃষ্টি করেছিল; কারণটাও অব্যর্থ—কেঁচো মাটি তৈরী করে, এ তো জানা কথা!

আধুনিক কালে কেউ কেউ হিন্দুদের দশাবতারের মধ্যে অভিব্যক্তিবাদের মূল সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন শুনেছি, কিন্তু তার মধ্যে কোন সত্য নেই, কারণ পুরাণকারগণ দশ অবতারের মধ্যে অভিব্যক্তিবাদের উদাহরণ ও তার পারম্পর্যের উল্লেখ করতে চেয়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া দশাবতারের মধ্যে উদ্ভিদ ও অমেরুদণ্ডীর কোনো উল্লেখ নেই—নৃসিংহাবতারের মত কোনো অর্দ্ধমানবও জন্মায় নি কোনো দিন পৃথিবীতে। সুতরাং এ মতের বিশেষ কিছু মূল্য নেই।

এ সব তো গেল প্রাচীন যুগের মানবের অপরিণত মনের কল্পনা। পরবর্তী যুগে মানুষ যখন যুক্তিদ্বারা ন্যায়ানুগ ভাবে চিন্তা করতে শিখলে, তখন তারা প্রথম অভিব্যক্তিবাদ বা ক্রমবিকাশের ধারা কতকটা বুঝতে পারলে। এ বিষয়ে গ্রীকরাই প্রথম জ্ঞানলাভ করে।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত রকম মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছে দেখা যায়, তাদের মূলত চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নাম দেওয়া

---

* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

† আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি।

যেতে পারে শাশ্বতবাদ (Theory of Eternity of Present Conditions)। এই মত অনুসারে সৃষ্টির আদিও নেই অন্তও নেই, পৃথিবীর জীবজন্তুর জীবনেতিহাসে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি কখনও—হবেও না কোনো দিন। পৃথিবী যেমন আছে, থাকবেও চিরদিন সেই একই ভাবে। বলা বাহুল্য, এই মতবাদ সুধীসমাজে আদৃত হয় নি কোনো দিন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম ভগবৎ-কর্তৃত্ববাদ (Theory of Special Creation)। এই মতে ঈশ্বর নিজের ইচ্ছা-মতো জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মধ্যযুগে ইয়োরোপে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। Father Suarez, Linnæus প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই মতবাদের কোনো মূল্য দেন না।

তৃতীয় মতবাদের নাম আপৎপাতবাদ (Theory of Catastrophism)। জীবাশ্ম বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা জগৎ-বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক কুভিয়ে (Cuvier—১৭৬৯-১৮৩২) এই মতবাদ প্রচারিত করেন। এই মতবাদ অনুসারে পৃথিবীতে প্রাচীন যুগে বহুবার বহু আংশিক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেছে। প্রত্যেক বিপ্লবে পৃথিবীর পূর্বতন উদ্ভিদ ও প্রাণী আংশিক ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তী নূতন যুগে আবার নূতন করে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়, পুরাতন যুগের অবিধ্বস্ত ভূখণ্ডের পুরাতন জীব থেকে। নবযুগের নূতন জীব পূর্বতন জীবের বংশোদ্ভূত হলেও আকারে সম্পূর্ণ নূতন রকমের হত, কারণ নবযুগের নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গেলে তাদের দৈহিক গঠনের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ত। এই রূপেই প্রাণী ও উদ্ভিদের রূপান্তর প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

কুভিয়ের শিষ্য D'Orbigny (১৮০২-১৮৫৭) কিন্তু মনে করতেন প্রাচীন যুগে পৃথিবীর বুকে যে সকল বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তাতে ভূপৃষ্ঠ সমগ্র ভাবে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে প্রত্যেক নবযুগের প্রারম্ভে সম্পূর্ণ নূতন করে প্রাণী ও উদ্ভিদ জন্মলাভ করে, পূর্বতন জীবের সঙ্গে তাদের কোনো রক্তসম্পর্ক ছিল না।

কুভিয়ের এই নূতন মতবাদ এককালে ইয়োরোপে খুব আদৃত হয়েছিল। বর্তমান কালে অবশ্য কোনো বৈজ্ঞানিক তাঁর মতবাদে আস্থাশীল না হলেও, সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন তিনিই প্রথম জীবাশ্মতত্ত্বের ভিত্তির উপর সৃষ্টিতত্ত্বকে স্থাপন করেন বলে। পূর্বতন মনীষীরা বর্তমান প্রাণী ও উদ্ভিদের সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য আলোচনা করেই অভিব্যক্তিবাদের থিয়োরী খাড়া করতেন। কুভিয়েই প্রথম প্রাচীন যুগের জীবাশ্ম আবিষ্কার করে সৃষ্টিতত্ত্ববিচারে তার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করেন।

কুভিয়ে যখন প্যারীর বটানিক্যাল গার্ডেনে (Jardin des Plantes) কাজ করেন সেই সময়ে প্যারীর নিকটবর্তী Montmartre পাহাড়ে জিপসামের খনিতে কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। তদানীন্তন জনসাধারণ সেই অদ্ভুত কঙ্কালগুলিকে অতিপ্রাকৃত দানবঘটিত বলে মনে করে ভয়ের চক্ষে দেখত। কুভিয়ে প্রথম সেগুলিকে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কঙ্কাল বলে চিনতে পারেন এবং তাই থেকে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর আপৎপাতবাদের মূল সূত্র আবিষ্কার করেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে জীবাশ্মতত্ত্ব গড়ে উঠে এবং এর স্থাপয়িতা হিসাবে কুভিয়ে আজও বৈজ্ঞানিক মহলে সমাদৃত হন।

চতুর্থ মতবাদের নাম ক্রমবিকাশবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Evolution)। এই মতবাদের মূলসূত্র কুভিয়ের সময়ের বহু পূর্ব থেকেই সুবিদিত ছিল, যদিও বর্তমান কালে তার অনেক রূপান্তর হয়েছে, এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য।

অভিব্যক্তিবাদ মতানুযায়ী পৃথিবীতে যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তারা এক আদিম অবিশিষ্ট জীবকোষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে যুগ যুগ ধরে, ধাপে ধাপে, অতি অল্প অল্প পরিবর্তনের ফলে।

এই অভিব্যক্তিবাদের সর্বপ্রথম ইঙ্গিত দেন গ্রীক দার্শনিক আনাক্সিম্যাণ্ডার (Anaximander) যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে। তাঁর কিছু পরে এম্পিডোক্লিস (Empedocles—৪৯৫-৪৩৫ বি. সি.) বেশ পরিষ্কার ভাবে এই মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর মতে প্রকৃতি বার বার ভিন্ন ভিন্ন রূপে জীব সৃষ্টি করে

পরীক্ষা করছেন—অযোগ্যদের নষ্ট করছেন এবং যোগ্যদের জীবিত রাখছেন। প্রকৃতির এই যোগ্যতম জীব সৃষ্টির প্রচেষ্টা কোনরূপ পূর্বকল্পিত অভিপ্রায় থেকে হচ্ছে না, হচ্ছে দৈব থেকে (Origin of the fittest form through chance rather than through design)। এখানে আমরা দেখতে পাই এম্পিডোক্লিসের মতবাদের শেষাংশটি ডারউইনের "Survival of the fittest" মতবাদের সঙ্গে আশ্চর্যরূপে মিলে যাচ্ছে। এই কারণেই এম্পিডোক্লিসকে অভিব্যক্তিবাদের পিতা (father of Evolution Theory) বলা হয়।

তার পরে আর একজন গ্রীক পণ্ডিত ডিমোক্রিটস্ (Democritus—৪৬০-৩৫৭ বি. সি.) এম্পিডোক্লিসের মতবাদ একটু পরিবর্তিত করেন। তিনি বলেন প্রকৃতি বার বার নূতন নূতন জীব সৃষ্টি করে পরীক্ষা করেন নি—এক একটি জীবের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিবর্তন করে পরীক্ষা করেছেন।

এঁদের পরে বৈজ্ঞানিক জগতে চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন করেন দার্শনিকশ্রেষ্ঠ এরিস্টট্‌ল (Aristotle—৩৮৪-৩২২ বি. সি.)। তিনি সক্রেটিসের প্রশিষ্য, প্লেটোর শিষ্য ও আলেকজাণ্ডারের গুরু ছিলেন। তাঁর ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তখনকার কালে আর কেউ ছিলেন না। তখনকার দিনে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি, সুতরাং অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য জীবজন্তুর সম্বন্ধে মানুষ কিছুই জানত না। তা'ছাড়া প্রাগৈতিহাসিক কালের অতিকায় জীবজন্তুর জীবাশ্মকঙ্কাল সকলের অস্তিত্বও তখন সকলের অজ্ঞাত ছিল। সেই সময়ে এরিস্টট্‌ল অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা সত্যিই আশ্চর্যকর। তাঁর মতে জগতে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তার পিছনে কারণ স্বরূপ এক অজ্ঞাত প্রজ্ঞাশীল অভিপ্রায় (intelligent design) বিদ্যমান আছে—সেই অভিপ্রায়ই জগতের সমস্ত পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু সেই অভিপ্রায় ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়, কারণ তিনি ভগবৎকর্তৃত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে জগতের প্রত্যেক জীবজন্তুর মধ্যে একটা আন্তরিক সুসম্পূর্ণ হবার প্রচেষ্টা (internal perfecting tendency) বিদ্যমান আছে। অবশ্য জীবজন্তুসকল এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সচেতন নয়। তাদের দেহগঠনপ্রক্রিয়া আপনা হতেই সুসম্পূর্ণ হবার চেষ্টা করছে। তিনিই প্রথম অচেতন থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে প্রাণী, প্রাণী থেকে মানবে ক্রমিক এবং ধারাবাহিক পরিণতির কথা প্রচার করেন। অবশ্য বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিকগণ এমত মানেন না—যদিও অনেক দার্শনিক এখনও এই মত গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

এরিস্টট্‌লই প্রথম প্রাণ বা জীবনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন। তিনি প্রাণকে দেহের ক্রিয়ার ফল স্বরূপ মনে করতেন। তিনিই প্রথম যোগ্যায়নবাদ (Theory of Adaptibility), উত্তরাধিকারবাদ (Theory of Heredity), দূরোত্তরাধিকারবাদ (Theory of Atavism) সম্বন্ধে জগৎকে জ্ঞান দান করেন।

এরিস্টটলের পর এক অজ্ঞানময় তামস যুগ বৈজ্ঞানিক জগৎকে আচ্ছন্ন করে। কারণ এই সময়ে খৃষ্টান পাদ্রীদের আধিপত্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তারা বিজ্ঞানের স্বাধীন মতামত একেবারেই সহ্য করতে পারত না। জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে বাইবেলে যে প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে, তা'ভিন্ন অন্য কোনো মতবাদ তারা মানত না, এবং যদি কোন বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক অন্য কোনো মতবাদ প্রচার করতেন তা'হলে তাঁকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। তাই কেউ কোনো নূতন মতবাদ প্রচার করতে সাহসী হতেন না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই যুগকে তামস যুগ বলে। জগতে যদি খৃষ্টান ধর্মের অভ্যুত্থান না হত অর্থাৎ যদি প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা তার নিজস্ব পথে অগ্রসর হবার স্বাধীনতা পেত, তা'হলে আজ বিজ্ঞানের ইতিহাস অন্যরূপে লেখা হত—জড় বিজ্ঞান তার চরম উন্নতি লাভ করত এই দু-হাজার বৎসরে। খৃষ্টধর্ম বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে প্রায় দু-হাজার বৎসর পিছিয়ে দিয়েছে।

এর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইডিস বৈজ্ঞানিক লিনিয়াস (Linnaeus—১৭০৭-১৭৭৮ এ. ডি.) অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেন। তিনিও খৃষ্টান পাদ্রীদের আধিপত্য থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন না। তিনি ভগবৎকর্তৃত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি

ভগবৎকর্তৃত্ববাদ ও অভিব্যক্তিবাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন। তাঁর মতে ঈশ্বর প্রত্যেকটি বিভিন্ন গণ (genus) সৃষ্টি করেছিলেন, তার পরে সাঙ্কর্য ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য অবনতির ফলে প্রত্যেক গণের মধ্যে বহু জাতির (species) সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক Felis একটি গণ, তা ঈশ্বরের সৃষ্টি। তার মধ্যে সাঙ্কর্য ও অবনতির ফলে বহু জাতির সৃষ্টি হয়েছে, যথা বাঘ (Felis tigris), সিংহ (F. leo), গুলবাগ (F. pardus), বিড়াল (F. domestica), আউন্স (F. uncia), পিউমা (F. concolor), জাগুয়ার (F. onca) ইত্যাদি। এরা সবাই Felis-গণভুক্ত, এবং এদের দেহগঠন ও মনোবৃত্তির মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। তাই লিনিয়াস কল্পনা করলেন যে, এরা সবাই ভগবৎসৃষ্ট 'ফেলিস' নামক এক জাতীয় লুপ্ত জন্তু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য কিছু আছে, যদিও সবটা সত্য নয়। লিনিয়াসের এই ধারণা থেকেই বর্তমান বৈজ্ঞানিক দ্বৈনামিক নামকরণ (Binomial Nomenclature) প্রথার সৃষ্টি হয়েছে।

এঁরই সমসাময়িক ফরাসী বৈজ্ঞানিক বাফোঁ (Buffon —১৭০৭-১৭৮৮) খৃষ্টান পাদ্রীদের ভয়ে নিজস্ব মত প্রচার করতে না পারলেও অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জগৎকে দান করেন। তিনি কখন কখন অত্যাচারের ভয়ে ভগবৎকর্তৃত্ব বাদ সমর্থন করলেও আসলে অভিব্যক্তি বাদেরই সমর্থক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে Lull বলেছেন—

"Buffon lived in a time when to express one's views along lines not deemed orthodox by ecclesiastical authority might invite serious annoyance or even persecution, and he was not of the stuff of which martyrs are made. To this may have been due his apparent wavering between special creation and Evolution."

বাফোঁ বিশ্বাস করতেন, জীবজন্তুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে তাদের দৈহিক গঠন পরিবর্তনে সহায়তা করে এবং সেই নবলব্ধ পরিবর্তন বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয় (inheritance of acquired characters)। এ ছাড়া তিনি কৃত্রিম সঞ্চয়ন (artificial selection), বিচ্ছেদন (isolation), ভৌগোলিক অভিযান (geographical migration) প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতেন। Malthus-এর পূর্বেও অতিপ্রজনন (overcrowding) সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল, এবং ডারউইনের পূর্বে তিনি জীবনসংগ্রাম (Struggle for existence) ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখে গেছেন।

ইরাজমাস ডারউইন (Erasmus Darwin—১৭৩১-১৮০২) সুবিখ্যাত চার্লস্ ডারউইনের পিতামহ। তিনি একাধারে ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক ও কবি ছিলেন। তাঁর মতবাদের সঙ্গে বাফোঁর মতের অনেকটা মিল আছে, কেবল তিনি মনে করতেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা জীবজন্তুর দেহে প্রত্যক্ষভাবে কাজ না করে পরোক্ষভাবে করে। জীবজন্তুর দৈহিক পরিবর্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে তাদের দেহের আন্তর প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রবর্তিত হয়। নবলব্ধ পরিবর্তন সন্তানে সংক্রামিত হয়, তিনি বিশ্বাস করতেন।

যুগ যুগ কাল ব্যাপী বিবর্তনের ফলে আদিম এককোষী জীব থেকে যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্ট হয়েছে এই ধারণা তিনিই প্রথম পোষণ করেন। আজও বৈজ্ঞানিকগণ একথা বিশ্বাস করেন।

ইরাজমাস ডারউইনের মতবাদের সঙ্গে লামার্কের (Lamarck—১৭৪৪-১৮২৯) মতবাদের বিশেষ মিল আছে। লামার্কও ইরাজমাস ডারউইনের মত বিশ্বাস করতেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রাণীর অন্তরস্থ স্নায়ুজালের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং সেই স্নায়ুজালের ক্রিয়া থেকেই বাহ্য পরিবর্তনসমূহ উৎপন্ন হয়। কিন্তু লামার্ক প্রাণিজগৎ সম্বন্ধেই উক্ত নিয়ম মানিতেন। উদ্ভিদজগৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বাফোঁর অনুরূপ ছিল, অর্থাৎ উদ্ভিদের পরিবর্তনসমূহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাবে উৎপন্ন হয়, এই কথাই তিনি মানতেন। নবলব্ধ পরিবর্তনের সংক্রামণে তিনি বিশ্বাস করতেন। আমেরিকার কোন কোন বৈজ্ঞানিক আজও এই মতবাদে আস্থা রাখেন।

লামার্কই সর্বপ্রথমে বিবর্তনের রীতি পরিষ্কার রূপে

ধারণা করতে পেরেছিলেন। তাঁর পূর্বেকার সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল, যে একই আদিম জীব থেকে কালক্রমে পরপর বিভিন্ন বিবর্তনের ফলে উত্তরোত্তর উন্নত স্তরের জীব সকল উৎপন্ন হয়েছে। যেমন একটি মইয়ের একের পর একটি ধাপ পরপর উঠে গেছে, তেমনি এক এক শ্রেণীর জীব পূর্বতন শ্রেণী থেকে পরপর উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু বিবর্তনের রীতির বর্তমান ধারণা তা নয়। যেমন একটি গাছের গুঁড়ি থেকে বিভিন্ন কাণ্ডের উৎপত্তি, বিভিন্ন কাণ্ড থেকে বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি, বিভিন্ন শাখা থেকে প্রশাখা, তার থেকে উপশাখা প্রভৃতির উৎপত্তি, তেমনি আদিম জীব থেকে বহু বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়ে বর্তমান জীবসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারণা লামার্কই প্রথম প্রচার করেন।

লামার্কের পরে সেন্ট হিলেয়ার (Geoffroy St-Hilaire —১৭৭২-১৮৪৪) পুনরায় পারিপার্শ্বিকের প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখতে থাকেন। তাঁর মতে পারিপার্শ্বিকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রাণিসমূহের ভ্রূণমধ্যে সহসা প্রচণ্ড পরিবর্তন (Saltation) সংঘটিত হয়—পরবর্তী কালে প্রাণি-দেহে কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না। এই পরিবর্তন অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে ঘটে না, পরন্তু সহসা প্রচণ্ডরূপে সংঘটিত হয়। এই দিক দিয়ে পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিক ডি ফ্রিজের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য ছিল। এই মতবাদের একটা সুবিধা এই যে এতে মধ্যবর্তী 'মিসিং লিঙ্ক' নিয়ে কোনরূপ মাথা ঘামাতে হয় না। কিন্তু এ মতবাদ এখন পরিত্যক্ত হয়েছে।

এঁর পরেই বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ চার্লস্ ডারউইনের (Charles Darwin—১৮০৯-১৮৮২) অভ্যুত্থান হয়। এঁর মতবাদই সামান্যরূপে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজে গৃহীত হয়েছে। এঁর মতবাদ পূর্বতন মতবাদসমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির।

চার্লস্ ডারউইন তাঁর মতবাদ গঠন করবার বহু পূর্বে ম্যালথাস (Malthus) অতি-প্রজনন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধই ডারউইনের মতবাদের মূল উৎস। সেই প্রবন্ধে ম্যালথাস বলেন, মানুষ জ্যামিতিক অনুপাতে (Geometrical ratio) বাড়ে, কিন্তু খাদ্য ও স্থান বাড়ে না, সুতরাং নিশ্চয়ই জগতে এমন কোন ধ্বংসকর ব্যবস্থা আছে যাতে পৃথিবীর লোকসংখ্যা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যেতে না পারে।

এই মতবাদ থেকে ডারউইন সিদ্ধান্ত করলেন যে যেহেতু পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন জীবের মধ্যে অল্প অল্প পার্থক্য (Continuous variation) আছে, অর্থাৎ যেহেতু একজাতীয় দুটি জীব কখনও সর্বতোভাবে একরূপ হয় না, সেইহেতু পৃথিবীতে বাঁচবার পক্ষে তাদের মধ্যে কেউ অধিক যোগ্য কেউ বা অল্প যোগ্য হবে নিশ্চয়ই, এবং যেহেতু পৃথিবীতে যথেষ্ট খাদ্য ও স্থানের অভাব বর্তমান, সেইহেতু নিদারুণ প্রতিযোগিতায় (Struggle for existence) দুর্বলরা লুপ্ত হবে এবং সবলরা উদ্‌বর্তন করবে (Survival of the fittest) নিশ্চয়ই। এই যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনের ফলেই নূতন জাতি গঠিত (Origin of species) হয়। এই যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনের ডারউইন-প্রদত্ত নাম Natural selection বা প্রাকৃতিক সঞ্চয়ন। তাঁর মতবাদের আরও একটি অংশ ছিল, তার নাম Sexual Selection বা যৌন সঞ্চয়ন, কিন্তু আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা সে অংশটুকুর সত্যতা স্বীকার করেন না। ডারউইনের মতবাদ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলবার ছিল, বারান্তরে সে কথা আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

ডারউইনের মতবাদ সামান্য একটু বদলে নিয়ে ডি ফ্রিজ (De Vries) এক নূতন মতবাদ প্রচার করেন, তার মূল কথা হচ্ছে নূতন জাতি উৎপন্ন হয় অল্প অল্প পার্থক্য থেকে নয়, আকস্মিক এবং বিরাট্ পার্থক্য (Mutations) থেকে। অন্য সব বিষয়ে তিনি ডারউইনেরই অনুবর্তী।

আধুনিক কালে ভাইজমান (Weismann) ডারউইনের মতবাদ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করেছেন। নির্নাল গ্রন্থির (endocrine gland) আবিষ্কারের পর আরও কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—সে কথাও বারান্তরে বলব। কেবল আজ এই কথা বলে শেষ করি যে ডারউইনের মতবাদও আজকাল বৈজ্ঞানিক-দের সন্তুষ্ট করতে পারছে না, তাঁরা মাঝে মাঝে নূতন

মতবাদ প্রচার করছেন। উদাহরণ-স্বরূপ লট্‌সীর (Lotsy) কথা বলা যেতে পারে। তাঁর মতে জাতি-সাঙ্কর্যের দ্বারাই বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এ সব মতবাদ আজও বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ সমাদৃত হয় নি।

বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অনেক দার্শনিক বহুকাল আগে থেকে ক্রমবিকাশবাদ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে বেকন, ডেকার্তে, লাইবনিজ, কাণ্ট, বার্গস প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। আধুনিক কালে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ বিজ্ঞান এবং দর্শনের সার সংগ্রহ করে যে মতবাদ প্রচারিত করেছেন তা সুধী সমাজে আদৃত হয়েছে।

মা

(উপন্যাস)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

দুই

সে যখন প্রথম বৌ হয়ে এল, এ বাড়ীতে কোন সমারোহ হয় নি, বিনাড়ম্বরে বৌ বরণ, বৌভাত হয়ে গেল, তখন সে বুঝলে, বাড়ীতে সে ছাড়া আরো আড়াইটি মাত্র লোক এবং এদের সকলকে নিয়ে যে সংসার সেটা পুরো-পুরি তারই।

শাশুড়ী অতি নির্বিরোধী, বেশী কথাই কইতেন না। বৌয়ের খুঁৎ ধরার দিকেও তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল না, আর যদিই বা ছিল আগের বৌয়ের ওপর দিয়ে হয় তো তা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকবে। কুটনো কুটে দিয়ে বা অন্য কাজে এদিক সেদিক ক'রে তার কিছু সাহায্য তিনি করতেন, বাকী সময় তিনি নাতি অমরকে নিয়ে কাটাতেন। দুপুরের রান্না তাঁর ঘরে হোত, রাতে হোত আঁশ হেঁসেলে। অল্প রান্না, অনায়াসে করে ফেলতো সবিতা—তার গায়েও লাগতো না। ঝি না রাখলে তার কোনই আপত্তি ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে বাড়ীর কর্ত্তার মতই আসল, তাই ঝিও ছিল তাদের। কাজের মধ্যে কাজ দুবেলা দু'চারখানা রান্না, তাও পরিমাণ দেখলে হাসিই পায়। তার মামা-বাড়ীতে······যাক্ ওসব কথা।

শাশুড়ী দু-চারদিন বলেছিলেন অবসর সময় সেলাই ফোঁড়াই করতে। পাড়ার মেয়েরা কেউ কেউ বেশ দক্ষ হাতের কাজে। বাধ্য মেয়ের মত সেও চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু এদিকে বিশেষ কিছু সুবিধে করে উঠতে পারে নি, এর চেয়ে অনেক সোজা কাঁচা আমের ফালি করে আম্‌সী করা, আমসত্ত, আচার—বছরের [illegible] নতুন তেঁতুল শুকিয়ে রাখা, বড়ি দেওয়া আরও কত কি। হাত শক্ত হয়ে গিয়েছে, জল ঘেঁটে বাসন মেজে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, সে হাতে ছুঁচ ধরা বা পশমের কাঁটা চালানো শক্ত লাগে। শাশুড়ীরও আপত্তি নেই বরং সায় আছে। অন্য বৌঝিরা করে তাই বলি, নইলে ওসবে দরকারই বা কি, না-হক্ খরচান্ত আরো। বৌ-ঝির লক্ষ্মী ভাঁড়ারে, হেঁসেলে।

কিন্তু তবু অনেক সময় থাকে। ঝাঁ ঝাঁ করে চোত-বোশেখের দুপুর, দীর্ঘ অপরাহ্ণ। আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টিঘন বিষণ্ণ প্রহরগুলি কেমন যেন কাটতে চায় না, মন বুভুক্ষিত হয়ে ওঠে, একলা লাগে। হাতে কাজ নেই, মন খালি খালি ভাল লাগে না তার, কিন্তু কেমন ক'রে ভাল

লাগাতে হয়, কি হলে মন খুসী হবে তাই যে ছাই জানা নেই। দুপুরবেলা মলাট-ছেঁড়া রামায়ণ একখানা মাথার কাছে রেখে শাশুড়ী লম্বা ঘুম দিয়েছেন। বইখানা কোলে নিয়ে সে অন্য মনে পাতা উলটিয়ে যায়। মন বসে না।

সন্ধ্যের সময় শম্ভুনাথ ফেরেন, জলখাবার খান। পান তামাক জুগিয়ে দেয় সবিতা। তার পরে কাঁধের ওপর চাদরখানা ফেলে তিনি বেরিয়ে যান। খানিকটা বেড়ান জেলের সামনে ও বড় পুকুরটার ধারে। তার পর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খানিক সময় হয় গল্পগুজব ক'রে—নয় তাস খেলে ঠিক ৯টা রাতে বাড়ী ফেরেন। ভাত খেয়ে আধ ঘণ্টা তিনি খবরের কাগজ পড়েন, তার পরে শুয়ে পড়েন। আর একটু পরে সবিতা এসে সসঙ্কোচে তাঁর শয্যার একাংশ অধিকার করে।

রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে শুয়ে স্ত্রীকে কেমন কেমন করে তিনি ভালোবাসেন সে কথা দিনের আলোতে বোঝাবার কথা নয়। রহস্যহীন, অথচ অন্তহীন রহস্যভরা নরনারীর সেই রাত্রির প্রেম। সেই প্রেমে বোঝাপড়ার আবশ্যক হয় না, মন জানাজানির বিলাস নেই—সবিতা যদি ভেবে থাকে মনের ভালোবাসার প্রয়োজন তার স্বামীর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে, হয় তো তার ভুলই হবে। রাত্রিদিন ভালোবাসার নেশায় মাতাল হয়ে থাকবে এত সম্বল আছে ক'জন পুরুষ বা ক'জন মেয়ের? ভালবাসা তাই মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করে। কখনো প্রয়োজন হয় দেহের—কখনো মনের। গভীর ভাবে দেহটিকেই ভালবাসতে পারে ক'জন লোক? প্রতি অঙ্গ প্রিয়, কিন্তু সে কি সত্যই একজনের, একটি জনের, তারই প্রতি অঙ্গ প্রিয়, পৃথিবীতে সে অদ্বিতীয়! কিন্তু প্রিয়—না প্রয়োজনীয়? লক্ষকোটী লোকের কাছেই প্রয়োজনীয়, প্রিয় নয়, অপরিহার্য্য নয়।

কিন্তু গভীরতার কামনা করে নি সবিতা—তার অর্থই সে জানত না। শুধু যদি শম্ভুনাথ তার সঙ্গে অকারণে ছুটো বাজে গল্প করতেন—ছুতোনাতা করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখে আসতেন তাকে দু'একবার, কোনোদিন আফিস কামাই করে অবেলায় ফিরে আসতেন—তবেই ধন্য হয়ে যেতো সে। যত ক্ষণস্থায়ী হোক, নারী যদি পুরুষের মনে মোহ না জন্মায়—ঔৎসুক্য না জাগায় তবে তার নারীত্বের মূল্য কি? কিন্তু এতটুকুও সে দুর্ভাগ্যক্রমে পেলো না—পেলো টাকা-পয়সার ভার, সংসারের দায়িত্ব, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, পুজোপার্ব্বণে সৌখিন জিনিস, ভাল সাড়ী জামা। শম্ভুনাথের সব ভাল—কিন্তু বড় ঠাণ্ডা তিনি, সবিতার প্রতি তাঁর লোভ নেই।

তবু এই বাঁচোয়া যে, মন উড়ু উড়ু করা ছাড়া সবিতার আর কিছুই উপলব্ধির শক্তি ছিল না। বুকের শূন্যস্থান জীবনে হয় তো তার পূর্ণ হোল না, কিন্তু সেদিকে চেয়ে আপশোষ করার সময় বা ইচ্ছে কোনটাই তার বেশী দিন রইল না, নিরবলম্ব মন শীগগিরই আশ্রয় খুঁজে নিল।

(২)

বিয়ের পরে প্রথম আশ্রয় পেল সে সতীনপো অমরনাথের মধ্যে। তার বয়স তখন আট, সবিতার ষোল। কোলে নিয়ে ছেলে বলে আদর করতে লজ্জা করতো সবিতার। ছেলেও আট বছরে মাথায় বেশ বেড়ে উঠেছিল, সেও পারলে নতুন মার কাছাকাছি ঘেঁসতো না। অল্পে অল্পে কিন্তু দু'দিক থেকেই সঙ্কোচটা কমে এল। বিয়েতে কে একজন একটা কলমদান উপহার দিয়েছিল—ঘর-বসত করতে এসে অমরকে জিজ্ঞেস করলো সবিতা, 'এইটে নেবে?'

একটু লাল হয়ে উঠল অমরের মুখ, তার পর জোর গলায় বললে, 'নাঃ'।

'কেন, নাও না।'

'ঠাকুমা আর বাবা বকবে।'

'কেউ বকবে না, আমি দিচ্ছি নিজে—'

'তুমি লিখবে না?'

'আমি কি ভালো লিখতে জানি? তুমি তো লিখতে পার, না?'

'সব লিখতে পারি, ইংরিজিও।'

"আমাকে দেখাবে?"

"এস না ঠাকুমার ঘরে দেখ্‌বে।"

এমনি ক'রে আলাপের সূত্রপাত। বন্ধুত্ব জমে উ'ঠতে দেরী হোল না। কিন্তু সবিতাও অমরকে ঠিক

ছেলের মত ভাবতে পারল না, অমরও মা বলে তাকে ডাকলেও সেটা শুধু মুখের ডাক মাত্রই হোল। সবিতা অন্যমনস্ক হ'য়ে এমন কথাও ভেবে বসতো, অমর যদি আমার নিজের ছোটভাই হোত তবে বেশ হোত।

অমর পড়তো কালীবাড়ীর পাঠশালায়। বিকেলে ঠিক আসার সময়টিতে সবিতা জানালায় এসে দাঁড়াতো। তার মন একই সময়ে ভাবতো কোন অলস দুপুর বেলায় (দিনে সে ঘুমুতে পারতনা), যদি আপিসে কাজ না থাকে, হঠাৎ স্বামী এসে পড়েন, আর অমরের পাঠশালাও যেমন ক'রেই হোক ছুটি হয়ে যায়! কিন্তু কোনদিন কোন কারণে অমরের পাঠশালা যদিই বা ছুটি হ'য়ে যেতো, শম্ভুনাথের অসময়ে আপিস থেকে ফেরা সবিতার কল্পনায় ছাড়া কোনদিন ঘটেনি।

দুপুর বেলা এক-একদিন তাদের বাড়ীতে পাড়ার মেয়েরা বেড়াতে আসতো। অল্পবয়সীরা শাশুড়ীর ঘরের দিকে ঘেঁষত না, তারই ঘরে এসে জমতো, আর যেদিন শাশুড়ীর বন্ধুরা আসতেন সে দিন তিনি ঘুম ভেঙ্গে হাই তুলতে তুলতে ডাকতেন, "বৌমা, মাদুর পেতে দিয়ে যাও আর পানের বাটাটা এনো।"

অল্পবয়সীরা গল্প করতো, স্বামী আর শাশুড়ীর। যাদের দু'একটি ছেলে কোলে এসেছে, তাদের গল্পে সন্তানের কথাও এসে মিশতো, দু'একজন বাপের বাড়ীর কথাও ওঠাতো, কিন্তু স্বামীই ছিলেন সকলেরই খোসগল্পের প্রধান নায়ক। এদের দলে ভিড়ে সবিতা কেমন করে কথা কইতো তা আমাদের ঠিক জানা নেই, তবে চুপ করে থাকতো না সে তা নিঃসন্দেহ।

এদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সবিতার, সে পাড়ার উকীল রবিবাবুর বড় ভাইয়ের বিধবা বৌ। বয়সে সবিতার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়। দুটি ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছে বছর দুই আগে। সে প্রায়ই আসতো একলা অথবা শাশুড়ীর সঙ্গে। তার শাশুড়ী ভিজে গামছা মাথায় চাপিয়ে অমরের ঠাকুরমার কাছে বসে গল্প করতেন, দুপুর গড়িয়ে গেলে উঠতেন। তিনি সধবা মানুষ—খালি গায়ে কস্তাপাড় সাড়ী পরে পান-দোক্তা খেয়ে খুব জমাতে পারতেন। এ ঘরে দুই বউয়ে গুঞ্জন চলতো। ঠিক গল্প করা নয়, কারণ অধিকাংশ সময়ই সবিতা ছিল শ্রোতা। বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করতো, আমড়া গাছের পাতা-ঝরা ডালে বসে তৃষার্ত্ত কাক একটানা আর্ত্তনাদ করতো, তাদের তামাটে রংএর গরুটা ছায়া খুঁজে বসে বসে নিমীলিত চোখে জাবর কাটতো, আর সবিতা শুনতো সখীর গল্প। মেয়েটি গল্প করতে জানে। তার গল্পে তার বিবাহিত জীবনের কয়েকটি বছরের যে চিত্র ফুটে উঠতো—তার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে যেত সবিতা। চৌদ্দ বছর যখন বয়স তখন বিয়ে, তার পর চার বছরের কত দিন, রাত্রি, মাস, বছর। তার মধ্যে দু'বার সন্তান হয়েছে তার—কিন্তু তারা কি সেই একজনকে এক মুহূর্ত্তও আড়াল করতে পেরেছে? মনে পড়ে, প্রথম ছেলে হবার পর তার চুল উঠতে আরম্ভ হোল—সে কি যেমন তেমন ওঠা! গোছা গোছা উঠে মেঘের মত ঘন রেশমের মত নরম একমাথা চুল নিঃশেষ হয়ে যাবার জো হোল। কিন্তু তাতে তার আর মন খারাপ কি, ওঁর যা মন খারপ হোল—উল্টে সেই সান্ত্বনা দেয়। 'ও রকম ওঠে, লোকে বলে, ছেলে হাসে আর মায়ের চুল খসে,' কিন্তু তাতে স্বামী মানে কি? কত তেল যে লুকিয়ে নিয়ে এল সে চোরের মত! কিন্তু লুকিয়ে তো আর মাখা যায় না! কি সব পোমেডবো, যেন টাটকা যুঁই, বেল। এ সব দেখে শুনে ননদদের কি হিংসে, শাশুড়ীর কত বাঁকা কথা, তবুও অনেক রাত্রে শোবার ঘরে খিল দিয়ে কেশ প্রসাধন তাকে করতেই হোত। কি যে নাছোড়বান্দা লোক! ছেলে হতে বাপের বাড়ী গিয়েছে সে—হঠাৎ চারদিন পরে এক সন্ধ্যেবেলা এক ব্যাগ হাতে ভদ্রলোক এসে হাজির—বন্ধুর বাড়ী যাবার অছিলে করে। এমনি সব দুষ্টুবুদ্ধি ছিল, ছলচুতোর কি অভাব হোত তাঁর?

বেলা পড়ে এসেছে। অতসী এসে ডাকল, 'মা দেখে যাও একবারটি। ওমা, তুমি সারা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুম দিলে বুঝি? কতত যে বারণ করি, তবু তোমার তো সেঁধোয় না! দেখি, গা গরম হয়ে উঠেছে নাকি?'

সে অপরাধীর মত উত্তর দিলে, 'ঘুমুই নি তো, কখন বুঝি একটু চোখ লেগেছে।' তার পর রাগের সুরে বললে

'তোমাদের আর কি, সব সময়ে আমার ওপরে সর্দ্দারি করা ছাড়া ভাইবোনের আর তো কাজ নেই! কাজকর্ম নেই দুপুরে আমি করি কি?'

অতসী হাসল। হাসলে মুখখানি কি একরকমের দেখায়। ঝক্‌ঝকে ছোট্ট ছোট্ট দাঁত, চোখ দুটি অর্দ্ধেক বুঁজে আসে—এক রাশ নুড়ির ওপর দিয়ে হঠাৎ যেন ঝরণা বয়ে যায়—সবিতা হাসে না, সে অবাক হয়ে ভাবে—এ ধরণের হাসি কোথা থেকে এল, নিজে সে কোন দিন কি এমন করে হাসতে পেরেছে?

শৈশবের কথা মন থেকে এক রকম মুছেই গিয়েছে। পরবর্ত্তী জীবনে হাসির খোরাক কোন দিন জুটে থাকলেও উচ্চ হাসি যে নিন্দনীয় চার দিক থেকে এই কথাই তো বরাবর শুনতে হয়েছে। মধুর কণ্ঠে সজোরে হাসলে যে ভালোও লাগে, হাসি মুখখানা বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, তার জীবনে এ সম্ভাবনা কোথায় সুপ্ত হয়ে ছিল চিরদিন?

'এসো মা, আমার বাগান দেখ এসে; আমি যখন কলকাতায় পড়তে চলে যাবো, তোমাকেই তো তখন যত্ন করতে হবে, এখন থেকে শিখে রাখ।'

'কলকাতায় যাবি নাকি?'

'বাঃ পড়বো না? মূর্খ হয়ে থাকবো বুঝি?'

তার আর কিছু মনে হোল না। টাকা যে সামান্যও উদ্বৃত্ত হয় না, বৃত্তি পাবার মত মেধাবী ছাত্রীও যে অতসী নয়, তার উচ্চাশার পথে যে শতেক বাধা আছে, এ সব কিছুই সে ভাবতে পারল না। তার মনে তৎক্ষণাৎ প্রত্যয় হোল অতসী যাবেই। কেমন করে যেতে পারবে কে জানে, কিন্তু সবিতার সাধ্য হবে না মেয়েকে আটকে রাখে। তারা তার নাগালের বাইরে। তার ভীরু ভাগ্যও সঙ্কুচিত হয়ে থাকে তার সন্তানদের কাছে।

সারাদুপুর অতসী এক মনে তার নতুন সৃষ্টি নিয়ে মেতে ছিল। জমি তৈরী করা, ইটের টুকরো বসিয়ে বসিয়ে সীমানা ভাগ করা, ছোট ছোট চারা লাগানো, এমন কি একবার জল দেওয়াও হয়ে গিয়েছে। নিজের কারুকার্য্যের দিকে সে আনন্দিত মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখছিল বারবার।

আকাশের উজ্জ্বলতা স্তিমিত হয়ে এসেছে, পুকুরের জলে ছায়া দীর্ঘ হয়েছে, হাঁসগুলোর এখনও স্নান ফুরোয় না।

একটা বোবা বেদনা মনের দরজায় মাথা খুঁড়ে মরেছে, কিন্তু কোন দিন বাইরে আসার পথ পায় নি। সেই ব্যথাই আজ আবার পুরনো ক্ষতের মত চারিয়ে উঠতে চায়। কত ব্যবধান, কি ভয়ানক ব্যবধান। মানুষে মানুষে কি দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সমুদ্র, এই বিশাল সাগর পাড়ি দিয়ে কেউ কি কোন দিন কারুর কাছে পৌঁছুতে পেরেছে? কে কাকে জেনেছে, সম্পূর্ণ দূরে থাক, কে কাকে অণুমাত্র জানতে পেরেছে? ভালোবাসার কোন আলো নেই, সে কোন পথ দেখায় না। একজনকে ভালবাসা তো মনের একটা আবেগ, একটা বেদনাজনক অনুভূতি, তার পরে অন্ধকারে চারদিক হাতড়ে মরা, তুমি কোথায়? আমি আমাকেও জানি না, তবু তোমাকে জানতে চাই, কাছে যেতে চাই তোমার। কিন্তু কি অন্ধকার—আর কত সুদূর।

আজও মনে পড়ে, অমরের চলে যাওয়ার দিনটি। কয়েক দিন হোল অমরের এক মামা তাঁর ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে (তিনি দালালি করে অনেক টাকা করেছিলেন) এসে অতিথি হয়েছেন। সবিতা প্রথম দিন একটু সঙ্কোচ করেছিল—কিন্তু তিনি অতি সহজেই তার লজ্জা ভেঙে দিলেন, অথচ লোকটি গম্ভীর প্রকৃতি। সবিতার খুব শ্রদ্ধা হয়েছিল তাঁর প্রতি। বিকেলবেলা, শাশুড়ীর রান্নাঘরে তোলা উনুন পেতে সে পাটিসাপটা ভাজছে এমন সময় অমর এসে ঢুকল ঘরে। এদানীং তাদের খুব ভাব হয়েছিল, তবু তাকে অসময়ে ইস্কুল থেকে আসতে দেখে সবিতা একটু আশ্চর্য্য হোল, বলল, 'কি অমর, আজ আবার ইস্কুলের কি হোল?' ইতিমধ্যে পাথরবাটি থেকে একখানা ভাজা পাটিসাপটা নিয়ে সে অমরের হাতে দিল। অমর কিছু না বলে প্রথমে সেখানা খেয়ে নিল—তার পরে কাচুমাচু মুখ করে বললে, 'বাবাকে বোল না যেন—আমি ফেল করেছি।'

অমর ফেল? এত দিন ধরে সবিতার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, অমর পড়াশুনোয় অসাধারণ ভাল ছেলে। সে বিস্ময়ের সুরে বললে, 'কি করে জানলে?'

'আজ প্রোমোশন হোল কিনা? অঙ্কের মাষ্টার আমায় দু'চক্ষে দেখতে পারে না যে।'

সবিতা খুব দুঃখিত হোল। এত দিনেও অনেক চেষ্টা করেও সে অমরের প্রতি বাৎসল্য ভাব আনতে পারে নি একটুও, সমবয়সীর মত মনে হয়। যাক, বেচারী ধরা পড়লে কি বকুনীই খাবে—আবার তার মামাও এখানে। না সে কখনই বলে দেবে না।

কিন্তু পর দিনই জানাজানি হয়ে গেল ব্যাপারটা—শম্ভুনাথের জন্যই ভয় ছিল সবিতার—কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু বললেন না, তবে যথেষ্ট বললেন অমরের মামা।

শেষটায় বললেন, 'এখানে থাকলে পড়াশুনো হবে না শাসন যখন নেই, আমি নিয়ে যাবো, সেখানে মাষ্টার রেখে দেবো, আমার ওই বয়সী ছেলে আছে—মিলে মিশে পড়বে।' তাঁর প্রস্তাবটা এতই সমীচীন যে শেষ পর্য্যন্ত সকলেরই মত দিতে হ'ল। সবিতাকে কেউ জিজ্ঞেস করে নি, কিন্তু তার মন খারাপ হয়ে গেল খুব। শাশুড়ী জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন, ভাঁড়ারে বসে তারও চোখে ঘন ঘন আঁচল উঠতে লাগল। যাবার আগে অমরকে সে বললে, "চিঠি লিখবে তো?" সে সাগ্রহে সম্মতি জানিয়েছিল, কিন্তু তারপরে আর চিঠি আসেনি। অনেকদিন পরে পরে ২।১ দিনের জন্য অমরের দেখা মিলতো, সে তখন অনেক বদলে গিয়েছে, কথা বলার ধরণ, কাপড় পরার ধরণ, সব। ক্রমশঃ তার প্রতি সমীহের ভাব এল সবিতার মনে।

এ জীবনে চলে যাওয়া, ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। সে জানে, যে যখন যায় তখন অনিবার্য্য ভাবে চ'লে যায়। যতদিন কাছে থাকে এমন নয় যে কারুর মুখ চেয়ে কেউ থাকে, নিজের গরজে নিজের ইচ্ছেয় থাকে, তারপরে যাবার সময় এলে নিতান্ত সহজে চলে যায়, এই হচ্ছে নিয়ম।

এতক্ষণ কঞ্চির বেড়া দিয়ে করবীর চারাটাকে বন্দী করার কাজে ব্যস্ত ছিল অতসী, সে ডাক দিলে, "খুকি, আয় তোদের খেতে দিই গিয়ে। ওই তো খোকাও এসে গেল।"

অতসী ছুটে গেল। "দাদা সারাদুপুর কোথা থেকে ঘুরে এল মুখ লাল করে? একদণ্ড বাড়ীতে পাবার যোটি নেই, আমার আঁক কটা কষে দেবে প্রতিজ্ঞে করেছিলে না সকালে?"

অতসীর দাদা উৎপল বারান্দায় বসে মুখ হাত ধুতে ধুতে জবাব দিলে, "দিন তো আর পালিয়ে যায় নি, নিয়ে আয় না অঙ্ক, দেখি তোর ধৈর্য্য কতক্ষণ থাকে।"

খাবার বার করতে করতে সে ছেলের দিকে চেয়ে ভাবল, খোকা ওঁর মত মুখ ধুতে বসে উবু হয়ে, বসার আদলটা ঠিক সে রকম; গৌরবর্ণ টাকমাথা নিরীহ শম্ভুনাথকে মনে পড়ল। কি ঘন কালো রেশমের মত চুল খোকার মাথায়, রং অতসীর চেয়ে কিছু ময়লা, কিন্তু লম্বা শক্ত অথচ ছিপছিপে চেহারা, মুখে সদ্যোজাত গোঁফের রেখা, চিবুকে এখনও ছেলেমানুষী কোমলতা, চোখের পাতা এত ঘন, চোখ নীচু করে থাকলে চোখ যেন বুঁজে আছে মনে হয়।

বাটিতে মুড়ির মোয়া আর দুধ দিয়ে সবিতা হাসিমুখে বলল, "আগে হাত পাত দিকি তোরা।"

উৎপল হঠাৎ চোখ বুঁজলে, "দাও তো মা কি দেবে?" দেখাদেখি অতসীও চোখ বুঁজে হাত পাতলে।

"নে, এবার চোখ খোল্।"

চন্দ্রপুলি! ধব্‌ধবে পরিষ্কার, আবার কিসমিস বসানো। ছেলেমেয়েদের আনন্দ-কলরব শুনতে শুনতে সমস্ত মন খুসীতে ছেয়ে যায় সবিতার। কি শান্তি। কত গোপন কত চেষ্টায় এই সব দুষ্প্রাপ্য সাধ্যাতীত ভাল-মন্দের যোগাড় তাকে করতে হয়, ভাগ্যি ওরা তা কোনদিন টের পাবে না। এমন সব ছেলেমেয়ে, কিছু কি ওরা চায়, না তাদের জন্য সে করতে পারে? তবু কত অল্পে ওরা খুসী হয়! সবিতার ইচ্ছে করে চাঁদ পেড়ে সে তাদের হাতে দেয়।

(৩)

জ্বর যেদিন আসে প্রায়ই কয়েক ঘণ্টা থেকে ছেড়ে যায়। সেদিনটা উপোস দিয়ে পরদিন নাওয়া-খাওয়া ক'রে সে ভাল হয়ে ওঠে। এবারের জ্বরটা তিন দিন রইল, একেবারে নির্জীব করে ফেলল তাকে। তিন দিন ধ'রে

জ্বরের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখল কত রকমের। কত লোক যেন আসা-যাওয়া করল তার সামনে। তাদের মধ্যে কেবল খোকা আর খুকী নেই: তারা কলকাতায় চ'লে গিয়েচে, পড়াশুনো করতে, উন্নতি করতে, তারা মূর্খ হয়ে এখানে পড়ে থাকতে রাজী নয়। কথাটা এতই ঠিক যে বাধা দেবার কথা ভাবতেই পারে না, বিশেষ ক'রে সে মা হ'য়ে। বড় হয়ে তারা দুঃখ ঘোচাবে তো তারই।

কী আশ্চর্য্য, তারা আবার ছোট হয়ে গিয়েছে। খোকা সবে হাঁটতে শিখেছে, আর একটি আশ্চর্য্য কথা শিখেছে। সে কথা তাকে কেউ শেখায় নি। একদিন অবেলায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কার্ত্তিক মাসের বেলাশেষের মিইয়ে-আসা রোদ তেরচা হয়ে জানালার নীচে মাদুর পেতে যেখানে সে খোকাকে পাশে নিয়ে শুয়ে সেখানে ঠিক তার গলায় মুখে এসে পড়ল। হঠাৎ একটু গরম লাগাতে ঘুমটা ছুটে গেল, চোখ মেলে চেয়ে দেখে পাশে খোকা নেই, হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের কোণায় লক্ষ্মীর আসনের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। সিঁদুর লেগেচে সমস্ত শরীরে, গেলাস উল্টে জল গড়াচ্ছে মেঝেয়, লক্ষ্মী কাত হয়ে শুয়ে পড়েছেন আর বাতাসাখানার আধখানা খোকার মুখে। কাণ্ড দেখে থ' হয়ে রইল সে, তারপর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দু-হাত বাড়িয়ে হেসে খোকা করল কি, ডাকল, "মা-ম্-মা"—আরো কি খানিকটা অবোধ্য ভাষা। কিন্তু মা ডাক তো স্পষ্ট। কিন্তু শিখল কি করে তাই বল।

স্বর্গের দেবতারা কানে কানে শিখিয়ে গেলেন, "ওরে খোকা, এক্ষুনি তোর মা শাস্তি দেবে তোকে, ভাল চাস তো 'মা' বলে ডেকে ক্ষমা চা।

খুকী তখন পেটে, তখন একদিন দুপুরবেলায় খেয়ে সে একটু শুয়েছে। জষ্ঠি মাস, খুব গরম, আম কাঁঠাল পাকছে। চারিদিকে শব্দটি নেই। সব বন্ধ, শুধু পায়ের নীচে জানলার একটি পাট একটু ফাঁক করা, নইলে বেজায় অন্ধকার হয়ে যায়। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, বাইরে কি অসম্ভব আলো, রোদ যেন কাঁপছে, আকাশ থেকে নীল রং ঠিকরে পড়েছে। খোকাকে কত কষ্টে যে ঘুম পাড়ান হয়েছে, পাছে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এই ভয়ে হাতের পাখা থামাতে সাহস হচ্ছে না তার, হাত ধরে আসছে। একবার সে আন্দাজ করছে খোকা মটকা মেরে পড়ে আছে না সত্যি ঘুমিয়ে আছে, আর একবার বাইরে চেয়ে দেখছে। অনেক দিন সে পাখা থামিয়ে চোখ বুঁজতে না বুঁজতে খোকা উঠে চম্পট দিয়েছে। এ নতুন নয়। ঘরে ঘরে সাড়ে তিন বছরের ছেলেরা আছে, এমন অসম্ভব দুরন্ত তাই বলে কোন ঘরে নেই।

হঠাৎ বাইরে চেয়ে আবার খোকার মুখের দিকে চাইতেই তার মনে এক অদ্ভুত ভাব এল।

এই দুপুর বেলায় প্রচণ্ড রোদে আম কাঁটাল যখন রসে ভরে উঠছে পেকে উঠছে, কাকের ডাক অবধি শোনা যায় না এখন—এমন সময় যদি হঠাৎ সে মরে যায়।

তার শরীরটা এই পাটীতে খোকার পাশে এমনি করেই পড়ে থাকবে আর তার আত্মাটা বার করে নিয়ে যমদূত ঐ আকাশের ঠিকরে-পড়া নীল রং-এর মধ্যে মিলিয়ে যাবে, এই কাঁপতে-থাকা দুপুরের রোদে মিশিয়ে যাবে। ফিতু পিসীর ঠিক যেমনি হয়েছিল। ভাল মানুষ, দুপুর বেলা রেঁধেবেড়ে খাইয়ে খেয়ে পানমুখে দিয়ে পাটী পেতে শুয়েছেন, আর উঠলেন না। খোকার ঘুম ভেঙ্গে সে উঠে পালাবে, রোদ্দুরে ঘুরে মুখ লাল করবে, তবু পেছন পেছন কেউ তাড়া করবে না। তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এই ঠাণ্ডা মেজেতে শুয়ে থাকবে, সে থাকবে না কোথাও।

সেদিন মনে তার কি দুঃখ, কি কান্না, চোখের জল আর থামে না। হে মৃত্যুর দেবতা, তাকে নিয়ে যেও না এখুনি, তার খোকাকে কেউ দেখবার থাকবে না, কেউ আদর করবে না। তাকে রেহাই দাও মৃত্যু থেকে। তার কি মরবার উপায় আছে?

তিন দিনের দিন বিকেলে জ্বর ছেড়ে গেল তার। পরদিন সকালে সে রীতিমত ভাল বোধ ক'রে চোখ মেলে চেয়ে দেখল পাশে স্মৃতসী তখনও ঘুমুচ্ছে। এই তিনদিনে মেয়ে যেন শুকিয়ে উঠেছে। দেয়ালের কাছে মাটিতে বিছানা করে খোকাও ঘুমুচ্ছে। সবেমাত্র আলো

দেখা দিয়েছে ; মেয়ের মাথায় দুর্ব্বল হাতটা রেখে আদর করল সে।

একটু বেলায় অতসী তাকে মুখ ধুইয়ে গরম দুধ নিয়ে এল। ওপাশের বিছানা থেকে উৎপল ডাকল, "ওষুধ দিয়েছিস তো মাকে ?"

অতসী বলল, "সকালের ওষুধ নেই, ডাক্তার বলেছেন ওটা আর না খাওয়ালেও হবে, তবে টনিক খাওয়ানো চাই, ডাক্তারখানা খুললে আজই গিয়ে জেনে এসো।"

সে বলল, "দুটিখানি মুড়ি আছে নাকি রে খুকী ?"

অতসী তাড়াতাড়ি পাথরবাটিতে ক'রে মুড়ি ও বাতাসা নিয়ে এল। ভারী খিদে পেয়েছে তার।

তারপর ক্ষীণস্বরে বলল, "এবার এত জোরে জ্বরটা এলো কেন কি জানি।"

একটু বেলা হলে উৎপল ঘরে ঢুকে কাগজে মোড়া বেদানা আঙুর আর একটা মাঝারি রকমের বোতল তাও কাগজে মোড়া, নামিয়ে রাখল। অবাক হ'য়ে গেল সবিতা। তারপর শোনা গেল এসব তারি জন্যে, শুধু তাই নয়, গয়লার কাছে আধসের দুধ বাড়ানো হয়েছে, তাও তার জন্যে। কিন্তু একটু পরেই যখন গিরীনবাবু তার খবর নিতে এলেন আর সে শুনলে তার জ্বরের চিকিৎসা এবার তিনিই করেছেন, তখন ধৈর্য্য আর তার রইল না। গিরীনবাবু তার স্বামী মারা যাবার পরে আর এ বাড়ী আসেন নি। সবাই জানে টাকা ছাড়া একটি পা তিনি হাঁটেন না, দয়ামায়া বিবেচনা বলে কোন জিনিষ তাঁর শরীরে নেই, তবু তাঁকে ডেকে আনা হয়েছে তার ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করতে! খোকা ও খুকীর এতদূর বাড় বেড়েছে কবে থেকে শুনি? সে কোন কথায় কথা বলে না ব'লে তার মত না নিয়ে যা খুসী স্বেচ্ছাচারিতা তোমরা করবে, জীবনে সে খেয়ে দেখে নি সেই সব ফল আর ওষুধ কিনে নিয়ে আসবে, এর পরে আর বেঁচে থাকবার ইচ্ছে তার নেই। এমন অবাধ্য ছেলেমেয়ে যার তাদের মা'র বেঁচে থাকা উচিত নয়।

এতসব কঠিন কঠিন কথা শুনেও যখন উৎপল 'আনন্দবাজার' পড়তে থাকল আর অতসী বেদানা ছাড়িয়ে লাল দানাগুলি শ্বেতপাথরের রেকাবে সাজাতে লাগল যেন ঠাকুরের ভোগ সাজাচ্ছে, তখন আর কথাটি না ব'লে সে পাশ ফিরে শুল, এ তো আর নতুন নয়। সংসারে তার সম্বন্ধে তার নিজের মত কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে নি। সব ব্যবস্থাই অন্যে করে এসেছে চিরকাল। মামাবাড়ীতে সবাই কর্ত্তৃত্ব করত, তারপর শাশুড়ী, স্বামী, এখন ছেলেমেয়ে। যার যেমন ভোগ বিধি করেন উদ্‌যোগ।

অতসীর আঙুলগুলো মুখে এসে লাগল। তার ঠোঁট দুটো শুকিয়ে আছে। "মা, হাঁ করতো দেখি।"

নিলো সে সব শুশ্রূষা নির্ব্বিকার ভাবে।

ঘরে এদিকে চাল-ডালের যোগাড় আছে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু তার কি ? ব্যবস্থার ভার তার ওপরে তো নয়, একবার শুধু সে জিজ্ঞেস করলে, "এসব কি ধারে কেনা হোল ?"

অতসী জবাব দিলে, 'বাঃ ধার কেন ? কাল দাদার কতগুলো টাকা এসেছে জান ? দাদার কলকাতার সেই ছাত্রের কাছে পাওনা ছিল, কাল এসেছে। আজ দুপুরে কি রাঁধব জান ? তোমার জন্যে সুক্ত, আর আমাদের জন্যে মাংস। জ্যাঠাইমাদের বাড়ী থেকে মাংসের ভাগা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের জন্যে। তুমি শুয়ে শুয়ে দেখিয়ে দিও, কেমন ?' কোন উত্তর না পেয়ে আবার বললে—'মাংসের সঙ্গে একটু টক হ'লে আরো ভালো, কিন্তু কি দিয়ে যে টক করা যায় তাই ভেবে পাচ্ছিনে।'

এবার অগত্যা সে পাশ ফিরলে, 'চাল্‌তে গাছ থেকে দুটো চাল্‌তে পাড়তে বল্‌তো ওবাড়ীর চাকরকে, আর ভাঁড়ারে খুঁজে দেখ্‌ একটা হাঁড়িতে দুটো পোস্ত পড়ে ছিল...

অতসী হাসিমুখে উঠে পড়ল।

ক্রমশঃ

বস্ত্রমূল্য-নিয়ন্ত্রণ

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

যুক্ত সম্পাদক, জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানীজ্‌ জার্ণাল

যুদ্ধ আরম্ভের কয়েক মাস পর হইতেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে উহা এরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সাধারণতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করিবার জন্য দেশের অন্যান্য আবশ্যক জিনিসপত্রেরও উৎপাদন হ্রাস করিবার দরকার হয়। এতদ্ভিন্ন চলতি মুদ্রার বৃদ্ধি ইত্যাদি নানারূপ কারণে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসের মূল্য যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি না করে, সে-বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কলিকাতার পাইকারী বাজার-দরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, যুদ্ধের পূর্ব্বেকার অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের দরের তুলনায় ১৯৪১ সালের জুলাই মাসের দর শতকরা ৪৯৲ বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে উহা আরও ৮১০ পয়েন্ট বাড়িয়া গিয়াছে। ফাটকাওয়ালাদের কারসাজি এবং অন্যান্য কতকগুলি সঙ্গত কারণে এই দর বৃদ্ধি হইয়াছে। যে কারণেই হউক ইহাতে জনসাধারণের যে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে দিল্লীতে ১৬ই অক্টোবর তারিখে একটি সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। যে-যে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসা উচিত তাহাদের সকলগুলির বিষয় এখানে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। কাজেই বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধির কারণ ও ইহার নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

১৯১৪ সালের জুলাই মাসের দরকে ১০০ ধরিয়া তুলার পাইকারী দরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ঐ দর ছিল ৬৪। উহা ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে স্পেকুলেশন ও যুদ্ধের অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনায় ১২২ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; আবার ফ্রান্সের পতনের পর ১৯৪০ সালের জুন মাসে ৬৮এ নামিয়া আসে। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসের দর ছিল ৮৮ এবং মনে রাখা প্রয়োজন যে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরের সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধি হইতে উহা ৩৪ পয়েন্ট নিম্নে। এই একই ভিত্তি লইয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে, তুলা-জাত দ্রব্যাদির মূল্য ১৯৩৯এর আগষ্টে ৯৭ হইতে ১৯৩৯এর ডিসেম্বরে ১৩৫ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৯৪০ সালের আগষ্টে উহা কিছু নামিয়া ১১৭ হইয়াছিল এবং ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে ২১৪ পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ এক বৎসরে প্রায় ৯৭ পয়েন্ট বাড়িয়া যায়। নিম্নে ভারতীয় ও আমেরিকান তুলার দর এবং সূতা ও সূতাজাত দ্রব্যের দরের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা দেখান হইল।

তুলা সূতা ও সূতাজাত দ্রব্যের বাজার দর

১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট এর তুলনায় ১৯৪১ সালের ৩০শে আগষ্ট দর শতকরা কত বাড়িয়াছে।

ভারতীয় তুলা	৪১
আমেরিকান তুলা	৯৭
সাদা লংক্লথ	১০০
ব্লিচিং না করা—	
সাধারণ লংক্লথ	১২৫
সূক্ষ্ম সূতার লংক্লথ	১৪৫
সাটিং	১১০
ড্রিল	১৪২
সাধারণ কাপড়	১৩৭

৮২ হইতে ১২২ নং সূতা	১২২
১৬ হইতে ২০ নং সূতা	১৪৪
৩২ হইতে ৮ নং সূতা	১৮০

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, (ক) ভারতীয় তুলার দরের বৃদ্ধি হইতে আমেরিকান তুলার দরের বৃদ্ধি অনেক বেশী এবং (খ) তুলার দরের বৃদ্ধির তুলনায় তুলাজাত দ্রব্য ও সূতার দর অনেক বেশী বৃদ্ধি হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এত বেশী মূল্য বৃদ্ধি হইল কেন? একথা সত্য যে ফাটকাওয়ালাদের জন্য দর বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দর বৃদ্ধির মূলে যে শুধু ফাটকাওলাদের কারসাজিই একমাত্র কারণ তাহা বলা চলে না। ইহার অন্যান্য সঙ্গত কারণও আছে। আমাদের মনে হয় নিম্নের কারণগুলিও দর বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে :—

(১) যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্য রং প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যের আমদানি কমিয়া যাওয়ায় এগুলির দর খুব বাড়িয়া যায়। জাহাজের ভাড়া ও ইন্সিওরেন্স রেট বৃদ্ধি হওয়ায়, ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের মূল্যও আপনা হইতেই বাড়িয়া যায়।

(২) জীবনযাত্রার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় শ্রমিকের মাহিনা কিছু কিছু বাড়ান হইয়াছে।

(৩) ভারতে ও ভারতের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র আমদানি যুদ্ধের জন্য খুব কমিয়া গিয়াছে। ভারতের মিলগুলিকে বর্ত্তমানে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের শূন্য স্থান পূরণ করিতে হইতেছে।

(৪) যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্ট অর্ডারও বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে আনুমানিক ৬০ কোটি গজ সূতাজাত দ্রব্য বার্ষিক গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিবেন।

(৫) ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে ৪০ কোটি গজ সূতাজাত দ্রব্য বার্ষিক পাঠাইতে হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৭ কোটি গজ কাপড় ভারত হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে নিশ্চয়ই এই রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে। কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৬) সাধারণ জিনিসের আমদানি কমাইয়া তৎ-পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্য আনাইবার ও প্রয়োজনে লাগাইবার জন্য ভারতের বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্তি সংরক্ষণের (conserve exchange resources) আবশ্যক হয়। তদুপরি জাপানের সহিত বাণিজ্যে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে ভারত গবর্ণমেণ্ট সূতা ও সূতাজাত দ্রব্যকে আমদানি নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনেন এবং এই দ্রব্যগুলির উপর আমদানি-শুল্ক বর্দ্ধিত করিয়া দেন। ফলে এই সব দ্রব্যের আমদানি কমিয়া যাইতে আরম্ভ করে।

(৭) কিছু দিন পূর্ব্বে জাপান ও অধিকৃত চীনের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিন্ন করা হইয়াছে।

(৮) ১৯৩৯-৪০ সালে জাপান ও চীন হইতে ভারতে মোট প্রায় ৪ কোটি পাউণ্ড সূতা আমদানি করা হইয়াছিল অর্থাৎ ভারতের মোট সূতা আমদানির প্রায় শতকরা ৯২ ভাগ এই দুইটি দেশ হইতে আসিয়াছিল। এই সূতার বেশীর ভাগ তাঁতীরা ব্যবহার করে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত এই আমদানি হইবার সম্ভাবনা না থাকায় ভারতের মিলগুলিকেই এই চাহিদা মিটাইতে হইবে। এই সম্ভাবনার জন্যও সূতার দাম কিছু বাড়িয়া গিয়াছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, সূতা ও সূতাজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির মূলে কতকগুলি সঙ্গত কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। মিল-মালিকদের অতি লাভের প্রবৃত্তিও যে মূল্য বৃদ্ধির জন্য কিছুটা দায়ী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমস্ত খরচখরচা বাদ দিয়া নীট লাভ যে খুব বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি মিলের হিসাব হইতে দেখা যায়। কাজেই তাহাদের অতিরিক্ত লাভ করিবার প্রবৃত্তিকে সংযত করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় সূতা ও সূতাজাত দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিশেষরূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন :—

(১) মূল্য নিয়ন্ত্রণ এরূপ ভাবে করিতে হইবে যাহাতে মিলগুলির উন্নতি এবং সংহতি ব্যাহত বা নষ্ট না হয়। ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে,

যুদ্ধের পর ব্যবসা বিশেষ মন্দা হইবে। এখন মিলগুলি যদি কিছু রিজার্ভ ফণ্ড গঠন করিয়া না লইতে পারে, তবে যুদ্ধের পর ইহাদিগকে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িতে হইবে। যদি যুদ্ধোত্তর কালে মিলগুলিকে অসুবিধার হাত হইতে উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করেন বা তৎ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে নিশ্চয়তা দেন, তাহা হইলে কতকটা আশার কথা। গত যুদ্ধের পরের অবস্থা যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা অবশ্য এবিষয়ে বিশেষ আশান্বিত হইবেন না। ১৯১৪-১৮ যুদ্ধের সময় বিলাতি বস্ত্র আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, তখন ভারতীয় ও জাপানী মিলগুলি এখানকার বাজার দখল করে। কিন্তু যুদ্ধের পর বিলাতি মিলগুলির সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ভারতীয় মিলগুলির উপর এক্সাইজ ডিউটি অর্থাৎ উৎপাদন-শুল্ক বসান হইয়াছিল। নিতান্ত স্বদেশী আন্দোলনের কৃপায় মিলগুলি সব দেউলিয়া হইয়া যায় নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের শেষেও যে ভারতীয় মিলগুলিকে অনুরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে না, তাহা বলা যায় না! এস্থলে আর একটি বিষয়ও বলা প্রয়োজন। বিলাতে বর্ত্তমানে যে অতিরিক্ত লাভ-কর গবর্ণমেণ্ট আদায় করিতেছেন, তাহার একটি অংশ যুদ্ধের পর কোম্পানিগুলিকে ফেরৎ দেওয়া হইবে, এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কাজেই এখন বিলাতি কোম্পানীগুলির পক্ষে রিজার্ভ ফাণ্ড তৈয়ারি না করিলেও প্রকারান্তরে গভর্ণমেণ্টই তাদের তরফে ফাণ্ড তৈয়ারি করিয়া রাখিতেছেন। আমাদের দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। মিলগুলি অতিরিক্ত লাভ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তৎসঙ্গে ভবিষ্যতে ইহারা বিপদে পড়িলে তাহাদিগকে বাঁচাইবার ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন।

(২) ভারত হইতে যে সূতা বা সূতাজাত দ্রব্য বাহিরে রপ্তানি হইবে, তাহা মূল্য-নিয়ন্ত্রণের আওতার বাহিরে রাখিতে হইবে। অ-ভারতীয় বাজারের খরিদ্দারগণের সুবিধার জন্য ভারতীয় মিলগুলিকে প্রকারান্তরে ট্যাক্স্ দিতে বাধ্য করিবার অনুকূলে কোন যুক্তি থাকিতে পারেনা।

(৩) দরিদ্র এবং মধ্যশ্রেণীর জনগণ যে সব দ্রব্য ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা শুধু সেই সব জিনিসের উপরই প্রয়োগ করা উচিত।

(৪) নিয়ন্ত্রণ-নীতি এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে কাঁচা মালের দরের উঠা-নামার সহিত নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের মূল্য-সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।

(৫) উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে মূল্যও কিছু হ্রাস পাইবে। এজন্য দুইটি প্রধান উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

(ক) মিলগুলিকে বাহির হইতে কলকব্জা আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং এ দেশে যে-সব প্রতিষ্ঠান মিলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করে তাহাদিগকে নানা দিক দিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহয্য করা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র উহারা যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে পারে।

(খ) মিলগুলি ২৪ ঘণ্টা তিন সিফটে কাজ করিলে মোট উৎপাদান প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাড়িয়া যাইবে।

(৬) গবর্ণমেণ্টও মূল্য কম রাখিবার ব্যবস্থায় অনুরূপ সাহায্য করিতে পারেন যথা :—

(ক) ভারতে ব্যবহার্য্য তুলা, সূতা এবং সূতাজাত দ্রব্যের উপর রেলওয়ে মাশুল হ্রাস করা প্রয়োজন। যুদ্ধের সময় মাশুল বৃদ্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্টের লাভের পরিমাণ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু এই দ্রব্যগুলির মাশুল হ্রাস করিলে বিশেষ আয় কমিবার সম্ভাবনা নাই।

(খ) ছোট আঁশের তুলা যাহাতে বেশী পরিমাণে মিলগুলি ব্যবহার করিতে পারে তজ্জন্য মিলগুলিকে তুলা আমদানি শুল্ক হইতে কিছু কিছু সাবসিডি (Subsidy) দিতে হইবে।

আমাদের মনে হয় উপরের ব্যবস্থাগুলি একযোগে অবলম্বন করিলে বস্ত্রমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সব দিক দিয়াই কল্যাণপ্রসূ হইবে।

চলার পথে

(কথা-চিত্র)

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

আমার জানালার ঠিক তলা দিয়ে গ্রামে যাবার চওড়া রাস্তা। যেদিন ঘন কুয়াসায় চারদিক ঢেকে রাখে, উপত্যকা আর গিরিশীর্ষ কিছুই দেখা যায় না, সামনের বনশ্রেণীর সবুজ শীর্ষগুলিও অস্পষ্ট হ'য়ে উঠে, সেদিন চোখে পড়ে রাস্তার দিকে। দূরে মাঠের ধারে দেবদারুর সারির ফাঁক দিয়ে তরঙ্গায়িত মেঘ যখন মাঠ পেরিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে ওপরে বিলীন হ'য়ে যায়, আবছায়ার ফাঁকে ফাঁকে কখনও বা দেখা যায়, কোন পথিক হয় ত হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠছে, কেউ বা তরতর করে নীচে নেমে যাচ্ছে। যখন বৃষ্টি পড়ে, জানালাটা বন্ধ ক'রে কাচের সার্শি দিয়ে দেখি, হয় ত বা একটা ফেরিওয়ালা ভিজতে ভিজতে চলেছে, কেউ বা চলেছে ঘোড়ার পিঠে—অধিকাংশই ব্যবসায়ী, উপত্যকায় গ্রামের হাটে বেসাতি করে।

আজও এমনি দেখছিলাম চেয়ে চেয়ে অকারণ। বৃষ্টি এল, মাঠে ছেলেদের খেলা বন্ধ হ'ল। শূন্য মাঠ, শূন্য পথ; কেবল শন্‌শন বাতাস আর শ্রান্তিহীন বর্ষণ। মাঝে মাঝে কুয়াশা আসে, পথ ঘাট ঢাকা পড়ে যায়, আবার পর্দা ওঠে। বৃষ্টির ধারা মাঠের বালুর বুকে আপন পথ সৃষ্টি করে বয়ে চলে; রাস্তাটার খুয়া বেরিয়ে আসে। দূরে একটা বাড়ীর জানলা খুলে গেল, আবার বন্ধ হ'য়ে গেল। বৃষ্টির মাঝে রবারের জুতা পরে, ছাতি মাথায় বেরিয়ে পড়লাম। খানিক দূরে গলির মোড়ে টিনের চালের বাড়ি। বাড়ির সামনের দিকটায় আমার পরিচিত ছেলেটি থাকে; এরা অনেক কালের বাসিন্দা। পেছনের দুটো ঘর খালি পড়ে থাকে প্রায়ই। আজ দেখি জানলা খোলা, ভেতর থেকে ভেসে এল কলকাকলি। অনেক দিন পরে লোক এসেছে হাওয়া বদল করতে।

বাদলার দিন, ছেলেমেয়েরা চাল-বেয়ে-পড়া সরু জলধারা করপুটে ধরছে, আনন্দ আর তাদের ধরে না। মাঝে মাঝে চাপা গলা শোনা যায়, "দুপুরে দস্যিপনা, জলঘাঁটা, পড়াশুনা নেই।" তাদের বড় মেয়েটির সেলাই করার হাত-কলের আওয়াজ চালের 'পরে বর্ষার নৃত্যের সাথে তাল মেলায়। এ বাড়ির ছেলেটি সকালে কাজে বেরয়, আর সেই রাতে বাড়ি ফেরে। এই ক'দিনেই সবাইকার তা জানা হ'য়ে গেছে। কাঠের মেঝে, কাঠের দেয়াল, সবই শোনা যায়। মেয়েটি দেখে ঘড়িতে আটটা বাজল, পাশের ঘরে জুতোর শব্দ। এইবার ছেলেটি কাজে যাবে, ...এই হুক থেকে ছাতা পাড়ল...। খস্ খস্ আওয়াজ..., বর্ষাতি পরছে...। "দেখি ত!" "হুঁ, ঠিক বলেছি! এই ত বর্ষাতি পরে, ছাতা মাথায় দিয়ে, ঘাড় নীচু করে চলেছে।"

"বাবা, কি বৃষ্টি পড়ার দেশের!"

সারাদিন পাশের ঘরটি নিস্তব্ধ, নিশুতি রাতের মত। সন্ধ্যা হ'ল, খট্‌খট্ আওয়াজ। ছেলেটি এসেছে। হুকে বর্ষাতি ঝুলিয়ে রাখল, ছাতা খুলে শুকাতে দিল। মেয়েটি জানে, এইবার সে শুয়ে একটু বিশ্রাম করবে, তারপর বেরিয়ে যাবে; আবার অনেক রাত্রে ফিরবে।

চট্‌পট শব্দ, ছেলেটি খেয়ে শুতে যাচ্ছে। এই সময়ে গুন্‌গুন্ গান ধরে। মেয়েটি উৎকর্ণ হয়ে গানের কলি ধরবার চেষ্টা করে—রেডিওর গানের ভাঙা কলি। ...গলাটি বেশ মিষ্টি ত!

অদ্ভুত লাগে মেয়েটির, লোক দেখা যায় না, কেবল তার উপস্থিতিটা অনুভব করে সে; অন্ধের শব্দ অনুসরণ করার মত। সে জানে ছেলেটির দৈনন্দিন কাজের তালিকা। ছুটির দিনে ছেলেটি ঘুমায়। সে দেখেছে বেড়াতে যাবার সময়, গায়ে তার ঢাকা থাকে মেটে রংয়ের

আলোয়ান। কি শান্ত ছেলেটি, গলার আওয়াজ শোনা যায় না। মাঝে মাঝে সকাল সকাল বাড়ী ফিরলে কবিতা পড়ে, ভারী মিষ্টি করে পড়ে।

দু' মাসের ওপর হয়ে গেল, এক ভাবেই ছেলেটির জীবন বয়ে চলেছে। তাদের ঘরে কত চেঁচামেচি? ভাই-বোনের কত অসংলগ্ন কলহ; তার দিনের কাজ, ঘর ঝাড়া' ঘর মোছা।...

"ওর ঘরটা কি রকম গোছান কে জানে!"

"হ্যাঁ, পুরুষমানুষ আবার গোছালো! একদিন দুপুর বেলায় চুপি চুপি ওর ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে এলে হয়। কাজ থেকে এসে অবাক হ'য়ে যাবে একেবারে। ঐ মিশির চাকরটা, ও কী আর তেমন যত্ন করে!"

"এত ঠাণ্ডাই বা কেন বাপু, চাকরটাকে ভাল-মন্দ হুকুম করলেই ত হয়।"

সে রাত্রে বৃষ্টি সব চেয়ে বেশী চেপে আসলো। ঝড় হ'ল অবিশ্রান্ত, ছাদের 'পরে কে যেন ঢাক পিঠছে।

রাত তখন সাড়ে দশটা। পাশের বাড়ীতে সাড়াশব্দ নেই, আলোও কাঠের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে না, সব নিশুতি।

ছেলেটি বলছে, "মিশির, আজ সব চেয়ে বেশি বৃষ্টি। টিনের ফাঁক দিয়ে জল পড়ছে। এই পাশেই ত ওরা শোয়, হয় ত বা ভিজে গেল।"

মিশির বললে, "হাঁ, বড়দিদি এই পাশেই শোয়।"

ছেলেটি বললে, "তাই ত, মেয়েটি ভিজে যাবে হয় ত।" মেয়েটি শুনতে পেলে। ঘরে বাইরে ঘন অন্ধকার, জল পড়ার আওয়াজ; তখনও সে ঘুমোয় নি। বালিশের ওপরে গালটি পেতে এলিয়ে পড়ল। মাথার খোঁপাটা গেল খুলে। লেপটাকে আরও নিবিড় ক'রে জড়িয়ে নিল।

"তাই ত, কপালে যেন এক ফোঁটা জল পড়ল! দু-ফোঁটা, তিন ফোঁটা...ওমা, তোষকের খানিকটা যে ভিজে গেছে!" মেয়েটি সরে শুল।

মেয়েটি চলেছে ভাইবোনদের নিয়ে বেড়াতে, ছেলেটি বিকেলে সকাল সকাল ফিরছে বাড়ি। পথের বাঁকে দেখা। বৃষ্টির পরে ঝিলিক দিয়েছে রোদের, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মোটা মোটা আলোর রেখা নেমে এসেছে সূর্য্যি থেকে পাহাড়ের শ্যামল গায়ে। জলবিন্দুর ওপরে তা চক্চক্ করছে। মেয়েটি ভাইদের বললে, "ভাল করে দেখে নে, আর ত দেখতে পাবি নে।"

তার মুখখানি স্যাঁতস্যাতে, চোখদুটি সোজাসুজি চাইতে শেখেনি যেন। ছেলেটি পাশ দিয়ে চলে গেল।

পর দিন ছেলেটি দেখলে, পাশের ঘরদুটি তেমনই পূর্ব্বেকার মত শ্রীহীন। এ পাশে ও পাশে ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ওধারে খানিকটা কয়লার গুঁড়ো জড় করা, উনুনটা ভাঙা।

এপাশে দেয়ালের ধারে খাটের তলায় খানিকটা পর্য্যন্ত স্যাঁতা দাগ।

"জল পড়ার দাগ, না রে মিশির? এখানটা মুছে দিস।"

ছেলেটি একবার পেছন ফিরে খাটটার দিকে তাকাল।

মেয়েটি ফিরে গেছে দেশে। পাশের ঘরে জুতোর শব্দ হ'লে সে উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে। ভিজে ছাদের আলশেয় হেলান দিয়ে ক্ষান্ত বর্ষণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের দিকে তাকায়।

"হঠাৎ মেঘের দরজা খুলে, বিজলীর পথ বেয়ে কেউ যদি ছাতে এসে নামে! বর্ষাতি গায়ে তার, মাথায় ছাতা, তেমনি মিষ্টি গলা। নেমে যদি বলে, আজ সব চেয়ে বেশি বৃষ্টি!"

সে রাত্রে পশ্চিমের জানলা খোলা ছিল। বৃষ্টির ছাট এসে মেয়েটির গা ভিজিয়ে দিল। মেয়েটি গাল পেতে বালিস আঁকড়ে চুপটি করে শুয়ে রইল, আর সরে এল না।

মুঘল-শাসনে খ্রীষ্টধর্মের প্রাদুর্ভাব

শ্রীরমেশকুমার ঘোষাল, এম-এ

"His Majesty [Akbar] firmly believed in the truth of the Christian religion and wishing to spread the doctrine of Jesus, ordered Prince Murad [his second son] to take a few lessons in Christianity by way of auspiciousness"—*Ain-i-Akbari.*

সম্রাট আকবরের চরিত্রের বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সর্ব ধর্মের প্রতি তাঁহার উদার মনোভাব। যে-যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে-যুগের পক্ষে ইহা একটি অতীব বিস্ময়কর এবং অনন্য-সাধারণ ব্যাপার বলা চলে। তাঁহার পূর্বে বা কিছু পরে যে অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের ধারাকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল, মহামতি আকবর সে সংকীর্ণ মনোভাব বহুল পরিমাণে কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের মত আকবরকে "born ahead of his time" বলা চলে।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, মুঘলরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার বহু পূর্বে এ দেশের স্থানে স্থানে খ্রীষ্টধর্মা-বলম্বী কয়েকটি সম্প্রদায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া বাস করিতেন। এই সব সম্প্রদায় যে বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন বা এ দেশে তাঁহাদের প্রভাব যে ব্যাপকভাবে বিস্তারিত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মালাবার উপকূলে সিরীয় খ্রীষ্টানদিগের একটি ছোট উপনিবেশের কথা উল্লেখ করা চলে। দক্ষিণ ভারতেরও কয়েকটি স্থানে নেস্টরমতাবলম্বী খৃষ্টানদিগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধর্ম সম্বন্ধে সম্রাট্ আকবরের একটি সহজ, সুন্দর সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব ছিল, তাহা বলিয়াছি। তাঁহার সভায় বহুবিধ ধর্মের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের মতবাদেরও একটি বিশিষ্ট আসন ছিল। প্রতি শুক্রবার রাত্রে ফতেপুর-সিক্রীর ইবাদতখানায় আকবর একটি ধর্ম-সম্মেলনের ব্যবস্থা করিতেন। সে সভায় মুসলিম উলেমাদিগের সহিত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান পণ্ডিতদিগের মধ্যে যে তর্কবিতর্ক এবং আলাপ আলোচনা হইত, সম্রাট তাহা গভীর অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিতেন। তিনি গোয়া হইতে পোর্তুগীজ পাদ্রিগণকে তাঁহার সভায় আনাইতেন এবং মনোযোগের সহিত তাঁহাদের বাদানুবাদ শ্রবণ করিতেন। যীশুখ্রীষ্টের মতবাদ যে তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাহারও কাহারও মতে তিনি প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে কোনও নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায় যে, আকবর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মুরাদকে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানার্জন করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বহু ইউরোপীয় (প্রধানতঃ ইংরেজ) পর্যটক বাণিজ্য-প্রসারের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকবরের সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাবের প্রশংসা করিয়া-গিয়াছেন। তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি প্রত্যেক বাণিজ্য-কেন্দ্রে জেসুয়িট পাদ্রিদিগের অন্তত একটি করিয়া গির্জা বা মিশন ছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টায় কোনও বাধা ছিল না। আকবরের মৃত্যুর আট বৎসর পরে, ১৬১৩ সালে, নিকলাস্ উইদিংনি (Nicholas withington) নামে একজন ইংরাজ পর্যটক আমেদাবাদ সহরে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, "আমাদাবারে (আমেদাবাদ : আহমদাবাদ) সহরে একজন জেসুয়িট পাদ্রি রহিয়াছেন দেখিলাম। তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী রহিয়াছেন।"

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তাঁহার শাসনাধীনেও খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব পূর্বের ন্যায় অপ্রতিহত ভাবেই চলিয়াছিল। ধর্মসম্বন্ধে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার ন্যায় মনোভাব দেখাইতে পারেন নাই। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ শত্রুতাচরণও করেন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি সাধারণ ভাবে ধর্মসংক্রান্ত যে কোনও ব্যাপারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কূট রাজনীতিই তাঁহার জীবনে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহনের অব্যবহিত পরেই (১৬০৯ খৃষ্টাব্দে) উইলিয়ম হকিন্স্ (William Hawkins) নামে একজন ইংরেজ পর্যটক আগ্রায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, আগ্রায় বাসকালীন জাহাঙ্গীর যে কক্ষে দৈনন্দিন প্রার্থনা করিতেন সেখানে খ্রীষ্ট এবং মাতা মেরী উভয়েরই দুইটি প্রস্তর মূর্তি রক্ষিত থাকিত। উইলিয়ম ফিন্স্ (Finch) নামক আর একজন পর্যটক লাহোরের রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে এবং আগ্রার দিয়াওনি-আমের ঝরোখার (সিংহাসনের) পশ্চাৎ ভাগে প্রাচীর গাত্রে যীশুখ্রীষ্ট এবং মাতা মেরীর ছবি দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

কয়েকজন সমসাময়িক ইংরেজ পর্যটকের মতে জাহাঙ্গীর যীশুখ্রীষ্টকে হজরত ইশা, অর্থাৎ 'মহাপ্রভূ যীশু' বলিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সার টমাস রো (Roe), ফিন্চ্, হকিন্স্, প্রমুখ পর্যটকদিগের বিবরণ হইতে জানা যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর একবার খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি দেখাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে জন্য তিনি তাঁহার পরলোক গত ভ্রাতা দানিয়েলের তিনটি (কাহারও কাহারও মতে দুইটি) পুত্রকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করেন এবং তাহাদিগকে জেসুয়িট্ পাদ্রিগণের নিকট পাঠাইয়া দেন। Xavier নামক জনৈক পুরোহিত তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। ধর্মান্তর গ্রহণের পরে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতুস্পুত্রদিগের নূতন নামকরণ হইয়াছিল —ডন্ ফিলিপো, ডন্ কার্লো এবং ডন্ হেনরিশো। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই দানিয়লের পুত্রগণ আপনাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভারতীয় মিউজিয়ামে বৌদ্ধ কারুশিল্প

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

ভারতবর্ষে কারু-শিল্পের অভিব্যক্তি এবং ক্রমোন্নতির কালনিরূপক ঘটনা ও ইতিহাস (chronological sequence) সম্বন্ধে সকল অনুসন্ধানীরাই একমত। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ঘটনা পরম্পরায় শাসক বংশের নামে এই শিল্প কালের সমতা রক্ষা করে এসেছে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ কারুশিল্পের ক্রমোন্নতির মূলে আমরা পেয়েছি মৌর্য (Mourja Period), শক্-কুশান (Saka-Kushana), কুশান (Kushana), ও গুপ্ত প্রভৃতি বংশ। উহাদের রাজত্বের পরবর্তী দুই যুগে প্রধানতঃ জৈন ও ব্রাহ্মণ্য (Jain & Brahmanical art) কারুশিল্পের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ কারুশিল্পের (ancient Buddhist art) মাঝে মাঝে পাল-বৌদ্ধ কারুশিল্পের (Pala Buddhist art) বিশেষ সমাদর ছিল না।

গান্ধার (Gandhara) ছিল কারুশিল্পের একটি বৃহৎ সঞ্চয়কেন্দ্র। এখানে গ্রীক্-বৌদ্ধ কারুশিল্পের (Greeco Buddhist art) প্রাচুর্য ছিল, এবং তার সৌন্দর্য এত প্রাণস্পর্শী ও মনোমুগ্ধকর যে, তাতে স্বতঃই মনে হয়, ইহা যেন ভারতীয় কারুশিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কুশান্ যুগে (Kushana period) গান্ধার

ছিল কারুশিল্পের ঐশ্বর্যনিলয়। ইহা যাদের হাতে গড়া, সেই সব নির্মাণকারী ও ভাস্কর সকলেই পরিশেষে বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দের শীতকালে আলেকজেণ্ডার কর্তৃক ইহা বিজিত হবার পর গ্রীকরা এখানে এসে বসবাস করা সুরু করে এবং কয়েক বৎসরকাল গান্ধার থাকে এদেরই শাসনে। বিশ বৎসর পর গান্ধার চন্দ্রগুপ্ত ও মৌর্যদের সাম্রাজ্যের একাংশে পর্যবসিত হয়। মৌর্য-সম্রাট বিন্দুসারের রাজত্ব-কালে তার পুত্র অশোক গান্ধারের শাসনকর্তা ছিলেন। অশোক সম্রাট হবার পর একদল বৌদ্ধ কাশ্মীরে ও গান্ধারে বাস করতেন। এরা সকলেই ছিলেন গ্রীক-বংশধর; এই সকল লোক ঈর্ষান্বিত হ'য়ে নূতন ধর্ম পরিগ্রহণ করে। তিন যুগ পরে কারুশিল্পের চরম উৎকর্ষতার সঙ্গে এল কুশান বংশ। এই সময় গান্ধারে বহু ধর্মপ্রাণ ভাস্করের অভ্যুত্থান হয়েছিল। তাদের ভাস্কর্যপ্রতিভা ভারতের অন্যান্যযুগের কারুশিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়। এই সময়কার কারুশিল্পের সৌন্দর্য-সম্ভারের তুলনা মেলে না।

লাহোরের মিউজিয়ামে গান্ধার ভাস্কর্য্যের নিদর্শন সঞ্চিত করা হয়েছে। তক্ষশীলার বিভিন্ন কারুশিল্পের মধ্যে দুটো ভাস্কর্যশিল্প প্রসিদ্ধ এবং সে দুটো সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। ঐ দুটো ভাস্কর্যশিল্প সকলকেই আনন্দ ও পরিতৃপ্তি দান করবে। পেশোয়ারের মিউজিয়মের শিল্প-সম্ভারগুলোও যুগযুগান্তর ধরে সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হচ্ছে, এখন পর্য্যন্তও কোনটার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। পেশোয়ার কারুশিল্পের ঐশ্বর্যভাণ্ডার। বর্তলৌহে নির্মিত মহাপুরুষগণের প্রতিকৃতি মন্ত্রিপরিষদের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে এমন সুন্দর ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত রাখা হয়েছে যে, কোন আগন্তুক পর্যটকের আগ্রহদৃষ্টি অনায়াসে সেগুলোর উপর পড়বে। তাছাড়া নিখুঁৎ রংএর পারিপাট্যে ছাঁচে গড়া প্যারী প্লাষ্টারের জিনিষ, বহির্ভাগে চন্দ্র ও সূর্য্যের মাঝে কনিষ্ক প্রতিকৃতি অপূর্ব্ব শোভাবর্দ্ধন করছে। ইং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ক-স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইহা আবিষ্কৃত হয়। গৌতমবুদ্ধের দেহাবশেষের যে সব অংশ ইহার মধ্যে ছিল, সেগুলো ব্রহ্মদেশকে উপঢৌকন দেওয়া হয়। ঐসব এখন মান্দালয়ে আছে। কয়েক ফুট উর্দ্ধ প্রস্তরময় স্থান থেকে বক্র কতকগুলো প্রস্তর-স্তম্ভ সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলোতে বোধিসত্ত্ব-সিদ্ধার্থের ঘটনারাজি লিপিবদ্ধ আছে এবং দীপঙ্কর, ভেসান্তর, শ্যামজাত কোশ এদের সম্বন্ধে নানাকথা বর্ণিত রয়েছে। শেষোক্ত দুটো লোকের নিকট খুব প্রিয়। দীপঙ্করের আখ্যান তক্ষশিল্প-স্তম্ভে (carvings) বর্ণিত রয়েছে। সেখানে আছে রাণী মায়ার স্বপ্নের পাঁচটি স্তর ও সিদ্ধার্থের জন্মের দশটি বিবরণ। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কারুশিল্পের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের কিংবদন্তিগুলোর বর্ণনা-প্রাচুর্য এই সব ঘটনাসমূহের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বোধিসত্ত্ব (Bodhisattvas) অবলোকিতেশ্বর (Avalokiteswar) ও মৈত্রেয় (Matreya), এদের প্রতিমূর্তি গ্রীক প্রতিমূর্তির মতই বীরত্বব্যঞ্জক। পোষাক-পরিচ্ছদ, চুল ও মণিমুক্তাদ্বারা এই সব সূক্ষ্ম কারুকার্য প্রস্তরমূর্তিতে ক্ষোদিত। গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ গ্রীক স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে আকৃতিতে, প্রচ্ছদ-পটে, সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে সাদৃশ্য রয়েছে। ভারতীয় অপরাপর কারুশিল্পের ন্যায় ইহার মধ্যে আড়ম্বরের ততটা ছাপ নেই, কিন্তু গ্রীক প্রতিমূর্তির মত সৌম শান্ত ভাব বিরাজ করছে। উপবিষ্ট বুদ্ধ প্রতিমূর্তির মুখে এত সুন্দর হাসির রেখা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা ফটোগ্রাফেও হয় না। স্বর্গগত রেজিনাল্ড ফেরার (Regir..d Farrer) পলনারুভেতে (palannaruva) গলবিহারে (Galbihar) সমাসীন বুদ্ধের বিরাট প্রস্তরমূর্তিটি দেখে স্থির করলেন যে, উহা গান্ধার দেশের স্মৃতি। অভয়মুদ্রা আছে, কিন্তু ধ্যান-মুদ্রার আধিক্য বেশী; ধর্মচক্রমুদ্রা (Dharma chakra-mudra) বেশী প্রিয়। একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, অজন্তা, ইলোর, মথুরা ও অন্যান্য স্থানে ধর্মচক্রমুদ্রায় বৃদ্ধাঙ্গুলী ও দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অপর হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুল ধরে আছে। কিন্তু গান্ধার ভাস্কর্য-কারুশিল্পে ইহার ঠিক উল্টো রকম দৃষ্টিগোচর হয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও বামহস্তের তর্জনী দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুল ধরে রয়েছে। কতকগুলি কারুশিল্পের দৃশ্য বুদ্ধমন্দিরে সমাবেশ করা হয়েছে, যেমন—চারটি পান-পাত্রদান, গৌতমবুদ্ধের মৃতদেহের কফিন ও মহাপুরুষদের

স্মৃতিচিহ্ন মন্দিরে রক্ষণ। সিদ্ধার্থের দেহাবশেষের ভাস্কর্য-শিল্প একমাত্র লাহোর মিউজিয়াম ব্যতীত অপর কোন স্থানে নেই।

গান্ধার পর্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত উষর উপত্যকা। এই পর্বতসঙ্কুল পথে আক্রমণকারীরা ভারতে আসে; গান্ধার পথপ্রান্তে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী পর্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়ে আলেকজাণ্ডার ও বাবরের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতে অনেক আক্রমণকারীর আবির্ভাব হয়। এই সময় প্রকৃত গুণী, সৎ ও শান্তিপ্রিয় মানবও ভারতে এসে ভারতের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের বিষয় অবহিত হন। ধার্মিক চৈনিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাদের মধ্যে অন্যতম। এরা তাঁদের শক্তিশালী লেখনী দ্বারা গান্ধার মন্দিরগুলোর শিল্প-সম্ভারের কথা আলোচনা করে জগতের সম্মুখে তা প্রচার করেছেন। তাঁদের এই লেখার ভিতর দিয়ে গান্ধার সম্বন্ধে জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে। ফাইয়েন্ (Fahien) ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে, সঙ্ইয়ান্ (Song-yan) ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে, হিয়েন্ সাঙ্, (Hiensang) ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে এবং টিসিয়াঙ্ (Tsing) ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আসেন। হিয়েন্-সাঙ্ ও টিসিয়াঙ্ চীনে প্রত্যাবর্তন করে গান্ধার দেশের কারুকার্যের যে বর্ণনা করেছেন, তাতে লোকের মনে গান্ধার সম্বন্ধে ততটা রেখাপাত হয় নি। ফাইয়েন্ ও সাঙইয়ানের গান্ধারের শিল্পসম্ভার ও বুদ্ধের আখ্যানলিপি প্রভৃতি অমূল্য সম্পদ তন্ন তন্ন করে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। বুদ্ধের চক্ষুদান, পানপাত্র (the bowl) ও অপরাপর দর্শনীয় জিনিসগুলো বৌদ্ধমন্দিরে ফাইয়েন্ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কণিষ্কমন্দিরও তিনি দেখেছিলেন। পেশোয়ারের নিকটবর্তী ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে দৃষ্ট হয়, এখন ইহার নাম দেওয়া হয়েছে সাহ্-জি-কি ধরী (Shah-ji-ki-dheri) অর্থাৎ মহারাজ চৈত্য (Maharaj chaitya)। ফাইয়েন্ লিখেছেন—"কণিষ্ক (Kanishka) যখন মর্তে এসে ঘুরে ঘুরে সব জিনিস দেখা সুরু করলেন, তখন স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তার মনে একটা ভাব জাগাবার জন্যে স্বয়ং রাখাল বালক সেজে পথপ্রান্তে প্যাগোদা (pagoda) নির্মাণ সুরু করলেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এখানে কি করছ! বালক উত্তর করলে, "আমি বুদ্ধের প্যাগোদা নির্মাণ করছি।" "চমৎকার" রাজা বললেন। তৎপর রাজা কণিষ্ক চারি শত ফুট উচ্চ প্যাগোদা নির্মাণ করেন এবং নানাপ্রকার বহুমূল্য ধাতুতে উহা অলঙ্কৃত করেন। এই প্যাগোদা এত অপরূপ সুন্দর করে তৈরী করা হয়েছেন যে, অপর কোন প্যাগোদার সঙ্গে ইহার তুলনা মিলে না। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে যারা সবগুলো প্যাগোদা দেখেছেন তারাই একথা একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, পৃথিবীতে এইটিই সবচেয়ে সুন্দর ও বৃহৎ। ইহার সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তিও আছে। পেশোয়ারের উত্তরে উত্তর-পূর্বে এমন অনেক স্থলে আছে যেখানে বুদ্ধ সম্পর্কে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। রাজকুমার ভেসান্তর (Vassantara) ও তদীয় পত্নীর পর্বতগুহার আবাসগৃহে ও দুটো পৃথক পাশাপাশি পর্বতগুহায় এই সব উপকথা উৎকীর্ণ আছে।

সাঙইয়ান ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধার পরিদর্শনের সময় দেখেছিলেন প্রধান প্রধান হর্ম্যরাজি নানা রঙে সুশোভিত এবং প্রতিমূর্তিগুলো স্বর্ণ দিয়ে এমন চমৎকার অলঙ্কৃত ও পরিবৃত করা হয়েছে যে, চক্ষু পড়লেই ঝল্‌সে যায়। ভেসান্তরের (Vassantara) রঙ ফলান সূক্ষ্ম কারুকার্য-গুলোও অত্যন্ত মনোরম। জাতকের (Jataka) ভেতরে যেন প্রাণ রয়েছে, তাকে এমনি জীবন্ত করে তোলা হয়েছে, তা দেখে নির্মম শ্বেত হুণদেরও চোখ ছেপে জল এসেছিল। সাঙইয়ান হুনরাজ মিহিরাঙ্গুলের (Mihirangula) সঙ্গে দেখা করেন। ইনি অত্যন্ত নৃশংস প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের নিয়মনিষ্ঠার ছিলেন ঘোর বিরোধী। ইহা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা যে, পনর বৎসর পরে মিহিরাঙ্গুল ষোল শত ধর্মমন্দির বিনষ্ট করে, দুই-তৃতীয়াংশ লোক ধংস করে এবং অবশিষ্ট সকলকে দাস করে রাখে। একশত বৎসর পর হিয়েন্‌সাঙ এই দেশকে জনবিরল অবস্থায় দেখেন, আরও দেখেন বৃহৎ বৃহৎ মন্দিরগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, শুধু পনরটি মাত্র মন্দির কোন রকমে বেঁচে আছে! প্রায় এক সহস্র সঙ্ঘরামের মধ্যে সবগুলোই বিধ্বস্ত হয়েছে, সেগুলোর উপর বন্য তৃণগুল্ম জন্মেছে, সর্বত্র বিরাজ করছে স্তব্ধ নির্জনতা। বুদ্ধমন্দিরগুলো প্রায় সবই বিধ্বস্ত হয়েছে!

ভারতের অন্যান্য মিউজিয়ামেও গান্ধার ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন সঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু তক্ষশীলা (Taxila) ও পেশোয়ারের মিউজিয়ামেই উহা সমধিক পরিমাণে সংগৃহীত রয়েছে। তক্ষশীলা পেশোয়ার থেকে অষ্টাশি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। বর্ত্তমানে অল্পকয়েক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনযোগে পৌছান যায়। কিন্তু ফাইয়েন্ পৌছিয়েছিলেন সাত দিনে। তিনটি সহরের ধংসলীলা ইহারই সন্নিকটে এবং ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত কয়েকটি মঠ পাহাড়ের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের মধ্যস্থ একটি পাত্রে তিনটি সোনার সেফটিপিন, চূণী ও অপর একটি স্বর্ণনির্মিত বাক্সে রৌপ্য পত্র, মণিমুক্তা প্রস্তর এবং হাড় পাওয়া যায়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমস্ফোর্ড কর্ত্তৃক এইগুলো সিংহলের বৌদ্ধদের উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল।

এই মিউজিয়ামে যে সমস্ত দর্শনীয় বস্তু আছে তা পেশোয়ারের মিউজিয়ামের তুল্য। কিন্তু পাথরের কাজগুলো আস্তরের কারুকার্যের কাছে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না, উহা সবগুলোই প্রায় গ্রীক বৌদ্ধ কারুশিল্প। মস্তকদানের একটি ভাস্কার্যশিল্প আছে, উহা এমনই চমৎকার যে তার তুলনা মেলে না। কন্থক প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে হাটুগেড়ে তার পদচুম্বন করছে, আর তপ্ত চোখের জলে পা ধুইয়ে দিচ্ছে। একটি কুলুঙ্গীর মধ্যে ছোট্ট দুটি মূর্তি আছে, ডানদিকে সারিপুত্র ও বামদিকে মুগালন। তার পার্শ্বে অপর দুটো মূর্তি, পদ্মপাণি ও বজ্রপাণি বুদ্ধকে উপাসনা করছে। মিঃ হারগ্রীভস্ (Mr Hargreaves) এই সন্নিবেশিত ভাস্কর্য শিল্পগুলোকে প্রস্তরখোদিত বুদ্ধ-জীবনী বলে অভিহিত করেন।

লক্ষ্ণৌতে গুপ্ত কারুশিল্পের দুটো নিদর্শন আছে। একটি উপবিষ্ট বুদ্ধ, ইহা দেখতে এত সুন্দর যে সারনাথের প্রতিমূর্তিও (Sarnath Image) এর কাছে হার মানে। অপরটি দণ্ডায়মান বুদ্ধ। এই প্রতিমূর্তির মুখমণ্ডলে যেন ধ্যানের ভাব ফুটে উঠেছে।

কিন্তু কুশান কারুশিল্প (Kushana Art) মথুরাতে সমধিক পরিদৃষ্ট হয়। মথুরা আগ্রা থেকে ট্রেনযোগে মাত্র একঘণ্টা ও দিল্লী থেকে তিন ঘণ্টার পথ। গান্ধারের গ্রীক বৌদ্ধ কারুশিল্প (Graeco Buddhist Art) একটি বিশেষ অঞ্চলের শিল্প বলে পরিগণিত হত। উহা ভারতীয় কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এই সব শিল্পগুলো স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্ব স্ব অভিরুচি অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল।

কুশানযুগে মথুরা-শিল্পের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কারখানা থেকে তৈরী ঐ জেলার লাল পাথরের সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্যশিল্প প্রেরণ করা হত, সারনাথ, সাঁচী, কৌসম্বি ও কুশিনগর প্রভৃতি স্থানে। গৌতমবুদ্ধের মথুরা-প্রতিকৃতির প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করেছিল; এমন কি ভারতের বাহিরেও। আদি বৌদ্ধ-কারুশিল্পের যুগে কিন্তু মথুরা-শিল্পের এরূপ আদর ছিল না। কতকগুলো নমুনা যেমন—পদচিহ্ন, বুদ্ধমন্দির, বোধিবৃক্ষ অথবা ধর্মচক্র এইগুলো গৌতমবুদ্ধের উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিত। গুপ্ত-শিল্পেরও উদাহরণ পাওয়া যায় —গৌতমবুদ্ধের সম্পূর্ণ দেহ কারুকার্য ও আরও অনেক জিনিষ বিরাজ করছে। এগুলো গুপ্তশিল্পের নিদর্শন।

ভারতের মিউজিয়ামগুলোতে যে সব ভাস্কর্যশিল্প পরিদৃষ্ট হয়, নূতন পরিকল্পনা নিয়ে সেই সব শিল্পকে মাদ্রাজের মিউজিয়ামে রূপ দেওয়া হয়েছে। কলিকাতার মিউজিয়াম সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে।

রামধনু

(গল্প)

শ্রীসুবোধ রায়, বি-এ

বাড়ীখানি জন-কোলাহলময় সহরের এক প্রান্তে, নিরালায়—ঝক্‌ঝকে—তক্‌তকে ; সামনে ছোট্ট একটি ফুলের বাগান—নেহাৎই নগণ্য। এইখানে একটি নব-দম্পতি ছোট্ট একটি শিশুকে কেন্দ্র করে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করেছে।

টুক্‌টুকে শিশুটিকে নিয়ে অপরিসীম আনন্দে এদের দিনগুলো দ্রুত গড়িয়ে চলে। মনের আনাচে-কানাচে অনাগত ভবিষ্যতের কত কল্পনা গড়ে ওঠে—কত রঙীন্ স্বপ্নের রামধনু ভেসে ওঠে ওদের চোখের সামনে।

খোকা শুয়ে শুয়ে তার কচি-কচি হাত-পা নেড়ে আপন মনে খেলতে থাকে—এক-একবার তার ছোট্ট দুটি মুঠির আঘাতে বিরাট মহাশূন্যের বুকে যেন গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করতে চায়। কী ভেবে আবার খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে। ক্রমে দু'একটা অস্পষ্ট ও অবোধ্য শিশু-ভাষা উচ্চারণ করে—হামাগুড়ি দিয়ে খেলে বেড়ায়—মাঝে মাঝে বাড়ীর দেওয়াল ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। মা-বাপের চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা আনন্দের দীপ্তি। আকাশে বাতাসে চলে আকুলি-ব্যাকুলি খেলা।

খোকা ঘরে কেঁদে ওঠে—মা ব্যস্তভাবে ঘরে গিয়ে নিয়ে আসে কোলভরা শিশু। বাপ খোকাকে কোলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় বিব্রত করে তোলে।

বাপ বলে, 'খোকার নাম হবে দীপক, কি বলো?'

প্রস্তাবটি মা একটুকরো নীরব হাসি দিয়ে সমর্থন করে।

খোকা এক-একবার মায়ের চুল ধরে টানে—এক-একবার কাঠের ভারী পুতুলটা দিয়ে মার মাথায় সজোরে আঘাত করে—আবার কেঁদে ওঠে—আঙিনায় রাখা দুধের বাটিটা খোকার পদাঘাতে পড়ে যায়! শীলা প্রথম সন্তানের অবুঝ অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। নির্জ্জনে ওকে বুকে নিয়ে চুমো খায় আর বলে, 'খোকা আমার, যাদু আমার।' খোকার মুখে ফুটে ওঠে এক ঝলক মিষ্টি হাসি। বাপ-মার মনে ঢেলে দেয় বিশ্বের সঞ্চিত সমস্ত আনন্দ—মুখে তাদের ফুটে ওঠে পরম নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির আভাষ।

অসিত বলে, 'খোকা আমাদের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হবে গো, দেখে নিও।'

সন্তানকে বাপ-মা আদর-সোহাগ করে চুমো খায়। এমনি করেই বুনে চলে ওরা ওদের স্বপ্নের জাল।

প্রতিবেশিনীদের সুতীক্ষ্ণ লোলুপ দৃষ্টি হতে রেহাই দেবার জন্য শীলা খোকাকে আড়াল করে রাখে। মাণিকের মা রাধু গোয়ালিনী দুধ দিতে আসে—শীলা খোকাকে বুকের ওপর চেপে ধরে ঘরে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচে।

পূবের আকাশ ফর্সা হবার আগেই খোকার অস্ফুট কাকলীতে মা-বাপের ঘুম ভাঙ্গে। উঠানের কোণে একটি তুলসীমঞ্চ—রোজ সন্ধ্যায় শীলা সেখানে দীপ জ্বেলে সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। এমনি নিঃশব্দে বয়ে যায় সহজ অনাবিল সময়ের স্রোত।

অসিত সহরের সওদাগরী আপিসে দশটা হতে পাঁচটা অবধি কলের মত কলম পিষে মাসান্তে পঁচিশটি মুদ্রা এনে শীলার হাতে দেয়; এতেই ওদের কোন রকমে খাই-খরচ চলে; তার বাইরে অবশ্য একটা খরচ এলেই চক্ষু চড়ক গাছ।

এই ফাল্গুনে দীপক পাঁচে পড়েছে—আধো আধো কথা কয়, ছুটোছুটি করে। শীলার মতে খোকা নাকি ষোল-আনাই দুষ্টু হয়েছে—শুধু নাকি টো টো করেই বেড়ায়।

ওদের পাশের মেটে রঙের ত্রিতল বাড়ীখানা হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত সাব্‌জজ্ রায় সাহেব ললিত রায়ের। রায়-

সাহেব গৃহিণী বড্ড মুখরা বলে এ অঞ্চলে কিংবদন্তী আছে। রায় সাহেবের ছোট ছেলেটি সে দিন তাদের বৈঠকখানার সংলগ্ন মাঠে হাতগাড়ী নিয়ে খেলছিল। দূরে দীপককে আসতে দেখে ও ছেলেটি ওকে ডাকল ওর সঙ্গে খেলতে। দীপক ছুটে এল। একবার দীপক টানে ও ছেলেটি চড়ে, আবার দীপক চড়ে ও ছেলেটি টানে। এমনি করে চলে ওদের খেলা।

নীলাকাশে একখণ্ড কালো মেঘ উদাস—ছন্নছাড়া বাউলের মত আপন মনে ঘুরে বেড়ায়।

অনেকক্ষণ সন্তানকে না দেখে মায়ের প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে—সারা দুনিয়াটুকু হয়ে যায় অন্ধকার। শীলা ছুটে গিয়ে দাঁড়াল জানালার ধারে—দেখে ওদের সহজ সরল খেলা। অদূরে সব-জজ গৃহিণীকে ঝড়ের বেগে আসতে দেখে ওর প্রাণ হঠাৎ কেঁপে ওঠে অজানা এক বিপদের আশঙ্কায়। সাব-জজ গৃহিণী এসেই, 'আ, মরণ আর কি,' বলে দীপকের হাত ধরে সজোরে গাড়ী থেকে নাবিয়ে দিলেন আর সাবধান করে দিলেন তার ছেলেকে দীপকের সঙ্গে না মিশতে—বললেন, 'ওরা ছোট লোক, পায়ে জুতো নেই, পরনে প্যাণ্ট নেই, গায়ের জামাটি অবধি ছিন্ন-ভিন্ন আর নোংরা—ওদের গাড়ীতে বসতে দিলে গাড়ী ময়লা হয়ে যায়।' হঠাৎ মুখটা একটু বাঁকিয়ে দীপককে লক্ষ্য করে বললেন—'পোড়ার মুখো ছেলে, ফের এদিকে এসেছ কি মরেছ—বলি, ভাত জোটে না গাড়ী চড়তে চাও কোন্ মুখে? ভিখিরীর অত সখ কেন?'

দীপকের শিশু-মনে এ সবের মর্ম্মার্থ ধরা পড়ে না—সে শুধু বোঝে সে অপরাধী—গাড়ী চড়া তার অপরাধ। সে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। শীলা রায়-গৃহিণীর এতাদৃশ অভিনয়ে মুস্‌ড়ে পড়ে—তার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের ঝাঁঝ শীলার অন্তস্থলকে আহত করে।

দীপক হতাশ হয়ে বাড়ী ফেরে—শীলা ছেলেকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গিয়ে বেশ দু'ঘা বসিয়ে দিয়ে বললে—'ও বাড়ীমুখো হবে আর দুষ্টু ছেলে?'

খোকার হাস্যোজ্জ্বল কচি মুখখানি হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসে—মা বোঝে বর্ষণ আসন্ন।

দীপক কেঁদে উঠে—'না আল্ যাবো না।'

সন্তানের কান্না মায়ের বুকে কষাঘাত করে—সে ভাবে, 'কেন পরের ওপর অভিমান করে এমন সোনার চাঁদের গায়ে হাত তুললাম?' খোকার কান্না থামে না। শীলা আর থাকতে পারে না—সে ছুটে এসে খোকাকে বুকে নিয়ে বসে, 'এই জন্মদুঃখিনীর কোলে কেন এসেছিলি বাবা? তোর বাপ মা যে বড় গরীব রে খোকা।'

শীলার চক্ষু দুটি ছল্ ছল্ করে ওঠে।

অপিসের অবিশ্রান্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর অসিত বাড়ী ফেরে। বাপকে দেখে খোকার কান্না প্রহারের অনুপাতে বাঁধভাঙ্গা জলের মত বেড়েই চলে। অসিত দীপককে বুকে জড়িয়ে ধরল—শীলা স্বামীকে সব ইতিহাস খুলে বলল। অসিত ভাবে, 'জীবনের সর্ব্ববিধ সুখ সৌভাগ্যের উচ্চশিখর যাদের ভাগ্যে জুটেছে—ভূপৃষ্ঠের আলো-হাওয়া-বর্জ্জিত অন্ধকূপবাসীদের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার কটাক্ষ তো তারা করবেই। সবহারাদের বুকভাঙ্গা করুণ ক্রন্দন তাদের কঠিন অন্তরকে স্পর্শ করবার পথ পাবে কোথা থেকে?'

খোকা নালিশ করে, 'বাবা মা আমায় মেলেছে।'

মা হেসে ওঠে—

বাপ বললে—'যেমন দুষ্টুমি করে ওদের গাড়ী চড়তে গিয়েছিলে।'

খোকা বায়না ধরে, 'বাবা, আমায় গাড়ি দাও।'

অসিত সান্ত্বনা দেয়, 'তুমি কেঁদ না—মাইনে পেলেই তোমায় একখানা ওদের মত গাড়ী এনে দেব।'

খোকার কান্নার বেগ ক্রমে কমে আসে।

মানুষের কখন যে কী হয় বলা যায় না। তার চলার পথে চলেছে নিত্য ভাঙ্গাগড়ার অশান্ত খেলা—কখনো হাসি কখনো কান্না—এরই মধ্য দিয়ে চলেছে তার জীবনের রথ।

ক'দিন থেকে খোকার গাটা একটু গরম হয়েছে, শীলা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বাপ ভাবে, 'না, জ্বর এমন বেশী কিছু নয়।'

মা ভাবে, 'হয়ত আমাবস্যার যোগটা কেটে গেলেই জ্বরটা ছাড়বে।'

এমনি করে কেটে যায় দিন দু'তিন। খোকার জ্বর এদের জীবন-নাট্যে বিরাট একটা ওলট-পালটের সূচনা করে জ্বর ক্রমে বেড়েই চলল। শীলার বুকে অনুতাপের তুফান ওঠে। খোকার গায়ে হাত রাখতেই শীলা চমকে ওঠে, 'ইস্, গা'টা যে একেবারে ফেটে যাচ্ছে। বলি, ডাক্তার-বদ্যি ডেকে একটা ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হয়।'...

পরদিন অসিতের বন্ধু অনাথ ডাক্তারকে ডাকা হলো। সে আজ বছর চার হলো হোমিওপ্যাথিতে এই অঞ্চলে চিকিৎসা করছে। দিন চার-পাঁচ কেটে গেল, কিন্তু জ্বর কমে না। অসিত আপিস থেকে এসেই খোকার শিয়রে গিয়ে বসে—কপালে হাত দিয়ে জ্বরের উত্তাপ অনুভব করে। শীলা খোকার কপালের ওপর ঝুলে-পড়া রুক্ষ কয়েকগাছি চুল ধীরে ধীরে সরিয়ে দিতে দিতে বলে, 'কই গো, ওষুধপত্রে তো কিছু হচ্ছে না।'

খোকা বাপকে দেখে বলে, 'বাবা, আমাল গালি কই ?'

অক্ষমতার দুঃসহ বেদনায় অসিতের বুকটা টন্ টন্ করে ওঠে—দু-চোখ দিয়ে অজ্ঞাতে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে—সে কথা কইতে পারে না।...

শীলা রাত্রে ঘুমন্ত শিশুর শিয়রের পাশে বসে তার মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকে। খেই-হারা কত চিন্তাই যে তার মাতৃহৃদয়কে তোলপাড় করতে থাকে।

সকালে ডাক্তার এলে অসিত বলল, 'খোকার জ্বর তো দিন দিন বেড়েই চলেছে—কাল রাত্রি থেকে খুক-খুক করে কাসছে।'

অনাথ ডাক্তার খোকার বুক পরীক্ষা করে বলল, 'একটা দিকে দোষ পাওয়া যাচ্ছে, তা ভাই, তুমি, এক কাজ কর, সারদা ডাক্তারকে একবার ডাক,—হাজার হ'লেও প্রবীণ চিকিৎসক তো বটেই।'

অসিতের চিন্তা বেড়ে যায়। সে অনাথকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে।

অনাথ বলল, 'ভয়ের কিছু নেই ভাই, তেমন গুরুতর কিছু নয় ; তবে হার্টটা বড্ড দুর্ব্বল।'

ডাক্তারের সান্ত্বনা দেবার মিথ্যা প্রচেষ্টা অসিতের কাছে ধরা পড়ে। ডাক্তার চলে যায়।...

অসিত ভাবে, 'মানুষের জীবনে এক-একটা সময় আসে যখন তার ঘুমোবারও অবসর মেলে না। একে সারাদিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, দ্বিতীয়তঃ খোকার অসুখের ভাবনা, তায় আবার অর্থচিন্তা। মাসকাবারের শেষ—এদিকে হাতেও কাণা-কড়ি নেই—। কাল সোমবার মাস পয়লা—কাল মাইনে পাব।'

শীলা এসে পাশে দাঁড়ায়। অসিতের চিন্তা বহির্জগতের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—সে আপন মনে ভেবেই চলে, সত্যিই কি অভিশপ্ত জীবন নিয়েই আমরা পৃথিবীতে এসেছি—দিনের পর দিন ছেলেটার অবস্থা খারাপ হয়ে চলেছে—অথচ ভাল ডাক্তার দেখাবার বা দু-ফোঁটা ওষুধ দেবার মত সামর্থ্য আমাদের নেই।' অক্ষমতার বেদনা তার বুকে অসহনীয় হয়ে ওঠে—সে আর ভাবতে পারে না,—তার মাথার ভেতর সব এলোমেলো হয়ে যায়। শীলাকে হঠাৎ পাশে দেখতে পেয়ে বলে, 'দ্যাখো, ভগবান করেন, আজকের রাত্তিরটা নির্ব্বিঘ্নে কাটে তা হ'লে কাল মাইনে নিয়ে ফিরবার পথেই সারদা ডাক্তারকে ডেকে আনবো।'

শীলার চোখে-মুখে বেদনার কালো ছায়া নেমে আসে—সে ভাবে, 'হায় আজ যদি আমার দু-একখানা গয়নাও থাকতো—।'

অজ্ঞাতে চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে। পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে স্বামীকে বললে, 'তা ছাড়া আর উপায় কি ? ডাক্তার আনতে হলে তো ভিজিটের টাকা আগেই জোগাড় করা চাই।'

অসিতের চক্ষু ছল্ ছল্ করে ওঠে—সে আর দাঁড়াতে পারে না—ছুটে গিয়ে রোগীর শিয়রে বসে।

...নিয়তি দেবী অলক্ষ্যে হাসেন।...ক্রমে গোধূলির আবছা অন্ধকার সারা দুনিয়াটাকে গ্রাস করে। শীলা হৃদয়ের সমস্ত বাসনা রাধামাধবের শ্রীচরণে ঢেলে দিয়ে দীপকের মঙ্গল কামনা করে। দেখতে দেখতে সারা দুনিয়া গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যায়। বাপ-মা সারারাত্রি

সন্তানের শিয়রে জেগে বসে থাকে—চোখে তাদের এতটুকু তন্দ্রা আসে না।...

আশু বিপদের সম্ভাবনা বুঝি সব মানুষই কম বেশী বুঝতে পারে। তাই আসিতের আজ অপিসে যেতে পা সরে না—অথচ তাকে যেতেই হবে—আজ যে মাস-পয়লা—মাইনের দিন—মাইনে পেলে খোকাকে বড় ডাক্তার দিয়ে দেখান হবে। তাই যেতে হ'ল তাকে—কিন্তু মন রেখে গেল খোকার শিয়রে। শীলা স্বামীর অনুপস্থিতে এক তিলও সন্তানের পাশ ছেড়ে নড়ে না।...

নিদাঘতপ্ত বৈশাখী মধ্যাহ্নের গুমোট গরমে ধরিত্রী যেন 'জল জল' করে ছট্‌ফট্‌ করছে। অদূরে শুক্‌নো আমগাছটির ওপরে বসে একটি কাক কা—কা করছে।

দুপুর হ'তে দীপকের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হ'তে আরম্ভ করল। অজানা কোন্ অনির্দ্দেশ্য পরপার হ'তে মৃত্যুর নির্ম্মম হস্ত এগিয়ে আসছে তার অভিষ্টকে ছিনিয়ে নিতে।...

বৈকালে পশ্চিমের আকাশ অন্ধকার করে আসে—কালো কালো মেঘ দেখা যায়, গুড়্‌গুড়্ করে মেঘ ডাকছে।

আপিস হতে বেড়িয়ে পড়ে অসিত। অন্ধকার আরও নিবিড়—আরও ভীষণ হয়ে ওঠে। ঝড়ের ঝাপ্টা এসে অসিতেকে যেন তাড়া করে। নাকমুখে ক্রমাগত ধূলা-বালি ঢুকে নিঃশ্বাস তার বন্ধ হবার উপক্রম হল। কিন্তু অন্তরের আহ্বান যখন প্রবল হয় তখন বহির্জ্জগতের প্রতি কোন খেয়ালই মানুষের থাকে না। তাই আসিত ঝড়ের বেগে ছোটছে—তার গতি অপ্রতিহত—তার দৃষ্টির সামনে শুধু খোকা—আর খোকা।...

শীলা স্বামীর নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় সময় গণছে ; উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে যতদূর তার দৃষ্টি যায়—কিন্তু কাকেও দেখতে পায় না—আবার খোকার পাশে এসে বসল, ভাবল, 'মাইনে নিয়ে ডাক্তার ডেকে বাড়ী ফিরবে, তা একটু দেরী হবে আসতে।' নাঃ, সে আর বসে থাকতে পারে না—তার মনে হয় সময়ের স্রোত আজ যেন তাকে উপহাস করে মন্থর গতিতে চলেছে—অধীর ভাবে সে এক বার জানালায়—এক বার খোকার শিয়রে—এক বার ঘরে পায়চারী করতে লাগল।

বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য সমানভাবেই চলছে—দূরে কয়েকটি প্রকাণ্ড গাছ সে দাপটে মাটিতে নুয়ে পড়ে হার মানে।

খোকার গলার মধ্যে একটা অব্যক্ত ঘর্ ঘর্ শব্দ ওঠল—কয়েক বার পাংশু-বিবর্ণ মুখে মায়ের মুখের পানে অর্থশূন্য ভাবে তাকায়। মায়ের কোমল মাতৃহৃদয় সে চাহনিতে তোলপার করে ওঠে—শীলা দিশেহারা হয়ে যায়। হঠাৎ খোকার নয়নতারা ঊর্দ্ধে ওঠে—একেবারে নিশ্চল হয়ে পল্লবের নীচে লুকিয়ে গেল। একটা দুরন্ত ক্রন্দনাবেগ কাঁপিয়ে তুলল শীলার সারা দেহকে।...

বাইরে প্রকৃতির উন্মা। মাতামাতি তখন কমে আসছে। বৃষ্টি পড়ছে খুব অল্প।...অসিত ডাক্তারকে সঙ্গে করে বিদ্যুৎবেগে ঘরে ঢুকল—অশ্রুসিক্ত অনিমেষ দৃষ্টিতে শীলা চেয়ে আছে—অসিতের সমস্ত হৃদয় ভেঙ্গে-চুরে কান্না ঠিক্‌রে বেরোয়—সে খোকার নিষ্প্রাণ দেহকে জড়িয়ে ধরে—। তাদের বুকফাটা কান্নায় সারা বিশ্বকে যেন কাঁপিয়ে তুলল।

নিদারুণ রিক্ততাই হয়ে ওঠে এদের জীবন-পথের অবশিষ্ট পাথেয়—।

কবির সন্ধানে

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

মধ্যাহ্নের সেই দীপ্ত রবি উঠ্‌বে ভেসে আঁখির 'পরে,
যখন আমার মায়ার বাঁধন টুটবে তোমার বীণার স্বরে।
শ্রান্তি আমার শান্তি হবে একটুখানি দৃষ্টিদানে—
আমার মর্ম্মের সকল ব্যথা ঘুচবে তোমার স্পর্শে প্রাণে।

সেই গোধূলির পথে, কবি,
চলেছ যে জীবন-পারে,
পাবো কি গো দেখা তোমার
মরণ-দেশের তোরণ-দ্বারে।

মাছের চাষ ও মৎস্য-শিল্প

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সেন

দুই বেলা মাছ না হইলে বাঙ্গালীর আহারে তৃপ্তি হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যেই দুই বেলা তো দূরের কথা রোজ একবেলাও মাছ জোটে না শুধু মাছের অভাবের জন্য। আমাদের মধ্যে শতকরা পঁচাশী জনই মৎস্যাশী। কিন্তু বাংলার জেলেদের অন্ন জোটে না। বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার প্রভৃতি দেশে, বরোদা, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে সরকারী মৎস্য-বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাছের চাষের ব্যবস্থা আছে। অথচ ঐ সকল অঞ্চলের তুলনায় বাংলা দেশে মৎস্যাশী লোকের সংখ্যা অনেক বেশী।

বাংলার ভৌগোলিক পরিস্থিতি, দক্ষিণ ও পশ্চিম মৌসুম বায়ুযুক্ত আবহাওয়া মাছের পক্ষে অনুকূল। এইজন্যই বাংলাদেশে এমন কয়েক শ্রেণীর মাছ পাওয়া যায় যেগুলি শুধু বৎসরের একটা নির্দিষ্ট সময়েই বাংলার নদীগুলিতে প্রবেশ করে। বাংলা নদীমাতৃক দেশ। সমুদ্রের সহিত যোগাযোগও খুব ঘনিষ্ঠ। বিশেষজ্ঞগণের মতে বাংলার খাল, বিল প্রভৃতির সহিত নদীর সংযোগ থাকায় এইগুলি মাছের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বাংলাদেশে খাদ্যোপযোগী প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর রকমের মাছ পাওয়া যায়। সমগ্র ভারতে প্রায় এগার শত প্রকারের মাছ আছে। কোন কোন জাতীয় মাছ নোনাজলে এবং কোন কোন জাতীয় মাছ মিঠাজলে বাস করে। মাছের চাষ এবং মৎস্য-ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে মাছের আহার-বিহার প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যও অপরিহার্য্য। বাঙ্গালী আমরা মিঠাজলের মাছই বেশী পছন্দ করি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এবং চীন ও জাপানের লোকেরা মিঠা ও নোনা উভয় জলের মাছই আহার করে। ইংরেজগণ নোনাজলের মাছ ছাড়া মিঠাজলের মাছ আহার করেন না।

বাংলাদেশে মাছের অভাব দেখা দেওয়ার কারণ সম্পর্কে বাংলা গবর্ণমেণ্টের মৎস্য-বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম, আর নাইডু বলিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাছের চাষ না হওয়া, ছোট ছোট মাছ ও ডিমপূর্ণ মাছ ধরার ফলে বাংলার নদী-নালা, খাল-বিলগুলি ক্রমেই মৎস্যশূন্য হইয়া পড়িতেছে। বাংলায় যে-কোন সময় এবং যে-কোন জলাশয় হইতে মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে। এমন কি মৎস্য-ব্যবসায়িগণ ডিম্বরেণু পর্য্যন্ত নানাস্থানে চালান দিয়া থাকেন। ফলে এণ্ড্রোমাস জাতীয় মাছ ছাড়া নদীজাত মাছের অভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। যে-সকল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নদীজাত মৎস্য বাংলাদেশে বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই বাংলার বাহির হইতে আমদানী করা হয়। ১৯১৭-১৮ সাল হইতে ১৯২১-২২ সাল পর্য্যন্ত কি পরিমাণ মৎস্য কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল।

সন	মাছের পরিমাণ	আনুমানিক মূল্য
	মণ	টাকা
১৯১৭-১৮	৩০১২৫৮	৪৫১৮৮৭০
১৯১৮-১৯	৩০৬০৩৭	৪৫৯০৫৫৫
১৯১৯-২০	৩১২৯৭৫	৪৬৯৪৬২৫
১৯২০-২১	৩৭০১৩৯	৫৫৫১৭৮৫
১৯২১-২২	৪১৭৬৮৪	৬২৬৫২৬০

বাংলাদেশের মৎস্যাভাব দূর করিতে হইলে যে-কোন সময় এবং যে-কোন জলাশয় হইতে মাছ ধরা বন্ধ করিবার জন্য আইন প্রণীত হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে মাছের চাষ ও ব্যবসা আবহমান কাল হইতে একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে এদিকে অগ্রসর হইবার কোন চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আমরা যাহাকে মাছের চাষ বলি এবং বাংলায় যে ভাবে মাছের ব্যবসা পরিচালিত হয় তাহা মৎস্য-চাষ ও ব্যবসার কলঙ্কস্বরূপ। মৎস্য-চাষের প্রাথমিক

এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশটিই আমরা বাদ দিয়া থাকি। বাংলার মৎস্যচাষিগণ যে স্থলে মনে করেন যে, মাছের চাষ সর্ব্বাঙ্গীনরূপে সম্পন্ন হইল, অন্যান্য দেশের মৎস্যচাষিগণ তখনই প্রকৃতপক্ষে মৎস্য চাষের কাজ আরম্ভ হইল বলিয়া মনে করেন।

পুকুরে কি করিয়া মাছের ডিম প্রসব করাইতে পারা যায় সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের মৎস্যচাষিগণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নদীতে যে-ডিম্ব-রেণু পাওয়া যায় মৎস্যচাষিগণ তাহা সংগ্রহ করিয়া মৎস্য সংরক্ষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পুকুরে ছাড়িয়া দেয়। এইটুকু কাজ করিয়াই তাহারা মনে করে—পুকুরে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পালন করিতেছি এবং শীঘ্রই পুকুর মৎস্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। কাহারও কাহারও ডিমের জন্য পৃথক পুকুর থাকে, কিন্তু পুকুরে যে মিশ্রিত ডিম্বরেণু ছাড়া হইতেছে এবিষয়ে খেয়াল তাহাদের থাকে না। তাছাড়া ডিম এবং পোনা মাছ ছাড়িবার পূর্ব্বে যে পুকুরে মৎস্য-ভুক্ হিংস্র মাছ বা হিংস্র জীব শূন্য করা প্রয়োজন তাহাও কেহ বিচার করিয়া দেখে না। পুকুর কখনও সংস্কার করা কিম্বা পঙ্কোদ্ধার করা হয় না। পুকুরের তলদেশে মাছের স্বাস্থ্যহানিকর কর্দ্দম ও আবর্জ্জনা জমা হইয়া থাকে। এইগুলি পরিষ্কার করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। আমাদের দেশের মৎস্যচাষিগণ যে-পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিতেছেন ততদিন তাহাদের মাছের চাষে লাভবান হওয়ার আশা বৃথা। গোপালন ও পাখীপালন অপেক্ষা মাছের চাষ কম লাভজনক নহে।

বাংলাদেশে মাছের চাষ, মৎস্যব্যবসায় এবং মৎস্য-শিল্প সর্ব্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত ব্যবসা। এ সম্বন্ধে শিক্ষা দিবারও কোন ব্যবস্থা এদেশে নাই। এ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার আগ্রহ কাহারও থাকিলে মৎস্য-ব্যবসা বা মৎস্য-শিল্প সম্পর্কে দুইএকখানা পুঁথিপুস্তক পাইলেই নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করিতে হইবে। কিন্তু পুথিগত বিদ্যার জোরে মাছের চাষ, মাছের ব্যবসা বা মৎস্যশিল্পে উন্নতি করা যায় না।

সমস্ত নদী বা জলাশয়ের মাছ সমান স্বাদ-বিশিষ্ট হয় না। ফুলছড়ি বা সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের যমুনার রোহিত মৎস্য দেখিতে যেমন মনোরম এবং খাইতে যেমন সুস্বাদু তেমনটি অন্যত্র কদাচিৎ দেখা যায়। নদী বা পুকুরের জলে খাদ্যের প্রাচুর্য্য এবং মাছের স্বাস্থ্যের পক্ষে জলের অনুকূল অবস্থার উপর মাছের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মাছের গতিবিধির স্বাধীনতার উপরেও তাহাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, রোহিত মৎস্য যদি পুকুরে ডিম পাড়ে, তাহা হইলে সেই ডিম হইতে জাত মাছ নদীর স্বাধীন রোহিত মাছের ডিম হইতে উৎপন্ন মাছ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। চিতল, সিলোন, বোয়াল, আইড়, পাবদা, ভাংনা, খয়রা মাছ স্থির ও মিঠা জলে থাকিতেই পছন্দ করে। আবার জিয়ল কৈ, মাগুর প্রভৃতি মাছ অপরিষ্কৃত ও জঙ্গলাকীর্ণ জলই পছন্দ করে বেশী। এই সকল মাছ বর্ষার জল না পাইলে ডিম ছাড়ে না। কিন্তু মৌরলা প্রভৃতি মাছকে বৎসরে দুইবার ডিম পাড়িতে দেখা গিয়াছে।

বাংলা দেশে মাছের চাষ ও ব্যবসার একটা বিরাট ক্ষেত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু আমরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছি না। ডাঃ নাইডু বলিয়াছেন, "মাছের চাষের বিরাট ক্ষেত্র ও উহার যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাঙ্গালী ইহাকে চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে।"

সংরক্ষণের ব্যবস্থার অভাব এবং অনেক স্থলে বিক্রয় করিবার বাজার না থাকায় প্রচুর মাছ নষ্ট হইয়া যায়। কোন কোন স্থলে ঐগুলিকে শুকাইয়া রাখা হয়। মাছ শুষ্ক করিবার পূর্ব্বে উহার মাথা কাটিয়া এবং নাড়ীভূড়ী বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। আমাদের দেশে মাথা ও নাড়ীভূড়ীগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইগুলির যে অর্থকরী সার্থকতা আছে তাহা আমরা জানি না বা জানিলেও উপেক্ষা করি। মাছের মাথা হইতে উৎকৃষ্ট সার এবং নাড়ীভূড়ী হইতে তৈল উৎপন্ন হইতে পারে। বাংলা দেশে প্রতিবৎসর বহু হাঙ্গরের যকৃৎ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কড মাছের যকৃতে যে পরিমাণ 'ক' খাদ্যপ্রাণ আছে বাংলার নদী ও সমুদ্রে প্রাপ্ত হাঙ্গর মাছের যকৃতে তদপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক 'ক' খাদ্যপ্রাণ আছে। সুতরাং হাঙ্গর মাছের যকৃত হইতে

কডলিভার অয়েল অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক মূল্যবান তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। অন্যান্য মাছের তৈল ষ্টীল টেম্পারিং করিবার নিমিত্ত, পাটের সাধারণ লাল আভা ও চামড়া ট্যান করিবার নিমিত্ত, সাবান, পেইণ্ট, গ্রীজ, কীটপতঙ্গ বিনষ্টকারী ঔষধ প্রভৃতির উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মাছের গুয়ানোতে (fish-guana) প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন এবং ফস্‌ফরিক এসিড আছে। সার হিসাবে ইহা অতুলনীয়। মালাবার-সমুদ্র-উপকূলে প্রতিবৎসর প্রায় তিন-চার হাজার টন মাছের গুয়ানো তৈয়ার হয়। উহার মূল্য পাঁচ-সাত লাখ টাকার কম নয়। বাংলাদেশে উহার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দক্ষিণ কানাডা এবং মালাবার হইতে উহা আমদানী করা হইয়া থাকে।

মাছের চাষের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তার চাষ ও ব্যবসা অপরিহার্য্য। পারস্য উপসাগর হইতে প্রতিবৎসর বহু লক্ষ টাকার মুক্তা আমাদের দেশে আমদানী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরে উৎকৃষ্ট মুক্তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। কক্স-বাজারের নিকট সমুদ্রের এক অংশের নাম 'মুক্তাছড়া'। সমুদ্রের এই অংশ মুক্তার জন্য বিখ্যাত ছিল। পূর্ব্বে স্কুলপাঠ্য পুস্তকেও বঙ্গোপসাগরের মুক্তার কথা উল্লিখিত হইত। বঙ্গোপসাগরে যে মুক্তা পাওয়া যায় অনেকেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। এখনও বঙ্গোপসাগরের কোন কোন স্থানে মুক্তা পাওয়া যায়।

বাংলায় ২১১টি যৌথ কোম্পানী এ বিষয়ে অগ্রগণ্য হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ও অর্থের অভাবে তাহারা উপযুক্ত পথ ধরিতে পারিতেছেন না। আমাদের মতে প্রথমতঃ বিশেষ ভাবে মৎস্য-পালন বিষয়ে মন দেওয়া উচিত; কারণ ইহাতে কম মূলধন প্রয়োজন। যাঁহারা বিরাট ভাবে এই ব্যবসা করিতে চান তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যাবলী পাঁচটি ভাগে বিভাগ করিবেন। প্রথম বিভাগে মৎস্য-পালন অর্থাৎ মাছের চাষ। দ্বিতীয় বিভাগে বিক্রয়-ব্যবস্থা। তৃতীয় বিভাগে সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের ব্যবস্থা। চতুর্থ বিভাগে মৎস্য-সংরক্ষণ ও রপ্তানী। পঞ্চম বিভাগে মাছের চাষ ও শিল্প বিষয়ে গবেষণা। প্রথমতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্যারম্ভ করাই উচিত।

বাংলায় এই শ্রেণীর একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান দরকার। এমনি একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া সাফল্য লাভ করিতে হইলে বাংলা সরকারের সাহায্য যেমন আবশ্যক বাংলার জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতিও তেমনি বিশেষ প্রয়োজন। বাংলার জমিদারগণ ব্যবসায়ী নন, তবু ইদানিং তাঁহারা দেশের শিল্পোন্নতির দিকে মন দিতেছেন, এটা শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। বাংলার জলজ সম্পদের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীর সহানুভূতির বিশেষ প্রয়োজন।

এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে যথেষ্ট অর্থাগম হইতে পারে। একমাত্র মৎস্য-পালন ও মৎস্য-শিকার দ্বারাই শত-করা পাঁচ শত টাকা আয় হইতে পারে। সামুদ্রিক মৎস্য শিকারেও যে যথেষ্ট আয় হয় তাহা অন্যান্য সভ্য জগতের লোক যে পরিমাণ আয় করিতেছে বা করিয়াছে তাহা দেখিলেই বোঝা যায়। ভারতে মাদ্রাজের ফিসারী বিভাগ কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাহাদের সফলতার একটা হিসাব নিম্নে দিলাম :—

খরচ

চক ফিসারী সমূহ	পরিমাণ টাকা	
টীনেভ্যালী	১০৭৬১/৮	পাই
রামানদ	২৯৭০১৲২	,,
শিবগঙ্গা	০০২৪২/০	
বেচিডিমার ফিসারী	০০,৯৫০।৯	,,
১৯১৩-১৪ সালে রামানদ চক ফিসারী ১৫ বৎসরের জন্য ইজারা নেওয়া হয় এবং উহার ছয় বৎসরের খাজনা এই সময় দেওয়া হয়।	৪,০০০৲	
তত্ত্বাবধানের খরচ	৬,৭৮০/১১	পাই
অবশিষ্ট নীট লাভ	৮২,৬১০॥/৭	,,
মোট	১৩৯,৭০৩/২	পাই

আয়

যে সমস্ত ফিসারী হইতে মাছ ধরা হইয়াছে তাহার আয়।	পরিমাণ টাকা	
টীনে ভ্যালা	৪৮,৫৪০৸৴২	পাই
রামানন্দ	৭২,৬৭১।৴০	,,
শিবগঙ্গা	০০,৩৪২৴২	,,
মিলন	০৭,৮৬২৴২	,,
বেচিডিমার	০১,৫৫০।৶৫	,,
যে সমস্ত চকের খাজনা পাওয়া গিয়াছে।		
তানজোর বিভাগ	০৪,১০০৲	
দক্ষিণ আরকট বিভাগ	০১,৮৮৬॥৭	পাই
চিঙ্গলপট এবং নেলোর	৮০,৭৫০৲	
মোট	১৩০,৭০৩৷৶৴২	পাই

ইংরাজগণের খাদ্যোপযোগী সামুদ্রিক মাছ ধরা যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি টাটকা অবস্থায় বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রয় করাও কঠিন। এদেশের দীন দরিদ্র জেলেরা ক্ষুদ্র ডিঙ্গির সাহায্যে মৎস্য শিকার করিয়া থাকে। উপরন্তু মৎস্য শিকার করিবার যে জাল তাহারা ব্যবহার করে তাহাও সামুদ্রিক মৎস্য শিকার করিবার পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। উপযুক্ত জালের অভাবে বিশেষতঃ আধুনিক উন্নত প্রথায় মৎস্য শিকার করিবার শিক্ষার অভাবে অতি অল্প সংখ্যক মৎস্যই ইহারা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া ধরিয়া থাকে।

ট্রলার প্রভৃতি ছাড়া বর্ষার সময় মাছ ধরা মোটেই সম্ভব নয়। এ বিষয়ে স্যার কে, জি গুপ্ত একটি রিপোর্ট দিয়াছিলেন। তাঁহার রিপোর্ট প্রকাশের পর সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্য বাংলা সরকার একখানি ট্রলার আনিয়াছিলেন, কিন্তু জানি না কি কারণে পরে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ফলে ইংরেজগণের দৈনিক টাটকা মাছের চাহিদা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও বিলাত হইতে আমদানী করিয়া সরবরাহ করা হইয়া থাকে। বিলাত হইতেই বহু লক্ষ টাকার টিনে সংরক্ষিত মৎস্য এদেশে আমদানী করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া জাহাজের ঠাণ্ডা [illegible] করিয়াও যথেষ্ট সামুদ্রিক মৎস্য এদেশে আমদানী হয়। নিম্নে কয়েক বৎসরের আমদানীর পরিমাণ দিলাম।

বৎসর	শুষ্ক মৎস্য টাকা	টিনে সংরক্ষিত মৎস্য টাকা	মোট পরিমাণ টাকা
১৯২৫-২৬	৩০,৬৩৫	১,০৮,০৮২	১,৩৮,৭১৭
১৯২৬-২৭	৩০,৭৮১	২,০৪,৪৭৩	২,৩৯,২৫৯
১৯২৭-২৮	৭২,০৮৩	২,২১,৭২৪	২,৯৮,৮০৭

মাছের ব্যবসায় বরফের নিতান্ত দরকার। আমাদের দেশের জেলেগণ জল-বরফ ব্যবহার করে। কিন্তু অন্যান্য জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের জেলেগণ শুষ্ক বরফের প্রচলন করিয়াছে (Dry Ice)। কারণ কারবন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide) বৈজ্ঞানিক প্রথায় বরফে রূপান্তরিত করা হয়, সুতরাং ইহা গলিয়া তরল হয় না। এই জন্যই ইহার নাম Dry Ice। ইহা সাধারণ বরফ হইতে বহুগুণ কার্য্যকরী। এই জন্য মৎস্য ব্যবসায়িগণের বিশেষতঃ যাঁহারা বিরাট ভাবে এই ব্যবসা করিতে চাহেন তাঁহাদের Dry Ice Plant থাকা দরকার ও তাড়াতাড়ি টাটকা অবস্থায় মৎস্য সরবরাহের জন্য মোটর লঞ্চ ও লরী প্রয়োজন।

আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার চিংড়ি মাছ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, সিদ্ধ করিয়া, অথবা ধোঁয়ায় সেঁকিয়া সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী করা হয়। উপযুক্ত মত ও আধুনিক উন্নত প্রথায় সংরক্ষিত না হওয়াতে উহা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হয় না। রেঙ্গুনে যথেষ্ট মাছের চাহিদা আছে। রেঙ্গুনে প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ টাকার সংরক্ষিত মৎস্য (canned fish) আমদানী হয়। অথচ আমাদের দেশের চিংড়ি মাছ উপযুক্ত ভাবে রক্ষিত করিতে পারিলে (অথবা অল্প শুষ্ক করিয়াও সপ্তাহের পর সপ্তাহ সংরক্ষণ করা চলে) এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসাবে ব্রহ্মদেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানী করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া রন্ধন করিয়া টিনের কৌটায় কিম্বা কাচের পাত্রে মুখবন্ধ করিয়া সংরক্ষিত অবস্থায় উহা বিক্রয় করা যায়। এইরূপে সংরক্ষিত অবস্থায় ঘুষাচিংড়ির চাহিদাও বাজারে যথেষ্ট।

স্যামন, মুলেট, ভেটকী, প্রভৃতি মাছ টুকরা টুকরা

করিয়া ধোঁয়ায় অর্দ্ধশুষ্ক করিয়া টিনের কৌটায় পুরিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। বাংলায় বিলাতী বেগুন যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। বিলাতী বেগুনের রসেও ডুবাইয়া রাখিয়া এই মাছ উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে বিক্রয় করা যাইতে পারে। আধুনিক উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রথায় উপরোক্ত মৎস্যগুলি সংরক্ষণ করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে উহার মূল্য আরও যথেষ্ট বেশী পাওয়া যাইত। এমন কি ভারতের বাহিরেও উহা রপ্তানী করা চলিত।

যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাছের চাষ করা যায় তবে বাংলায় যে শুধু মাছেরই প্রাচুর্য্য হইবে তাহা নহে, এই ব্যবসায় বহু বেকার যুবকের অন্নসংস্থান হইবে। শুধু এই ব্যবসাতেই দশ সহস্র বেকার যুবকের অন্নসংস্থান করা সম্ভব।

দিব্য-দৃষ্টি

(গল্প)

শ্রীপ্রফুল্ল দেবী

আকাশ স্বচ্ছ নীল। মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। মণিকা জানালার পাশে ব'সে উদাস দৃষ্টিতে সেই দিকে চে'য়েছিল।

মা এসে বললেন—শাড়ী এনেছে, পছন্দ ক'রে দিয়ে যা তো মণি।

ব্যথিত দৃষ্টিতে মা'র দিকে চেয়ে মণিকা বললে—তুমিই পছন্দ কর গে মা, আমি ও পারব না।

মা গালে হাত দিয়ে বললেন—তুই অবাক করলি মণি, আমরা হলুম সেকেলে মানুষ, আমরা যা পছন্দ করব তা কি আজকালকার মেয়েদের মনে ধরবে? তারে চেয়ে তুই চট্ করে দেখে দিয়ে যা মা—।

মণিকার ব্যথিত দৃষ্টি এইবার অশ্রুতে ঝাপসা হ'য়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে বললে—তোমার পায়ে পড়ি মা, তোমরাই পছন্দ করগে, অপছন্দ আমার কিছুতেই হবে না।

মা কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে কন্যার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর থে'কে বেড়িয়ে গেলেন। যে মণিকা পাঁচ-শ শাড়ীর মাঝ থেকে নিজের মনের মত শাড়ী বেছে নিয়েছে, আজ কত দুঃখে যে সে শাড়ী দেখতে গেলনা, তা তিনি মায়ের প্রাণে ভাল করেই জানতে পেরেছেন।

* * *

প্রথম যৌবনে যখন মানুষ দুনিয়াটাকে উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিময় দেখে, সেই সময় মণিকার পিতা প্রকাশ বাবুর সঙ্গে বিনয় বাবুর বন্ধুত্ব হয়েছিল। তখন প্রথম কলেজে প্রবেশ করেছেন। দুইজনের বুকভরা তখন আনন্দের তুফান। সেই উদ্দাম আনন্দে পাল তুলে দিয়ে তাঁরা কত রঙিন নেশায় ভেসে যেতেন। উভয়েই ধনীর সন্তান। তাই অর্থাভাব কোন দিন তাঁদের হয় নি।

তারপরে ধীরে ধীরে তাঁরা সংসারজীবনে প্রবেশ করলেন। মণিকার মাতা বিমলা দেবী আর বিনয় বাবুর পত্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর মধ্যে যদিও সে রকম বন্ধুত্ব হ'ল না, তবু বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্মে উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটত।

প্রকাশ বাবু আর বিনয় বাবু অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হ'লেও তাঁদের পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। প্রকাশ বাবুর প্রকাণ্ড তেতালা বাড়ী বীডন ষ্ট্রীটে মাথা তুলে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে, বাড়ী-ভরা বয়, খানসামা, বাবুর্চ্চি—কিছুরই অভাব নাই। আলোকপ্রাপ্তা পত্নী বিমলা দেবী প্রতিদিন বিকেলে হুড-খুলে-দেওয়া মোটরে স্বামীর পাশে ব'সে হাওয়া খেয়ে যেতেন, দরকার হ'লে মার্কেটে গিয়ে নিজের পছন্দমত জিনিষ কিনে আনতেন। প্রকাশ বাবুর এ সব বিষয়ে অবাধ সম্মতি ছিল।

বিনয় বাবুর পরিবারিক জীবন ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। তাঁদের তিন পুরুষের ভিটে ভবানীপুরে—চক মিলান প্রকাণ্ড বাড়ী—দাস-দাসী, প্রতিপালিত আত্মীয়তে ভরা। স্থাপিত বিগ্রহ মদনমোহনের প্রতিদিন মহা সমারোহে পূজা-ভোগ সম্পন্ন হয়। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাপরায়ণা বধূ।

প্রকাশ বাবুর হ'ল দু'টি ছেলে, অজয়, কমল। আর সকলের ছোট মেয়ে মণিকা। বিনয় বাবুর পত্নী একটি জন্মান্ধ পুত্রকে জন্ম দিয়ে গভীর বেদনায় অঞ্চলে অশ্রু মুছলেন। কালের অপ্রতিহত গতিতে সংসারের চাকা ঘুরে ঘুরে যখন এসে থামল, প্রকাশ বাবু দেখলেন, তাঁর ভাগ্যে সুখের জায়গা কোথায় স'রে গিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গভীর দুঃখ। একে একে বীডন ষ্ট্রীটের প্রকাণ্ড বাড়ী, পৈত্রিক কোম্পানীর কাগজ, সমস্ত বিষয়-বিভব সব কোথায় উড়ে গিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ। ছেলেটি তখন বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়তে গিয়েছে। কন্যা মণিকার সেবার ম্যাটি ক পরীক্ষার বছর।

প্রকাশ বাবুর চোখের উপরের সব আলো যেন দপ ক'রে নিভে গেল। সম্মুখে ভেসে উঠল অসীম আঁধার। সে আঁধারে কোন দিক ঠিক নেই, কোন পথ নেই, কোন সীমা নেই।

চোখের জলে সব বিদায় দিয়ে তাঁরা এসে উঠলেন দু-খানা খোলার ঘরে। অসহনীয় দুঃখে অপরিসীম লজ্জায় চির দিনের বন্ধু বিনয় বাবুকেও কিছু জানালেন না। কলেজ থেকে বি-এ ডিগ্রী নিয়েছিলেন, কিন্তু কোন দিন অর্থ উপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন হইনি। আজ বুঝলেন, পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি কিছুতেই ধরা দেয় না—সব চেয়ে দরকারী স্বাবলম্বন।

দুঃখের আঘাতে তিনি একেবারে মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেন। সম্মুখের অস্তিত্ব সব তাঁর কাছে লোপ পে'য়ে গেল। শুধু সব আঁধারের মধ্যে ভীষণ বিভীষিকার মত সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইল কতকগুলি ঋণ আর পুত্রদের জন্যে মাসিক খরচ পাঠানর তাগিদ।

শরীর ভাল ছিল না ব'লে বিনয় বাবু মাস কয়েকের জন্যে স্ত্রীপুত্রসহ চেঞ্জে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে সবই জানতে পারলেন। খোঁজ করে প্রকাশ বাবুর নূতন ঠিকানা নিয়ে তাঁকে দেখতে এলেন।

বেলা প্রায় আটটা, প্রকাশ বাবু তখন তক্তপোষের উপরে জড়ান বিছানার সঙ্গে আধাশোয়া অবস্থায় রাস্তার ওপারের ত্রিতল অট্টালিকার পানে চেয়েছিলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে নোটবুক বের ক'রে তার সঙ্গে বাড়ীর নম্বর মিলিয়ে দেখে, বিনয়বাবু বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হ'য়ে গেলেন। এই কি সেই লাখ টাকার অধিপতি প্রকাশ রায়ের বাসস্থান? রাজাকেও তা হ'লে অদৃষ্টের ফেরে ভিক্ষায় নামতে হয়।

কণ্ঠ পরিষ্কার করে বিনয়বাবু ডাকলেন—প্রকাশ! যাঁর সান্নিধ্য কত বড় আনন্দদায়ক ছিল, আজ তাঁর আহ্বান প্রকাশবাবুর অন্তরে প্রবল বিপ্লব বাঁধিয়ে তুলল। দুই হাতে তিনি মুখ ঢেকে ফেললেন। দরজা খুলে দিয়ে মণিকা ডাকলে—আসুন কাকাবাবু।

ঘরে প্রবেশ করে বিনয় বাবু বুঝতে পারছিলেন না যে তিনি জেগে আছেন কি স্বপন দেখছেন।

ছোট ঘরের মধ্যে কতকগুলি জিনিষ ঠাসাঠাসি ভাবে পড়ে রয়েছে, তারই মধ্যে শোবার জন্যে কয়েকখানা তক্তপোষ পাতা।

প্রকাণ্ড ত্রিতল গৃহে সুন্দর মেহেগনি কা[illegible] খাটে যার শুভ্র শয্যা, চারিদিকে প্রচুর আলো হাওয়া, ইলেকট্রিক আলো, ফ্যান, বয়-খানসামা যাঁর তৃপ্তি বিধানের জন্যে সর্ব্বদা ছুটাছুটি করত, আজ তার একি অবস্থা।

দুই পাশের বড় বড় বাড়ীগুলি এই ছোট্ট বাড়ীখানার গলা যেন টিপে ধরেছে। সে সব তো হারিয়েছে, কিন্তু ভগবানের দেওয়া আলো হাওয়া থেকেও কি সে বঞ্চিত?

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি বিনয়বাবু স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। একখানি চেয়ার আঁচল দিয়ে মুছে সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে মণিকা বললে—বসুন কাকাবাবু।

দুই হাতে মুখ ঢেকে প্রকাশবাবু দুর্দ্দমনীয় অশ্রু রোধ করতে চেষ্টা করছিলেন। রান্নাঘরের কোণে ব'সে

মণিকার মা বিনয়বাবুর উপস্থিতি জেনে অনুচ্চ কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন।

বিনয়বাবু প্রকাশবাবুর পাশে বসে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—এত দুঃখ পেয়েছ আমাকে একটুকও কি জানাতে নেই ভাই, আমি কি তোমার এত পর?

অজস্র অশ্রুধারার মধ্যে যখন দুই বন্ধুর পুনর্মিলন হ'ল, প্রকাশ বাবুর অন্তরের গভীর বেদনা তখন অনেকটা হালকা হ'য়ে গিয়েছে।

যেখানে যা কিছু দেনা আছে, সব মিটিয়ে দিয়ে বিনয়বাবু যখন প্রকাশ বাবুকে সুন্দর ছোট একখানি দ্বিতল অট্টালিকায় তুলে নিয়ে এলেন, গভীর কৃতজ্ঞতায় বন্ধুর হাত দুখানি জড়িয়ে ধরে প্রকাশবাবু বললেন—আমাকে এত ঋণী ক'রে দিলে ভাই, এ জীবনে ত এ শোধ করতে পারবো না

হাসিমুখে বিনয়বাবু বললেন—ঋণ নয় ভাই, বন্ধুত্বের দাবী বল।

কাতর কণ্ঠে প্রকাশবাবু বললেন সেই—দাবীতেই ত এত নিলুম ভাই। কিন্তু কেবল নিতেই হবে দিতে কি কিছুই পারব না?

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে বিনয়বাবু বললেন—দিতে তুমি পার ভাই, আজ তোমার কিছু না থেকেও যা আছে, তা'তে আমার চে'য়ে তুমি ভাগ্যবান।

বেদনাপ্লুত কণ্ঠ থামিয়ে তিনি বাইরের পানে চেয়ে রইলেন। প্রকাশবাবুর চোখের উপরে একটা আলোর শিখা দীপ্ত হ'য়ে উঠল। নিবিড় ভাবে বন্ধুর হাত জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন—আমার মণিকাকে তুমি নেবে বিনয়? তুমি যা দিয়েছ তার তুলনায় অবশ্য এ কিছুই নয়।

আর্ত্তকণ্ঠে বিনয়বাবু বললেন—আমার যে অন্ধ ছেলে প্রকাশ, মণিকা আমার রূপে গুণে মন্দারের মালা, আমার অন্ধ ছেলের গলায় এ দিব কেমন করে।

প্রকাশবাবু বললেন—তাতে কিছু হবেনা ভাই, এই তার ভাগ্যলিপি ব'লে মেনে নিতে হবে। মহাভারতের পুণ্য উপাখ্যানে গান্ধারী যদি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে মালা দিয়ে থাকেন, রাজকুমারী সাবিত্রী যদি বনবাসী সত্যবানকে স্বামীত্বে বরণ করতে পারলেন, তবে কেন আমার মেয়ে তা পারবে না?

(২)

ফুটন্ত ফুলের মত মণিকার সর্ব্বাঙ্গে রূপের প্রভা ফুটে উঠেছিল। কিন্তু রূপের চেয়েও বেশী ফুটেছিল তার অন্তরের পরিমার্জ্জিত গুণগুলি। শিশুকাল থেকেই পিতার আদরে, স্নেহে, শিক্ষায় মানুষ হ'য়ে সে সবচেয়ে ভক্তি করত, ভালবাসত পিতাকেই।

পিতা যখন কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—আমার জন্যে তোকে দুঃখ পেতে হ'বে মা, কিন্তু এ ছাড়া যে উপায় নেই।

মণিকার সমস্ত হৃদ্‌পিণ্ডখানি কে যেন সবলে মুচড়িয়ে দিলে। মুখের রক্তিমাভ নিঃশেষে মুছে গিয়ে পাংশু রং সেখানে ফুটে উঠল।

অচেতনপ্রায় কন্যাকে কোলের মধ্যে টেনে এনে কেঁদে উঠে প্রকাশ বাবু বললেন—আমি যে মা, তোর হতভাগ্য বাবা, চেয়ে দেখ মা, এ নিয়ে লড়তে তোর বাবার জীর্ণ হৃদয়ে কত কষ্ট পেতে হ'য়েছে। সংসারের যত সাধআহ্লাদ মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছিলুম সব মরুভূমির বালুস্তূপের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। কেবল আমি শুধু আছি। বাকী জীবনের শেষ দিন কয়টি এই জীর্ণ পাঁজরের মধ্য দিয়ে যে নিশ্বাসগুলি বইবে, তা যে কতখানি যন্ত্রণাদায়ক তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝবার জন্যই ভগবান্ বুঝি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

পিতার করুণ আর্ত্তনাদে ব্যথিতা কন্যা পিতার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বললে—আমায় ক্ষমা কর বাবা, আমার মনে কোন দুঃখ হয়নি। এতদিন আমায় তুমি যে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুললে, তার সার্থকতা কি কিছুই আমার মধ্যে ফুটে ওঠেনি? জীবন শুধু ভোগ-বিলাসের জন্যে নয়, এটা অমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমার মেয়ে হ'য়ে সেই শিক্ষা সার্থক ক'রে তুলতে পারি।

শুভ দিনে গোধূলিলগ্নে প্রসাদের সঙ্গে মণিকার বিয়ে হ'য়ে গেল। শুভদৃষ্টির দৃষ্টি বিনিময় যদিও হ'ল না, তবুও লোকাচার মতে শুভদৃষ্টি করতে হ'ল। আলোকোদ্ভাসিত

প্রাঙ্গণে সুসজ্জিতা মণিকার সজল নেত্র যখন দৃষ্টিহীন প্রসাদের মুখের উপর নিবদ্ধ হ'ল, মণিকার চোখের উপরকার সব আলো যেন নিভে গিয়েছে। তার রত্নালঙ্কারখচিত কমনীয় তনুলতা, বিবাহসভার শত শত লোক যার পরে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে, প্রবল লজ্জার শিহরণে ব্যথিত হ'য়ে তা কেঁপে উঠল। আজ তার মনে হ'ল, বৃথা তার রূপকান্তি, বৃথা তার সজ্জা। নারীর মধুময় সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে শুধু স্বামীর নয়নতলে।

প্রসাদের সুকুমার ভাস্বর মূর্ত্তি হ'তে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার সময় মণিকা দেখতে পেল, স্বামীর অবরুদ্ধ চোখের পাতা একটু কেঁপে-উঠে তার কোণে জমে উঠেছে দু-ফোঁটা টলটলায়মান অশ্রু। মণিকার সমস্ত অন্তরটা টনটন ক'রে উঠল।

বরবধূবেশী প্রসাদ ও মণিকা যখন হাত ধরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সামনে এসে দাঁড়াল, প্রীতির উচ্ছ্বাসে তাঁর নয়ন থেকে অজস্র অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এই কি তাঁর দৃষ্টিহারা পুত্র? রূপকথার রাজপুত্রের মত কোন দেশ জয় করে এমন রাজকন্যার মত বধূ ঘরে নিয়ে এল? হায় রে, এই সঙ্গে যদি তার সারাজীবনের হারা দৃষ্টিও ফিরে পেত!

বহুদিনের একটা লুপ্ত স্মৃতি তাঁর স্মৃতিপথে ভেসে উঠল। তখন প্রসাদ ছিল কিশোর বালক, আর মণিকা তখন কলোচ্ছাসভরা ঝরণার মত ছোট একটি বালিকা। কি একটা উৎসবে সকলে একত্রিত হ'য়েছিলেন। প্রসাদের মা ব'সে মণিকার মার সঙ্গে গল্প করছিলেন, এমন সময় প্রসাদের হাত ধরে মণিকা এসে বললে—দেখুন কাকীমা, খেলতে গিয়ে প্রসাদ-দার খুব লেগেছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী চেয়ে দেখলেন দেওয়ালের কঠিন আঘাতে প্রসাদের সুগৌর ললাট নীল হ'য়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু তার ব্যথা সবটুকু ফুটে উঠেছে মণিকার মুখে। একটা সুন্দর আশা তাঁর মনকে উদ্বেলিত ক'রে তুলল, হায় রে, এমনি যদি একখানি নির্ভরশীল হাতে তাঁর দৃষ্টিহীন পুত্রকে সঁপে দিতে পারতেন।

ফুলশয্যার রাত্রে সমস্ত কক্ষ ফুলে ফুলময়। পিতলের পিলসুজের উপরে ঘৃতের প্রদীপ। একপাশে খাটের ওপরে ফুলের বিছানা শয্যা।

ফুলসাজে সজ্জিতা মণিকা এসে ধীরে ধীরে স্বামীর পাশে দাঁড়াল। বাইরে তখন জ্যোৎস্না সমস্ত ধরাকে প্লাবিত করে দিয়েছে। সর্ব্বাঙ্গে একটা স্বপনকুহেলী মেখে ঘুমন্ত বৃক্ষলতা ধরার বুকে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুদূরে কোন বৃক্ষের কোলে আলিঙ্গনাবদ্ধ কুহু দম্পতির ঘুমন্ত চোখে রূপসায়রের মৃদু হিল্লোল জাগ্রত পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিল, তাই তারা নিজেদের কলঝঙ্কারে ধরার বুকে সুরের ঢেউ খেলিয়ে দিচ্ছিল।

জানালার পাশে সোফার ওপরে প্রসাদ ব'সেছিল। প্রকৃতির সুখলীলা, তাণ্ডব প্রকৃতি কিছুই সে দৃষ্টি দিয়ে দেখে নাই, সব অনুভূত হ'ত তার অন্তরের সঙ্গে। কিন্তু আজ তার সমস্ত অন্তর গভীর কাতরতায় কেঁদে ফিরছিল। শুধু অন্তরের পরিচয়েই মন তৃপ্ত হয় না, সেখানে চোখের পরিচয়ও যে সে চায়।

পত্নীর মৃদু পদশব্দ তার অনুভব শক্তিকে পরাজিত করতে পারে নি, তাই সে বুঝতে পেরেছিল যে মণিকা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। হাত বাড়িয়ে মণিকার কোমল হাতখানি ধরে পাশে নিয়ে বসাল।

গভীর নিশীথে সুষুপ্তা প্রকৃতি সুখের আবেশে প্রণয়ীর কোলে ঢ'লে পড়েছে। প্রসাদের পাশে নবপরিণীতা পত্নী। তাদের অন্তর ভরে আকুল উচ্ছ্বাস কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠেছে; বাইরের বায়ুতরঙ্গ তা বহন করে পরস্পরের কানে ঢেলে দেয় নি।

ঘরের উজ্জ্বল প্রদীপ স্তিমিত হ'য়ে এল; বাইরের উদ্যানের পুষ্পগন্ধভরা একটা বায়ুহিল্লোল উভয়ের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেল। প্রসাদের হাতের মুঠিতে আবদ্ধ মণিকার হাতখানি একটু কেঁপে উঠল। স্নেহবিজড়িত কণ্ঠে প্রসাদ ডাকলে—মণিকা—

একটু মৃদু সাড়া দেওয়ার সঙ্গে মণিকার নমিত মাথাটি ধীরে ধীরে প্রসাদের বুকের কাছে হেলে পড়ল।

মুখে, মাথায়, গালে ধীরে ধীরে স্নেহপরশ বুলিয়ে, রুদ্ধ-কণ্ঠে প্রসাদ বললে—মণি, আজ হতভাগ্য হয়েও পৃথিবীর মধ্যে আমি সব চেয়ে ভাগ্যবান্। আমার মনে কি হচ্ছে

জান? ভগবান্ যদি শুধু একদণ্ডের জন্যে আমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেন, তা হ'লে তোমার মুখখানি দেখে নিয়ে আবার না-হয় চিরদিনের জন্যে অন্ধ হ'য়ে যেতুম।

দৃষ্টিহীন চোখের কোল দিয়ে জল গড়িয়ে ঝরঝর করে বুকের ওপর পড়ল। আবেগরুদ্ধ বুকের ওপরে ধীরে ধীরে মণিকার মাথাটি চেপে ধরল।

বাইরে তখন উজ্জ্বল ধরা আনন্দে মেতে গিয়েছে, ভিতরে দুইটি প্রাণী অসহনীয় শোকচ্ছ্বাস বুকে নিয়ে নির্ব্বাক হ'য়ে ব'সে আছে। উভয়ের মনের ভাষা মুখে ব্যক্ত করার শক্তি নেই. শুধু উভয়ের নয়নজলে উভয়ে সিক্ত হ'য়ে অন্তরে অন্তরে নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করছিল।

কতক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ধীরে ধীরে মণিকা বললে—কেন তুমি এত দুঃখ পাচ্ছ। পৃথিবীর সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েও যদি দুঃখ পাও নি, আমাকে দেখতে না পেয়ে কেন এত কষ্ট পাচ্ছ?

প্রসাদের অশ্রুধৌত মুখের ওপরে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল। সে বললে—পৃথিবীর কিছু দেখতে না পেলেও সবই আমি দেখি মণি, কিন্তু তা বাইরে নয় অন্তরে। জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলুম, এ সংসারে থেকেও আমি এ সংসারের জীব নই, তখন মনের মধ্যে ধীরে ধীরে আমি আলাদা একটি সংসার রচনা করলুম। বাইরে যখন উষার আগমন-বার্ত্তা মধুর কাকলীতে চারদিক ব্যাপ্ত হ'ত, ধীরে ধীরে আমার অন্তরে জেগে-উঠত স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল সুপ্রভাত। রাতের অন্ধকার দূর ক'রে কে যেন তুলির টানে টানে সেখানে রঙিন আলোতে ভ'রে তুলেছে। পাখীর অশ্রান্ত কলরব, আমার অন্তরকেও মধুর ঝঙ্কারে ভ'রে তুলত। তার পর, রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে যখন সমস্ত পৃথিবী অলস তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়েছে, বহু দূর থেকে চাতকের তৃষ্ণার্ত্ত স্বর, বায়ুর স্তরে স্তরে ভেসে এসে আমার কানে প্রবেশ করে, আমার কল্পনানেত্রে ভেসে ওঠে সেই নূতন মধ্যাহ্ন। রৌদ্রোজ্জ্বল আভায় শ্যামল গাছপালা কিছুই আমার মন থেকে বাদ যায় না। তার পর সন্ধ্যার স্নিগ্ধ হাওয়ায় গাছে গাছে সান্ধ্য ফুল ফুটে ওঠে, পুষ্পগন্ধভরা হাওয়া এসে আমার কানে কানে নূতন সন্ধ্যা রচনা করতে ব'লে যায়। আমার মানসনেত্রে জেগে ওঠে সুখের সন্ধ্যা। সবুজ পাতার কোলে কোলে থোকা থোকা ফুল ফুটে ওঠে। ফুলে ফুলে কাল ভ্রমর উড়ে বেড়ায়। প্রজাপতি তার রঙিন পাখা মেলে নেচে যায়। সায়াহ্নের অস্তমিত সূর্য্য পশ্চিমাকাশে লাল হ'য়ে তার পরে ধীরে ধীরে ডুবে যায়। ধীরে ধীরে রাত হ'য়ে আসে। আমার অন্তরের সঙ্গে পরিচিত হ'তে গভীর আঁধার এসে আমাকে ঘিরে ধরে। তারই মাঝে আমার বাইরের চোখের সঙ্গে অন্তরের চক্ষুও ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। এমনি করে রাতের পর দিন, দিনের পর রাত আমি এগিয়ে চলেছি।

উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত প্রসাদের মুখের পানে চেয়ে মণিকা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে মণিকা বললে—যেখানে তুমি একটি আলাদা রাজ্য রচনা করেছ, আমাকেও না হয় তারই এক কোণে স্থান দাও। ছোট বেলা থেকে যেমন অন্তরের রচিত রাজ্যে সুখী হ'য়ে বাস করেছ, আজও সেই সুখেই সুখী থাক, বাইরের নূতন অস্তিত্বে প্রবেশ করতে এসে নিজেকে দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে দিও না—এই আমার একান্ত অনুরোধ।

পত্নীর ললাটে গভীর স্নেহচিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়ে হাসি-মুখে প্রসাদ বললে—তাই হোক মণি, আমার অন্ধদৃষ্টির স্নেহধারায় অভিষিক্ত ক'রে, তোমাকেই করব সেই রচিত রাজ্যের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আজ আমার জীবনের বিফলতা দূর হ'য়ে গিয়েছে। আমি আজ হারাণো দৃষ্টির মধ্যেও দিব্য দৃষ্টি পেয়েছি।

বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী, এম-এ

বাঙ্গালা ভাষার গোড়ার দিকটা তমসাবৃত থাকলেও তাতে বহুলাংশে আলোকসম্পাত কোরেছে আমাদের ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, পালিভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থ, কতকগুলো শিলালিপি আর প্রাচীন মুদ্রা। এই সমস্ত মালমশলা থেকেই বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব কি কোরে হোল তা জানা যায়। সংস্কৃতের নিগড় ভেদ কোরে লৌকিক প্রাকৃত ভাষা একদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল—তখন যদিও এই প্রাকৃত ভাষাটাকে লোকে একটু ঘৃণার চোখেই দেখতেন; কিন্তু কে তখন জানত যে, অদূর ভবিষ্যতে এই ঘৃণিত প্রাকৃত থেকেই সৃষ্টি হবে এমন ভাষা যার শক্তিতে বলীয়ান হোয়ে কবিবর বিশ্বজগৎ জয় কোরে আনবেন বিজয়মাল্য।

প্রচীন ভারতের ইতিহাস থেকে জানা যায়, আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রবেশ কোরেছিলেন ভারতবর্ষে। প্রথমে যে শাখা ভারতে এলেন তাঁরা এসেই তাঁদের বসবাসের জায়গাটি স্থির কোরে নিলেন পঞ্চনদ-বিধৌত প্রদেশে। তখন হয়তো খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ শত শতাব্দী বা আরও বেশী। তখন যে-জাতি ভারতে বাস কোরতেন তাদের 'অনার্য্য' আখ্যায় অভিহিত করা হোলেও তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অনার্য্য ছিলেন না। তাদের জাতিটির নাম ছিল দ্রাবিড়। এই দ্রাবিড়গণও যথেষ্ট সভ্য ছিলেন। তাদের ভেতরেও যে একটা আভিজাত্য, একটা সংস্কৃতি, একটা রুচির বৈশিষ্ট্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় হরপ্পা আর মহেঞ্জোদড়োর আবিষ্কার থেকে।

এরাই আগে বাস কোরতেন পঞ্জাবে। কিন্তু খৃঃ পূঃ ১৫০০ (?) শতাব্দীতে আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ কোরলে এরা বাধ্য হোলেন পাঞ্জাবের চার দিকে ছিটিয়ে পড়তে। কেউ কেউ গেলেন হিমালয়ের পাদদেশে, কেউ বা এলেন বিন্ধ্যপর্ব্বতে, আবার এক দল দ্রাবিড় এল পূর্ব্ব দিকে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের এদিকে। আর্য্যগণ দ্রাবিড়দের পঞ্জাব থেকে হটিয়ে দিলেও তাদের ঘৃণা কোরতেন না মোটেই। বরং তাঁরা এই সমস্ত সভ্য অসভ্যদের সাথে মিলে মিশেই থাকতে লাগলেন। ফলে তখন ভারতে সৃষ্টি হোল একটা মিশ্র সংস্কৃতি আর মিশ্র ভাষার। আর্য্যগণ বৈদিক ভাষা এবং বৈদিক সভ্যতা নিয়েই এদেশে এসেছিলেন বটে, কিন্তু দ্রাবিড়দের সাথে মিশে বৈদিক সংস্কারটা গেল উড়ে, শুধু তাদের সম্বল রইল বৈদিক ভাষাটা—তাও আবার একটু মিশ্ররূপে। কারণ অতি প্রাচীনকালের আর্য্য-ভাষাতে যে ময়ূর, পূজন, কূট প্রভৃতি শব্দ দেখা যায়, ওগুলো প্রকৃতপক্ষে দ্রাবিরদের কাছ থেকেই ধার করা শব্দ। এমনি কোরেই মেলামেশার ভেতর দিয়ে হোল আর্য্য অনার্য্যদের সমন্বয় আর সেই সমন্বয়ের অমৃতময় ফল থেকে হোল একটা কথ্য ভাষার সৃষ্টি, যার নাম পণ্ডিতেরা দিলেন প্রাকৃত। এই প্রাকৃতই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সমস্ত ভারতীয় ভাষার মূল।—কিন্তু সেটা পরের কথা। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই আর্য্যগণ বেশ সুখেই কাল কাটিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাদে সুখস্বপ্নে প্রথম বাধা পড়ল, যখন আর এক দল আর্য এসে তাদের বসবাস স্থাপন কোরতে চাইলেন ওই পঞ্জাব প্রদেশেই। এই নবাগত আর্য্যেরা এলেন তাদের নূতন শিক্ষা, সভ্যতা নিয়ে—আর তাদের শক্তিও ছিল দুর্ব্বার। কাজেই পুরাতন আর্য্যের দল বাধ্য হোলেন পঞ্জাব থেকে তাদের অধিকার ছেড়ে দিতে। অনন্যোপায় হোয়ে তারা বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে পড়লেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। পুরাতন আর্য্যদের মধ্যে কেউ বা চলে গেলেন হিমালয়ের পাদদেশে, এক দল গেলেন কাশ্মীরের ওদিকে, তাদের ভেতর কতক গিয়ে বসবাস স্থাপন কোরলেন মহারাষ্ট্র প্রদেশে, দাক্ষিণাত্যে—আবার কেউ কেউ সরে এলেন পূর্ব্ব-ভারতে বাঙ্গালা আর আসামের এ-দিকটায়। এই রকম কোরেই পূর্ব্বতন আর্য্যদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে,

আর তাদের কথ্য ভাষাকে কেন্দ্র কোরেই গ'ড়ে উঠল ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি প্রাকৃত ভাষা। Hornle সাহেব এই পুরাতন আর্য্যদের নাম দিয়েছেন 'outer Aryans' এবং নবাগত আর্য্য, যারা ভিত্তি গেড়ে বসলেন পঞ্জাবে, তাদের নাম দিয়েছেন 'Inner Aryans'. এই Inner Aryans বা নূতন আর্য্যদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল— নিজেদের আভিজাত্যের অহঙ্কার। এই আভিজাত্য বজায় রাখবার জন্যই তারা কারুর সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না। ভারতের আদি-নিবাসী দ্রাবিড়দের সঙ্গে তো নয়ই, এমন কি পূর্ব্বতন আর্য্য যাঁরা ছিলেন তাদেরই বংশের অন্তর্গত তাঁদের সঙ্গেও নয়। তবে পূর্ব্বতন আর্য্যদের তাঁরা ঘৃণা কোরতেন না, সেটা বেশ বোঝা যেত, যখন তারা বোলতেন—"অদীক্ষিতাঃ দীক্ষিতাং বাচং বদন্তি" অর্থাৎ অদীক্ষিত আর্য্যগণ (পূর্ব্বতন আর্য্য) দীক্ষিতদের (নবাগত আর্য্যদের) ভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু তাঁরা (পূর্ব্বতন আর্য্য) দীক্ষিতদের সংস্কার বর্জ্জিত। নবাগত আর্য্যদের ভেতর নিজেদের অন্য জাত থেকে পৃথক রাখবার জন্য ছিল একটা দুর্নিবার আগ্রহ। এইজন্য শুধু নিজেদের সভ্যতা নয়, নিজেদের ভাষাটাকেও পৃথক রাখবার জন্য তাঁরা বৈদিক ভাষাকে সংস্কার কোরে একটা নূতন ভাষার সৃষ্টি কোরেছিলেন। সে ভাষার নাম তাঁরা দিয়েছিলেন সংস্কৃত (Reformed language)। তখনকার দিনে এই সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুটো ভাষারই প্রচলন হোল সত্য, কিন্তু প্রাকৃতটা বেশীর ভাগ ব্যবহার করা হোত মেয়েদের অথবা নিম্নশ্রেণীর লোকদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রাকৃতের ততটা আদর ছিল না, যতটা আদর ছিল সংস্কৃতের। সংস্কৃতটাই তখন হোয়ে দাঁড়াল (court language) রাজসভার ভাষা! তালিকা দিয়ে বোঝাতে গেলে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের জন্ম কি কোরে হোল তা বোঝানো চলে এই প্রকারে—

বৈদিক ভাষা

লেখ্য ভাষা (সংস্কৃত) — কথ্য ভাষা (প্রাকৃত)
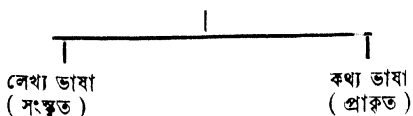
সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, এটা একটু কঠোর—যে সে বলতে পারত, না আর বৈয়াকরণ পানিণি এর যে সমস্ত নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন তার বাইরে যাবারও কোন উপায় ছিল না বলেই এর ভাষাটা আরও বেশী অভিজাত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতটা ছিল অপেক্ষাকৃত সোজা। কি ভাষার দিক থেকে, কি ব্যাকরণের দিক থেকে এর সহজ সরল ভাবটা খুব লক্ষ্য করবার মত। সংস্কৃতে যেখানে বলা হ'ত 'ধর্ম্ম' প্রাকৃতে তাকে বলা হ'ত 'ধম্ম'। এমনি করেই 'সমীকরণে'র নিয়মে সংস্কৃত 'কর্ত্তা', চক্র, ভক্ত (আহার্য্য) যথাক্রমে কত্তা, চক্ক, ভত্ত (> বা ভাত) হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু এই প্রাকৃত ভাষাটা সব দেশে একই রকম ছিল না। পূর্ব্বতন আর্য্যেরা কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে গিয়ে যে প্রাকৃত ভাষা গড়ে তুলেছিলেন তাকে বলা হ'ত পৈশাচী প্রাকৃত; আবার যাঁরা মহারাষ্ট্রদেশে গিয়েছিলেন তাদের ভেতর প্রচলিত হ'ল মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত; এই রকমে সুরসেন (মথুরা) দেশের প্রাকৃতের নাম হ'ল সৌরসেনী প্রাকৃত; আর মগধে যে প্রাকৃত ব্যবহার হ'ল তার নাম মাগধী প্রাকৃত। এই রকম ক'রে প্রাকৃতের তালিকা দাঁড়াল প্রধানতঃ চারটি—
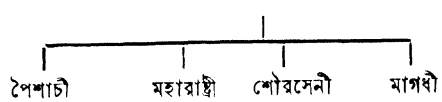
এই চারটি প্রাকৃত থেকেই ভারতের আধুনিক সমস্ত ভাষার জন্ম হয়েছে। কাশ্মীরী ভাষা পৈশাচী প্রাকৃত থেকে, মহারাষ্ট্রী ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে, বর্ত্তমান হিন্দী ভাষা সৌরসেনী প্রাকৃত থেকে উদ্ভব হয়েছে। আর বাঙ্গালা ভাষাটা জন্ম নিয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে।

কিন্তু প্রাকৃত থেকে আধুনিক ভাষায় পরিবর্ত্তিত হ'তে এই ভাষাগুলোকে আরও একটা স্তরের ভেতর দিয়ে আসতে হয়েছিল, সে স্তরের নাম ছিল—অপভ্রংশস্তর। কিন্তু এই অপভ্রংশস্তরের নমুনা প্রায় কোন ভাষাতেই পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন, অপভ্রংশ-

স্তরের ভাষাগুলির নমুনা নাকি হারিয়ে গিয়েছে। একথা কত দূর সত্য তা বলা যায় না—অন্ততঃ এ মত নিয়ে বিরোধ করবার অবকাশ আছে যথেষ্ট।

যাহোক, আমাদের বাঙ্গালা ভাষাটা যে এসেছে মাগধী প্রাকৃত থেকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মাগধী প্রাকৃত থেকে বাঙ্গালা ভাষাটা এলেও এর ওপর আর একটা ভাষার প্রভাব খুব বেশী পড়েছিল। সে ভাষাটার নাম অর্দ্ধমাগধী। এই অর্দ্ধ মাগধী নাকি 'পালি' ভাষার আদি জননী। এই 'পালি' বেশ মজার ভাষা। পণ্ডিতেরা বলেন, 'পালি' নাকি কোন ভাষার নাম ছিল না—এ ছিল বুদ্ধদেবের উপদেশ সমূহ লিপিবদ্ধ গ্রন্থ। গ্রন্থের নাম 'পালি' থেকেই নাকি ভাষার নামটা এসেছে। কিন্তু এই পালির প্রভাব মাগধীর উপর ছিল খুব বেশী।

শুধু তাই নয়। দু'জন তিন জন লোক একত্র থাকলে যেমন একের প্রভাব অন্যের ওপর পড়েই—তেমনি বিভিন্ন দেশে প্রচলিত প্রাকৃতগুলির উপরেও একের প্রভাব অন্যের উপর ছিল। মাগধী প্রাকৃতেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এমন কি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ওপরেও হিন্দী বা অন্যান্য ভাষার প্রভাব বেশ দেখা যেত। চর্য্যা পদগুলির ভেতর ব্যবহৃত 'ভইল' 'ঐছন' 'তছু' (তাহার) ইত্যাদি শব্দগুলিই তার প্রমাণ।

এমনি করেই বৈদিক কথ্য ভাষা থেকে আরম্ভ করে মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ভেতর দিয়ে তার অগ্রগতির চক্র চালিয়ে, অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে এবং দেশী দ্রাবিড়দের শব্দের সাহায্য নিয়ে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হ'ল। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার যথাযথ রূপটি পাওয়া যায় "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" নামক গ্রন্থে। পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় নেপাল গ্রন্থাগার থেকে এ গ্রন্থ উদ্ধার করে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানি আলোচনা করলে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে এর শব্দ ভাণ্ডারে নিম্নলিখিতদের দান অসাধারণ বলেই প্রতীয়মান হয়।

(১) (ক) তৎসম শব্দ (খ) ভগ্ন তৎসম শব্দ।

(২) তদ্ভব শব্দ।

(৩) দেশী শব্দ।

হুবহু সংস্কৃত থেকে যে সমস্ত শব্দ বাঙ্গালায় গ্রহণ করা হয়েছে তাদের বলা হয় তৎসম শব্দ। প্রাচীন চর্য্যা পদে তাদের অভাব নেই, যেমন, 'নিবাস', সো (সে), তে (তাহারা), যে (যাহারা) ইত্যাদি।

তৎসমকে কিছুটা ভেঙ্গে স্বর ভক্তির ভেতর দিয়ে যে কথাগুলো বাঙ্গালায় গ্রহণ করা হ'ল তাদের নাম দেওয়া হয়েছে অর্দ্ধতৎসম বা ভগ্ন তৎসম। প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রাপ্ত—পরশ (স্পর্শ), পরাণ (প্রাণ), পরমাণ (প্রমাণ) ইত্যাদিই ভগ্নতৎসম শব্দের উদাহরণ।

তদ্ভব শব্দের মানে সংস্কৃত হতে কতকগুলি নিয়ম দিয়ে সহজ করে উৎপন্ন শব্দ। এর মূল সংস্কৃত, কিন্তু নিয়মের আওতায় পড়ে এর পরিণতি হ'ল বাঙ্গালা। কতকগুলো মাত্র তদ্ভব শব্দের উদাহরণ দেওয়া হ'ল, কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভাষার প্রাণ এই তদ্ভব শব্দ। তদ্ভব শব্দ আছে এই জন্যই এর মূল প্রকৃতি—এর পরিবর্ত্তনের নিয়মকানুন নিয়ে ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়েছে।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা তদ্ভব
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
চক্র	চক্ক	চাক (যেঃ মৌচাক)
কর্ম্ম	কম্ম	কাম
বধূ	বহু	বউ (বৌ)
অষ্টাদশ	অট্‌ঠারহ	আ[illegible]
ইন্দ্রাগার	ইন্দাআর	[illegible]ারা

এই রকম প্রায় বেশীর ভাগ বাঙ্গালা শব্দই তদ্ভব শব্দ।

এ ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় দ্রাবিড়দের কাছে প্রাপ্ত কতকগুলো দেশী শব্দ যেমন. ঢেঁকি, কুলা, লাঙ্গলজুড়ি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এই নিয়েই অতি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্ত্তী কালে অবশ্য অন্যান্য আরবী, পারসী, ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী শব্দ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে,—কিন্তু পূর্ব্বে এগুলোর চিহ্নও বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না। তবে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' গ্রন্থে 'পানি' (জল) এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।

ইহাই মোটামুটি বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সঞ্চয়ন

বাংলাদেশের সাধারণ জলজউদ্ভিদের পরিচয়

[১৯৪১এর সংখ্যা উইমেন্স কলেজ-ম্যাগাজিন হইতে উদ্ধৃত]

বাংলাদেশ সুজলা, সুফলা; এখানে নদী, খাল, বিল, জলাভূমি প্রভৃতির অভাব নাই। এই সমস্ত জলাশয়ে নানা প্রকার জলজউদ্ভিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ভিদের বিষয় আলোচনা করিব।

(১) কতকগুলি উদ্ভিদ্ জলে ভাসিয়া থাকে; কারণ, উহাদের দেহের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কাণ্ড, পাতা ও মূল বায়ুকোষে (air cavity) পরিপূর্ণ। এই ভাসমান গাছ-গুলির মধ্যে কচুরী পানা (water hyacinth) গত মহা-যুদ্ধের পর হইতে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে বড় পানা বা টোপা পানার (Pistia) প্রাচুর্য্য ছিল। কিন্তু অধুনা কচুরী পানার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় উহারা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। এই কচুরী পানার বোঁটাগুলি খুব মোটা ও বায়ু পূর্ণ। ফুলগুলি বেগুনী রঙের ও তিন প্রকার (trimorphic.)

(২) বড়পানা (Pistia) – ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ইহাদের গোছা গোছা লম্বা মূল আছে। জলে ঢেউ খেলিলে যখন পানাগুলি আন্দোলিত হয়, তখন এই লম্বা মূলগুলি গাছের ভারকেন্দ্র রক্ষা করে; তাহার ফলে পানাটি উল্টাইয়া যায় না।

(৩) ক্ষুদে পানা (Lemna)—পুকুরে এবং স্থির জলে আমরা দুই তিন প্রকারের ক্ষুদে পানা দেখিতে পাই। ইহাদের ছোট পত্রাকার কাণ্ডের (frond) নীচের দিকে মূল থাকে, ও পাতার কিনারায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল হয়।

(৪) মরুচে পানা—কোনো কোনো জলাশয়ে এক প্রকার ক্ষুদ্র বাদামী রঙের পানা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম মরচে পানা; বৈজ্ঞানিক নাম (Azolla pinnata)। ইহার মূলের গায়ে মূলকেশ (root hairs) হয়, যাহা জলজ গাছে সচরাচর হয় না।

(৫) গুঁড়িপানা (Wolffia)—আর একপ্রকার পানা পুকুরে জলের উপর সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়; উহারা সুজির দানার মত ছোট ও সবুজ বর্ণের।

(৬) মূষিককর্ণী (Salvinia)—খণ্ড খণ্ড মৌচাকের মত গর্ত্তবিশিষ্ট কতকগুলি পানা সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় জলে ভাসিয়া বেড়ায়। উহাদের বাংলা নাম ইঁদুরকানী পানা; এবং সংস্কৃত নাম মূষিককর্ণী। উহাদের উপরের পাতা-গুলি ছোট বাটীর মত, কিন্তু নীচের পাতাগুলি দেখিতে ঠিক শিকড়ের মত। উহাদের বৈজ্ঞানিক নাম (Salvinia euculata).

আমেরিকা হইতে নূতন একপ্রকার ইঁদুরকানী পানার আমদানী হইয়াছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের লেকে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিক্রম খুব বেশী। ঐ জাতীয় অন্যান্য পানাদিগকে ধ্বংস করিয়া ইহারা আপন আধিপত্য বিস্তার করে। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম Salvinia auriculata.

(৭) চাঁদমালা (Lymnamthemum)—ছোট ছোট শালুকের পাতার মত পাতা বিশিষ্ট আমাদের জলাশয়ে একপ্রকার উদ্ভিদ্ ভাসিতে দেখা যায়; ইহাদের নাম চাঁদমালা। মোটের উপর চারি প্রকার চাঁদমালা বাংলাদেশে দেখা যায়; যথা—কেষ্ট চাঁদমালা, রাধা চাঁদ-মালা, অরুণ চাঁদমালা ও পূর্ব্ব চাঁদমালা; ইংরাজী নাম যথাক্রমে—Lymnamthemum—cristatum indica, Auratiacum and Parvifolium। ইহাদের জাতির নাম Gentianaceae. চিরতা ইহাদের স্বজাতি।

(৮) মাখনা—পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে মাখনা নামে একপ্রকার জলজাত ফল আছে। লোকে উহার বীজ

ভাজিয়া শাঁস বাহির করিয়া খায়। উহার ফলের গায়ে কাঁটা থাকে; পাতাগুলি বারকোষের মত বড় ও গোলাকার এবং জলের উপরে ভাসিয়া থাকে। ঐ পাতাগুলিকে কেবল-মাত্র 'ভিক্টোরিয়া রিজিয়া'র পাতার সহিত তুলনা করা যায়।

(৯) ভিক্টোরিয়া রিজিয়া—এই গাছ কলিকাতার ইডেন গার্ডেন ও শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে কয়েক বৎসর হইল আমদানী হইয়াছে। আমেরিকার Amazon নদীর নিকটবর্তী বিলসমূহে এই গাছ জন্মিয়া থাকে। তথা হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া অনেক সৌখীন ব্যক্তি এদেশে আনয়ন করেন। জলে ফেলিলে প্রায় তিনবৎসর পরে বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়। ইহার ফুল সাদা হইতে ক্রমে লাল হইয়া যায়। কতকগুলি ফুল বরাবর জলের নীচেই থাকে।

(১০) পদ্মফুল—ইহার পাতাগুলি গোলাকার এবং জল হইতে প্রায় ছয় ইঞ্চি উপরে অবস্থান করে। সংস্কৃতে শ্বেতপদ্মকে 'পুণ্ডরীক', লালপদ্মকে 'কোকনদ', ফুলের বোঁটাকে 'মৃণাল', কেশরকে (Stamens) 'কিঞ্জল্ক', পদ্ম-চাকাকে 'কর্ণিকা' ও মধুকে 'মকরন্দ' বলে। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'নীলপদ্ম' নামে কোনোপ্রকার পদ্ম আছে কিনা। কেহ কেহ ইহার উত্তরে বলেন যে, মানস সরোবরে আছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে যাহাকে (Nelumdium speciosum) বলে উহা নীল বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু নীলশালুককে সংস্কৃতে নীল-পদ্ম বলা হয়। উহার বৈজ্ঞানিক নাম Nymphaca stellata, শ্বেতশালুক বা শাপ্‌লার নাম Nymphaca lotus এবং রক্তকমল বা লালশালুকের নাম Nymphaca rubra। ইহা ছাড়া আর যে সকল সুন্দর সুন্দর শালুক লোকে উদ্যানস্থিত পুষ্করিণীতে সখ করিয়া রোপণ করে, উহারা বিদেশী ফুল। পদ্ম, শালুক ও মাখ্‌না একই জাতিভুক্ত।

(১১) ঝাঁঝি—জলে সাঁতার কাটিবার সময় কতক-গুলি ঝাঁঝি গায়ে লাগিলে গা কুটকুট করে; তন্মধ্যে দুই প্রকার ঝাঁঝি কলিকাতার পুকুরে দেখা যায়। একটির নাম মালা ঝাঁঝি (Hydrilla)। হেদোর পুকুর ও ইডেন গার্ডেনের লেকে ইহা প্রচুর জন্মায়। আর এক প্রকার ঝাঁঝির নাম শৃঙ্গী ঝাঁঝি (Cerato phyllum)। প্রথম প্রকার ঝাঁঝি 'monocot' শ্রেণীভুক্ত ও দ্বিতীয় প্রকার 'bicot' শ্রেণীভুক্ত।

(১২) পাটাশ্যাওলা—ইহা জলের নীচে কাদার ভিতর জন্মিয়া থাকে; দেখিতে ঘাসের ন্যায়। এই গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট মাছ ঘুরিয়া বেড়ায়। দেশীয় প্রণালীতে গুড় তৈয়ারী করিবার সময় ইহার পাতা ব্যবহৃত হয়।

(১৩) হিঞ্চেশাক—ইহা জলে জন্মায়। অনেকে ইহা রন্ধন করিয়া খাইয়া থাকেন। এই শাক যকৃতের পক্ষে উপকারী।

(১৪) কল্‌মী শাক—অনেকের খুব প্রিয় খাদ্য। জলে ও জলের ধারে জন্মায় বলিয়া ইহাকে 'উভচর' বলা হয়।

(১৫) শুষ্‌নি শাক—কলিকাতার বাজারে এবং মফঃস্বলে অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। ইহার বোঁটার উপরে চারিখণ্ড পাতা দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৬) পানিফল—ইহার অপর নাম সিঙ্গাড়া, সংস্কৃত নাম শৃঙ্গাটক ও বৈজ্ঞানিক নাম Trapa। ইহার ফলের গায়ে কাঁটা থাকে। ঐ কাঁটাগুলির দ্বারা অপক্ক ফলের বীজ জীবজন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। উহার শাঁস মুখরোচক। পশ্চিম অঞ্চলে ঐ শাঁস দ্বারা নানা প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত হয়।

(১৭) শোলা—কলিকাতার বাহিরে নানা ডোবাতে শোলা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কাণ্ড কোমল ও বায়ুপূর্ণ এবং সহজে জলে ভাসে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Aeschynome।

(১৮) হোগ্‌লা—জলে জন্মায়। ঢাকুরিয়া ষ্টেশনের নিকটে ও কলিকাতার আশে পাশে প্রচুর জন্মিয়া থাকে, ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Typha। হোগ্‌লা গাছ দুই জাতীয় হয়।

(১৯) এতদ্ব্যতীত Potamogeton, Chara, Nitella এবং নানা প্রকার শ্যাওলা অনেক পুকুর, খাল, বিলে দেখিতে পাওয়া যায়।

(পুষ্প বকসী)

লৌহমানব ষ্ট্যালিন

[১৩৪৮। ১৪ই কার্ত্তিক তারিখের বাতায়নে প্রকাশিত প্রবন্ধের সার অংশ]

ষ্ট্যালিনের আসল নাম যোসেফ ভিসারিয়নোভিচ (Joseph Vissarionovitch)। তাঁর অবাধ কর্ম এবং দৃঢ়তা দেখে তাঁকে বলা হয় ষ্ট্যালিন। রুশীয় ভাষায় 'ষ্ট্যালিন' শব্দের অর্থ হলো—ইস্পাতের মানুষ; সত্যই ষ্ট্যালিনের কার্য্যকলাপ দেখলে বলতেই হবে তিনি ইস্পাতের মতোই দৃঢ়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জর্জিয়ার অন্তর্গত টাইফ্লিস গ্রামে এক দরিদ্রের কুটিরে যোসেফ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর পিতা ছিলেন চর্মকার, তাঁর মাতা ছিলেন এক তেজোময়ী সুন্দরী ককেসিয় মহিলা। বালক যোসেফের ডাক নাম ছিল সোসো (Sosso); খাটো দোহারা গড়ন, কিন্তু তার মধ্যে ছিল তেজ আর দৃঢ়তা পরিস্ফুট; কী যেন এক বিজয় স্বপ্নে বালকের শির ছিল সদাই উন্নত—সেই বাল্যকালের মাথা উঁচু রাখবার যে অভ্যাস তা আজও সমান রয়েছে—এখনও বিজয়োদ্ধত, এখনও অনমিত। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্রকে ধর্মযাজক করবেন, সেই আশাতেই সোসোকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু বালক এই গতানুগতিক জড়জীবনযাত্রা আদৌ পছন্দ করেন নি। তিনি সকলের অলক্ষিতে, গোপনে গোপনে চর্চা করতেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর সমাজনীতি। তাঁর সেই তখনকার ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই তাঁর অন্তর্নিহিত বিপ্লববৃত্তির আভাস পাওয়া যেতে লাগলো সাবেক কালের ধনিক-নিষ্পেষিত রাশিয়াকে নূতন করে গড়বার স্বপ্ন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন তাঁর বিপ্লবী মনোভাবের জন্য এবং সেই সময়েই তিনি রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমক্রেটিক ওয়ার্কার্স পার্টিতে যোগদান করেন। এখন থেকে তার ব্রত হ'লো গুপ্তভাবে সাধারণকে জাগিয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব আনয়ন করা। অল্পকালের মধ্যেই তিনি এই সঙ্ঘে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে পড়লেন, সেই বালক সোসো। দু'বার তাঁকে গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়া পাঠানো হয়, তার মধ্যে পাঁচবার তিনি কৌশলে সেখান থেকে পালিয়ে এসে আবার আপন দলে যোগদান করেন—নূতন নূতন নাম নিয়ে; কোনো বারেই তিনি দু'মাসের বেশী নির্বাসন ভোগ করেন নি। তাঁর নামগুলো হলো—ডেভিড (David), কোবা (Koba), নিজেরাডোজ (Nijeradoze), সেনিজিকফ (Tseniji-koff), আইভ্যানোভিচ (Ivanovitch) এবং সর্ব শেষে যে নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন বিশ্বময়—ষ্ট্যালিন (Stalin)।

যোসেফের কাজ ছিল গোপনে গোপনে শ্রমিকদের মধ্যে তাঁদের সঙ্ঘের মতবাদ প্রচার করা এবং ধর্মঘটের আন্দোলন করা। নির্বাসনে থাকতেও তিনি অতি সন্তর্পণে নিজেকে রুশীয় সাধারণের সদা সংস্পর্শ রেখে কাজ করে যেতেন। যখনই পুলিশের সর্পিল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পড়েছেন তখনই নব নব পন্থা উদ্ভাবন করে তাদের চোখে ধূলা দিয়ে মুক্তি লাভ করেছেন। এ বিষয় তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধুও তাঁর সহায়তা করেছেন যথেষ্ট। তাঁর সঙ্গে থাকতো কাগজ ছাপার সরঞ্জাম, তাই নিয়ে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে কাগজ ছাপিয়ে শ্রমিক সাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য চালাতে হতো—প্রত্যেক জায়গায় অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। সে সব কাহিনী যেমন বিস্ময়কর তেমনি চিত্তচমৎকারী।

অবিরাম কঠোর পরিশ্রমের ফলে কোবা অর্থাৎ যোসেফের শরীরে ক্ষয়রোগের প্রাথমিক লক্ষণ দেখতে পাওয়া গিছল, কিন্তু সাইবিরিয়ার তুষারক্ষেত্রে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে গিয়ে শাপে বর হলো; ক্ষয়রোগ সেরে গেল—দ্বিগুণ উৎসাহে আবার কাজে যোগ দিলেন। এই সময় কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতা লেনিনের (Lenin) সঙ্গে তাঁর প্রথম পত্রালাপে পরিচয় হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে; তাঁর সঙ্গে ষ্ট্যালিনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ফিনল্যাণ্ডের টামারফরস্ (Tammerfors) নামক স্থানে এক বলশেভিক সভায়, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে।

এই প্রথম সাক্ষাতের পূর্বে লেনিন সম্বন্ধে ষ্ট্যালিনের ধারণা ছিল দুরন্ত। তিনি যে লেনিনকে কেবল রাজনীতি-বিদ মহাবীর কল্পনা করেছিলেন তা নয়, তাঁর ধারণা ছিল, দৈহিক শক্তি এবং গড়নেও লেনিন বুঝি দানবীয় আদর্শের পুরুষ! কিন্তু যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের

অবধি রইল না—মাঝারি গড়নের একজন অতি সাধারণ লোক, বিশেষ করে অন্য সবার থেকে পৃথক করবার মতো তাঁর মনে কিছুই নাই। সাধারণ নেতারা সভাস্থলে উপস্থিত হন সবার শেষে, কিন্তু লেনিন সভা আরম্ভ হবার বহু পূর্বেই এসেছিলেন; একপ্রান্তে বসে অতি সাধারণ শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে খুব লঘু বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করছেন অন্তরঙ্গের মতো। লেনিন নিজেকে অন্য সকলের থেকে পৃথক করবার পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁর এই সরল মেলামেশা ষ্ট্যালিনকে মুগ্ধ করেছিল সর্ব প্রথম। লেনিনের সঙ্গে ষ্ট্যালিনের যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হলো এই প্রথম দেখা শোনা থেকে তা অটুট ছিল লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত।

রাশিয়ার বিপ্লবে ষ্ট্যালিন তাঁর কর্ম দক্ষতায় যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং বহু উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

বলশেভিকবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হলে পর ষ্ট্যালিন বরাবর লেনিনের সহকারী হিসাবে অধিকাংশ সময় সেণ্টপিটার্স-বার্গে থেকে তাঁহাকে সাহায্য করেন এবং অপর সহকর্মী, ট্রটস্কি (Trotsky) ছিলেন প্রচার কার্যে। কার্যত ষ্ট্যালিনই জনগণের মধ্যে সুপরিচিত হয়েছিলেন বেশী লেনিনের অন্য সহকর্মীদের চেয়ে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ২১ জানুয়ারী রাশিয়ার যুগ প্রবর্তক লেনিনের মৃত্যুতে কম্যুনিষ্ট দল নেতৃহীন হয়ে পড়লো। তখন ষ্ট্যালিন আপন দৃঢ়তা ও তৎপরতার বলে ক্রমে ক্রমে নব্য রাশিয়ার জননায়ক হয়ে উঠলেন ট্রটস্কিকেও ছাড়িয়ে। তিনি হলেন রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট দলের সচিব প্রধান (Secretary General) এবং আজ পর্যন্ত সেই পদেই অধিষ্ঠিত। এই যুদ্ধের পূর্ব পর্যান্ত তাঁর কোন সরকারী পদনির্দেশ ছিল না; তিনি প্রজাতন্ত্রের সভাপতিও নন, প্রধান মন্ত্রীও নন, অথচ তাঁর ক্ষমতা এই দুই পদ অপেক্ষা অধিক ছিল, এবং এখনও সেই সর্বময় কর্তৃত্ব রয়েছে অক্ষুণ্ণ।

বাহিরে এই কর্মবহুল সঙ্কুল জীবন ধারা দেখে ষ্ট্যালিনের সাংসারিক জীবনের কল্পনা করা অসম্ভব; এবং সে সম্বন্ধে খুব সামান্যই শোনা যায়। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক এই ষ্ট্যালিন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি বিপত্নীক। তাঁর স্ত্রী নাদেজা আল্লিলুয়েভা (Nadejde Alliliouieva) ছিলেন রুশীয় রূপসী। তাঁদের তিন সন্তান—প্রথম পুত্র যেসেকা (Jaschaka), মধ্যম পুত্র ভ্যাসিলি (Vasili) এবং কনিষ্ঠা কন্যা সিৎলানা (Syetlana)। ছোট্ট একটি তিনতলা বাড়ীতে বাস করেন ষ্ট্যালিন ক্রেমলিনে। গৃহের আসবাব পত্র অতি সাধারণ। নিকটবর্তী রেস্তোরাঁ থেকে নিত্য আসে তাঁদের আহার্য। দুই ছেলের শোবার ব্যবস্থা হয় সেই হল ঘরে যেখানে খাওয়া দাওয়া হয়; তাদের পৃথক শয়ন ঘর নেই; কেবল সিৎলানার জন্যে একটি পৃথক ঘর নির্দিষ্ট আছে; বোধ হয় মস্কোতে অন্য কোনো বালিকার এই পৃথক ঘর পাবার সৌভাগ্য হয় নি সিৎলানা ছাড়া। এই হলো ষ্ট্যালিনের সংসারের কথা। কতো অসাধারণ, কিন্তু কি সাধারণ তাঁর সাংসারিক জীবন!

বক্তা হিসাবে ষ্ট্যালিনের কোনো প্রতিভা নাই বললেই চলে; ট্রটস্কির মতো জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবার শক্তি তাঁর নাই। কিন্তু তাঁর কথা সব সময় সুযুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়দৃঢ়। বাগ্মিতার বলে তিনি ডিক্টেটর পদ লাভ করেন নি; তাঁর দৃঢ় ইচ্ছা এবং অদম্য পরিচালনা শক্তিই তাঁকে নব্য রাশিয়ার কর্ণধার করেছে—তাঁর সিংহ বিক্রম ও বিরাট ব্যক্তিত্বকে রাশিয়ার জনসাধা[illegible] ভক্তির চেয়ে ভয়ই করে বেশী। রাজনীতির দিক থেকে তিনি সুবিধাবাদী। দরকার হলে বিজিত দলের কার্যধারাও তিনি অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত নন।

রাশিয়ার এই লৌহভীম ষ্ট্যালিনের সঙ্গেই আজ হিটলারের শক্তি পরীক্ষা চলেছে—সমস্ত পৃথিবী ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় জয়-পরাজয়ের প্রতীক্ষায় বিনিদ্র, কারণ পৃথিবীর শান্তি নির্ভর করছে এই যুদ্ধের উপর।

ভারতের শিক্ষিত বেকার সমস্যা

(১৩৪৮। কার্ত্তিক সংখ্যা 'সম্পদ' হইতে উদ্ধৃত)

বর্ত্তমান জগতে অনেক ছোট বড়ো সমস্যার সাথে সাথে বেকার সমস্যা ও ক্রমশঃ বিরাটকায় হয়ে ওঠছে, আর তার সমাধান কল্পে প্রত্যেক স্বাধীন দেশ বহুবিধ

কর্মপন্থা গ্রহণ করে চলছে। কিন্তু ভারতের বেকার সমস্যা পৃথিবীর বেকার সমস্যা বলতে যা বুঝায় ঠিক তা নয়। ভারতের সমস্যা যেমন ব্যাপক তেমন জটিল আর সরকার কর্তৃক তেমনি অবজ্ঞেয়। কয়েক বছর আগে লীগ অব ন্যাশন সমস্ত সভ্য জগতের বেকার সংখ্যা হিসেব করে দেখেছেন প্রায় তিন কোটি (অবশ্যি ভারত ছাড়া) এবং ভারতে যদিও সরকারের তরফ হতে হতভাগ্য বেকারদের কোন সংখ্যা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয় নি, তবু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা যে সংখ্যা নির্ণয় করা হোয়েছে, তা হচ্ছে চার হতে পাঁচ কোটি। এর মাঝে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৫ লক্ষ। আর বাকী যারা, তাদের অধিকাংশই হচ্ছে কৃষি বিভাগের বেকার ও এ ছাড়া কিছুটা শ্রমিক বেকার। আজ কাল শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যতই বাড়ছে, বেকার সমস্যা ক্রমশঃ প্রকট হয়ে ওঠছে। তার কারণ—অশিক্ষিত মূর্খ বেকার জনতা জনমত গড়ে তুলতে পারে না, ফলে এত দিন এটা একটা বিশেষ সমস্যা রূপে দেখা দেয় নি। সম্প্রতি শিক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথেই এ সমস্যা নিয়ে চারিদিকে আলোচনা চলছে এবং সরকারেরও খানিকটা শুভ দৃষ্টি এদিকে পড়েছে।

১৯৩১ সালের আদম সুমারী মতে দেখা গিয়াছে যে ভারতে মোট জন সংখ্যার শতকরা ৪৪ জন কাজ করে, আর তার মাঝে ২৮.৮ জন কৃষিজীবী। বিলাতে কৃষিজীবীদের সংখ্যা হচ্ছে তার লোক সংখ্যার শতকরা মাত্র ৩ জন।

যে দেশের লোক কৃষির ওপরে এত বহুল পরিমাণে তাদের অর্থ নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করে রেখেছে, তারা যে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষে এত নির্যাতিত হবে, এতে আর আশ্চর্য কি? কারণ, কৃষির ওপর নির্ভরশীল হওয়া মানে অদৃষ্টের দিকে হা করে চেয়ে থাকা। যেমন—বৃষ্টি হলো না, ফসলও হলো না; বা অতিবৃষ্টি হলো, বন্যায় সমস্ত ফসল ভাসিয়ে নিয়ে গেল, এই ত আমাদের অবস্থা। অতএব জাতীয় সম্পদ (National dividend) বাড়াতে হলে চাই শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অবাধ প্রসারণ। কিন্তু এদিকে ভারত কত পেছনে, নিম্নে অন্যান্য সভ্য দেশের সাথে ভারতের তুলনা করা গেল।

দেশ	লোক সংখ্যা অনুপাতে, বাণিজ্য ইত্যাদিতে শতকরা কর্মী সংখ্যা
ভারত	৭.৩
গ্রেট বৃটেন	৩০.৫
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২২.৩
জার্মাণী	২৯.২
ফ্রান্স	১৬.৪
জাপান	১৮.০

যান্ত্রিক প্রগতির দিনে যে দেশ শিল্প-বাণিজ্যে জগতের এত পশ্চাতে সে দেশের লোক যে বেকার থাকবে, সেটা ত স্বাভাবিক। কারণ প্রতি বছর যে এত অজস্র শিক্ষিত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে বাইরে আসছে, তারা করবে কি? আমাদের অনুন্নত কৃষি বিভাগেও তাদের কোন প্রয়োজন নেই, আর শিল্প-বাণিজ্যের অপ্রসারণের দরুণ সে সব ক্ষেত্রেও কোন সুবিধে নেই। এ সম্বন্ধে এক জন বিশেষজ্ঞ লেখক বলেছেন, "The true cause of unemployment is that in an industrial & machine age, the country is becoming increasingly rural." (-- Sir M. Visvesvaraya.)

দ্বিতীয় কারণ হলো আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি। এর ফলে প্রচুর সংখ্যক লোক সাধারণ শিক্ষার ডিগ্রী নিয়ে বছরের পর বছর শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলছে। দেখা যায় একটা কেরাণীগিরীর জন্যে ৫০০ শত দরখাস্ত পড়ে; অথচ দেশে যদি প্রচুর শিল্প-কেন্দ্র গড়ে ওঠে তবু এত অধিক সংখ্যক আই, এ—বি, এ কে কেরাণীগিরীর কাজ দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে অবশ্যি বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসারণ হলে চতুর্দিকে ব্যবসায়, বাণিজ্যের মহড়া পড়ে যাবে, ফলে বেশ কিছুটা লোকের চাকুরি হওয়া স্বাভাবিক।

তার পর আরো কতকগুলো সামাজিক কারণও রয়ে গেছে, যার জন্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনেক ব্যবসাকে সম্মান হানিকর বলে মনে করায় তাদের কাজের গণ্ডিকে সীমাবদ্ধ

করে ফেলেছে। শিক্ষিত বেকার সমস্যার প্রধান কারণ-গুলো হলো এই।

বিগত ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলনে দেখা গেল—যে সব শিক্ষিত যুবক বেকার হয়ে আছে, ওরাই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে অধিক পরিমাণে, এবং এটা সরকারের কাছে ক্রমশঃ অনুভূত হলো যে, এদের যদি কাজে না লাগানো যায় তবে ওরা দিনের পর দিন কেবল অশান্তিই বাড়িয়ে তুলবে, রাজকার্য পরিচালনের সহজতাও বিনষ্ট হয়ে পড়বে। তার পরই সরকার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বেকার নাশন সমিতির গঠন হতে লাগল। সর্ব প্রথমে ১৯২৪ সালে বাংলা দেশে, ১৯২৭ সালে মাদ্রাজে ও বোম্বায়ে, ১৯২৮ সালে পাঞ্জাবে এবং পরে বিহারে, যুক্তপ্রদেশে এরূপ কমিটি গঠিত হলো। এ সব তদন্ত কমিটির বিগত কয়েক বছরের প্রচেষ্টার ফলে এ সমস্যার ওপর সরকারের তরফ হতে খানিকটা গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে এবং প্রতিকারের জন্যেও কোন কোন অঞ্চলে যৎসামান্য সক্রিয়তা দেখা দিয়েছে। সমস্যার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তাদের কেহ কেহ বলছেন, সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতির অবাধ প্রসারণের জন্যেই মধ্যবিত্ত বেকার শিক্ষিতদের (Middle class unemployed intelligentsia) সংখ্যা বেড়ে চলেছে (যেমন পাঞ্জাব ও বাংলা দেশ), আর কেহ বলছেন শিল্প বাণিজ্যের স্বল্পতা ও উন্নত কৃষি পদ্ধতির অভাবের দরুণই এ সমস্যাকে আয়ত্ত করা যাচ্ছে না (মাদ্রাজ, বোম্বে, বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের অভিমত)। মোটের ওপর এ দু' কারণকেই স্বীকার করে নিতে হয়।

গত ১৯৩৭ সালে ভারত সরকার হতে প্রাদেশিক সরকারদের কাছে এ মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে যে —তাদের স্ব স্ব প্রদেশের সীমা রেখার ভেতরে যে সব শিক্ষিত বেকার রয়েছে তাদের সম্পূর্ণ হিসেব গ্রহণ করে ও প্রাদেশিক বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রে ও অফিসাদিতে কি ভাবে কত জন লোক কাজ করছে বা আরো কাজ দেওয়া সম্ভব কি না তা তদন্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাখিল করতে হবে। পরে নাকি কেন্দ্রীয় পরিষদে আইন করে ভারতের সমস্ত উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে এমন ভাবে পরিকল্পনা প্রণালীতে (Economic planning) নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা যাবে, যাতে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে কাজে লাগান সম্ভব হয়ে ওঠে। অবিশ্যি এ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে গেলে প্রচুর বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করতে হবে, তবে এরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা আংশিক ভাবে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং কোন কোন প্রদেশে সে চেষ্টা চলছে ও ইদানিং বাংলা সরকার একটা পরিকল্পনার দ্বারা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের জন্যে কুটির-শিল্প ধরণের কতকগুলো শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছেন, যেমন—ছাতা তৈরী করা, চীনামাটির বাসন তৈরী করা, সাবান প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী তৈরী করা, জুতা তৈরী করা প্রভৃতি। বোম্বে সরকারও অনেকটা অনুরূপ ব্যবস্থা করেছেন। অন্যান্য প্রদেশেও এ ধরণের অনেক কিছু চলছে। এ ছাড়া প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বেকার শিক্ষিতদের সংখ্যা গ্রহণ করছেন প্রতি বছর, ও তাদের মারফতে যে সব চাকুরী আসে, ও গুলোর বিজ্ঞপ্তি প্রত্যেক কলেজে কলেজে পাঠিয়ে দেন, এবং নিয়োগের বেলায়ও তারা কিছুটা সহায়তা করেন। তবে এসব প্রক্রিয়াগুলো সমস্যার বিরাটত্বের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর।

রাশিয়া এ সমস্যাকে অনেক পরিমাণে দূর করতে সমর্থ হয়েছে তার সমাজতান্ত্রিক নীতি দ্বারা দেশের সমস্ত উৎপাদন যন্ত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে; জার্মাণী এবং ইতালীও আজ রাশিয়ার মত অনেকটা পরিকল্পনা (planning) চালাচ্ছে তাদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর ওপর; জাপান অতি উন্নত ধরণের কুটির শিল্পের দ্বারা তার সমস্যা অনেকটা সমাধান করে ফেলেছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে বেকারের সংখ্যা খুবই কম। সে সব দেশে শ্রমিক বেকারের সংখ্যাই বেশী এবং নানা রকম শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার ফলে এ সমস্যার ভয়াবহ মূর্তি অনেকটা দূর হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের বেকার সমস্যা এখনও সমুদ্রের ব্যাপকত্ব নিয়ে বসে আছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন বেকার নাশন সমিতি ও বড় বড় অর্থনীতিকদের মতে বেকার

সমস্যা দূরীকরণের যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে—নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

(ক) সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রস্তাব হচ্ছে—বহুল যন্ত্র-শিল্পের প্রসারণের দ্বারা ভারতের বেকার সমস্যা দূরীভূত হবে। এ প্রস্তাবের মাঝে অবশ্যি সত্যতা রয়েছে প্রচুর। কারণ কাঁচা মাল ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভারত পৃথিবীর কোন দেশ হইতেই পেছনে নয়, এবং তৈল ও কয়লা সম্পদ তার প্রচুর না থাকলেও ভাববার প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতের মত নদীমাতৃক দেশে স্বচ্ছন্দে Hydro-electric দ্বারা তার বৃহৎ যন্ত্রশিল্পগুলোকে চালিয়ে নিতে পারবে। ইদানিং ভারতের বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রগুলোতে এই Hydro-electric power ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নাম করা যেতে পারে—(১) Lonavla projects—যা টাটা কোম্পানী দ্বারা চলছে এবং পৃথিবীর মধ্যে এটাই নাকি সর্বপ্রধান জলীয় বিদ্যুৎ শক্তি। (২) The Andhra Valley supply Co.—যে power দ্বারা বোম্বের ৩০টা বৃহৎ শিল্প কেন্দ্রের কাজ চলেছে। এ ছাড়াও (৩) Mysore installation. (৪) Kashmir Works. (৫) Koyna Valley project (৬) Hand Project প্রভৃতি আরও অনেকগুলো Hydro-electric power house চলছে।

বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের বহুল প্রসারণের সুবিধে ভারতে কোন দেশের চেয়েই কম নয়। ভারতের এতসব সম্পদগুলোকে যদি এখন কাজে লাগানো যায়; তা হলে জাতীয় সম্পদ ত বাড়বেই, সাথে সাথে বেকার সমস্যারও যে অনেক উপশম হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেখা গিয়াছে, যুক্তপ্রদেশে, প্রায় একশতটা চিনির কারখানা গড়ে ওঠার ফলে সেখানে ৫০০ রাসায়নিক, অনুরূপ সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার, এক হাজার কেরাণী ও প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রমিক কাজ পেয়েছে। (Report of the unemployment committee, U. P. 1936) তা ছাড়া বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলগুলোর প্রতিষ্ঠার ফলে ও টাটা কোম্পানীতে, অজস্র বেকার জীবিকার সংস্থান করে নিয়েছে।

তবে এটাও ঠিক নয় যে—বৃহৎ যন্ত্র শিল্পের দ্বারা এ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে। ভারতে labour supply-র সম্ভাবনা এত বেশী যে, কেবল বৃহৎ যন্ত্র শিল্পের দ্বারা এ সমস্যার মাত্র আংশিক সমাধান হতে পারে, তবে আংশিক সমাধান এমতাবস্থায় মোটেই অবাঞ্ছনীয় নয়।

(খ) দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে জাপান যে ভাবে তার বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সাথে সহযোগিতা রেখে উন্নত ধরণের কুটির শিল্পের প্রসারণ দ্বারা তার বেকার সমস্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করেছে [Ref. S. Uychara : The Industry and trade of Japan (London, 1936)] আমাদের দেশেও তাই করতে হবে। ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি (Indian National planning committee) বৃহৎ যন্ত্র শিল্প ও কুটির শিল্প, এ দুটারই আবশ্যকতা স্বীকার করেছেন। বাস্তবিক ভাবে এমন কতকগুলো বস্তু কুটির শিল্পের দ্বারা তৈরী করিয়ে নেওয়া যেতে পারে, যেগুলোকে বৃহৎ যন্ত্র শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে না। যেমন দিয়াশলাই, ঝিনুকের বোতাম, চিঠির খাম, নানা প্রকার খেলনা, বাঁশ-বেতের জিনিষ এরকম আরও অনেক কিছু অতি ছোটখাট যন্ত্র দিয়ে ঘরে বসে তৈরী করা যেতে পারে। এতে পুঁজিরও তেমন দরকার পড়ে না, দেশ ছেড়ে প্রবাসী হতেও হয় না, সুতরাং কুটির শিল্পের দ্বারাও বেকার সমস্যা দূরীকরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, নিখিল ভারত চরকা সংঘের দ্বারা চরকায় সুতা কাটা ও তাঁতে কাপড় বোনার ব্যবস্থা করায় ২৭৬০০০ জন শ্রমিক এবং ২৯৩৩ জন অর্গানাইজার কাজ করছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের তাগিদে ভারত সরকার হতে যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের কুটির শিল্পীদের হাতে ২০ হাজার কম্বল ও প্রায় ১ লক্ষ থার্মফ্লাস্কের বাহিরের cover তৈরী করার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। (The Indian Information)। তবে ভারতের কুটির শিল্প এখনও জগতের অপরাপর দেশের কুটির শিল্পের চেয়ে অনেক পেছনে রয়েছে। ওটাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে দরকার শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে নানা রকম শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া—তা হলেই কুটির শিল্পের দ্বারা দেশের বেকার সমস্যার খানিকটা সমাধান সুনিশ্চিত।

(গ) পাঞ্জাবের বেকার তদন্ত কমিটি প্রস্তাব করেছেন—উচ্চ শিক্ষার দ্বার সাধারণের জন্য রুদ্ধ করে

দিলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক কমে যাবে। এর জন্যে প্রস্তাব করেছেন শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি করে দিতে, তাহলেই সাধারণ লোক এত উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারবে না; প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেই যার যার কাজে লেগে যাবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট মতামত রয়েছে, তবে এটা অসঙ্গত নয় যে, সাধারণ শিক্ষার পথ খানিকটা খাট করে দিয়ে তার বদলে যদি শিল্প শিক্ষার প্রসারণ করা যায়, তবে কিছুটা ফল হবেই। কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের অতি অল্প সংখ্যক লোকই শিল্প শিক্ষা গ্রহণ করছে। এবিষয়ে শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর যেমন অভাব, ছাত্রদের উৎসাহের অভাবও প্রচুর। ১৯৩১ সালে দেখা গিয়াছে শিল্পশিক্ষারত ছাত্রদের সংখ্যা ভারতে ৯৪,৬১০ জন, আর ঐ বছর জাপানের মত এত ছোট একটা দেশের শিল্প-শিক্ষারত ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ১৫,৮৬,০৬২। এতেই অনুমান করা যায়, আমাদের দেশ এখনও শিল্পের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেনি, তবে এজন্য দেশবাসী যেমন দায়ী সরকারও ততোধিক।

(ঘ) আর একটা প্রস্তাব আছে—আধুনিক উন্নত ধরণের যন্ত্রাদির প্রচলন করা হোক কৃষি বিভাগে (to industrialize agriculture)। এতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যে কিছুটা হ্রাস পাবে—তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। মাদ্রাজ ও বিহারের বেকার তদন্ত কমিটি এ প্রস্তাবে জোর দিয়াছেন। তবে ভারতের বর্ত্তমান জমি বণ্টন প্রণালীতে আধুনিক যন্ত্র শিল্পের ব্যবহার কতটুকু সম্ভব—সেটা ভাববার বিষয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অবস্থাভেদে যে সকল প্রতিকার পদ্ধতি অনুসরণ করছে, ভারতও যদি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে এসমস্যা দূরীকরণে উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করে, তবে নিশ্চই বহুল অংশে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। এ গুরু দায়িত্ব বহন করতে হলে ভারতের বেসরকারী ও সরকারী উভয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সর্বশেষে Central Bank-এর সহযোগিতাও এবিষয়ে নিতান্ত আবশ্যক। দেশের ধন উৎপাদন ও বেকার সমস্যা দূরীকরণ, এ দুটাই যথেষ্ট ভাবে নির্ভর করে জাতির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক কার্য্য-প্রণালীর ওপর।

(সত্যবান দাস)

গান

শ্রীইন্দিরা সেন

খোল, খোল, খোল দ্বার,
মন্দিরে তব পূজারিণী আমি,
ফিরায়ো না মোরে আর।

শ্রান্ত জীবন-ধূপে
আরতিতে ওই রূপে
অর্ঘ্য রচিয়া এনেছি বহিয়া
বন্দনা-গীতিহার।

মঙ্গল ঘট ভরেছি আমার
নয়ন-গঙ্গাজলে,
উজাড় করিয়া সকলি সঁপেছি
পাষাণ-দেউল-তলে
দেবতা যেও না ছুঁ'লে।

ক্লান্ত চরণে এসে
নামাইনু পথ-শেষে
সারা জীবনের ছন্দে গাঁথা-এ
ব্যর্থ সাধন-ভার।

করুণা করিয়া লইয়ো তুলিয়া
শেষ পূজা-উপচার।

কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাস বল্লে—শরৎ-দি, বৌদি খুব ভাল গান করেন, শুনবেন একখানা?

শরৎ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে—শুনবো বই কি, ভাল গান শোনাই তো হয় না—উনি যদি গান দয়া করে—

বাবার গান ও বাজনা শরৎ শুনচে বাল্যকাল থেকেই, কিন্তু লণ্ঠনের তলাতেই অন্ধকার, বাবার গান বাজনা তার তেমন ভাল লাগে না। এমন কি বাবা ভাল গাইতে পারেন বলেও মনে হয়না শরতের। অপরে শুনে বাবার গানের বা বাজনার কেন অত প্রশংসা করে শরৎ তা বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে কেদার বলতেন গড়শিবপুরের বাড়ীতে—শরৎ শোনো মা, এই মালকোষখানা বেহালার সুরের মূর্চ্ছনায় রাগিনী পর্দ্দায় পর্দ্দায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতো—। বাবার ছড় ঘুরোনোর কত কায়দা, ঘাড় দুলুনির কত তন্ময় ভঙ্গি—কিন্তু শরৎ মনে মনে ভাবতো বাবার এসব কিছুই হয় না। এ ভালই লাগে না, বাবা হয়তো বোঝেন না, লোকে শুনে হাসে ·····

প্রভাস ওর বৌদিদির দিকে চেয়ে হেসে বললে—শুনিয়ে দাও একটা—

মেয়েটি মৃদু হেসে হারমোনিয়মের কাছে গিয়ে বসলো—তারপরে নিজে বাজিয়ে সুকণ্ঠে গান ধরলে—

পাখী ওইযে গাহিলি গাছে,
কেন পিক্ দিয়ে ঝোপে ডুবে গেলি যেমন এসেছি কাছে।

শরৎ মুগ্ধ হয়ে শুনলে, এমন কণ্ঠ এমন সুর জীবনে সে কখনও শুনে নি। গড়শিবপুরের জঙ্গলে এমন গান কে কবে গেয়েছে? আহা, রাজলক্ষ্মীটা যদি আজ এখানে থাকতো! রাজলক্ষ্মী কত দুঃখদিনের সঙ্গিনী, তাকে না শোনাতে পারলে যেন শরতের অর্দ্ধেক আমোদ বৃথা হয়ে যায়। সুখের দিনে তার কথা এত করে মনে পড়ে!

গান থেমে গেলে শরতের মুখ দিয়ে আপনা আপনি বেরিয়ে গেল—কি চমৎকার!

মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে হেসে কি একটা বলতে যাবে—এমন সময় একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে দোরের কাছে এসে বললে—আজ এত গানের আসর বসল এত সকালে—কে এসেচে গো তোমাদের বাড়ী? আমি বলি তুমি—

শরতের দিকে চোখ পড়াতে মেয়েটি হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ঘরে না ঢুকে সে দোরের কাছেই রইল দাঁড়িয়ে।

মেয়েটির পরনে লাল রঙের জরিপাড় শাড়ী, খোঁপায় জরির ফিতে জড়ানো, নিখুঁত সাজগোজ, মুখে পাউডার। শরৎ ভাবলে মেয়েটি হয়তো কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে যাবে কুটুম্ববাড়ী, তাই এমন সাজগোজ করেচে।

প্রভাসের বৌদিদি বললে—এই যে গানের আসল লোক এসে গিয়েচে। কমলা, একে তোমার গান শুনিয়ে দাও তো ভাল—

কমলা বিষণ্ণমুখে বললে—তাই তো, আমার ঘরে যে এদিকে হরিবাবু এসে বসে আছে—আজ আবার দিন বুঝে সকাল সকাল—

প্রভাস ওকে চোক টিপলে মেয়েটি চুপ করে গেল।

প্রভাসও বললে—না তোমার একখানা গান না শুনে আমরা ছাড়চিনে—এদিকে এসো কমলা—

কমলাও হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরলে। থিয়েটারি গান ও হালকা সুর—কলকাতার লোকে বোধ হয় এই সব গান পছন্দ করে। অন্য ধরণের গান তারা তেমন জানে না, কিন্তু গড়শিবপুরে ঠাকুরদেবতা, ইহকাল পরকাল, ভবনদী পার হওয়া, গৌরাঙ্গ ও নদীয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত গানের প্রাদুর্ভাব বেশি। বাল্যকাল থেকে শরৎ বাবার মুখে, কৃষ্ণযাত্রার আসরে, ফকির-বোষ্টমের মুখে এই সব গান

এত শুনে আসচে যে কলকাতায় প্রচলিত এই সব নূতন সুরের নূতন ধরণের গান তার ভারি সুন্দর লাগলো। জীবনটা যে শুধু শ্মশান নয়, সেখানে আশা আছে, প্রাণ আছে, আনন্দ আছে—এদের গান যেন সেই বাণী বহন করে আনে মনে। শুধুই হতাশার সুর বাজে না তাদের মধ্যে।

শরৎ বললে—বড় চমৎকার গলা আপনার, আর একটা গাইবেন ?

বিনা প্রতিবাদে মেয়েটি আর একটা গান ধরলে, গান ধরবার সময় ঘরের মেজেতে বসানো এক জোড়া বাঁয়া-তবলার দিকে চেয়ে প্রভাসকে কি বলতে যাচ্ছিল, প্রভাস আবার চোক টিপে বারণ করলে। আগের চেয়েও এবার চড়া সুর, দু-একটা ছোটখাটো তান ওঠালে গলায় মেয়েটি, দ্রুত তালের গান, শিরায় শিরায় যেন রক্ত নেচে ওঠে সুরে ও তালের মিলিত আবেদনে।

গান শেষ হলে প্রভাত বললে—কেমন লাগলো শরৎদি ?

—ভারি চমৎকার প্রভাস-দা, এমন কখনও শুনিনি—

কমলা এতক্ষণ পরে প্রভাসের বৌদিদির দিকে চেয়ে বললে—ইনি কে জান ?

প্রভাসের বৌদিদি বললে—ইনি ? প্রভাস বাবুদের দেশের—

শরৎ একথায় একটু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে, প্রভাসদার বৌদিদি তাকে 'প্রভাসবাবু' বলচেন কেন, বা যেখানে 'আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশের' বলা উচিত সেখানে 'প্রভাস বাবুদের দেশের'ই বা বলচেন কেন ? বোধ হয় আপন বৌদিদি নন উনি।

কমলা বললে—বেশ, আপনার নাম কি ভাই ?

শরৎ সলজ্জ সুরে বললে—শরৎ সুন্দরী—

—বেশ নামটি তো।

প্রভাস বললে—উনি এসেচেন কলকাতা সহরে দেখতে। এর আগে কখনও আসেন নি—

কমলা আশ্চর্য্য হয়ে বললে—সত্যি ? এর আগে আসেন নি কখনও ?

শরৎ হেসে বললে—না।

—আপনাদের দেশ কেমন ?

[illegible] না একবার আমাদের দেশে—

—যেতে খুব ইচ্ছে করে—নিয়ে চলুন না—

—বেশ তো, আপনি আসুন, উনি আসুন—

মেয়েটি আর একটি গান ধরলে। এই মেয়েটির গলার সুরে শরৎ সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেল—সে এমন সুকণ্ঠী গায়িকার গান জীবনে কখনও শোনেনি—প্রভাসের বৌ-দিদির বয়েস হয়েচে, যদিও তাঁর গলা ভালো তবুও এই অল্পবয়সী মেয়েটির নবীন, সুকুমার কণ্ঠস্বরের তুলনায় অনেক খারাপ। শরতের ইচ্ছে হোল কমলার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করে।

গান শেষ করে কমলা বললে—আসুন না ভাই, আমাদের ঘরে যাবেন ?......

—চলুন না দেখে আসি—

প্রভাস তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—না উনি এখনই চলে যাবেন, বেশিক্ষণ থাকবেন না—এখন থাকুগে—

কিন্তু শরৎ তবুও বললে—আসি না দেখে প্রভাস-দা ? এখুণি আসচি—

প্রভাস বিব্রত হয়ে পড়লো যেন। সে জোর করে কিছু বলতেও পারে না অথচ কমলার সঙ্গে শরৎ যায় এ যেন তার ইচ্ছে নয়। এই সময় হঠাৎ একটা লোক ঘরে ঢুকে অস্পষ্ট ও জড়িত স্বরে বলে উঠলো—আর এই যে কমল বিবি এখানে বসে, আমি সব ঘর ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি বাবা—বলি—প্রভাস বাবুও যে আজ এত সকালে—

প্রভাস হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে উঠে তাকে কি একটা বলে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে গেল। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে শরৎ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে—লোকটা পাগল নাকি ? অমন কেন ?

সে প্রভাসের বৌদিদিকে বললে—উনি কে ?

—উনি—এই হোল—আমাদের বাড়ীর—বাইরের ঘরে থাকেন—

—কমলার সম্পর্কে কে ?

—সম্পর্কে—এই ঠাকুরপো—

কমলার ঠাকুর পো কি রকম শরৎ ভাল বুঝলে না। লোকটির বয়স চল্লিশের কম নয়—তাহলে কমলার দোজবরে কি তেজবরে স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়েচে নাকি ? না হলে অত বড় ঠাকুরপো হয় কি ক'রে ? কমলার ওপর কেমন একটু করুণা হোল শরতের। আহা, এমন মেয়েটি।

কমলাও একটু অবাক হয়ে প্রভাসের বৌদিদির দিকে চাইলে। সে যেন অনেক কিছুই বুঝতে পারচে না।

শরৎ জিজ্ঞেস করলে—আপনি প্রভাসদা'র কে হন?

কমলা কিছু বলবার আগে প্রভাসের বৌদিদি উত্তর দিলে—ও আমার পিসতুতো বোন হয়। এখানে থেকে পড়ে।

হঠাৎ শরৎ কমলার সিঁথির দিকে চাইলে। সত্যিই তো, ওর এখনও বিয়ে হয়নি। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করেনি। তবে আবার ওর ঠাকুরপো কি রকম করে হোল। শরতের বড় ইচ্ছে হচ্ছিল এ সব গোলমেলে সম্পর্কের একটা মীমাংসা সে করে ফেলে এদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। কিন্তু দরকার কি, পরের বাড়ীর খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞেস ক'রে।

একটু পরে প্রভাস বাইরে থেকে ডাকলে—কমলা, তোমায় ডাকচেন—শুনে যাও—

কমলা চলে যাবার আগে হাত তুলে ছোট্ট একটা নমস্কার করে শরৎকে বললে—আচ্ছা, আসি ভাই—

—কেন আপনি আর আসবেন না?

—কি জানি যদি কোন কাজ পড়ে—

—কাজ সেরে আসবেন। যাবার আগে দেখা করেই যাবেন—

—আপনি কতক্ষণ আছেন আর?

প্রভাসের বৌদিদি বললেন—উনি এখনও ঘণ্টাখানেক থাকবেন—

কমলা বললে—যদি পারি আসবো তার মধ্যে—

ও চলে গেলে শরৎ প্রভাসের বৌদিদির দিকে চেয়ে বললে—বেশ মেয়েটি—

—কমলা তো? হ্যাঁ ওকে সবাই পছন্দ করে—

—বড় চমৎকার গলা—

—গানের মাষ্টার এসে গান শিখিয়ে যায় যে! এখন বোধ হয় সেই জন্যই উঠে গেল। আপনি বসুন চায়ের দেখি কি হোল—

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বললে—না না, আপনি যাবেন না। আমি চা খেয়ে বেরিয়েচি—

—বেরুলেন বা। তা কখনও হয়? একটু মিষ্টিমুখ—

—না না—আমি এসময় কিছুই খাইনে—

—বসুন আমি আসচি।

—বসচি কিন্তু খাওয়ার জোগাড় কিছু করবেন না যেন। আমি সত্যিই কিছু খাব না।

প্রভাস বললে—থাক বরং বৌদি, উনি এসময় কিছু খান না। ব্যস্ত হতে হবে না।

এই সময় অরুণ ও গিরিন বলে সেই লোকটা ঘরে ঢুকলো। শরৎ হাসিমুখে বললে—এই যে অরুণবাবু আসুন—

—দেখুন মাথায় টনক আছে আমার। কি করে জানলুম বলুন আপনি এখানে এসেচেন—

গিরিন প্রভাসকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—কি ব্যাপার?

প্রভাস বিরক্ত মুখে বললে—আরে ওই হরি সা না কি ওর নাম সব মাটি করে দিয়েছিল আর একটু হোলে—এমন বেফাঁস কথা হঠাৎ বলে ফেললে—আমি বাইরে নিয়ে গিয়ে ধমকে দিলাম আচ্ছা করে। ভাগ্যিস্ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কিছু বোঝে না তাই বাঁচোয়া। কমলা বিবি আবার ঘর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল ওর, কত কষ্টে থামাই। দেখলেই সব বুঝে না ফেলুক, সন্দেহ করতো।

—তারপর।

—তারপর তোমরা তো এসেচ, এখন পথ বাৎলাও—

—লিমনেড্ খাওয়াতে পারবে না?

—চা পর্য্যন্ত খেতে চাইচে না—তা লিমনেড্।

—ও এখানে থাকুক—চলো আমরা সব এখান থেকে সড়ে পড়ি।

—মতলবটা বুঝলাম না।

—এখানে দু-দিন লুকিয়ে রাখো। তারপর ওর বাবা ওকে আর নেবে না—ওর গ্রামে রটিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দাও যে কোথায় ওকে পাওয়া গিয়েচে। পাড়াগাঁয়ের লোক, সমাজের ভয়ে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

—তাই করো—কিন্তু মেয়েটিকে তুমি জানো না। যত পাড়াগেঁয়ে ভীতু মেয়ে ভাবচো, অতটা নয় ও। যেন তেজী আর একগুঁয়ে মেয়ে। তোমার যা মতলব, ও কতদূর গড়াবে আমি বুঝতে পারচিনে। চেষ্টা করে দেখতে পারো।

—তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও, দেখ আমি কি করি—টাকা কম খরচ করা হয়নি এজন্যে—মনে নেই?

—হেনাকে ডাকো একবার বাইরে। হেনার সঙ্গে পরামর্শ কর। তাকে সব বলা আছে সে একটা পথ খুঁজে বার করবেই। কমলাকেও বালো।

ওর বৌদিদি শরৎকে পাশের ঘরের সাজসজ্জা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। একটা খুব বড় ড্রেসিং টেবিল দেখে শরৎ খুসি হয়ে বললে—বেশ জিনিসটা তো? আয়নাখানা বড় চমৎকার, এর দাম কত ভাই?

—একশো পঁচিশ টাকা—

—আর এই খাটখানা?

—ও বোধ হয় পড়েছিল সত্তর টাকা—আমার ধীরেন-বাবু—মানে আমার গিয়ে বাপের বাড়ীর সম্পর্কে ভাই—সেই দিয়েছিল।

—বিয়ের সময় দিয়েছিলেন বুঝি? এসবই তাহোলে আপনার বিয়ের সময় বরের যৌতুক হিসেবে—

—হ্যাঁ তাই তো।

—আপনার স্বামী এখনো বাড়ী আসেননি, আফিসে কাজ করেন বুঝি?

—হ্যাঁ

—আপনার শাশুড়ী বা আর সব—ওদের সঙ্গে আলাপ হোল না।

—এবাড়ীতে আর কেউ থাকেন না। এ শুধু মানে আমাদের—উনি আর আমি—

—আলাদা বাসা করেচেন বুঝি? তা বেশ।

—হ্যাঁ। আলাদা বাসা। আফিস কাছে হয় কিনা? এ অনেক সুবিধে।

—তা তো বটেই।

—আপনি এইবার কিছু মুখে না দিলে সত্যই ভয়ানক দুঃখিত হবো ভাই।

বারবার খাওয়ার কাল বলাতে শরৎ মনে মনে বিরক্ত হোল। সে যখন বলাতে খাবে না, তখন তাকে পীড়াপীড়ি করার দরকার কি এদের? সে যে বিধবা মানুষ, তা এরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেচে, বিধবা মানুষ সব জায়গায় সব সময় খায় না বিশেষ করে সে পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, তার অনেক কিছু বাচবিচার থাকতে পারে, সে জ্ঞান দেখা যাচ্চে কলকাতার লোকের একেবারেই নেই।

শরৎ এবার একটু দৃঢ়স্বরে বলেল—না আমি এখন কিছু খাবো না, কিছু মনে করবেন না আপনি।

প্রভাসের বৌদিদি আর কিছু বললে না এবিষয়ে। শরৎ ভাবলে, এদের সঙ্গে ব্যবহারে হয়তো সে ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে পারবে না, কিন্তু কি করবে সে, কেন এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করা? খাবে না বলেচে ব্যস্ মিটে গেল—ওদের বোঝা উচিৎ ছিল।

আরও দু-পাঁচ মিনিট শরৎকে এ ছবি, ও আলমারী দেখানের পরে প্রভাসের বৌদিদি ওর দিকে চেয়ে বললে—ভাল, একটা অনুরোধ রাখো না কেন—আজ এখানে থেকে যাও রাতটা।

শরৎ আশ্চর্য্য হয়ে বললে—এখানে? কি করে থাকবো?

—কেন, এই আলাদা ঘর রয়েচে। উনি বোধ হয় আজ আর আসবেন না। এক একদিন রাত্রে কাজ পড়ে কিনা? সারারাত আসতে পারেন না। একলা থাকতে হবে, তার চেয়ে তুমি থাকো ভাই, দুজনে বেশ গল্পে গুজবে রাত কাটিয়ে দেবো, তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেচে।

কথা শেষ করে প্রভাসের বৌদিদি শরতের হাত ধরে আবদারের সুরে বললে—কথা রাখো ভাই, কেমন তো? তাহোলে প্রভাস বাবুকে—ইয়ে ঠাকুরপোকে [illegible] দিন আজ গাড়ী নিয়ে চলে যাক—তাই করি, বলি ঠাকুরপোকে।

শরৎ বিষণ্ণ মনে বলে উঠলো—না না তা কি করে হবে? আমি থাকতে পারবো না। বাবার পাশের বাড়ীতে চাটুয্যে মশায়ের ওখানে আজ রাত্রে নেমন্তন্ন আছে, তাই রান্না নেই, এতক্ষণ আছি সেই জন্যে। নইলে কি এখনও থাকতে পারতাম। বাবা একলাটি থাকবেন, তা কখনো হয়? তা ছাড়া তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন যে! আমি তো আর বলে আসিনি যে কারো বাড়ী থাকবো, ফিরবো না। আর সে এমনিই হয় না? আপনার স্বামী যদি এসেই পড়েন হঠাৎ—

প্রভাসের বৌদিদি বললে এসে পড়লে কিছুই নয়। তিনটে ঘর রয়েচে এখানে, তোমাকে ভাই এই ঘরে

আলাদা বিছানা করে দেবো, কোনো অসুবিধে হবে না—থাকো ভাই প্রভাসকে বলি গাড়ী নিয়ে চলে যাবার জন্যে। বোসো তুমি এখানে—

—না, সে হয় না। বাবাকে কিছু বলা হয়নি, তিনি ভীষণ ভাববেন—

—প্রভাস কেন গাড়ীতে করে গিয়ে বাবার কাছে খবর দিয়ে আসুক না যে তুমি আমাদের এখানে থাকবে—তা হোলেই তো সব চেয়ে ভাল হয়—তাই বলি—এই বেশ সব দিক দিয়ে সুবিধা হোল—তোমার পায়ে পড়ি ভাই, এতে অমত করো না।

শরৎ পড়ে গেল বিপদে। একদিকে তার অনুপস্থিতে তার বাবার সুবিধে অসুবিধের ব্যাপার অন্য দিকে প্রভাসের বৌদিদির এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—কোন্ দিকে সে যায়? অবিশ্যি একটা রাত এখানে কাটানো আর তেমন কি, সম্ভবতঃ ওর স্বামী আজ আফিসের কাজের চাপে বাড়ী ফিরতে পারবেন না বলেই আজ সঙ্গে রাখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন—শোয়ারও অসুবিধে কিছু নেই, থাকলেই হোল—কিন্তু একটা বড় কথা এই যে সে বাড়ী না ফিরলে বাবা কি ভাবনাতেই পড়ে যাবেন! তবে বাবাকে যদি প্রভাসদা এখুনি খবর দিয়ে দেন—তবে আলাদা কথা।

সে সাতপাঁচ ভেবে কি একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে কমলা এসে ঘরে ঢুকে বললে—বারে, এখানে সব যে, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—

প্রভাসের বৌদিদি উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে—বেশ সময়ে এসে পড়েছ কমলা—আমি ওকে বোঝাচ্ছি ভাই যে আজ রাতটা এখানে থেকে যেতে। উনি আজ আফিস থেকে আসবেন না, জানোই তো—দু-জনে বেশ একসঙ্গে গল্পগুজবে—কি বলো?

প্রভাস এবং তার দলবল একটু আগে বাহিরে কমলার সঙ্গে কি কথা বলেছে। সেই জন্যই তার এখানে আসা, যতদূর মনে হয়।

সে বললে—আমিও তাই বলি ভাই, বেশ সবাই মিলে মিশে—একটা রাত আপনাকে নিয়ে আমোদ করা গেল—

প্রভাসের বৌদিদি বললে—আর বড্ড ভাল লেগেচে তোমাকে তাই বলছি। কি বলো কমলা?

—তা আর বলতে! আমি তো ভাবছি একটা কিছু সম্বন্ধ পাতাবো—

এই মেয়েটীকে সত্যিই শরতের খুব ভাল লেগেছিল—বয়সে এ তার সঙ্গিনী রাজলক্ষীর চেয়ে কিছু বড় হবে, দেখতে শুনতে রূপসী মেয়ে বটে। সকলের ওপরে ওর গান গাইবার গলা...অনেক জায়গায় গান শুনেচে শরৎ—কিন্তু এমন গলার স্বর—

শরৎ আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলো—বেশ সম্বন্ধ পাতাও না ভাই—আমি ভারি সুখী হবো—

—কি সম্বন্ধ পাতাবেন বলুন?

—আপনি বলুন—

প্রভাসের বৌদিদি বললে—গঙ্গাজল? পছন্দ হয়?

কমলা উৎসাহের সুরে ঘাড় নেড়ে বললে—বেশ পছন্দ হয়। আপনারও হয়েচে তো?...তবে তাই—কিন্তু আজ রাত্রে—

শরৎ আপন মনেই বলে গেল—তোমাকে ভাই আমাদের দেশে নিয়ে যাবো, যাবে তো? তোমার বয়সী একটা মেয়ে আছে রাজলক্ষী, বেশ মেয়ে। আলাপ করিয়ে দেবো। আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকবে। তবে হয়তো অত অজ পাড়গাঁ তোমার ভাল লাগবে না—

—কেন লাগবে না, খুব লাগবে—আপনাদের বাড়ী থাকবো—

—জানো না তাই বলচো। আমাদের বাড়ী তে গাঁয়ের মধ্যে নয়—গাঁয়ের বাইরে, জঙ্গলের মধ্যে—

কমলা আগ্রহের সুরে বললে—কেন, জঙ্গলের মধ্যে কেন?

—আগে বড় বাড়ী ছিল, এখন ভেঙে চুরে জঙ্গল হয়ে পড়েচে, যেমনটি হয়—

—বাঘ আছে সেখানে?

শরৎ হেসে বললে—সব আছে, বাঘ আছে, সাপ আছে, ভূতও আছে—

কমলা ও প্রভাসের বৌদিদি একসঙ্গে বলে উঠলো—ভূত! দেখেচেন?

—না, কখনো দেখিনি, ওসব মিথ্যে কথা। কিংবা চলো তোমরা একদিন, ভূত দেখতে পাবে।

প্রভাসের বৌদিদি বললে—আচ্ছা সে জঙ্গলে না থেকে কলকাতায় এসে থাকো না কেন ভাই। এখানে কত আমোদ-আহ্লাদ—তুমি এখানে থাকলে কত মজা করবো আমরা—তোমাকে নিয়ে মাসে মাসে আমরা থিয়েটারে যাবো, বায়োস্কোপে যাবো— খাবো দাবো—কত আমোদ ফুর্ত্তি করা যাবে। গঙ্গায় ইষ্টিমার বেড়াতে যাবো, যাওনি কখনো বোধ হয়? চমৎকার বাগান আছে ওই শিবপুরের দিকে, সেখানে কত গাছপালা—

শরতের হাসি পেলে। গাছপালা দেখতে ইষ্টিমারে চেপে গঙ্গা বেয়ে কোথায় যেন যেতে হবে কতদূর কলকাতায় এসে—তবে সে গাছপালা দেখতে পাবে। হায়রে গড়শিবপুরের জঙ্গল—এরা তোমাকে দেখেনি কখনো তাই এমন বলচে। সেখানে গাছ দেখতে রেলেও যেতে হয় না, ইষ্টিমারেও যেতে হয় না—ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছে জানালা দিয়ে চাইলে দেখতে পাবে জঙ্গলের ঠ্যালা।

কমলাও বললে—তাই করুন—কলকাতায় চলে আসুন, কেমন থাকা যাবে—

প্রভাসের বৌদিদি বললে—এই আমাদের বাড়ীতেই থাকবে ভাই। মানে—আমাদের বাড়ীর কাছেও বাস করে দেওয়া যাবে এখন। এমনি সাজিয়ে গুজিয়ে বেশ চমৎকার করে দেওয়া যাবে। কি ভাই সেখানে পড়ে আছ জঙ্গলে, কলকাতায় এসে বাস করে দেখো ভাই আমোদ ফুর্ত্তি কাকে বলে বুঝতে পারবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে, একসঙ্গে বেড়াবো, দেখবো শুনবো, সে কি রকমমজা হবে বল দিকি ভাই? তোমার মত মানুষ পেলে তো—

কমলাও উৎসাহের সুরে বললে—আপনাকে পেয়ে আর ছাড়তে ইচ্ছে করচে না বলেই তো— ক্রমশঃ

প্রার্থনা

শ্রীসমরেন্দ্র দত্তরায়

সুন্দর, তব মহিমার
স্তুতি যেন মোর বক্ষে ফুটে বার বার
বনে বনে নিত্য ফোটা গন্ধরাজ সম
অন্তরের গীতে রসে গন্ধে বর্ণে মম।
যেন এই অতি দীন হীন
তোমার আলোক-তীর্থে
অন্তরের যা কিছু মলিন
ধৌত করি শুদ্ধ হয়ে নিয়ত সন্ধ্যায়
বন্দনার মন্ত্রখানি লাভ করি রজনীগন্ধায়।
গাহে সদা গান
"তুমি মোর সব কিছু
তুমি মোর পরাণের প্রাণ
জীবনের অনন্ত জীবন
হৃদয়ের পরম রতন।"
ওগো প্রেমার্ণব
তোমার অতল তলে বিসর্জ্জিয়া সব
রিক্ত হস্তে আমি যেন পারি বলিবারে
"তোমার প্রদত্ত ধন দিলাম তোমারে,
এইবার মোরে তুলে লও
আমার অন্তরে আসি
চির যুগ মগ্ন হয়ে রও।"
তুমি যে আমার
জ্যোতির্ম্ময় আঁধারের পার।

দীঘি

কাজী হাশমৎউল্লা, এম-এ,

জুড়ায়ে নয়ন শোভিছে কেমন দীঘিতে সলিল কালো
কতদিন যায় আমি যে তোমায় বাসিয়া এসেছি ভালো।
বুকেতে তোমার দুলিছে যে হার ধবল কমলে গাঁথা,
সুনীল গগনে হাজার বরণে শয়ন রয়েছে পাতা।
ঘিরে চারিধার চরণে তোমার বিথার দুর্ব্বাধান
স্বভাব গোপনে হয় যেন মনে অঞ্জলি করে দান।
তোমার বুকে যে জমাট রয়েছে আমার অতীত স্মৃতি
হেরি গো যতই বাড়িছে ততই হাসি ও কাঁদন গীতি।
পাশে এইখানে আমের বাগানে কেটেছে দুপুর বেলা—
কখনো আবার দিয়েছি সাঁতার করেছি জলের খেলা।
অভিমান করে ছাড়ি মোর ঘরে বসিয়ে তোমার পাশে
জানায়েছি ওরে নালিশ যে তোরে সোহাগ পাবার আশে।
আজি কেন হায় ছুঁইতে তোমায় অযথা আসে গো ভয়?
গেছে যে জীবন ফিরায়ে কখন পাবনাক নিশ্চয়!
মাঠে মাঠে সেই রোদ্দুরে জলেই তোমার সুধাটি পিয়ে,
বিটপীর তলে পড়িতাম ঢলে আবেশ-আঁখিটি নিয়ে।
সকলি স্বপন অতীত ঘটন জাগিয়ে কাঁদিগো আজ,
যুবতীরা সব চলেছে নীরব, চাহে না—অযথা লাজ!
আমারই সাথে ওরা খালি মাথে খেলেছে ধূলির খেলা
ঘোমটা টানিয়ে সরম জড়িয়ে পলায়—হায়রে হেলা!
কে জানি আমায় চিনেছে হেথায় বলিতে পারে না—ভয়
নয়নের কোণে ছলিছে গোপনে নিদারুণ সংশয়।
দুলিয়ে বাতাস আসিছে উদাস বিরহী রাখালী সুর
জোড় মাণিকেরা একা ঘোরাফেরা করে যেন বহুদূর!
শুকো পাতগুলো হয়ে এলোমেলো কাঁদিয়ে লুটিছে বায়
শেফালি সকল অশ্রু সজল ঝরিয়াছে নিরাশায়!

বঁধু ও গুরুটি দীঘি মোর দুটি হেরিনি ত কোথা আর
উদার তুমি যে তোমার ভূমি হে আমার শিক্ষাগার।

তোমারই কোলে বসে এ বিরলে চিনছি স্বভাব-বালা,
কুমুদের ফুলে এনে তুলে তুলে গেঁথেছি তাহার মালা।
শূন্যে ধবল তাহারই আঁচল পলাশের ফুলজরি—
দেবদারু পাতে তোরণ সাজাতে বুকখানা গেছে ভরি।
বটের জটায় আজো যে দোলায় তাহার দোলনা টানা,
দুলি সে দোলনে দেখেছি সামনে ঘুরিছে অখিলখানা।
পিয়া সে আবার শোভে চারিধার ঝিঁঝির ঝুমকো প'রে,
গান গেয়ে আমি যাই দিবাযামি কবিতা সুরটি ধ'রে!
বঁধু হে আমার কার্য্য তোমার হ'ল না এখনো সারা
সকাল অবধি রও নিরবধি করমে আপনহারা।
তব গুণগুলি দাও তারে খুলি যাহার সে আঁখি আছে,
বসে এই তটে শিখে যায় বটে কত কি তোমার কাছে।
বুদ্বুদ্ ওঠে, ওঠে আর টুটে যেন তা তোমার বুলি,
বুকভরা তব পুরাতন নব জমানো ঘটনগুলি।
শেরশা-বাহিনী গিয়েছেও জানি তোমার পার্শ্ব দিয়ে,
কে জানে হেথায় দুরেছে তৃষায় তোমার সুধাটি পিয়ে।
তোমার পাশেতে গেছে এই পথে ঈশা খাঁ বাঙালী বীর
মানসিংহ যারে জিনিবার নারে—গরবে উথলে নীর।
পাও না কি ব্যথা সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া সারা,
মরিচা মলিন হেরিয়ে অধীন এ জাতি জীবন কারা।
গেঁয়ো জীবনের মধ্য যুগের শান্তি ওঠে কি ফুটে,
দেখে দুখী আজ পল্লীসমাজ পরাণ যায় কি টুটে।
—নিশ্চয় যায়, নহে কি হেথায় একেলা জাগিতে তুমি,
নাহি হতে ভোর মুছি ঘুমঘোর কাঁপে ও বক্ষভূমি!
যোগাও যতনে পূজার কারণে পূজারীরে শুচিজল
পূজা শেষ হলে করম কবলে যুঝিতে ধরগো বল।
বালবালা দল—যত আছে বল ছুড়ে ঢিল তব বুকে,
ভাবি কচি কিল হে উদার-দিল্ সয়ে লও হাসিমুখে।
পশু আর পাখী এসে থাকি থাকি ঝাঁপিয়ে পড়েও কোলে,
অঙ্গ সবার জলে করুণার ধুয়ে দাও হিল্লোলে।

এত তব ভাষা বুকভরা আশা কেহ ত বুঝে না হায়,
জাগিতে সবায় বলিছ—হেলায় কেহ ত ফিরে না চায়!
সকলে তোমার বাসী যে পাড়ার কা'রই বা করিবে খল
সবার পরশে শুচি করেছ এ তোমার কাজল জল!

ভোরের বেলায় রজকেরা পায় চুকো মুখ সবা পাশে,
তাই তারা সবে ওই যে নীরবে তোমার তটেতে আসে।
ধরে ব্যথা-গান সারা দিনমান বাজে তব বুক মাঝে,
মানুষই হায় মানুষে না চায় ব্যথা কি এমনো আছে?
তুমি সবে চাও—কাহারে কাঁদাও এমন দেখিনি কভু,
নিতি হাসিমুখ—এত ব্যথা দুখ সহিছ সদাই তবু।
নিখিলের জীব দেখে যা—গরীব গুরু মোর পরহিতে,
দরবারে তার আসে অনিবার কত জন ধূলি নিতে।
অরুণের করে ঝলমল করে তাহার বদন-বিভা,
বিহগের স্বনে গভীর ভজনে পূত ভাব জাগে কিবা।
পাপ তব অরি তাও দয়া করি পাপীরে দিয়েছ ঠাঁই,
হোক কেন সাপ—এই তব ভাব আশ্রয় দেওয়া চাই।

অশুচির দল তোমারই জল তোমার পীযূষে নেয়ে
শুচি হয়ে যায় পথ বেয়ে ধায় হরষের গান গেয়ে।
তুমি আমাদের হৃদয়-মনের যমুনা-কাবেরী-কূল
তুমি আমাদের অতীত যুগের মুনির পূজারই ফুল।
এ গেঁয়ো শিবের জটাল শিরের তুমিই যে ভাগীরথী,
পল্লীর মাঝে তাই ত বিরাজে সরল অমরাবতী।

বঁধু হে আমার রসে ত তোমার ক্ষমতা দেখি না কম,
যুবতীর সনে প্রেম আলাপনে পটু তুমি মনোরম।
থির বুকে যবে বধূদল সবে দিয়েছে আবেশ ছোঁয়া
বুকে বুক রেখে চল এঁকে বেঁকে রসিক বারোটি পোয়া।
লুকাও অতলে কাজল মহলে দলের পাঁচীরে ঘেরা,
ঝিনুকের দল প্রহরী সকল করে ঠিক ঘোরাফেরা।
কখনো সোটান মীনের কামান জল ফেড়ে ওঠে জোরে,
কমল-পতাকা লাল-নীলে আঁকা বাতাসের বেগে ঘোরে।
কখনো আবার শাড়ীতে সবার প্যাঁচিয়ে লাগালে টান,
তীরে থেকে ভাই হেসে মরে যাই ঢেউ তোলে যেন গান!

দশ না বাজিতে নূপুরের গীতে কঙ্কন-ঠুন-ঠনে
কলস গহ্বরে জল ভরা স্বরে যুবাদের লম্ফনে—
পশু চীৎকারে ভরা ক্ষেত ধারে বিহগের মধুস্বরে,
যাতায়াত রোলে হাসি সোরগোলে চারিভিতে যায় ভরে।
মনে হয় যেন আশ্রম কোন খুলিয়াছে এই খানে,
পুলকে সবাই ছুটিছে সদাই কার কথা কেবা শোনে।
উঠে কোলাহল ভেদি নভতল—আবাহন দুনিয়ায়,
শান্তি-আলয় শান্তি বিলায়—সকলে লুটিয়া যায়!
সকালটি সারা কাটে এই ধারা তুমি যে করম-বীর
পূত চপল রসাল-সুবল বিমল, উদার, ধীর!

আসিলে দুপুর পুণ্য মধুর তোমার করুণা ঝলে,
আপনার জল হিম সুশীতল বিলাও তৃষিত দলে!
দূরের পথিক নাগরী বণিক্ আসিলে রোদ্দুরে জ্বলে—
বিছাও যতনে শ্যামল আসনে তটের তরুর তলে!
চারি দিক শুধু করে ওঠে ধূ ধূ যেন কাল মরুভূমি,
সাজ একা সাকী লও সবে ডাকি পেয়ালা লইয়ে তুমি।
মরূদ্যান ফুল অতুল অতুল দুলিয়ে আপন কাঁখে
ঢেলে যাও সুধা তবু ভোর ক্ষুধা রহিল সবার আঁখে।
বিচরণ জ্বালা পিয়াসার জ্বালা মিটালে পীযূষ দানে
তবু আসে যায় কিসের মায়ায় 'রাহীরা' তোমার পানে।
করম কুশল কৃষাণের দল তোমার আদুরে ছেলে,
সবল সরল হাতে ধরি হল ক্ষেতবুকে যেন খেলে।
গ্রামের রাখাল লইয়ে গোপাল জুটেছে তোমার কোলে,
বাঁশরীর সুর পুণ্য মধুর দুপুর মাতিয়ে তোলে।
তুমি তাহাদের আপনা বুকের যোগাও স্নেহের ধারা,
কিবা বলা যায় রয়েছে সেথায় ধরার রতন যারা।
তাহাদেরি বেশে এসেছিল হেসে ঈশা ও 'আরব-ভাতি',
শুক্তির মাঝে শুনেছি বিরাজে মুকুতা—রাজার সাথী।
কে জানে বিরাট করে কেহ পাঠ প্রকৃতির পুঁথিখান
ফেলিবে কোথায় তা'দেরে হেলায়—তোমারই যে সন্তান!

পূর্ণ দুপুর ঝিঁঝির নূপুর বাজায় চরণে যবে,
তরুর ছায়ায় নীরবে গড়ায় পথিক রাখাল সবে।

কেহ চেয়ে রয় জাগে বিস্ময়—গম্ভীর তব ভাল,
নিঝুম কেবল নাহি চলাচল চাল যেন কোন চাল।
বালকের দল ভাবিয়ে বিফল জ্বালাতে আসে না আর,
ভূত আছে' কয় দূরে দূরে রয়, 'ধরা গেলে বাঁচা ভার'।

আসিলে বিকাল স্বপনের জাল ছড়াও তোমার জলে
সে লঘু রোদ্দুরে বধূমন ওরে ঘর ছাড়ি আসে চলে।
জল ফেলে জল আনিবার ছল পারে না রুখিতে আর,
টেনে আনে ধড় হয়ে জড়সড় হেরিতে তোমার ধার।
চরণে নূপুর ঝামর ঝুমুর আপনি বাজিয়ে ওঠে,
কলসের মুখে ভাষা হয় সুখে বলয়-বাজন ফোটে!
'কতটুকু পথ হায় কি বিপদ ফুরোতে চায় যেন,
এঁকে বেঁকে খালি ওরে জঙ্গালী চলেছ বলত কেন?
কচি তৃণদল হাসে খল খল শুনে তা লুটায় বায়
সখীরা হথায় দাঁড়িয়ে শাসায় 'আয়লো, বেলা যে যায়।
বলি হাঁ লো সই, উনি ত বড়ই নাছোড় হলেন দেখি,
বিকেলেও তোর বেরোবার জোর হয় না আ মর, সে কি?
হাসির লহরী কোলাকুলি করি চলে যায় দীঘি-বুকে,
'বালাই বালাই আরে দূর ছাই কি আর বলি যে তোকে।'

কালোর উপরে কালো ছায়া পড়ে ঘনিয়ে আসিলে সাঁঝ
ক্ষীণ রবি-রেখা যায় তাহে দেখা তোমার মরম মাঝ।
তারা-চাঁদ ঝলে নীলাকাশে—জলে—লাল রং কিনারায়,
কভু পুনঃ পীত জরদ হরিৎ দেখা দিয়ে মেশে যায়।
তীরে তীরে সব করে কলরব গ্রামের যুবকদল,
কেউ গলা ভাজে, কেউ বলে—'বাজে দু'চার গল্প বল।'
পরাণ আকুল করিছে বাউল ওপার হইতে ভেসে,
আজানের সুর পুণ্য মধুর জুড়ায় হৃদয়-দেশে।

গেয়ে মেঠো গান গাঁয়ের কৃষাণ তোমার পার্শ্ব ধরে
বলদ সামনে চলে আনমনে আপন আপন ঘরে।
ছাড়িয়ে তোমায় রাখাল ব্যথায় যাইতে চায় না জানি,
তাই ধীরে ধীরে ফিরে চায় তীরে অবশ শরীরে টানি।
বিষাদে নলিন হয়েছে মলিন চাহিতে পারে না আর,
কাঁদিয়ে ভোমর বুকভাঙ্গা স্বর ছড়াইছে চারি ধার।

যাদের চেয়েছ ভালও বেসেছ তারা কি তোমারে চায়?
এমন বঁধুরে রেখে একা দূরে সকলে চলিয়া যায়!
'গেল তারা যাক, সুখে সদা থাক'—এই যে তোমার নীতি
তাহাদের লাগি' হয়েছে বিরাগী—গাইতে সাম্য গীতি।
তাদের সকল কিসে মঙ্গল হইবে ভাবনা সাথে,
তুমিই জাগিবে তারা ঘুমাইবে সারা রাত নিরালাতে।

সৌম্য মহান অতি দয়াবান নিয়তই বঁধু মম,
দীপ্ত ললাট বিরাট বিরাট দোসর নিকটতম।
পরের কারণে বিলাও আপনে আপনার যত কিছু।
তোমার মতন পারিব কখন হইতে কি পিছু পিছু!
তোমার ধরণে পরের বেদনে কাঁদিয়ে আপনহারা—
হইবারে দাও শকতি যোগাও তুমিই গুরুর পারা।

ঘনিয়ে যখন বঁধু হে স্বজন আসিবে জীবন সাঁঝ,
লুটিয়ে যখন পড়িব স্বজন এই ধরণীর মাঝ,
স্মরণ রাখিয়ো ঠাঁই মোরে দিয়ো তোমার ও বুকের পাশে
কবর আমার জুড়ায়ো আবার এমনি সমীর-শ্বাসে।
তোমার ও-তটের বন্য ফুলের পরায়ো নিতুই মালা,
ঝিঁঝির নূপুর দুলিয়ে মধুর জুড়ায়ো পরাণ-জ্বালা।
তুমিই জানিবে তুমিই বুঝিবে ঘুমায় নীরব কবি,
তুলিয়ে আমার দেখিয়ো সবার ব্যথিত হৃদয়-ছবি।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্মনীতি

কিছু দিন ধরিয়া মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তন সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা এতদিনে বোধ হয় নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি সম্পর্কে যে সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে তাহার প্রত্যুত্তরে মহাত্মা গান্ধী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। কিন্তু বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পরেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেরই সন্দেহ ভঞ্জন হয় নাই। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে আলোচনার সময় পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি তো বলিয়াই ফেলিয়াছেন, "সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হইয়াছে।" সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হইয়াছে, কি হয় নাই এই প্রশ্ন বাদ দিয়াও, আর একটা বড় প্রশ্ন রহিয়াছে, অন্যান্য ফ্রণ্টে কংগ্রেসের কাজ করা সঙ্গত কিনা?

বিভিন্ন ফ্রণ্ট বলিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কথা প্রথম বলিতে হয়। কংগ্রেসী সদস্যগণ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য পদ পরিত্যাগ করেন নাই, ভবিষ্যতেও করিবেন এমন কোন আভাস পাওয়া যায় না। সদস্য পদ বজায় রাখার জন্য যেটুকু উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন শুধু সেইটুকু তাঁহারা হইতেছেন। তাঁহারা নিয়মিত ভাবে পার্লামেণ্টরী কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন, ইহাই সত্যমূর্ত্তির ইচ্ছা।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট—যে-সকল প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয় নাই সেই সকল প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের কার্য্যে কংগ্রেসী সদস্যদের যোগদান। এই যোগদানের অনুমতি যদি তাঁহারা পান, তবে আসামে আবার কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার খুব সম্ভাবনা। পাঞ্জাবেও সেকেন্দরী মন্ত্রিসভাকে সরাইয়া প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। পাঞ্জাব প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি মিঞা ইফতি-খারুদ্দিনের ওয়ার্দ্ধা গমনের সহিত পাঞ্জাবে প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা গঠনের সম্পর্ক আছে বলিয়া শোনা যায়। বাংলার মন্ত্রিসভার সঙ্কট এখনও কাটে নাই। যদি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়, তাহা হইলে বাংলাতেও প্রগতি-শীল মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে এবং ইহার জন্য কংগ্রেসের সহযোগিতারও প্রয়োজন আছে।

তৃতীয় ফ্রণ্ট—যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যা-গরিষ্ঠ সেই প্রদেশগুলিতে পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ। এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে পুণা-প্রস্তাবের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার কথা শোনা যাইতেছে। কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পাইবেন কিনা, তাহা এখনও অনিশ্চিত। সকল রাজবন্দী মুক্তি পাইলেও পুণা-প্রস্তাব সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা না করিয়া কংগ্রেসের পক্ষে পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা বোধ হয় সহজ হইবে না। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে পারেন, তাহা নির্ভর করে তাঁহার নিজের বিচার-বিবেচনার উপরে, কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ছাড়া পুণা-প্রস্তাবের রদ-বদল আর কেহ করিতে পারিবে না। তবে এই বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহূত হইতে পারে বলিয়া শোনা যায়।

বন্দী মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকারের কথাও শোনা যাইতেছে। করাচীর কংগ্রেসী পত্রিকা 'দৈনিক হিন্দু'তে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধীকে যত শীঘ্র সম্ভব দিল্লী যাইবার জন্য বড়লাট টেলিগ্রাম করিয়াছেন। সমস্ত ঘটনা মিলাইয়া দেখিলে মনে হয়, ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে একটা পরিবর্ত্তন আসিলেও আসিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের দাবী সম্পর্কে কতটুকু অগ্রসর হইতে প্রস্তুত, তাহারই উপরে সমস্তই নির্ভর করিতেছে। কংগ্রেসের সহিত গবর্ণমেণ্টের আলোচনার দ্বার উন্মুক্তই ছিল। বন্দী মুক্তির প্রশ্ন লইয়া আলোচনার সুযোগ আবার উপস্থিত হইয়াছে। এই সুযোগ কি ভাবে গ্রহণ করা

হইবে তাহারই উপরে সমস্ত নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধ ক্রমশঃ ভারতের নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করা হইতেছে। এই অবস্থায় কংগ্রেসের সহযোগিতা যে খুব মূল্যবান তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিলেই মীমাংসার পথ সহজ হইয়া যাইবে, ইহাই সকলের বিশ্বাস।

—

ভারতীয় জনগণের প্রতি দরদ

স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের নাম ভারতে অনেকের নিকটই পরিচিত। ভারবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া সম্পর্কে সংবাদপত্রে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি উহাতে লিখিয়াছেন, "অন্য সব দেশকে স্বাধীনতা দেওয়ার অভিপ্রায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু ভারতবাসীদের সম্পর্কে আমরা করিয়াছি বিষম ভুল।" ভারতবাসী সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিবে কি না তাহা যুদ্ধবিরতির ঠিক পরবর্ত্তী বৎসরেই স্থির করিবার ভার ভারতবাসীর উপরেই দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কথাও তিনি বলিয়াছেন। বৃটিশ অধিকার শিথিল হইলে ভারত খণ্ডবিখণ্ড হইবে, এইরূপ আশঙ্কা অনেক বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিক প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড বলেন, "এরূপ আশঙ্কা কেন? ভারতবাসীরা নির্ব্বোধ নহে। চীনা, জাপানী ও রাশিয়ানদের মত তাহাদেরও সামরিক ও রাজনীতিক বিষয়ে জ্ঞান আছে।"

স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের মূক জনসাধারণের জন্য স্যার আলফ্রেড নক্সের দরদ উথলিয়া উঠিল,—তাই কি হয়, ভারতের চল্লিশ কোটি লোকের অধিকাংশেরই যে ভোটের তাৎপর্য্য সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও নাই। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের কথা কি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কঠোর শ্রমে নিরত ভারতের জনগণের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়? উহা যে একটা নিছক রাজনৈতিক কাপুরুষতা হইবে। তারপর আবার পৃথিবীব্যাপী মহাসমর। এই সময় কি সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য অবশ্যম্ভাবী রূপে বৃদ্ধি হইতে দেওয়া যায়? তার পর ভারত সম্পর্কে বৃটেনের কর্ত্তব্য কি কম! ভোটারের কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়া ভারতের লোকদিগকে যে স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। বৃটেন ভারতে তাহার ন্যস্তভার ত্যাগ না করায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন অসন্তোষের পরিচয় তো পাওয়া যায় না! ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম, জাতি ও বর্ণের লক্ষ লক্ষ মূক জনগণের প্রকৃত স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ভারতে বৃটেনের ন্যস্তভার ত্যাগ করা পাগলামি ছাড়া আর কি?

ভারত খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কাতেই কি বৃটেন ভারতে তাহার কর্ত্তৃত্ব শিথিল করিতে পারিতেছে না? তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ভারতবাসীর ক্ষোভের কোন কারণ থাকিত না। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছিলেন, "ভারতীয় জীবন ও অগ্রগতির উপর অধিকার ত্যাগ করিবার কোন অভিপ্রায় বৃটিশ জাতির নাই। রাজমুকুটের যে অত্যুজ্জ্বল এবং মূল্যবান রত্ন আমাদের ডোমিনিয়ন এবং অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব এবং শক্তি, তাহা পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই।" বৃটেন ভারতে তাহার অধিকার কেন শিথিল করিতে অসমর্থ, এইখানেই কি তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? মূক জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার কথাটা একটা অছিলা মাত্র। ভারতের মূক জনগণের জন্য স্যার আলফ্রেড নক্সের যে এত দরদ, গত দুই শতাব্দীর মধ্যে বৃটেন তাহাদের কল্যাণের জন্য কি করিয়াছে?

—

দেউলী বন্দীশিবিরে অনশন

দেউলী বন্দীশালার বন্দীদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার সম্পর্কে মিঃ এন, এম যোশী যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন অনেক দিন পরেও ভারত গবর্ণমেণ্ট সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা না করায়, দেউলী বন্দীশিবিরের ২০৮ জন রাজবন্দী অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল কবুল জবাব দিয়া বসিলেন, অনশন ত্যাগ না করিলে রাজবন্দীদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা হইবে না। দেউলীর রাজবন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘট সম্পর্কে শ্রীযুত যোশী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক মুলতবী প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিনা ভোট গণনায় তাহা অগ্রাহ্য

হয়। কংগ্রেসী সদস্যগণ কেন্দ্রীয় পরিষদে যোগদান করেন নাই। কাজেই মিঃ যোশীর মুলতবী প্রস্তাবের ভাগ্যে যে ইহাই ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? অতঃপর মিঃ যোশী ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়া দেউলীতে যান। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৪ জন রাজবন্দী অনশন ত্যাগ করায়, দেশবাসীর উৎকণ্ঠা বহুল পরিমাণে দূর হইয়াছে।

মিঃ যোশী রাজবন্দীদিগকে ভরসা দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন। তাঁহারা কেহই অবিবেচক নহেন। উপায়ান্তর না দেখিয়াই তাঁহারা অনশন ধর্ম্মঘট গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ যোশীর নিকট ভরসা পাইয়া অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা অনশন ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারাও সত্বর অনশন ত্যাগ করিয়া দেশবাসীর উৎকণ্ঠা দূর করিবেন, এই আশা আমরা করিতেছি। এখন অবিলম্বে তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্যকর্ত্তব্য।

—

দেউলী বন্দী-শিবির

দেউলীর বন্দী-শিবিরে রাজবন্দিগণ কিরূপ সুখে আছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে দেখা যায়, স্থানটি কোটা হইতে ৫৬ মাইল এবং নসিরাবাদ হইতে ৫৭ মাইল দূরবর্ত্তী, এই যা অসুবিধা, তাছাড়া দেউলীর আর কোন দোষ-ত্রুটি নাই—বেশ ভাল যায়গা।

পূর্ব্ব-রাজপুতনার জয়পুর, বুঁদি এবং মেবার রাজ্যের সংযোগস্থলে বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত স্থানে দেউলী অবস্থিত। আজমীর হইতে এই স্থান ৭১ মাইল দূরে। মরুভূমি হইতে এই স্থানের দূরত্ব একশত মাইলের কিছু উপরে। উত্তাপের সর্ব্বোচ্চ মাপ ১০৮° ডিগ্রী ফারণহাইট এবং সর্ব্বনিম্ন মাপ ৪৮° ডিগ্রী ফারণহাইট। বৎসরে গড়পড়তা ২০·৩৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। দেউলীর আবহাওয়া নাকি পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশের অধিকাংশ স্থান এবং পূর্ব্ব-রাজপুতনার অন্যান্য অংশের আবহাওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল। পূর্ব্বে এখানে সেনানিবাস ছিল। এমন মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান হইতে সেনানিবাস উঠাইয়া দেওয়া হইল কেন, ইহাই আশ্চর্য্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজবন্দীদিগকে টেবিল চেয়ার দেওয়া হয় না। শীতের সময় তাঁহারা শুধু একখানা কম্বল বা লেপ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের কাপড়, কম্বল ইত্যাদি জেলের 'সি' ক্লাস কয়েদীর অনুরূপ। প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দিগণ আহার্য্য বাবদ জনপ্রতি দৈনিক বার আনা পান। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরা পান দৈনিক নয় আনা।

রিপোর্টে রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গড়ে প্রত্যহ ১৪ জন রাজবন্দীকে অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে থাকিতে হয়। গত আগষ্ট মাসে ৪৩ জন রাজবন্দীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিতে হইয়াছে, সেপ্টেম্বর মাসে করা হইয়াছে ৩৫ জনকে। দেউলী যে কিরূপ মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর স্থান উল্লিখিত বিবরণ হইতেই তাহা বোঝা যাইতেছে।

—

কানপুরে পুলিশের লাঠি চালনা

দেউলী বন্দিশালার রাজবন্দিগণের অনশন উপলক্ষে কানপুরের ছাত্রগণ এক মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। কানপুরের পুলিশ এই মিছিলের উপর লাঠি চার্জ্জ করায় প্রায় একশত শোভাযাত্রাকারী আহত হইয়াছে। কয়েক জনের আঘাত গুরুতর বলিয়া প্রকাশ। লাঠি চার্জ্জের পরেও ছাত্রগণ স্থান ত্যাগ না করায় পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করা স্থির করে। জন কয়েক কংগ্রেস নেতা অনেক বুঝাইয়া ছাত্রদিগকে স্থান ত্যাগ করাইতে সমর্থ হন।

কানপুর কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন নাই। এই অনশন ধর্ম্মঘট উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি ও মিছিল ইত্যাদি হইয়াছে; কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোথাও আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। কানপুর কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই এই অপ্রীতিকর ঘটনার হাত এড়াইতে পারিতেন।

—

আসাম গবর্ণরের অশোভন উক্তি

নওগাঁ যুদ্ধ কমিটিতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আসামের গবর্ণর স্যার রবার্ট রীড রাজবন্দীদিগকে বিদ্রোহী, স্বার্থপর ও

ধড়িবাজ বলিয়া যে অশোভন উক্তি করিয়াছেন প্রাদেশিক গবর্ণরের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নিকট হইতে কেহই ইহা আশা করিতে পারেন নাই। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত বৃটিশজাতি অপরিচিত নহেন। রাজবন্দিগণকে দেশবাসী এই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলিয়া মনে করেন। পরাধীন জাতির পক্ষে স্বদেশপ্রেম অপরাধ সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বাধীনতার উপাসক বৃটিশ জাতিরই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে এই উক্তি অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত হইয়াছে।

—

সুভাষবাবু কোথায়

ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ই, কনরান স্মিথ বলিয়াছেন, "এদেশের কোথাও কোথাও এরূপ আলোচনা হইয়া থাকে যে, কিছু দিন হয় সুভাষবাবু হয় বার্লিনে, না হয় রোমে আছেন এবং অক্ষ-শক্তির সহিত তাঁহার এরূপ চুক্তি হইয়াছে যে, জার্মান কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের জন্য অক্ষ-শক্তি পঞ্চমবাহিনী দ্বারা সাহায্য করিবেন।" তিনি আরও বলেন যে, প্রচারিত কতিপয় পুস্তিকা হইতে তাঁহার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সুভাষবাবু শত্রুপক্ষের দেশে গিয়াছেন।

কোথায় কোথায় উক্তরূপ আলোচনা হইয়াছে, কোথা হইতে ঐ সকল পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে বা কে প্রচার করিয়াছে, এই সকল পুস্তিকার উপর তাঁহার বিশ্বাস স্থাপনের কারণই বা কি তাহা মিঃ কনরান স্মিথ বলেন নাই। এইরূপ অপ্রামাণ্য আলোচনা ও গোপনে প্রচারিত পুস্তিকার উপর নির্ভর করিয়া মিঃ কনরানের ন্যায় বিশিষ্ট সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে ভারতের একজন জনপ্রিয় নেতা সম্পর্কে এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করা অত্যন্ত অসঙ্গত এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদে ঐ বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক নহে কি?

আরও আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহার এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়া বিলাতের সংবাদপত্রসমূহ ভারতের বিশিষ্ট জননায়ক শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়কে দেশদ্রোহী ইত্যাদি আখ্যা দিয়া খুব চমকপ্রদ ভাবে উহা প্রকাশ করিতেছেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা যে মনোভাবের পরিচয় দিলেন, তাহার নিন্দা করিবার ভাষা নাই।

ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল এক জাতির হাত হইতে আর এক জাতির হাতে তুলিয়া দিবার সার্থকতা কোন ভারতবাসীই স্বীকার করেন না। ভারতের স্বাধীনতাকামী সুভাষবাবু সম্পর্কে এরূপ কল্পনা করাও অসম্ভব। সুভাষ বাবুর ন্যায় একজন দেশপ্রেমিক জননেতা সম্পর্কে মিঃ কনরান স্মিথের উক্তিতে সমগ্র দেশব্যাপী বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা এই উক্তিকে সমর্থন করা অথবা উহা প্রত্যাহার করা।

—

বেঙ্গল এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে

ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদে 'বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে' এবং রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ে ক্রয় করিয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বি এণ্ড এন, ডব্লু রেলের সহিত সর্ব্ব প্রথম চুক্তি হয় ১৮৮২ সালে। ১৯৩২ সাল শেষ হওয়ার সঙ্গে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। গবর্ণমেণ্ট ঐ সময় উহা ক্রয় করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া ১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বর্দ্ধিত করিয়া দেন। ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় চুক্তি শেষ হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি উক্ত রেলওয়ে ক্রয় করিয়া লইতে ইচ্ছুক না হন তবে ১৯৮২ সাল পর্য্যন্ত আরও চল্লিশ বৎসরের সর্ত্তে উক্ত রেল কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিতে হইবে।

ভারতের রেলপথগুলি কোম্পানীর হাত হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে আসুক, ইহা ভারতবাসীর দাবী। লণ্ডনে ভারতের হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইতেছে। এই সঞ্চিত অর্থ হইতে উল্লিখিত দুইটি রেলওয়ে ক্রয় করিলে এই অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে এবং ভারতের দাবী পূরণ হইবে।

—

ভারতীয় ইমিগ্রেশন তহবিল

জাভা এবং অন্যান্য নেদারল্যাণ্ড ইণ্ডিজ হইতে মালয়ে

শ্রমিক আমদানীর জন্য ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রেশন কমিটি যাহাতে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করিতে পারে তজ্জন্য সংযুক্ত মালয় রাষ্ট্রের সিঙ্গাপুর ব্যবস্থা পরিষদে মালয় শ্রমিক আইন সংশোধনের জন্য একটি বিল উত্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় ইমিগ্রেশন তহবিলের অর্থ ভারতীয় ইমিগ্রেশন কমিটি ব্যয় করিয়া থাকেন। এই অর্থ ভারতীয় শ্রমিকদের জন্যই ব্যয়িত হইবে, তাহা মালয় শ্রমিক আইনে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে এবং অন্য ভাবে উহা ব্যয় করিবার উপায় নাই।

মালয় কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি জাভা হইতে শ্রমিক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জাভা শ্রমিকদের জন্য ভারতীয় ইমিগ্রেশন তহবিলের অর্থ ব্যয় করিবার অধিকার উক্ত কমিটির নাই। ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা জাভার শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করার অধিকার ভারতীয় ইমিগ্রেশন কমিটিকে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই আইন সংশোধনের ব্যবস্থা। ভারতীয় ইমিগ্রেশন কমিটি নামে ভারতীয় হইলেও উহাতে ভারতীয় সদস্য আছেন মাত্র দুই জন। বাকী ১৭ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন সরকারী মনোনীত এবং ৮ জন রবর বাগানের মালিকদের প্রতিনিধি।

গত মে মাসে মালয়ের ভারতীয় শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হয় নাই। ইহার উপর আবার ভারতীয় ইমিগ্রেশন তহবিলের অর্থ জাভা শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। মালয়ে জাভা শ্রমিকরা চিরস্থায়ী অধিকার না পাইলে ডাচ কর্ত্তৃপক্ষ মালয়ে শ্রমিক পাঠাইতে রাজী নহেন। এই আইন সংশোধন হইতে বোঝা যাইতেছে, মালয় কর্ত্তৃপক্ষ জাভার শ্রমিকদিগকে তাহাদের প্রার্থিত অধিকার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভারতীয় শ্রমিকরা কিন্তু মালয়ে আজও কোন নাগরিক অধিকার পায় নাই। ভারতগবর্ণমেণ্ট কি ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন না?

—

মালয়ে ভারতীয় শ্রমিক

মালয়ে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সময় শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু মালয় কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এই প্রস্তাবটি মনঃপূত হয় নাই। এই প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে মালয় কর্ত্তৃপক্ষ মালয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য অতি সুস্পষ্ট,—মালয় কর্ত্তৃপক্ষ গুলি বর্ষণ ব্যাপারটা এড়াইতে চান। তাছাড়া এই কমিশনের সম্মুখে এমন সমস্ত সুপারিশ মালয় কর্ত্তৃপক্ষ উপস্থিত করিতে পারিবেন যাহার ফলে মালয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের সামান্য যাহা কিছু অধিকার আছে তাহাও সঙ্কুচিত হইবে।

—

ব্রহ্মদেশে স্বায়ত্ত শাসন

ব্রহ্মদেশে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য দরবার করিতে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী মিঃ উ-স বিলাতে গিয়াছিলেন। কিন্তু আলাপ-আলোচনার গতিক দেখিয়া তিনি খোলাখুলি ভাবেই বলিয়াছেন, "আমার দেশবাসী এবং আমি যেরূপ উচ্চ আশা পোষণ করিয়াছিলাম, তাহা পূরণ হয় নাই, তবে আমি কোন রূপ বিদ্বেষ মনোভাব না লইয়াই আপনাদের দেশ পরিত্যাগ করিব।"

সাম্প্রদায়িক অনৈক্যই নাকি ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়ার অন্তরায়। কিন্তু ব্রহ্মদেশে তো সাম্প্রদায়িক সমস্যা নাই, তবে মিঃ উ-স-র আশা পূরণ হ[illegible] না কেন?

—

তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের খাদ্য

ডাঃ বি, সি, রায়, ডাঃ জীবরাজ মেহতা, ডাঃ দেশমুখ প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসক নাগপুর জেলের তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের খাদ্য পরীক্ষা করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তাঁহারা জানাইয়াছেন, নাগপুর জেলের তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের খাদ্যে প্রাণীজ প্রোটিনের একান্ত অভাব এবং উহা বন্দীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। এই ব্যবস্থাকে তাঁহারা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী মধ্যপ্রদেশের জেলের খাদ্য বন্দীদের স্বাস্থ্য ও

শক্তি রক্ষার উপযোগী বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ। যে সকল জেলে এইরূপ খাদ্য দেওয়া হয় তাহাদের সম্বন্ধেও তাঁহাদের উল্লিখিত মন্তব্য প্রযোজ্য। আশা করি, গবর্ণমেণ্ট তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের খাদ্য তাহাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অনুকূল করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

—

মূল্য-নিয়ন্ত্রণের কি হইল

দিল্লীতে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলাফল দেখিয়া দেশের গরীব লোকেরা শুধু একটা নিরাশার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়াছে। অন্ন আর বস্ত্র সমস্যাই গরীবের প্রধান সমস্যা। দাম বাড়িয়া যাওয়ায় এই সমস্যা চরমে উঠিয়াছে, কিন্তু মূল্য-নিয়ন্ত্রণ-সম্মেলনে এই দুইটির একটিরও দাম নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। গরীবদের জন্য কয়েক প্রকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় নাকি তৈয়ার করা হইবে। গরীব-মার্কা কাপড় যদি তৈয়ার হয়, তবে হউক; কিন্তু কাপড়ের কলের মালিকরা কি স্বেচ্ছায় কম লাভ লইতে স্বীকৃত হইবেন? ডোমিনিয়নগুলির জন্য গবর্ণমেণ্ট ন্যায়সঙ্গত মূল্যে কাপড় সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু শুধু ভারত-বাসীর বেলাতেই উহা জটিল ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল কেন?

নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের দাম এত বাড়িয়াছে যে, তাহাতে জনসাধারণের উৎকণ্ঠিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। জিনিষের দাম বাড়িয়াছে, কিন্তু আয় তো বাড়ে নাই। গত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জিনিষের দাম যে রকম ছিল, এবারও যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জিনিষের দাম প্রায় তাহাই ছিল। কিন্তু গত যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে জিনিষের দাম শতকরা ২৮৲ টাকা বাড়িয়াছিল আর এবার যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে বাড়িয়াছে শতকরা ৫১৲ টাকা। তা ছাড়া গত যুদ্ধের পূর্ব্বে কৃষকের অবস্থা যেরূপ ছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা তাহা অপেক্ষাও খারাপ ছিল। গত যুদ্ধের হিসাব অনুযায়ী বর্ত্তমানে জিনিষের দাম অন্ততঃ শতকরা ২৮৲ টাকা বৃদ্ধিতেই বাঁধিয়া দেওয়া উচিত ছিল। গরীবের দুঃখে অশ্রুবর্ষণ অনেকেই করেন, কিন্তু কাজের বেলায় তাহাদের জন্য কিছুই করা হয় না, ধনীর কোলেই সকলে ঝোল টানেন।

—

কাপড়ের কলে কার্য্যকাল বৃদ্ধি

কাপড়ের চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম বলিয়া কাপড়ের দাম বাড়িয়াছে, আমরা এই কথা শুনিতেছি। সম্প্রতি কাপড়ের কলগুলিতে কার্য্যকাল বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কাপড় বেশী তৈয়ার হইলেও দাম কমিবে বলিয়া ভরসা পাওয়া যাইতেছে না। কাপড়ের দাম বাড়িবার মূলে যে ব্যবসায়ীদের অত্যধিক লাভ করিবার প্রবৃত্তি রহিয়াছে, বাংলা গবর্ণমেণ্টও তাহা পূর্ব্বে এক বিবৃতিতে জানাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রবৃত্তি প্রশমিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কাপড় বেশী তৈয়ার হইলেই যে তাঁহাদের লাভ করিবার প্রবৃত্তি কমিবে তাহারই বা ভরসা কোথায়? মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করিয়া কাপড়ের কলে কার্য্যকাল বৃদ্ধি করিলেই কাপড়ের দাম কম হইবে, এইরূপ ভরসা করিবারও কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

—

গমের দাম নির্দ্ধারিত হইল

পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ না করিয়া শুধু ব্যবসায়ীদের শুভ-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে যে সুফল পাওয়া যায় না, গমের দামের বেলায় তাহা বেশ ভাল করিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট গমের দাম প্রতি মণ ৪।৵০ আনা নির্দ্ধারণ করিয়া না দিয়া আর পারিলেন না। সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, গমের দাম ইতিপূর্ব্বেই বিপজ্জনক সীমার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। ভারত গবর্ণমেণ্ট গমের যে দাম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাও ১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসের গড়পরতা দামের দ্বিগুণ, ১৯৩১ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের সর্ব্বোচ্চ দাম অপেক্ষা ১৲ টাকা এবং উক্ত নয় বৎসরের গড়পরতা দাম অপেক্ষা ২৲ টাকা বেশী। গমের দাম তো নির্দ্ধারিত হইল, কিন্তু চাউল ও কাপড়ের দাম নির্দ্ধারণ করা হইল না কেন?

—

তাঁতিদের দুঃখ-কষ্ট

বাজারে কাপড়ের দামও আছে, চাহিদাও আছে, কিন্তু এই রকম একটা সময়েও গ্রাম্য তাঁতিদের অন্ন জুটিতেছে না, বহুসংখ্যক তাঁতি এখনও বেকার। ভারতে যে-পরিমাণ কাপড় ব্যবহৃত হয়, যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও তাহার শতকরা ২৬ ভাগ ভারতের গ্রাম্য তাঁতিরাই যোগাইত। কাপড়ের এই দুর্মূল্যের বাজারে তাঁতিদের বসিয়া থাকিবার কথা নয়। কিন্তু সূতার অভাবে তাহারা বেকার। কাপড়ের কলে কার্য্যকাল সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাঁতিদের সূতা পাওয়ার কি ব্যবস্থা হইল? তাঁতিদিগকে সূতা যোগাইবার ব্যবস্থা করিলে কাপড়ের উৎপাদন শতকরা আর ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে কাপড়ের যোগানও বৃদ্ধি পাইবে, তাঁতিদেরও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

—

হাঙ্গরের যকৃৎ হইতে তৈল

হাঙ্গর শিকার মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূলে একটি লাভজনক ব্যবসা। কালিকটে হাঙ্গরের যকৃৎ হইতে তৈল উৎপাদন-শিল্পের কারখানা আছে। সত্তর বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ কালিকটে এই শিল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু ১৮৭০ সাল হইতে কডলিভার অয়েলের দাম কম হওয়ায়, কালিকটের মৎস্য-তৈলের শিল্প অতি কষ্টে বাঁচিয়া আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ভারতে কডলিভার অয়েলের আমদানী বন্ধ হওয়ায়, কালিকটের এই শিল্পের সম্মুখে এক নূতন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যে-সকল রোগীর শরীরে ভিটামিন 'এ'র অভাব তাহাদের পক্ষে কডলিভার অয়েল অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, হাঙ্গরের যকৃতের তৈলে কডলিভার অয়েল অপেক্ষা ১০ হইতে ১৫ গুণ বেশী ভিটামিন 'এ' আছে। এই তৈলের রোগ আরোগ্যকারী শক্তিও পরীক্ষিত হইয়াছে। এই শিল্পের প্রতি পুঁজিপতিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

—

রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের পরিস্থিতি

জার্ম্মানী শীতের প্রাক্কালেও পূর্ব্বরণাঙ্গনে নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে। কিন্তু এক ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না।

পূর্ব্বরণাঙ্গনের সর্ব্বোত্তর যুদ্ধক্ষেত্র—মুরমনস্ক ও লেনিনগ্রাড অঞ্চলে যুদ্ধ প্রবল ভাবেই চলিতেছে। মুরমনস্ক অঞ্চলে রুশসৈন্যেরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিয়াছে। লেনিনগ্রাড ঘেরাও করিয়া ফেলিবার দাবী জার্ম্মানরা করিলেও, তাহাদের এই দাবী সত্য নহে। বাহিরের সহিত লেনিনগ্রাডের সম্বন্ধ এখনও অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে এবং জার্ম্মানী বহু সৈন্য ক্ষয় করিয়াও এখনও লেনিনগ্রাড অবরোধ করিতে পারে নাই।

মস্কোর দিকে যে জার্ম্মান অভিযান চলিতেছে, তাহাও রুশ সৈন্যের পাল্টা আক্রমণে প্রতিহত হইয়াছে। মস্কো হইতে ১১০ মাইল দূরবর্ত্তী তুলার দক্ষিণ সহরতলী হইতে জার্ম্মানরা পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে। এখন যুদ্ধ চলিতেছে তুলা সহরের বহির্ভাগে। মস্কো হইতে ১০০ মাইল দূরবর্ত্তী কালিনন অঞ্চলেও প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। এই অঞ্চলের যুদ্ধে রুশ গরিলা বাহিনীরও যথেষ্ট কর্ম্মতৎপরতা দেখা যাইতেছে। মস্কোর উত্তর-পশ্চিমে ভোলোকোলামস্কে জার্ম্মানী এস-এস সৈন্য বাহিনী আমদানী করিয়া নূতন করিয়া আক্রমণের আয়োজন করিতেছে। মস্কোর ৬৫ মাইল পশ্চিমে মোজাইস্ক অঞ্চলে জার্ম্মান সৈন্যের নারা নদী পার হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমে মালোয়ারোস্লাভোটোতে জার্ম্মানরা তাহাদের একটি ঘাঁটি হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মুরমনস্ক-লেনিনগ্রাড অঞ্চলের যুদ্ধ এবং মস্কো অভিযানের সংবাদ হইতে বোঝা যাইতেছে, এই অঞ্চলের যুদ্ধের গতি এখন রাশিয়ার অনুকূলে। কিন্তু মস্কো অভিযান যে একটা সঙ্কট অবস্থায় পৌছিতেছে জার্ম্মানীর নূতন সৈন্য আমদানী হইতেই তাহা অনুমান করা যায়।

ডন-অববাহিকা অঞ্চলের যুদ্ধের অবস্থা ঠিক বোঝা যাইতেছে না। রোষ্টভের দিকে জার্ম্মান অভিযান

প্রতিহত হইলেও আরও উত্তরে ষ্ট্যালিন ও খারকোভ অঞ্চলে জার্ম্মানরা অগ্রসর হইতে পারিতেছে। এখানে সামরিক শক্তিতে রাশিয়া তেমন সবল নয়। মার্শাল বুদেনিকে যে ক্ষতি এখানে স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা মার্শাল টিমোশেঙ্কোকে সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করিয়া পূরণ করিতে হইতেছে।

ক্রিমিয়াতে জার্ম্মানী সাফল্য লাভ করিতেছে, ইহা খুবই দুঃখের বিষয়, যদিও ইহা চরম সাফল্য নয়। জার্ম্মানী বোমাবর্ষণ করিয়া সিবাষ্টাপোলে নৌঘাঁটি রাখা অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু রাশিয়া যদি ওডেসা রক্ষার ন্যায় দৃঢ়তা এখানেও প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা হইলে জার্ম্মানী সিবাষ্টাপোল দখল করিতে পারিবে না। জার্ম্মান বিহানীর এক অংশ কার্চ্চ দখল করিতে চেষ্টা করিতেছে। অনেকে মনে করেন, কার্চ্চ দখল করিতে পারিলে জার্ম্মানী ককেসাসের দিকে অগ্রসর হইবে। আজবসাগর ও কৃষ্ণসাগরের সংযোগকারী প্রণালীটি পাশে বেশী নয় বটে, কিন্তু তথাপি এত প্রশস্ত যে, সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ককেসাস অঞ্চলে সৈন্য পার করা কঠিন হইবে। রাশিয়া এখানে প্রবল ভাবেই বাধা দিবে। বিশেষতঃ সৈন্যপারের আয়োজন করিতে এত দীর্ঘসময় লাগিবে যে, এই সময়ের মধ্যে রাশিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ সম্পর্কে জার্ম্মানীতে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। দীর্ঘদিন স্থায়ী যুদ্ধ এবং বিপুল বিস্তৃত রণক্ষেত্রে সমরোপকরণ এবং খাদ্য সরবরাহ করাও জার্ম্মানীর কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। চারিমাস ধরিয়া প্রবল যুদ্ধ করিয়া জার্ম্মান সৈন্যের যে ক্লান্তি আসে নাই তাহা নহে। এই অবস্থা দীর্ঘ দিন চলা অসম্ভব।

জাপান কোন্ পথে

জাপানে টোজো গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার পর হইতেই চাঞ্চল্যকর একটা কিছু ঘটিবে, অনেকেই এইরূপ মনে করিতেছেন। কিন্তু ইন্দোচীনে সৈন্য সংখ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি করা এবং হেইনান দ্বীপে ব্যাপক ভাবে যুদ্ধের আয়োজন করা ব্যতীত জাপান আজ পর্য্যন্ত চাঞ্চল্যকর কিছুই করে নাই। সুদূর প্রাচ্যে এক চীনের সহিত যুদ্ধ করা ছাড়া নূতন যাহাই জাপান করিতে যাইবে তাহাতেই বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষ বাঁধিবার ষোলআনা সম্ভাবনা।

এদিকে জাপানের ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া নাৎসী জার্ম্মানী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে, বোঝা যাইতেছে। কিন্তু রাশিয়া আক্রমণ করিলে আমেরিকা কি করিবে সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হইয়া এবং রাশিয়ার পরাজয় অনিবার্য্য না বুঝিলে জাপান কিছু করিবে বলিয়া মনে হয় না। মার্কিন সেনেটর ট্যাফ্‌ট্ যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সত্য হইলে, এই অনুমানই ঠিক। জাপান নাকি ভ্লাডিভষ্টক আক্রমণ করিবার বিনিময়ে পাঁচটি সহর ব্যতীত জাপ অধিকৃত অবশিষ্ট চীন হইতে সরিয়া আসিতে চায়। জাপান হয়তঃ আশা করে, রাশিয়াকে কাবু করিতে পারিলে চীনের সহিত আবার সে লড়িতে পারিবে।

জাপানের ইতস্ততঃ ভাব নূতন নয়। জাপান একাধিক বার যুদ্ধ করিয়া তাহার রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহার শত্রুকে অপর কোন শক্তি আক্রমণ না করিয়াছে কিম্বা অভ্যন্তরীন বিপ্লবে বিপন্ন না হইয়াছে ততদিন জাপান আক্রমণ করে নাই। জাপান পূর্ব্ব এসিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে চায়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে যে পক্ষই জিতুক তাহার সহিত জাপানের সাম্রাজ্য-বিস্তারে কোন সম্পর্ক নাই। তবে একটা কথা সে উপেক্ষা করিতে পারে না। জার্ম্মানী যদি রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভ করে আর জাপান জার্ম্মানীর পক্ষে যোগ না দেয়, তাহা হইলে চীনে জাপানের কোন ভরসা নাই। আবার রাশিয়া জিতিলেও কোন ভরসা জাপান পাইতেছে না। বিজয়ী জার্ম্মানীর সহযোগী হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া জাপান মনে করে। কিন্তু প্রথমতঃ, জার্ম্মানী যে জিতিবেই সে সম্বন্ধে জাপান এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিজয়ী জার্ম্মানীর সহযোগী হইলেও জার্ম্মানী শেষ পর্য্যন্ত চীনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধেও কোন ভরসা জাপান করিতে পারিতেছে না। এই সকল বিবেচনা করিয়াই জাপান ইতস্ততঃ করিতেছে। জাপান বড় জোর, বর্ম্মা রোডের যে অংশ চীনে অবস্থিত সেই অংশ আক্রমণ করিতে পারে।

মার্কিনের নিরপেক্ষতা আইন সংশোধিত হইল

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে নিরপেক্ষতা আইন সংশোধন বিল আঠার ভোটের আধিক্যে পাশ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর মার্কিন জাহাজগুলিকে শুধু স-শস্ত্র করাই চলিবে না, যুদ্ধাঞ্চলেও প্রেরণ করা চলিবে। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সংশোধনের ফলে নিরপেক্ষতা আইন প্রায় বাতিল হইয়া গিয়াছে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে যখন পৃথিবীব্যাপী সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়। নাৎসী-জার্ম্মানীর কার্য্যকলাপে ক্রমাগত মার্কিণ জাহাজ ডুবি হইতে থাকায় এই আইন সংশোধন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রথমে শুধু বাণিজ্য জাহাজ সশস্ত্র করিবার বিধানেরই ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আইসল্যাণ্ডের নিকট মার্কিন ডেষ্ট্রয়ার ইউবোটের আক্রমণে নিমজ্জিত হওয়ার পর যুদ্ধাঞ্চলে এবং যুদ্ধনিরত দেশের বন্দরে মার্কিণ বাণিজ্য জাহাজগুলিকে যাইবার অধিকার দিবার জন্য বিলে নূতন বিধান সংযুক্ত হয়। এই বিল পাশ করাইতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে।

—

ব্যবস্থা পরিষদের ব্যয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের বৎসরে কি পরিমাণ ব্যয় হয় তাহার একটি হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪০ সালের মে হইতে ১৯৪১ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হইয়াছে প্রায় দশ লক্ষ টাকা। এই টাকার মধ্যে পরিষদের সদস্যদিগের বেতন বাবদ গিয়াছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাঁহাদের দৈনিক ভাতা এবং রাহা খরচ বাবদ। অবশিষ্ট টাকা পরিষদের স্পীকার, ডেপুটী স্পীকার এবং পরিষদ বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় হইয়াছে। দেশের লোকের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে এই যে বিপুল ব্যয় ব্যবস্থা পরিষদের জন্য হইতেছে, তাহা দ্বারা কি কি লাভ হইল তাহাদিগকে একবার ইহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

—

ভারতে বীমা-ব্যবসায়

১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলির দেশী ও বিদেশী নূতন কাজের পরিমাণ ছিল ৪৫ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা এবং বৎসরের শেষে উহাদের চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। ভারতীয় কোম্পানীগুলির আয়ের পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে মোট ১৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা দাঁড়ায় এবং জীবনবীমা তহবিলে ৫ কোটি দশ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৬ কোটি ৩১ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। এই বৎসর কার্য্যপরিচালন বাবদ মোট যে ব্যয় হয়, তাহা প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩·৩২ ভাগ ছিল। পূর্ব্ব বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ৩·১৭ ভাগ।

১৯৪১ সালের ১৫ মে পর্য্যন্ত ১৯৩৮ সালের সংশোধিত বীমা আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করা বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২৯৫টি। উহাদের ভিতর ১৯৭টি ভারতীয় কোম্পানী। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির ১৫৯টি শুধু জীবন বীমার কাজ করে, ১৮টি কোম্পানী এক সঙ্গে জীবন বীমা ও অ-জীবন বীমার কাজ করে। শুধু অ-জীবন বীমার কাজ করে ২০টি কোম্পানী। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির ৬৩টি কোম্পানীর হেড অফিস বোম্বাই প্রদেশে, ৫৩টির বাংলায়, ৩০টির মাদ্রাজে, ২০টির পাঞ্জাবে, ১২টির দিল্লীতে, ৯টির যুক্ত প্রদেশে, ৩টির মধ্যপ্রদেশে, ৩টির বিহারে, ২টির সিন্ধুপ্রদেশে। আসামে ও আজমীরে শুধু একটি করিয়া বীমা কোম্পানীর হেড অফিস আছে।

কয়েকটি ভারতীয় বীমা কোম্পানী ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশ, বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা, সিংহল, মালয়, ও ষ্ট্রেইট সেটেলমেণ্ট প্রভৃতি স্থানে কাজ করিয়া থাকে। ১৯৩৯ সালে ঐসকল স্থানে উহারা মোট ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার নূতন কাজ করিয়াছে এবং ঐ বাবদ উহাদের প্রিমিয়ামের আয় দাঁড়ায় ৩৯ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে উক্ত কাজের পরি[illegible] ৬ লক্ষ টাকা বেশী।

ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলির ভ্যালুয়েশন্ সম্পর্কে ইসিওরেন্স ইয়ার বুকে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, "ইহা দুঃখের বিষয় যে, এখন পর্য্যন্ত কয়েকটি কোম্পানী তাহাদের প্রিমিয়ামে ও ভ্যালুয়েশনে যে হারে খরচের হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ ব্যয় করিতেছে।" দুর্ব্বল ভিত্তিতে নির্ভর করিয়া বোনাস ঘোষণা দ্বারা সাময়িক সুবিধা লাভ করা অপেক্ষা ভবিষ্যতের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া তোলা জীবন বীমা ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জ্জনের জন্য বেশী প্রয়োজন।

—

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

তৃতীয় বর্ষ } পৌষ, ১৩৪৮ { ১২শ সংখ্যা

ভারত-সমরের মহানায়ক

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সমরক্ষেত্রে পরিণত। যে সুপবিত্র ভূমি আর্য্যঋষি ও রাজন্যবর্গের যজ্ঞায়তন ছিল, যেখানে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগতো হিতায় চ' সমস্ত পার্থিব সম্পদ্ বিশ্বপ্রাণ বিষ্ণুর সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিয়া আর্য্য-সন্তানগণ আপনাদের আর্য্যত্বের পূর্ণতা সম্পাদনে ব্রতী হইতেন, আজ সেখানে তাঁহাদেরই বংশধরগণ স্বার্থপরতা লোভ ও বিদ্বেষের তাড়নায় সমরাগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিবার নিমিত্ত বিচিত্র বিষাক্ত মারণাস্ত্র লইয়া সমবেত। অসুরভাবাপন্ন ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আপনার ধ্বংসসাধনে সমুদ্যত। ভারতের প্রাণ এই আসুরিক শক্তির নিষ্পেষণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য যেন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। দেশ, জাতি ও সমাজের ঐক্য ও ধর্ম্মানুবর্ত্তিতা অক্ষুন্ন ও নিরাবিল রাখিবার উদ্দেশ্যে যে ক্ষাত্রশক্তির আবির্ভাব, দম্ভমোহমদান্বিত ক্ষত্রিয় রাজপুরুষগণ সেই কল্যাণকরী শক্তির অপব্যবহার করিয়া দেশকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সমাজে অত্যাচার, অবিচার ও পাপের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, নিয়ত সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা জাতির নৈতিক বল ও জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়াছেন, দেশের ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে—বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম ও তপস্যার শক্তিকে—তাঁহারা আসুরিক শক্তির অধীন করিয়া মারণাস্ত্রের উদ্ভাবনে, বিদ্বেষবহ্নির প্রজ্জ্বালনে, হিংসামন্ত্রের প্রচারকার্য্যে, অধর্ম্মকে ধর্ম্মের আসনে স্থাপনকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। ভারতের প্রাণ, মানবের অন্তরাত্মা, আর সহ্য করিতে না পারিয়া মুক্তির জন্য ব্যাকুল।

এই মহাসমরের মহানায়ক ভারতের প্রাণপুরুষ, বিশ্বমানবের আত্মার আত্মা, সর্ব্বযজ্ঞাধিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান। আসুরিক শক্তির নিপীড়ণ হইতে মানবাত্মাকে মুক্তি-দান করিতে তিনি বিগ্রহবান্ হইয়া আবির্ভূত। পক্ষবিশেষের জয় তাঁহার লক্ষ্য নয়। এক অসুরকুলকে নিগৃহীত করিয়া অপর এক অসুরকে মর্য্যাদা ও প্রভুত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। তিনি চান মানবাত্মার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি। তিনি চান মানবসমাজে অধর্ম্মের পরাভব ও ধর্ম্মের অভ্যুদয়। তিনি চান মানবজাতির মধ্যে সপ্রেম ঐক্যপ্রতিষ্ঠা, সাম্যমৈত্রী, পবিত্রতা ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা, সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় প্রাণের ইহাই আকাঙ্ক্ষণীয়। এই আদর্শের বিজয়েই ভারতপ্রাণের আত্মপ্রতিষ্ঠা, মানব-প্রাণের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা। এই সুমহান্ আদর্শের সংস্থাপনে আবশ্যক হইলে যথাসময়ে সকল প্রকার প্রতিকূল শক্তির বিনাশ সাধনে তিনি 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন।

সেই যুগে ভারতের প্রাণপুরুষ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারতের অখণ্ডতা সম্পাদন, ভারতীয় আত্মার মুক্তিসাধন, ভারতীয় মানব-সমাজে সনাতন

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের বিজয় প্রতিষ্ঠা এবং এই সুমহান্ আদর্শকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় মহাজাতি সংগঠন,—ইহাই ছিল তাঁহার জীবন-ব্রত। ভারতবর্ষকে তিনি মহামানবের মিলনক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। সকল প্রকার আসুরিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ ও সংগ্রাম, হিংসা ঘৃণা ভয়, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, নিম্নশ্রেণীর উপর উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞা, সরলচিত্ত অশিক্ষিতদের উপর কূটবুদ্ধি আধিপত্য-কামী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রবঞ্চনা ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিয়া, প্রেম ও সহানুভূতি, সেবা ও সহযোগিতা, যজ্ঞ ও ত্যাগ, সাম্য ও মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সমন্বয়ের উপর ভারতীয় সভ্যতার মহাসৌধ রচনা করিতে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই নব্য মহাভারত সংগঠনে তিনি চাহিয়াছিলেন সকল বিবদমান শক্তির মিলন,—আর্য্য ও অনার্য্যের মিলন, পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রিক শক্তি সমূহের মিলন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মিলন, সকল প্রকার রাষ্ট্রিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মতবাদের মিলন। সকল মানবের মিলন-সূত্র আবিষ্কারের জন্য তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাঁহার যোগজ প্রজ্ঞা, তাঁহার বিরাট্ প্রাণের সূক্ষ্ম অনুভূতি, তাঁহার বিশাল বুদ্ধির মহতী কল্পনাশক্তি। ভারতীয় সভ্যতাকে মহামানবতার উচ্চতর সুদৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি অকুণ্ঠচিত্তে সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত ছিলেন, সকল প্রকার স্বার্থপর আত্মম্ভরী বিদ্রোহী-শক্তির ধ্বংস সাধনে কৃত-সংকল্প ছিলেন, প্রয়োজন হইলে সকল প্রকার মিত্রদ্রোহ, জ্ঞাতিদ্রোহ, লোকক্ষয় ও করুণ ক্রন্দনের ভিতর দিয়া জাতি ও সমাজকে লইয়া যাইতে তাঁহার চিত্তে কোন শোক তাপ ভয়ের উদয় হইত না। মানবতার নিত্য আদর্শের সুপ্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার অশেষ প্রেমভাজন বহু সংখ্যক মানুষের অনিত্য দেহ বলি প্রদান করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন স্বভাবতঃ প্রেমঘনমূর্ত্তি। বিশ্বমানবের প্রতি ছিল তাঁহার নিরাবিল প্রেম, নিবিড় সহানুভূতি। উচ্চ নীচ সকলের প্রতি ছিল তাঁহার সমদৃষ্টি। এই প্রেম, এই সহানুভূতি, এই সমদর্শনই তাঁহাকে বাল্যাবধি প্রবল পরক্রান্ত বহু অসুর-দৈত্য-দানবের সহিত সংগ্রামে প্রমত্ত করাইয়াছে, অনেক মদোন্মত্ত স্বার্থোদ্ধত সম্রাট্‌কে তাঁহার শত্রুস্থানীয় করিয়াছে, তাঁহাকে অনেক ধনী মানী পণ্ডিত ব্যক্তির ভয়ের পাত্র করিয়াছে। প্রেমের মানুষকে আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পে যোদ্ধা হইতে হইয়াছিল। অহিংসা ও সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহাকে হিংসা ও মিথ্যার বিরুদ্ধে তেজের সহিত দাঁড়াইতে হইয়াছে, ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে তাঁহাকে অন্যায় ও অধর্ম্মের প্রতিরোধার্থে স্বীয় ক্ষাত্রশক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, দুর্ব্বল ও নিরীহদিগকে সবলের কবল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। জাতি ও সমাজের মধ্যে যখন অপ্রেমের ও অধর্ম্মের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে, প্রেমধর্ম্মকে তখন আত্মপ্রতিষ্ঠাকল্পে কতদূর কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়, শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মময় জীবন তৎসম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তস্থল।

কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার কোন রতি ছিল না। সর্ব্বত্রই তিনি প্রেমের পথে, শান্তির পথে, বেদ ও বিচারের সাহায্যে, মানুষের অন্তরাত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ভারতীয় প্রাণের সুমহান্ আদর্শ প্রচার করিতে প্রযত্নশীল ছিলেন। তিনি এই আদর্শ প্রচার কার্য্যে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রধান আচার্য্যরূপে লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের সহযোগিতায় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শ, জীবন ও বাণী নানা ভাষায়, নানা ছন্দে, নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে, প্রামাণিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যান কৌশলে, আর্য্যসমাজের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভাবধারা অবলম্বনে তিনি পারি-বারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ব-সমস্যার সমাধানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি মহাভারত ও পুরাণ-সংহিতার ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের জীবন, কর্ম্মাদর্শ ও ভাবাদর্শকেই চিরস্থায়ী রূপ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মত ও পথকেই তিনি সনাতন আর্য্য সাধনার তাৎপর্য্যরূপে প্রতিপাদন করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান

ও নূতন শাস্ত্রের রচনা করিয়াছেন। পারাশর কৃষ্ণের সমর্থন অপৌরুষের বেদের সমর্থনরূপে বেদের বাসুদেব কৃষ্ণকে সাহায্য করিয়াছিল।

আদর্শের প্রচার, সুশিক্ষার ব্যবস্থা, জাতি ও সমাজের শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের সমর্থন, পুরাতনকে স্বাভাবিক নিয়মে নূতন ধারায় প্রবাহিত করিবার কৌশল,—এই সকলই নূতন আদর্শকে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান উপায়। এই প্রকার গঠনমূলক কার্য্যের ভিতর দিয়াই জীবনীশক্তির সম্যক্ বিকাশের পরিপন্থী প্রাচীন কুসংস্কার সমূহ আপনা আপনি তিরোহিত হয়, প্রতিকূল শক্তিসমূহ পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ায়, জাতি ও সমাজ যেন কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিরাট্ মহান্ সমুদার সার্ব্বভৌম আদর্শের সুপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রধানতঃ এইরূপ গঠনমূলক উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির পরম ঐক্যভূমি সচ্চিৎপ্রেমানন্দঘন ভগবান্‌কে মানবজীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মানবজীবনকে ভাগবত জীবনে উন্নীত করিবার চরম আদর্শটি বাস্তব আকারে সকলের অন্তরে চিরজাগ্রত রাখিয়া, মানুষের পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রিক জীবন, আর্থিক জীবন, সবই ভগবৎকেন্দ্রিক ও ভগবৎসেবাময় করিয়া, মানুষের জীবন-প্রবাহের সব ধারাকে এক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া, বিশ্বের সব মানুষকে প্রাণে প্রাণে এক করিয়া তোলা, মানুষের সহিত মানুষের সব ভেদ হিংসা ঘৃণা ভয় বৈরভাবের সম্বন্ধ দূর করিয়া সব মানুষকে এক প্রেমের সূত্রে গ্রথিত করা, বিশ্বের মধ্যে সত্য প্রেম পবিত্রতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা,—ইহাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের সকল কর্ম্মের লক্ষ্য। ভারতের সম্যক্ ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করাই ছিল তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায়। তদুদ্দেশ্যে তিনি নানাপ্রকার সংগঠনমূলক উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন, যথাসম্ভব প্রেম, মৈত্রী, সুপরামর্শ, সুশিক্ষা, পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রিক সৌহার্দ্দ্যস্থাপন প্রভৃতি পন্থাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার এই সামনীতি সর্ব্বত্র সুফলপ্রসূ হয় নাই। অহিংসা ও শান্তির পথে ভারতে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা ও প্রেমরাজ্য স্থাপনের দুরতিক্রম্য অন্তরায় ছিল ভারতের সামরিক শক্তি ও অসুরবলদৃপ্ত রাজ্যভোগ-সুখপিপাসু রাজন্যবর্গের ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি। দেশের রাষ্ট্রশক্তি যাঁহারা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমগ্র দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ অপেক্ষা নিজেদের প্রভুত্বরক্ষায় অত্যধিক আগ্রহ-সম্পন্ন ছিলেন, সমগ্র ভারতীয় জাতির ঐক্যসংস্থাপনে প্রয়াসী না হইয়া নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপনেই তাঁহারা তাঁহাদের সামরিক শক্তি নিয়োগ করিতেন। নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও বিস্তার করিতে তাঁহারা ন্যায়ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতেও দ্বিধা করিতেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐক্য ও সাম্যের আদর্শ, প্রেমধর্ম্মের বাণী গ্রহণ করিতে মোটেই রাজী ছিলেন না। ইহা তাঁহারা বিপ্লবাত্মক মনে করিতেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বীর্য্যার্জ্জিত সম্পদ্, প্রভুত্ব ও মর্য্যাদা হইতে বিভ্রষ্ট করিবার কৌশল বলিয়া ধারণা করিতেন। অনেক বেদবাদরত বেদমর্ম্মার্থানভিজ্ঞ স্বার্থলোলুপ ব্রাহ্মণও তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতিকে বেদবিরোধী বলিয়া প্রচার করিতেন। এই সব বিরোধী শক্তিকে সংযত না করিলে তাঁহার আদর্শের অবাধ প্রচার অসম্ভব ছিল এবং দণ্ডনীতি ব্যতীত তাহাদিগকে সংযত করিবার উপায়ান্তরও ছিল না। ঐক্য শান্তি ও প্রেমের আদর্শ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দেশের বহুধা বিভক্ত অসুর-ভাব-ভাবিত পশুবল দৃপ্ত ক্ষাত্রশক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। মানবসমাজে ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীয়মান রাখিবার জন্যই ক্ষাত্র শক্তির আবশ্যকতা, ক্ষত্রিয় জাতির প্রাধান্য ও সংগ্রাম-শক্তি রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা, ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প বিসর্জ্জন দেওয়া, প্রেম ও সাম্যের বাণী প্রচারে বিরত হওয়া নিতান্তই কাপুরুষতা, মনুষ্যত্বের অবমাননা। বিরুদ্ধ ক্ষাত্রশক্তি ও অনার্য্য শক্তির দমন-কার্য্যে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে প্রধান সহকারী রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পারাশর কৃষ্ণের জ্ঞানবল এবং পাণ্ডব কৃষ্ণের অস্ত্রবল

সহায় করিয়া বাসুদেব কৃষ্ণ মহাভারত সংগঠনে প্রবৃত্ত হইলেন, বহু খণ্ডে বিভক্ত ভারতকে এক অখণ্ড মহাভারতে পরিণত করিতে প্রযত্নশীল হইলেন, ব্রাহ্মণ ও ম্লেচ্ছ, আর্য্য ও অনার্য্য, প্রবল ও দুর্ব্বল, জ্ঞানী ও মূর্খ, সকলের হৃদয়-কেন্দ্রে এক ভগবান্‌কে, সকলের সাধন-জীবনে এক বিশ্বজনীন আদর্শকে, সকলের প্রাণে এক ভক্তিমূলক যোগ-ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে স্বীয় অনন্যসাধারণ সংগঠনী শক্তি নিয়োগ করিলেন। ভারতকে এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত ও এক প্রাণে সঞ্জীবিত করিবার পথে যে সব প্রবল অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অপসারণ করিতে করিতেই কালক্রমে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের সূত্রপাত হইল। নূতন আদর্শের বিরোধী রাজন্যবর্গ পাণ্ডববিদ্বেষী প্রবল পরাক্রমী কুরুকুলনায়ক দুর্য্যোধনকে কেন্দ্র করিয়া সংঘবদ্ধ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবগণের শক্তি বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যলাভ শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ প্রচারের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। ধর্ম্মের জন্যে, মানবোচিত জীবনাদর্শের জন্যে, জাতি ও সমাজের ঐক্য শান্তি ও কল্যাণের জন্যে, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের সকল বিভাগে নেতারূপে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদর্শ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপনার সকল শক্তি নিয়োজিত করিতে ও জীবন উৎসর্গ করিতে রাজী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিতে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ স্বার্থ ছিল, দেশ, সমাজ ও জাতির কল্যাণ কল্পে তিনি ইহার আবশ্যকতা বোধ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণ কৌরব রাজ্যের ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ উত্তরাধিকারী হইলেও জন্মাবধি নিগৃহীত নির্যাতিত, দুর্য্যোধন ও তাঁহার কূটবুদ্ধি বন্ধু-বান্ধবগণের ষড়্‌যন্ত্রে নানাবিধ দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত। ধর্ম্মের আদর্শ জীবনে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সারাজীবন সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন প্রতীকার-সামর্থ্য সত্ত্বেও সহ্য করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুমহান্ আদর্শের পতাকা লোক-সমাজে বহন করিয়া লইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। নিজেরা নানা প্রকার নিগ্রহ ভোগ করিয়া দেশের ও সমাজের সকল নিগৃহীত প্রপীড়িত পদদলিত জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় হইয়া ধর্ম্মার্থে ও লোক-কল্যাণার্থে সংগ্রাম করিবার অধিকার তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। দেশের যে সব রাজা ও ক্ষত্রিয়বীর পাণ্ডবদের গুণমুগ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের আদর্শের পক্ষপাতী এবং অন্যায়-অত্যাচারের বিরোধী, তাঁহারা পাণ্ডবগণের পক্ষে নিজেদের শক্তি সংযোজিত করিলেন। ভারতের রাষ্ট্রশক্তিসমূহ কার্য্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইল,—একভাগ ন্যায়ের পক্ষে, অপর ভাগ বনিয়াদী স্বার্থের পক্ষে, একভাগ নিগৃহীতের পক্ষে, অপর ভাগ নিগ্রহকারীর পক্ষে, একভাগ ঐক্য ও মিলনের পক্ষে, অপর ভাগ ভেদ ও বিরোধের পক্ষে, একভাগ শ্রীকৃষ্ণের আদর্শের অনুরাগী, অপর ভাগ সেই নব আদর্শের বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ নিজের ও স্ববংশীয় বীরগণের ক্ষাত্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া এবং স্বীয় সখা অর্জ্জুন ও ভীমকর্ম্মা বৃকোদরের সংগ্রামশক্তির সাহায্য লইয়া তাঁহার পথের অনেক কণ্টক অপসারিত করিয়াছিলেন। এই সব কণ্টকোদ্ধার কার্য্য তিনি সাধারণতঃ এমন কৌশলে করিতেন, যাহাতে শান্তি-প্রিয় নিরীহ প্রজামণ্ডলী যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে নিষ্পেষিত না হয়, তাহাদের সরল জীবনধারা স্বচ্ছ প্রবাহে চলিতে পারে।

কিন্তু অবশেষে বিরাট্ মহাসমর অনিবার্য্যরূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার নিবারণ কল্পে শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক সামোপায়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। যুধিষ্ঠির পাঁচ ভাই-এর জন্য পাঁচখানি গ্রাম মাত্র লইয়া সন্তুষ্ট হইতে রাজী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দৌত্যকার্য্য করিয়া শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। বাল্যাবধি দুর্য্যোধন ও তৎপক্ষীয়-গণ পাণ্ডবদের প্রতি যত অত্যাচার করিয়াছেন, সবই তাঁহারা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত। ভীমকে বিষ-প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা, কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার ষড়্‌যন্ত্র, কপট পাশা-খেলায় তাঁহাদের ধন মান রাজ্য সুখ অপহরণ, এমন কি, রাজসভায় অসংখ্য রাজগণের মধ্যে কুলবধূ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বিবস্ত্রীকরণের নিদারুণ পাপ-প্রচেষ্টা,—সবই দেশে শান্তি ও প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রীকৃষ্ণানুগত মহাবীর পাণ্ডবগণ বিস্মৃত হইতে প্রস্তুত। কিন্তু শান্তির সব প্রয়াস ব্যর্থ হইল।

দেশের নৈতিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থা যখন মহাসমরের যোগ্য হয়, তখন তাহা নিবারণ করা কাহারই সাধ্য নয়। এই স্বার্থপর দাম্ভিক ক্ষাত্রশক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলে ঐক্য, শান্তি ও প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ নিয়তির কাছে নতশির হইয়া যুদ্ধে মত দিলেন। পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য,—দেশকে অশান্তির জ্বালা হইতে অব্যাহতি দিয়া ক্ষত্রিরাজকুলসমূহ নিজের ভাগ্যরচনার জন্য,—কুরুক্ষেত্রের বিশাল ভূমিতে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে মহাসমরের অবসান ঘটাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে সুব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে এই মহাসমরে অস্ত্রধারণ করিবেন না, সংকল্প করিলেন। অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়া পাণ্ডব পক্ষে তিনি তাঁহার নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার বিশাল নারায়ণী সেনা দুর্য্যোধনের প্রার্থনায় তিনি তাঁহার পক্ষে প্রদান করিলেন।

আঠার দিনের যুদ্ধে ভারতের দুর্দ্ধর্ষ ক্ষাত্রশক্তি প্রায় নির্ম্মূল হইল। বাঁচিয়া রহিলেন শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুগ্রহে তাঁহার পতাকাবাহী পঞ্চপাণ্ডব। আর রহিলেন নারী, শিশু, বৃদ্ধ,—যাঁহারা যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। নিঃক্ষত্রিয় প্রায় ভারতবর্ষে যুধিষ্ঠির রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন। ক্ষাত্রশক্তির শ্মশানের উপরে শ্রীকৃষ্ণের সুমহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল, অখণ্ড ভারতের বনিয়াদ নির্ম্মিত হইল, নবযুগের সূচনা হইল। ব্যাসদেব ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংগঠন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন।

কৃতজ্ঞতা

শ্রীপ্রীতিকুমার বসু

হে প্রিয় মম, তোমারে লয়েছিনু চিনে
জীবনের পরম দুর্দ্দিনে—
যে দিন প্রাণেতে মনেতে মম বেঁধেছিল দ্বন্দ্ব,
ভেঙ্গে গিয়েছিল মোর জীবনের ছন্দ,
যেদিন হারায়েছিনু মম যাত্রাপথ
থেমে গিয়েছিল মোর রথ—
সেদিনের এক শুভপ্রাতে
তব সাথে
হয়েছিল কানাকানি,
মনে মনে হয়েছিল জানাজানি,
প্রাণে প্রাণে লেগেছিল দোল,
হৃদিতট হয়েছিল উতরোল…

তুমি এনেদিয়েছিলে মোর ধ্বনি,
বীণা বেজেছিল রিণিরিণি,
গতি এসেছিল ফের ফিরে
আবার চলেছিনু ধীরে ধীরে,
আঁখি পেয়েছিল ফিরে জ্যোতি,
জীবনে এসেছিল সঙ্গতি।

* * *

তাই আজ ক্ষণে ক্ষণে
তোমারেই পড়ে মনে…।
আমার এ ভাঙ্গা লেখনীতে
যার প্রভাবেতে
প্রথম এসেছিল বেগ,
ঝরে পড়েছিল কত হৃদয় আবেগ ;…
প্রথম যে ভেঙ্গেছিল সুপ্তি মম
মুক্তি দিয়েছিল মোরে যে প্রিয়তম,
তারে আজ বলে যাব শুধু দু'টি কথা—
আমার প্রাণের যাহা গোপন বারতা।

মোর জীবনের কূলে
তুমিই তো তুলেছিলে ঢেউ,
তাহা আর জানে না তো কেউ।
তাই আজি এ রাতে
গোপনেতে
বলেগেনু সেই কথা
তোমার কানেতে।

মা

(উপন্যাস)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

তিন

দুপুরে খাওয়ার পরেই সে বেড়াতে বেরিয়েছিল, অতসীকে বলল "খুকী, তোরা ভাইবোনে মিলে ততক্ষণ বাক্সগুলি গুছিয়ে রাখ আমি এই আসছি।" আসতে আসতে বেলা অবিশ্যি একেবারে গড়িয়ে গেল। কিন্তু উপায় কি? কয়েকবাড়ী ক'রে রোজ না সারলেই নয়। এতদিনের বাস উঠিয়ে চ'লে যাবার আগে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করবেনা এ তো আর হয় না।

বিমলাবাবুর বাড়ীটা পার হয়েই সেই বন। বন বলা যায় কিনা সন্দেহ, তবে তার কাছে এইকটা বাঁশঝাড়, অশথ গাছ, ষাঁড়াষষ্ঠীতলা, কাপাস শিমুল গাছের ঘন সারি, বেগুনি ফুলফোটা জারুল, নিম, সজনে, বুনো তেঁতুল আর তলায় তলায় গাঁদাল কচু আর দ্রোণ ফুলের ঝোপ আরো কত কি ঝোপঝাড় সে নামও জানে না, এই সব মিলে এক মহা অরণ্য। বিয়ের পর যে-বার সে ফিরে যায়, এখানে থেমে স্বামী বলেছিলেন, ওই গাছতলায় প্রণাম কর। তারপর থেকে কতদিন কতবার এই গাছ-দেবতার পায়ে সে নমস্কার জানিয়েছে। আর ওই যে ষষ্ঠিতলা, খোকাখুকিদের জন্মের পরে ওখানেই তো সে পূজো দিতে এসেছিল। কবিরাজি ওষুধের অনুপান খুঁজতেও বারকয়েক আসতে হয়েছে। এখানে এলেই মনটা একটু অন্য রকমের হ'য়ে যায়। এখানে খোলা মাঠ নেই, বন বলতে তা এইটুকু। আর আছে কতকগুলো পুকুর, তা ছাড়া গ্রামের গন্ধ নেই এখানে। সবিতার কাছে এ জায়গা মস্ত এক সহর, তার বাপের বাড়ীর তুলনায় তো বটেই।

তবু যাহোক্ এখানে আকাশ দেখা যায়, বনের গন্ধ ব'য়ে বাতাস আসে, জ্যোৎস্না ওঠে, অন্ধকার আকাশে তারা ঝক্‌ঝক্ করে; রাত্তিরে পাড়ার কুকুরগুলি চেঁচিয়ে প্রহর জাগে; পুকুর থেকে কলসী ব'রে জল আনতে হয়। উৎপল বলেছে, "মা, একটা কথা কিন্তু জেনে রাখ, শেষে যেন রাগ কোর না। ক'লকাতায় চারিদিকে ঘুপসি, ইট আর কাঠ, আর কলের জল নিয়ে হাঙ্গামা, দিনরাত সাড়াশব্দ, শান্তি নেই সেখানে।" সমস্ত ব্যাপারটা সে ধারণা করতে পারে না, তবু ভয় হয়েছে তার মনে, কিন্তু তার আর কি ক'রবার আছে? সে তো আর যেতে চায়নি, যাবার কথা ভাবতেও পারেনি, সুদূর কল্পনায়ও না।

যেদিন সে অতসীর হাতে সুক্ত দিয়ে আর পলতার বড়া দিয়ে ভাত পথ্য করল, সেদিন দুপুর বেলায় ছেলে আর মেয়ে খেতে বসেছে। সে দরজায় হেলান দিয়ে বসে তাই দেখছে, এমন সময় উৎপল বল্‌ল, "মা, এখন তো যাহোক্ সেরে উঠেছ, এখন তুমি আর একটু গায়ে বল পেলেই যাওয়ার উয্যুগ করো।" সে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো, "তোর ক'লকাতা যাবার এই যে সেদিন বললি, আরো প্রায় একমাস বাকী।"

"না, এবার শুধু আমার নয়, অতসী আর তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। অতসীর পরীক্ষার ফল ও শীগ্‌গিরই জানা যাবে, এরপরে তো আর এখানে পড়া চলবে না, আর তোমাকে একলা ফেলে আমরা যেতে পারিনে।"

প্রথমটায় সে একেবারে বেঁকে বস্‌ল। সে কি কথা, এতকাল পরে এখানের বাস উঠিয়ে, বাড়ী ঘর দুয়ার ফেলে রেখে ক'লকাতায় যাওয়া, সে কি হয়? তা ছাড়া অত খরচ আসবে কোথা থেকে? উনি যা

রেখে গিয়েছিলেন তার সবই তো প্রায় উড়ে গিয়েছে। এখানে বসেই কি খাব ঠিক নেই।

অতসী কি বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে উৎপল বললে, "মা শোন, উপোস যদি করতেই হয় সব জায়গাতেই সমান। কিন্তু আমরা ওখানে উপোস করলে আর তুমি একলাটি এখানে না খেয়ে জ্বরে ভুগে সারা হ'লে কার কি লাভ হবে বল? এস না একবার ভাগ্য পরীক্ষা করি! অন্ততঃ আমাদের কাছে পেলে তো মনে একটু শান্তি থাকবে তোমার, এখানে তো তাও না।"

কি যে বলে! ভাগ্য পরীক্ষা! ভাগ্যকে ওরকম খোঁচাতে নেই। সবিতা কি বলতে পারে তার ভাগ্য ভাল নয়? ভাগ্য যে তার কোল জুড়ে স্বর্গের চাঁদ-সূর্য্য পাঠিয়ে দিয়েছে, ওরা তার কি বোঝে? কত রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় অতসীর মুখে চেয়ে, উৎপলের মুখে চেয়ে তার চোখে যে জল এসে পড়ে, সে কি বঞ্চিত ভাগ্যের বেদনায়, না অসামান্য সৌভাগ্যের শঙ্কায়। মা হ'য়ে তার মত সুখ কবে কোন মেয়ে পেয়েছে!

যাওয়া যখন ঠিক হ'য়ে গেল তখন কোথা থেকে তার মনে একটু একটু ক'রে আগ্রহ জেগে উঠতে লাগল। বলতে গেলে তার এই ছত্রিশ বৎসরের জীবনে এই প্রথম বাইরে যাওয়া। স্বামীর সঙ্গে সে কখনো কোথাও যায়নি, যাবার কথা মনেও হয়নি তার। তবে শাশুড়ীর অনন্তব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে তারা রেলে চ'ড়ে একবার এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে সাতগাঁয়ের শিবতলায় গিয়ে দু-দিন ছিল সেখানের পাণ্ডার বাড়ীতে। পাণ্ডার স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হ'য়ে গিয়েছিল সেই দু-দিনেই। ঘরের কাজকর্ম্ম থেকে দুটোদিনের সম্পূর্ণ ছুটি। আজো মনে আছে, ব্রত উদ্‌যাপনের সব কাজকর্ম্ম চুকে গেলে পর তারা খেতে বসেছিল। পাণ্ডার স্ত্রী পরিবেশন করেছিল কাঁচামুগের ডাল, কচুভাজা, শশার অম্বল আর খুব টক দই। গরীব পাণ্ডার বাড়ীতে এর চেয়ে আর কি জুটবে, তবু তাদের আন্তরিকতার কথা আদরের কথা আজও সে ভোলেনি।

শাশুড়ী যখন অমর চ'লে যাবার বছর খানেক পরে কাশীবাস করতে চ'লে যান, তখন তার একবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল তার সঙ্গে সেও যায়, কিন্তু খোকা তখন পেটে, উপায় ছিল না, তাই মনের ইচ্ছে সে চেপেই রেখেছিল। চেপে না রাখলেও যে যাওয়া হোত তা অবিশ্যি নয়। এমন কি শাশুড়ীর মৃত্যুর আগে অসুখের সংবাদ পেয়ে স্বামী দেখতে গেলেন তখনও তার যাবার কথা উঠল না। অত খরচ, হাঙ্গামা কে পোয়াবে? স্বামী একেবারে শ্রাদ্ধ সেরে ফিরেছিলেন।

এতদিনের রুদ্ধ জীবনে আজ হঠাৎ বাইরে থেকে হাওয়া এসেছে। যাক, বহুদিনের কত সাধ এবার পূর্ণ হবে, গঙ্গায় নাওয়া, কালীঘাটে পূজো দেওয়া সে তো আছেই, তা ছাড়া গাড়ী-ঘোড়া, রাজপ্রাসাদের মত বড় বড় বাড়ী, কত রকমের আলো, রাতে চাঁদ-তারা ঢাকা পড়ে, অমাবস্যার আঁধার ঢাকা পড়ে এমন সব আলো, দোকান-পাট—চিরজীবন কত গল্পই সে শুনেছে। মুগ্ধ মনে কত কল্পনা সে করেছে, উৎপল বড় হ'য়ে চাকরী করবে, তখন সে গিয়ে একবার ক'লকাতা দেখে আসবে। যাক্, ছেলের দৌলতেই আজকেও তার যাওয়া।

বিয়ের পরে অমর একবার এখানে বৌ নিয়ে এসে দু-দিন থেকে গিয়েছিল, তখন আবার শম্ভুনাথের খুব অসুখ—তাঁর মৃত্যুর আগের মাসটায়, বৌকে ভাল ক'রে আদর যত্ন কিছুই করা হয়নি। অমর কোথায় এক চা-বাগানের ম্যানেজার, বাপের শ্রাদ্ধ করতে সে এখানে আসেনি, যেখানে কাজ করে সেখানেই সেরেছিল। সে এখন খুব কাজের মানুষ হয়েছে, খুব বিষয়ী, নিরীহ শম্ভুনাথের বিপরীত। এখানের বাড়ীতে তারও অংশ আছে, তবে এপর্য্যন্ত সে কিছুই দাবী করেনি। এখন তারা চ'লে গেলে কি করবে বলা যায় না। উৎপলকে সবিতা তার সন্দেহের কথা জানাল। উৎপল বললে, "এ বাড়ী তো ভাড়া দিয়ে যাবো রথী জ্যাঠামশাই ভাড়া আদায় করবেন, দাদা যদি দাবী করেন অর্দ্ধেক তাঁকে দিয়ে দিলেই চলবে, তবে এ বাড়ী এ সহরে বারো-চৌদ্দ টাকার বেশী তো আর ভাড়া হবে না।"

জিনিষ পত্র কি নেওয়া হবে, না হবে, তাই নিয়ে সবচেয়ে মুস্কিল বাধল। সবিতার ইচ্ছে, সে যথাসম্ভব

সবই নিয়ে যায়। ছেলে-মেয়েদের চেষ্টা, যাতে যথাসম্ভব সবই রেখে যাওয়া হয়। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে রাগারাগি হ'য়ে কথা বন্ধ হবার যো হোল। উৎপল যতই বোঝাবার চেষ্টা করে, সেখানে তিনহাত ঘর আর এক টুকরো ঘেরা বারান্দায় রান্না, এর মধ্যে এত জিনিষপত্র থাকলে আমরা থাকবো কোথায়? সবিতা বলে, ওখানে গিয়ে কি তবে খাওয়া-দাওয়ার পাট তুলে দিতে হবে, তা' হ'লে গিয়ে লাভ কি? ওখানে কি লোকের হাঁড়ি কলসী ডালা কুলো চালুনি জাঁতা কিছুই লাগে না? ওখানের লোকে কি মাটিতে জিনিষ ছড়িয়ে রাখে?

শেষটায় দু-পক্ষের মধ্যে একটা রফা হোল। যা রইল সবিতা সযত্নে একটা ছোট ঘরে বন্ধ করে একটা মস্ত তালা ঝুলিয়ে দিল। এ ঘরখানা মাটির নয়, সিঁদ কেটে চুরির ভাবনা নেই, তবে যদি কেউ তালা ভাঙ্গে।

দেখতে দেখতে যাবার দিন এসে পড়ল। পাড়ার সব বাড়ীর মেয়েরা দলে দলে রোজ এসে কত দুঃখ প্রকাশ করেছে সে চলে যাবে শুনে। ক'জনে আবার কত আশা দিয়েছে, ক'লকাতায় গিয়ে কপর্দ্দকশূন্য কত লোক রাজা হ'য়ে গিয়েছে। অমন সোনার চাঁদ ছেলে-মেয়ে, ভালই হবে তাদের। অতসীকে তার ইস্কুলের বন্ধুরা নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ালো, টীচাররা খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন যে, সে আরো পড়াশুনো করবে, এখন থেকে বসে বসে বিয়ের দিন গুনবে না।

মিশনরী মেমদের যত্নে গড়ে তোলা স্কুল, টীচার বেশীর ভাগই খৃষ্টান, তাঁরা অতসীকে অনেক উপদেশ দিলেন। এসব দেখে শুনে সবিতার মনে গর্ব্বের ও আনন্দের সীমা রইল না। তাদের নিয়ে এত ব্যস্ত হ'তে এ পর্য্যন্ত কাউকে দেখা যায়নি, ভাগ্যিস্ ক'লকাতায় যাওয়া ঠিক হোল।

রেলগাড়ী। থার্ডক্লাস হ'লেও ভিড় খুব কম। অতসী ছোট বিছানাটা খুলে বেঞ্চির ওপর পরিপাটি ক'রে পাত্‌ল, সঙ্গের জিনিষ-পত্র সব এক জায়গায় সযত্নে গুছিয়ে রাখল। তবু সবিতা নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না, চুপি চুপি বললে, "খুকী তোর বাক্সটা যে ওই ওদের জিনিষের অত কাছে রাখলি, ওরা নামবার সময় যদি নিয়ে চ'লে যায়?"

অতসী হেসে বল্‌লে, "কিছু ভয় নেই মা, আমরা সব রয়েছি কি করতে?"

সবিতা জানে তারা কি করতে আছে। একটু পড়েই দু-জনে ঘুম লাগাবে এ তো জানা কথা। তবে সে নিজে জেগে থাকতে পারলেই হয়, নইলে আর লটবহর নিয়ে ক'লকাতা পৌছুতে হবে না। এই তো গেল বছর খোকা তার চামড়ার বাক্সটি কার সঙ্গে দিব্বি বদলে নিয়ে এল, জামা কাপড় বই খাতা, কিছু টাকাকড়ি সব গিয়েছিল, আর সে যে বাক্স এনেছিল তা খুলে দেখা গেল আজে-বাজে কি কতগুলো জিনিষ, একটা ছেঁড়া সার্ট ও একখানা কাপড়, সে বাক্সটা ও আবার গিয়ে স্টেশনে সে জমা দিয়ে এল। বাক্সটাই না হয় কাজে লাগতো, তোরটা যখন গেছেই। কিন্তু সে কথা কি ওরা শোনে?

কিন্তু ঘুম কি আসতে পারে? ক্রমাগতঃ বাইরে চেয়ে চেয়ে চোখ ব্যথা করছে এরি মধ্যে। দু-বার কয়লার গুঁড়োও চোখে পড়লো, কিন্তু সে যাই হোক, আর ছেলে-মেয়ে যতই কেন না মুরুব্বিয়ানা করুক, সে পারবে না, সে নেবে না তার চোখ ফিরিয়ে। এরকম সে জীবনে দেখেনি, দেখেনি। গাছপালা, টেলি-গ্রাফের তার, আকাশ, মেঘ, সব পাল্লা দিয়ে ছুটছে, কেউ থামছে না, হাঁপিয়ে পড়ছে না। ওই দু-খানা ঘর গাছপালা ঘেরা, সামনে একটা পুকুর, পুকুরের ঘাটে একটি বৌ। মুসলমান বাড়ীর বৌ বোধ হয়, ভালো ক'রে দেখা তো গেল না। ওই ঘরের চালে কি চমৎকার লাউগাছ লতিয়ে উঠেছে, ডাঁটাগুলো কি পুষ্ট, কিন্তু একটু আশমিটিয়ে চেয়ে দেখবার আগেই উধাও হ'য়ে গেল। কি জোরে বাতাস এসে গায়ে লাগছে। তার রুক্ষ চুল মুখে কপালে উড়ে এসে পড়ছে, গলার কাছটা ঠাণ্ডায় শির্‌শির ক'রে উঠছে, তবু কি আরাম। তাই লোকে রেলগাড়ী চ'ড়ে হাওয়া বদল করতে যায়, নইলে অমন হাওয়া!

মানুষের মনে লুকিয়ে থাকে কত অতীত জীবন,

এক জীবনেই কত জীবন, তারা হারায় না। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে অবচেতন মনে তারা আশ্রয় নেয়। আবার যদি কোনদিন কেউ উৎসুক হ'য়ে অনুসন্ধান ক'রে তারা উঠে আসে সাগরের তল থেকে শুক্তির মত, বয়ে আনে মুক্তা। তখনি মনে হয়, যে-সব দিন চ'লে গেল তারাই সব চেয়ে সুখের ছিল, তারাই জীবনে স্বর্গসুধা এনেছিল, তাদের স্মৃতি এখনও সঞ্জীবিত করে মন-প্রাণ। কিন্তু অল্প ক'জন লোক এমন আছে যারা অতীতের স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চায় না, তাতে সুখও পায় না, বর্ত্তমান যাদের কাছে অতীতের চেয়ে অনেক জীবন্ত, সবিতা সেই দলের। তার জীবনে যৌবন-শেষে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় আজও নব নব সম্ভাবনা। সে সুখী হ'তে চায়, সুখী হ'তে জানে, চেষ্টা ক'রে নয়, আগ্রহের জোরে নয়, সে সামনে যা পায় তাই আঁকড়ে ধ'রে সুখী হয়, পেছন ফিরে আপশোষ করে না। তাই দুঃসাহসী যৌবনের সামনে-চাওয়া দৃষ্টি এখনও তার দুই চোখে।

(২)

এক-একটা ষ্টেশন এক-একটা রাজ্য।

ইষ্টিশান তো আর কারুর বাড়ী নয়, তবে এত সুন্দর ক'রে তৈরী করেছে কেন?

সব ইষ্টিশান একই রকমের কেন? সেই ফুল-গাছের বেড়া-দেওয়া, ছায়াওয়ালা একটা বড়গাছ কাঁঠাল বা কৃষ্ণচূড়ো, তেঁতুল বা অমনি, লাল ইটের দু'তিনখানা ঘর, পাশে মাষ্টারের বাড়ী। শোবার ঘর অনেক সময় চোখে পড়ে, মাষ্টারের ছেলে, মেয়ে, বৌকেও দেখা যায় কখনো। ষ্টেশনের বাইরে রাস্তায় হয় ঘোড়ার গাড়ী, নয় মোটরবাস, কি কোথাও কাছাকাছি খাল থাকলে ছোট ছোট নৌকা সাজানো, লোকজন নামছে উঠছে। মাঝে এক ষ্টেশনে নতুন বিয়ের বর-বৌ উঠল তাদের পাশের কামরায়। বৌটি সিল্কের শাড়ী, নতুন গয়নাগাটি পরেছে, মুখখানা মন্দ নয়, তবে রংটা কালো, তার বর দেখতে বেশ। তারা এর আগের ষ্টেশনে নেমে গিয়েছে। খুব বাজনা-বাদ্যি ক'রে বর-বৌ নিয়ে গেল। মেয়েটি অতসীর বয়সী। অতসীর যেদিন বিয়ে হবে!

খুকীর বিয়ের কথা সে কি আর ভাবে না? ভাবে, কিন্তু ভেবে কূল-কিনারা পায় না। টাকা-পয়সা নেই, এমন কি বিনাপণে বিয়ের যোগাড়ও তার নেই। কিন্তু তা না-ই থাক, মেয়ে যে কি এক ধরণের, তার বর একটিও তো এপর্য্যন্ত চোখে পড়ল না সবিতার। মেয়ের মনের কথা সে জানেনা, কিন্তু সবিতা তার নিজের মনের কথাটি জানে। (এইটুকু জানে, কেমন হ'লে অতসীর সঙ্গে মানাবে)। উৎপলের মত সুন্দর চেহারা, তবে রংটা আর একটু ফর্সা। জোত্ জমিজমা, বাড়ী-ঘর, মস্ত সংসার, তার মত একলা সংসারে একলাটি মুখ বুঁজে থাকা নয়। ননদ, যা, শ্বশুর-শাশুড়ী দেওর, দাস-দাসী সবমিলে জম্‌জম্ করছে। দু'বেলায় শতেক পাত পড়ে। সামনে মস্ত দীঘি, পেছনে মেয়েদের স্নানের পুকুর, কাকচক্ষু-নির্ম্মল-জল। পুকুর পাড়ে ফলের বাগান। বার মাসের সব পূজোপার্ব্বন কিছু আর বাকী থাকে না। পূজোর সময় ছোট ছেলে-মেয়েরা রঙিন ধুতি শাড়ী পরে বাঁশী বাজিয়ে বাজি পুড়িয়ে হৈচৈ করে ঘুরে বেড়ায়, বাড়ীর মেয়েরা পরে সব বেনারসী শাড়ী। শাশুড়ী দামী গরদের শাড়ী পরে মঙ্গলাচরণ করেন, বৌ-ঝিরা সব এগিয়ে গুছিয়ে দেয়। আরতির সময় লাল বেনারসী শাড়ী-পরা ঝকঝকে সোনার গয়না পরা অতসীর মুখখানিতে ঝাড়লণ্ঠনের রঙিন আলো পড়ে, ধূপের ধোঁয়ায় চারিদিকে গন্ধের ভোজ লাগে। ঢাকীরা ঢাক বাজায় বুড়ো পাগল জামাই ভোলানাথের যত নিন্দে। মেনকা নিন্দা করেন আর মনে মনে হাসেন।

ছেলেমানুষ জামাইয়ের সহস্র আবদারে সবিতাও রাগ দেখিয়ে খুব ধমক দেয়, আবার তার লজ্জিত মুখটি দেখে হেসে ওঠে। অতসীকে যে নেবে সে সবিতার কতদিনের দিবাস্বপ্নে, কতদিনের নিভৃত কল্পনায় তিলে তিলে গড়ে তোলা। উৎপলের মত যে তাকেও মানুষ করেছে, তার আশা, কল্পনা ও স্বপ্ন মিলিয়ে।

একটা খুব বড় ষ্টেশনে এবার গাড়ী দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি অনেক রেলের লাইন, ষ্টেশনের বাড়ীটা যেন ইন্দ্রপুরী। সে অবাক হয়ে দেখছিল। দু-জন সাহেব সিগারেট খেতে খেতে পায়চারী করছে। টিকিট দেখে

বেড়াচ্ছে একজন মেমসাহেব। সবিতার বুক উত্তেজনায় ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। গাড়ী চড়ে এমন সব ইষ্টিশান পার হয়ে তারা যে যাচ্ছে একথা কি বিশ্বাস হবার মত? এমন সময় উৎপল কাছে এসে ডাকল, "মা তুমি যদি হাত মুখ মাথা ধুয়ে নিতে চাও তবে নেমে চলো, এখানে কাছেই কল আছে বেশ সুবিধে।"

অমনি অতসী বললে, "আর মা, একটু ফল আর দুধও খেয়ে নাও এখানে নেমে; গাড়ীতে তো আর তুমি খাবে না?"

এতক্ষণে সবিতা বাস্তব জগতে পা দিল। ঠিক, খাওয়া দাওয়ার কথা তো সে ভুলেই ছিল, খোকা-খুকির না জানি কত ক্ষিদেই পেয়েছে। এমন কি, লজ্জার কথা তার নিজেরও ক্ষিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে। নেমে যেতে তার আপত্তি ছিল না, তবে অতসীকে একলা রেখে নামা যায় কি করে? কিন্তু সে জন্য ছেলে বা মেয়ের কোন দুর্ভাবনা দেখা গেল না। অতসী বললে, "এই তো আমি জানলা দিয়ে চেয়ে আছি, তুমি আমাকে দেখতেই পাবে।"

সে বেশ ভাল করে মুখ, হাত-পা ধুয়ে নিল, ছেলে গামছা হাতে করে পাশে দাঁড়িয়ে। তার দিকে চেয়ে সে হাসিমুখে বলল, "চানটা ক'রে নিতে পারলে আরো ভালো হোত, কতক্ষণ গাড়ী দাঁড়াবে রে এখানে? সঙ্গে চা'ল ডাল সবই তো আছে, ইটের উনুন পেতে অনায়াসে তোদের দুটো ফুটিয়ে দিতে পারি।"

উৎপল বললে, "অত সময় পাওয়া যাবে না মা, চটপট নাও।"

তারপরে ছুরী দিয়ে একটা কচি শশা ছাড়িয়ে সে মায়ের হাতে দিল, "খাও মা, বেশ ঠাণ্ডা লাগবে।"

সে খেতে খেতে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। কাঁচের বড় বড় বাক্স ভরা কত রকমের খাবার বিক্রি হচ্ছে। একজন লোক বেশ মোটা এবং লম্বা, নেমে ঠোঙ্গায় করে একরাশ খাবার দু'মিনিটে সাবার করে এখন জল খাচ্ছে। একটি ছোট মেয়ে মায়ের কোলে বসে একটা গোল বড় বিস্কুটে কামড় দিতে দিতে তার দিকে চেয়ে দেখছে, সম্ভবতঃ তার খাওয়াটাই দেখছে, ওকে একটু দিতে পারলে হোত। উৎপল মাটির ভাঁড়ে গরম দুধ এনে বললে, "শীগ্গির খেয়ে নাও মা, গাড়ীর বেশী দেরী নেই।"

তার একটুও ইচ্ছে ছিল না—কিন্তু ছেলে এমন তাড়া লাগাল যে, এক চুমুকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দুধ খেয়ে তবে পরিত্রাণ পেল। তারপর জল খেয়ে মুখ ধুয়ে গাড়ীতে ফের চড়ে বসল। ইতিমধ্যে এক অন্ধ বুড়াকে হাত ধরে একটি বছর দশের মেয়ে খুব করুণ গলায় পয়সা চাইছে। মেয়েটির মুখে এক চমক চেয়েই (শ্যামবর্ণ জটপড়া ময়লাচুল, আধ ছেঁড়া কাপড় পরনে) তার মন একেবারে গলে জল। অতসী রঙিন সুতোর নক্সাকাটা ব্যাগ থেকে একটি পয়সা বার করে মেয়েটির হাতে দিলে তবে সে স্বস্তি পেল। উৎপল একটু হেসে বললে, "মা, এরকম হাজার হাজার ভিখিরী দেখবে পথে-ঘাটে, ইষ্টিশানে, ক'লকাতার রাস্তায়। আমাদের তো গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। ভেব না এদের সকলেরই খুব অভাব। কেউ কেউ ভিক্ষে করে টাকা-পয়সা জমিয়ে ফেলে, জান?"

অতসী বললে, "বেশ জানি দাদা, সেদিনও কাগজে পড়লাম এক ভিখিরী মারা গেছে, তার ঘরে পয়সা সিকি আধুলীতে মিলে পাঁচশো না কত টাকা পাওয়া গিয়েছে। মা, ভিখিরী দেখেই অত ব্যস্ত হ'য়ে পড়োনা, বুঝলে?"

ততক্ষণে মেয়েটি বুড়োকে হাতে ধরে অন্য গাড়ীর কাছে নিয়ে গিয়েছে। গলায় খুব ভিজে করুণ সুর এনে সে বলছে, "অন্ধকে দয়া কর আজ দু'দিন খাইনি ও বাবা, ও মা অন্ধকে দয়া কর।" দৃষ্টিহীন শূন্য সাদা চোখ, লাঠি ঠুক-ঠুক করে অন্ধ মেয়ের হাত ধরে মন্থর পদে হেঁটে চলেছে।

ছেলে আর মেয়ের হিতোপদেশের দরকার ছিল না একটুও। সবিতা অত বোকা নয়, ছেলেমেয়েদের চাইতেও আরো ভালো ক'রেই জানে (এতটা বয়স সাধে হয়নি) যে, সংসারে লোকে ঠকায়, ফাঁকি দেয়, মিথ্যে করে ভিক্ষে চায়। এ সবই জানা তার, তবু আজ ওদের মুখে এসব জানা কথাই শুনতে ভাল লাগছে না।

একটা কথা কেউ জানে না, ভিখিরীর ওপর মায়ের করুণায় বাধ্য হয়ে পয়সা যারা দিল তারাও নয়,

পয়সা যে পেল ঐ মেয়েটি সেও নয়, রাজ্যিপাট জোড়া এত যে লোকজন এরা কেউ না। এরা জানে না সে আজ রাজরাণী। দাসদাসী লোকলস্কর ধনরত্ন নিয়ে তীর্থে চলেছে রাজরাণী। কোন্ ভিখিরী ঠকিয়ে পয়সা আদায় ক'রে নিচ্ছে সে খবরে তার কি এসে যায়।

সন্ধ্যের পরটায় তার একটু ঘুম এসে গিয়েছিল, হঠাৎ নাড়া খেয়ে জেগে উঠে দেখ্ল অতসী ডাকছে, "মা ওঠো, এখুনি নামবো, এসে গেল যে।"

সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, গাড়ীর গত অতি মৃদু হয়ে এসেছে, ঝক্ঝক করতে করতে একটা মস্ত ইষ্টিশানে ঢুকছে। কি আলো চারদিকে, মনটা বিস্ময়ে কেমন করে ওঠে! তার চোখের ভাগ্যে যে এমন সব দ্রষ্টব্য অপেক্ষা ক'রে আছে জীবনে তা কি কোনদিন সে ভেবেছিল? ক'লকাতা এসে গেল তা'হলে! একদিন খুব ছোটবেলায় সে এখান থেকে চ'লে গিয়েছিল, আজ আর কিছুই মনে নেই। সে যে কোনদিন ছোট মেয়েটি ছিল—ওই ওপাশের বেঞ্চিতে বসা বৌ-এর কোলে ঘুমন্ত মেয়েটির মতই ছোট, এ তার মনে হয় না। সে যেন চিরদিন মা।

না, শুধু আলো নয়, শব্দেরও কি বিচিত্র সমারোহ এখানে। কাল শেষ রাত্রে গাড়ী চড়ে ছিল। আজ সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে পার হয়ে গিয়েছে, দেখে ও শুনে চোখ কান দুই-ই ক্লান্ত হয়েছে তার। জিনিষপত্র নামিয়ে উৎপল তাকে হাত ধরে নামাল। অতসী লঘু পায়ে নেমে এল, মেয়ে যেন কতকালের বাসিন্দে ক'লকাতার। সবিতা ভাবে, মেয়ে কেন কিছুতেই আশ্চর্য্য হয় না, সবই কি ক'রে ওর কাছে এত সহজ? এই তো ষ্টেশনে আরো কত মেয়ে গাড়ী থেকে নেমেছে, কেউ তো তার মেয়ের চেয়ে সহুরে সপ্রতিভ বলে মনে হচ্ছে না। না বাহাদুরী আছে বটে খুকীর।

এমন সময় একটি ছেলে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ডাকল, 'উৎপল'।

উৎপল কুলীর মাথায় জিনিষ ওঠাতে ব্যস্ত ছিল, ডাক শুনে ফিরে বলে উঠল, "আরে রমেশদা এতক্ষণে? আমি ভাবলাম চিঠি কি তবে পাওনি? বাসা করার সবই তোমার ওপরে ভার, তুমি এলে না দেখে মনে এমন ভাবনা হচ্ছিল!"

সবিতা ভাবল, মনে যে ভাবনা হচ্ছিল খোকাকে দেখে ত একটু টের পাওয়া যায়নি! ওরা কি রকম নিজেকে ঢেকে রাখতেই যে পারে, যেমন মেয়ে তেমনি ছেলে। এমন সময় রমেশ নত হয়ে তাকে প্রণাম করলে। লম্বা ছেলেটি উৎপলের চেয়েও গড়ন শক্ত, নাকমুখ তেমন চোখা নয়, তবে বেশ শ্রী আছে মোটের ওপর, রংটা আধ ময়লা, দেখে মনে হয় রোদে পোড়া। তাড়াতাড়িতে আশীর্ব্বাদ করতে ভুলে গেল সবিতা, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল একটু। তারপর ছেলেটি অতসীকে হাত যোড় ক'রে নমস্কার করলে; সেও হেসে তাই করল দেখে রাগ হোল সবিতার। তোর দাদাও দাদা বলে ডেকেছে, মাথাটা নোয়াতে কি দোষ হয় বাপু, লোককে একটু সম্ভ্রম করে চলতে হয়না? তবে লোকের সামনে মেয়েকে সে আর কিছু বল্ল না।

রমেশ বললে, "তা'হলে রওয়ানা হওয়া যাক্, আমি সব ঠিক করেই এসেছি।"

উৎপল একটা ট্যাক্সিতে জিনিষপত্র তুলে সবাইকে উঠিয়ে দিল। সবিতার গা-হাত-পা ব্যথা করছিল দীর্ঘকাল কাঠের বেঞ্চিতে বসে বসে। গাড়ীর নরম গদিতে ঠেসান দিয়ে আরামে চোখ বুঁজে এল তার। সত্যি, বাড়ী ছেড়ে আসবার সময় ও আজ সারাদিন মাঝে মাঝে রাজগঞ্জের কথা ভেবে তার মন খারাপ হয়েছে বটে, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে অভিজ্ঞতা যা হচ্ছে তা কেবলই সুখের ও আরামের। এত বছর পরে সম্পূর্ণ নতুন আর এমন একটা পরীরাজ্যের মত জায়গায় নতুন করে গৃহস্থালী সংসার পেতে বসতে মনে ভয় ও উদ্বেগের চেয়ে উত্তেজনা ও আগ্রহই বেশী হচ্ছিল তার। এতদিন খোকা ক'লকাতা থেকে যখন বাড়ী যেত, তার মনে হোত যেন সে দিগ্বিজয় ক'রে এল, সমুদ্র থেকে যেমন জাহাজ ভেড়ে এসে বন্দরে। আজ সেও ভাগ নিতে বেরিয়েছে, সেও দু-চোখ মেলে কত কি দেখ্বে, কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে প্রতিদিন। এতদিন

খোকার জগতের একটা দেশ থাকতো তার অজানা, আভাসে ইঙ্গিতে যতটুকু সে জানতে পেত। ছেলে আবার যা মুখবোজা, দু'কথার জায়গায় চার কথা সে কয় না। এখন থেকে মাকে না জানিয়ে তার আর চলবে কি ক'রে? রাজগঞ্জে সে যেমন ছোট হয়ে তাকে ধরা দেয়, এখানেও তাই দিতে হবে, তবেই না ক'লকাতা আসা তার সার্থক হবে? খুকীর খুব ভাল বিয়ে, খোকার মস্ত চাকরী, সুন্দর বৌ, তার কোলে তাদের ছেলেমেয়ে, সন্ধ্যেবেলায় তাদের কাছে রূপকথার গল্প বলা, খোকা-খুকী আবার ছোট হয়ে ফিরে আসবে তার কোলে, চাঁদকে ডেকে ডেকে ঘুম পাড়াতে হবে তাদের। এ সবই অপেক্ষা ক'রে আছে এই ক'লকাতায়। কেমন ক'রে কি হবে কিছুই সে জানে না, শুধু সে জানে ক'লকাতায় সবই হতে পারে। যাদুঘরের দেশ ক'লকাতা।

এ কি, এরি মধ্যে গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়েছে! মোটরগাড়ী ছোটেও বাতাসের মত, হবে না কেন? যেখানে গাড়ী দাঁড়াল তার পাশে একটা গলি, গলির ভেতর গাড়ী ঢুকবে না, প্রকাণ্ড একটা হলদে রং-এর বাড়ী সামনেই, সবিতা অবাক হয়ে ভাবল,—এই এত বড় বাড়ীতে থাকব নাকি আমরা, তবে যে খোকা বলছিল,—কিন্তু তক্ষুণি রমেশকে গলির ভিতরে ঢুকে পড়তে দেখে বুঝল, হলদে বাড়ীটা তাদের জন্য নয়। কিন্তু যে বাড়ীটায় তারা গিয়ে ঢুকলো সেটাও তো কম বড় নয়? উৎপলকে জিজ্ঞেস্ করতে সে বললে, "ভেবো না মা কিছু, এখুনি বুঝতে পারবে।" তারপরে সব শোনা ও বোঝা গেল। বারান্দায় রান্না আর দু'খানা যতদূর সম্ভব ছোট ঘর তাদের। দু'খানা ঘরের পরে বারান্দায় কাঠের দেয়াল। তার ওধারে অন্য ভাড়াটের বাস। এত সিঁড়ি ভেঙে শেষটায় এই এতটুকু ঘর দু'খানায় এসে সে একটু নিরাশ না বোধ ক'রে পারল না। তবে একটা ভরসা এই যে, ঘরে বিজলী আলো জ্বলছে, ক'লকাতায় এসে আর লণ্ঠন জ্বালাতে হবে না এটা কম কথা নয়। তারপরে রমেশ বলল, তাদের জন্যে একটা ছোট স্নানের ঘর আছে এবং জলের কোন অসুবিধে নেই। এটাও নেহাৎ তুচ্ছ সুখবর নয়। তাদের একপাশে ভাড়াটে, অন্য দিকে নয়। অর্থাৎ এক টেরে তাদের ঘর দু'খানি, এও ভালো বন্দোবস্তই। এর জন্যে নাকি এক টাকা ভাড়াও তাদের বেশী, তা হোক্। অল্পে অল্পে মায়া জন্মাতে লাগলো সবিতার। নিরাশ হয়ে বেশীক্ষণ থাকা তার স্বভাব নয়। মেজে ঘষে এই দু'খানি ঘরকেই সে কি ক'রে ফেলবে দেখবে এখন লোকে। অতসীকে বললে, "আগে নেয়ে ফেলি একখানা কাপড় বার করে দে দেখি খুকী, সারাদিনটা রেলে ইষ্টিমারে চড়ে গা ঘিন-ঘিন্ করছে।"

অতসী কাপড় বার করে দিয়ে বলল, "নতুন জায়গার জলে বেশী স্নান কোর না মা, কালই তবে জ্বরে পড়বে।"

রমেশ স্নানের ঘর দেখিয়ে আলো জ্বেলে দিয়ে বলল, "একটা ঘটি আর বালতী কিনেই রেখেছি আমি, ঘরগুলোও ধুইয়ে রেখেছি, কিন্তু আপনাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি করব ঠিক বুঝতে পারিনি। ওদের জন্যে অবিশ্যি হোটেল থেকে ভাত আনানো মোটেই হাঙ্গাম হবে না, আপনার জন্যে শুধু দুধের যোগাড় আছে আর—"

বাধা দিয়ে স্নেহসিক্ত স্বরে সে বললে, "কিছু ভেবো না, আমার তো রাতে কিছু দরকার হবে না। তুমি ওদের যা হয় দুটি খাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও বাবা।"

রমেশ চলে গেলে সে বালতীতে জল ভরতে ভরতে ভাবতে লাগল, কি ভাল ছেলেটি, খোকার চেয়ে কতই বা বড় হবে, অথচ কি বুদ্ধিসুদ্ধি, কত ব্যবস্থা আর কি মায়ামমতা। খোকার যে অমন বন্ধু আছে তাতো কই কোন দিন বলেনি? ওদিক থেকে অতসীর গলা শোনা গেল, "হোটেলের ভাত আমি খেতে পারব না দাদা, কোন দিন ত খাইনি, তুমি গিয়ে খেয়ে এস। আমি শুধু চা খাব একটু।"—মেয়েটার বুদ্ধি আছে। হোটেলের ভাত খেতে কি মেয়ে মানুষের প্রবৃত্তি হতে পারে? তবে ছেলেদের কথা আলাদা, আচার-বিচের ওসব তো আর ওদের জন্যে নয়, ভগবান্ ওদের ঘেন্না বলে কোন জিনিষ দিয়ে পাঠান নি।

ক্রমশঃ

বিলাতের শিল্প-বিপ্লব

শ্রীমতিলাল সাহা, এম-এ

(১) বিপ্লবের ধরণ-ধারণ

প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া মানুষ তাহার প্রভুত্ব কায়েম করিয়াছে যন্ত্রপাতির বলে। মানুষে আর জন্তু-জানোয়ারে তফাৎ শুধু এই জন্য নয় যে, জন্তু-জানোয়ার হিংস্র কমুক ও লোভী আর মানুষ সহৃদয় প্রেমিক এবং উদার। আসল তফাৎ এই যে, মানুষ যন্ত্রস্রষ্টা।

বর্তমানে যে সকল চমকপ্রদ যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা মানুষের বহু হাজার বৎসরের সাধনার ফল। এই সাধনা সুরু হইয়াছে মানুষের বাঁচিবার জন্য—আহারান্বেষণের সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণা হইতে। কোন অবস্থায়ই মানুষ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই। সে চির অশান্ত। হয়তো পশুপক্ষীও অশান্ত ও অসন্তুষ্ট। কিন্তু গতি ও উন্নতির যুদ্ধে মানবেতর প্রাণী মানুষের কাছে হার মানিয়াছে শুধু মস্তিষ্ক চালনার অক্ষমতায়, আর মানুষ জিতিয়াছে মাথা খাটাইয়া। অভাবের বোধই উন্নতির জনক।

বর্তমানে রেল-ষ্টীমার ও হাওয়া গাড়ী এরোপ্লেনে চড়িয়া, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ও রেডিওর মধ্যে বাস করিয়া যদি একবার পশ্চাতে ফিরিয়া সুদূর অতীতের সেই আদিম মানব-সমাজকে দেখিবার চেষ্টা করি, তবে সেই দৃশ্যের হিংস্র বিভীষিকায় আজিকার মানুষের হৃৎকম্প হইবে। একদিকে হাঙ্গর-কুমীরে ভরা অকূল পাথার, আর দিকে মেঘ-ছোঁয়া পাষাণের স্তূপ, এবং মাঝখানে জানোয়ারে ভরা গভীর বন। তাহার মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যায় নগণ্য মানব—কোন অভিজ্ঞতা নাই, দুনিয়ার কেন ও কি-র কোন জবাব জানা নাই, মরণের সহস্র উন্মুক্ত দুয়ারের সম্মুখে শুধু আছে বাঁচিবার সহজ প্রবৃত্তি!

সেই অসহায় অবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছাইতে বহু বৎসরের কঠোর পরিশ্রম ও বহু কাঠখড় পোড়ানর দরকার হইয়াছে; এবং এই উন্নতি হইয়াছে ধাপে ধাপে। অজ্ঞ অসহায় মানুষ যখন একটা পাথরের টুকরা তুলিয়া আত্মরক্ষার একটা উপায় বাৎলাইতে পারিল, তখনই সে একধাপ পার হইল। আবার সেই পাথর যখন ভাঙ্গিয়া ঘসিয়া মাজিয়া নিজের ব্যবহারের উপযোগী করার কথা ভাবিতে পারিল, তখন সে পার হইল আরও এক ধাপ। উন্নতির এক একটি ধাপ অবলম্বন করিয়া সভ্যতার এক-একটি স্তর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কোন স্তরেই মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারে নাই। কারণ কোন অবস্থায়ই মানুষ সুখী নয়। যখনই কোন এক জায়গায় সে ভাবিয়াছে যে, তাহার উন্নতির চরম হইয়াছে এবং সেই মূলধন ভাঙ্গাইয়া খাইলেই চলিয়া যাইবে, তখনই সে দেখিয়াছে, কোথা হইতে আর একদল 'ছোটলোক,' তাহার উপর টেক্কা মারিয়া উঠিয়া গিয়াছে এবং সে সভ্যতার নিম্নতর স্তরে পড়িয়া থাকিয়া 'অসভ্য' আখ্যা পাইয়াছে। এই এক-এক ধাপ উন্নতিই এক-একটি যান্ত্রিক বিপ্লব; এবং এই যান্ত্রিক বিপ্লবের ফল যখন মানুষ আহারান্বেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া খাদ্য ও ভোগ্য সংগ্রহের উপায় বদলাইয়াছে, তখন উহাকে শিল্প-বিপ্লব বলা হইয়াছে। এই রকম কতকগুলি যান্ত্রিক ও শিল্প-বিপ্লব অবলম্বনে সভ্যতার এক-একটা যুগ ধরা হইয়াছে। যেমন—

১। অতিপ্রাচীন প্রস্তর-যুগ (Aeolithicage)—খৃঃ পূঃ ১,০০,০০০ (?)—খৃঃ পূঃ ৩০,০০০ (?) যবদ্বীপে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

২। প্রাচীন প্রস্তর-যুগ (Palæolithic age)—খৃঃ পূঃ ৩০,০০০ (?)—খৃঃ পূঃ ৮,০০০ (?) এই যুগ দুইভাগে ভাগ করা হয়—

(ক) অনুন্নত (Lower) খৃঃ পূঃ ৩০,০০০ (?)—খৃঃ পূঃ ২০,০০০ (?)

(খ) উন্নত (Upper) খৃঃ পূঃ ২০,০০০ (?)—

খৃঃ পূঃ ৮,০০০ (?) অরিগ্‌নেশিয় (ফ্রান্স, ইংলণ্ড, দক্ষিণ ওয়েল্‌স), ম্যাগ্‌ডেলেনিয় (ব্যাভেরিয়া) প্রভৃতি সভ্যতা এই যুগের পরিচায়ক।

(৩) নূতন প্রস্তর-যুগ (Neolithic age) খৃঃ পূঃ ৮,০০০ (খৃঃ পূঃ ৪,০০০) আজিলিয় (ব্যাভেরিয়া) সভ্যতাএই যুগের পরিচায়ক।

(৪) ধাতব যুগ (Metal age) খৃঃ পূঃ ৪,০০০— বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত সভ্যতাগুলির কোষ্ঠী-বিচার করিলে দেখা যায় যে, উহাদের সূচনা হইয়াছে প্রস্তর ও ধাতব যুগের সংঘর্ষের কালে (খৃঃ পূঃ ৫০০০) এবং সেই দিন হইতে গোড়া পত্তন হইয়াছে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার। ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়ে এই সভ্যতাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা চলে—

১। সুপ্রাচীন (Ancient) খৃঃ পূঃ ৫০০০—খৃঃ পূঃ ৭০০।

(ক) আসিরো-ব্যাবিলোনিয় (Assyro-Babylonian)

(খ) মিশরিয় (Egyptian Pharaonic)

(গ) মহেঞ্জোদারিয়

(ঘ) মাইশিনিয় (Mycenaenian)

(ঙ) হিব্রু (ইহুদীয়)

(চ) ইন্দো-আর্য (i) বৈদিক হিন্দু

(ii) পারসিক ইরানীয়

(iii) গ্রীসিয় (Hellenic)

(ছ) চৈনিক।

২। প্রাক্-আধুনিক (Early modern) খৃঃ পূঃ— ৭০০-১৩০০ খৃষ্টাব্দ

(ক) হিন্দু, গ্রীক, রোমক, চৈনিক,

(খ) য়ুরোপীয়

(গ) সারাসানিক

৩। মধ্যযুগ (Mediaeval) ১৩০০ খৃঃ পূঃ—১৭৫০ খৃষ্টাব্দ

৪। আধুনিক (Modern) ১৭৫০ খৃঃ—বর্ত্তমান কাল। আদিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত যত কিছু উন্নতি সমস্তই হাজার হাজার যান্ত্রিক ও শিল্প বিপ্লবের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। একটা বিশেষ যুগের যান্ত্রিক কল-কৌশল (technique) পৃথিবীর এক কোণে উদ্ভাবিত হইয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আবার বিভিন্ন রকমের বস্তুগত এবং বিষয়গত (objective and subjectiv) অবস্থার জন্য পৃথিবীর আর এক কোণে হয়ত আর এক ধাপ উন্নতির সূচনা হইয়াছে এবং এই নূতন উন্নতি বাহির হইয়াছে দিগ্বিজয়ে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়া যে নূতন যান্ত্রিক যুগ কায়েম করিয়াছে তাহা অতীতের হাজার হাজার শিল্প-বিপ্লবের সহিত আর একটি সংখ্যা যোগ করিয়াছে মাত্র।

এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া জানা দরকার—দুই কারণে। প্রথমত য়ুরোপীয়গণ জাহির করিয়া থাকেন যে, আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতায় উন্নত হওয়ার ক্ষমতা লাভ এসিয়াবাসী অ-শ্বেতকায় জাতির বংশগত গুণ-বিরুদ্ধ, বিশেষত বর্তমান লৌহযুগের যন্ত্রপাতি নির্মাণে উষ্ণমণ্ডলের অধিবাসীরা (অর্থাৎ ভারতবাসী) একদম অপারগ। নবীন জাপানের যান্ত্রিক উন্নতি, টাটা কোম্পানী ও বাংলা-দেশের কয়েকটা লৌহশিল্প এই মতবাদের বাস্তব প্রত্যুত্তর দিয়াছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের কোন কোন নেতা যুক্তি দিয়া থাকেন যে, বর্তমান যা[illegible] শিল্প য়ুরোপের ধন-লালসার সৃষ্টি এবং উহা ভারতের সনাতন ধর্ম ও সভ্যতার বিরোধী। অতএব উহা সর্বথা বর্জনীয়। এই উভয়বিধ যুক্তিই মানুষের ক্রমোন্নতির বিশ্লেষণ মূলক ইতিহাসের অজ্ঞতাসূচক, এবং অবৈজ্ঞানিক আবেগ প্রকাশক মাত্র। যে হেতু আধুনিক যন্ত্রশিল্প য়ুরোপীয়, সুরু হইয়াছে একটা য়ুরোপীয় দেশে এবং এতদিন য়ুরোপীয়েরাই উহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে, শুধু এই জন্যই বিজ্ঞান এবং যান্ত্রিক কলকৌশল (technique) কোন বিশেষ দেশের নিজস্ব হইতে পারে না। গত পৌণে দুইশত বৎসরের মধ্যে এই যান্ত্রিক কৌশলের যে বিস্তার হইয়াছে তাহাতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উহা একদিন সারা দুনিয়া জয় করিয়া নিজের য়ুরোপীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিবে। এই শিল্প-পদ্ধতি এত প্রাণবান যে, আজিকার

গরুর গাড়ীর মতো চিমনীর ধোঁয়া ও মোটরগাড়ী একদিন জনসাধারণের নিত্য-নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইবে। এখন প্রশ্ন, এই ধোঁয়া আমাদেরই উত্তর পুরুষেরা উড়াইয়া পূর্বপুরুষের নামে দীপান্বিতার বাতি জ্বালিবে, না অন্য কোন বলিষ্ঠ জাতি আমাদিগকে ইহলোকে হঠাইয়া দিয়া চিম্‌নি গাড়িবে?

বর্তমান শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে সারা পৃথিবীতে মোটামুটি একই উৎপাদন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। একই গরুর গাড়ী, পানসি নৌকা, গরু-ঘোড়া-মহিষ টানা কাঠের লাঙ্গল, ঢাল তলোয়ার গাদাবন্দুক ও ঘোড়ার ডাক পৃথিবীময় ছড়ান ছিল। এমন কি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তাক্ষেত্রেও য়ুরোপ ও এশিয়া একই স্তরের ছিল। এ বিষয়ে অধ্যাপক ডাঃ বিনয়কুমার সরকারের বস্তুবিজ্ঞানে এশিয়া ও য়ুরোপের মধ্যে সমতা নির্ণয় উল্লেখ করা চলে।—

"১। নির্ভুল বিজ্ঞানে (Exact science) ভারতবর্ষ (খৃঃ পূঃ ৬০০—১৩০০ খৃষ্টাব্দ)=নির্ভুল বিজ্ঞানে য়ুরোপ (খৃঃ পূঃ ৬০০—১৩০০ খৃষ্টাব্দ)

২। ভারতে নবজাগরণ (১৩০০—১৬০০ খৃষ্টাব্দ)=য়ুরোপে নবজাগরণ (Renaissance)—(১৩০০—১৬০০ খৃষ্টাব্দ)

"উপরের সমতায় 'কিন্তু' ও 'যদি' যোগ করিয়া বুঝিতে হইবে; কেননা উহা মোটামুটি হিসাব মাত্র।

"তৃতীয় যুগের জন্য আমরা নীচের হিসাব মানিয়া লইতে পারি—নির্ভুল বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ (১৬০০—১৭৫০) বিজ্ঞানে য়ুরোপ (ইংলণ্ড)— (১৩০০—১৬০০ খৃষ্টাব্দ)।

"সাধারণত নবজাগরণ নামে পরিচিত যুগে নির্ভুল-বিজ্ঞানের ব্যাপারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে কোন তফাৎ কায়েম হয় নাই। কেবল নবজাগরণের পরবর্ত্তী যুগেই অর্থাৎ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে (ডেকার্টিস্, ১৫৯৫—১৬৫০; নিউটন, ১৬৪২—৭২) য়ুরোপ ঐ সব ক্ষেত্রে ভারতকে দূরে ফেলিতে আরম্ভ করে। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের ভারতের স্থান ১৬০০ খৃষ্টাব্দের য়ুরোপের কাছাকাছি।" (ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বস্তুবিজ্ঞান (Positive Science) শাখার সভাপতির অভিভাষণ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭। লেখকের বঙ্গানুবাদ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আবিষ্কৃত ষ্টীম-এঞ্জিনকে কাঠামো করিয়া ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব হয়, তাহা অতীতের সহিত সংযোগহীন কোন "বিপ্লব" নয়, এবং উহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের যতটা পরিবর্তন হইয়াছে তাহার অনেক বেশী বদল হইয়াছে উৎপাদন-পদ্ধতির। উলট্-পালটের নূতনত্বের চেয়ে উহার আকস্মিকতা ও অতুলনীয় গতিবেগের জন্যই এই পরিবর্তনের নাম হইয়াছে শিল্প-বিপ্লব। লোহার সরঞ্জাম-শিল্পে এই পরিবর্তন সুরু হয়, কিন্তু বয়ন-শিল্পে নূতন আবিষ্কারের ফলেই উহার তীব্রতা বাড়িয়া যায়। যেখানে অতীতের হাজার বছরেও দেশের বাহিরের কাঠামো'র সাধারণ-ভাবে কোন বদল হয় নাই, সেখানে যন্ত্র-পাতির এই সামান্য অদল-বদলের ফলে পৌণে দুইশ' বছরের মধ্যেই দেশের চেহারা একদম বদলাইয়া যায়—এবং নূতন নূতন জটিল সামাজিক সমস্যা আসিয়া হাজির হয় বলিয়াই উহার নাম 'বিপ্লব'!

শিল্পক্ষেত্রে এই বিপ্লবের আশু পরিণাম উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি। উৎপন্ন-দ্রব্য-সম্ভার অতি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলে এবং জাতির ও ব্যক্তির সম্পদ যাহা বাড়ে তাহা অভূতপূর্ব এবং অচিন্তনীয়। নীচের হিসাব হইতেই ইহা মোটামুটি বোঝা যাইবে।

ইংলণ্ডে আমদানী

কাঁচা পশম

১৭৬৬——১৯,২৬,০০০ পাঃ (ওজন)।
১৮৫৭——১২,৭৩,৯০,০০০ ,, ।

কাঁচা তুলা

১৬৯৭——১৯,৭৬,০০০ পাঃ (ওজন)
১৭৬৪——৩৮,৭০,০০০ ,,
১৮০০——৫,৬০,০০,০০০ ,,

পশমী পণ্য রপ্তানী

১৬৯৯——৩০,০০,০০০ পাঃ (মুদ্রা)।
১৭৬৪——৪০,০০,০০০ ,,
১৮৩৩——৭৯,০০,০০০ ,,

নরম লৌহ (Pig iron) উৎপাদন

১৭৪০——১৭,০০০ টন

১৮০৬——২,৫৮,০০০ ,,

১৮৫২——২৭,৪১,০০০ ,,

মোট বিদেশী বাণিজ্য (১,০০০ পাঃ-মুদ্রা)

	রপ্তানী	আমদানী
১৬১৩	২৪,৮৭,	১২,৪১
১৬৯৯	৬৭,৮৮	৭১,২০
১৭৫০	১,২৬,৯৯	৭৭,৭২
১৮০৫	৩,১০,৬৪	২,৮৫,৬১
১৮৪০	১১,৬৪,৭৯	৬,৭৯,৩২
১৮৫০	১৯,৭৩,৩০	

লোক সংখ্যা (ইংলণ্ড ও ওয়েলস্)

১৬৮৮——৫৫,০০,০০০

১৭৫০——৬৪,০০,০০০

১৮০১——৮৮,০০,০০০

১৮৫৩——১,৭৯,০০,০০০

১৯৩১——৪,৫০,০০,০০০ (স্কটলেণ্ড সহ)

এই ধন-সম্পদ বৃদ্ধির চেয়েও অধিকতর সুদূর প্রসারী আর একটি পরিবর্তন এই শিল্প-বিপ্লবের দ্বিতীয় এবং প্রধান পরিণাম। কানিংহামের মতে এই পরিবর্তনগুলিই একত্রে শিল্প-বিপ্লব। ইহার মধ্যে আছে সংস্কৃতি ও চিন্তা-জগতের আলোড়ন, যেমন, উদ্ভাবনী শক্তির অগ্রগতি এবং সামাজিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। ইহার ফলে এমন সব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে যাহার সমাধান সহজসাধ্য নহে। নূতন বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার, কয়লা দিয়া লোহা জ্বালান ও লোহার কাজ করার নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ এবং নূতন ধরণের চরকা ও মাকুর উদ্ভাবন এই পরিবর্তনের একদিকের পরিচালক। অপর দিকে এই নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সাধারণ মজুরকে (কুটীর) শিল্পক্ষেত্রে স্থানচ্যুত করায় দেশের সামাজিক জীবনের সর্ব্বত্র আসিল এক বিপুল আলোড়ন।

বাস্তবিক পক্ষে যন্ত্রের উন্নতি ও শিল্পক্ষেত্রে যান্ত্রিক ব্যবহারের বিস্তার একটা ব্যাপক পরিবর্তনের অঙ্গমাত্র। উহা ধনতন্ত্রের প্রসার। পূর্ব হইতেই, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের প্রবেশ এবং প্রভাব বিস্তার সুরু হইয়াছিল। পশ্চিম ইংলণ্ডে পশম শিল্পক্ষেত্রে ধনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বয়ন-শিল্পে তাঁতিরা ভ্রাম্যমান মহাজনদের নিকট হইতে তুলা ও পশম ধার করিয়া বয়ন করিত এবং নিজেদের পারিশ্রমিক লইয়া উৎপাদিত বস্ত্র ছাড়িয়া দিত। কয়লাখাত, বস্ত্র, ও লৌহশিল্পে ধনিক নিজের খুঁটি গাড়িতে পারিয়াছিল। কারণ বাজারে মাল কেনা-বেচায় তাহার একটা বিশেষ সুবিধা ছিল এবং নূতন কারখানা (plant) গড়ার ঝুঁকি লওয়ার সাহস তাহারই থাকিতে পারিত। বয়ন-শিল্পে কলকব্জার প্রয়োগে কুটীরের তাঁতী অপেক্ষা ধনিকেরই বেশী সুবিধা হইল, কারণ দামী যন্ত্রপাতি কিনিবার সামর্থ্যও তাহার আয়ত্তে।

নূতন পদ্ধতিতে উৎপাদনের ফলে লাভের মাত্রা এত বৃদ্ধি পাইল যে, লোকে কৃষিকার্যের জন্য জমিতে মূলধন খাটান'র চেয়ে শিল্পে মূলধন নিয়োগ করাই সুবিধাজনক মনে করিল। এইভাবে ক্রমে টাকা খাটান'র উপযোগী সম্পত্তি হিসাবে জমির মর্যাদা কমিতে আরম্ভ করিল।

শিল্পক্ষেত্রে কলকব্জার আমদানী শ্রমিকের অবস্থার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শারীরিক গাধার খাটুনী তাহার কমিল না, কিন্তু তাহাকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নামিয়া প্রতি[illegible] রুজি হারাইবার আশঙ্কার মধ্যে দিন গুজরান করিতে হইল। সমাজের ভারসাম্যে শক্তি-কেন্দ্র ব্যক্তি হিসাবে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন-মজুরের জীবন-যাত্রার মান কমিতে আরম্ভ করিল; এবং তাহার অবস্থার হীনতা চরমে উঠিল ওয়াটারলুর যুদ্ধজয়ের পর-পরই। প্রচলিত আইন যখন তাহাকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইল, তখন মালিকের লোভের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে শ্রমিক সংঘবদ্ধ হইয়া প্রথমেই এলিজাবেথের আমলের আইন পুনরায় প্রচলন করিবার দাবীতে আন্দোলন সুরু করিয়া দিল। এই সময়ই ট্রেড্ য়ুনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত। কানিংহাম্ মজুরের এই দাবীকে

অবাস্তব গোঁড়ামী প্রসূত (impracticable conservatism) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আসলে ইহার পশ্চাতে ছিল আত্মরক্ষার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া ও সম্মুখে যে-দীনতার মধ্যে সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিক্ষিপ্ত হইতে চলিয়াছে তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করিয়া সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম মানুষের সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সম্ভূত। শ্রেণী-সংগ্রাম ও তৎসহ যাবতীয় মতবাদের বীজ শিল্পবিপ্লবই বপন করিয়াছে।

নূতন পদ্ধতিতে মজুর সম্পর্কিত বিশেষ পরিবর্ত্তনের মধ্যে দেখা যায় জটিলতর শ্রমবিভাগ ও বিশেষ শ্রেণীর কুশলী (specialised) মজুরের উদ্ভব, এবং অনিপুণ মজুরকে সরাইয়া নিপুণ কারিকরদিগকে কর্ম্মে নিয়োগ।

শিল্পে প্রাকৃতিক শক্তি নিয়োগের প্রথম স্তরে আপ্-শক্তি (water power) নিয়োজিত হয়। কাজেই যে যে জায়গায় আপ্-শক্তি ব্যবহারের উপযোগী জলস্রোত অবস্থিত সেই সেই স্থানেই শিল্প কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে, এবং তাহারই ফলে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের উদ্ভব। প্রথমে ওয়েষ্ট রাইডিং অঞ্চলে, শিল্প-সমূহ আপ্-শক্তির জন্য, এবং পরে, বাষ্প ব্যবহার আরম্ভ হইলে কয়লা-উৎপাদক অঞ্চলে শিল্প-সমূহ কেন্দ্রীভূত হয়। অপর পক্ষে পূর্ব অঞ্চলের ক্ষীয়মান শিল্পগুলির আর পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় নাই। শিল্প-সমূহের স্থান ত্যাগ এবং স্থল বিশেষে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইহার প্রত্যক্ষ ফল গ্রাম ও সহরে পার্থক্য বৃদ্ধি ও কুটীর শিল্পের ক্ষয়-প্রাপ্তি। পূর্বে কৃষক জমি চাষ করিত এবং অবসর সময়ে কুটীরে বসিয়া উপার্জনের দ্বিতীয় উপায় নানারকম শিল্পকর্ম্মে অর্থ উপার্জন করিত। এখন এক দিকে কুটির-শিল্পী যান্ত্রিক-শিল্পের নিকট উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য প্রতিযোগীতায় আঁটিয়া উঠিতে হইল অসমর্থ, এবং অন্যদিকে শিল্প-সমূহ কেন্দ্রীভূত হওয়ায় শিল্প-কেন্দ্রে সমস্ত শ্রমিককে বাস করিতে হইল। কারখানার শ্রমিকের পক্ষে আর জমিতে কৃষিকর্ম্ম করা সম্ভব রইল না। কৃষি ও শিল্পের সংযোগ এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। লোকাধিক্যের জন্য শিল্পকেন্দ্রগুলি সহরে পরিণত হইল। আর কৃষিকেন্দ্র আগের মতই পল্লীগ্রামেই রহিয়া গেল।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে।)

অর্ঘ্য

কুমারী কমলা চক্রবর্ত্তী

অর্ঘ্য যখন সাজাই তোমার
আমার মনে বিদ্যুত হানে,
ভরিয়ে দিতে চাই যে তোমায়
আমার গোপন ব্যথার গানে।

যে গান আমার কথার ভাষায়
উঠলনাক সজীব হয়ে,
তবুও আমি ভেবেছিলাম
গাইব তাহা তোমায় লয়ে।

এই আশা মোর সফল হবে
জানিনাক কোন সে কাজে,
ব্যথার কথা রোদন ভরা
হৃদয়-বীণা তাইত বাজে।

ছিঁড়ে গেছে তারগুলি সব
হারিয়ে গেছে মধুর তান,
চিত্ত আমার কাঁদিয়ে দিল
আমার প্রাণের ব্যথার গান।

হেঁয়ালি

(গল্প)

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

কথায় বলে গৃহ আর নারী এই দুই নিয়ে সংসারী। চিরঞ্জীবের গৃহ একটা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে নারী নাই, কাজেই তাহাকে সংসারী ঠিক বলা চলে না।

আবার ছন্নছাড়াও সে নয়। সংসারের আর পাঁচজনেরই মত সে যথা নিয়মে খায় দায়, কাজ-কর্ম্মও করে, এক কথায় তাহার ব্যবহারিক জীবনের কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নাই।

কিন্তু ত্রুটি যাহা রহিয়া গিয়াছে তাহার ব্যক্তিগত জীবনে তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিতকর নয়। সংসারে সে নিতান্ত একা। মা, বাপ, ভাই, বোন, স্ত্রী জগতে যাহারা পরম আপনার জন, চিরঞ্জীবনের কাছে তাহাদের কেহ বা বিস্মৃত, কেহ বা অর্দ্ধ-বিস্মৃত, আবার কেহ হয়ত সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। কাজেই তাহার ব্যবহারিক জীবনে হাজার মিল থাকিলেও, তাহার ব্যাক্তিগত জীবনের কোথাও কোন মিল বা মিলনের মিছিল নাই। সে অগৃহী না হইলেও সংসারচ্যুত।

বড় রাস্তা পার হইয়া সরু একটা গলি। গলির ভিতর খান চার-পাঁচ বাড়ীর পরেই ছোট একখানা দোতলা বাড়ী। বাড়ীটা চিঞ্জীবের পৈতৃক সম্পত্তি। স্থানীয় একটা কলেজের অধ্যাপক সে, বেতন যাহা পায় তাহাতে তাহার মত একটা লোকের দিব্যি আনন্দে দিন চলিয়া যায়, বরং কিছু উদ্বৃত্তও থাকে।

কিন্তু অর্থই পরমার্থ নয়, অর্থের সঙ্গে মানুষের অর্থাতীতেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। সে কথা দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক চিরঞ্জীব না বুঝিলেও তাহার বাপের আমলের পুরাতন ভৃত্য বনমালী তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারে। তাই সে মাঝে মাঝে তাহার এই কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ-করা সংসার বিরাগী মনিবটিকে অনুরোধের সুরে বলিয়া থাকে,—দাদাবাবু, এবার দেখেশুনে আমার একটি দিদিমণি না নিয়ে এলে আর চলে না।

স্মিতমুখে চিরঞ্জীব বলে—কেন চলবে নারে, এই ত তুইও বে'থা করিস নি, তাই বলে কি তোর দিন চলে না বনমালী?

তাচ্ছিল্য-স্বরে বনমালী জবাব দেয়—আমাদের কথা ছেড়ে দাও না বাবু, আমরা গরীব লোক, আমাদের কি আর সব হয়? তুমি কি দুঃখে এমন সন্নিসী হয়ে থাকবে শুনি?

হাসিতে হাসিতে তখন চিরঞ্জীব বলে—আচ্ছা বনমালী, মনে নেই তোর সেবার হুগলীর ওরা কি বলেছিল?

হুগলীর তাহারা কি বলিয়াছিল তাহা বনমালীর অবিদিত নয়। একবার চিরঞ্জীব তাহার এক বন্ধুর সঙ্গে হুগলীতে একটি মেয়ে দেখিতে গিয়াছিল। মেয়ের বাপের অবস্থা বেশ ভালই, হুগলীর বাজারে তাহার মস্ত বড় একটা ধান-চালের আড়ৎ—দু-পয়সার সংস্থানও আছে। মেয়েটি সুন্দরী—চিরঞ্জীবের পছন্দও হইয়াছিল, পাত্রী-পক্ষকে সে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহারা যেন সময় মত একবার কলিকাতায় গিয়া তাহার সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটা পাকা কথা কহিয়া আসে।

কিন্তু তাহার পর অনেকদিন গত হইয়া গেলেও যখন ওপক্ষ হইতে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন একদিন চিরঞ্জীব তাহার সেই বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, তাহার রঙ কালো এবং দেখিতে সে সুপুরুষ নয় বলিয়াই উহারা তাহাকে মেয়ে দিতে একান্ত অক্ষম। মেয়ে সুন্দরী বলিয়া মেয়ের মার বড় ইচ্ছা জামাইটিও বেশ সুপুরুষ হইবে।

কথাটা শুনিয়া চিরঞ্জীব এত হাসিয়া ছিল যে, জীবনে বোধ হয় সে কখনও কোন কারণে এতটা হাসে নাই।

হুগলীর প্রসঙ্গ উঠিলেই বনমালী বলে—ছেড়ে দাও না বাবু ওসব মুখ্যু জড়ভরত লোকগুলোর কথা। মুদীখানার

দোকান কোরে দু-পয়সা কোরেছে কিনা, তাই এত দেমাক্। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া আপন মনে গজ-গজ করিয়া পুনরায় বলে—রেখে দে না বাবু, অমন সুন্দরী মেয়ে দাদাবাবুর পায়ে এলে ধন্যি হয়ে যায়। দাদা বাবু কি আমাদের যে-সে লোক, চার-চারটে পাশ-করা কলেজের মাষ্টার।

হয়ত সে আরও বলে—হীরের আংটী বুঝি আবার বাঁকা হয়?

বনমালীর এই সব কথাগুলি শুনিয়া চিরঞ্জীব শুধু মুখ টিপিয়া মনে মনে হাসে

বনমালী কিন্তু শুধু বলিয়াই বিরত থাকে না। আলাপী লোকজনদের কাছে সে একটি সর্ব্বগুণ-সম্পন্না সম্ভ্রান্তঘরের সুন্দরী মেয়ের সন্ধান করিয়া বেড়ায়।

অবশেষে সন্ধান মিলিল একদিন। বালীগঞ্জবাসী জনৈক এড্‌ভোকেটের একটি মেয়ে আছে। বয়স সতের-আঠার, ম্যাট্রিক পাশ, দেখিতে অপরূপ সুন্দরী। বনমালী যেমনটি খুঁজিয়াছিল তাহার দাদারবাবুর জন্য ঠিক মেয়েটিই মিলিয়া গিয়াছে।

মেয়ের নামটিও বেশ—সুপ্রভা।

যে ঘটক সম্বন্ধটি আনিয়াছিল তাহাকে লইয়া বনমালী চিরঞ্জীবের কাছে গেল। ঘটকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া চিরঞ্জীব সহাস্যে বনমালীকে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা বনমালী, ওরাও যদি বলে আমার রঙ কালো, আমার সঙ্গে ওরা মেয়ের বিয়ে দেবে না?

রুক্ষ কণ্ঠে বনমালী জবাব দিল—ছেড়ে দাওনা বাবু, ওসব কথা, সবাই ত আর ওদের মত পাগল নয়।

তা নয় বটে, তবে সংসারে সকলেরই পছন্দ কখনও এক হয় না। চিরঞ্জীবের কিন্তু মেয়ে একটুও অপছন্দ হইল না। বরং এই মেয়েটি হুগলীর সেই মেয়েটি অপেক্ষা বেশী সুন্দরী বলিয়াই মনে হইল, এবং সে সেই দিনই মেয়ের বাপের সঙ্গে সকল কথাবার্ত্তা একেবারে পাকাপাকি করিয়া আসিল। তখন পৌষমাস। মাঘ মাসের শেষের দিকে একটা ভাল দিন ছিল। স্থির হইল, ঐ দিনটিতেই তাহাদের বিবাহ হইবে।

বনমালীর ত আর খুসী ধরে না। ছেলের মত কোলে পিঠে করিয়া যাহাকে সে আশৈশব মানুষ করিয়াছে আজ তাহারই বিবাহ। আনন্দ ত হইবারই কথা।

কথায় কথায় বনমালী বলে—দেখ দেখি দাদাবাবু, এমন সব থাকতে তুমি কি না গিয়াছিলে কোথায় কোন হতভাগা দেশে মেয়ে খুঁজতে···বলি বাবু, তারা এমন কি ভাগ্যি করেছে যার জোরে তাদের মেয়ে তোমার ঘরে আসতে পারবে? ওসব আড়ৎদারের মেয়ের বিয়ে আড়ৎদারের ছেলের সঙ্গেই হয় তোমার সঙ্গে মানাবে কেন?

চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা বনমালী, আমার ভাগ্যটাকে তুই কি এতই ভাল বলে মনে করিস?

—তা নয়ত কি? বড়লোক ত অনেকেই হয়, কিন্তু তোমার মত বিদ্বান কটা লোক হতে পারে শুনি।···সোজা কথা ত নয়, চার-চারটে পাশ-করা কলেজের মাষ্টার।

চিরঞ্জীব হয়ত তাহার ভুল সংশোধন করিয়া দিয়া বলে—কলেজের মাষ্টার হয় নারে বোকা, কলেজের প্রফেসর।

তাচ্ছিল্য-স্বরে বনমালী বলে—ও একই কথা, তোমরা ইংরিজি কোরে ঐ বল আর আমরা বাংলায় বলি মাষ্টার।

মাষ্টার ও প্রফেসর যে এক নয় তাহা চিরঞ্জীব তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারে না।

যাহা হোক নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে সুপ্রভার সঙ্গে চিরঞ্জীবের বিবাহ ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া গেল। বৌ দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, ঠিক এমনটি না হইলে নাকি চিরঞ্জীবের ঘর মানাইত না ইত্যাদি।

বনমালী সকলের কাছে বাহাদুরী করে, এ বিবাহের মূল উদ্যোক্তা হইতেছে সে। যোগাযোগ করিয়া সেই প্রথম এই সম্বন্ধটি আনিয়াছিল।

কথাটা ঠিকই। চিরঞ্জীবও সর্ব্বসাধারণের কাছে এ কথা একবাক্যে স্বীকার করিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হয় না।

দিনের পর দিন যায়।

চিরঞ্জীব এখন আর সংসারচ্যুত নয়। গৃহ এবং নারী এতদিনে তাহার দুই-ই হইয়াছে। অতএব সে এখন পুরাদস্তুর সংসারী।

তবে সংসারী হইলেও সংসার সম্বন্ধে এখনও সে পূর্ব্ববৎ উদাসীন। সংসারের যাহা কিছু করিবার বনমালীই তাহা করে। চিরঞ্জীব শুধু পয়সা দিয়াই খালাস।

কিন্তু পয়সাই অনেক সময় শান্তির সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করে। এবং চিরঞ্জীবের সংসারেও ইহার ব্যতিক্রম হইল না।

কথায় কথায় সুপ্রভা একদিন চিরঞ্জীবকে বলিল—দেখ, চাকর-বাকরদের বেশী বিশ্বাস করতে নেই।

হঠাৎ এ-কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি তাহা সঠিক বুঝিতে না পারিয়া চিরঞ্জীব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিল।

সুপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বনমালীকে যে রোজ বাজারের পয়সা দাও ও তার হিসেব দেয়!

চিরঞ্জীব এইবার যেন স্ত্রীর মনোভাব কতকটা বুঝিতে পারিল, বলিল—হ্যাঁ, তা দেয় বৈকি, এইত সকাল বেলায় একটা টাকা নিয়ে গেল, দু'আনা ফেরৎ দিয়ে বললে, চোদ্দ আনা খরচ হয়েছে।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সুপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল—ধর ঐ চোদ্দ আনা থেকেই যদি ও দু'আনা পয়সা চুরি করে থাকে, হিসেব ত আর দেয় না।

বনমালী যে যখনও চুরি করিতে পারে ইহা চিরঞ্জীবের কল্পনাতীত। তাই কথাটা সে উড়াইয়া দিবার জন্য তাচ্ছিল্য স্বরে বলিল—আরে না না, বনমালী চুরি করবে কি, ও খুব বিশ্বাসী।

কিন্তু চাকর-বাকরদের যে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই এ কথাটা স্বামীকে বুঝাইবার জন্য সুপ্রভা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিল, যে তাহার বাপের বাড়ীতে একজন চাকর ছিল। চাকরটা বোকা হাবা বলিয়া সকলেই তাহাকে বিশ্বাস করিত এবং কৃপার চক্ষে দেখিত। তাহার পর একদিন সকাল বেলায় দেখা গেল, সেই বোকা হাবা ভাল মানুষ চাকরটি গৃহস্থের বাসন-কোসন কাপড়-চোপড় ইত্যাদি লইয়া রাতারাতি কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। অতএব ইহাদের কখনও বিশ্বাস করিতে নাই।

যাহা হউক, প্রসঙ্গটা আপাততঃ স্থগিত রাখিবার জন্য চিরঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল। তা ছাড়া তর্ক করাও তাহার স্বভাব নয়।

পরদিন সকাল বেলায় চিরঞ্জীব স্নান করিতে যাইবার সময় দেখে বনমালী তাহার প্রাত্যহিক বাজার আনিয়া দালানে ঢালিয়াছে এবং সুপ্রভা তাহার সম্মুখে বসিয়া প্রত্যেকটি জিনিষের পাই পয়সার হিসাব বুঝিয়া লইতেছে। তাহার হিসাব লইবার কৌশল দেখিয়া চিরঞ্জীব একবার ভাবিল স্ত্রীকে ডাকিয়া সে বলে যে, উহার নিকট হইতে হইতে অত করিয়া হিসাব লইবার কোন প্রয়োজন নাই, ও খুব বিশ্বাসী। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল ও বিশ্বাসী হইলেও চাকর-বাকরদের উপর তাহার স্ত্রীর বিশ্বাস অত্যন্ত দুর্ব্বল। বনমালী তাহাদের চাকর হইলেও উহাকে যে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করা যায় এ কথা সুপ্রভা কিছুতেই স্বীকার করিবে না। কাজেই ও সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া চিরঞ্জীব তাহাদের পাশ কাটাইয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

খানিক পরে চিরঞ্জীব স্নান করিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে আর্সির সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আচড়াইতেছিল, এমন সময় কি একটা কাজে বনমালী তাহার ঘরে ঢুকিয়া রুক্ষ কণ্ঠে বলিল—আমিও দেখে নেব ব্যাটাকে মেরে হাড় গুড়ো করে দেব।

সহাস্যে চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিল—কার হাড় গুড়ো কোরে দিবি রে বনমালী?

—ঐ ব্যাটা আলুওলার, ঐ ব্যাটারই কাছে টাকা ভাঙিয়ে জিনিষ কিনে ছিলুম, নিশ্চয়ই ও চা[illegible]টে পয়সা গোলমাল কোরে দিয়েছে।

—কেন? পয়সা তুই গুনে নিস্‌নি?

—গুনে নেব না কেন, ব্যাটার কাছে আলু কিনেছি, কপি কিনেছি, আরও দু-একটা জিনিষ কিনেছি, নিশ্চয়ই ও হিসেবের কিছু হের-ফের করেছে।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া চিরঞ্জীব বলিল—তাই বলে চারটে পয়সার জন্যে তুই ওকে মেরে হাড় গুড়িয়ে দিবি?

—কেন দেব না?…দিদিমণি বললে এতদিন যা হবার তা হয়েছে এখন থেকে বুঝে-সুঝে চলতে হবে…ঠিকই ত, এখন ত আর দাদাবাবু একা নয়, দিদিমণি এসেছে, দু'দিন পরে খোকাখুকু আসবে, তখন কত ত খরচ।

এই বলিয়া বনমালী হঠাৎ থামিয়া গিয়া তাহার সেই শীর্ণ বয়স-মলিন মুখখানার অপূর্ব্ব একটি ভঙ্গিমা করিয়া সহাস্যে বলিল—তখন কি আর আমি সকাল বেলায় বাজার করতে যাব?…তখন রোজ খোকাখুকুদের নিয়ে আমি ঠেলা গাড়িতে চড়িয়ে সেই গড়ের মাঠের দিকে বেড়াতে যাব, না দাদাবাবু?

ম্লান হাসিয়া চিরঞ্জীব বলিল—তোর ত সখ কম নয় বনমালী?

বিস্মিত কণ্ঠে বনমালী উত্তর দিল—সখ কি গো দাদা-বাবু, খোকাখুকু না থাকলে কি বাড়ী মানায়?

সলজ্জ হাসিয়া চিরঞ্জীব বলিল—আর যে তোর তর সয় না দেখছি।

উত্তরে বনমালী কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সুপ্রভা ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে কি একটা কাজের ফরমাস করিলে সে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সুপ্রভা স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ওদের কাছে ওসব কথা বল কেন?

এমন কি আপত্তির কথা চিরঞ্জীব বনমালীর কাছে বলিয়াছে তাহা সঠিক বুঝিতে না পারিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—কাদের কাছে, কি সব কথা?

ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে সুপ্রভা বলিল—ঐ বনমালীর কাছে আমাদের ছেলেপুলে হওয়ার কথা। চাকর-বাকরদের কাছে ওসব কথা বললে মনিবের সম্ভ্রম হানি হয় বুঝলে? বলিয়াই সে হঠাৎ মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া হাসিতে হাসিতে চিরঞ্জীবের আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার পিঠের উপর একখানা হাত রাখিয়া অত্যন্ত নরম স্বরে বলিল—আচ্ছা তুমি নিজে দার্শনিক হয়েও নিজের সম্বন্ধে অত অচেতন কেন বলত?

একটুখানি কি ভাবিয়া সহাস্যে চিরঞ্জীব বলিল—দেখ প্রভা, বনমালীকে আমি কিছুতেই ঠিক মাইনে-করা চাকরের মত দেখতে পারি না। খুব ছোট বেলা থেকে ও আমায় কোলে পিঠে কোরে মানুষ করেছে কিনা, তাই হয়ত ওর সম্বন্ধে আমি একটু অচেতন।

উত্তরে সুপ্রভা কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় বাহিরে হঠাৎ একটা কলরব শোনা গেলে চিরঞ্জীব জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে, বনমালী একটা হিন্দুস্থানী ছোকরাকে ধরিয়া অকথ্য ভাষায় তাহাকে গালাগাল করিতেছে। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য চিরঞ্জীব তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া আসিল।

পথে তখন লোক জমিয়া গিয়াছে। জনতার পিছনে দাঁড়াইয়া চিরঞ্জীব হাঁকিল—এই বনমালী, কি হয়েছে?

মুখ ফিরাইয়া মনিবকে দেখিয়া বনমালী হাঁকিয়া বলিল—বাবু, এই ব্যাটা সেই জোয়াচোর আলুওলা—আমার কাছ থেকে পয়সা ঠকিয়ে নিয়েছে।

হিন্দুস্থানীটার বয়স অল্প, তায় এতগুলো লোকের মাঝখানে বনমালী তাহাকে চোর প্রতিপন্ন করায় সম্ভবতঃ সে একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। আমতা আমতা করিয়া একটুখানি সাহস আনিয়া সে বলিল—আরে কেয়া ঠক্‌লায়া তোমকো…?

—কেয়া ঠক্‌লায়া শালা? এই বলিয়া বনমালী হাত উচাইয়া ছোকরাটাকে মারিতে যাইতেছিল এমন সময় চিরঞ্জীব তাহার নিকটে আসিয়া তাহার সেই উদ্যত হাতখানা ধরিয়া সজোরে একটা ঝাঁকনি দিয়া বলিল—কেন মারছিস্?…বুড়ো মিনসে…পয়সা তখন হিসেব কোরে নিতে পারিস নি?

কিন্তু হিসাব করিয়া না লইলেও ঐ লোকটা যে তাহাকে যথার্থই ঠকাইয়াছে এ কথা বনমালী বার-বার হাত নাড়িয়া সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

যাহা হউক, গোলমালটা কোন রকমে মিটাইয়া দিয়া চিরঞ্জীব বনমালির হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া তিরস্কারের সুরে বলিল—আচ্ছা তুই এমন হলি কেন বলত? খাম্‌কা লোকের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করবি?

শ্লেষের সুরে বনমালী বলিল—না, ও করবে চুরি--আর আমি কিছু বলব না, মুখটি বুজে চুপটি করে থাকব… তারপর তোমরা ভাববে পয়সা বুঝি আমিই চুরি করছি।

এই অপ্রিয় সত্য কথাটা যে বনমালী কোনদিন তারই মুখের উপর বলিতে পারিবে চিরঞ্জীব তাহা কখনও ভাবে নাই। তীব্র কণ্ঠে সে বলিল—বনমালী, তুই এমন

কথা মুখে ফুটে বলতে পারলি যে আমরা তোকে চোর ভাববো?

—কেন পারব না, তোমরা ত তাই ভাব?

—আমরা ভাবি? কে বললে?

উত্তরে বনমালী কি বলতে যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে চাপিয়া গিয়া ঈষৎ নরম সুরে বলল—যাকৃগে বাবু ওসব কথা, আমি যাই ··· আমার অনেক কাজ আছে। বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল।

আবার দিনের পর দিন যায়।

বনমালী যথা নিয়মে কাজ-কর্ম্ম করে।

কাজের মধ্যে শুধু তাহার বাজার-হাট করা আর ফাই-ফরমাস খাটা, কিন্তু ঐ বাজার করার কাজটাই যেন তাহার কাছে এক বিড়ম্বনার মত হইয়া উঠিয়াছে। সুপ্রভা তাহার নিকট হইতে প্রত্যেকটি জিনিষের পাই-পয়সার হিসাব বুঝিয়া লয়। সে বুড়া হইয়া পড়িয়াছে, তায় চোখে ভাল ঠাহর করিতে পারে না, প্রায়ই সে দু' একপয়সা হিসাবের গোলমাল করিয়া ফেলে।

সে জন্য অবশ্য সুপ্রভা তাহাকে কখনও তিরস্কার করে না। কিন্তু তিরস্কার না করিলেও উপদেশ দেওয়ার ছলে এমন কতকগুলি কথা সুপ্রভা বলে যাহা নাকি বনমালীর কাছে তিরস্কারেরই মত তীব্র পীড়াদায়ক।

এই ব্যাপারে চিরঞ্জীব নিতান্ত নিরুপায়। স্ত্রীর কাছে বনমালীর সততা সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেই সুপ্রভা তাহাকে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, চাকর-বাকরদের কথায় বিশ্বাস করিতে নাই। একটু সুবিধা পাইলেই তাহারা দু'পয়সা টেঁকস্থ করিবার চেষ্টা করে ইত্যাদি।

কাজেই চিরঞ্জীব ও সম্বন্ধে স্ত্রীকে আর কোন কথা বলে না বড় একটা।

সেদিন বৈকালে।

কলেজ হইতে ফিরিয়া চিরঞ্জীব বারান্দায় বসিয়া চা খাইতে খাইতে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিতেছিল, এমন সময় বনমালী আসিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল—বাবু, আমি দেশে যাব।

চিরঞ্জীব একটু অবাক হইল। আজ পর্য্যন্তও সে বনমালীকে কখনও দেশে যাইতে দেখে নাই। দেশের কথা জিজ্ঞোসা করিলেই সে বলত—দেশে আমার কে আছে বাবু, যে সেখানে যাব, ছোটবেলা থেকে এই খানে আছি, এই আমার দেশ।

আজ হঠাৎ বনমালীর মুখে তাহার দেশে যাওয়ার কথা শুনিয়া ঈষৎ বিস্মিত সুরে চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিল—দেশে যাবি, কেন, কি হয়েছে?

স্খলিত কণ্ঠে বনমালী উত্তর দিল—কিছু ত হয়নি বাবু, চিরকাল বিদেশে বিভুঁয়ে কাটল, তাই ভাবছি এবার শেষ সময়টায় দেশেই যাই।

—কিন্তু দেশে তোর আছে কে যে সেখানে গিয়ে থাকবি?

—কেউ না থাক, নিজের দেশটা ত আছে, আর দেশে মানুষও আছে, কি বল দাদাবাবু? এই বলিয়া সে অনর্থক হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

চিরঞ্জীব কোন কথা কহিল না।

সম্মুখের প্রকাণ্ড বাড়ীটার গায়ে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতেছে। সেই দিকে চাহিয়া চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিল—কবে যাবি?

—ভাবছি, কালই যাব।

—বেশ, তাই যাস।

সুপ্রভা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া সোয়েটার বুনিতে বুনিতে ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, বনমালী চলিয়া গেলে সে বলিল—তা ওর আর ভাবনা কি, এতকাল চাকরি করে নিশ্চয়ই দু'পয়সা হাতে কোরেছে তাইতেই ওর একরকম করে চলে যাবে।

একটা সিগারেট ধরাইয়া ধূয়া উড়াইতে উড়াইতে কতকটা নির্লিপ্ত সুরে চিরঞ্জীব বলল—তা যাবে।

পরদিন সকাল বেলায় বনমালী অত্যন্ত সহজভাবে ইহাদের নিকট হইতে বিদায় লইল। সে এমনভাবে চলিয়া গেল যেন, সে ইহাদের-বাড়ীতে মাত্র একটি রাত্রের মত অতিথি হইয়াছিল। যাইবার সময় সে একটি বারও পিছন ফিরিয়া তাকাইল না।

এ সংসারের নিয়মই এই। যে দেয় আশ্রয়, প্রয়োজন ফুরাইলেই মানুষ তাহাকে একদিন অবহেলায় ত্যাগ করিয়া যায়। যাইবার সময় সে আর পিছন ফিরিয়া তাকাইবারও প্রয়োজন বোধ করে না।

তাহার পর প্রায় বছরখানেক কাটিয়া গিয়াছে। বনমালীর কথা সকলেই একরকম বিস্মৃত প্রায়। মাঝে মাঝে চিরঞ্জীবের মনে হইত বটে, কিন্তু তখনই আবার তাহা মনের মধ্যে কোথায় বিন্দুবৎ মিলাইয়া যাইত।

ঠিক এই সময় পথে একদিন হঠাৎ বনমালীর সঙ্গে চিরঞ্জীবের দেখা।

প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া চিরঞ্জীব গড়ের মাঠে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ সে দেখে, তাহার অনতি দূরে ঠিক বনমালীরই মত একজন লোক একটি শিশুকে ঠেলা গাড়ীতে চড়াইয়া ঠেলিতে ঠেলিতে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রথমে চিরঞ্জীবের মনে হইল, হয়ত বনমালী, আবার পরক্ষণেই ভাবিল সে কেমন করিয়া হইবে, বনমালীত দেশে চলিয়া গিয়াছে অনেক দিন। কিন্তু লোকটি নিকটে আসিলে চিরঞ্জীব সবিস্ময়ে দেখিল—হ্যাঁ বনমালীই বটে।

তাহাকে দেখিয়া বনমালী একগাল হাসিয়া খুসীর সুরে বলিল—আরে দাদাবাবু যে, পেন্নাম হই।

সাগ্রহে চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিল—তুই দেশে যাসনি বনমালী?

—না দাদাবাবু, এতদিন এখানে থেকে এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে ভারি মায়া হচ্ছিল...তাই...আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কাজও পেয়ে গেলুম...কাজ এমন কিছুই নয়, এই ছোট ছেলেটিকে নিয়ে সকাল-সন্দেয় একটু বেড়িয়ে বেড়ান। এই বলিয়া অল্প থামিয়া বনমালী জিজ্ঞাসা করিল—তারপর খবর সব ভাল বাবু, দিদিমণি ভাল আছে?

ঘাড় নাড়িয়া চিরঞ্জীব জানাইল যে, হ্যাঁ সকলে ভালই আছে।

চকিতে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া অত্যন্ত খাটো গলায় বনমালী জিজ্ঞাসা করিল—খোকা-খুকী হ'ল দাদাবাবু?

অন্যমনস্ক ভাবে চিরঞ্জীব উত্তর দিল— না।

—হলে বাবু খবর দিও, তাদের নিয়ে এই রকম বেড়িয়ে বেড়াবার জন্যে একটা লোক চাইত। আর আমি এখন অন্য কাজ-কর্ম্মও ঠিক করতে পারি না। বুড়ো হয়ে পড়েছি বাবু বাজার-হাট করতে গেলেই হিসেবের গোলমাল করে ফেলি।

চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিল—তুই এখন কোথায় আছিস বনমালী?

বনমালী তাহার নূতন মনিবের নাম ঠিকানা বলিল।

বেলা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। আরও দু-একটা কথাবার্ত্তার পর চিরঞ্জীব বনমালীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাড়ীর পথ ধরিল।

পথে আসিতে আসিতে বার বার তাহার মনে হইতে লাগিল, বনমালী তাহা হইলে দেশে যায় নাই। তাহার বাড়ীর কাজ ছাড়িয়া সে অন্য এক বাড়ীতে চাকরী লইয়া এইখানেই আছে। বাড়ী যাওয়ার জন্য সে যে অত আগ্রহ দেখাইয়াছিল সেটা শুধু তাহার একটা ছুতা মাত্র।

কিন্তু তাহার বাড়ীতে এমনই বা কি ঘটিয়াছিল যাহার জন্য সে এতদিনের আশ্রয়টিকে এক কথায় ছাড়িয়া চলিয়া আসিল। এই দুনিয়ায় কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই।

আবার বনমালী যেদিন ইহাদের বাড়ী হইতে ছাড়িয়া চলিয়া আসে, সেদিন পথে আসিতে আসিতে সে ভাবিয়াছিল, যাহাকে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিল তাহারই স্ত্রী তাহাকে সামান্য কারণে অবিশ্বাস করিল কেমন করিয়া? মানুষের মনের কথা কাহারও বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই।

মুর্শিদাবাদে চারদিন

(ভ্রমণ)

কাজী হাশমৎউল্লা, এম-এ,

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগ। ঠিক করলাম, এবার ঈদুজ্জোহার নামাজটা দেশের ছোট্ট ঈদগায় বা গড়ের মাঠের বিপুলতার মধ্যে না পড়ে কোন নূতন জায়গায় পড়ব। সিদ্ধান্ত করতে না করতেই বেকার-হোষ্টেলবাসী বন্ধুবর এ, এফ, কলিমউল্লা প্রস্তাব করল, চল এবার মুর্শিদাবাদ বেড়িয়ে আসি। বড় ভাই সেখানে আছেন ইত্যাদি। এ-যেন সোনায় সোহাগা! সঙ্গে-সঙ্গেই সম্মতি! আমার কল্পনা সুদূর অতীত হতে এ-পর্য্যন্ত বঙ্গের রাজধানীগুলির প্রতি চোখ বুলিয়ে নিল। লক্ষ্মণ সেনের নবদ্বীপ—বখতিয়ার খিলিজির লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়—শাহ্ সুলেমান কেরওয়ানীর টুণ্ডা বা তারানগরী—কুমার মানসিংহের রাজমহল—ইস্‌লাম খাঁর জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা)—সুলতান সুজার রাজমহল বা আকবরনগর—মীরজুম্লার ঢাকা এবং সর্ব্বশেষে মুর্শিদকুলি খাঁর (১৭১২-১৭২৫ খ্রীঃ) মকসুদাবাদ বা মুর্শিদাবাদ! স্বাধীন বঙ্গের শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদ দেখতে কার না ইচ্ছা হয়? আশাও করতে পারি নি, অমন এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের দর্শনলাভ করব এত সহসা! বন্ধুবর রহস্য করে বললেন—বাঃ বেশত, কিন্তু ভাবী সাহেবাকে এ-ঈদের মরশুমে অকূল নৈরাশ্যে ফেলা কি ঠিক!

আমি কিন্তু সহজভাবেই উত্তর দিলাম,—তোমার ভাবীর কাছে ঈদের মরশুম শেষ হতে-না-হতেই ফিরে আসব।

আমার মন মুর্শিদাবাদের মত স্থান ভ্রমণের আনন্দে ঈদ্-মরশুমী বৌকেও উপেক্ষা করতে পেরেছিল। বন্ধুবর এ-কথা-সে-কথা বলে চলেছেন—আমার মন তখন ভ্রমণ সার্থকতাপূর্ণ করার তোড়জোড়ের চিন্তায় ব্যস্ত। কলিমকে বললাম, ক্যামেরা তো চাই একটা। সে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, আমার সহপাঠী মহম্মদ হানিফও যাবে আমাদের সঙ্গে, তার নিজের ক্যামেরা আছে।

৩১শে জানুয়ারী। শিয়ালদহ ষ্টেশনে হাজির হয়ে দেখি, আমরা সর্ব্বসমেত পাঁচ জনের একটি ছোট দলে পরিণত হয়েছি। পান-সিগারেট খুব চলছে। ট্রেণে উঠেই সুরু হল ব্রীজ—মধ্যে মধ্যে হাল্কা গান। রাণাঘাট পর্য্যন্ত খুব চেনা—কতবার গেছি আসছি। সেখানেই চেঞ্জ। রাণাঘাটে গাড়ী বদল করে আমি পুনরুজ্জীবিত খেলায় অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য হারতে সুরু করলাম। তবু ভ্রূক্ষেপ নাই—দুই-এক জন বন্ধু খেলায় নেশা জমানোর জন্য টিটকারী দিতে আরম্ভ করলেন—তবুও আমি ফাঁকি দিতে কার্পণ্য করি নাই। জানালার পার্শ্বে নূতন স্থান দেখার আনন্দটা উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। অবিলম্বে প্রস্তাব করলাম, খেলা স্থগিত রেখে গান সুরু হোক। এ বিষয়ে আমিই 'লীড' নিলাম। হাসিগানের মধ্যে ট্রেণ-বাহনটা রিঁ-রিঁ করে ছুটেছে—পার্শ্বে উচ্চ নীচ ঝোপ, দীর্ঘ বৃক্ষাদি ও সমতল ক্ষেত্রগুলি ছবির 'রীলে'র মত এক-একে ভেসে যাচ্ছে। কৃষ্ণনগর ছেড়ে কিছুদূর অগ্রসর হতে না-হতেই বন্ধু কলিম বলে উঠল, পথে প[illegible] ষ্টেশন পড়বে। আমার গান থেমে গেল—হাসি থেমে গেল! সঙ্গে-সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল এক প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি! পলাশী—রাক্ষসী পলাশী! ভারতের কলঙ্কের ডালি নিয়ে আজও বেঁচে আছ? তুমিই না বিশ্বের মধ্যে এমন অলক্ষ্মী-স্থান যেখানে পালিত ভৃত্যেরা প্রভুর গলায় কাঁটার হার পরিয়েছে? বাঙলার শেষ স্বাধীন নৃপতি গেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও কেন সলিলগর্ভে ডুবে যাও নাই! হতভাগী পলাশী!

দেখতে দেখতে পলাশী ষ্টেশনে ট্রেন থামল; কিন্তু শুনলাম, পলাশী-যুদ্ধক্ষেত্র ষ্টেশন হতে অনেক দূর। অগত্যা পলাশীর প্রান্তর দেখা হল না, রাত্রি ৮টায় বহরমপুর ছেড়ে মুর্শিদাবাদে পৌছলাম। মিঃ সলিমউল্লা—

লালবাগের সাব-ডিভিশাল অফিসার—স্বয়ং আমাদের নিতে এসেছেন। ইনি আমার বিশেষ পরিচিত—বন্ধুবর কলিমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এস-ডি-ওর কোয়ার্টারে যেতে দক্ষিণ দিকে নবাবদের পড়ো ঘোড়াশাল দেখে সত্যই প্রাসাদ বলে ভ্রম হয়। এস-ডি-ওর কোয়ার্টার ভাগীরথীর পূর্ব্ব-কূলে অবস্থিত। অফিস ও ফ্যামিলি কোয়ার্টার সংলগ্ন। অফিস ঘরগুলি একতলা—এদের ছাদের উপরিভাগটা চেপ্টা গম্বুজাকারের (oval shaped), ব্যবহারের অযোগ্য। তবে পার্শ্ব-দেশগুলিতে ৩।৪ হাত পরিমিত স্থান এবং সর্ব্ব-দক্ষিণাংশ সমতল। সেখানে বসে ভাগীরথী-বক্ষের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। বাটীর পূর্ব্বভাগে মুর্শিদাবাদ-ট্রেজারী। বাড়ীগুলির পূর্ত্তকার্য্য অতীতের পোর্ত্তুগীজ ও ফরাসীদের কুঠির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

জলযোগান্তে সকলে নদীতীরে বালুর চড়ায় যেয়ে বসলাম। ভাগীরথীকে একটা তিন-পেড়ে সাদা শাড়ীর মত দেখা যাচ্ছিল। দুই তীরে শ্যামল ক্ষেত্র ও ঝোঁপের ঘনাট অন্ধকার—মধ্যে দুই দিকে বালুর সাদা জমিন্—মধ্যস্থলে ধীর-গামিনী ভাগীরথীর কালো জলরাশি এঁকে-বেঁকে সর্পিল গতিতে ছুটে চলেছে! পথ-শ্রান্তিতে নিদ্রালস ধরেছিল, তাই ঘণ্টাখানেক পর বাসায় ফিরে আহারাদি সমাপনান্তে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠে মিঃ আলিমকে (কালিম উল্লার মেজো ভাই) সঙ্গে নিয়ে নদীতীরে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করলাম। এই দিন ফেব্রুয়ারীর প্রথম তারিখ। নয়-দশটার সময় নৌকাযোগে অপর পারে এসে শিকার করার ছলে খুশ্‌বাগের দিকে অগ্রসর হলাম। ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে রাজপ্রাসাদ হ'তে দুই মাইল দক্ষিণে খুশ্‌বাগ অবস্থিত। এ সেই খুশ্‌বাগ যেখানে নবাব আলীবর্দ্দী তদীয় মাতার কবরের পার্শ্বে শায়িত। স্থানটি এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ—মনুষ্যাবাস এখান হ'তে অনেক দূরে। খুশ্‌বাগ একটি চতুঃষ্কোণাকার প্রাচীর-পরিবেষ্টিত উদ্যান। পূর্ব্ব দিকে গেট—দুই পার্শ্বে দারবানদের ছোট ছোট কক্ষ। পূর্ব্বের প্রাচীর ভগ্নপ্রায়—সংস্কার অভাবে হীনশ্রী। প্রবেশ মাত্রই প্রাঙ্গণ দেখা যায়। পার্শ্বে—উত্তর ও দক্ষিণে ফুল ও লতাগাছ। সামান্য অগ্রসর হ'লেই মধ্যস্থলে একটি ছোট দালানবাড়ী সম্মুখে পড়ে। ইহারই মধ্যে নবাব আলীবর্দ্দী ও সিরাজের কবর। আরও কবর রয়েছে, কিন্তু সিরাজের কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেই কেন যেন প্রাণ আপনা-আপনি কেঁদে উঠল। কবরের চতুর্দ্দিক সাধারণ সিমেণ্ট করা—শিয়রে প্লাটফর্মগাত্রে নবাবের নাম, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ লিপিবদ্ধ। এদিক-ওদিক ছোট গোল গোল কাঁচা মাটির ঢিপি লহ্‌বান-বাতির আধার-স্বরূপ দয়া করে রক্ষিত। যে ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়েছিল তা বর্ণনা করবার শক্তি আমার নাই। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ভূপতি সিরাজের মকবেরা যে এরূপ অযত্নে থাকবে তা ভাবতেও পারি নি। প্রাণের অন্তঃস্থল হ'তে কে যেন বলতে লাগল—নত হও পথিক! সিরাজ—সে যে তোমাদের রাজা—বাঙালীর স্বাধীন রাজা। আমার মনে হ'ল সিরাজ তাঁর কবর থেকে অনন্তকাল ধরে বলে চলেছেন—হে প্রজাবৃন্দ! তোমরা নির্ব্বাক রয়েছ—ইতিহাস আমার প্রতি অবিচার করেছে—বিদেশীরা আমার বিরুদ্ধতা করেছে—দেশবাসী আমায় ভুল বুঝেছে! অলক্ষ্যে কয় বিন্দু অশ্রু উপহার দিয়ে বিদায় নিলাম। পূর্ব্ব-পশ্চিমাংশে একটি মস্‌জিদ। মস্‌জিদটিতে নামাজাদি হয় না। ব্যবহার করলে এখনও তা যত্নসুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

ক্ষীণাঙ্গী ভাগীরথীর তীর বেয়ে বাসায় পৌঁছতে প্রায় দুইটা বেজে গেল। আহারাদির পর বিশ্রামান্তে নদী-তীরে বেড়াতে বের হ'লাম। ক্বচিৎ দুই-একটি ছোট নৌকা দেখা যায়। স্বতঃই অতীতের কথা মনে পড়ল, যখন এই ভাগীরথী-বক্ষে কত ফৌজ, সেনাপতি ও শিল্পীর তরণী রাজপ্রাসাদ লাভ করার জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করত। খুশ্‌বাগ হ'তে ফিরে এসে আমার আর কিছুই ভাল লাগছিল না; কাজেই যে গান-চিত্ত ভাগীরথী বেয়ে অধর-উপত্যকা পথে বিলীন হ'ল তা বড়ই মন্দগতি—করুণ রসাত্মক,—বন্ধুদের হাল্কা আনন্দে জোয়ার তুলতে সম্পূর্ণ অপারগ।

সে-দিনের বাকী অংশটা কোন রকমে কেটে গেল। রাত্রি! জ্যোৎস্না-পরিমল রাত্রি। মিঃ সলিমউল্লা আমাদের নিয়ে নৌকাযোগে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূল

বেয়ে বেড়াতে বের হলেন। কন্‌কনে হিমেল হাওয়ায় বেশীদূর ভ্রমণ সম্ভব হয় নি, কিন্তু যে-দৃশ্য সেদিন দেখেছিলাম জীবনে তা ভুলবার নয়। আমরা উত্তরে উজানে চলেছি। সেখান হ'তে পূর্ব্বতীরস্থ প্রাসাদশ্রেণী ও ইমামবাড়ী এক স্বপ্নপুরী বলে প্রতিভাত হয়েছিল। নগর ও রাজপ্রাসাদ হ'তে সোপানশ্রেণী নদীতে নেমেছে। অদূরে মস্‌জিদ ও মন্দিরের চূড়াগুলি অতীতের স্মৃতিভারে দীপ্ত হয়ে রয়েছে। পথে আটটা বাজতেই প্রাসাদ হ'তে তোপের শব্দ হ'ল—আগুনের হল্কা বৃত্তাকারে এসে নদী-বক্ষের প্রতিবিম্বের সঙ্গে মিশে গেল। লক্ষ্য করলাম, নদীর ধারে ধারে নহবৎখানাগুলি শূন্য হয়ে পড়ে আছে। শৈত্যাধিক্যে অধিক দূর অগ্রসর হলাম না। ফিরবার সময় পশ্চিমকূল বেয়ে আমাদের নৌকা তর্‌তর বেগে ভাটিতে ছুটল। মিঃ সলিমউল্লা প্রাসাদ, বাবুর্চ্চিখানা, মুর্গীখানা ইত্যাদি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখিয়ে চলছিলেন—ইতিহাস নিয়েই তিনি গল্প করে যাচ্ছিলেন। রাত্রি দশটার সময় আমরা বাসায় পৌছলাম। আহারান্তে শয়নাগারে এসে রাজপুরীর দৃশ্য সম্মুখে রেখে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তৃতীয় দিন, ২রা ফেব্রুয়ারী। ভগবানগোলায় শিকার উদ্দেশ্যে বহির্গত হ'লাম। সাব্‌ডিভিশনাল অফিসার আমাদিগকে তাঁর মোটরখানা ছেড়ে দিলেন। কিছুদূর পাকা রাস্তা, তার পর কাঁচা। ভাগীরথীর প্লাবন হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য উঁচু বাঁধ দেওয়া হয়েছে। তারই পাশের পথ ধরে আমাদের মোটর ছুটল। বেলা ১১।১২টায় ভগবানগোলায় পৌছলাম। সে-স্থানে কোন অতীত ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য হ'ল না। একটা ভগ্ন মস্‌জিদ আকারের বাড়ী দেখেছি। শুধু এইটুকু স্মরণ হ'ল, বঙ্গে বর্গী-হাঙ্গামার সময় (আলীবর্দ্দীর সময়) ও সিরাজদ্দৌলার শাসনকালে নবাবদের সৈন্য ও সমরোপকরণ ভগবান-গোলার পথে নীত ও পরিচালিত হয়েছিল। ভগবান-গোলার জনৈক ভদ্রলোক আমাদের জলযোগে আপ্যায়িত করে একজন লোক সঙ্গে দিলেন। এখান হ'তে কিছু দূরে একটি ছোট বিল আছে। পথ ভয়ানক খারাপ ছিল বলে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হ'ল। মোটর অধিক দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। পদব্রজে বিলে পৌছলাম। সেখানে তেমন পক্ষী-মৃগয়া আর জুটল না—তবে আনন্দ বড় কম পাই নি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় এসে পানভোজনে পরিতৃপ্ত হ'লাম। পরে ফেরার পথে নিকটবর্ত্তী কয়েকটি উচ্চ পাড়-ঘেরা পুষ্করিণীতে কতিপয় বালিহাঁস, মরাল প্রভৃতি ভাল পক্ষী শিকার করা হ'ল। রাস্তায় খুব হৈ-হল্লা করতে করতে বাসায় পৌছলাম।

চতুর্থ দিন ৩রা ফেব্রুয়ারীর প্রোগ্রাম খুব বড় ছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অনেক কিছু দেখাশুনা শেষ করতে হয়েছিল। কারণ ঐ তারিখেই কলিম, হানিফ ও আমি কলিকাতা ফিরে এসেছিলাম। প্রাতঃকালে জলযোগান্তে মোটর যোগে প্রাসাদের উত্তর দিকে লছমি পার্ক দেখতে গেলাম। উক্ত লক্ষ্মী বালছমী শেঠ জগদ্বিখ্যাত জগৎ শেঠের আত্মীয়। তাঁরই নামানুসারে পার্কের নামকরণ হয়েছে। রায় দুর্ল্লভ, মীরজাফর, শেঠ-পরিবার ইত্যাদির ষড়যন্ত্রের কথা মনে হ'ল। প্রথমেই পার্কের শেষাংশে মার্ব্বেল মন্দির দেখলাম। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যপূর্ণ মন্দির—তৎসংলগ্ন মনুষ্যমূর্ত্তি, পদ্ম ইত্যাদি অতি উচ্চ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। বারান্দায় দুইটি বৃহৎ ঝাড়বাতি দেখা গেল। মন্দির-রক্ষক পুরোহিত দুইটি স্ফটিক-বিগ্রহ দেখালেন এবং বললেন যে, এগুলি নবাবদের দান। বিগ্রহের নাম জগৎ-পিতা। তিনি এমন ভাবে সৃষ্টির ব্যাখ্যা করলেন যে, তাতে হিন্দুমুসলিম দুই সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করাই তাঁর নিগূঢ়তর উদ্দেশ্য বলে মনে হ'ল। শুধু এ-মন্দিরই নয়—রাজপ্রাসাদের অতি নিকটে ও রাজপুরীর মধ্যে বহু পুরাতন মন্দির দৃষ্ট হয় এবং এদের অনেকগুলিতেই নবাবদের দান স্বীকার করা হয়। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগল, কেমন করে নবাবেরা হিন্দু প্রজা পীড়ন করছেন? হিন্দু প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য শরিয়ত-বিগর্হিত এবং মুক্ত রাজধর্ম্মপ্রণোদিত দানও তাঁরা করেছেন! ইতিহাস ত সত্য ঘটনার উল্লেখ করে? এই আলোক-সম্পাতে আমাদের ইতিহাস ভ্রমপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন হয়। আমার বেশ স্মরণ হয়, দূরদর্শী শাসক নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকাল হতে (১৭১২-১৭২৫ খৃঃ)

স্পষ্টতঃ হিন্দু কর্মচারীদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে এবং এ 'প্রিসিডেণ্টে'র কখনও বিপর্যয় হয় নি। দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ এক-কোটির অধিক বঙ্গের রাজস্ব আদায় করেছেন এবং তাঁরই সময়ে উহা দেড়-কোটিতে পরিণত হয়েছিল। মুর্শিদকুলীর অপক্ষপাতিত্ব গুণে রাজ্যমধ্যে প্রভূত ধন-সমাগম হয়, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হয়। অতঃপর নবাব সুজাউদ্দিনের শাসন-কালকে (১৭২৫—১৭৩৯ খৃঃ) বাঙলার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। তদীয় দেওয়ান যশোবন্ত রায় সায়েস্তা খাঁর নির্মিত ঢাকার পশ্চিম-ফটকের দ্বারোদ্ঘাটন করেন—সায়েস্তা খাঁর সময়ের মত তিনিও চাউলের দর টাকা প্রতি ৮ মণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিলাসী সুজাউদ্দীন বিখ্যাত ছিলেন। রাজ্য ন্যায়ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে এরূপ উন্নতি সম্ভবপর নয়। বর্গী-হাঙ্গামার মধ্যেও নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ (১৭৪৯—১৭৫৬ খৃঃ) তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের ন্যায় শৃঙ্খলা রাখতে সমর্থ ছিলেন। জনৈক ঐতিহাসিকের বিবৃতি হতে নবাব আলীবর্দ্দীর শাসন-শৃঙ্খলার একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়:—"যৌবনারম্ভ হইতেই আলীবর্দ্দী খাঁ সুরা বা অপর কোন মাদক সেবনে, সঙ্গীতবাদ্য অথবা তোষামোদকারীদের প্রতি আসক্তি দেখান নাই। তিনি নিয়মমত ভগবদুপসনা করিতেন এবং ঈশ্বরের বিধানে নিষিদ্ধ সমুদয় বিষয়ে একান্ত বিরক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ সূর্য্যোদয়ের দু-ঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতেন এবং স্নান উপাসনার পর বিশেষ বিশেষ সহচরের সহিত একত্র বসিয়া কাফি পান করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পর তিনি সাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তখন তাঁহার সেনা-নায়কগণ, দেওয়ানি কর্ম্মচারী, এবং তৎসমীপে আবেদন লইয়া আগত সকল শ্রেণীর প্রজাই ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে তাঁহার সম্মুখে আসিতে পাইত, এবং তাহাদের নিবেদন জ্ঞাপনান্তর বদান্যপ্রকৃতি নবাবের নিকট সন্তোষ লাভ করিয়া ফিরিত। এই কার্য্যে দুইঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া তিনি নিজের বসিবার ঘরে গমন করিতেন। তথায় কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণই আসিত। এই সকল লোক, হয় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় নোয়াজিস মহম্মদ ও সৈয়দ আমেদ, নয় তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা, নয় বিশিষ্ট কোন মিত্র। এখানে কবিতা, ইতিহাস বা গল্প পড়া হইত। কখনও কখনও তিনি রন্ধনকারীদিগের সহিত রন্ধনের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আমোদ অনুভব করিতেন। উহারা তাঁহার সম্মুখেই তাঁহার রুচিমত খাদ্য প্রস্তুত করিত। প্রয়োজন হইলে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আদেশের জন্য তথায় আসিত। অতঃপর তিনি বন্ধু-বান্ধবসহ আহার করিতেন, এবং অনেকেই তাঁহার গৃহে আহার করিয়া যাইতেন। আহারান্তে সকলে বিশ্রাম করিতেন। সে সময় আমোদজনক গল্প শুনাইবার নিমিত্ত একজন গল্পকারী উপস্থিত থাকিত। মধ্যাহ্নের পর একটার সময় তিনি সাধারণতঃ উঠিতেন, এবং উপাসনার শেষ করিয়া প্রায় চারিটা পর্য্যন্ত কোরাণ পড়িতেন। অতঃপর নির্দ্দিষ্ট স্তুতিপাঠ করিয়া বরফ বা বা সোরাযোগে সুশীতল এক গেলাস জল পান করিতেন। তখন কয়েককজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইতেন এবং তাঁহাদের সহিত আলাপে প্রতিদিন এক ঘণ্টা যাপন করিতেন। তাঁহার অবগতির নিমিত্ত সেই সেই সকল লোক ঈশ্বর ও বিধি-বিধান লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিত; তিনি শুনিতেন। তাহারা চলিয়া গেলে রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার পোদ্দার জগৎ শেঠের সহিত তৎসমীপে উপস্থিত হইত। উহারা দিল্লী ও সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত এবং তাঁহার রাজ্যের প্রতি জেলা হইতে আনীত সংবাদ নবাবকে শুনাইত। অতঃপর যে কার্য্যের আদেশ করা প্রয়োজন তিনি তদনুরূপ আদেশ তাহাদিগকে দিতেন। এই কার্য্যে এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইত। কখনও কখনও তাঁহার নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ তথায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইত। এই সময় অন্ধকার হইয়া আসিত, আলোক দেওয়া হইত এবং তৎসঙ্গে কয়েকজন ভাঁড় ও রসিক ব্যক্তিও আসিত, উহারা কিছুক্ষণ পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ ও রসভাস দ্বারা নবাবকে আনন্দ দান করিত। অতঃপর তিনি উপাসনার জন্য উঠিতেন; উপাসনান্তে খাস কামরায় আপন বেগমের নিকট বসিতেন। তখন নিকট-সম্পর্কীয়া মহিলাবর্গ রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত।

স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেলে প্রয়োজনানুসারে পুরুষেরাও তাঁহার নিকট আসিত। পরে আর ভোজন না করিয়াই রাত্রি অধিক না হইতেই তিনি শয়ন করিতেন। সকল কার্য্যের জন্যই সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া তিনি এইরূপে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার আত্মীয়, কুটুম্ব, মিত্রবর্গ, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হীনাবস্থায় পরিচিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শনে তাঁহার তুল্য কেহ ছিল না। বিশেষতঃ যৌবনকালে দিল্লীতে যখন তিনি দুর্দ্দশাপন্ন, তখন তাঁহার প্রতি যাহারা একটু মাত্রও অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বা তাহাদের সন্তানগণকে নিজরাজ্যে আনয়ন করিয়া আশাতীত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, সাধারণ প্রজাবর্গ তাঁহার সদয় রাজ্যশাসনে এরূপ যত্ন ও আনন্দ অনুভব করিয়াছিল যে, পিতা-মাতার যত্নও ততোধিক হয়না। এ দিকে তাঁহার অতি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীও তাঁহার কার্য্য করিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিল। সকল কার্য্যেই তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইত। তিনি সকল ব্যবসায়েই যোগ্য ব্যক্তিকে উৎসাহ দান করিতেন। তিনি আচরণে অমায়িক, রাজ কার্য্যে বিচক্ষণ ও যুদ্ধে সেনাপরিচালনে বীর ছিলেন।"

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন-কর্ত্তাদের নীতি যে পরিত্যক্ত হয়েছিল সেকথা বলা চলে না। সিরাজ মাত্র পঞ্চদশ মাস রাজ্য শাসন করেছেন। নবাব সিরাজকে বিদেশীদের হতে অধিকতর সন্ত্রস্ত থাকতে হয়েছিল; কারণ তৎপূর্ব্ব বিগত ১০০ শত বৎসরের ইতিহাস ঘাঁটলে এটা খুব সত্য বলে মনে হয় যে, সিংহাসনলাভের জন্য পক্ষসৃষ্টির উদাহরণ নবাবদের আভ্যন্তরীণ জীবনকে আদৌ নিরাপদ রাখে নাই। সর্ব্বদা নবাবদিগকে ক্ষমতাশালী সেনাপতি ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিকট হতে সাবধান থাকতে হত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক নবাবের মধ্যে যা-কিছুই দুর্ব্বলতা থাক-না কেন এটা সত্য যে, তিনি ইংরাজদের দিন দিন ব্যবসায় ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হয়েছিলেন,—পাছে এই বণিক জাতি পক্ষাবলম্বন দ্বারা মসনদ আপদগ্রস্ত করে তোলেন। এতদ্ব্যতীত ইংরাজদের প্রাচ্য রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকাতে ও প্রাচ্য শিষ্টাচার প্রথা না-জানায় নবাবের প্রতি ইংরাজ-পক্ষের ব্যবহার একাধিকবার অসম্মান-জনক হয়েছে, সন্দেহ নাই। নবাব সিরাজের সময়ও বাংলার শিল্প ও কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয় নাই। সিরাজ যে ঘাসটি বেগমের সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন তা পূর্ব্ববর্ত্তী শাসকদের প্রথায় দূষণীয় হয় নাই। কমপক্ষে মুর্শিদকুলী খাঁর সময় হতে দেখতে পাই যে, নূতন নবাব অগ্রবর্ত্তী নবাবের বা প্রদেশ-শাসকের বিষয় সম্পত্তি হস্তগত করে সম্রাটের নিকট পাঠিয়েছেন। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, নবাব সিরাজ নিজকে স্বাধীন-ভূপতি বলেই জানতেন, কারণ ১৭৪৬ খৃঃ হতে সম্রাটদের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে প্রদেশ-শাসকরা দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করেছিলেন। নবাব সিরাজ যে, আশঙ্কা করেছিলেন ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় সে-আশঙ্কা সুবিবেচনা-প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই প্রমাণিত হয়। সিরাজের শাসনকাল সম্বন্ধে এই বলা চলে যে, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবগণ যেমন বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পেরে ছিলেন বিংশবর্ষীয় সিরাজ দুর্ভাগ্য বশতঃ সে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নাই। অত্যন্ত কূটনীতি পরায়ণ তিনি ছিলেন না বলেই সিরাজকে এরূপ বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু সিরাজের পক্ষে এখানে একটু বলার আছে যে, আলীবর্দ্দী খাঁয়ের মত যোগ্য নবাবও সিরাজের সময়ে রাজ্য রক্ষা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ কারণ নবাব আলীবর্দ্দী ইংরাজদের সমুদ্রশক্তির ইঙ্গিত, হায়দর আলীর মত, মৃত্যুর পূর্ব্বেই দিয়েছিলেন। তা ছাড়া শক্তিমান্ আলীবর্দ্দীর সময়ে যে-ধুরন্ধর মীরজাফর, আতাউল্লা ইত্যাদি স্বয়ং আলীবর্দ্দীকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়ে ছিল, তারা যে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে একান্ত, অনুরক্ত থাকত তার কোন নিশ্চয়তাও ছিল না। সে-যুগের নীতি অনুযায়ী মীরজাফরদের মত ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাস-ঘাতকদের সমুচিত দণ্ড বিধান করাই রাজনীতি-কুশলতার পরিচায়ক ছিল।

অনেকদূর এসে পড়েছি; পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। উক্ত লছ্মি পার্ক-স্থিত দুইটি বাড়ীতে বহু মূল্যবান্ প্রস্তর, আর্শী, টেবিল, চেয়ার, তক্ত-পোষ, বাসন ইত্যাদি

সরঞ্জাম দেখলাম। সে-যুগের অলঙ্কারাদির নিখুঁত কারুকার্য্য আমাদের স্তম্ভিত করেছে। বাহিরে আসার সময় হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি অদূরে হাম্মামখানা বা স্নানাগারের দিকে পতিত হ'ল। সোপান-শ্রেণী-বেয়ে এক চত্বরের একাংশ বড় কূপের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। চত্বরের উপরে সামান্য স্থানে দুইজন বসবার মত একটি মঞ্চ। সমস্ত স্থানটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা—বাহির হতে নজরে পড়ে না। শোনা যায়, কূপের জল ইচ্ছামত বাড়ানো ও কমানো যেত। জল চত্বর থেকে সোপান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হ'ত। অন্তঃপুর-নারীদের স্নান করার সময় উক্ত মঞ্চ হতে পুরুষেরা স্নান-সৌন্দর্য্য উপভোগ করতেন। এটা সে-যুগের বিলাস-ব্যসনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

লছমী পার্ক দর্শন করে জাফরগঞ্জে উপস্থিত হলাম। পূর্ব্ব হতে পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রাসাদটি বিস্তৃত। উহা তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম ভাগ প'ড়ো—প্রাচীরাদিও ভগ্ন প্রায়। বৈঠকখানা নামাজ-ঘর ইত্যাদি সেখানে ছিল। শোনা যায়, এ-স্থানেই নবাব সিরাজকে ছোড়া বিদ্ধ করা হয়। সে-স্থানের একটা ফটো নিলাম। সমতল স্থানের মধ্যে যে-কিঞ্চিৎ উচ্চাংশ দেখা যায় সেখানেই নবাবকে আঘাত করা হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। মধ্যাংশ অন্দর মহল এবং সর্ব্ব পশ্চিমাংশ দরবার। ছাদগুলি ধ্বসে গেছে—স্তম্ভগুলি এখনও নগ্নদেহে দণ্ডায়মান্। সম্মুখের দক্ষিণ দিকটায় বিশাল প্রাঙ্গণ—নগরের জানোয়ার-গরুবাছুর চরে বেড়ায় দেখা গেল। শীঘ্র সে-স্থান হতে জাফরগঞ্জে সিমেট্রিতে এসে ঘাসটী বেগম, মীরজাফর ইত্যাদির কবর দেখলাম। কোম্পনি-মাতা ও কোম্পানি-ভ্রাতার মকবেরা খুশ্‌বাগর কবরগুলির চেয়ে স-যত্ন-রক্ষিত বলে মনে হ'ল। জগতের ক্রূর পরিহাসে হাসিকান্না দুই-ই উপস্থিত হয়।

অনতিবিলম্বে মুর্শিদকুলী-খাঁর মস্‌জিদ বা কাটোরা মসজিদের নিকট উপস্থিত হলাম। মুর্শিদকুলীর স্মৃতিস্তম্ভও বহু কষ্টে কালের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। মুর্শিদকুলী খাঁর পূর্ব্ব নাম করতলব খাঁ ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় দেওয়ান মুর্শিদকুলী ঢাকা ত্যাগ করতঃ এ-স্থানে আগমন করেন এবং ইহার নাম মকসুদাবাদ রাখেন। পরে ১৭১২ খৃঃ নবাব রূপে ইহাকে মুর্শিদাবাদ নামে অভিহিত করেন। ১৭২৫ খৃঃ মসজিদের সোপানের নিম্নে এক ক্ষুদ্র কক্ষে তাঁর সমাধি হয়। শোনা যায় বাদশাহদের প্রথামত তিনি জীবদ্দশাতেই আপন মকবেরার স্থান নির্ব্বাচন করে ছিলেন।

কাটোরা মস্‌জিদের ছাদ হয়েছে ছয়টি গম্বুজ-সংযোগে। মধ্যভাগের গম্বুজগুলি একেবারে নাই; দুই-পার্শ্বে গম্বুজের ভগ্নাংশ এখনও দেখা যায়। উচ্চতা সাধারণ মসজিদের দেড়গুণ। দৃষ্টিপাত মাত্রেই একটা গাম্ভীর্য্যের আভাস পাওয়া যায়। বন্ধুবর হানিফ অদূরে দেওয়ালে উঠে উচ্চাংশের ছবি তুললেন। কাটোরা সমজিদের আকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে পূর্ব্বের পারস্য সভ্যতার কিছু ছাপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠে। এই মসজিদ ও তৎসংলগ্ন হর্ম্যশ্রেণী পারস্য প্রথায় রচিত। সমস্তটি একটি প্রকাণ্ড স্কোয়ার। পূর্ব্ব দিকে গেট বেয়ে উঠলে মুর্শিদকুলী খাঁর কবর আপনার পায়ের নীচে পড়বে। ধর্ম্মাত্মা নামাজীদের পদধূলি নেওয়ার পুণ্যসঞ্চয়-উদ্দেশ্যেই এরূপ স্থান নির্দ্দেশ করেছিলেন বলে মনে হয়। সম্মুখে এক বিশাল চত্বর। শোনা যায় এস্থানে মজলিস ও রাজকার্য্য-পরিচালন-নিবন্ধন সভা-সমিতিও বসত। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে লম্বা দ্বিতল বাড়ী বরাবর প্রাচীর গঠন করেছে। একতলায় সময় বিশেষে সৈন্য রাখা হত ও দ্বিতলে মক্তব-মাদ্রাসার কাজ চলত। চত্বরের সর্ব্ব-পশ্চিমাংশে মস্‌জিদ। মসজিদের অদূরে পশ্চিমে ও দ্বিতলপ্রাচীরের বাহিরে দুই কোণে দুইটি মনুমেণ্ট। এখন শৃঙ্গগুলি ভেঙ্গে গেছে। এখানে সৈনাধ্যক্ষ ও পর্য্যবেক্ষণ-কারীরা বহুদূর পর্য্যন্ত অনায়াসে পর্য্যবেক্ষণ করতেন।

কাটোরা মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ হতে মতিঝিলের দিকে রওয়ানা হলাম। "মুর্শিদাবাদের নিকটই এই গ্রাম্য প্রাসাদ বিরাজমান। জলের উপর এই অট্টালিকার অনেক অংশ বিদ্যমান ছিল। (সিরাজের জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত) নোয়াজিস মহম্মদ কর্ত্তৃক এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর ভগ্নাবশেষ হইতে কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বেলের স্তম্ভ-

সমূহ আনয়ন করিয়া এই প্রাসাদ সমালঙ্কৃত হইয়াছিল।" নোয়াজিস মহম্মদের পত্নী ঘাসটী বেগম তাঁর ধনসম্পত্তি নিয়ে এই মতিঝিল প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঝিলের উপরিভাগ দল-শৈবালে পরিপূর্ণ হয়েছে। যে অবস্থা দেখলাম তাতে নৌকাদ্বারা অদূরে যাওয়াও কষ্টকর। বহুজাতীয় পক্ষী নিরাপদে বিচরণ করছে। শিকারীরা ভুলেও সে-দিকে গুলী ছুড়ে না, কারণ পক্ষী গতায়ু হলেও তা লাভ করার উপায় নাই।

সর্ব্বশেষে ফিরবার পথে রাজপ্রাসাদ, ইমামবাড়ী ও নবাবের মসজিদ-সহ স্কুল-কম্পাউণ্ড দেখে বাসায় পৌছলাম। রাজপ্রাসাদকে হাজার দুয়ারী বলা হয়। বাস্তবিক এ-প্রাসাদ অসংখ্য দরজা সমন্বিত। প্রাসাদে যেতে সম্মুখে দুই বৃহদাকার সিংহমূর্ত্তি দেখা যায়। নিম্ন-তলার একাংশে অস্ত্রাগার দেখবার জিনিস। বহু প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র ও শিরস্ত্রাণ রক্ষিত আছে। আমি একটি শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করলাম তা খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসরের, পারস্য ইরাণ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। নবাব সিরাজ যে-ছোরা দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিলেন তাও রক্ষিত আছে। তরবারী, খঞ্জর, ডবল-ছোরা, পাঁচনলা বন্দুক ইত্যাদি সে-যুগের দেশীয় অস্ত্র-শিল্পীদের কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান। বিভিন্ন উপাদানের ও বিভিন্ন প্রকারের ঢাল দেওয়াগুলির শোভা বর্দ্ধন করছে। নবাব সিরাজের হস্তের দীর্ঘতরবারীও রক্ষিত আছে। ছোট বড় কামানগুলি অস্ত্রাগারের একাংশে রক্ষিত। দ্বিতলে নবাবের দরবার—সে স্থানে তিনটি মসনদ দৃষ্ট হ'ল। শোনা যায় একটিতে মুর্শিদকুলী খাঁ, একটিতে আলীবর্দ্দী খাঁ ও অপরটিতে নবাব হুমায়ূন জাহ্ উপবেশন করেছেন। চতুর্দ্দিকে কতকগুলি বহুমূল্য চেয়ার ও টুল। রৌপ্য নির্ম্মিত একটি টুলে লর্ড ক্লাইবকে বসতে দেওয়া হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। উচ্চ 'ডোমের' গম্বুর বেয়ে এক বড় ঝাড়বাতি শোভা পাচ্ছে। একাংশে বাংলার নবাবদের প্রতিকৃতি ধারাবাহিক ভাবে সজ্জিত। এতদ্ব্যতীত মহামূল্য মোগল-আর্ট হল ও বারান্দাগুলি পরিশোভিত করেছে। তৃতীয় তলে হলের একাংশ ফুটবল গ্রাউণ্ডের মত প্রশস্ত। নবাবের বৈঠকখানায় রক্ষিত মূল্যবান গালিচা, কারুকার্য্যপূর্ণ কাপ, গ্লাস ইত্যাদি বাংলার তথা ভারতীয় শিল্পীদের বিজয় নিশান স্বরূপ। কুতুবখানা বা লাইব্রেরী গৃহে মূল্যবান কলমী পুস্তক, কারুকার্য্যপূর্ণ কোরাণ শরীফ ইত্যাদি অতীত ভারতের অমূল্য সম্পদ। এ-সব দেখে বাংলার শিল্পীদের তথা তথা ভারতের শিল্পীদের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। বাংলা হতে কি কি মূল্যবান সামগ্রী পাওয়া যেত মুর্শিকুলী খাঁর সময়ের এক অপূর্ণ ফর্দ্দ হতে তা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যদিও ফর্দ্দটির মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে উল্লেখ আছে, তবু তাতে কয়েকটি মূল্যবান্ শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। "নবাব (মুর্শিদকুলী) সাধারণতঃ বৈশাখের প্রারম্ভেই সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব ১ ক্রোর ৩০ লক্ষ হইতে ১ ক্রোর ৫০ লক্ষ টাকা, অধিকাংশই সোনা-রূপায়, দিল্লীতে প্রেরণ করিতেন। টাকা মোহরের বাক্স ২০০ দুইশত বা ততোধিক গো-যানে বোঝাই দেওয়া হইত, ৩০০ তিনশত অশ্বারোহী ও ৫০০ পাঁচশত পদাতিক প্রহরীর কার্য্য করিত এবং একজন ছোট খাজাঞ্চি সঙ্গে যাইত। রাজস্বের সহিত নবাব সম্রাট ও মন্ত্রীদিগের নিমিত্ত নানা উপহার পাঠাইতেন; যথা—অনেকগুলি হস্তী, পার্ব্বত্য ঘোটক, কৃষ্ণসার মৃগ, বাজপক্ষী, গণ্ডার চর্ম্ম-নির্ম্মিত ঢাল, তরবারি, শ্রীহট্টের শীতল পাটি, স্বর্ণ-রৌপ্যের নক্সার কাজ-করা থালা-বাটি, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্য, ঢাকাই মলমল, কাসিমবাজারের গরদ ও হুগলীর রাজবন্দর হইতে আনীত কতকগুলি ইয়ুরোপ নির্ম্মিত দ্রব্য।"

রাজপ্রাসাদ ও ইমামবাড়ী মুখোমুখী অবস্থিত, মধ্যে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ; তারই একাংশে ঘড়ি-ঘর। মধ্যভাগে একটি সুদীর্ঘ কামান দুইটি স্তম্ভের উপর রক্ষিত হয়েছে। কামানের মুখে সিঁদুর ও বিল্বপত্র দেখা গেল। শুনলাম এখনও হিন্দুরা তার পূজা করে। পশ্চিমদিকে নদীতীরে নহবৎখানা ও কামান-শ্রেণী। রাজপ্রাসাদের সম্মুখেও কয়েকটি কামান সজ্জিত আছে। ইমামবাড়ীর বহুস্থান সংস্কার অভাবে হীনশ্রী বলে বোধ হ'ল। ইমামবাড়ীর উত্তরে নবাব-হাই-স্কুল। ভাগীরথীর তীর-সংলগ্ন পথ বরাবর বিশাল অত্যুচ্চ গেটের মধ্যদিয়ে নগরে পড়েছে। প্রাসাদের দক্ষিণাংশে আরও একটি বিরাট হর্ম্ম্য। তার

সম্মুখে দুইটি সুদীর্ঘ সরো-কদ বা সাইপ্রেস জাতীয় বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। প্রাসাদ-সীমানার দূরে একাংশে মুর্গীখানা—দেখে মনে হয় তা মানুষেরই বাসস্থান বুঝি। তার অদূরে দক্ষিণভাগে কয়েকটি মন্দিরের গা-ঘেঁসে নগরাগত একটি সরনী সোজা সোপান বেয়ে ভাগীরথীতে নেমেছে।

এ-ভাবে মুর্শিদাবাদে চারদিন অতিবাহিত করে পলাশীকে গালি দিতে দিতে কলিকাতা অভিমুখে রওয়ান হলাম। বন্ধুবর কলিমের ভ্রাতৃদ্বয় ও মিসেস সলিমউল্লা আমাদের আহার আরামের সুব্যবস্থা করেছিলেন; তজ্জন্য তাঁরা ধন্য বাদার্হ। প্রসঙ্গতঃ বলতে ভুলে গেছি যে, মুর্শিদাবাদের এক ছোট্ট মসজিদে ঈদের নামাজ পড়েছিলাম।

ফিরবার পথে গত দুইশত বৎসরের ইতিহাসের খুঁটীনাটি মনে পড়ছিল। শিয়ালদহে পৌঁছেই স্মরণ হ'ল, কলিকাতার নাম কালিকট ও আলিনগর ছিল।

খাপছাড়া

(গল্প)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

আজও প্রতুল পথের উপর এসে দাঁড়াল। অভিজাত মনটা চাপা থাকলেও, আর একটা মন যেন সংসারের সমস্ত কিছুর বাইরে গিয়ে পড়েছে; জ্যোতি নেই চোখে, যেন কুহেলিতে আচ্ছন্ন, যেন অন্তরের নির্লিপ্ত চোখ দুটো ধ্যানাসনে বসেছে।

পেছন থেকে কে এসে হাত চেপে ধরল। চমকে ওঠা উচিত ছিল প্রতুলের, কিন্তু সে সহজভাবেই পেছনে তাকায়, ওর মনে যেন কোন বোধই নেই।

—এই যে প্রতুল—

প্রতুল সমীরের দিকে একবার তাকায়, মুখভরা উচ্ছ্বাস, বেদনা নেই, বেদনাবোধও নেই, একটা কৌতুক যেন ছড়িয়ে পড়েছে সমীরের মুখে।

প্রতুল একটু হাসল। সুদূর অতীতের কোনও পাথরের মূর্ত্তিকে আবিষ্কার করলে, মানুষের মুখে যেমন হাসি খেলে তেমনি।

—বিয়ে-ত করলি—প্রতুল জিজ্ঞেস করল।

—সেই কথাটাই তোর প্রথমে দরকার পড়ল নাকি—

প্রতুল সমীরের দিকে একবার স্থির দৃষ্টি মেলে কি যেন দেখতে চেষ্টা করল, না কিছুই নেই, আজ সে মানুষের মুখের আর কথার চেহারা-ও চিনতে পারে না। অপরিচিত, ভয়ানক অপরিচিত এই আশপাশগুলো।

—তোর নিমন্ত্রণ চিঠিও পেয়েছিলাম—

প্রতুল আরও কি বলতে যাচ্ছিলো, সমীর বাধা দিয়ে বললে—থাক, আর অজুহাত দেখাতে হবে না।

প্রতুলের মুখের কথাটা সত্যিই মুখেই থাকল এর পরের কথা সমীরের শুনে কোন লাভ হবে না। একজনের ক্ষতি তাতে আর দশজনের কি।

—আচ্ছা সমীর তুই যা, আমি এই গলিটাতে যাব—

—তার মানে, তোকে যে আজ আমি এক হপ্তা ধরে খুঁজছি। তোদের বাড়ীতে গিয়ে দেখি তালাবন্ধ। মনে করলুম দেশে গিয়েছিস। ঠিকানা না জানলে এই কলকাতায় কোথায় আর খুঁজে পেতাম—

—তোর যতদূর পর্য্যন্ত নজর যায় অন্ততঃ ততদূরের মধ্যে পেতি না—প্রতুল একটু মুচকি হেসে বলল। হাসি ও বলা যায় অভিমানও বলতে পারা যায়—কিসের ওপর অভিমানতা বোঝা গেল না।

—বেশ এখন চল্ আমার ওখানে, আর মা কোথায় আছেন বলত, চেঞ্জে যাবি শুনেছিলুম—

প্রতুল দাঁড়িয়ে পড়ল। গায়ের র‍্যাপারটা একটু টেনে গায়ে দিল।

—আজ যাব না, আমার বিশেষ কাজ আছে রে—

সমীর কোনক্রমেই তাকে নিতে পারল না, কারণ প্রতুলের ভীষণ কাজ। ঠিকানাও দিল না, পরশু গিয়ে নাকি জানাবে।

অথচ প্রতুলের কী ই বা এমন কাজ। তবু সে এসে ঢুকল তার মেসটাতে। হ্যাঁ, মেসই বলতে হবে বৈকি। একটা অপরিসর গলির শেষ দিকে খসেপড়া-চুন-সুরকীর দেয়াল তোলা একখানা বাড়ী। বাইরে পুরোনো সাইন-বোর্ড ঝুলছে—'দরিদ্র হোটেল'। নীচ তলায় রান্না হয়, খাবার জায়গা আছে—ওপাশে খানতিনেক ঘর। ওপরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে যেতে হয়। মেজটা সানের বটে, কিন্তু বারান্দাটা কাঠের পাটাতন করা। কাঠের রেলিঙও আছে। নীচ-টা থেকে ওপরটা মন্দ নয়। প্রতুল থাকে এই দোতালার পুবের দিকের ঘরে। পশ্চিম দিকে আছে একটি হিন্দু পরিবার। লোকটি কোন এক কাঠের দোকানে পালিশের কাজ করে। দুটি ছোট মেয়ে আছে তার, কি আর মাইনে পায় এমন—তবে শাস্তি এই, তাদের আধি-ব্যাধি তেমন নেই। লোকটার নাম সেদিন শুনেছিল অশ্বিনী। যাই হোক, এই আস্তানাকে প্রতুল 'মেস' কেন বলে জানি না। তাবে নিতান্ত বস্তী না বলুক 'আখরা' বললে বোধ হয় নামকরণটা মানানসই হ'ত।

—কি গো মীনু রাণী—প্রতুল তার গালটা টিপ দেয়।

মীনু অভ্যাসমত হাত পেতে বলে—দাও—

এক প্যাকেট লজেঞ্চ এসে পড়ল তার হাতে।

তারপর মীনু পেছনে লুকিয়ে রাখা আলোটা প্রতুলকে দেয়। এইটেই হচ্ছে মীনুর কাজ। এদানিক সে প্রতুলের জন্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখে, তার বিনিময় ঐ লজেঞ্চুস কিংবা বিস্কুট।

মীনু চলে যেতেই প্রতুল আলোটা কমিয়ে রাখল।

যত রাজ্যের চিন্তা এসে তার মাথায় ঢোকে।

সমীরের সঙ্গে দেখা না হলেই ছিল ভাল। মানুষের সমাজ যেন কেমন, চট করে তার অতীত অস্তিত্বটাকে মনে করিয়ে দেয় এই মানুষ। প্রতুলের একটা ভাল গত-জীবন ছিল একথা আজ তিনমাস সে ভুলেই ছিল। কোন বন্ধুর সঙ্গে সে দেখাও করেনি, কেউ মনেও করিয়ে দেয় নি যে সে একজন বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রতুল, কিন্তু আবার কেন?

—আপনার শরীরটা কি খারাপ করেছে—

ঘরে ঢুকল অশ্বিনী।

—কই, না—

উত্তর শুনে অশ্বিনীর মুখটা এমন হল যেন প্রতুল হ্যাঁ বললেই সে স্বস্তি পেত। তাই প্রতুলই পাল্টা জিজ্ঞেস করল—আপনার শরীরটা তেমন সুবিধের দেখছি নে ত—

—আর শরীর মশাই, সেই সকালে যাই, শিরীষ কাগজ হাতে তুলি আর ব্যাটারা সন্ধ্যে না হলে বিশ্রাম করতে দেয় না। এক ঠাঁই বসে মশাই এমন করলে শরীর থাকে, অথচ আজ দশ বছর এমনি চালিয়ে এসেছি, মনিবের কাজ কিছুই এগোয় না, কিন্তু আমাদের হাত নড়তেই থাকে—

অশ্বিনী একটু কেসে বলতে আরম্ভ করল—যেদিন প্রথম কাজে ঢুকলাম সেদিন মনে করেছিলাম, একা জীবন, যা করি তাতেই চলে যাবে। কিন্তু কে জানে মশাই, এই চাকরীটাই আমার কাল হয়ে দাঁড়াবে। সেই চাকরীর সূতো ধরে আমার বিয়ে উঠে এলো, তার [illegible]র ত দেখছেনই রীতিমত সংসার। এখন আ[illegible] [illegible]া হলে চলে, কিন্তু আমার এই চাকরীটা না হলে চলবে না।

অশ্বিনী একটা ভাল কথা বলতে পেরেছে ভেবে হেসে নিয়ে আবার আরম্ভ করল—জীবন আপনাদের, বেশ আছেন—

প্রতুল একটু হাসল। হ্যাঁ, জীবন তারই, বেশ ছন্ন-ছাড়া জীবন, জগতে তার আর এমন কেউ নেই যার জন্যে ভাবতে হবে, কিংবা তারই কথা কেউ দু-দিন ভাববে। অথচ ছিল, একদিন তাও ছিল—কিন্তু তা অশ্বিনী জানে না, অশ্বিনীর নিজের জীবনের উপর বিতৃষ্ণা আছে, পরকে ঈর্ষা করে—

'আপনি চাকরী পেয়েই বিয়ে করলেন কেন?' প্রতুল জিজ্ঞেস করে।

—আরে মশাই সেইটে-ই ত ধাঁধা; কেমন একটা মনে হ'ল, নিজের মনে জোর এসেছে, নিজের একটা মূল্য হয়েছে জানতে পেলাম, সংসার করার মত ক্ষমতা হয়েছে বুঝতে পেরে এই খাটুনীর শরীরে একটা আরাম জাগল যেন, লোকেও বললে বাইরেরটা সামলিয়েছ, এবার ঘর গুছবার চেষ্টা কর—

লণ্ঠনের আলোটা একেবারে নিভে যাচ্ছিলো, সেদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে প্রতুল ভাবে আর একটা জীবনের কথা। সেটা হয়ত অশ্বিনীর আভ্যন্তরীন পরিচ্ছেদ, বাঁচবার জন্যে সে কি আগ্রহ। বয়স:হয়েছিলো তার, কিন্তু মৃত্যু এসে তাকে সত্যি সত্যি পৃথিবী থেকে কেড়ে নেবে এ সইতে পার ছিল না যেন, ঐ লণ্ঠনটার মত সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল বাঁচতে, যেন এক নিমেষে মরে যাবার জন্যেই।

—আলোটা যে নিভে গেল মশাই—অশ্বিনী বলল। প্রতুলের কোন সাড়া না পেয়ে অতঃপর মীনুকেই ডাকল তার কাকাবাবুর আলোটা জ্বালিয়ে দিতে। মীনু এসে নিয়ে গেল আলো।

অসহায় আর নির্লজ্জ এই মানুষ। মানুষের মন মিথ্যা-বাদী। যে কোন মুহূর্তে মরতে পারে সে, তবু সে বাঁচতে চায়, তার বাঁচবার মিথ্যে কাহিনী শুনিয়ে আর দশজনকেও মাতাল করে রাখে। উচ্ছ্বাসী মনটা মানুষের বিকাশ-মান মনুষ্যত্বটার উপর বেসাতী করছে। প্রতুল শোক-কাতর হয়ে দু-দিন শ্মশানে ঘুরেছে, কিন্তু থাকতে ত পারল না সেখানে। আবার ফিরে এসেছে সহরে, মানুষের কাছে। বাঁচা চাই তার, তাকে যে বাঁচতে হবে, আশে-পাশের এতগুলো লোক উচ্ছ্বাস চাপা দিয়ে কেমন বাঁচতে চেষ্টা করছে যে! তারও অনুভূতি মিলিয়ে গেল, তবু স্মরণের প্রকাশ আছে—তাই পরিবর্ত্তন করলো জীবনের, কিন্তু কতটুকুই বা পরিবর্ত্তন—শুধু বাসভবন আর অভ্যাস। যেখানে ছিল বাড়ী সেখানে এক দরিদ্র হোটেল, যেখানে ছিল খাট সেখানে এল খাটিয়া, এ আর কতটকু? জীবনের যেখানে উদ্বৃত্ত ছিল সেখানে ঘাটতিও হ'ল না, অথচ তিনটি মাস কেটে গিয়েছে।

মীনুর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আলোতে ঘরটা যেন জ্বলে উঠল। প্রতুলের অন্ধকারের স্বপ্ন ভেঙে যায়। বিরক্ত হয় সে। যে কাজটা তার করা উচিত ছিল সে কাজটা আর একজন করে গেল—যেন তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল, তুমি অসহায়, তুমি একা তোমাকে চলাতে পার না, মানুষের সঙ্গ তোমারও দরকার, তুমি সমাজে এস।

প্রতুল গায়ের কাপড়টা আবার কাঁধে চড়িয়ে নেয়।

—উঠলেন নাকি—অশ্বিনী বলে।

—হ্যাঁ—প্রতুল বলল, না বললেও বোধ হয় চলত।

—কিন্তু আপনার কাছে বড় দরকারে এসেছিলুম—

প্রতুল পকেট থেকে একটা টাকা অশ্বিনীর হাতে না দিয়ে মীনুর হাতে দিয়ে গেল। কোন কিছুরই সে সাক্ষী রাখতে চায় না, বুদ্ধি ও সহায় হীনতার সঙ্গে তার খাপ খায় না। অশ্বিনীকে সে কিছু দেয় না, কারণ তার বিবেক সাক্ষী হয়ে থাকবে, সে যে উপকারী এ কথা অশ্বিনীর বিবেক তাকে অহরহ শুনিয়ে দেবে।

—কতই ত নিলুম—অশ্বিনী সসঙ্কোচে হাত জোড় করে দাঁড়ায়। আজকে নিতুম না, কিন্তু ব্যাটারা আজও মাইনেটা ঠিক মত দিল না, পেটের অসুখে ভুগেছিলুম দু-দিন তাই দু-দিন কামাই গিয়েছিল, ক'দিন পালিশটা ভাল হয়নি, জরিমানা হয়েছিল—

—আপনাকে শোধ করতে হবে জানলে আমি আপনাকেই দিতাম।

—আপনি পূর্ব্বজন্মে আমাদের নিশ্চয়ই কেউ ছিলেন—

অশ্বিনী বিনয়ে তার পায়ের ধুলো নিতে আসে ছল-ছল চোখে। প্রতুল তার আগেই বেরিয়ে যায়।

কিন্তু কোথায় যাবে সে এই রাত্রে? যেখানেই যাক, সেই একই চিন্তা—মানুষ, মানুষ, শুধু মানুষ।

আর সেই সঙ্গে আর একটা মানুষ ভেসে ওঠে তার স্মৃতিপটে। মনে পড়ে তার স্বাস্থ্যের কথা—আর চেহারা যেন দেবী প্রতিমা। সময় সময় নিজকে ভাগ্যবান মনে করত প্রতুল ও ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাত। তারপর যা ভাববার কথা তা হলনা, চুলও পাকল না, ম্লানও হ'ল না মন অথচ রক্ত—কি ভীষণ রক্তের স্রোত যেন

আগুনের হলকা গায়ে এসে লাগে, পুড়ে যাবে--পুড়ে—গেল।

—আত্মা—প্রতুল ডাকে কম্পিত স্বরে।

যে বেরিয়ে আসে সে ব্রহ্মচারী, শুভ্র পোষাক, ধীরে দোরটা খুলে সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কিরে অনেকদিন পর এত রাত্রে।

—আইডিন আছে তোদের এখানে, পায়ে বড্ড লেগেছে—

—আচ্ছা—বস্, মহারাজের আবার অসুখ কিনা।

আত্মানন্দ আইডিন আনতে গেল।

মহারাজের অসুখ, মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজ। অসুখ—ভীষণ অসুখ, চুপ করে থাক, জাগিওনা, তাঁর শান্তি ভেঙোনা। সাধু, মহাত্মা, ত্যাগী, গৃহী নয়, পৃথিবীকে ছাড়িয়ে গেছেন তিনি—তাঁর অসুখ করেছে, অসুখ সে যে মৃত্যুর দোসর—তাকে সমীহ করে চলো, বাঁচাও, বাঁচ। মঠের সমস্ত আলোগুলোতে সবুজ রঙের শেড্। আলোর দিকে তাকাইলে ঘুম আসে। হ্যাঁ, কোনরকম গোলযোগ সইবে না, আলোর তীক্ষ্ণতাকেও ক্ষমা করো না, কারণ মহারাজের অসুখ; শুদ্ধ হও, ধীরে চল—চুপ!

—সে কিরে এমন হোঁচট খেলি কিসে? জুতোটা যে রক্তে ভিজে গেছে। আত্মানন্দ ফিরে এসে তার পায়ে আইডিন লাগাতে লাগাতে বলল।

প্রতুল কি বলতে চেয়েছিল একটু জোরে, আত্মানন্দ তাকে থামিয়ে একটু হেসে বলল—একটু আস্তে কথা বলিস, মহারাজের ভীষণ অসুখ, দেহ ত্যাগই করবেন না কি?

প্রতুল আর আত্মানন্দ মহারাজের শয়ন ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। আত্মানন্দ ভেতরে ঢুকল, প্রতুল দাঁড়িয়ে রইল দরজাতে। মঠের সমস্ত ব্রহ্মচারী, সাধু, স্বামিজী শুশ্রূষা করছেন, কোন ক্রটি নেই। মহারাজকে বাঁচাতে কি ব্যাগ্রতা, মহারাজেরও কি আগ্রহ নেই বাঁচতে? প্রতুল কান পেতে থাকে। হ্যাঁ, শোনা গেল, মহারাজ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ঈশ্বরকে ডাকছেন, তাঁকে নিরাময় করে তুলতে, তাঁর অনেক কাজ পড়ে আছে সংসারে!

প্রতুল পালিয়ে এল। সে দাঁড়াতে পারল না। কারণ মহারাজ দেহত্যাগ করছেন না, তিনি হয় মারা যাচ্ছেন, নতুবা বেঁচে যাবেন।

ছাঁচে ঢালা সব মানুষ—সব—মানুষ, একটিও বাদ নয়। অচলার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বলে সমীর একদিন মরতে গিয়েছিল—প্রতুলকে দিয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড আনিয়েছিল, খেয়েছিলও, কিন্তু ভাগ্যিস প্রতুল বিষের বদলে দিয়েছিল অমৃত। সেই অচলার কোথাও বিয়ে হয়ে গেছে। সমীর বিয়ে করেছে আর কোনখানে, আর তার নিমন্ত্রণ চিঠি পেল প্রতুল যে পটাসিয়াম সায়ানাইড এনে দেয়নি। যে মরতে গিয়েছিল সে বাঁচতেই চায়, বেঁচেই সে খুসী, এইটেই তার আসল চাওয়া, মৃত্যু যেন তার ভুল।

অশ্বিনীরা ধীরে ধীমে বাঁচার পথে এগিয়ে চলেছে, এইটেই অশ্বিনীর ধারণা, নতুবা এমন হাড়ভাঙা খাটুনী আর আর মনিবের বকুনী সে খেতে যাবে কেন—এত দুঃখেও তারা যে বাঁচছে এই জন্যে তারা বাসা বেঁধে আছে, এই জন্যেই সে তাকে প্রণাম করতে ছুটে এসেছিল।

মানুষের সঙ্গ লাভে মানুষের নেশা আছে, মানুষের কথায় মাদকতা আছে ভুলিয়ে দেয় সব। এই সঙ্গে আর একটা লোকের কথাও তার মনে পড়ে। তিনমাস আগেও সে বেঁচেছিলো। সেদিনও প্রতুল মনে করেছিল মানুষ বাঁচলেই বাঁচতে পারে, মানুষ বেঁচেই থাকে, এইটেই তার সার্থকতা।

প্রতুল এসে সাধারণের টেলিফোন এর যায়গায় রিসিভারটা তুলে নিয়ে নাম্বার বলল।—কে অ[illegible]—হ্যাঁ, আমি প্রতুল। খবর আর কিছুই নয়। হ্যাঁ, তা তোমাদের ওখানে যাইনে প্রায় ছ'মাস ত' হলোই; অথচ এই ছ'মাস পরে তোমার কথাটাই সর্ব্বপ্রথম মনে পড়ল, বলছি, সব বলছি। শোন—তিনমাস হ'ল আমার মা মারা গেছেন, সংসারের একমাত্র আত্মীয় আমার। হ্যাঁ, দু-তিন ভুগেছিলেন—মানে যেদিন থেকে তোমাদের ওখানে যাই না; অথচ এখন তাঁর কোন স্মৃতি আর আমার মনে পড়ে না। কেবল মনে পড়ে প্রথম দিনকার কথা, যেদিন তাঁর মুখ থেকে প্রথম লাল টকটকে আগুন বেরিয়ে এল, সে আগুনের কি আঁচ, তার উত্তাপ টের পেলুম শেষের দিন চিতায়, বাঁচবার জন্যে তাঁর কি কাকুতি, হ্যালো অনিলা—

—হ্যাঁ শোন, বাঁচা-মানুষদের উপর যেন তাঁর হিংসা ছিট্‌কে পড়তে থাকে। তবু বাঁচাতে পারলাম না, অথচ মনে পড়ে, মা প্রথম যেদিন সেই টি-বি রোগী কালী বাড়ীর বুড়ো পুরুত ঠাকুরকে শুশ্রূষা করতে গেল গাঁয়ের মানুষের তিরস্কার সহ্য করে, সেদিন তাঁর চোখে-মুখে দেখেছিলাম মৃত্যুঞ্জয়ের অন্তর চক্ষু—আবার সেই চোখই একদিন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। হ্যালো হ্যালো—

ওধার থেকে বোধ হয় উত্তর আসে—

মনে করেছিলুম সব সয়ে যাবে, সয়ে ছিলও। এঁ্যা, কি বলছ মা-বাবা কারও চিরদিন থাকেনা—তুমি কি সত্যি এটা বোঝ? আমিও বুঝি, কিন্তু এ কয়েকমাসে ঘুরে ঘুরে আরও অনেক মানুষ দেখলাম, অনেক। দেখলাম শুধু কারও মা-বাবাই নয় 'কার-ও' লোকটিও চিরকাল থাকে না, অথচ দেখলাম প্রত্যেকটি মানুষ এই পৃথিবীতে থাকতেই চায়—কি ব্যর্থ প্রয়াস তাদের! হ্যালো—

—আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ, কেন—আমার জীবনটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় এই জন্যে ত' অর্থাৎ আমি যাতে মরে না যাই কেমন—দেখ, মা বাঁচবার জন্যে আমাকে দিয়ে জোর করে দেবতার কাছে মানতও করেছিলেন।

—অনিলা—হ্যালো, অনিলা—শোন—তোমার বৌদি ওধার থেকে যা বললেন যা আমার কানে এসে পৌঁচাচ্ছে। তোমাকে বলছি কারণ যাবার আগে তোমার কথাটাই মনে পড়ল।

আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কোথায় জানি না, তবে বোধ হয় সন্ন্যাসী হব না। দেখি কি হয়, সবচেয়ে সুখের হয় যদি পাগল হ'য়ে যাই। ভয়ানক নেশা করেছি, এমন নেশা করেছি যে পুরোনো লোকই বারবার দেখতে ইচ্ছে করে, তাদের সঙ্গে কেবল কথা বলতে ভাল লাগে, সেই নেশাটা একটু কমিয়ে নিয়ে আসি। এঁ্যা--কি বলছ—তোমার ভার! তুমি কি নিজে বইতে পারবে না? মনটা একটু সুস্থ কর, সুখী হবে। না—না আশীর্ব্বাদ করছি না, কারণ—এঁ্যা, কি বলছ, তুমি আমাকেই কেবল—কি বললে—ও—হ্—প্রতুল তাড়াতাড়ি কনেকসনটা কেটে দিয়ে একটু হাসল।

প্রতুল যখন বেড়িয়ে এল সে দেখতে পেল পথের ওধারে একটা লোক তাড়ি খেয়ে প্রচুর বমি করছে, লোকটি কোন্ দেশী প্রতুল একবার দেখতেও চেষ্টা করল না। সামনেই তাড়ির দোকান, অনেক সুস্থ লোক মাতাল হবার জন্যে জমা হয়েছে, পাহারাওয়ালা আছে হয়ত দূরে, বহুদূরে।

অনন্তের যাত্রী

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

আজি এ প্রভাতে নদীপথ বেয়ে কোথা যাও তুমি চলিয়া,
চলিতে চলিতে পথহারা হয়ে, যাবে কি আমারে ছলিয়া?
ত্যজিতে পার যদি মনোবেদনা, আর তবে হেথা এসো না,
(তব) ত্যাগের মহিমা গোপন রবে না, প্রচারিবে বিশ্বজনা।

সকলই ভ্রম মায়া-মরীচিকা, বুঝেও যে জীব বোঝে না,
বৃথা ঘুরে মরে শুধু যায় আসে, পায় কত-শত যাতনা।
স্থূলদেহ ছাড়ি সূক্ষ্মদেহ ধরি, মহাশূন্যে যবে মিশিবে,
ফিরিবে না আর এ মরজগতে, প্রণবেতে শেষে পশিবে।

ভারতের বীমা-ব্যবসা

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

সম্প্রতি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্স ১৯৩৯ সালের বীমা কোম্পানীসমূহের কার্য্যবিবরণী সম্বলিত বার্ষিক বিবরণী প্রচার করিয়াছেন। এই বার্ষিক বিবরণী যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ করা হয় তজ্জন্য সকলেই বহুদিন যাবৎ চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। দুই মাস পরে তথ্যাদি প্রকাশ করিলে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য হয়ত হ্রাস হয় না কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিতে বেশ অসুবিধা হয়, ইহা নিশ্চিত। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, নূতন বীমা বিভাগ খোলায় হয়ত কিছু সুবিধা হইবে, কিন্তু তাহা যে হয় নাই তাহা বেশ দেখা যাইতেছে।

১৯৩৯ সালের মধ্যভাগে নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহার দুয়েরই কিছুটা কার্য্যকারিতা ১৯৩৯ সালের কার্য্যবিবরণী হইতে পাওয়া যায়। ভারতের মোট নূতন বীমার কার্য্য কমিয়াছে এবং কোম্পানীর সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। ৪৯টি ভারতীয় কোম্পানী অন্য কোম্পানীর সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং কয়েকটি অভারতীয় কোম্পানী এখান হইতে কারবার তুলিয়া লইয়াছে। ভারতে মোট ২৯৫টি কোম্পানী কার্য্য করে, তন্মধ্যে ১৯৭টি ভারতীয় কোম্পানী। ভারতীয় কোম্পানীগুলির ৬৩টি বোম্বাই ৫৩টি বাংলা ৩০টি মাদ্রাজ ২০টি পাঞ্জাব, ১২টি দিল্লী, ৯টি যুক্তপ্রদেশ ৩টি মধ্যপ্রদেশ ৩টি বিহার ২টি সিন্ধু, ৩টি আসাম এবং আজমীরে ১টি প্রতিষ্ঠিত।

১৯৩৯ সালে ভারতে জীবন বীমা হইয়াছিল মোট প্রায় ৪৭ কোটী টাকার, তৎপূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল প্রায় ৫২ কোটী টাকার, তন্মধ্যে ভারতীয় কোম্পানী-গুলির অংশ ছিল প্রায় ৪২।৷৹ কোটী টাকা এবং তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ছিল ৪৩ কোটী টাকা, যদিও মোট নূতন বীমার কাজ অনেক কমিয়াছে, ভারতীয় কোম্পানী-সমূহের অংশ খুব বেশী কমে নাই।

১৯৩৯ সালের মোট ২৭২ কোটী টাকার বীমা সচল ছিল, তৎপূর্ব্ব বৎসর ছিল ২৯৮ কোটী টাকার, ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের অংশ ছিল ২১৫ কোটী টাকা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ছিল ২০৪ কোটী টাকা, অর্থাৎ ভারতীয় কোম্পানীসমূহের সচল বীমার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু অভারতীয় কোম্পানী সমূহের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। অনেকগুলি অভারতীয় কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণী হস্তগত না হওয়ায় এইরূপ হইয়াছে, অনুমান হয়।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ভারতীয় কোম্পানী-গুলি ১৯৩৯ সালে মোট ৪৬ কোটী টাকার বীমার কাজ করিয়াছিল, তৎপূর্ব্ব বৎসর করিয়াছিল, উহার প্রায় ৭২ লক্ষ বেশী, মোট চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ২৩২ কোটী টাকার। তৎপূর্ব্ব বৎসর ছিল ২১৯ কোটী টাকার। ভারতীয় কোম্পানীগুলির মোট আয় হইয়াছি প্রায় ১৫ কোটী টাকা, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর হইয়াছিল ১৪ কোটী টাকা।

১৯৩৯ সালে জীবন বীমা তহবিল ৫ কোটী টাকা বাড়িয়া ৫৬ কোটী টাকার উপর উঠিয়াছে। সুদবাবদ আয় হইয়াছিল শতকরা ৪.৬৪ তৎপূর্ব্ব বৎসর উহা হইয়াছিল ৫·১৫। প্রিমিয়ামের শতকরা ৩৩·২ ভাগ, ১৯৩৮ সালে উহা ছিল ৩১·৭ ভাগ। অর্থাৎ খরচের হার কিছু বাড়িয়া গিয়াছে।

জীবনবীমার কাজে ভারতীয় কোম্পানীগুলি অভারতীয় কোম্পানীগুলিকে কতকটা হটাইয়া দিয়াছে, কিন্তু অগ্নি, নৌ, মোটর ইত্যাদি বীমা সম্বন্ধে একথা খাটে না। অভারতীয় কোম্পানীগুলিকে কোণঠাসা করিয়া

রাখিয়াছে। অগ্নি ইত্যাদি বীমা মোট প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ৩ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা, তৎপূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ২ কোটী ৮২ টাকা। ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীগুলির অংশ ছিল ১ কোটী ২ লক্ষ টাকা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ছিল ৮৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ অভারতীয় কোম্পানীগুলি ভারতীয় কোম্পানীগুলির তিনগুণেরও অধিক কাজ করিয়া থাকে। অভারতীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক-গুলির সহায়তা এবং অন্যান্য উপায়ে তাহারা ভারতের বাজার দখল করিয়াছে। ভারতীয় কোম্পানীগুলির ঐক্য প্রচেষ্টায় এবং জনসাধারণের কার্য্যকরী সহানুভূতিতেই এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভব।

নূতন বীমা-কোম্পানীর সমস্যা

বীমা আইনের একটি উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে নূতন বীমা কোম্পানী ব্যাঙের ছাতার মত গজাইতে না পারে। ডিপজিট ও প্রদত্ত মূলধন বৃদ্ধি বাধ্যতামূলক করিয়া অল্প মূলধনে নূতন নূতন কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করিবার পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। এখন কোন বীমা কোম্পানী করিতে হইলে তাহা সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর করা সম্ভবপর। নূতন কোম্পানী গঠন করিবার বিরুদ্ধে পূর্ব্বেকার ইন্সিওরেন্স ব্লু বুকগুলিতে সাবধান করিয়া দেওয়া হইত। সম্প্রতি ১৯৪০ সালে যে বীমা বার্ষিকী সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্স প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে গঠিত বীমা কোম্পানীগুলি সম্পর্কে কয়েকটি অতি সমীচীন মন্তব্য করিয়াছেন, বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ এবং ভারতীয় বীমার হিতকামী ব্যক্তিগণের তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের পরিচালকবর্গের ধারণা যে, তাঁহারা ইন্সিওরেন্স ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ এবং তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থ বীমা ব্যবসা চালাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। অবশ্য কতকগুলি কোম্পানী বেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া বিশেষ উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কতকগুলির বেলায় এই মন্তব্য খাটে না, কিছুদিন কাজ করিবার পর ইহারা ক্রমান্বয়ে বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহাদের পুঁজি এবং অভিজ্ঞতা ব্যবসায়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। টাকার অভাব বা অনভিজ্ঞতা বা অন্য কোন কারণ ইহাদের অসফলতার জন্য দায়ী তাহা চুলচেরা বিচার করিয়া এখন কোন লাভ নাই, তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, অধিকাংশ পরিচালকেরই বীমা বিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ, সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা নাই।

যুদ্ধের জন্য ছোট ছোট নূতন কোম্পানীগুলির যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য যে-সব কোম্পানী প্রিমি-য়ামের আয় একলাখ টাকার কম ও বয়েস কম তাহাদের ডিপজিট অর্দ্ধেক করিবার জন্য একটি আইন পাশ করা হয়। ফলে কতকগুলি কোম্পানীর বিশেষ সুবিধা হয়। যে সব কোম্পানীর ১টি বা ২টি করিয়া ভ্যালুয়েশন হইয়াছে বা হইবার সময় হইয়াছে তাহারও কেহ কেহ এই সুবিধা পাইবার দাবী উত্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু এই সব কোম্পানীর এই সুবিধা পাওয়া উচিত নহে বলিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্স মনে করেন। এই কোম্পানীগুলির ভিত্তি দৃঢ় নহে। তাহারা রিজার্ভ ফাণ্ড্ গঠন করে নাই বা তাহাদের বীমা তহবিল এত বেশী নহে যে কোন বিপদ আসিলে তাহা সামলাইতে পারে। কাজেই কয়েকটি কোম্পানী শিথিল ভিত্তিতে ভ্যালুয়েশন করাইয়া বোনাস দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহা করিতে দেওয়া চলে না। কোম্পানীগুলির সচলতা (Solvency) দেখাইবার জন্যও শিথিল ভিত্তিতে ভ্যালুয়েশন করান উচিত নহে। ইহার বিপদ আরও বেশী। কারণ ইহার দ্বারা বীমাকারিগণকে প্রকৃত অবস্থা জানিতে দেওয়া হয় না, এবং কোম্পানীকে দৃঢ় মনে করিয়া নূতন নূতন বীমাকারী নিজেদের বীমা করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনে।

পুরাতন বীমা কোম্পানীগুলি যে অবস্থায় সৃষ্ট হইয়া-ছিল এবং যেরূপভাবে নিজেদের দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়াছে, সেরূপ এখন আর নাই। নূতন কোম্পানী আর সেরূপ সুবিধা পাইবে না। পুরাতন কোম্পানী গুলির প্রবল প্রতিযোগিতায় আর তাহাদের পাড়িয়া উঠা সম্ভব নহে। কাজেই খুব বেশী পরিমাণ প্রদত্ত মূলধন না লইয়া নূতন কোম্পানী গঠন করিলে তাহারা

প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিবে না এবং সমগ্র বীমা-ব্যবসায়ের বিপদ ডাকিয়া আনিবে।

এখন যে সব ছোট ছোট শিথিল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী আছে, তাহাদের অবস্থা কি হইবে? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্স মনে করেন যে একত্রীকরণ (amalgamation) ও বিজনেস ট্রান্সফার করিয়াই এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। অনেকগুলি কোম্পানী ইতিমধ্যেই একত্রিত হইয়াছে, আশা করা যায় আরও হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, ছোট ছোট কতকগুলি কোম্পানী একত্রিত হইতেছে। কোন বড় কোম্পানীর সহিত কোন ছোট কোম্পানী একত্র হয় নাই। ছোট ছোট কোম্পানীর বিপদের ঝক্কি লইবার মত ক্ষমতা বেশী নহে। আর কতকগুলি ছোট কোম্পানী একত্র হইলেই যে একটি দৃঢ় ও শক্তিশালী কোম্পানী গঠিত হইল, ইহা মনে করা যায় না। ইহাতে বিপদ আরও বেশী বাড়িতে পারে।

বড় বড় কোম্পানীগুলির এদিকে একটু বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। শুধু ইহারাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানীর দায়িত্ব বহন করিতে সক্ষম। দেশের বীমা-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং ঐসব কোম্পানীর বীমাকারিগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বড় বড় দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইহাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা আশাকরি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আবেদন বৃথা যাইবে না।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীর ধন-নিয়োগ।

বীমা বার্ষিকীতে ভারতীয় কোম্পানীগুলির সম্পত্তি কি ভাবে দাদন করা হইয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, মোট সম্পত্তির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ গবর্ণমেণ্ট ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ সিকিওরিটিতে খাটান হইয়াছে।

সম্পত্তি বন্ধক	২'০৪	কোটি	টাকা
বীমা বন্ধক	৬,২১	„	„
শেয়ার বন্ধক	'১৯	„	„
অন্যান্য ঋণ	'৩৫	„	„
ভারতগবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি	৩৬,৯৮	„	„
দেশীয় গবর্ণমেণ্ট „	'৪০	„	„
বহির্ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট „	'৮০	„	„
মিউনিসিপ্যালিটি বণ্ড	৫'৬২	„	„
শেয়ার	'৭২	„	„
জমি ও বাড়ী	'৪৬৯	„	„
এজেণ্টস ব্যালেন্স ইত্যাদি	৩'১৩	„	„
ক্যাশ	২'৬১	„	„
অন্যান্য	১'৩৪	„	„
মোট	৬৯'১৪	কোটী	টাকা।

সমবেদনা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

লোহার শিকলে বাঁধা টিয়ারে ডাকিয়া,
সোনার খাঁচায় থাকি কহিল পাপিয়া,—
"তোমারে দেখিলে ভাই,
মনে বড় দুঃখ পাই,
সাধ হয় ফেলি খলে নিগড় তোমার।"

পাপিয়ার কথা শুনি টিয়াটি হাসিয়া,
কহিল তাহারে ধীরে মৃদু সম্ভাষিয়া,—
"তার আগে যদি পার,
আপন পিঞ্জর ছাড়,
মুক্ত নিজে হয়ে খুলো নিগড় আমার।"

কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরতের খুব ভাল লাগছিল ওদের সঙ্গ। এমন মন খোলা, আমুদে, তরুণী মেয়েদের সঙ্গ পাড়াগাঁয়ে মেলে না, এক আছে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু সেও এদের মত নয়—এদের যেমন সুশ্রী চেহারা, তেমনি গলার সুর, এদের সঙ্গে একত্র বাস করা একটা ভাগ্যের কথা। কিন্তু ওরা যা বলচে, তা সম্ভব হবে কি করে? এরা আসল ব্যাপারটা বোঝে না কেন?

সে বললে—ভাল তো আমারও লেগেচে আপনাদের। কিন্তু বুঝচেন না? কলকাতায় বাবা থাকবেন কি করে? তেমন অবস্থা নয় তো তাঁর? এই হোল আসল কথা।

প্রভাসের বৌদিদি হেসে বললে—এই! এজন্যে কেনো ভাবনা নেই তোমার ভাই। এখন দিনকতক আমাদের বাসাতে থাকো না—তারপর এর পর একটা দেখে শুনে নিলেই হবে এখন। আর তোমার বাবা? উনি যে আফিসে কাজ করেন, সেখানে একটা কাজটাজ—

—সে কাজ বাবা করতে পারেন না। ইংরিজি জানেন না—উনি জানেন গান-বাজনা, বেশ ভাল বেহালা বাজাতে পারেন—

প্রভাসের বৌদিদি কথাটা যেন লুফে নিয়ে বললে—বেশ, বেশ—তবে তো আরও ভাল। নরেশবাবু থিয়েটারেই তো কাজ করেন—তিনি ইচ্ছে করলে—

শরৎ বললে—নরেশ বাবু কে?

—নরেশ বাবু?—এই গিয়ে—ওঁর একজন বন্ধু। আমাদের বাসায় প্রায়ই আসেন টাসেন কিনা?

শরৎ একটুখানি কি ভেবে বললে—কিন্তু বাবা কি গাঁ ছেড়ে থাকতে পারবেন? আমার সহর দেখা শেষ হয়নি বলে তিনি এখনও বাড়ী যাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করচেন না—নইলে এতদিন উদ্বাস্ত করে তুলতেন না আমাকে। নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় পড়ে কিছু বলতে পারচেন না। তিনি টিকবেন সহরে? তবেই হয়েছে!

প্রভাসের বৌদিদি বললে—আচ্ছা, এক কাজ করো না কেন?

—কি?

—তুমিই কেন থাকো না এখন দিনকতক? এই আমাদের সঙ্গেই থাকো। তোমার বাবা ফিরে যান দেশে, এরপরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। আমাদের বাড়ীতে আমাদের বন্ধু হয়ে থাকবে, টাকাকড়ির কোনো ব্যাপার নেই এর মধ্যে—তোমায় মাথায় করে রেখে দেবো ভাই। বড্ড ভাল লেগেচে তোমাকে, তাই বলচি। কি বলিস্ কমলা? তুই কথা বলচিস নে যে—বল্ না তোর গঙ্গাজলকে।

কমলা বললে—হ্যাঁ, সে তো বলচিই—

প্রভাসের বৌদিদি বললে—সে সব গেল ভবিষ্যতের কথা। আপাতত: আজ রাত্রে তুমি এখানে থাকো। প্রভাস গিয়ে খবর দিয়ে আসুক তোমার বাবাকে। রাজি?

শরৎ দ্বিধার সঙ্গে বললে—আজ? তা—না ভাই আজ বরং আমায় ছেড়ে দাও—কাল বাবাকে বলে—

—তাতে কি ভাই! প্রভাস-ঠাকুরপো গিয়ে এখুনি বলে আসচে। যাবে আর আসবে—ডাকি প্রভাসবাবুকে—তুমি আর অমত কোরো না। বসো আমি আসচি—তুমি থাকলে কমলাকে দিয়ে সারারাত গান গাওয়াবো।

শরৎ এমন বিপদে কখনো পড়েনি।

কি সে করে এখন? এদের অনুরোধ এড়িয়ে চলে যাওয়াও অভদ্রতা—যখন এতটাই পীড়াপীড়ি করচে তার থাকার জন্যে, থাকলে মজাও হয় বেশ—কমলার গান শুনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অন্যদিকে বাবাকে বলে আসা হয়নি, বাবা কি মনে করতে পারেন। তবে প্রভাস-দা যদি মোটরে করে গিয়ে বলে আসে, তবে অবিশ্যি বাবার ভাব্‌বার কারণ ঘটবে না। তবুও কি তার নিজের মন তাতে শান্তি পাবে।

কোথায় বাগানের মধ্যে নির্জ্জন বাড়ী, সেখানে একলাটি পড়ে থাকবেন বাবা, রাত্রে যদি কিছু দরকার পড়ে তখন কাকে ডাকবেন, কে তাঁকে দেখে?

সে ইতস্ততঃ করে বললে— না ভাই, আমার থাকবার যো নেই—আজ ছেড়ে দাও, বাবাকে বলে কাল আসবো।

হঠাৎ প্রভাসের বৌদিদি উঠে হাত বাড়িয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বললে—যাও দিকি কেমন করে যাবে ভাই? কক্ষণো যেতে দেবো না—কই, যাও তো কেমন করে যাবে? এমন আমোদটা আমাদের মাটি করে দিয়ে গেলেই হোল।

শরৎ তার কাণ্ড দেখে হেসে ফেললে।

এমন সময় বাইরে থেকে প্রভাসের গলা শুনতে পাওয়া গেল—ও বৌদিদি—

প্রভাসের বৌদিদি বললে—দাঁড়াও ভাই আসচি— ঠাকুরপো ডাকচে—বোধহয় চা চান, বন্ধু-বান্ধব এসেচে কিনা? ঘন ঘন চা—

সে বাইরে যেতেই প্রভাস তাকে বারান্দার ও প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বললে—কি হোল?

তারসঙ্গে অরুণ ও গিরিনও ছিল। গিরিন ব্যস্তভাবে বললে—কতদূর কি করলে হেনা?

—বাবাঃ—সোজা একগুঁয়ে মেয়ে। কেবল বাবা আর বাবা। এত বোঝাচ্ছি, এত কাণ্ড করচি, এখনও মাথা হেলায় নি—কমলা আবার চোঁফ মেরে চুপ করে রয়েচে। আমি একা বকে বকে মুখে বোধহয় ফেনা তুলে ফেল্লাম— ধন্যি মেয়ে যা হোক্! যদি পারি, আমায় একশো কিন্তু পুরিয়ে দিতে হবে। কমলা কিছুই করচে না—ওর টাকা—

গিরিন বিরক্তির সুরে বললে—আরে দূর্ টাকা আর টাকা। কাজ উদ্ধার কর আগে—একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে সঙ্গে থেকে ভুলোতে পারলে না—তোমরা আবার বুদ্ধিমান, তোমরা আবার সহুরে—

প্রভাসের বৌদিদি মুখনাড়া দিয়ে বলে উঠলো—বেশ, তুমি তো বুদ্ধিমান, যাও না, ভজাও গে না, কি মুরোদ। তেমন মেয়ে নয় ও—আমি ওকে চিনেচি। মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেচি, আমরা চিনি মেয়েমানুষ কে কি রকম। ও একেবারে বনবিছুটি—তবে পাড়াগাঁ থেকে এসেচে, আর কখনো কিছু দেখেনি—তাই এখনও কিছু সন্দেহ করেনি, নইলে ওকে কি যেমন তেমন মেয়ে পেয়েচ?

প্রভাস বিরক্ত হয়ে বললে—যাক্. আর এক কথা বার বার বলে কি হবে? সোজা কাজ হোলে তোমাকে বা আমরা টাকা দিতে যাবো কেন হেনা বিবি, সেটাও তো ভাবতে হয়—

হেনা বললে—এবার যেন একটু নিমরাজি গোছের হয়েচে—দেখি—

হেনা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই হাসিমুখে বার হয়ে এসে বললে—কই ফেল তো দেখি টাকা?

ওরা সবাই ব্যস্ত ও উৎসুক ভাবে বলে উঠলো—কি হোল? রাজি হয়েচে?

হেনা হাসিমুখে ঘাড় দুলিয়ে বাহাদুরির সুরে বললে— এ কি যার তার কাজ? এই হেনা বিবি ছিল তাই হোল। দেখি টাকা? আমি যাকে বলে—সেই সেই পাতায় পাতায় বেড়াই—তাই—

গিরিন বিরক্তির সুরে বললে—আঃ কি হোল তাই বলো না? গেলে আর এলে তো?

—আমি গিয়েই বললাম,' ভাই, প্রভাস ঠাকুরপোকে বলে এলাম তোমার বাবাকে খবর দিতে। সে গাড়ী নিয়ে এখুনি যাচ্ছে বললে। আমি জোর করে কথাটা বলতেই আর কোন কথা বলতে পারলে না' কেবল বললে, প্রভাসদা যাবার আগে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যায়—বাবাকে কি বলতে হবে বলে দেবো—কমলা কিন্তু কিছু করচে না, মুখ বুঁজে গিন্নি শকুনের মত বসে আছে।

গিরিন বললে—না প্রভাস; তুমি এখান থেকে সরে পড়, হেনা গিয়ে বলুক তুমি চলে গিয়েচ—তুমি এসময় সামনে গেলে একথাও বলতে পার যে আমিও ওই গাড়ীতে বাবার কাছে গিয়ে নিজেই বলে আসি। তা ছাড়া তোমার চোখমুখ দেখে সন্দেহ করতে পারে—হেনার মত তুমি পারবে না—ও হোল এ্যাক্‌ট্রেস্, ও যা পারবে, তা তুমি আমি পারতে—

হেনা বললে—বঙ্গরস থিয়েটারে আজ পাঁচটি বছর

কেটে গেল কি মিথ্যে মিথ্যে? ম্যানেজার সেদিন বলচে—হেনাবিবি, তোমাকে এবার ভাবচি সীতার পার্ট দেবো—সেদিন আমার রাণীর পার্ট দেখে—ও কি ওই কম্‌লির কাজ? অনেক তোড়জোড় চাই—

গিরিন বললে—যাক্ ও সব কথা, কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে। এত পরিশ্রম সব মাটি হবে। খসে পড়ো প্রভাস—তোমাকে আর না দেখতে পায়—মন আবার ঘুরে যেতে কতক্ষণ, যদি বলে বসে না, আমি প্রভাসদা'র মোটরে বাবার কাছে যাবো। আর কে যাচ্ছে এখন এত রাত্রে সেই পাগলা বুড়োটার কাছে?

প্রভাস ইতস্তত: করে বললে—তবে আমি যাই?

—যাও—তোমায় আর না দেখতে পায়—পায়ের বেশি শব্দ কোরো না।

—তোমরা? তোমাদেরও এখানে থাকা উচিত হবে না তা বুঝচ?

—আমরা যাচ্ছি। তুমি আগে যাও—কারণ তুমি চলে গেলে ওর হাতের তীর ছাড়া হয়ে যাবে, আর তো ও মত বদলাতে পারবে না?

হেনা বললে—আজ রাত্তিরটা কোনো রকম বেতাল না দেখে ও। তোমরা ওই হরি সা লোকটাকে আগলে রাখো—

অরুণ বললে—কোথায় সে?

প্রভাস বললে—আমি তাকে কম্‌লির ঘরে বসিয়ে রেখে এসেচি। কিন্তু এখন যা আছে, আর দু-ঘণ্টা পরে ও তা থাকবে না। ওকে চেনো তো? চীনে বাজারের অত বড় দোকানটা ফেল করেচে এই করে। বোকা তাই রক্ষে। ওকে সরিয়ে দাও বাবা, আজ রাত্তিরের মত—

গিরিন বললে—যাও না তুমি? কেন দাঁড়িয়ে বক্‌বক্ করচো?

প্রভাস চলে যেতে উদ্যত হোলে গিরিন তাকে বললে—কোথায় থাকবে?

—আজ বাড়ী চলে যাই—বাবা সন্দেহ করবেন, বেশি রাত্তিরে বাড়ী ফিরলে—

—ভাল কথা, তোমার বাবার সঙ্গে তো ওর বাবার খুব আলাপ, সেখানে গিয়ে সন্ধান নেবে না তো বুড়ো?

প্রভাস হেসে বুড়ো আঙুল নেড়ে বললে— হুঁ হুঁ বাবা—সে গুড়ে বালি! অত কাঁচা ছেলে আমি নই। বাবা তো বাবা, বাড়ীর কেউই ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না। বাবাও কেদারকে ভুলে গিয়েচেন, দু-জনের দেখাশুনো নেই কতকাল। দেখলে কেউ হঠাৎ হয়তো চিনতে পারবে না। তার ওপর আমাদের বাড়ী কেদার বুড়ো জানবে কি করে? ঠিকানা জানে না, নম্বর জানে না—কোনোদিন শোনেও নি। আর এ কলকাতা সহর, বুড়ো না চেনে রাস্তাঘাট। সে দিকে ঠিক আছে।

প্রভাস সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে গেল।

অরুণ একটু দ্বিধার সুরে বললে—কাজটা তো এক রকম যা হয় এগুলো—শেষে পুলিশের কোনো হ্যাঙ্গামায় পড়বো না তো?

—কিসের পুলিশের হ্যাঙ্গামা? নাবালিকা তো নয়, ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ধাড়ি—আমরা প্রমাণ করবো ও নিজের ইচ্ছেয় এসেচে। ওকে এ জায়গায় কেন পাওয়া গেল—একথার কি জবাব দেবে ও? আমি বুঝিনি বললে কেউ বিশ্বাস করবে? নেকু?

—তা ধরো ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সত্যিই ওর বয়েস হয়েচে বটে, কিন্তু এসব কিছু জানে না বোঝে না। দেখতেই তো পেলে—একটু সন্দেহ জাগলে ওকে রাখতে পারতো হেনা? তা জানে নি। এমন জায়গাও কখনো দেখেনি, জানে না। যদি এই সব কথা প্রমাণ হয় আদালতে?

গিরিন আত্মম্ভরিতার সুরে বললে—শুধু দেখে যাও আমি কি করি। গিরিন কুণ্ডুকে তোমরা সোজা লোক ঠাউরো না—

অরুণ বললে—আর একটা কথা। সে না হয় বুঝলাম—কিন্তু ওসব ঘরের মেয়ে, যখন সব বুঝে ফেলবে, তখন আত্মহত্যা করে বসে যদি? ওরা তা পারে।

গিরিন তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—হ্যাঁ—রেখে দাও ওসব। মরে সবাই—দেখা যাবে পরে—

—আজ চলো আমরা এখান থেকে যাই—

—এখন?

—আমার মনে হয় তাই উচিত। কোনো সন্দেহ না জাগে মনে—এটা যেন মনে থাকে।

হেনাকে সন্তর্পণে বাইরে আনিয়ে গিরিন বললে—আমরা চলে যাচ্ছি হেনাবিবি। রেখে গেলাম কিন্তু—

হেনা বললে—আমি বাবু পুলিশের হ্যাঙ্গামে যেতে পারবো না, তা বলে দিচ্ছি। কাল দুপুর পর্য্যন্ত ওকে এখানে রাখা চলবে। তারপর তোমরা কোথায় নিয়ে যাবে যেও—আমার টাকা চুকিয়ে দিয়ে।

গিরিন বললে—কেন, আবার নতুন কথা বলচো কেন? কি শিখিয়ে দিয়েছিলাম?

—সে বাপু হবে না। ও বেজায় একগুঁয়ে মেয়ে। আগে যা ভেবেছিলাম তা নয়—ও শুধু বুঝতে পারেনি তাই এখানে রয়ে গেল। নইলে রসাতল বাধাতো এতক্ষণ। আর একটা কথা কি, কিছুতেই খাচ্ছে না, এত করে বলচি, নানারকম ছুতো করচে, পাড়াগাঁয়ের বিধবা মানুষ, ছুঁচিবাই গো ছুঁচিবাই। কেন খাচ্ছে না আমি আর ওসব বুঝিনে? আমি মানুষ চরিয়ে খাই—

অরুণ বললে—মানুষ চরাও নি কখনো হেনাবিবি, ভেড়া চরিয়েচ। এবার মানুষ পেয়েচ, চরাও না দেখি। বুঝলে?

ওরা দু-জনে নীচে নেমে গেল।

চাটুয্যে মশায়ের বাড়ীর গানের আসর ভাঙলো রাত এগারোটায়। তারপরে খাওয়ার জায়গা হোল, প্রায় ত্রিশজন লোক নিমন্ত্রিত, আহারের ব্যবস্থাও চমৎকার। যেমন আয়োজন, তেমনি রান্না। কেদার এক সময়ে খেতে পারতেন ভালই, আজকাল বয়েস হয়ে আসচে, তেমন আর পারেন না—তবুও এখনও যা খান, তা একজন ওই বয়েসের কলকাতার ভদ্রলোকের বিস্ময় ও ঈর্ষ্যার বিষয়।

বাড়ীর কর্ত্তা চাটুয্যে মশায় কেদারের পাতের কাছে দাঁড়িয়ে তদারক করে তাঁকে খাওয়ালেন। আহারাদির পরে বিদায় চাইলে বললেন—আবার আসবেন কেদারবাবু, পাশেই আছি—আমরা তো প্রতিবেশী। আপনার বাজনার হাত ভারি মিঠে, আমার স্ত্রী বলছিলেন—উনি কে? আমি বললাম, আমাদের পাশের বাগানেই থাকেন—এসেচেন বেড়াতে। আহা আজ যদি আপনার মেয়েটিকে আনতেন—বড় ভাল হোত, আমার স্ত্রী বলছিলেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা তো বটেই। তার এক দাদা এসে তাকে নিয়ে গেল বেড়াতে কিনা? মানে গ্রাম-সম্পর্কের দাদা হোলেও খুব আপনা-আপনি মত। কলকাতায় তাদের বাড়ী আছে—সেখানেই নিয়ে গেল। মটোর গাড়ী নিয়ে এসেছিল। তা আর একদিন নিয়ে আসবো—

—আনবেন বই কি, মাকে আনবেন বই কি—বলা রইল, নিশ্চয় আনবেন—আচ্ছা নমস্কার. কেদার বাবু—

কেদারের সঙ্গে চাটুয্যে মশায় একজন লোক দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেদার তা নিতে চান নি। তিনি গানের আসরের শেষ দিকে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মেয়ে এসে একা থাকবে বাগানবাড়ীতে। গাঁয়ে গড় বাড়ীর বনের মধ্যে মেয়েকে ফেলে রেখে যেতেন প্রায় প্রতি রাত্রেই, সে কথা ভেবে এখন তাঁর কষ্ট হোল। তবুও সে নিজের গ্রাম, পূর্ব্বপুরুষের ভিটে, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র।

গেট দিয়ে ঢুকবার সময় কেদার দেখলেন, কোন ঘরে আলো জ্বলচে না। শরৎ তা হোলে হয় তো সারাদিন ঘুরে ফিরে এসে ক্লান্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েচে। আহা, কত আর ওর বয়েস, কাল তো এতটুকু দেখলেম ওকে—দেখুক শুনুক আমোদ করুক না?,

বাড়ীর রোয়াকে উঠে ডাকলেন—ও শরৎ—মা শরৎ উঠে দোরটা খোল, আলোটা জ্বালো—

সাড়া পাওয়া গেল না।

কেদার ভাবলেন—বেশ ঘুমিয়ে পড়েচে দেখ[illegible]—বড্ড ঘুম-কাতুরে, গড়শিবপুরে এক-একদিন এমন ঘুমিয়ে পড়তো—ছেলেমানুষ তো হাজার হোক্—হুঁ—

পুনরায় ডাক দিলেন—ও মা শরৎ, ওঠো, আলো জ্বালো—

ডাকাডাকিতে ঝি উঠে আলো জ্বেলে রান্না ঘরের বারান্দা থেকে এসে বললে—কে—বাবু? কই দিদিমণি তো আসেন নি এখনও—

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন—আসে নি? বাড়ী আসে নি? তুই ঘুমিয়ে পড়েছিলি, জানিস নে হয় তো—দ্যাখ—সে এসে হয় তো আর ডাকে নি—চল ঘরে, আলো জ্বাল—

ঝি বললে—চাবি দেওয়া রয়েচে যে বাবু, এই আমার

কাছে চাবি। দোর খুলবে, আমার কাছ থেকে চাবি নেবে, তবে তো ঢুকবে ঘরে। কি যে বলো বাবু!

তাই তো, কেদার সে কথাটা ভেবে দেখেন নি। চাবি রয়েচে যখন ঝিয়ের কাছে তখন শরৎ দোর খুলবে কি করে।

ঝি বললে—আমি সন্দে থেকে বসে ছিনু এই রোয়াকে, এই আসে, এই আসে—বলি মেয়েমানুষ একা থাকবে? এসব জায়গা আবার ভাল না। বাগানবাড়ী, লোকজনের গতাগম্যি নেই—রাত্তির কাল। আমি শুয়ে থাকবো'খন দিদিমণির ঘরে—রান্নাঘরে আটা এনে রেখেচি, ঘি এনে রেখেচি—যদি এসে খাবার করে খায়—

কেদার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন—ঝিয়ের দীর্ঘ উক্তির খুব সামান্য অংশই তাঁর কর্ণগোচর হোল। ঝিয়ের কথার শেষের দিকে প্রশ্ন করলেন—কে খাবার করে খেয়েচে বললে?

—খাইনি গো খায়, যদি খায় তাই এনে রাখনু সব গুছিয়ে। আটা ঘি—

কেদার বললেন—তাই তো ঝি, এখনও এল না কেন বল দেখি? বারোটা বাজে—কি তার বেশীও হয়েচে—

—তা কি করে বলি বাবু।

—হ্যাঁ ঝি, থিয়েটার দেখতে যায়নি তো? তা হোলে কিন্তু অনেক রাত হবে। না?

—তা জানিনে বাবু!

রাত একটা বেজে গেল—দুটো। কেদারের ঘুম নেই, বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে আছেন, বাগানবাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়েও অত রাতেও দু-একখানা মোটর বা মাল লরীর যাতায়াতের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, কেদার অমনি বিছানার ওপর উঠে বসেন। এই এতক্ষণে এল প্রভাসের গাড়ী! কিছুই না।

আবার শুয়ে পড়েন।

নয়তো উঠে তামাক সাজেন বসে বসে, তবুও একটু সময় কাটে।

হলের ঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজলো।

কত রাত্রে কলকাতার থিয়েটার ভাঙ্গে! কারণ এতক্ষণে তিনি ঠিক করেই নিয়েছেন যে প্রভাস ওকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে গিয়েছে, প্রভাস এবং অরুণের বাড়ীর সবাই গিয়েছে, মানে মেয়েরা। তাদের সঙ্গেই—তা তো সব বুঝলেন তিনি, কিন্তু থিয়েটার ভাঙ্গে কত রাত্রে? কাকে জিজ্ঞেস করেন এত রাত্রে কথাটা! আবার শুয়ে পড়লেন। একবার ভাবলেন, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কি দেখবেন? শেষ রাত্রে কখন ঘুম এসে গিয়েছিল চোখে তাঁর অজ্ঞাতসারে, যখন কেদার ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন, উঃ এ দেখচি রোদ উঠে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে।

ডাকলেন—ও ঝি—ঝি—

ঝি এসে বললে—আমি বাজারে চননু বাবু, এর পরে মাছ মিলবে না, ওই মুখপোড়া ইটের কলের বাবু-গুনো হয়েচে শেয়ালের মত—

—হ্যাঁরে শরৎ আসে নি?

—না বাবু, কই? এলে তো তখোনি উঠে দরজা খুলে দিতাম বাবু। আমার ঘুম বড্ড সজাগ ঘুম।

ঝি বাজারে চলে গেল। কেদারের মনে এখন আর ততটা উদ্বেগ নেই। তিনি এইবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। অনেক রাত্রে থিয়েটার ভেঙ্গে গেলে প্রভাসের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে শরৎ তাদের বাড়ীতে গিয়ে শুয়েছে—এ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। রাত্রের অন্ধকারে মানুষের মনে ভয় ও উদ্বেগ আনে, দিনের আলোয় তাঁর মনের দুশ্চিন্তা কেটে গিয়েছে। মিছেমিছি ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই এর মধ্যে। কলকাতার জীবন-যাত্রা প্রণালী গড়শিবপুরের সঙ্গে এক নয়—এ তাঁর আগেই বোঝা উচিত ছিল।

কেদার নিজেই জল ফুটিয়ে চা করে খেলেন, ঝি দোকান থেকে খাবার নিয়ে এল—আটটা ন'টা, দশটা বাজলো, কেদার ঝিকে বলে দিয়েছিলেন কি কি আনতে হবে, মেয়ে এসে মাছ রাঁধবে বলে ভাল মাছও আনতে দিয়েছেন—ঝি বাজার থেকে ফিরে এল, অথচ এখনও শরতের সঙ্গে দেখা নাই। বাজার পড়ে রইল, ঝি জিজ্ঞেস করল—দিদিমুণি তো এখনও এলো না, মাছ কি কুটে রাখবো।

—রেখে দে। হয় তো গঙ্গাচ্চান করে আসবে।

যখন বারোটা বেজে গেল, তখন ঝি এসে বললে—বাবু রান্নাটা আপনিই চড়িয়ে নিন না কেন? আমার বোধ হয় দিদিমণি এবেলা আর এলেন না। না খেয়ে কতক্ষণ বসে থাকবেন।

কিন্তু কেদার বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

আজ একটা ব্যাপার তাঁর কাছে আশ্চর্য্য ঠেকছিল, সেটা এই, শরৎ যত আমোদের মধ্যেই কেন থাকুক, বাবাকে ভুলে তাঁর জন্যে রান্নার কথা ভুলে সে কোথাও থাকবে না। জীবনে সে কখনও তা করেনি। যতই কালীঘাটেই যাক আর গঙ্গাস্নানই করুক—বাবার খাওয়া হবে না দুপুরে, এ চিন্তা তাকে বৈকুণ্ঠের দ্বার থেকেও ফিরিয়ে আনবে।

অথচ একি রকম হোল!

মহামুস্কিলে পড়ে গেলেন কেদার।

প্রভাসের বাড়ীর ঠিকানা জানেন না তিনি যে খোঁজ নেবেন। এমন তো হতে পারে কোনো অসুখ করেচে শরতের! কিন্তু প্রভাসও খবর দিতে এল না একবার, এই বা কেমন কথা?

ঝি এসে দাঁড়ালো, আবার ভাত চড়াবার কথাটা বলতে।

একটু ইতস্ততঃ করে বললে—বাবু একটা কথা বলবো কিছু মনে কোরোনি, দিদিমণি যেনার সঙ্গে গিয়েচেন, তিনি কি রকম দাদা!

ঝিয়ের কথার সুর ও বলবার ধরণে কেদারের মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা ধারালো অস্ত্রের বিষম ও নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়ে তাঁর সরল মনকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলে।

তিনি পাংশুমুখে ঝিয়ের দিকে চেয়ে বললেন—কেন মেয়ে? কেন বলো তো?

—না বাবু, তাই বলছি। বলি, যেনার সঙ্গে তিনি গিয়েচেন, তিনি নোক ভালো তো? সহর-বাজার জায়গা এখানে মানুষ সব বদমাইস কিনা, দিদিমণি সোমত্ত মেয়ে তাই বলচি। তবে আপনি বলছিলে দাদার সঙ্গে গিয়েচে তবে আর ভয় কি। তা বাবু, ভাতটা চড়িয়ে—

কেদার রান্না চড়াবেন কি, ঝির কথা শুনে তাঁর কেমন একটা ভয়ে সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো, হাতে পায়ে যেন বল নেই। এ সব কথা তাঁর মনেও আসেনি। ঝি নিতান্ত অন্যায় কথা বলেনি। প্রভাসকে তিনি কতটুকু জানেন? তার সঙ্গে মেয়েকে যেতে দেওয়া হয়তো তাঁর উচিত হয় নি।

হঠাৎ মনে পড়লো, পাশের বাগানে গিয়ে চাটুয্যে মশায়কে গিয়ে এ বিপদে তাঁর পরামর্শ নেওয়া দরকার—বিশাল কলকাতা সহরের মধ্যে তিনি আর কাউকে জানেন না, চেনেন না। ঝিকে বসিয়ে রেখে বাড়ীতে, তিনি চাটুয্যে মশায়ের বাগানবাড়ীতে গেলেন। চাটুয্যে মশায়কে সামনের চাতালেই চাকরে তেল মাখাচ্ছিল, কেদারকে এমন অসময়ে আসতে দেখে তিনি একটু বিস্মিত হয়ে কাপড় গুছিয়ে পরে উঠে বসলেন। হাত তুলে নমস্কার করে বললেন—আসুন, আসুন কেদার বাবু, ওরে বাবুকে টুলটা এগিয়ে দে—

কেদার বললেন—বড় বিপদে পড়ে এসেচি চাটুয্যে মশায়—আপনি ছাড়া আমি তো আর কাউকে জানি নে চিনিও নে—কার কাছেই বা যাবো—

চাটুয্যে মশায় সোজা হয়ে বসে বিস্ময়ের সুরে বললেন—কি বলুন দিকি? কি হয়েচে?

কেদার ব্যাপার সব খুলে বললেন।

চাটুয্যে মশাই শুনে একটু চুপ করে ভাবলেন। তারপর বললেন—আপনি ঠিকানা জানেন না?

—আজ্ঞে না—

—প্রভাস কি?

—দাস—ওরা কর্ম্মকার।

—আহা দাঁড়ান, টেলিফোন গাইডটা দেখি—কিন্তু আপনি তো বলচেন ঠিকানা জানেন না, তবে তাতে কি হবে? ওই নামে পঞ্চাশ জন মানুষ বেরুবে।

—আচ্ছা, আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি স্নানটা সেরে নি চট্ করে, বেলা হয়েচে। আপনাকে নিয়ে একবার থানায় যাবো কি না ভেবে দেখি। পুলিশের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার।

পুলিশের নাম শুনে নির্ব্বিরোধী কেদার ভয় পেয়ে গেলেন। পুলিশে যেতে হবে, ব্যাপারটা গুরুতর দাঁড়াবে

কি? নাঃ। হয় তো মন্দির-টন্দির দেখতে বেরিয়েচে মেয়ে, ফিরে আসতে একটু বেলা হচ্ছে। একেবারে পুলিশে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

কেদার বললেন—আহা, আপনি স্নানাহার সেরে নিন—আমি ততক্ষণ একবার দেখে আসি এল কি না। আপনি খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি আসচি—

বাগানবাড়ীতে ফিরে কেদার এঘর ওঘর খুঁজলেন, ঝিকে ডাকলেন—শরৎ আসেনি। ঘড়িতে বেলা দুটো। কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় শুয়ে মন শান্ত করার চেষ্টা করলেন—পুলিশে খবর দেবার আগে বরং একটু দেরি করা ভাল। ঘড়িতে আড়াইটে বাজলো।

এমন সময় ফটকের কাছে মোটরের হর্ন শোনা গেল। কেদার উৎকর্ণ হয়ে রইলেন—সকাল থেকে তো একশো মোটর গাড়ীর বাঁশি শুনেচেন তিনি। কিন্তু মনে হোল—না, এই তো, গাড়ীর শব্দ একেবারে বাগানের লাল কাঁকরের পথে। বাবাঃ, বাঁচা গেল। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন ঝাল বেরিয়ে গেল কেদারের।

ঝি ছুটে এসে বললে—বাবু মটোর ঢুকচে ফটক দিয়ে—দিদিমণি এসেচে—

কেদার প্রায় ছুটেই বাইরে গেলেন। মোটর সামনে এসে দাঁড়ালো—তা থেকে নামালো প্রভাস ও গিরিন। শরৎ তো গাড়ীতে নেই?

ওরা এগিয়ে এল।

কেদার ব্যস্ত ভাবে বললেন—এসো বাবা প্রভাস—শরৎ আসেনি? এত দেরি করলে, তাকে কি বাড়ীতে—

প্রভাস ও গিরিনের মুখ গম্ভীর। পাশেই ঝিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গিরিন বললে—আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। ওদিকে চলুন—

ঝি হঠাৎ বলে উঠলো—হ্যাঁ গা বাবু, দিদিমণি ভাল আছে তো?

গিরিন নামতা মুখস্থ বলার মত বললে—হ্যাঁ, আছে—আছে—আসুন, চলুন ওই ওদিকে। তুই যা না কেন, হ্যাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে কি?

ক্রমশঃ

না পাওয়ার সান্ত্বনা

(বাউল)

অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, এম-এ

না হয় আমার নাইবা হবে পারে যাওয়া।
এই তো ভালো এ-পারেতে
অন্ধকারে,
আপন মনে পথ চাওয়া ॥
ডোবে যদি দিনের রবি নদীর পারে
পূর্ণিমা চাঁদ দেবে দেখা বনের ধারে,
না হয় যদি, আকাশ ভরা
তারার আলো
একটুখানি যাবেই পাওয়া ॥

যদি, পথের সাথী গভীর রাতে বিদায় মাগে,
চোখে তাহার অরুণ আলোর নেশা লাগে,
বিদায় তারে দেবো আমার তরণীতে
রইব চেয়ে আঁধার ভরা ধরণীতে
নিঝুম রাতে শালের বনে,
করবে খেলা
পাগল-করা দখিণ হাওয়া ॥

সঞ্চয়ন

আধুনিক চীনের শিক্ষার অগ্রদূত হু-শীহ্

[১৩৪৮। অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শীশ মহল' হইতে উদ্ধৃত]

চীন-জাপানের যুদ্ধ সম্প্রতি চার বছর পার হয়ে পাঁচ বছরে পড়েছে। চীনকে যুদ্ধে হারাবার জন্যে যে এর সিকি সময়ের দরকার হবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার সময় জাপান সেকথাও ভাবতে পারে নি। পৃথিবীর অন্য কোন জাতিও ভাবতে পারেনি যে, সুদূর প্রাচ্যের এক প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিকে মাসের পর মাস চীন কিভাবে ঠেকিয়ে রাখবে। কিন্তু অপরের ভাবনা অনুযায়ী চীন চলেনি, সে সত্যিই বাধা দিয়ে চলেছে জাপানকে। চীনের সামরিক শক্তি যে এর প্রধান কারণ সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই মুখ্য কারণের পিছনে অপর একটি বিষয় লুকিয়ে আছে গৌণভাবে—সে হচ্ছে চীনের ঐতিহ্য।

প্রাচীন চীনের সংস্কৃতি ও বৈদগ্ধ্যের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, বললেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে সেটা। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আধুনিক সভ্যতা যখন সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকায় সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, চীন যে তখন তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারেনি, একথা একেবারে অস্বীকার করা চলে না। গত শতাব্দীর শেষেও চীন শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ছিল অনেক পেছনে। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মধ্যে অর্থাৎ বছর চল্লিশের মধ্যেই চীন উন্নতি করেছে যথেষ্ট, যেমন উন্নতি হয়েছে রুশিয়ার গত পনের বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ ক'রে। আজ সমগ্র চীনে জনসাধারণের মধ্যে বেশ শিক্ষার বিস্তার হয়েছে। কিন্তু কেমন ক'রে সেটা সম্ভব হ'ল তা স্পষ্ট বোঝা যায় হু-শীহ্-এর জীবনী আলোচনা করলে।

হু-শীহ্ জন্মান ১৮৯১ সালে। বাপ ছিলেন শিক্ষিত, মা ছিলেন এক সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে। ছেলেকে ভাল ক'রে লেখাপড়ার শেখানর ইচ্ছা হু-শীহ্-এর বাপমার ছিল ছেলের শৈশব থেকেই। মাত্র তিন বছর বয়সেই হু-শীহ্ আটশো'র ওপর কথা শিখেছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁকেগ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয়। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ ক'রে তিনি গেলেন সাংহাইতে। আগে একটা পরীক্ষা হ'ত পিকিং-এ। পরীক্ষা অবশ্য কঠিন ছিল, কিন্তু পাশ করতে পারলে চীন সরকারের শিক্ষা বিভাগে ভাল চাকরি পাওয়া যেত। কিন্তু হু-এর ভাগ্যে এই পরীক্ষা দেওয়া ঘটল না। কারণ কয়েক বছর আগেই এই পরীক্ষা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই সাংহাইতে গিয়ে হু-শীহ্ পাশ্চাত্য দর্শন পড়তে আরম্ভ করলেন। ক্যাণ্ট, হ্যাক্সলে, স্পেন্সার, ডারউইন,—এক এক ক'রে সবই তিনি পড়লেন। ডারউইনের survival of the fittest theory তাঁর খুবই ভাল লাগল। এই সময় তিনি নিজের নামে 'শীহ্' কথাটা যোগ করেন। চীনা ভাষায় শীহ্ কথার মানে হচ্ছে যোগ্যতম (fittest).

এর পর হু বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় চলে গেলেন। বক্সার বিদ্রোহের পর ক্ষতিপূরণ হিসাবে চীন আমেরিকাকে যে অর্থ দিয়েছিল তাই থেকে যুক্তরাজ্যে একটি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। আট বছর হু আমেরিকায় কাটালেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় প্রফেসর ডিউই-র প্রতি হু বিশেষ আকৃষ্ট হন। ছেলেবেলা থেকেই চীনের অনেক প্রচলিত সংস্কার হু-র চোখে ভাল বোধ হ'ত না, প্রফেসর ডিউই-র সাহচর্য্যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করায় প্রাচীন সংস্কার হু-র চোখে আরও বিসদৃশ বোধ হল। ১৯২৮ সালে হু যখন চীনদেশে ফিরে এলেন তখন চীনা দার্শনিকদের চলিত মতামতের সঙ্গে তাঁর নিজের মতের মিল হল না। চীনা দার্শনিকদের মতে শরীর ও আত্মার সম্বন্ধ হচ্ছে ছুরি ও তার ধারের

স্কন্ধের মত। ছুরিখানা ভেঙে গেলে যেমন তার ধারের প্রশ্ন ওঠে না, তেমনই শরীর নষ্ট হয়ে গেলে আত্মা আবার থাকবে কেমন ক'রে? কিন্তু হু-শীহ্ প্রতিবাদ করলেন এইখানে। তাঁর মতে সকল জিনিষই শাশ্বত। আমরা যা বলি, করি যা সবই অনন্তকাল ধরে এই বিশাল পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে তার একটা ফল প্রদান করে, কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য তার দ্বারা নিশ্চয়ই সাধিত হয়; সেই প্রতিফল আবার অন্য কোন স্থানে এক নূতন ফল দেয়, এইভাবে অনন্ত কাল ধরে সেই কথা এবং কাজ চল্‌তে থাকে। তার রূপান্তর হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না।

হু-শীহ্ কোন দিন রাজনীতির ধার ধারেন নি। কারণ তাঁর মতে রাজনীতি কোন গঠনমূলক কাজের জন্যে বিদ্রোহ আনতে পারে না। বিদ্রোহ আসে তখনই যখন জনসাধারণ শিক্ষা লাভ ক'রে বুঝতে শেখে এবং তার জন্যে তারা মতবাদ পোষণ করতে অভ্যস্ত হয়। এই জন্যেই হু বৌদ্ধ ধর্ম্মের ওপরও ছিলেন চটা। ভারতবর্ষ হ'তে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ধীরে ধীরে চীনের বুকে প্রথম ছড়িয়ে পড়ে তখন চীনের আধ্যাত্মিক জীবনের মূলে যে সে যথেষ্ট শক্তি জুগিয়েছিল একথা হু অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁর মতে বর্ত্তমানে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রয়োজন গেছে শেষ হয়ে। এখন সেখানে দরকার নূতন উদ্ভাবনী-শক্তির, প্রয়োজন প্রতিভার। নিজের অমরতা, পিতৃপুরুষের পূজা—এসবের কোন প্রয়োজন এখন নেই। চীনের অধিবাসীরা আজ জানুক, প্রকৃতি চলেছে নিজের নিয়মে, There is no need for the concept of a Supernatural Ruler or Creator, কোন ঐশ্বরিক শাসক অথবা সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বের ধারণা নিষ্প্রয়োজন। কি তেজ! জাতিকে তৈরী করবার জন্যে কি দৃঢ় কঠোর বাণী!

একটা জাতিকে গঠন করতে হ'লে তার যে সব-আগে প্রয়োজন শিক্ষার, হু-শীহ্ একথা একদিনের জন্যেও ভুলতে পারেন নি। নিজের শৈশবের শিক্ষাই যে ক্রমশ তাঁকে মানুষ ক'রে তুলেছে, নিজের জ্ঞান ও মতবাদের জন্য যে তিনি শিক্ষার নিকট ঋণী হু একথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি চেষ্টা করেছিলেন চীনের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করতে। আমাদের দেশে এককালে শিক্ষিত পণ্ডিতদের ভাষা ছিল যেমন সংস্কৃত, বা তার চেয়েও কঠিন সংস্কৃতজাত বাঙলা ভাষা, তেমনই চীনদেশের সাহিত্য চলত কন্‌ফুসিয়সের ভাষা। চীনের জনসাধারণ সে ভাষা বুঝত না, কাজেই তারা নিজেদের একটা কথ্য ভাষায় সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিল। কন্‌ফুসীয় ভাষা শিখতে সময় লাগত যথেষ্ট, অথচ যারা চীনকে পরিচালনা করবেন তারা ঐ প্রাচীন ভাষাই শিখতেন। ফলে তাঁদের সঙ্গে এবং তাদের মতবাদের সঙ্গে সাধারণের সংযোগ ছিল শিথিল। তারা নিজেরা যে ভাষা তৈরী করে নিয়েছিল তাতেই তারা উপন্যাস লিখত, বই রচনা করত'। কিন্তু মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের কাছে সে ভাষা ছিল অপাংক্তেয়। কিন্তু হু-শীহ্ সমর্থন করলেন জনসাধারণের এই ভাষাকে। যে ভাষায় সমস্ত জনসাধারণ নিজের মনের ভাব আদান প্রদান করতে শিখল, যে ভাষা তাদের সকলকে একসঙ্গে দাঁড় করাতে পারল, সেই ভাষা থাকবে সদর দরজায় প্রার্থীর মত দাঁড়িয়ে, আর ঐ মুষ্টিমেয় শিক্ষা-গর্ব্বিতের ভাষা অন্দরে রাজ সম্মান লাভ করবে, এ চিন্তা হু-এর পক্ষে অসহ্য। নিজের কবিতা, প্রবন্ধ, সমস্তই হু ঐ কথ্য ভাষাতেই ছাপাতে লাগলেন। তরুণ বুদ্ধিজীবীরাও অনুসরণ করলেন হু-কে। নূতন নূতন ছাপাখানা খোলা হ'ল, স্কুলের পাঠ্য বই ঐ ভাষাতে ছাপা হতে লাগল, এমন কি, স্কুলে ছাত্রদের ঐ ভাষাই পড়ান হতে লাগল। ফলে চীনের জনসাধারণ হ'ল শিক্ষিত। বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। ১৯১৯ সালে চীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ'ল ১,৪৭,০০০, কিন্তু ১৯২৮ সালে সেটা বেড়ে হ'ল ১,৫৮,০০০। যারা ছিল পেছনে দাঁড়িয়ে, প্রকাশ্য সভায় তারা স্বীকৃত হ'ল শিক্ষিত ব'লে। কিন্তু এর মূলে রয়েছে হু-শীহ্‌এর অনুপ্রেরণা এবং প্রচেষ্টা, আর সেইজন্যেই হু-কে বলা হয় চীনের শিক্ষা-নেতা—Intellectuel leader.

ইক্ষুর চাষ

[১৩৪৮। কার্ত্তিক সংখ্যা ভাণ্ডার হইতে উদ্ধৃত]

বহু প্রাচীন যুগ হইতে ভারতবর্ষে ইক্ষুর চাষ চলিয়া আসিতেছে। অনেকে মনে করেন, ভারতের উত্তরপূর্ব্ব

অঞ্চলেই সর্ব্বপ্রথম ইক্ষুর উৎপত্তি হয়। বর্ত্তমানে এদেশে যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়, এমন আর কোন দেশেই হয় না। ইক্ষুর চাষ এবং চিনি প্রস্তুত করিবার পক্ষে এদেশে কতকগুলি নৈসর্গিক সুবিধা রহিয়াছে, যাহা অন্যান্য দেশে বিশেষ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও চিনির ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ জাভা, হাওয়াই প্রভৃতির সাহত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পাড়িতেছে না। ভারতবর্ষে ইক্ষুর মূল্য সম্বন্ধে কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মিঃ বি, সি, বার্ট বলিয়াছেন—"কৃষি-পণ্যের মন্দা বাজারের সময় উত্তর-ভারতের হাজার হাজার পল্লীতে ইক্ষুই কৃষক-দিগকে রক্ষা করিতেছে। ইক্ষু হইতে যে লাভ হয়, তাহাতে কৃষকের সকল পরিশ্রম সার্থক হয় এবং একমাত্র ইক্ষুর চাষই কৃষককে সারা বৎসর নিযুক্ত রাখিতে পারে।" যদিও ভারতবর্ষ ইক্ষুর আদি উৎপাদন-স্থান, তথাপি কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্তও এদেশে যে পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হইত, তাহা হইতে দেশের প্রয়োজনীয় চিনি পাওয়া যাইত না, এবং চিনির জন্য ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হইত। এমন কি, ১৯২৯-৩০ সনেও এদেশে বিদেশ হইতে প্রায় ১০ লক্ষ টন চিনি আমদানী করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইক্ষুর অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা নিম্নের হিসাবের দিকে চাহিলেই সুস্পষ্ট হইবে :—

দেশের নাম	প্রতি একর হইতে লব্ধ চিনির পরিমাণ	ইক্ষু হইতে লব্ধ চিনির শতকরা হার
ভারতবর্ষ	৪৩·৬ মণ	৯·৪
জাভা	৭১৭·৫ মণ	১২·৩৫
পেরু	১০১৫·৮ মণ	
হাওয়াই	১৫১২·৯ মণ	

ভারতবর্ষে ইক্ষু-চাষ সংক্রান্ত কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৯১১ সনে পুসায় বোর্ড অব্ এগ্রিকালচারেলের সভায় কইম্বাটোরে ইক্ষু চাষের একটি কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯১২ সনে এই কেন্দ্রটি খোলা হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চাষের জন্য ভাল ইক্ষু-বীজ উৎপাদন করা। বার্বার এই কেন্দ্রটির পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সামনে উত্তর-ভারতের আবহাওয়ার উপযোগী ইক্ষু-বীজ কি ভাবে উৎপাদন করা যায়, এই সমস্যা ছিল। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ইক্ষুর শ্রেণী বিভাগ করেন। বার্বার কিভাবে উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু উৎপাদনে কৃতকার্য্য হন, তাহা কেবল এদেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও সুপরিচিত। তাঁহার পরে বেঙ্কট রমন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।

মোটা ধরণের ইক্ষু প্রধানত মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত-প্রদেশ, বিহার, আসাম এবং বাঙ্লার কোন কোন স্থানে উৎপন্ন হয়। এই ধরণের ইক্ষু সাধারণত লোকে চিবাইতে ভালবাসে।

ভারতবর্ষে ইক্ষুর স্থান

ভারতবর্ষে কি পরিমাণ চিনি আমদানী ও রপ্তানী হয়, তাহার একটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই হিসাব হইতে ভারতবর্ষে ইক্ষুর স্থান কি, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে।

আমদানী

	১৯১৪	১৯৩৭-৩৮
চিনি (উৎকৃষ্ট ধরণের)	৩২৪,০০০ টন	১৪,০০০ টন
চিনি (অন্যান্য ধরণের)	৫'১,০০০ টন	১,০০০ টনের কম

রপ্তানী

১৯৩৭-৩৮

উৎকৃষ্ট চিনি—জলপথে ১৪,০০০ টন এবং স্থলপথে ৩১,০০০ টন।

অন্যান্য চিনি— ৭৯,০০০ টন

১৯৩৭-৩৮ সনের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু ভারতবর্ষে বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মোট ইক্ষু যে জমিতে চাষ করা হয়, তাহার শতকরা ৭৯ ভাগ জমিতে এই ইক্ষু উৎপন্ন হয়। অবশ্য এই হিসাবে স্বাধীন রাজ্যগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে কইম্বাটোরের ইক্ষু-বীজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উক্ত দুই প্রদেশেই মোট ইক্ষু চাষ যে পরিমাণ জমিতে হয়, তাহার শতকরা ৯০ ভাগেই কইম্বাটোরের ইক্ষু-বীজ ব্যবহার করা হয়। বাঙ্লাদেশে যে সকল জমিতে ইক্ষু চাষ হয়, তাহাদের শতকরা ৮০ ভাগেই উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু উৎপন্ন হয়।

মাতৃহীনা

(গল্প)

শ্রীশিশিরময়ী গাঙ্গুলী

প্রাতঃকাল। পূর্ব্বাকাশে রক্তিম আভা তখনও বিলীন হয় নাই। জাহ্নবীতটে জগদীশবাবুর পত্নীর মুমূর্ষু অবস্থা। তাহার অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গার জলে শায়িত। শিয়রে কন্যা মীনা ও পার্শ্বে জগদীশবাবু উপবিষ্ট। তাঁহার চক্ষু দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত। অদূরে জনকতক ভদ্র যুবক দণ্ডায়মান।

জগদীশবাবুর স্ত্রী আপনার অন্তিম অবস্থা বুঝিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে স্বামীকে দুই চারিটি কি কথা বলিলেন, তারপর অতি কষ্টে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অমর—অমর কোথায়, তাকে একবার ডেকে দাও।"

অমর নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, আরও কাছে আসিয়া তাঁহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বলিল, "কি বলছেন কাকিমা?"

জগদীশবাবুর স্ত্রী আস্তে আস্তে অমরের হাতখানি ধরিয়া আপনার শিশুসন্তানের হাত দুটি অমরের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, "বাবা অমর, আমি চল্‌লাম, আমার মীনুকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, জীবনের যাহা শিক্ষা ও কর্ত্তব্য তুমিই শিখিয়ে দিয়ো। মীনুকে আমার সৎপাত্রে দিতে চেষ্টা করো। তোমায় চিরদিনই আত্মজ মনে করে এসেছি, তুমি আমার মীনুর জ্যেষ্ঠ, আমার অন্তিম উপরোধ যেন ভুলে যেও না বাবা!"

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার চোখের তারা দুটি ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্থির হইয়া গেল। অমর দুই হাতে চোখ মুছিয়া বলিল, "কাকা-মশায়, দেখছেন কি, মুখে গঙ্গাজল দিন।"

জগদীশবাবু পত্নীর মুখে গণ্ডূষ করিয়া জল দিতে লাগিলেন। অমর জোরে জোরে নাম শুনাইতে লাগিল, ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, মীনু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এইরূপে জগদীশবাবুর সহধর্ম্মিণী চিরদিনের মত সংসার হইতে বিদায় লইলেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত আয়োজন ঠিক ছিল; জগদীশ-বাবু পত্নীর শেষকার্য্য সমাপন করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কন্যাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

গৃহে ফিরিয়া আপাততঃ সমস্তই তিনি শূন্য দেখিলেন। তাঁহার পত্নী কিছু দিন ধরিয়া রোগশয্যায় শায়িতা ছিলেন। পত্নীর চিকিৎসার কোন ত্রুটি তিনি করেন নাই। এ জন্য তাঁহাকে কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়াও পড়িতে হইয়াছিল।

পত্নী রুগ্না বলিয়া তিনি মাঝে মাঝে বিরক্ত হইতেন ও নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেন। কাজেই জগদীশ-বাবুর পত্নী-শোক হইল বটে, কিন্তু তাহা শুধু কয়েক দিনের জন্য। তিনি নানা প্রকারে মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যখন তিনি তাঁহার শূন্যকক্ষের দিকে চাহিতেন, তখন তাঁহার সমস্ত বৈরাগ্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে দরদর ধারায় অশ্রুর বন্যা ছুটিত। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস তাঁহার প্রাণটা আকুল করিয়া তুলিল। বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে আর দারপরিগ্রহের সময় আছে কি?

পুরুষদের বিবাহের বয়স পার হইয়া গেলে যদি পত্নীবিয়োগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের শোকের উচ্ছ্বাস দ্বিগুণতর হইয়া উঠে, প্রবোধ দিবার আর কিছুই থাকে না। জগদীশবাবুর অবস্থাও সেইরূপ হইল। যখন তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়েরা আসিয়া বলিলেন, "বাবা জগু, কেঁদে আর কি হবে বল! মানুষ মরলে আর ফিরে আসে না! আর তোমার বয়েসই বা এমন কি? আমরা তোমায় কোলে করে মানুষ ক'রেছি। হারাণ চক্রবর্ত্তীর বড় মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। বিয়ে করে নিয়ে এসে ঘরজোড়া কর।"

জগদীশবাবুকে খুব বেশী বলিতে হইল না। একটা শুভ দিন দেখিয়া তিনি হারাণ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে

লক্ষ্মীর কাঠা মাথায় তুলিয়া গৃহে আনিলেন। নবপরিণীতা পত্নী চিরপরিচিতার মত আসিয়াই স্বামী-গৃহে জাঁকিয়া বসিলেন।

মীনা বিবাহের বয়সেই মাতৃহীনা হইয়াছিল, তাহার পর তিন বৎসর কাটিয়া গেল। মীনার বয়স পনর পার হইয়াছে। সে বিমাতার ছেলে কোলে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রতিবেশীরা নিজেদের বয়স্থা মেয়েগুলির পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ও অজস্র প্রশংসা করিয়া মীনার বয়সের জন্য প্রায় অন্নজল ত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন।

সকলের থেকে অমরের বেশী চিন্তা যে কিরূপে মীনাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবে। অমর অন্তরে অন্তর্য্যামীকে ডাকিয়া বলিল, সে যেন মীনাকে সৎপাত্রে দিয়ে তার কাকিমার অন্তিম উপরোধ রক্ষা করিতে পারে।

অমর নানা স্থানে মীনার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে অমরের একটি সহপাঠীর সহিত মীনার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইল। পাত্রের চরিত্র আদর্শ। আর পাত্রের পিতাও আজকালকার অর্থলোলুপ পুত্রবৎসল পিতা নহেন।

অমর সর্ব্বসমেত পাঁচ শত টাকা বরাভরণ, পণ ইত্যাদিতে চুক্তি করিয়া আসিয়া জগদীশবাবুকে বলিল, "কাকা মশায়, এ পাত্র কখনই ছাড়া হবে না, এত অল্প টাকায় এমন ঘর-বর পাবেন কোথা ?"

জগদীশবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "তা—ই—তো পাঁচ শত টাকা—বড়ই মুস্কিল, ছোট খোকাটির অন্নপ্রাশনের খরচ আছে।"

অমর মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে আমি শুনবো না, এই বৈশাখ মাসের শেষেই ওর বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলি।"

অমর বিবাহের দিন স্থির করিয়াই আয়োজন করিতে লাগিল। যাহাদের যাহা বলিতে হইবে অমর তাহাদের বলিয়া আসিল। বিবাহদিনে অমর কোমরে কাপড় বাঁধিয়া ছুটাছুটি করিয়া বিবাহের কাজ করিতে লাগিল। একদিকে বরপক্ষের অভ্যর্থনা, অপর দিকে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের আদর-আপ্যায়ন। জগদীশবাবু বিবাহ অবধি তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীকে এক জোড়া ব্রেসলেট ও এক জোড়া আরমলেট এ পর্য্যন্ত গড়াইয়া দিয়া উঠিতে পারেন নাই, তারপর তাঁহার গৃহিণী বায়না ধরিয়াছেন যে, তাঁহার কোলের খোকাটির অন্নপ্রাশনে নহবত বসিবে ও গ্রামশুদ্ধ নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইবে আর উপরোক্ত দুইখানি গহনা পরিয়া পুত্র কোলে লইয়া ছেলের আভ্যুদয়িক করাইবেন। কাজেই এইরূপ অসময়ে কন্যার বিবাহে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। বিবাহদিনে জগদীশবাবুর গৃহিণী উঠিলেন না, বিবাহের শুভকার্য্য কিছুই নিজের হাতে করিলেন না, মাঝে মাঝে অভিমানে অশ্রুজল মুছিতে লাগিলেন। পত্নীর অবস্থা দেখিয়া জগদীশবাবু মনের অবস্থা বড়ই খারাপ ছিল। তিনি বরপক্ষের আদর-অভ্যর্থনা করা দূরের কথা—দুই চারিটা রূঢ় কথা শুনাইয়া দিলেন, বরপক্ষের অপরাধ তাহারা কয়েকটা পান চাহিয়াছিল।

অমর বরযাত্রদের ব্যবস্থা সমস্ত নিজ হাতে করিয়াছিল, ইহাতে তাহারা কিছুমাত্র ত্রুটি ধরিতে পারিল না। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে কন্যার পিতার এরূপ বিসদৃশ আচরণে তাহারা রুখিয়া উঠিল এবং বর লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অমর অনেক মিনতি করিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত, সমস্তই যোগাড় ছিল, বর আসিয়া ছাদনাতলায় দাঁড়াইল। কন্যা আসিলে স্ত্রী-আচার শেষ করা হইল। কিন্তু জগদীশবাবুর দেখা নাই, তিনি তখন ভূমিশয্যাশায়িতা পত্নীর নিকট করজোড়ে দাঁড়াইয়া, অনুমতি পাইলে কন্যাদান করিতে যাইবেন।

অমর ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কাকামশায়, করেন কি ? কন্যাদানের সময় যে হয়ে গেছে, চলুন।"

জগদীবাবু পত্নীর কোন জবাব পাইলেন না। তিনি ব্যথিত মর্ম্মাহত হৃদয়ে পণের টাকাগুলি লইয়া বিবাহস্থলে আসিলেন ও কন্যাকে বলিলেন, "মীনা, তুই তোর মার সঙ্গে মরলি না কেন ? তোর জন্যে আমি সর্ব্বস্বান্ত হলাম।"

সন্তানবৎসল পিতার কথা শুনিয়া সকলে স্তব্ধ নির্ব্বাক্। অমরের অত্যন্ত রাগ হইল, বলিল, "কাকামশায়! আপনার কাছে এই টাকা আমি ঋণ করলাম, আজকের

রাত যেতে দিন, তিন দিনের মধ্যে আপনার টাকা আমি শোধ করবো।"

বরের পিতা একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তিনি একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া ভাবী পুত্রবধূর নিকটে গিয়া বলিলেন, "মা, তোমার বাবা যে কয়খানি গহনা দিয়াছেন খুলে দাও তো মা! আমি তোমায় পরে গড়িয়ে দেবো।"

মীনা তৎক্ষণাৎ তাহার গাত্র হইতে গহনাগুলি খুলিয়া দিল।

পাত্রের পিতা অলঙ্কারগুলি হাতে লইয়া জগদীশবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "বেহাই মহাশয়, আপনার দেওয়া গহনাগুলি আপনি ফিরিয়ে নিন। আমি এক পয়সা পণ চাই না। আমি মাকে কেবল শাঁখা-সিঁন্দুর পরিয়েই ঘরে নিয়ে যাবো। যদি আমার দেওয়ার ক্ষমতা হয় তো আমি মাকে অলঙ্কার দিয়ে সাজাবো।"

বরের পিতার উদারতা দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

বিবাহান্তে বরকন্যা বিদায় হইবার সময় মীনু বা মৃণাল খুব কাঁদিল। সে ভাবিল তাহার পিতা বরপক্ষের সহিত যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিলেন, বোধ হয় এ-জীবনে সে পিত্রালয়ে আর আসিতে পারিবে না। নবদম্পতীকে সকলেই আশীর্ব্বাদ করিল। অমর আসিয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "মীনু তুই কাঁদিস না, আট দিন পরে আমি নিজে গিয়ে তোকে নিয়ে আসবো।"

মৃণাল শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। শ্বশুর-বাড়ী সে সকলের নিকটই ভালবাসা পেয়ে এসেছে, তাই তার বড় স্ফূর্ত্তি, বড় আনন্দ। মা বাবাকে সে কিরূপে সন্তুষ্ট করিবে এখন এই তার একমাত্র চেষ্টা।

এই সময় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় প্রতি ঘরেই দু-একটি লোক উহাতে আক্রান্ত হইতেছিল। মীনুরও জ্বর হইল। অমরকে দেখিয়া সে বলিল, "অমরদা, আমার খুব জ্বর হয়েছে, গায়ে বড় ব্যথা।" সেই রাত্রি হইতে মীনুর ১০৫ ডিগ্রি জ্বর, জ্ঞান নাই। অমর আসিয়া রোগীর বিছানা ও ডাক্তারের ব্যবস্থা করিয়া গেল। সেবার ব্যবস্থা যে না করিল এমন নহে। জগদীশবাবু ও তাঁহার পত্নী কোলের শিশুসন্তানটি লইয়া বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, তার ব্রঙ্কাইটিস। ডাক্তার দেখাইতেছিলেন, পয়সাও রীতিমত ব্যয় হইতেছিল। কিন্তু মীনার জন্য ডাক্তার ডাকার কথায় তিনি মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তা—ই—তো, হাতে টাকা তো নেই, বড় ডাক্তার আনবো কি করে।"

অমর ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "তা হবে না, তা বলে মেয়েটা কি মরে যাবে, টাকা না দিতে পারেন আমি দিচ্ছি, আমার সাধ্যমত আমি দেখিয়েছি আর দেখাবো।"

সেই দিনই সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার আনা হইল। তিনি বলিলেন, "ভয়ানক সিরিয়েস্ কেস্, বসন্ত ভিতরে বার হচ্ছে, বাঁচবার আশা নেই।"

অমর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

রাত্রি ন'টা বাজিল। জগদীশবাবু কন্যার নিকট বসিয়া-ছিলেন, আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিলেন, "অমর, তা হলে তোমরা মীনুর কাছে থেকো, আমি দেখি গে খোকা কেমন আছে, আমাকে ছাড়া যে এক দণ্ড থাকতে চায় না।"

জগদীশবাবু ধীরে ধীরে গৃহ ত্যাগ করিলেন, অমর ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অমর দু-চারটি বন্ধু সংগ্রহ করিয়া মীনার সেবাকার্য্যে লাগিয়াছিল। মাঘের শীত, রাত্রি ২টা বাজিল। মীনা অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিল। হঠাৎ সে একবার চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল অমর ও জন কয়েক তার কাছে বসিয়া আছে। মীনু চক্ষু মেলিয়াছে দেখিয়া অমর তাহার মুখের উপর পড়িয়া বলিল, "মীনু।"

মীনু ডাকিল, "বাবা, অমর দা, বাবা কোথায়, আমি বাবাকে দেখবো।"

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মীনু আবার বলিল "অমরদা বাবাকে ডেকে দাও, আমি বাঁচবো না।"

অমর মীনার ললাটে হাত বুলাইয়া বলিল "বাঁচবি না কি রে, অমন কথা বলতে নেই, আমি কাকামশাইকে ডেকে আনছি।"

মীনা গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল, "আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না অমরদা, তুমি বাবাকে শীগ্‌গির করে ডেকে আনো।"

অমর মীনার কপালে হাত দিয়া দেখিল ঠাণ্ডা, নাড়ী দেখিল, নাড়ীর গতি অত্যন্ত ক্ষীণ। অমর এক দৌড়ে দ্বিতলে উঠিয়া জগদীশবাবুর শয়নাগারের সম্মুখে আসিয়া ডাকিল, কাকামশাই। পুনঃ পুনঃ দরজায় করাঘাত করিল, কিন্তু সাড়া পাইল না। জানালার নিকট আসিয়া জানালায় এক ঘুঁষি লাগাইল। জানালার ছিট্‌কানিটা সশব্দে কক্ষের ভিতর পতিত হইল, সেই শব্দে জগদীশবাবুর নাকডাকা বন্ধ হইল। অমর ডাকিয়া বলিল, কাকা মশায় শীগ্‌গির আসুন, মীনা বুঝি আর বাঁচলো না, সে আপনাকে দেখতে চাচ্ছে।"

জগদীশবাবু দুই হাতে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিলেন, "আমি গিয়ে আর কি করবো, ছেলেটার বুকে সর্দ্দি, কাশি, দরজা খুললে ঠাণ্ডা লাগবে। রাত তো প্রায় ২টা হবে বোধ হয়। শেষের ব্যবস্থাটা সকালেই করো। এই হাড়ভাঙ্গা শীত, তা না হলে কষ্ট হতে তোমাদেরই হবে। সবই ভগবানের হাত, মানুষের হাত কিছুই নাই এতে।"

অমর দেখিল কন্যাবৎসল পিতা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। অমর রুদ্ধ ক্রোধে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া সিড়ি দিয়া দ্রুত নামিয়া আসিল। মীনার ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "মীনু, মীনা, মৃণাল, " কোন উত্তর নাই।

মৃত্যু পরিচয় করাইয়া দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না, বিনা পরিচয়েই মানুষ তাহাকে চিনিতে পারে।

অমরের মুখ হইতে বাহির হইল শুধু একটি ছোট্ট অস্ফুট শব্দ—'ওঃ'। সে ধীরে ধীরে মৃতা মীনার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যাপীঠ

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ
সম্পাদক, নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যাপীঠ

নবদ্বীপ আবহমানকাল জ্ঞানগৌরবে গৌরবান্বিত। অসাধারণ প্রতিভাশালী বিদ্বান্ ও জ্ঞানী মহাত্মার জীবনী লইয়াই নবদ্বীপ সমগ্র ভারতবর্ষে বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র ও পুণ্যতীর্থরূপে সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছে।

সুবিখ্যাত হিন্দু-নরপতি বল্লাল সেন নবদ্বীপে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার পর হইতে বিদ্যাচর্চ্চায় নবদ্বীপের গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর তর্কবাগীশ, ও ব্যাসাপ্তি শিরোমণি প্রমুখ অসাধারণ পণ্ডিতগণ এই নবদ্বীপের নাম সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত করেন।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লাল সেন নবদ্বীপ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে শিথিলাচার দর্শনে সমাজবন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য বল্লাল সেনের যে প্রচেষ্টার উল্লেখ দেখা যায়, তাহার ফলে নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চ্চার বিপুল উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সমস্ত শাস্ত্রের পঠন-পাঠনায় নবদ্বীপে তখন বিরাট বিশ্ববিদ্যাপীঠ গড়িয়া উঠে।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনও পিতার তুল্য বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজেও সংস্কৃত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার গভীর অনুরাগ ও প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। বিক্রমাদিত্যের মত তাঁহারও নবদ্বীপ-রাজসভায় 'নবরত্ন' অসাধারণ পণ্ডিতরত্নই ছিলেন। সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কবিসম্রাট জয়দেব ইঁহারই নবরত্নের মধ্যমণি ছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণের মধ্যে হলায়ুধ, পশুপতি, ধোয়ী প্রভৃতি প্রত্যেকেই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকাররূপে নবদ্বীপের শ্লাঘা বর্দ্ধন করেন।

লক্ষ্মণ সেনের পর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত

প্রায় তিন শত বৎসরকাল বঙ্গদেশে মুসলমানগণের প্রভাব-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলিলেও, নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চ্চা কোন দিনই স্তিমিত হয় নাই। মুসলমান শাসনকর্ত্তারাও দেশের সংস্কৃতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতচর্চ্চার পৃষ্ঠপোষকতাই করিয়া গিয়াছেন। গৌড়েশ্বর নসরত খাঁ মহাভারত অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ 'ছুটিখানের মহাভারতে'র পরিচয় দিয়াছেন। মুসলমান আমলেও নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চ্চার প্রতি যে বাদ্‌শাহ ও নবাবগণের সহানুভূতি ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে যে সকল বিদ্যার্থী নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের নিকট শিক্ষালাভ করিতে আসিত, তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বাদ্‌শাহ্ সরকার হইতে বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া যে 'ফারমান্' দেওয়া ছিল, তদ্দৃষ্টেই East India Company বঙ্গের শাসনভার গ্রহণকালে উক্ত বৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া নিজহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেও উক্ত বৃত্তি বজায় থাকে। অদ্যাবধি উহার ব্যতিক্রম ত হয়ই নাই; বরং স্যার আশুতোষের প্রচেষ্টায় উক্ত বৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে বার্ষিক ছয় হাজার টাকা হইয়াছে।

মুসলমান শাসনে ও ইংরাজ শাসনে সরকারী কার্য্যাদিতে ফারসী ও ইংরাজীর প্রবর্ত্তন হওয়ার ফলে দেশে সংস্কৃতচর্চ্চার গতি যে মন্দীভূত হইয়াছিল, ইহা আদৌ অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র দেশ হইতে টোলের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ কঠোর ত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়া পার্থিব সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন বলিয়াই বৈদেশিক শাসনেও নবদ্বীপের সংস্কৃতচর্চ্চা ম্লান হইতে পারে নাই। বরং মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্রের গৌরব আহরণ করিয়া নবদ্বীপের অসাধারণ প্রতিভাশালী সুসন্তান বাসুদেব সার্ব্বভৌম নিজ জন্মভূমি নবদ্বীপকে সেই বৈদেশিক শাসনকালেও সমধিক সমলঙ্কৃতই করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃতীছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে নব্যন্যায় শাস্ত্রের উন্নতিসাধন করিয়া মিথিলা হইতে উপাধিদানের ক্ষমতা অধিকার করিয়া নবদ্বীপকে তদানীন্তন কালে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত গৌরব প্রদান করিয়াছিলেন। রঘুনাথ তখন সমগ্র পণ্ডিতসমাজে প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া অঙ্গীকৃত হন এবং তদবধি নবদ্বীপই ছাত্র-পর্য্যায়ক্রমে বঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক পদ অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছে।

সংস্কৃত-চর্চ্চা লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের নৈতিক অধোগতির সূচনা উপলব্ধি করিয়া কয়েকজন দূরদর্শী ইংরাজ শিহরিয়া উঠেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে East India Companyর নূতন সনন্দ গ্রহণের সময় উপস্থিত হয় এবং Parliament সভায় ঐ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে চার্লস্ গ্রাণ্ট ও ক্রীতদাস-বন্ধু উইলবার ফোর্স সাহেব প্রমুখ কতিপয় সহৃদয় সাহেব ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাহাতে প্রাচীন বিদ্যাশিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির সমধিক প্রচার হয়, তৎসংক্রান্ত এক প্রস্তাবও আনয়ন করেন। দেশের তৎকালীন নৈতিক অধঃপতন ও বিদ্যাহীনতার ভাব গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়াই তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি Lord Minto এ সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তাহাতে তিনি স্পষ্টই জানান যে, ১৭৯২ খৃঃ কাশীতে যেরূপ সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, অচিরে নবদ্বীপে ও ত্রিহুতে (নদীয়া ও মিথিলায়) সেইরূপ সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে, দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। Rev. J. Long ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ১৮১১ খৃঃ ৬ই মার্চ্চ তারিখে Lord Minto, কলিকাতার Fort William হইতে উক্ত পত্র লিখেন। তাঁহার নিজের উক্তি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"I would accordingly recommend that in addition to the college of Benares, colleges be established at Nadiya and Tirhoot."

দুঃখের বিষয়, ১৮১১ খৃঃ হইতে এ পর্য্যন্ত উক্ত কলেজ আর নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে নাই। মধ্যে মধ্যে যখনই কোন ছোটলাট বা গবর্ণর নবদ্বীপ আসিয়াছেন, তখনই এই কথা তাঁহাদিগের নিকট নিবেদিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি তাহাতে কোনই ফল হয় নাই।

মধ্যে একবার প্রায় ১৭।১৮ হাজার টাকা পরিমাণ অর্থ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের বজেটে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। তবে নবদ্বীপে যে সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের গৃহনির্ম্মাণ জন্য স্থান সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি। বহু যায়গায় দর দামও হইয়াছিল। Lord Ronaldsay মহোদয় নবদ্বীপ আসিলে স্থানীয় পণ্ডিতগণের এই দারুণ স্থানাভাব দর্শনে সহানুভূতি প্রকাশও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত সরকার পক্ষ হইতে নির্দ্দিষ্ট ছাত্রবৃত্তি দেওয়া ব্যতীত গৃহনির্ম্মাণে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় নাই।

নবদ্বীপের এই সরকারী বৃত্তির মূলেও কিন্তু নদীয়াধিপতি মহারাজগণের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিপুল দানই দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ এই নদীয়ারাজবংশই চিরদিন নবদ্বীপের সংস্কৃত গৌরব রক্ষা করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছেন। এই সুবিখ্যাত রাজবংশের বদান্য রাজারা তাঁহাদের নিজ সম্পত্তির আয় হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে নদীয়ার টোলসমূহে মাসিক সাহায্য কল্পে ১২০ পাউণ্ড বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি যদি দান না করিতেন, তাহা হইলে সরকারী সাহায্য হয়ত বন্ধ হইয়াই যাইত।

এরূপ আশঙ্কা যে সত্য সত্যই ঘটিয়াছিল, তাহার বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। যে কমিটী অব্ রেভিনিউ (Committee of Revenue) নদীয়া রাজের প্রদত্ত আয় হইতে টোলের বৃত্তি দিতে বাধ্য ছিলেন, তাঁহারা সহসা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। নবদ্বীপের এই সংস্কৃত বৃত্তি বন্ধ করিবার পশ্চাতে তখনকার দিনের ইংরাজীশিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য যে বিরাট আন্দোলন হয়, তাহাও কতকটা দায়ী ছিল। মেকলে সাহেব সংস্কৃত চর্চ্চা বন্ধ করিয়া দিবারই পক্ষপাতী ছিলেন। এ দেশের অনেকেই তখন মেকলে সাহেবের মত সমর্থনও করেন। ফলে প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার মূলে একরূপ কুঠারাঘাত হইবারই আশঙ্কা হইয়াছিল। সুখের বিষয়, বিলাতে তখন সংস্কৃতানুরাগী বিদ্বান্ সাহেবও অনেকেই মেকলের মত সমর্থন করেন নাই। উইলসন সাহেবের নাম এই প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয়। মেকলের কটাক্ষে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি এই সময় টলমল হইতে দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় উইলসন সাহেবের নিকট বিলাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠাইয়াছিলেন—

গোলশ্রী দীর্ঘিকায়া বহুবিটপীতটে কোলিকাতা নগর্য্যাং।
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সংস্কৃত পঠন-গৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ॥
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো 'মেকলে'-ব্যাধরাজঃ।
সাশ্রু ক্রূতে স ভো ভো 'উইলসন' মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ॥

উইলসন সাহেব তর্কবাগীশ মহাশয়কে উত্তরে লিখেন—

নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্‌বহু প্রাণিনাং।
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণে নাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ॥
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্ব্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈঃ।
দূর্ব্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্ব্বলে॥

সংস্কৃত ভাষাকে দূর্ব্বার সহিত তুলনা করিয়া উইলসন সাহেব উহার পবিত্রতা ও অবিনশ্বরতা সূচিত করিয়াছেন এবং ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন যে বিরুদ্ধ পক্ষের শত চেষ্টা সত্বেও সংস্কৃত চর্চ্চার গতি রুদ্ধ হইবে না। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকপ্রবর জয়গোপাল তর্করত্ন মহাশয়ও অনুরূপ শ্লোকদ্বারা উইলসন সাহেবকে পত্র দিলে, সাহেব তাহারও উত্তরে যে শ্লোক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত ভাষার প্রতি যে তাঁহার কিরূপ ধারণা ছিল তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছিল—

যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাৎ যাবদ বিন্ধ্য-হিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেবহি সংস্কৃতম্॥

যাক্, কথা আর বাড়াইব না। মোট কথা, সংস্কৃত কলেজও বাঁচিয়া গেল। এদিকে আমাদের নবদ্বীপের বৃত্তিও পুনরুদ্ধারের সুরাহা হইল। নবদ্বীপস্থ ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের আবেদনে মুর্শিদাবাদের কমিশনার বাহাদুর বিগলিত হইলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় Committee of Revenue পুনরায় নবদ্বীপের বৃত্তি মঞ্জুর করেন, একথা Hunter's Statistical Account of Nadiya পুস্তকে উল্লিখিত আছে। তদবধি নিয়মিত মাসিক ২০০৲ টাকা নবদ্বীপের ছাত্রগণের বৃত্তিস্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া নদীয়া কলেক্টোরেট (Krisnaga trea-

sury)হইতে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট Sir John Woodburn মহোদয় নবদ্বীপ পরিদর্শনে আসিলে পণ্ডিতগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আর ১০০৲ বাড়াইয়া দেওয়ায় সরকারী বৃত্তি ৩০০৲ টাকাই মাসিক নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্বর্গীয় পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় নবদ্বীপ পণ্ডিত-সভার সভাপতি থাকাকালীন মুখ্যত তাঁহারই প্রচেষ্টায় মাসিক বৃত্তি ৫০০৲ শত টাকা হইয়াছে।

নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যাপীঠ ভবনটির অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। লর্ড মিণ্টোর সময় হইতে যে Residential Universityর কল্পনা চলিয়া আসিতেছে, অদ্যাবধি তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ৺বুনো রামনাথের সাধন-পীঠ কালক্রমে ৺প্রসন্নকুমার তর্করত্ন মহাশয়ের অধ্যক্ষতার অধীন হইয়াছিল। ৺বাবুলাল আগড়ওয়ালা নামক জনৈক লক্ষৌবাসী বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে উক্ত টোল গৃহ-পাকা করিয়া দেন। পরে উহাই "পাকা টোল" নামে বিখ্যাত হয়। ৺তর্করত্ন মহাশয়ের দেহান্তের পর তদীয় উত্তরাধিকারীসহ মনান্তর মূলে উক্ত ধনী স্বতন্ত্র স্থানে নূতন 'পাকা টোল' প্রতিষ্ঠিত করায় ৺বুনো রামনাথের ভিটা ও চতুষ্পাঠি পুরাতন পাকা টোল রূপেই পরিত্যক্ত ছিল। গত কয়েক বৎসর হইতে স্থানীয় বঙ্গ-বিবুধজননী সভা উক্ত গৃহ[illegible] করিয়া নবদ্বীপের সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যাপীঠের কার্য্য পরিচালিত করিতেছেন।

এই বিশ্ববিদ্যাপীঠ গৃহের জীর্ণ সংস্কার জন্য নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটী ও মণিপুরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর কিছু অর্থসাহায্য করিয়াছেন এবং তাহার পরিমাণ প্রায় তিন চারি হাজার টাকা। উপস্থিত ছাত্রগণের গৃহগুলি মেরামত না করিলে উপায় নাই। প্রায় দুইশত বিদেশী ছাত্র ভাড়া-বাটীতে বাস করিতেছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, লেঃ স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, বিচারপতি ডাঃ বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, 'মাতৃভূমি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত এস্, কে, হালদার (বিভগীয় কমিশনার), শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এই বিদ্যাপীঠ গৃহ দর্শনে ইহার সংস্কার জন্য সর্ব্বসাধারণকে সাহায্য করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ ৩০০৲ সাহায্য করিয়াছেন। এখনও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকীল মৌলভী ইয়াসিন সাহেব প্রমুখ এই বিদ্যাপীঠ দর্শনে সর্ব্বসাধারণকে সহায়তা করিতে আবেদন করিয়াছেন। দেশপ্রাণ সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারকামী ব্যক্তির যথাসাধ্য সাহায্য হইতে এই প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হইবে না ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

পুস্তক-পরিচয়

ডাঃ সেন—শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী। প্রকাশক—শ্রীশান্তিকুমার রায়চৌধুরী, চিত্রা পাবলিশিং কোং, ১১, কানাইধর লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯১, মূল্য এক টাকা

একখানি উপন্যাস। লেখকের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ,—আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির ন্যায় তাঁহার বিশ্লেষণ প্রতিভার পরিচয়ও বইখানিতে পাওয়া যায়। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার রঙ্গীন পালিশের নীচে—আমাদের দেশ-সেবা, সমাজ-সেবার আবরণের অন্তরালে, দীপ্ত প্রতিভার জৌলুষের তলায় যে বিরাট একটা ফাঁকিবাজী চলিতেছে তিনি তাহার মুখোস খুলিয়া ফেলিয়াছেন। মানব-জীবনের এই দিকটা না জানিলে মানুষের প্রকৃত পরিচয় অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। উপন্যাসখানিতে সুধাংশুবাবু জীবনের খাঁটি পরিচয়ই দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার ভাষা স্বচ্ছন্দগতি এবং বেশ জোরালো, গল্প বলার ভঙ্গিটিও খুব সহজ। কিন্তু ৯১ পৃষ্ঠার মধ্যে ঘটনা বাহুল্যের ঠাসাঠাসির ফলে রসোপলোব্ধির ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়াছে। বইখানার অন্ততঃ চারিগুণ পৃষ্ঠা হইলে এই ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভবপর ছিল। তবুও বইখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে এবং পাঠক-পাঠিকাদেরও ভাল লাগিবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কবি বিষ্টুদা—শ্রীসতীকুমার নাগ ও শ্রীসনৎকুমার নাগ। প্রকাশক—শ্রীরণেন্দ্রনাথ দে মজুমদার, চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, ৭ নং নবীন কুণ্ড লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৮, মূল্য পাঁচ আনা।

ছোটদের গল্পের বই। মোটের উপর দুইটি গল্প আছে বইখানিতে। উগ্রচণ্ডী গল্পটি পূর্ব্বেই মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি বিষ্টুদা গল্পটি নূতন সন্নিবেশিত। দুইটি গল্পই সরসতায় হাস্যোজ্জ্বল। ভাষাও বেশ ঝর্‌-ঝরে,—পড়িয়া যাইতে কোথাও আটকায় না। তবে কবি বিষ্টুদার চলার পথে গল্পটি মাঝে মাঝে একটু আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

কয়েকখানি ছবি থাকায় বইখানি আরও মনোজ্ঞ হইয়াছে। ছেলে-মেয়েরা বইখানি লুফিয়া লইবে।

ছাপা, কাগজ ভাল।

শতাব্দীর প্রতিনিধি—অধ্যাপক সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীদেবব্রত রায়চৌধুরী। প্রকাশক—শ্রীজগদীশ বসু, ৪৪-১, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০০, মূল্য চৌদ্দ আনা।

সামাজিক ঘটনাবলীর সজ্যাতে ইতিহাস গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থদ্বারা এই সকল ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ শ্রেণী আমাদের চোখে পড়ে না, আমরা দেখিতে পাই শুধু ব্যক্তিকে যাঁহার অঙ্গুলী-হেলনে মানব-সমাজ বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের পথে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সৃষ্টি করিয়া আগাইয়া চলে। কিন্তু এই ব্যক্তি শুধু ব্যক্তি নয়, এই ব্যক্তি প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু কার প্রতিনিধি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে শতাব্দীর প্রতিনিধি পুস্তকখানিতে। এই পরিচয় সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নয়,—নিরস কথার গাঁথুনী নয়,—বর্ত্তমান শতাব্দীর যাঁহারা প্রতিনিধি তাঁহাদের জীবনের ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজভাবে এই পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। চার্চ্চিল, মুসোলিনী, চিয়াং, হিটলার, রুজভেল্ট এবং ষ্টালিন এই ছয়জনের পরিচয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান শতাব্দীর গতি-পথের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাপা, কাগজ ভাল।

বইখানির ভাষা সহজ এবং সুখপাঠ্য। ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত হইলেও অভিভাবকরাও পড়িয়া আনন্দ পাইবেন।

আহুতি (মাসিক পত্রিকা)—প্রথম বর্ষ; দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৪৮। সম্পাদক—শ্রীজাহ্নবী [illegible] চক্রবর্ত্তী, এম-এ। ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত।

আহুতির ১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলা[illegible]। ময়মনসিংহের মত মফঃস্বলের সহর হইতে একখানি মাসিক প[illegible] প্রকাশ করা বড় সহজ নয়। আলোচ্য সংখ্যাখানি গল্প, প্র[illegible] এবং কবিতায় সমৃদ্ধ। অতীতে এবং বর্ত্তমানে সাহিত্য-জগতে ময়মনসিংহ যাহা দান করিয়াছে তাহা সাহিত্যের গৌরবের বস্তু। আহুতি এই গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবে, ইহাই আমরা কামনা করিতেছি

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতীয় সমস্যায় ভারত-সচিব

আটলাণ্টিক সনদ যে ভারতে প্রযোজ্য নহে, একথা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেওয়ার পরও উহার প্রতি লো: যখন ভারতবাসীর দূর হইল না, ভারত-সচিব মিঃ আমেরী মাঞ্চেষ্টারে এক বক্তৃতায় জানাইয়া দিলেন, আগষ্টের ঘোষণা আটলাণ্টিক সনদের চেয়েও ভাল,—কি ছার আটলাণ্টিক সনদ আগষ্টের ঘোষণার কাছে! ভারতবাসী আটলাণ্টিক সনদের জন্য যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে মিঃ চার্চ্চিল যদি উহা ভারতবাসীকে দিয়াই ফেলিতেন, তাহা হইলে কত বড় লোকসান যে হইত তাহা ভাবিয়া আমেরী সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

মিঃ আমেরী শুধু লোকসান হ[illegible]তই ভারতবাসীকে বাঁচান নাই, তাহাদের জন্য দায়িত্বপূ[illegible]নতা-সৌধ নির্ম্মাণের অধিকতর অলৌকিক কার্য্য ([illegible]acle) অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অলৌকিক কর্ম্ম তো বটেই! তাঁহার নিজের দেশেই উহা সম্পন্ন করিতে যে কয়েক শতাব্দী লাগিয়া গিয়াছিল। তাছাড়া ভারতে এই অলৌকিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে বাধাও তাঁহার কম নয়! ভারতে রাজনৈতিক শক্তি অধিকার করিবার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পরস্পর গলা ধরিয়া অগ্রসর না হইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে। শক্তির জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিযোগিতা করিবে না অথচ ভারতবাসী দায়িত্বশীল স্বাধীনতা পাইবে, ইহা অপেক্ষা অলৌকিক কর্ম্ম আর কি হইতে পারে!

আমেরী সাহেবের দেশেও তো একাধিক রাজনৈতিক দল আছে। তাঁহারা কি শক্তির জন্য প্রতিযোগিতা করেন না? নির্ব্বাচনের সময় কি প্রত্যেক দল নিজ নিজ আদর্শ, মতবাদ এবং কার্য্য লইয়া ভোটারদের নিকট উপস্থিত হন না, তাহাদিগকে নিজ নিজ দলের মতানুবর্ত্তী করিয়া ভোট আদায় করিতে চেষ্টা করেন না? তবে ভারতের রাজনৈতিক দলাদলিতে কিছু পার্থক্য যে আছে, তাহা আমরাও স্বীকার করি। প্রভুর প্রসাদ আকাঙ্ক্ষী দলের অস্তিত্বের জন্যই এই পার্থক্য। পরাধীনতার ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল।

মাঞ্চেষ্টারের বক্তৃতায় মিঃ আমেরী আরও বলিয়াছেন যে, অনৈক্য ও প্রাচীন পন্থা পরিত্যাগের অনিচ্ছাই হইল ভারতীয় সমস্যা সমাধানের অসুবিধা। প্রাচীন পন্থা বলিতে কি তিনি দলগত রাজনীতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন? অনৈক্যের কথা বহু পুরাতন। কেন অনৈক্য, কি উহার স্বরূপ তাহা বহুবার আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের কাছে উহা চির নূতনই থাকিবে।

রাজনৈতিক মর্য্যাদা অঙ্গ-সজ্জার ন্যায় কাহাকেও দান করা যায় না। এসম্বন্ধে আমেরী সাহেবের সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু ব্যবহার ও রক্ষা করিবার ক্ষমতা দ্বারাই যদি উহা অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে জলে না নামিয়া সাঁতার শেখার মতই উহা এক অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, গ্রীস প্রভৃতির কথা আমরা উল্লেখ করিতে চাই না। গত মহাযুদ্ধে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকদের বীরত্বের যে প্রশংসা আমেরী সাহেবের স্বদেশবাসীরাই করিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ না হয় নাই করিলাম, কিন্তু অঙ্গ-সজ্জার মত স্বাধীনতা যেমন দান করা যায় না, তেমনি স্বাধীনতার ব্যবহার এবং উহা রক্ষা করার শক্তি অপরের নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ করাও অসম্ভব। স্বাধীনতা পাইয়াই লোক উহা ব্যবহার শিক্ষা করে, উহার রক্ষা করিবার শক্তিও অর্জ্জন করে।

—

গণপরিষদ অসম্ভব কেন?

আটলান্টিক সনদের জন্য ভারতে যে একটা আন্দোলন চলিতেছে, মিঃ আমেরী মাঞ্চেষ্টারের বক্তৃতায় তাহাকে চিন্তার দৈন্যপ্রসূত বলিয়া তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। চিন্তার দৈন্য তো বটেই! তিনি যাহাকে ভাল বলেন, তাহাকে ভাল না বলিলে চিন্তার দৈন্য তো প্রকাশ পাইবেই। আটলান্টিক সনদ নাকি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অসন্তোষজনক হইত। আগষ্টের ঘোষণাই তাঁহার কাছে একমাত্র সুস্পষ্ট এবং সন্তোষজনক। কিন্তু তাহাও সুস্পষ্ট এবং সন্তোষজনক শুধু এক সর্ত্তে,—শাসন-তন্ত্রের প্রধান প্রধান নীতি সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে মতের ঐক্য হওয়া চাই,—গণপরিষদে নীতি নির্দ্ধারণ করিলে চলিবে না। গণপরিষদের দাবী মিঃ আমেরীর কাছে একটা অসম্ভব দাবী। কিন্তু কেন অসম্ভব? সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবী অনুসারে শাসনতন্ত্র রচিত হউক, এ দাবী তো কংগ্রেস করে নাই। যদি করিত তাহা হইলে গণপরিষদ চাহিত না।

গণপরিষদ আহূত হইলে মতের অনৈক্য হইবে না, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা নেতা সাজিয়া বসিয়াছেন, গণপরিষদে তাঁহারা কোন পাত্তা পাইবেন না, অনৈক্য সৃষ্টি করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। গণপরিষদের সমস্যাটা এইখানেই।

ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন দিবার পথে যত রকম কাল্পনিক বাধা হইতে পারে, তাহার একটা বিস্তৃত তালিকা ভারত-সচিব তাঁহার মাঞ্চেষ্টার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ডোমিনিয়নগুলি যখন শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছিল, তখন কিন্তু এইরূপ বিস্তৃত তালিকা বৃটেন প্রদান করে নাই। কিন্তু ভারতসম্পর্কে যাহা ভাল তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিতে বৃটেন রাজী নয়। ইহাই প্রধান সমস্যা।

—

সত্যাগ্রহী বন্দীমুক্তি

অবশেষে গবর্ণমেণ্ট নামমাত্র অপরাধে অপরাধী সত্যাগ্রহী বন্দীদিগকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুকেও মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এইটুকুও খুব সহজে হয় নাই। গত ১৮ই নবেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত যোশীর বন্দীমুক্তির প্রস্তাব উত্থাপিত ও প্রত্যাহৃত হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল সমগ্র বিষয়টি বিবেচনার জন্য আরও সময় চাহেন। কাজেই প্রস্তাব প্রত্যাহার না করিয়াই বা উপায় ছিল কি? অতঃপর ২৭শে নবেম্বর কমন্স সভায় প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব মিঃ আমেরী জানান, শ্রীযুত যোশীর প্রস্তাবসম্পর্কে উক্ত সময় পর্য্যন্ত সরকারীভাবে তিনি কিছু জানিতে পারেন নাই, তবে তিনি শুনিয়াছেন, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন আছে, ইহা কেন্দ্রীয় পরিষদে জানান হইলে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়।

১৮ই নবেম্বর হইতে ২৭শে নবেম্বর পর্য্যন্ত নয় দিনের ভিতর মিঃ আমেরী শ্রীযুত যোশীর প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই, ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বিলাতের ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকা নয় দিনের ভুল শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। ইহার পূর্ব্বেও ডেইলী হেরাল্ড, মাঞ্চেষ্টার [illegible], এমন কি আধাসরকারী পত্রিকা টাইমস [illegible] বন্দীমুক্তির প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। তথাপি বন্দীমুক্তির প্রশ্নের সমাধান হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। এই বিলম্ব কি সত্যই ভুল বশতঃ হইয়াছে?

বিলম্বে হইলেও বন্দীমুক্তি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভারতবাসী তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। ভারতবাসী তিন শ্রেণীর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিই চাহিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই। শ্রীযুত যোশী ইহাকে দ্বিধাপূর্ণ ও নিরুৎসাহী ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীও বলিয়াছেন, "ভারত গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তে আমি আনন্দিত হইতে পারি নাই।"

বন্দীমুক্তির পর বিলাতী পত্রিকাসমূহ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা পরিবর্ত্তন আশা করিতেছেন। এরূপ আশা করা আশ্চর্য্য কিছু নয়। কংগ্রেসের নীতি

পরিবর্তন সম্পর্কে শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি প্রভৃতির আগ্রহের পটভূমিকার উপরেই সত্যাগ্রহী বন্দিগণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এই আগ্রহকে আরও দৃঢ় করিবার জন্যই মৌলনা আজাদ এবং পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বন্দীমুক্তির এই ব্যবস্থায় কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তিত হইবে কি না তাহা স্থির করিবে ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি। কিন্তু সমস্ত বন্দী মুক্তি পাইলে ভারতবাসী যে অত্যন্ত আনন্দিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

—

ভারতীয় সমস্যা ও পণ্ডিত নেহরু

জেল হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু লক্ষ্ণৌ সহরে সাংবাদিক বৈঠকে এবং ডেইলী-হেরাল্ড পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা, যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং স্থায়ী শান্তিপূর্ণ ভাবী দুনিয়া সম্পর্কে যে বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলিয়াছেন, জার্ম্মানী অকারণ রাশিয়াকে আক্রমণ করায় ফ[illegible]র স্বরূপ বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, "বৃ[illegible] [illegible]গতিশীল শক্তিসমূহের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু [illegible] সম্পর্কে বৃটিশ মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তনই হয় [illegible]। ডেইলী হেরাল্ডের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন, "ভারত সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সকল কথা বলিয়াছেন এবং যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতে সকল শ্রেণীর লোকই বিরক্ত হইয়াছে এবং এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, এই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না।" ভারতের প্রকৃত সমস্যা এইখানেই। এই সমস্যার সহিত বন্দিমুক্তির সমস্যার কোন সম্পর্ক পণ্ডিতজী স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন, "সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিলেও প্রকৃত সমস্যাটি থাকিয়াই যায়। গত দুই বৎসরের ঘটনায় উহার সন্তোষজনক সমাধানের আশা আরও সুদূরপরাহত হইয়াছে।"

অহিংসার আদর্শ সম্পর্কে পণ্ডিতজী একটি অতি সুন্দর সমাধান প্রদান করিয়াছেন। মহাত্মার নেতৃত্ব উজ্জ্বল, প্রজ্ঞাদীপ্ত, সন্দেহ না[illegible] [illegible]র অপরা[illegible] অহিংসার আদর্শ সম্মুখে রা[illegible] [illegible]যা প্রয়োগ সম্ভব নহে। আন্তর্জ্জাতিক সে[illegible] করেন, শান্তিরক্ষার্থ আন্তর্জ্জাতিক সৈন্যবাহিনী[illegible] সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ সম্ভবপর। কিন্তু উহা প্রকৃত আন্তর্জ্জাতিক হওয়া চাই। কয়েকটি বড় বড় রাষ্ট্রদ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত হইলে চলিবে না। স্থায়ী শান্তিপূর্ণ ভাবী পৃথিবী সম্পর্কে পণ্ডিতজীর এই অভিমত অত্যন্ত মূল্যবান। লীগ অব নেশানস্-এর ব্যর্থতা হইতে পৃথিবী কোন শিক্ষালাভ করিয়া থাকিলে পণ্ডিতজীর নির্দ্দেশিত পথই একমাত্র স্থায়ী শান্তির পথ।

৭৬৩

যুদ্ধ আজ ভারতের তটভূমিতেও আসিয়া আঘাত করিতেছে। পণ্ডিতজী মনে করেন, এই বিশ্ব-সংগ্রাম শুধু সংগ্রাম নয়, সংগ্রাম অপেক্ষাও বৃহত্তর আরও কিছু— এই সংগ্রাম অসংখ্য পরিবর্ত্তনের জননী। কিন্তু কিরূপে এই পরিবর্ত্তন সার্থক হইবে? পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, "হিটলার জয়লাভ করিলে, তাহা সর্ব্বনাশকর হইবে; কিন্তু অপর কেহ জয়লাভ করিয়া যদি অস্ত্রবলে বিশ্বের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তবে তাহাও সর্ব্বনাশকর হইবে।" সামরিক জয়কে সার্থক করিবার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন পণ্ডিত নেহরু— স্বাধীনতা এবং নিরস্ত্রীকরণ।

অ-ফ্যাসিষ্ট শক্তিসমূহের প্রতি ভারতের সহানুভূতির অভাব কোন দিনই হইবে না। কিন্তু পণ্ডিতজী মনে করেন, বৃটিশ সরকারের ভারতীয় নীতির প্রতি ভারতবাসীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইবার কোন কারণ ঘটে নাই। দ্বিধা-বিজড়িত কার্পণ্যদ্বারা কোন কাজ হইবে না, ইহাই তাঁহার অভিমত। ভারত যে স্বাধীনতা দাবী করিতেছে, তাহা আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ প্রসূত নহে। বিশ্ব-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই ভারত স্বাধীনতার দাবী করিতেছে। কিন্তু পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা বজায় রাখিয়া ভারতের দাবী পূরণ করিবার উপায় নাই। অতীতের ধ্বংসাবশেষকে অপসারিত করিয়াই বিজয় এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। পণ্ডিতজী বলেন, "ইহার পরীক্ষার স্থান ভারতবর্ষ এবং সে-পরীক্ষা হইবে এখনই, যুদ্ধের পরে নহে।"

...অভিমত দ্বারা বৃটিশ গবর্ণ-...যদি প্রভাবিত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারতীয় সমস্যার সমাধান কঠিন হইবে না। কিন্তু হইবে কিনা তাহা বলা কঠিন।

—

পার্থক্য কেন ?

১৯৩৯ সন হইতে সৈন্যবিভাগে জরুরী কমিশনে যাঁহাদিগকে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ইউরোপীয়, এংলোইণ্ডিয়ান শতকরা দেড়জন এবং ভারতীয় শতকরা ২৩ জন। এই পার্থক্য কেন হইল, তাহার সম্বন্ধে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা যুক্তি দিয়াছেন—ইউরোপীয়ের সংখ্যা তো বেশী হইবেই, তাহাদের মধ্যে সৈন্যবিভাগে যোগদান করা বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক কথাটা অবশ্য ঠিকই। বেতন ও পদমর্য্যাদা ইউরোপীয়দিগের সমান হইলে বহু ভারতীয় সামরিক বিভাগে আকৃষ্ট হইত।

কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, দেশরক্ষা বিভাগে অফিসারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল মহিলা কেরানী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ২৮১ জন ইউরোপীয়, ৮৬ জন এংলোইণ্ডিয়ান, এবং ৪ জন ভারতীয়। এখানে ভারতীয়ের সংখ্যা কম হইবার কারণ কি? বাধ্যতামূলক কেরানীগিরির তো কোন আইন নাই।

সৈন্যবাহিনীতে কিংস কমিশনে যে সকল ভারতীয় আছেন তাঁহাদের অপেক্ষা বৃটিশ কর্ম্মচারীদের বেতন বেশী। যাঁহারা এশিয়াবাসী নহেন, তাঁহাদেরই যদি ভারতীয়দের অপেক্ষা অধিক বেতন পাইবার অধিকার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কি ভারতের মর্য্যাদা হানি হয় না? ডোমিসাইলই কি বেতন পার্থক্য হওয়ার কারণ? এংলোইণ্ডিয়ান কেরানীদের বেতন ভারতীয় কেরানীদের বেতন অপেক্ষা বেশী কেন?

রাষ্ট্রীয় পরিষদের একটি প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, ভারতীয় পুলিশ বিভাগে ইউরোপীয় আছে ৪০৪ এবং ভারতীয় আছে ২০২ জন। অর্থাৎ প্রতি দুই জনে একজন ভারতীয়। উপযুক্ত ভারতীয়ের অভাব না থাকিলেও ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে এই সংখ্যা-বৈষম্য সত্যই বিস্ময়কর।

হিন্দুস্থান টাইমসের মামলা

দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী দেবীদাস গান্ধী, মুদ্রাকর শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ শর্ম্মা ও উক্ত পত্রিকার মীরাটস্থ সংবাদদাতা শ্রীযুত আর, এন সিংহাল আদালত অবমাননার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি কলিষ্টারের এজলাসে এই মোকদ্দমার বিচার হয়। হিন্দুস্থান টাইম্‌সের সংবাদদাতা শ্রীযুত সিংহালের কোন রিপোর্ট ইতিপূর্ব্বে ভ্রান্তিমূলক হয় নাই এবং এই জন্যই যে তাঁহার প্রদত্ত সংবাদ সরল বিশ্বাসে প্রকাশ করা এবং তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হইয়াছে বিচারপতিদ্বয় তাহা মানিয়া লইয়া পত্রিকার সম্পাদক এবং মুদ্রাকরকে বিদ্বেষ পোষণের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। সংবাদের শিরোনাম এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য ঠিক না হওয়ার ত্রুটির জন্য সম্পাদক শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া আদালতে আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচারপতিদ্বয় দুঃখ প্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া আদালত অবমাননার অভিযোগে সম্পাদক এবং মুদ্রাকরকে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীযুত সিংহাল তাঁহার প্রদত্ত সংবাদ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিচারপতিদ্বয় তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু মীরাটের অতিরিক্ত দায়রাজজ শ্রীযুত হরিশঙ্কর বিদ্যার্থী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ৩১ শে জুলাই তারিখ আদালতে বসিয়াই তিনি যুদ্ধের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিচারপতিদ্বয় তাঁহার এই কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, আদালতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা হইতে তাঁহার নিজের অনুমানের উপর অথবা অন্য লোকের কথার উপর শ্রীযুত সিংহালের রিপোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচারপতিদ্বয় শ্রীযুত সিংহালের ত্রুটি মার্জ্জনাও করিতে পারিতেন।

নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ যে ক্ষমাপ্রার্থনার তুল্য, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার প্রচুর ক্ষমতা হাইকোর্টের আছে।

বিচারপতিদ্বয় যদি নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশকে ক্ষমা-প্রার্থনার অর্থে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, এইখানেই এই মোকদ্দমার যবনিকাপাত হইত।

—

ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দীর আত্মহত্যা

দেশের জন্য যাঁহারা ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিয়াছেন, একান্ত অসহায় অবস্থাতেও তাঁহাদের দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন একথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুত নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য্য যে অবস্থায় পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত শোচনীয় ও মর্ম্মান্তিক।

মুক্তিলাভের পর বেনারসে তিনি একটি কাজ পাইয়াছিলেন, কিন্তু সেখান হইতে বহিষ্কৃত হওয়ায় কলিকাতায় আসিয়া আর একটি চাকুরী সংগ্রহ করেন। এখানেও তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না, নিজের জিলা ত্রিপুরার সীমার মধ্যে বাস করিবার জন্য তিনি আদেশ পাইলেন। কিন্তু সরকার হইতে তাঁহাকে কোন মাসোহারা দেওয়া হয় নাই। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি না ?রিতে পারে এমন পাপ নাই, অন্নবস্ত্রের সংস্থান ক[illegible] না পারিয়া জীবনের উপর বীতস্পৃহ হও[illegible]ভাবিক নয়। পুলিশের রিপোর্টের উপর নির্ভর [illegible] বহিষ্কারের আদেশ প্রদত্ত হইলে যাঁহাদের জীবিকা অ[illegible]নের দ্বার রুদ্ধ হয়, তাঁহাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্যকর্ত্তব্য। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইবেন, ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

—

শিক্ষিত যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রাণপ্রিয় পরিজনবর্গের ভরণ-পোষণের কোন উপায় করিতে না পারিয়া মানুষ আত্মহত্যা করিয়াছে, অতীতে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া জনৈক সুশিক্ষিত যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে সাহসী সৈনিকের মত সম্মুখীন না হইয়া আপনি পলায়নের চেষ্টা করিবার অপরা[ধে] অপরাধী হইয়াছেন। যদিও আপনি সঙ্কটজনক অবস্থা মধ্যে পড়িয়াছিলেন, তথাপি দেওয়ালের দিকে পৃষ্ঠদে[শ] রাখিয়া আপনার যুদ্ধ করা উচিত ছিল। কিন্তু আপ[নি] কাপুরুষের মত কাজ করিয়াছেন, আর সব কিছুকে আপনি জলে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।" ম্যাজিষ্ট্রেট এই সুশিক্ষিত যুবককে মুক্তি দিয়া ন্যা[য়] বিচারের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু এই সুশিক্ষি[ত] যুবকটি কাপুরুষের মত আত্মহত্যা করিতে কেন গিয়[া]ছিলেন, সে প্রশ্ন রহিয়াই গিয়াছে। এই প্রশ্নে[র] মীমাংসা করিবার দায়িত্ব আদালতের নয়। দায়ি[ত্ব] সমাজ ও রাষ্ট্রের।

যে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-জীবন সংগ্রামের সৈনিকে[র] যুদ্ধ করিবার অস্ত্র যোগাইতে অসমর্থ, সেই অর্থনৈতি[ক] ব্যবস্থা অক্ষম ব্যবস্থা। এই অক্ষম ব্যবস্থার পরিবর্ত[ন] না হইলে আত্মহত্যা পাপের প্ররোচনা দূর হইবে না।

—

শ্রমিকদের ভাতা

বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের মালিকগণ শ্রমিকদিগ[কে] তাহাদের বার্ষিক উপার্জ্জনের শতকরা সাড়ে বার টা[কা] বোনাস দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধা[ন্ত] তাঁহারা করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ অনুযায়ী। [এই] ব্যবস্থায় শ্রমিকদের যে একেবারেই কিছু সুবিধা হয় ন[া] তাহা নহে; তবে তাহাদের কষ্ট যে এই ব্যবস্থায় [দূর] হইবে না, তাহা ঠিক। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ম[ূল্য] যে হারে বাড়িয়াছে, এই বোনাস দিয়া তাহা সঙ্কুল[ান] হইবে না। তারপর এই বোনাস ফেব্রুয়ারীতে দেও[য়ার] সিদ্ধান্তও সঙ্গত হয় নাই। শ্রমিকগণ শতকরা ২৫্ ট[াকা] হারে মজুরী বৃদ্ধি দাবী করিয়াছিল। এই দাবীর পরি[বর্তে] যে বোনাস মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎক[র]। কল-মালিকদের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শ্রীযুত যোশী যথ[ার্থই] বলিয়াছেন, "এই সিদ্ধান্তের মধ্যে বদান্যতা না থাকি[লেও] চাতুর্য্য আছে।"

—

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেলওয়ে ক্রয় করার সিদ্ধান্ত

ভারত-গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন রেলওয়ে ক্রয় করিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট শুধু এই দুইটি রেলওয়ে ক্রয় করিয়া লইলেই জনসাধারণের দাবী পূরণ হইবে না; এই দুইটি রেলওয়ে যাহাতে জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল ভাবে পরিচালিত হয়, সেই জন্যই জনসাধারণের এই দাবী। গবর্ণমেণ্ট এই দাবী পূরণ করিতে কার্পণ্য করিবেন না, এই আশা আমরা কি করিতে পারি না?

—

কংগ্রেসের কর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে। শীঘ্রই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে। অনেকেই এইরূপ আশা করিতেছেন, কর্ম্মনীতি পরিবর্ত্তন সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটির এই অধিবেশনেই গৃহীত হইবে।

ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু মুক্তি পাওয়ার পর হইতে এপর্য্যন্ত একাধিক বার তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুত রাজগোপাল আচারী তাঁহার মত স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই এপর্য্যন্ত। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে অভিভাষণ প্রদান করিতে যাইয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অভিমতের আভাস কিছু পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটিবার ফলে উভয়ে ভিন্ন পথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তব হইয়া উঠিলে, তিনি তাহার সম্মুখীন হইতে দ্বিধা করিবেন না।

কিন্তু সমস্যা প্রকৃত পক্ষে হিংসা-অহিংসার সমস্যা নহে। প্রয়োজন হইলে যে কংগ্রেস নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তাহা পুণা-প্রস্তাবেই প্রকাশ। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার পর হইতেই অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ভারতের বড় সমস্যা নহে। মুসলিম লীগের বাহিরে ভারতের যে বিরাট মুসলমান সমাজ রহিয়াছে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া মুসলিম লীগকেই ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি স্বীকার করাতেই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মিঃ জিন্নার নেতৃত্ব যে কৃত্রিম, বাংলা এবং আসামে সদ্য সদ্য তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কংগ্রেসের কর্ম্মনীতির ন্যায়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতিও পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। কংগ্রেসের নীতি-পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে, কিন্তু বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের দিক হইতে এখনও তাঁহাদের কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। বিলাতী পত্রিকাসমূহও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেছেন। এখন বৃটিশ রাষ্ট্র-নীতিবিদ্‌দের দূরদৃষ্টি এবং আন্তরিকতার উপর সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে।

—

বাংলার নূতন মন্ত্রি-সভা

গত সেপ্টেম্বর মাসে অনাস্থা প্রস্তাবের সূচনা হইতে বাংলায় মন্ত্রিত্ব-সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা চলে অনেক দিন ধরিয়া। কিছুতেই তাহা এড়াইবার সম্ভাবনা দেখা না দেওয়ায় ১লা ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার সকল [illegible] ত্যাগ করেন। কিন্তু তাহার পরেও ১১ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের জন্য কেহ-ই আহূত হন নাই। বহু প্রতীক্ষার পর ১১ই ডিসেম্বর প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেব আহূত হইয়া মন্ত্রী-সভা গঠন করিয়াছেন। এই মন্ত্রী-সভার বিশেষত্ব এই যে, তাহা সমর্থনের জন্য পূর্ব্বেই প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি নামে একটি দল গঠিত হয়। এবং এই দলের নেতা হিসাবে হক সাহেব মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ঢাকার নবাব বাহাদুর লীগদল পরিত্যাগ করিয়া প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলে যোগদান করিয়া পুনরায় মন্ত্রী হইয়াছেন।

নূতন মন্ত্রী-সভা গঠিত হইয়াছে বলিয়াই বাংলায় নূতন যুগের সৃষ্টি হয় নাই। তাঁহাদিগকেই বাংলায় নূতন যুগ গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা আশা করিতেছি, বাংলার জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া নূতন মন্ত্রি-সভার

গঠনের সার্থকতা তাঁহারা সম্পাদন করিবেন। নূতন মন্ত্রি-সভা গঠনের সার্থকতাও এইখানেই।

শরৎবাবুর গ্রেফ্‌তার

যেদিন হক সাহেব আহূত হইয়া মন্ত্রি-সভার কাঠামো গঠন করিলেন, সেই দিনই শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হওয়ায় দেশবাসী অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছে। শরৎবাবু নূতন মন্ত্রি-সভায় স্বরাষ্ট্র সচিব হওয়ার সম্ভাবনার কথা শোনা গিয়াছিল। বাংলার এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে তাঁহার উপদেশ এবং কর্ম্মশক্তির অভাবে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ইহা বাংলার চরম দুর্ভাগ্য। নূতন মন্ত্রি-সভা তাঁহার মুক্তির যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

আসামের শ্রী মন্ত্রি-সভা

আসামে সাদুল্লা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগের পরেও ব্যবস্থা পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রি-সভার পদত্যাগের পূর্ব্বেই শিক্ষা-সচিব শ্রীযুত রোহিণীকুমার [illegible] পদত্যাগ করিয়া নূতন একটি দল গঠন করি[illegible]ই দলের নাম জাতীয়তা-বাদী কোয়ালিশন দল। [illegible]লের সদস্যসংখ্যা ৩২জন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। [illegible]গ্রেসী সদস্যদের সমর্থন পাইলে রোহিণী বাবুর প্রধানমন্ত্রিত্বে আসামে নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হইবার সম্ভাবনা। এই বিষয়টি বর্ত্তমানে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাবকমিটির বিবেচনাধীন। আমরা আশা করিতেছি, সিন্ধুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আসামও কংগ্রেস নূতন মন্ত্রি- গঠনে সহযোগিতা করিবেন।

রুশ-জার্ম্মান

রুশ-রণাঙ্গনে শীত পড়িয়াছে এক মাস। রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের ছয় মাস পূর্ণ হইতে সপ্তাহের বেশী বাকী নাই। ক্রিমিয়াতে জার্ম্মানী [illegible] লাভ করিলেও রোষ্টভে তাহার যে পরাজয় হইয়াছে তাহার ফল বহু দূরপ্রসারী হইবে তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। রোষ্ট-ভের পরাজয়ের পর, একমাসের চেষ্টায় জার্ম্মানীর ক্রিমি দখল ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। রোষ্টভ পুনর রাশিয়ার অধিকারে আসায়, উত্তর দিকের পথে জার্ম্মানী ককেশাসের পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় আর রহিল না। এই পথটি বন্ধ হওয়ায় কার্চ্চ প্রণালী পার হইয়া দক্ষি দিকের পথে জার্ম্মানীর অগ্রসর হওয়াও কঠিন। কার ডন অববাহিকায় রাশিয়া জয়লাভ করায় সমরোপকর ও খাদ্য সরবরাহের বাধা সৃষ্টি হইবে। সিবাষ্টাপো দখল না করিয়া জার্ম্মানী কার্চ্চ প্রণালী পার হইতে পারিবে না। কাজেই ককেশাস দখল করা জার্ম্মানী আর হইল না।

মস্কো ও লেনিনগ্রাডের রণাঙ্গনেও রাশিয়ার পাল্টা আক্র মণে জার্ম্মানী পিছু হটিতে বাধ্য হইতেছে। ২৫শে নবেম্ব হইতে ৯ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দুই সপ্তাহ যতগুলি জার্ম্মা আক্রমণ হইয়াছে, তাহার সবগুলিই ব্যর্থ হইয়াছে সুতরাং শীতের মধ্যে মস্কো সহরে প্রবেশ করা জার্ম্মানীর আর হইল না। শীতকালে জার্ম্মানীর সর্ব্বশেষ আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া গেল।

রাশিয়ার প্রবল শীত জার্ম্মানীর এই পরাজয়ে রাশিয়াকে কতকটা সাহায্য হয়ত করিয়াছে। কিন্তু শীতের জন্যই যদি জার্ম্মান আক্রমণ ব্যর্থ হয় তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। যুদ্ধে জয়লাভ করার পক্ষে অস্ত্র-শস্ত্রের ন্যায় প্রাকৃতিক অবস্থাও মানুষের সহায়। বৃটেনের ইংলিশ চ্যানেল, ভারতের হিমালয়ের ন্যায় রাশিয়ার শীতও স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান সহায়। জার্ম্মান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ গর্ব্ব করিয়াছিলেন, রাশিয়ার শীত তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। এই গর্ব্ব তাঁহাদের আর রহিল না।

জাপানের অতর্কিত আক্রমণ

জাপ আক্রমণের কোন সম্ভাবনার কথাই যখন কাহারও মনে হয় নাই, জাপান যখন নিজে উপযাচক হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আপোষ আলোচনা চালা-ইতেছিল, সেই সময় অতর্কিতে ৭ই ডিসেম্বর জাপান বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। প্রতারণার আশ্রয় লইয়া জাপান হঠাৎ প্রশান্ত মহাসাগ